ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্র পাঠযুক্ত (CBCS) স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম.এ. দ্বিতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পাঠ - ৫

Society and Culture in India

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

জুন ২০১৯
মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

SYLLABUS

SEMESTER- II

EC-5	4 CREDITS	100 MARKS	100 HOURS

Paper/EC-5: Society and Culture in India

BLOCK 1: Nature, wild life and ethnic communities in India

Unit-1: Nature and human civilization.

Unit-2: Different changes and the issue of sustainable progress of human society; animal ethics.

Unit-3: Society and culture of different ethnic communities inhabiting different geographical zones in India.

BLOCK 2: Spiritual and material culture.

Unit-4: Contradiction and conflict.

Unit-5: Some case studies - *Ajivikism, Buddhism, Jainism, Vaishnavism, Sufism*.

BLOCK 3: *Dalits* in India.

Unit-6: *Dalit* historiography.

Unit-7: *Dalit* movements in India.

BLOCK 4: Culture and heritage of India

Unit-8: Elite and folk culture and their varieties -Assam, Mizoram, Rajasthan, Kerala.

Unit-9: Different folk cultures of Bengal.

Unit-10: Temple and society in India, some case studies.

Unit-11: Participation of Indian temple in society and economy - Orissa, South India, Rajasthan, Maharashtra,

BLOCK 5: Education and press in India.

Unit-12: Decline of traditional education and its regional variations.

Unit-13: Spread of western education in India, a journey from colonial to post-colonial India.

Unit-14: University Education and the Educated Bengalis.

BLOCK 6: Evolution of different forms of music and dance as performing art

Unit-15: Music - North and South Indian varieties.

Unit-16: Dance: North, South and North- Eastern varieties.

Contents

Blocks	Titles	Pages
1	Nature, wild life and ethnic communities in India	1-44
2	Spiritual and material culture.	45-68
3	*Dalits* in India.	69-78
4	Culture and heritage of India.	79-109
5	Education and press in India.	110-121
6	Evolution of different forms of music and dance as performing art.	122-142

পর্যায় গ্রন্থ-১

Nature, Wild Life and Ethnic Communities in India

একক-১

Nature and Human Civilization

বিন্যাস ক্রম :

৫.১.১.০ : উদ্দেশ্য

৫.১.১.১ : সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর গুরুত্ব : পূর্ব কথা

৫.১.১.২ : মানব জাতির উদ্ভব

৫.১.১.৩ : মানব জাতির বিস্তার

৫.১.১.৪ : গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

৫.১.১.৫ : অন্যান্য প্রাণীদের থেকে প্রভেদ

৫.১.১.৬ : সমাজ ব্যবস্থার প্রাক্ অবস্থা

৫.১.১.৭ : সমাজ ব্যবস্থার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ

৫.১.১.৮ : সমাজ ব্যবস্থার সংহত রূপ

৫.১.১.৯ : সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন

৫.১.১.১০ : পৃথিবীর জলবায়ু

৫.১.১০.১ : হিম যুগে পৃথিবীর জলবায়ু

৫.১.১০.২ : হিম যুগের অবসান ও উষ্ণ আবহাওয়ার সূচনা

৫.১.১১ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

৫.১.১২.১ : দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

৫.১.১২.২ : ক্ষণস্থায়ী প্রভাব

৫.১.১২ : জলবায়ুর উপাদান

৫.১.১৩ : জলবায়ুর পরিবর্তন

৫.১.১৪ : জলবায়ু পরিবর্তনের নিদর্শন সমূহ

৫.১.১৪.১ : ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন

৫.১.১৪.২ : নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন

৫.১.১৪.৩ : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

৫.১.১৪.৪ : জীব তাত্ত্বিক নিদর্শন

৫.১.১৫ : প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থা

৫.১.১৫.১ : হিম যুগে পৃথিবীর অবস্থা

৫.১.১৫.২ : হিমোত্তর যুগে পৃথিবীর অবস্থা

৫.১.১৬ : ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর অবস্থা

৫.১.১৭ : কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা

৫.১.১৮ : খৃষ্টপূর্ব যুগ

৫.১.১৯ : খৃষ্ট যুগ

৫.১.২০ : আধুনিক যুগ

৫.১.২১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.১.২২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.১.১.০ : উদ্দেশ্য

(১) মানবজাতির উদ্ভব, বিস্তার।

(২) সমাজব্যবস্থার উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন।

(৩) জলবায়ুর উপাদান ও পরিবর্তন সমূহ।

(৪) প্রাক্ ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থা।

৫.১.১.১ : সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর গুরুত্ব : পূর্ব কথা

আজ থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে সরল প্রোটিন যুক্ত কিছু ভাইরাস্ (Virus) ইত্যাদির আকারে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ স্পন্দিত হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে পৃথিবী যেমন বিবর্তিত হয়েছে প্রাণও তেমন করেই হয়েছে বিবর্তিত। বিবর্তনের এই ধারায় এসেছে প্রাণের সর্বাপেক্ষা জটিলরূপ মানুষ। সৃষ্টির পর থেকে মানুষের মধ্যেও ঘটেছে বিবর্তন। হোমো হাবিলিস্ (Homo habilis) থেকে হোমো ইরেকটাস্ (Homo erectus) এবং

সবশেষে হোমো সাপিয়েনস্ (Homo sapiens) হোমো হাবিলিস্ থেকে হোমো সাপিয়েনস্ পর্যায়ে উন্নীত হতে মানুষের সময় লেগেছে আনুমানিক ১৮ লক্ষ বছর।

পৃথিবীতে বর্তমানে মানবজাতি হোমো সাপিয়েনস্ নামে পরিচিত। একই স্থানে উদ্ভব হলেও হোমো সাপিয়েনস্রা অনেক পরে খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন স্থানে বসবাসের সূত্রে কালক্রমে তারা গড়ে তুলেছিল নানা প্রকার সমাজব্যবস্থা।

বাস্তুতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে জীব জগৎ ও জড় জগৎ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার মূলে রয়েছে তাপশক্তি। সূর্য এই তাপশক্তির একমাত্র উৎস। তাপশক্তির তারতম্যের জন্য বিবর্তন প্রক্রিয়া এখনও সচল। তাপ যেমন জীবনের উৎস, তেমনই জলবায়ুর প্রধান উপাদান।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জলবায়ুর বহু পরিবর্তন ঘটেছে। আর তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ঘটেছে মানব সমাজের বিবর্তন। সামাজিক এই বিবর্তনের মূলে আছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যা খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল তাই সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংগৃহীত নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদিও সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর অগ্রণী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়।

৫.১.১.২ : মানব জাতির উদ্ভব

পৃথিবীতে বসবাসকারী বর্তমান মানব জাতি হোমো সাপিয়েনস্ (Homo sapiens) নামে পরিচিত। বিবর্তনের মাধ্যমে হোমো ইরেকটাস্ (Homo erectus) গোষ্ঠী থেকে এই মানব গোষ্ঠীর উদ্ভব। প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে এই আদি মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

নৃতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা যায় যে হোমো হাবিলিস্রা (Homo habilis) হোমো ইরেকটাস্দের (Homo erectus) পূর্বপুরুষ। এরা প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশে আবির্ভূত হয়ে অতি অল্প সময়ে ঐ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ও বসবাস শুরু করে। পৃথিবীতে তখন ছিল হিম যুগ কালটা প্লায়োসিন্ (Pliocene)। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে হোমো হাবিলিস্ (Homo habilis) গোষ্ঠী হোমো ইরেকটাস্ (Homo erectus) গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হল। সমসাময়িক যুগে নিয়েনডারথাল (Neandarthal) নামে অপর এক মানব প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল যারা পরবর্তীকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

৫.১.১.৩ : মানব জাতির বিস্তার

বর্তমান মানবগোষ্ঠীর বিস্তার নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আধুনিক গবেষণা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আজ থেকে প্রায় ৫৫ হাজার বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হোমো সাপিয়েনস্ (Homo sapiens) মানবগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী অন্যান্য মানবপ্রজাতি গুলিকে অপসারিত করে হোমো সাপিয়েনস্রা তাদের স্থান দখল করে।

আদিম মানুষের সংগৃহীত হাড়ের ডি.এন.এ. (DNA) ও মাথার খুলি পরীক্ষা করে জানা যায় যে হোমো সাপিয়েনস্দের সঙ্গে অন্যান্য মানব প্রজাতির মিশ্রণ ঘটেনি। আজ থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বছর আগে হোমো

সাপিয়েনস্‌দের আবির্ভাব ঘটলেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার আগে তারা প্রায় ৯৫ হাজার বছর ঐ মহাদেশে বসবাস করেছিল।

এক স্থান থেকে উদ্ভব হলেও পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মানুষের মধ্যে কালক্রমে জীনগত পার্থক্য ঘটে যায় এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে গবেষণার অন্ত নেই। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে মূলত জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থার ভিন্নতা এর অন্যতম প্রধান কারণ।

৫.১.১.৪ : গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

আদিম মানুষ ছিল একাকী। আদিম প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা সহজসাধ্য ছিল না। খাদ্য সংগ্রহ ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত মানুষ উপলব্ধি করেছিল যুথবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা। এই অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল।

৫.১.১.৫ : অন্যান্য প্রাণীদের থেকে প্রভেদ

পৃথিবীতে পিঁপড়ের আবির্ভাব কয়েক কোটি বছর আগে। সময়ের সাথে সাথে জীবতাত্ত্বিক কারণে এদের দেহে অনেক শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত পিপঁড়েরা সমাজবদ্ধ। জীনগত কারণে বহু প্রাণীও প্রথম থেকে সমাজবদ্ধ। মানুষ কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় সমাজবদ্ধ ছিল না। মানুষ ছিল একাকী। সিংহ, বেবুণ, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে পারিবারিক যে যুথবদ্ধতা দেখা যায় সুদূর অতীতে মানুষের মধ্যে তাও কতটা ছিল তা প্রায় অজানা। জীনগত কারণে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়নি। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে।

৫.১.১.৬ : সমাজ ব্যবস্থার প্রাক্ অবস্থা

প্রাচীনকালে মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল। ছোট ছোট এই দলগুলি শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। প্রধানত শিকারের ভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা সংঘাতে লিপ্ত হত। এই সংঘাতই যে তাদের অস্তিত্বের সংকট ঘনিয়ে তুলবে এই উপলব্ধিই ধীরে ধীরে ছোট দলগুলিকে বৃহত্তর গোষ্ঠীতে পরিণত হতে প্রাণিত করেছিল।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পশুপালন করতে শিখল। পশুপালন মানব সভ্যতার বিবর্তনে প্রথম ধাপ। এই পশুপালনই মানুষের খাদ্য সংস্থানকে বহুলাংশে নিশ্চিত করে। পশু খাদ্যের সন্ধানে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ পশুর দলকে নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। তখনও মানুষ স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেনি।

৫.১.১.৭ : সমাজ ব্যবস্থার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ

সভ্যতার দ্বিতীয় ধাপে এসে মানুষ শিখল কৃষিকাজ। কৃষিকাজের প্রয়োজনে যাযাবর মানুষ নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। গড়ে তুলল সমাজব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সুসংবদ্ধ রূপ পেল।

মানব সভ্যতা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রবেশ করলে শিল্প যুগে, শিল্প সভ্যতা মানুষের জীবনে আনল অমূল পরিবর্তন। উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষ এবার গড়ে তুললে আধুনিক সভ্যতা।

মানব সভ্যতার ধারায় ঐতিহাসিক এই পরিবর্তনের সূচনা করেছিল কৃষিকাজ। কৃষিকে নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিকাশ লাভ করে। জলবায়ু কৃষির প্রধান নিয়ন্ত্রক। বলাবাহুল্য কৃষিপ্রধান সভ্যতাগুলিও জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে গড়ে উঠে ও বিকাশ লাভ করে।

কৃষি নির্ভর এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল এক সুসংহত সমাজব্যবস্থা। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনে কৃষিকাজের প্রচলিত ধারা ব্যহত হয়। অনিবার্য্য ভাবে এর প্রভাব পড়ে কৃষি নির্ভর সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার উপর। পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাবে একদা বিকশিত এই সভ্যতাগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৫.১.১.৮ : সমাজ ব্যবস্থার সুসংহত রূপ

সমাজব্যবস্থা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও বিধি নিষেধের প্রচলন করেছিল। অতি প্রাচীনকালে ছোট ছোট মানবগোষ্ঠী গুলিতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নীতি প্রচলিত ছিল না। দলপতিরা প্রধানতঃ পেশী শক্তির দ্বারা ছোট ছোট দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখত। প্রাথমিক পর্য্যায়ে পেশী শক্তির ভিত্তিতে দলপতি নির্বাচিত হলেও কালক্রমে এই নির্বাচন বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। প্রয়োজনের তাগিদে ছোট ছোট দলগুলি বৃহৎ গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হলে তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দলপতিরা অনেক অনুশাসন প্রচলন করে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অন্যান্য প্রাণীদের মত মানুষ প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব অনুসারে দলপতির অনুশাসনকে মেনে নিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে প্রচলিত এই অনুশাসনই পরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় এবং সুসংহত সমাজ ব্যবস্থা গঠনে মানব গোষ্ঠীগুলিকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনুপ্রাণিত করে।

প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও বিধি নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুসংহত সমাজব্যবস্থা গঠনে ঠিক কোন সময়ে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা আজ প্রায় অজানা, তথাপি ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্য থেকে অনুমান করা হয় যে কৃষিকাজ ও স্থায়ীভাবে বসবাস মানবগোষ্ঠী গুলিকে সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। যা পরবর্তীকালে সুসংহত রূপ নেয়। এই সিদ্ধান্তের কারণ পৃথিবীব্যাপী ধ্বংস প্রাপ্ত কৃষি নির্ভর প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে যে সুসংসবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল তা প্রমাণিত।

৫.১.১.৯ : সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন

স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য প্রয়োজন অনুকূল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ। যেখানে খাদ্য উৎপাদন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সহজলভ্য হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন খাদ্য উৎপাদনে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়। প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগে পৃথিবীতে বহুবার জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তিত হয়েছে অনুকূল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ ফলে অনুকূল পরিবেশ নির্ভর সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে।

সৃষ্টির পর থেকে আজও পৃথিবীতে ঘটে চলেছে নানা বিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তন এই বিবর্তনের অন্যতম প্রধান উপাদান, জীব জগৎ, জড় জগৎ ও মানুষের সৃষ্ট সমাজব্যবস্থা সবই এই জলবায়ু পরিবর্তনের অংশীদার।

৫.১.১.১০ : পৃথিবীর জলবায়ু

জলবায়ু বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট স্থানের ৪০ থেকে ৫০ বৎসরের আবহাওয়ার সামগ্রিক বিবরণকে। সূর্যতাপ ও বৃষ্টিপাত জলবায়ুর প্রধান উপাদান। পৃথিবীর অবস্থান ও গতির জন্য ঋতুভেদে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। উষ্ণতার তারতম্যই বৃষ্টিপাতের প্রধান কারণ

উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যে পৃথিবীব্যাপী নানা জলবায়ু অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এক এক জলবায়ু অঞ্চলে এক এক রকম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বৈশিষ্টের এই ভিন্নতা খাদ্য উৎপাদনে ও প্রাকৃতিক সম্পদে লভ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্নতার সৃষ্টি করেছে।

৩.১.১০.১ : হিমযুগে পৃথিবীর জলবায়ু

প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে উষ্ণ ও শীতল আবহাওয়া বিরাজ করত। প্রাপ্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে আজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ৯০ হাজার ও ৭০ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিল হিমযুগ। পর পর তিনটি হিম যুগের মধ্যে ছিল উষ্ণ আবহাওয়া, পৃথিবীতে সর্বশেষ হিম যুগ দেখা গিয়েছিল আজ থেকে ১০ হাজার ৮ শত বছর আগে।

হিম যুগে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঢাকা ছিল বরফের আস্তরণে। পৃথিবীব্যাপী উষ্ণতা ছিল অনেক কম। উষ্ণতা কম হওয়ার জন্য উত্তর-দক্ষিণে উদ্ভিদ জগতের বিস্তার ছিল সংক্ষিপ্ত। সমুদ্র জলতল ছিল অনেক নীচে। শিকারের সন্ধানে আদিম মানুষেরা এই সময় ঘুরে বেড়াত সমুদ্র উপকূলের আশে-পাশে। সমাজব্যবস্থার ধারণা ছিল অজানা।

৫.১.১০.২ : হিমযুগের অবসান ও উষ্ণ আবহাওয়ার সূচনা

ক্রমে হিম যুগের অবসান ছিল। সমগ্র পৃথিবীতে উষ্ণ আবহাওয়ার বিস্তার ঘটল। উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হল। উষ্ণতার তারতম্যের জন্যে অতিদ্রুত তৈরী হতে থাকল অনুকূল জলবায়ু যুক্ত ভৌগোলিক পরিবেশ। এই সমস্ত অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন সহজ। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে শিকারী মানুষ খাদ্য সংগ্রহের স্থান হিসাবে প্রাথমিক ভাবে অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিল। মানুষের সার্বিক জীবন যাপন ও উন্নতির মূলে ছিল অনুকূল জলবায়ু।

৫.১.১.১১ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ুর ভিন্নতার জন্য আদিম পৃথিবীতে নানা প্রাকৃতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের এক এক রকম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ছিল। গাছপালা, প্রাণী, প্রাকৃতিক সম্পদ সবই ছিল আলাদা। প্রাথমিক ভাবে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং পরবর্তী কালে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ এক একটি

প্রাকৃতিক অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিল। এই সব অঞ্চলে তারা তাদের প্রয়োজনমত তাদের পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা।

যেহেতু খাদ্য উৎপাদন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল তাই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুকূল জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এখানে তারা প্রয়োজনীয় সমাজব্যবস্থা গঠনে উদ্যোগী হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর ভিন্নতা মানব গোষ্ঠীর ভিন্নতার প্রধান কারণ ফলত গড়ে উঠেছে ভিন্ন প্রকার খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, আচরণ, ধর্মাচরণ, লোকাচার ইত্যাদি, যা সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান।

সংস্কৃতির বিচারে আজকের পৃথিবীতে আনুমানিক ৬০০০ মানবগোষ্ঠী আছে। এই ৬০০০ মানব গোষ্ঠী ৫০০০ রকমের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সমাজ ব্যবস্থাও ভিন্ন। যে ভিন্নতা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে।

৫.১.১১.১ : দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

জলবায়ুর প্রভাব মানব সমাজে নানা ভাবে অনুভূত হয়। দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তাদের মধ্যে অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী অনুকূল জলবায়ু খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক রসদের যোগান সুনিশ্চিত করে। খাদ্যের নিরাপত্তা মানবগোষ্ঠীগুলিকে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। মানবগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে মানুষ উন্নত জীবন যাপন করতে পারে এবং উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গঠনে নিজেরা অংশীদার হতে পারে। খাদ্যের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নতি মানবগোষ্ঠীগুলিকে আমরা সুসংসবদ্ধ সমাজব্যবস্থা গঠনে অনুপ্রাণিত করে। মানুষের সার্বিক কৃতি উন্নতি লাভ করে। সভ্যতা বিকশিত হয়।

পক্ষান্তরে দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিকূল জলবায়ু খাদ্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। প্রাকৃতিক রসদের যোগান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। উর্বর কৃষি জমি খরা অঞ্চলে পরিণত হয়। মানুষ স্থানান্তরে গমন করে। সমাজব্যবস্থার অবক্ষয় শুরু হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গোষ্ঠী সংঘাত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকূল জলবায়ুর অপর প্রধান প্রভাব রোগের আবির্ভাব ও বিস্তার। গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে প্রতিকূল আবহাওয়া নানা রকম রোগের আবির্ভাব ও বিস্তার ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম প্রধাণ কারণ ছিল ম্যালেরিয়া রোগের আবির্ভাব ও বিস্তার।

৫.১.১১.২ : ক্ষণস্থায়ী প্রভাব

জলবায়ুর ক্ষণস্থায়ী প্রভাব গুলির মধ্যে বন্যা ও পতঙ্গের আক্রমণ অন্যতম। বন্যা ও ক্ষতিকারক পতঙ্গের আক্রমণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান বাধাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের প্রচলিত জীবন যাপন পদ্ধতি ও অভ্যাস হঠাৎ করে পরিবর্তিত হয়। বহুদিন ধরে প্রচলিত সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। মানুষের জীবিকার পরিবর্তন সূচীত হয়। ক্রমে মানুষ অন্যত্র গমন করতে শুরু করে পরিবর্তন ঘটে সমাজ ব্যবস্থার।

একথা বলাই বাহুল্য যে জলবায়ুর পরিবর্তন মানব সমাজের পরিবর্তনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। পৃথিবীব্যাপী সংগৃহীত ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া যায় তেমনিভাবে সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের স্বপক্ষে মতবাদ ব্যক্ত করে।

৫.১.১.১২ : জলবায়ুর উপাদান

উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত জলবায়ুর দুটি প্রধান উপাদান। পৃথিবীর অবস্থান ও গতিপথ অনুসারে ক্রান্তীয় উত্তর থেকে ক্রান্তীয় দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অংশে সূর্য কিরণ লম্বভাবে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবে উক্ত অঞ্চলে উষ্ণতা পৃথিবীর অন্য অংশ থেকে বেশী। আবার যতই উত্তর ও দক্ষিণে যাওয়া যায় উষ্ণতা ততই কমতে থাকে। পক্ষান্তরে বৃষ্টিপাত সব সময় উষ্ণতাকে অনুসরণ করে না। তাই উষ্ণতা কম হলেও বৃষ্টিপাত কম নয় এমন অনেক অঞ্চল পৃথিবীতে দেখা যায়। মূলত সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী আর মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে বৃষ্টিপাত কম। কারণ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস যখন মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে গিয়ে পৌঁছায় তখন তার বৃষ্টিপাত ঘটানোর ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। বায়ুপ্রবাহ আবার পৃথিবীর উষ্ণতার সমতা নিয়ে আসে।

৫.১.১.১৩ : জলবায়ুর পরিবর্তন

কোন কোন স্বাভাবিক উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন যখন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে তখন বলা হয় যে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে। সৃষ্টি পর থেকে অনেক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে পৃথিবী আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। এই বিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর বিশাল অংশ বরফের আস্তরণে ঢাকা ছিল। উষ্ণতা ছিল অনেক কম। উষ্ণ আবহাওয়ার সূচনা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটাল। উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উদ্ভিদ জগতের আরো বেশী বিস্তার ও প্রাণীকুলের নিরন্তর অভিযোজন প্রক্রিয়ায় রচিত হল আধুনিক পৃথিবী। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের বিরামহীন প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল সুসংবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা। ক্রমবিবর্তনের পটভূমিকায় গড়ে উঠা এই সমাজ ব্যবস্থা বহুবার কালের বিবর্তনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আবার প্রাকৃতিক নিয়মে পুনরায় গড়ে উঠে। ধ্বংস ও গড়ে উঠার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে জলবায়ুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.১.১.১৪ : জলবায়ু পরিবর্তনের নিদর্শন সমূহ

অতি প্রাচীনকালে আবহাওয়া সম্পর্কিত কোন তথ্য আদিম মানুষ লিপিবদ্ধ করে যায় নি। পক্ষান্তরে আবিষ্কৃত গুহা চিত্র থেকে আদিম যুগে মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য পরোক্ষ উপাদানগুলির সহায়তা নেওয়া হয়। পরোক্ষ উপাদানগুলির মধ্যে ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও জীবতাত্ত্বিক উপাদানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.১.১৪.১ : ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে পৃথিবীতে জলবায়ুর বহু পরিবর্তন ঘটেছে। এসেছে হিম যুগ ও উষ্ণ আবহাওয়ার যুগ। উভয়যুগে পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক তথা ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। আবিষ্কৃত ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে আজ আমরা তৎকালীন পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে একটা ধারাণা করতে পারি। যদিও এই ধারণা প্রত্যক্ষভাবে তখনকার মানব সমাজের বৈশিষ্ট্যের উপর কোন আলোকপাত করতে পারে না। তথাপি

বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গঠিত ভূভাগ, জীবাশ্ম, নদীর বাৎসরিক বন্যা, মাটির নীচে সঞ্চিত খনিজ দ্রব্য, হ্রদে সঞ্চিত কাদামাটি থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা মূলত প্রাকৃতিক বিবর্তনকে নির্দেশ করে। প্রাকৃতিক এই বিবর্তন নিয়ে আসে ভৌগোলিক পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে ভৌগোলিক বিবর্তন প্রক্রিয়া এখনও সচল।

৫.১.১৩.২ : নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নৃতাত্ত্বিক তথ্যাদি থেকে জানা যায়। বিবর্তনের এই ধারায় বর্তমান মানুষের উদ্ভব হয়েছিল প্রাকৃতিক বিবর্তনের সূত্রধরে। অনুকূল পরিবেশে পৃথিবীতে যেমন প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল তেমনি করে প্রাণ বিবর্তিত হতে হতে মানুষের সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান মানুষ শিকারী থেকে পর্যায়ক্রমে আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে। গড়ে তুলেছে সুসংবদ্ধ সমাজব্যবস্থা যা জলবায়ু, পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে।

৫.১.১৪.৩ : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাপি জলবায়ু পরিবর্তনে পরোক্ষ ভাবে আলোকপাত করতে পারে। সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি তখনকার দিনে মানুষের খাদ্য, তৈজসপত্র, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবহার সমকালীন আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে প্রাচীন সভ্যতাগুলির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি, জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে যায়।

৫.১.১৪.৪ : জীবতাত্ত্বিক নিদর্শন

জীবতাত্ত্বিক উপাদানগুলি ঐতিহাসিক সময়ে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম নিদর্শন, জীব বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে প্রধানত বীটল (Beetles) জাতীয় পতঙ্গের চরিত্র থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঠিক ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছেন, কারণ উষ্ণতার তারতম্য বীটল জাতীয় পতঙ্গ গোষ্ঠীর হ্রাস বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপরপক্ষে উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি উদ্ভিদ জগতের পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় উদ্ভিদ জগতে এই তারতম্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে উদ্ভিদ কাণ্ডে জমা 'বার্ষিক বলয়' এর সাহায্যে যা থেকে আবহাওয়া পরিবর্তনের চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য সমাজ ব্যবস্থার সচলরূপকে নির্দেশ করে, প্রাকৃতিক বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থারও বিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের জ্ঞান, কারিগরী কুশলতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচরণ, মূল্যবোধ সবই পরিবর্তনশীল। বলাবাহুল্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খলানুযায়ী এই পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল।

৫.১.১.১৫ : প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থা

পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রান্তে গুহাচিত্র গুলি প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে আদিম মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রামাণ্য দলিল। আদিম মানুষের সামগ্রিক কৃতি আবর্তিত হত খাদ্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে। মানুষ তখন যুথবদ্ধ

হয়নি ফলে সমাজ সম্পর্কিত ধারণা ছিল অজানা। নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম ছিল চিত্র যা আদিম মানুষ সম্পর্কে অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গৃহীত। প্রাক্ ঐতিহাসিক কালে পৃথিবীতে একাধিকবার এসেছিল হিম যুগ ও উষ্ণ যুগ।

৫.১.১৫.১ : হিমযুগে পৃথিবীর অবস্থা

হিমযুগে পৃথিবীর বিশাল অংশ বরফে ঢাকা ছিল। সমুদ্রের জলতল ছিল অনেক নীচে। গাছপালার বিস্তার অনেক কম ছিল। কারণ পৃথিবীব্যাপী উষ্ণতা ছিল অনেক কম। এই সময় আদিম মানুষ তাদের কৃতি গুহাগাত্রে চিত্রের আকারে রেখে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত গুহা চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে সেই সময়কার প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

মধ্য ফ্রান্স ও উত্তর স্পেন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গুহাচিত্র গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এগুলি আনুমানিক ৫০ হাজার বছরের পুরানো। ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ঐ গুহাচিত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক মানুষদের জন্য এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আদিম মানুষ তাদের শিকার সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান রেখে যেতে ঐ সব গুহাচিত্রের মধ্যে।

গুহাচিত্রগুলিকে আরো বিশ্লেষণ করে জানা যায় ঐ সময় উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ বন্য মহিষ, ম্যামথ, গন্ডার, হরিণ, গরু ও ঘোড়া প্রভৃতি শিকার করার জন্য কুঠার ও তীর ধনুক ব্যবহার করত। ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন ঘাসে ঢাকা প্রান্তর ছিল। সেখানে বন্য মহিষ, ম্যামথ, গণ্ডার, হরিণ, গরু ও ঘোড়ারা অবাধে বিচরণ করত।

গুহাচিত্র গুলিতে বিশ্লেষণ করে আদিম শিকার নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রতিকূল জলবায়ুতে মানুষের জীবন যাপনের যে চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তা আসলে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা যায়।

ভূতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা যায় যে আজকের আলাস্কা তখন বরফ মুক্ত ছিল, বেরিং প্রণালী ছিল শুষ্ক। সমুদ্রের জলতল অনেক নীচে। আদিম মানুষ শিকারের সন্ধানে সাইবেরিয়ার সমভূমির উপর ঘোরাফেরা করত। পৃথিবীর মূল ভূখণ্ডের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অবাধে যাতায়াত করতে পারত।

৫.১.১৫.২ : হিমোত্তর যুগে পৃথিবীর অবস্থা

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে হলোসিন্ (Holocene) যুগের প্রথমে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে হিম যুগের অবসান ঘটে। যদিও এই অবসানের সূত্রপাত ঘটেছিল প্রায় ১৫ হাজার বছর আগে। হিমোত্তর যুগে পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন সূচিত হল। উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমে থাকা বরফ গলে নীচে এলাকাগুলি জলপূর্ণ হল। সমুদ্র জলতল বৃদ্ধি বহুস্থানকে প্লাবিত করল এবং বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত উপকথায় পৃথিবীব্যাপী বিশাল বন্যার উল্লেখ এই তথ্যকে সমর্থন করে।

হিমোত্তর যুগে উষ্ণতা বৃদ্ধি পৃথিব্যাপী গাছপালা ও প্রাণীকূলের বিপুল পরিবর্তন ঘটাল বৈজ্ঞানিক হিসাবে সেই যুগে পৃথিবীর উষ্ণতা আজকের তুলনায় ১ থেকে ৩ সেলসিয়াস্ পর্যন্ত বেশী ছিল। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীতে বনভূমি ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হল।

হিমোত্তর যুগে জলবায়ুর পরিবর্তন মানব সমাজের ও পরিবর্তন ঘটায়। মানুষ স্থানান্তরে গমন করতে শুরু করে। কারণ খাদ্যের অভাব। এই সময় মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ শুরু করে। ফলে পশুপালন ও ক্রমে কৃষিকাজ মানুষের করায়ত্ত হল।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে বর্তমানে তুর্কি, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের সীমান্তবর্তী জাগরোজ পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ১২ হাজার বছর আগে পশু মাংস ছাড়া বন্য গম, বার্লি ও ভুট্টা জাতীয় শষ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। পশুমাংস ছাড়া খাদ্য হিসাবে শষ্যের ব্যবহার কৃষি ব্যবস্থার প্রচলনকে সমর্থন করে। যদিও এই সময়ে সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল তার কোন চিত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। তথাপি সংগৃহীত তথ্য থেকে বলা যায় হিমোত্তর যুগে জলবায়ুর পরিবর্তন মানুষের সমাজ ব্যবস্থার বিকাশে সহায়ক ছিল।

অধ্যাপক রাইট এর গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে আজ থেকে প্রায় ৮০০০ বছর আগে পূর্ব তুর্কি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরে গমনের প্রধান কারণ শষ্য সংগ্রহ। মেসোপটেমিয়ার সমভূমি অঞ্চলে প্রাপ্ত গম ও বার্লির নমুনা ঐ অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের দিক নির্দ্দেশ করে। সমসাময়িক কালে এখানকার মানুষ স্থায়ীভাবে ভেড়া, ছাগল শুকর ও কুকুর নিয়ে বসবাস শুরু করে। ইতিহাসে যা প্রথম কৃষিগ্রাম রূপে পরিচিত।

৫.১.১.১৬ : ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর অবস্থা

মানব সভ্যতায় কৃষিগ্রামের আত্মপ্রকাশ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যা আধুনিক সভ্যতার প্রাথমিক পদক্ষেপ ঐ সময়ে পাওয়া ভূতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহের উপকূলীয় সমভূমি আরো বেশী বিস্তৃত ছিল সমসাময়িক কালে ঐ অঞ্চলে জেরিকোতে (Jericho) গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর প্রথম নগর সভ্যতা। সুদূর অতীতে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের সামাজিক জীবনে যুগান্তকারী প্রভাবের সূচনা করেছিল, মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই অবস্থার সম্ভাবনা আরো বেশী উজ্জ্বল হয়েছিল।

মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারে ম্যাগলেমস্ (Maglems) সংস্কৃতির উপস্থিতির কথা বলা যায়। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উত্তর সাগরের সমভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ডেনমার্ক অঞ্চল থেকে এই সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে আসে।

ওয়েণ্ডল্যাণ্ড ও ব্রাইসন্ এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবগোষ্ঠীর কৃষ্টির ও পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীব্যাপি সংগৃহীত ৩৭০০ টি নমুনার রেডিও কার্বন ডেটিং এর ফলাফলকে বিশ্লেষণ করে এই তথ্যকে আরো সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়েছে।

মধ্য সাহাসা অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের কৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়। আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে সাহারা অঞ্চল রুক্ষ হতে শুরু করে। ঐ সময়ে নীলনদের উৎস মুখে ইথিওপিয়ায় বৃষ্টির পরিমান কমে যায়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ও বসবাস করার মত ভূপ্রকৃতির অভাব দেখা দেয়। এমত অবস্থায় মানুষ ক্রমশ স্থানান্তরে গমন করে। পরিবর্তন ঘটে মানুষের কৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থায়।

৫.১.১.১৭ : কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা

কৃষিকাজ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কৃষিকাজের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীগুলি এক সুসংহত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কারণ কৃষি মানবজীবনে খাদ্য সরবরাহে যে স্থিতিশীলতা নিয়ে এসেছিল তাঁর ফলে মানুষ এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে আদিতে মানুষ প্রধানত নদীর নিম্ন অববাহিকার সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকাজ শুরু করে। কারণ এই অঞ্চলে শষ্য উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা ছিল।

খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৩০০০ বছর আগে সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, হোয়াং হো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, এবং নীল নদের অববাহিকা অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। হিমোত্তর যুগে পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন ঐসব অঞ্চলে অনুকূল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অঞ্চল গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন খাদ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়, কারণ রাজস্থান, আরব, গোবি ও সাহারার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন রুক্ষ মরু অঞ্চল রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার ফলে কৃষিযোগ্য জমির পরিমান হ্রাস পেতে থাকে।

খাদ্য উৎপাদনে অনিশ্চয়তা মানুষের তৈরি সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসে, কৃষিনির্ভর সুসংহত সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কারণ কৃষির ব্যর্থতা সমাজ ব্যবস্থাতেও ব্যর্থতা নিয়ে আসে। খাদ্যের সন্ধানে মানুষ স্থানান্তরে গমন করে।

ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীব্যাপী উষ্ণতার তারতম্য বায়ুপ্রবাহে তারতম্য ঘটায়। বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখা দেয়। কৃষি অঞ্চলের হ্রাস ঘটে। কম বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য নদীর জলপ্রবাহ কমে যায় এবং কৃষিকাজে নদীর জলের ব্যবহার স্বভাবতই হ্রাস পায়। একথা বলাই বাহুল্য যে জলবায়ুর পরিবর্তন এই সব কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫.১.১.১৮ : খৃষ্টপূর্ব যুগ

প্রধানতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রাক্ খৃষ্ট যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এই সময় পৃথিবীর বহু স্থানে সাময়িক ভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছিল। অনেক স্থানে বৃষ্টিপাত কমে যায়। উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পূর্ব সৃষ্ট অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ নষ্ট হতে শুরু করে। পূর্বে যেখানে খাদ্য উৎপাদন কাজ ছিল তা ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকল। ফলে মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। জীবিকার সন্ধানে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাত্রা করে। খাদ্যের অভাব মানবগোষ্ঠী গুলির মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটায়, জলবায়ু পরিবর্তনের এক যুগান্তকারী প্রভাব এই সময় সমাজ জীবনে দেখা যায়।

খৃষ্ট জন্মের ১২০০ বছর আগে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহে জলবায়ুর পরিবর্তনে সমাজ জীবনে অস্থিরতা দেখা যায়। এই সময় আর্য্যরা ইরান থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে বসবাস শুরু করে। সমসাময়িক কালে গ্রীসে মাইসিন্ সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর প্রায় ১০০ বছর পরে উত্তর থেকে দোরিয়ান (Dorian) সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন গ্রীসে এসে বসতি স্থাপন করে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে আনাটোলিয়ার মালভূমি অঞ্চল ক্রমে রুক্ষ হয়ে উঠে। ফলত স্থানীয় হিট্টিটি (Hittite) সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা নতুন বাসস্থানের সন্ধানে বারে বারে মিশর আক্রমণ করতে থাকে।

মধ্য এশিয়ায় বিকশিত নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা ক্রমে উত্তরে ভল্গা ও নীপার নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। অপর পক্ষে মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে আগত অশ্ববাহিনীর হাতে চীনের ইয়াং-শো এবং লাং-শান সভ্যতা বারে বারে আক্রান্ত হতে থাকে। কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন এই সব অঞ্চলকে মরুপ্রায় ভূমিতে পরিবর্তিত করেছিল। যে পরিবর্তন ঐ সব মানবগোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তন ঘটিয়েছিল। যার ফলে নতুন বাসস্থানের সন্ধানে এই সব গোষ্ঠীগুলি সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

চৌ-কো-চেন এর মতে ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। তখন উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় পূর্ব চীনের দক্ষিণে বেশী ভাগ অংশে দু'বার ভুট্টা চাষ করা সম্ভব হয়েছিল। প্রায় ৫০০ বছর পরে অর্থাৎ ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে নাগাদ উষ্ণতা কমে যাওয়ায় ঠাণ্ডার প্রভাব বাড়তে থাকে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন কৃষির অনুকূল পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করায় সমাজ জীবনে পরিবর্তন ঘটে। চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল দেখতে পাওয়া যায়। চীনের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি এই সময় অস্তিত্বের সংকটে পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়। সংঘাত সংকুল এই পরিস্থিতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় Warring States Period নামে পরিচিত।

৭৫৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রোমের পত্তন হয়। ঐ সময় গ্রীকেরা সিসিলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে পূর্ব ও দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের তীরে বসবাসকারী লোকেরা ঠাণ্ডা জলবায়ুর জন্য গরমের পোষাক ব্যবহার শুরু করে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ঢাল ছাদ বিশিষ্ট বাড়ী ঘর তৈরি করে। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং শীতকালে বেশী বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক বেশী পরিমাণ জমি কৃষিযোগ্য হয়ে উঠে। সমসাময়িক কালে গড়ে উঠা ফিনিসিয়ান্ ও কারথজিনিয়ান সভ্যতা জলবায়ুর পরিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো উপত্যকায় সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি তিনটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যায়ে বিকশিত হয়েছিল। সময়টা ছিল ৫০০ থেকে ১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সমগ্র উত্তর গোলার্ধে উষ্ণতার সামগ্রিক রূপ বদলে যায়। ফলস্বরূপ বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয়। ঠাণ্ডার প্রকোপ বাড়তে থাকে। ঐ সমস্ত স্থানে গড়ে উঠা সভ্যতা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন সর্বদাই জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং চিন্তাবিদ্গণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে জলবায়ু গুরুত্ব সম্পর্কে মতবাদ পোষণ করেন।

৫.১.১.১৯ : খৃষ্ট যুগ

গৌতম বুদ্ধ ও কনফুসিয়াসের তুলনায় যিশুখৃষ্ট মনোরম জলবায়ু চলাকালীন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র পৃথিবীতে আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কোথাও বৃষ্টিপাতের সময় সীমা পরিবর্তিত হয়েছে। আবার বৃষ্টি বহুল অঞ্চল খরায় পরিণত হয়েছে। টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় আর্দ্র বাতাস ও বৃষ্টিপাত উত্তর আফ্রিকার জলবায়ুর উন্নতি ঘটায়। ফলে ১২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আলেকজান্দ্রিয়ার পত্তন হয়।

ঐতিহাসিক প্লিনির সময়ে প্রাপ্ত আবহাওয়ার বিবরণ থেকে জানা যায় যে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম ও তার আশপাশের আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণতর হতে থাকে ফলে দ্রাক্ষা চাষ ইটালি থেকে জার্মানী ও ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

খৃষ্টিয় ৪ শতকে মধ্য এশিয়ায় খরার প্রকোপে ঐ অঞ্চলে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। জনবসতিগুলি পরিত্যক্ত হয়। বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীগুলি ক্রমশ পশ্চিমে যাত্রা শুরু করে। ফলস্বরূপ মধ্যএশিয়ায় বসবাসকারী যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগোষ্ঠীগুলির দ্বারা রোম সাম্রাজ্য বার বার আক্রান্ত হয়।

উষ্ণতা বৃদ্ধি ও খরার সূচনা ভয়াভয় রোগের সূত্রপাত ঘটায়। খৃষ্টিয় ১৪৪ থেকে ১৭৪ এর মধ্যে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠা মানব সভ্যতা প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং মহামারীর রূপ নেয়। উত্তর সময়ে মিশরের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মিশর থেকে ম্যাসিডেনিয়া এবং ক্রমে রোমে প্লেগের বিস্তার ঘটে। ৫৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সমগ্র ইউরোপে প্রায় ১০ কোটি লোকের মৃত্যু ঘটে ভয়াবহ প্লেগের আক্রমণে ইতিহাসে এই সময়টা ''ব্ল্যাক ডেথ'' নামে পরিচিত। জলবায়ুর পরিবর্তনে এই রোগের আবির্ভাব ও বিস্তার ঘটেছিল। ফলস্বরূপ মিশর, ম্যাসিডোনিড়য়া ও রোমে গড়ে উঠা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

মধ্য আমেরিকায় মায়া সভ্যতা খৃষ্টিয় ৮ শতকে দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। উক্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত ফুলের রেণু বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে জলবায়ুর পরিবর্তন এ অঞ্চলে উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটায়। ঘাসে ঢাকা অঞ্চল ক্রমে বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে পরিণত হয়। মায়া সভ্যতায় যে সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন তৈরি করা সেচ ব্যবস্থায় আঘাত হানে। শষ্য উৎপাদন ব্যহত হয়। সমাজব্যবস্থায় অবক্ষয় শুরু হয় এবং পরিবর্তন ঘটে।

৫.১.১.২০ : আধুনিক যুগ

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ নিয়ে এলো কৃষি ব্যবস্থায় বিবর্তন। ফলে ক্রমন্নতি ঘটল মানব সভ্যতার কালক্রমে মানব সভ্যতা আধুনিক যুগে প্রবেশ করল। জলবায়ুর উন্নতি সভ্যতার বিকাশে প্রধান সহায়ক ছিল। পৃথিবীব্যাপি জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছিল অনেক আগেই। ফলস্বরূপ সভ্যতার বিবর্তন নানা স্থানে সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছিল পরিবর্তন।

খৃষ্টিয় ১০ শতকের পর পৃথিবীতে জলবায়ুর সামগ্রিক উন্নতি হয়। প্রাপ্ত আবহাওয়া সম্বন্ধীয় তথ্য থেকে জলবায়ুর এই উন্নতি মধ্যযুগীয় ক্লাইমেটিক অপটিমাম্ (Medieval climatic optimum) নামে পরিচিত। ইউরোপ ও আমেরিকায় জলবায়ুর এই উন্নতি জাপান ও চীনে লক্ষ করা যায় নি।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে ৮০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডে'এ ভাইকিং (Viking) সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ইতিহাসে ভাইকিং'রা নোরস্ (Norse) নামেও পরিচিত। জলবায়ুর উন্নতির ফলে আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের অনেক অংশ তখন ঘাস, গুল্ম ও ছোট ছোট গাছে ঢাকা অঞ্চল ছিল। ভাইকিংদের তৈরি বিশাল খামার বাড়ী ও বার্লি চাষের প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য থেকে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ঠাণ্ডার প্রকোপে ঐ অঞ্চলের শষ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়, খাদ্যাভাবের ফলে ভাইকিং সভ্যতার অবলুপ্তি হয়।

খৃষ্টিয় ১০ শতক থেকে ২০ শতকের মধ্যে পৃথিবীর বেশীর ভাগ স্থানে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন হয়। ঐ সমস্ত অঞ্চলে বিকশিত সমাজ ব্যবস্থাতে ও পরিবর্তন আসে এবং স্থান বিশেষে অবলুপ্ত হয় সমাজ ব্যবস্থা। উষ্ণতা কমে যাওয়ায় উত্তর মেরু থেকে বরফের আস্তরণ ক্রমশ দক্ষিণ দিকে আইসল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে সমুদ্রপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জনবসতিগুলি পরিত্যক্ত হয়। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়।

১২০০ খৃষ্টাব্দে ডরসেট্ (Dorset) কৃষ্টিভুক্ত এস্কিমো'রা জলবায়ুর পরিবর্তনে উত্তর কানাডা থেকে ক্রমশ দক্ষিণে সরে এসে বসবাস শুরু করে। খাদ্যের অভাবে উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। গোষ্ঠী সংঘাত ও রোগের প্রকোপে ক্রমশ ঐ অঞ্চল জনবসতি শূন্য হয়ে যায় সমাজব্যবস্থার অবলুপ্তি হয়।

উত্তর সাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহে জলবায়ুর এই পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। খৃষ্টিয় ১৩ শতকে সামুদ্রিক বন্যা ও ঝড়ের প্রভাবে বহু লোকের মৃত্যু হয়। সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যা কৃষি ও কৃষি জমির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। খাদ্য শষ্যের অভাবে ইউরোপের বহুস্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বহু স্থান জনবসতি শূন্য হয়ে যায়। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

উত্তর আফ্রিকায় জলবায়ুর পরিবর্তন মরু অঞ্চলের বিস্তার ঘটায়। খৃষ্টিয় ১৩ শতকে পশ্চিম আফ্রিকায় মালি (Mali) সাম্রাজ্যের বিস্তার জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয় মালি সুলতানরা টিমবাকটু (Timbaktu) তে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। গড়ে তুলেছিল উন্নত সমাজব্যবস্থা পশ্চিম আফ্রিকায় জলবায়ুর পরিবর্তন মালি সাম্রাজ্যের পতনকে তরান্বিত করে। অধিক বৃষ্টিপাতে নাইজার নদীতে বন্যা দেখা দেয়। ঐ সময় আবার প্রাকৃতিক কারণে নাইঝার নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বন্যার ফলে টিমবাকটু'র বাসিন্দারা শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে খরার প্রকোপে ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। তীব্র খরার ফলে সহেল (Sahel) অঞ্চলের সৃষ্টি হয় যা এমন বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় পশ্চিম আফ্রিকার বেশীর ভাগ অংশ

খরা অঞ্চলে পরিণত হয়। চাদ হ্রদ অঞ্চলের রুক্ষতার কারণে কৃষিকাজে বিঘ্ন এবং খাদ্যের অনিশ্চয়তা অধিবাসীদের ক্রমশ দক্ষিণে সরে আসতে বাধ্য করে।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে মধ্যযুগে ভারতে জলবায়ুর পরিবর্তন খরার সূচনা করেছিল। শষ্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায় খাদ্যের অভাবে বহু স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বহু মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে প্রাণ হারান। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিক ব্রাইসনের মতে জলবায়ুর পরিবর্তনে আগ্রায় তৈরী হওয়া নগরী ফতেপুর সিক্রি (Fatepur Sikri) মাত্র ১৬ বছরের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়।

উত্তর আমেরিকায় মধ্যযুগে জলবায়ুর পরিবর্তনে জনসংখ্যার বিশাল পরিবর্তন ঘটে। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ফলে বহু স্থান জনবসতিশূন্য হয়ে যায়। নতুন স্থানে মানুষ বসবাস শুরু করে। ফলস্বরূপ সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়।

খৃষ্টিয় ষোড়শ শতকের পর থেকে আবহাওয়া সম্পর্কিত সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে পৃথিবী ব্যাপি জলবায়ুর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতক আগের শতক থেকে উষ্ণ ছি।

পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জলবায়ুর পরিবর্তনে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আনাটোলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে কৃষিযোগ্য জমি ও বাসস্থান পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ফলে ঐ অঞ্চলে গড়ে উঠা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খরা, বন্যা ও প্রাকৃতিক ঝড়ের প্রভাবে ব্যাপক শষ্য, সম্পত্তি ও জীবনহানি হয়। বহু মানুষ নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র গমন করে, গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি হয়। নতুন পরিস্থিতিতে স্থানান্তরিত মানুষের বয়ে নিয়ে আসে কৃষ্টি ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীব্যাপী এই পরিবর্তনের ইতিহাস আজও সচল যেমন সচল জলবায়ুর পরিবর্তন।

৫.১.১.২১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (Refrence Books)

১। Burrough, W.J. 2005. Does the weather Really Malter? Cambridge University Press, Cambridge, England.

২। Huntington, E. 1948. Civilization and Climate Yale Univestity Press. London.

৩। Lamb. H.M. 1995. Climate, History and the Modern World, Rontledge. London, Websites :

১। http://www.sunysuttolk.edu

২। http://www.urantia.org

৫.১.১.২২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। মানব সমাজের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশে জলবায়ুর ভূমিকা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।

২। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল কেন? এই সমাজবদ্ধতার মধ্য দিয়ে মানুষ কি কি সুবিধা লাভ করেছিল?

৩। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীব্যাপী যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার মূল ভিত্তি কি ছিল? কিভাবে এই সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়?

৪। জলবায়ু পরিবর্তনের পরোক্ষ উপাদান গুলি কি কি? তাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

৫। মানব সভ্যতায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উন্নত সমাজব্যবস্থার গঠনের সহায়ক এ সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত কর।

৬। ''জলবায়ুর পরিবর্তনে মানুষের বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে''—ঐতিহাসিক সূত্র ধরে কি ভাবে বিভিন্ন সময়ে এই পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে তোমার মতবাদ ব্যক্ত কর।

পর্যায় গ্রন্থ-১

একক-২

Different Changes and the Issue of Sustainable Progress of Human Society ; Animal Ethics

বিন্যাস ক্রম :

৫.২.১.০ : উদ্দেশ্য

৫.২.১.১ : ভূমিকা

৫.২.১.২ : আধুনিক পরিবেশ চেতনা ও পরিবেশ বিতর্ক

৫.২.১.৩ : ক্লাব অব রোমের রিপোর্ট (The Club of Rome Report)

৫.২.১.৪ : স্থিতিশীল উন্নয়ন

৫.২.১.৫ : পরিবেশ চিন্তার ইতিহাস

৫.২.১.৬ : ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি

৫.২.১.৭ : দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতের পরিবেশের ইতিহাসের চালচিত্র

৫.২.১.৮ : সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান

৫.২.১.৯ : পরিবেশ সংরক্ষণে সাধারনের অংশ গ্রহণ

৫.২.১.১০ : আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা (Role of International Agencies)

৫.২.১.১২ : উড়িষ্যার পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movements in Orrissa)

৫.২.১.১৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.২.১.১৪ : প্রশ্নমালা

৫.২.১.১৫ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৫.২.১.০ : উদ্দেশ্য

বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের সমস্যা ও পরিবেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরিবেশের বিষয়টি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং এটিকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেই বিচার করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিতর্ক, স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা ও সমস্যা, পরিবেশ চিন্তার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি ও ভারতীয় সমাজের উপর তার প্রভাব, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় জ্ঞানের (Indigenous knowldge)

গুরুত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ-সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির (NGO) ভূমিকা ও বিভিন্ন অঞ্চলিক পরিবেশ আন্দোলনগুলির উপর আলোকপাত করা।

৫.২.১.০ : ভূমিকা

বিশ্বায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ একুশ শতকের পৃথিবীকে এক নতুন সমস্যার সামনে হাজির করেছেন। প্রকৃতির বৈধ ব্যবহার কি এবং কিভাবে তা স্থির হবে বর্তমান প্রজন্মকেই তা ঠিক করতে হবে। এই প্রশ্নটি এখন মানব সমাজের অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। কারণ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না রাখলে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। প্রশ্নটির গুরুত্ব এমনই যে শুধু বিজ্ঞানীরা নন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীরাও। সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের এক নতুন শাখা ঃ পরিবেশের ইতিহাস। বর্তমান অধ্যায়টি ভারতের পরিবেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে।

৫.২.১.১ : আধুনিক পরিবেশ চেতনা ও পরিবেশ বিতর্ক

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বে শিল্প বিপ্লবকে সূচিত করেছিল। তখন থেকেই মানব সমাজ ক্লান্তিহীনভাবে পার্থিব উন্নতির লক্ষ্যে প্রকৃতিকে শোষণ করে চলেছে। এইভাবে বিশ্বের বেশ কিছু দেশ শিল্পোন্নত হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধোত্তর পর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বহুদূর সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সময়কে দ্বিতীয় শিক্ষা বিপ্লবের সূচনাকাল বলা চলে যা প্রথম শিল্প বিপ্লবের তুলনায় নতুন শক্তি ও উদ্যম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। উপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন দেশগুলি এই পর্বে মুক্তি লাভ করেছিল। এই সমস্ত দেশগুলি এবং অপরাপর শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি যাদেরকে উন্নয়নশীল দেশ (developing countries) বলা চলে তারা তাদের উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। একইসঙ্গে ঐ দেশগুলিতে জনসংখ্যা তীব্র হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উন্নত বিশ্বের দেশগুলি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতাকে বৃদ্ধি করেছিল। এইভাবে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলি তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বিশ্বের সীমিত সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে, প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ ও সৃষ্টি হয়েছিল যা দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই বিংশ শতকের ষাটের ও সত্তরের দশকে প্রকৃতির অবক্ষয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন—বৃক্ষচ্ছেদন, মৃত্তিকা ক্ষয়, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, বায়ু ও জল দূষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার আবির্ভাব ঘটিয়েছে।

৫.২.১.৩ : ক্লাব অব রোমের রিপোর্ট (The Club of Rome Report)

পরিবেশ বিষয়ে বর্তমানে যে সচেতনতা তা শুরু হয়েছিল ষাটের দশকে এবং তা সত্তরের দশকে নতুন মাত্রা পেয়েছিল। ম্যালথাসই (Malthus) সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম পরিবেশের ভারসাম্যতা বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে সকলের

দৃষ্টিগোচর করেন। তবে, যাই হোক না কেন তাঁর উক্তি যা ম্যালথুসিয়ান বিপর্যয় (Malthusian disaster) নামে পরিচিত তা ব্রিটেন ও অপরাপর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়নি। সুতরাং তাঁর এই মত সার্বজনীন ভাবে গৃহীত হয়নি। কিন্তু Club of Rome নামক একটি গোষ্ঠী মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে 1968 সাল থেকে আলোচনা শুরু করে এবং 1972 সালে তারা এ বিষয়ে একটি বিস্তরিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই রিপোর্টটি যে বইটির মাধ্যমে প্রকাশ পায় তার শিরোনাম হল The limits of Growth যদিও এই মডেলটি পুরোপুরি সঠিক ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি লক্ষ্য করা যায় তথাপি ও এটি তাৎপর্যপূর্ণ। এটাই ছিল মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কম্পিউটার নির্ভর এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্মত প্রথম পদক্ষেপ।

তবে যাই হোক না কেন এই রিপোর্টের মূল কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল এই যে, এই পৃথিবীর নিদিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ সক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, দূষণ, খাদ্য উৎপাদন, সম্পদ ক্ষয় যদি একই হারে চলতে থাকে তাহলে আগামী একশো বছরের মধ্যে পৃথিবী তার বৃদ্ধির প্রান্ত সীমায় পৌঁছাবে। আর এর সম্ভাব্য ফল হবে বিশ্বের জনসংখ্যা এবং শিল্প সম্ভাবনার আকস্মিক ও নিয়ন্ত্রণহীন পতন।

এই দ্রুতহারে বৃদ্ধির প্রবণতা আকস্মিক পতনের সম্ভাবনা বহন করে। এর পরিবর্তে এমন একটি পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সুস্থিতির প্রয়োজন যা অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির ধারাকে বজায় রাখতে পারবে। বিশ্বব্যাপী একটি ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ তার প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে পারে এবং প্রতিটি মানুষ তার স্বতন্ত্র মানব সত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে পারে। এটি হল স্থিতিশীল বৃদ্ধির (Sustainable growth) পথ। ক্লাব অব রোমের রিপোর্ট অনুসারে সমগ্র বিশ্বের মানুষ এই নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির পরিবর্তে একটি স্থিতিশীল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হবে। পৃথিবী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে কিন্তু লোভের শিকার হতে পারে না (mother earth can meet every body's need but not greed) মহাত্মা গান্ধীর এই বক্তব্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্যের এক আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করা যায়। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত Intergovernmental panal on climate change (2007) প্রতিবেদন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আবহাওয়া পরিবর্তন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বিতর্ক।

৫.২.১.৪ : স্থিতিশীল উন্নয়ন

স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে বোঝায় ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে কোনরূপ সমঝোতা না করে বর্তমানের প্রয়োজন মেটানো। সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল উন্নয়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়তো সম্পূর্ণ না ও হতে পারে, কিন্তু এই পথে কিছুটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

দ্বিশত বৎসর পূর্বে Malthus যে উক্তি করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি আমরা লক্ষ্য কারি ক্লাব অব রোম (Club of Rome) এর রিপোর্টের মধ্যে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে যে দুটি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে তার একদিকে রয়েছে নয়া ম্যালথুসিয়ানরা (Neo-Malthusians) যারা স্থিতিশীল উন্নয়নের সপক্ষে কথা বলেন। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রবক্তা ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বাসী। তারা মনে করেন এই বৃদ্ধির পথে গড়ে ওঠার বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে যেমন-সম্পদের ক্ষয় (বিকল্প-উপায়ে, বা বৃত্তাকর পদ্ধতির মাধ্যমে

সমাধঅন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি (জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে এবং শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান), দূষণ প্রভৃতির সমাধান করা সম্ভব। নয়া ম্যালথুসিয়ানদের আশঙ্কা ও ভীতি এক্ষেত্রে সত্য এবং দৃষ্টিগোচর হলেও বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মতামতকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের এই পৃথিবীতে বেশ কিছু দুঃখজনক বিষয় ও অনিবার্য স্থিতিশীল বৃদ্ধির পক্ষপাতী এই পরিবেশবিদ ও সংরক্ষণবাদী এই দুঃষবাদী গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। স্থিতিশীল বৃদ্ধির এই ইচ্ছা সম্পূর্ণ নতুন নয়। প্রাচীন কালের মুনি-ঋষিরা এই আত্মত্যাগের মন্ত্র এবং সাধারণ জীবনধারা ও উচ্চচিন্তাকে (simple living and high thinking) বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

ক্লাব অব রোমের রিপোর্টের বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা এবং বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করা হলে ও এর দুটি তাৎপর্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারটি আর্থসামাজিক বিষয়ও যুক্ত হয়ে বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে। এগুলি হল অপুষ্টি, শিল্পায়ন, সম্পদের শোষণ এবং পরিবেশে অবক্ষয় সম্মিলিত ভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলি পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। যদিও এই রিপোর্টটি সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়নি। তথাপি এটি ক্রমবর্ধমান বিতর্ক এবং বিশ্বে বৃদ্ধির প্রবণতার বিষয়ে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিবেদন আংশিক হলেও বিশ্বে মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি নতুন সচেতনতাকে বৃদ্ধি করেছিল। এই রিপোর্টকে অনুসরণ করে UN কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। এর প্রভাবে বিশ শতকের শেষভাগ থেকে 'সবুজ আন্দোলন' শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

৫.২.১.৫ : পরিবেশ চিন্তার ইতিহাস

মানব সমাজে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সর্বত্রই বিরাজিত ছিল। মানব সমাজের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয়। অতীতে মানব সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে একটি কেন্দ্র হল প্রাকৃতিক জগতের স্বাভাবিক ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা। যেহেতু বিশ্বের সর্বত্র মানব সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে সেহেতু প্রাকৃতিক জগতের বৈধ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নটি গুরুত্ব পাচ্ছে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে এই অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র উপলব্ধ হচ্ছে। ক্ষমতার ভাষা দিয়ে এটিকে সম্ভবত ব্যাখা করা চলে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানব সমাজের সংঘাতকে ও এই ক্ষমতার ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। পরিবেশ হল ক্ষমতা প্রকাশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতীয়তাবাদ-সমাজে ক্ষমতার এই প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়গুলির সঙ্গে প্রকৃতিকে ও সমপর্যায় ভুক্ত করা চলে। ক্ষমতার সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর, প্রাকৃতিক জগতের অবিরাম অপব্যবহার, প্রকৃতিকে শোষণ করার জন্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় পুরাতন এই বিতর্ককে এমন জটিল করে তুলেছে যা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। সমগ্র মানব সমাজের কাছে এটিই কেন্দ্রীয় ও বিশ্বজনীন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানের বিষয়টিও দীর্ঘতর হচ্ছে। লেখক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, আইনজীবী, প্রশাসক ও চিন্তাবিদরা এই অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছেন। গত দু, দশক ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিষয়টি

একটি নতুন রূপ পেয়েছে এবং জ্ঞানের জগতে একটি নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে যাকে পরিবেশের ইতিহাস বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতে বনকে আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে বলে মনে করা হত এবং সন্ন্যাসীদের আশ্রমে বন ও বন্যপ্রাণীকে রক্ষণাবেক্ষণের ধারণাও গড়ে উঠেছিল। বন নির্ভর এই আশ্রমকেই অরণ্য সংস্কৃতি বলা চলে। বনের বাস্তুতন্ত্রের উপযোগিতা এবং তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্যই গাছ এবং বন্যপ্রাণীর প্রতি একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় প্রদর্শিত হত। রামায়ণের মত প্রাচীন মহাকাব্য থেকে এই বোধশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অযোধ্যা সম্রাট রাম যখন গাঙ্গেয় উপত্যাকায় দক্ষিণ দিকের বনে নির্বাসিতের জীবন-যাপন করতে যাত্রা করেছিলেন তাঁর মা নিরাপত্তার বিষয়ে ভয় পেয়ে ঘোষণা করেছিলেন বনের হাতি, সিংহ, বাঘ বা বন্য মহিষ তোমাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাম তার পত্নীকে সুরক্ষিত করার জন্য গোপন স্থাপন নির্বাচিত করেছিলেন। বন একটি নির্দিষ্ট জমিতে গড়ে উঠেছিল যেখানে আমোদ ও কষক্লিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এটি একইসঙ্গে সুন্দর জায়গাও ছিল। সুতরাং বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং সুরম্যস্থান উপভোগ করা—বনের এই দ্বিবিধ চরিত্র মহাকাব্যে ও স্থান পেয়েছে।

মৌর্যদের সময় থেকে হাতিকে রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থশাস্ত্র বনের হাতিকে রক্ষার জন্য নিয়মের কথা তুলে ধরেছে। হাতির বন ছাড়াও সেখানে এমন কিছু বন ছিল যার প্রধান লক্ষ্য চিল বনের কাঠ, বাঘ এবং সিংহকে রক্ষা করা। মধ্যযুগেও বন ও বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বনও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন।

শিল্প বিপ্লবের পর সংরক্ষণবাদীদের উচ্চারণ এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়েছে। বনের হ্রাস এবং স্থলভাগের পরিবর্তন প্রাকৃতিক জগতে রোমান্টিক ভাবধারাকে গড়ে তোলে। বিভিন্ন রোমান্টিক রচনায় শিল্প বিপ্লবের সমালোচনা থাকলে ও প্রকৃতির অবক্ষয় এর গুণকীর্তন করা হয়েছে। এটি 'back-to-the land' আন্দোলনকে উৎসাহ দিয়েছিল। উইলিয়াম ওয়াউসর্থ, জন রাস্কিন এবং উইলিয়াম মরিস এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এবং ইউরোপে পরিবেশ ভিত্তিক সমাজের গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় বনের অতিদ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ফলে এক নতুন বন্য ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যা নৈতিকতা, বিজ্ঞান এবং রুচিসম্পন্ন বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস আমেরিকায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এখানেই প্রথম আত্মসচেনতা বোধ সম্পন্ন পরিবেশের ইতিহাস গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। আমেরিকায় পরিবেশের ইতিহাস একটি আদর্শ ও সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এবং এটি ঐতিহ্য থেকে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। জর্জ পারকিন মার্শা এবং ফ্রেডারিক জ্যাক্সন টর্নার প্রমুখ গবেষকদের রচনার মধ্যে এই ঐতিহ্যগত ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমেরিকার দৃশ্যের অভ্যন্তর থেকেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশের ইতিহাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। এর প্রধান কারণ হল পরিবেশের ইতিহাস সংরক্ষণের পথ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যা আমেরিকাতেই সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার পরিবেশের ইতিহাসচর্চায় উৎসাহের একান্ত অভাব এবং বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের

অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে আমেরিকার ঐতিহাসিকরা বর্তমানে তাদের সংকীর্ণ আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছেন।

1970 এর দশকের আগে পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বা মানব সভ্যতার ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে চর্চার আগ্রহ তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। 1970 এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঐতিহাসিকরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার সময়ে পরোক্ষ ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সংকীর্ণ বা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছিলেন। ফলে—ইতিহাস, নিম্নবর্গের ইতিহাস, কৃষির ইতিহাস, আদিবাসীদের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে পরিবেশের ইতিহাস বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। তবে এটা সত্যি যে কয়েকটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া এই ধরনের ইতিহাস প্রধানত কৃষিযোগ্য জমির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বভাবতই এই ধারার ঐতিহাসিকরা, অকৃষিযোগ্য জমি, জলাজমি, পাবত্য এলাকা, নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেননি। স্যার যদুনাথ সরকার যিনি মুঘল যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে মুঘলদের সামরিক অভিযানের পরিবেশের ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখানে পরিবেশের অবক্ষয় সম্পর্কে খুব কম আলোচনা করা হয়েছে। 1970 সালের পূর্বে ঐতিহাসিক জগতে ঔষধ ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা করতে পরিবেশের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। অপরাধের ইতিহাস, বনের আইন সংক্রান্ত সমস্যা, বিভিন্ন প্রকার গ্রামীণ বিচার সংক্রান্ত আন্দোলন এবং গণ সংস্কৃতি সম্পর্কে ক্ষুদ্র আলোচনায় পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বলা চলে পরিবেশের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—(১) পরিবেশ সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস, (২) সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিকতা নির্ভর পরিবেশের ইতিহাস, (৩) শক্তি প্রয়োগের মাধ্যম হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস চর্চা, (৪) পরিবেশের ইতিহাস যা উল্লেখিত তিনটির সমন্বয়ে গঠিত। পরিবেশ সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস প্রধানত জৈব ও ভৌত পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন মানব সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর বা মানুষের কার্যকলাপে কতখানি পরিবেশের ভৌত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করে। সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিকতা সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস খুবই উৎকৃষ্ট এবং এখানে প্রকৃতিকে বিভিন্ন ধারণা, কলা এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এই তুলে ধরার প্রক্রিয়ায়—এবং এর ফলে উদ্ভুত পরিবেশের ওপর তারা আলোকপাত করে। তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত পরিবেশের ইতিহাস পরিবেশকে ক্ষমতার ব্যবহারের একটি মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরে। এটি প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণা, আইন এবং রাষ্ট্রনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে রাষ্ট্র শক্তি কিভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে এবং সেক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থবাহী গোষ্ঠী কিভাবে সংগ্রাম করে ক্রম পরম্পরায় আলোচনা করা হয়। শেষ পর্যায় ভুক্ত পরিবেশের ইতিহাস উপরে উল্লেখিত একটি বা একাধিক বিষয়ে আলোচনা করে। এই ইতিহাস বহুবিধ চরিত্রবিশিষ্ট এবং চিত্তাকর্ষকযুক্ত।

আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক গবেষণার পরিবর্তিত ধারা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সচেতন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইতিহাস চর্চার এই পরিবর্তিত ধারার ফলে পরিবেশের ইতিহাস যথেষ্টভাবে উপকৃত হয়েছে। ইতিহাসের অভ্যন্তরেই একটি নতুন ধারার উদ্ভব বিষয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং রক্ষণশীল ঐতিহাসিকদের এই নবধারার মধ্যে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। পরিবেশের ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান

বিস্তৃতি তাকে একটি স্বতন্ত্র ধারায় পরিচিতি দান করেছে। বর্তমানে এই বিষয়ের গুরুত্বকে খাঁটো করে দেখানোর প্রবণতা দেখা গিয়েছে এবং এটাকে পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ক পড়াশোনার অভিন্ন অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়েছে। তবে পরিবেশের ঐতিহাসিকদের নিজেদের পথ হিসাবে পরিবেশকে আলোচনার পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিতে, পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ক আলোচনায় ঐতিহাসিকরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। ইতিহাস এমন একটি ধারা যেখানে নিঁখুত কোন তত্ত্ব নেই। ঐতিহাসিকরা তথ্য ছাড়া সহায়হীন এবং ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্য অর্থহীন। অনেক সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এই ধারার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। এবং তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আধুনিকোত্তোর ইতিহাস এই ধারার মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। ঐতিহাসিকদের তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এবং তাদের এই প্রয়োজনের তুলনায় তথ্যগুলির ভাষা রচনা করতে হয়। ইতিহাস একটি পৃথক ধারা হিসাবে উত্তর আধুনিকতার প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং একটি স্বাধীন ধারা হিসাবে একে রক্ষা করাও ঐতিহাসিকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

৫.২.১.৬ : ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি

ঊনবিংশ শতকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বৃহৎ ক্রান্তীয় অরণ্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর শক্তি প্রয়োগের একটি অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে ও দুই বিপরীতমুখী ধারা দেশীয় প্রথা ও পাশ্চাত্য আইন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষ দেখা যায়। ভারতবর্ষে উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা (power)-র যে নতুন ধারা গড়ে তোলে সেখানে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেতা স্পর্শ করতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্ববতী সময়ে তাৎপর্যহীন হিসাবে মানব চরিত্র বা বিধির বৈশিষ্ট্যকে পরিদর্শনের আওতার আনা জরুরী হয়ে ওঠে। যখন জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত অধিকারের কথা বলা হয় তখন ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী তাদের উন্নত আইন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত গড়ে তোলে। এই অনুচ্ছেদের প্রধান উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে বনের ঔপনিবেশীকরণ ছিল বৃহত্তর ভাবে শক্তি প্রয়োগের একটি মধ্যম এবং এর লক্ষ্য ছিল অবদমিত সমাজে বন ও তার মানুষের মধ্যে একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারা ও নতুন আদর্শকে প্রয়োগ করা। বিদেশিক শাসন দেশীয় সমাজের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এবং অরণ্যের উপর এর প্রভাব কি পড়েছিল তা দেখা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটিশরা যখন ভারতে তাদের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে তখন বৃহত্তর এলাকা ছিল গভীর অরণ্যে পরিপূর্ণ। ঔপনিবেশক শাসনের পূর্ববর্তী সময়ে এগুলি ছিল কম ঘনবসতি এলাকা। সেখানের বেশ কিছু মানুষ শিকারের মাধ্যমে, আবার কেউ স্থানান্তর চাষের (Shifting cultivation) মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। কারিগররা গ্রামাঞ্চলে বাস করত, অনেকে গরু, ঘোড়া এবং ছাগল সেখানে চরাত। কৃষক এবং কারিগরদের কাঁচামাল বিশেষত কাঠের সরবরাহের ক্ষেত্রে অরণ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দুর্ভিক্ষ সংকটের সময়েও অরণ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং মানুষের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দিয়েছিল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ সরকার অরণ্যের ওপর বিভিন্ন বাধা নিষেধ আরোপ করে। বিভিন্ন শহর ও জাহাজ নির্মাণে এবং ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রচুর পরিমাণে কাঠের প্রয়োজন ছিল। 1849 খ্রীঃ বনজ

সম্পদের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যেগ নেওয়া হয়েছিল যখন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী বেশ কিছু জলাভূমিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় আনতে চেয়েছিলেন। 1852 খ্রীঃ তিনি শুষ্ক খাদ্য, জ্বালানী বনজ সম্পদকে সংরক্ষণের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 1864 খ্রীঃ Imperial Forest Department প্রতিষ্ঠিত হয়। 1865 খ্রীঃ প্রথম অরণ্য আইন পাশ হয়। এর মাধ্যমে অরণ্য সংরক্ষণের আওতায় আনা হয় এবং এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর ব্রিটিশ সরকারের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংরক্ষিত এলাকার ওপর ব্রিটিশ সরকার তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। পরবর্তী কয়েক দশকে বনের ওপর সমীক্ষা করা হয় এবং সেখানকার বাসিন্দাদের নথিভুক্ত করা হয়। 1878 খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অরণ্য আইন ব্রিটিশসরকারকে আরো বেশী ক্ষমতা দেয়। এই দ্বিতীয় আইন ব্রিটিশ সরকারকে অদখলীকৃত বা জলাজমিকে সংরক্ষণের আওতায় আসার অধিকার দেয়। ভারতীয় জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের পর থেকে যে ধরণের বাস্তুতান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছিল তা ইতিপূর্বেকার পরিবর্তনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় অরণ্য সংক্রান্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক যুগের অরণ্য আইনকে বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জলবিভাজিকা বলা চলে।

ঔপনিবেশিক শাসনের আগমনের ফলে প্রথাগত সমাজের পতন অনির্যা হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদের চাপে ভারতের ঐতিহ্যগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং নতুন আইন—মানুষ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর এক নতুন কৃষি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নতুন কৃষি সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে নতুন সম্পর্কের ফলে একটি নতুন শাসন প্রবর্তন করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। জমির ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রবর্তন করা এবং পশ্চিমী ধারার আইনী ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের দুই শাসকদের কাছে জরুরী হয়ে ওঠে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যন্ত এলাকাতে আইনের শাসন বজায় রাখার ওপরেই সম্পত্তির অধিকার কার্যকর করা সম্ভব ছিল। স্বভাবতই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও তাদের সহযোগীদের কাছে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীকে অনুশাসিত করা যারা যে কোন কারণে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। নতুন আইন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় দেশীয় সমাজে সামাজিকতার ধারণাও পরিবর্তিত হয়। কোনটি অপরাধ, কোনটি সম্পত্তি, কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায়, কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ সমস্ত কিছুই নতুনভাবে নির্ধারিত হয়। স্বভাবতই জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর রাষ্ট্রীয় অনুশাসন প্রবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষ থেকে আইন, আদালত, ঔপনিবেশিক পুলিশ বাহিনী কারাগার এবং জররী অবস্থার জন্য একটি সেনা বাহিনী প্রস্তুত রাখা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থেই এই সমস্ত উপাদান গুলিতে বৈধতার ছাপ দেওয়া হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে উদ্বেগের বিষয় ছিল প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে রাষ্ট্রই এই 'বেআইনী' বিষয়গুলিকে সহ্য করত। কিন্তু এখন আইনের সুসংবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরু হল। আইনের সুসংঘবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বেন্থামের উপযোগিতাবাদ একটি গুরুত্ব পূর্ণ শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। বোর্ড অব কন্ট্রোটের সভাপতি Dundus এর কাছে বেন্থাম যেন 'Indian Solon' হিসাবে আবিভূত হয়েছিলো। ভারতে আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কি ধরনের রূপান্তর প্রয়োজন সেই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর প্রবন্ধ Influence of Time and place in Matters of Legislation রচনা করেছিলেন উপযোগবাদীদের মতে, মানুষ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তার

সর্বোদ যুগের জন্য আইনের সংগঠনরূপে 'severe schoolmaster' প্রয়োজন। তাদের কাছে, আইনের মত জনমত এবং শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আইন অনুশাসনের মাধ্যমে বিপথে গমন নিয়ন্ত্রণ করবে এবং দীর্ঘি পদক্ষেত্রের মাধ্যমে অপরাধকে দূর করবে। এটাই হ'ল আইনের Instrumentalist' দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে বলা হয় আইন সমাজের চাহিদা ও পদ্ধতি এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার ক্ষেত্রে যন্ত্রের মত কাজ করবে। আইনের 'Instrumentalist' দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আইন শুধুমাত্র জনগণের দ্বন্ধ এবং সামাজিক অপরাধগুলিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি বাহক হিসাবে কাজ করে না, বরং সমাজের একটি রূপান্তরকারী যন্ত্র হিসাবে সে কাজ করে। প্রকৃত পক্ষে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এবং জনগণ তাদের কার্যকলাপ, তাদের পরিচিতি এবং তাদের সমস্ত তৎপর্যহীন অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের কাজ করে। সুতরাং আইনের কাজ হয়ে দাঁড়ায় 'smallest frogment of life' এর উপর নজরদারী করা। মানুষের এই নতুন জ্ঞান সরাসরি প্রত্যক্ষগোচর না হলেও বাস্তবে অস্তিত্বশীল। নিয়ম শৃঙ্খলার প্রকৃত যন্ত্রপাতি অবযভহীন হলেও সর্বদা সে সব কিছুকে পর্যবেক্ষণ করে। সমাজও হল কারাগারের মত একটি সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গি, সম্ভাব্যতা এবং সন্দেহজনক সমস্ত কিছুই আধুনিক রাষ্ট্র নথিভুক্ত করে।

1865 সালে 1878 সালের Forest Act-এর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যকে এই পরিপ্রেক্ষিতে থেকেই আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে। এক ধাক্কায় অরণ্যের উপর সরকারের অধিকার বৈধতা পেল এবং দেশীয় মানুষের শিকার, খাদ্যসংগ্রহ বা গাছ কাটা অবৈধ বা বেআইনী হয়ে গেল। শিকার করা, প্রাণী হত্যা ও চুরি করা, মাছ ধরা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই অপরাধমূলক কাজ হিসাবে গণ্য হল। এইভাবে অরণ্য অপরাধের নতুন তালিকা তৈরী হল।

ভারতীয় অরণ্য ও পার্বত্য এলাকায় মানুষের বেশ কিছুকার্যকলাপকে অপরাধ মূলক কাজ হিসাবে গণ্য করা হল যা প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে আইনের চোখে অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত ছিল। আইন প্রণয়ণকারীরা সমগ্র ঔপনিবেশিক শাসন জুড়ে অরণ্য অপরাধের সীমানাকে সম্প্রসারিত করেছিল, যদিও সাধারণের মধ্যে অপরাধ সংক্রান্ত ধারণা প্রায় একই রয়ে যায়। শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থানুসারে আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী কিছু ক্ষেত্রে আইনকে সম্প্রসারিত করে। উপনিবেশিক সরকার অরণ্যের ওপর তার আধিপত্যকে আইনি বৈধতা দান করেছিল। স্বভাবতই ব্রিটিশ রাজের কাছে সামাজিক স্থিতিশীলতা দান করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্র এবং তার সহযোগীরা তাদের নিজেদের কার্যকর্মকে বৈধতা দিয়েছিল নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। সাধারণভাবে আইন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো এবং বিশেষভাবে অরণ্য আইন ও প্রতিরোধ ছিল ব্রিটিশসদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রয়োজনের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর মাধ্যমে ভারতীয়দের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী, নির্দিষ্ট স্থান ও বিশিষ্ট ভূমিকায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রাচ্যের অরণ্য ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিদের ত্রুটিকে অদ্ভুত বিদেশী এবং অজানা বলে মনে করেছিল তারা অনতিকাল ধরে আরণ্যকে ব্যবহার করে আসছিল। ঊনবিংশ শতকে ভারতে বহু সম্প্রদায় ছিল যারা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে খাদ্য সংগ্রহ বা শিকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাষ্ট্রের অরণ্য সংরক্ষণ এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলি কার্যকলাপকে নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনেকে ঔপনিবেশিক অরণ্য সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে সচেতন ছিল না। তারা সরকারের দাবীর বৈধতাকে অস্বীকৃত

করেছিল। তারা আগের মতই একইভাবে গাছ কাটতে থাকে, ও মাংসের জন্য ছোট প্রাণীকে শিকার করে। খাদ্য সংগ্রহকারী ও শিকারীরা বনের আইনকে অস্বীকার করে বনে প্রবেশ করতে থাকে কারণ এটি ছিল তাদের কাছে একটি ঐতিহ্যগত পেশা। কিন্তু বিদেশীদের চোখে এটি ছিল 'অপরাধ'। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নতুন সামাজিক স্থায়িত্ববোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অপরাধের কথা বললেও বনের আদিবাসীরা কিন্তু এ ব্যাপারে শাসকদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বৈদেশিক আইন ও মতাদর্শ সনাতন অর্থনীতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং এর ফলে সামাজিক নৈতিক ও ভাবাদর্শগত একটি অধঃপতন শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বের শাসকদের এই সমস্ত সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। ভারতের সমস্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামোই দেশীয় আদিবাসী মানুষদের কাছে অদ্ভুত বিদেশী এবং অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছিল।

শিকারী, খাদ্য সংগ্রহকারী এবং স্থানান্তরিত কৃষক হিসাবে বনের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সব যুগেই নানা ধরনের চাপের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু পূর্বেকার এই চাপ ছিল গুণগতভাবে কিছুটা পৃথক ধরনের। ঊনবিংশ শতকে রাষ্ট্র বনের দায়িত্ব গ্রহণের পর তারা নতুন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। পূর্বে বনজ সম্পদের ওপর বাণিজ্যিক শোষণ সীমাবদ্ধ ছিল গোলমরিচ এলাচ গজদন্ত প্রভৃতির মধ্যে। এগুলির শোষণ বা অবক্ষয় পরিবেশ অথবা দৈনন্দিন জীবনাযাত্রার উপর কোন ব্যাঘাত ঘটায়নি। কিন্তু যখন বনের কাঠ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে উঠল তখনই তা পরিবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং অরণ্যের ব্যবহারে ও পরিবর্তন হয়। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, রাষ্ট্রের এই বন সংরক্ষণ প্রাচীন অদিবাসী সম্প্রদায়গুলি কার্যকলাপের উপর আঘাত এনেছিল এবং তাদের স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক বলপূর্বকভাবে বনের এই দখল বনের অধিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে ব্রিটিশ বিরোধী একাধিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। বহু অরণ্যবাসীরা বন সংরক্ষিত হয়নি এমন এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। আয়ের প্রধান উৎস থেকে বঞ্চিত হয়ে কীচক বাধকি লিধা প্রভৃতি আদিবাসীরা চুরি ও ডাকাতিতে লিপ্ত হয়।

ঊনবিংশ শতকে যে সমস্ত আদিবাসীরা স্থানচ্যুত ও কর্মচ্যুত হয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলাতে ডাকাতি শুরু করেছিল তারা ছিল মূলতঃ উত্তর ভারতের বাধাক সম্প্রদায়ের শাখা। অফিসের বিভিন্ন ডাকাতি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্যাদি শিকারীদের জীবনের ওপর আলোকপাত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগরের রাজা বাংলায় এই বাধাক সম্প্রদায়কে স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের শুল্ক হীন জমি প্রদান করা হয়েছিল এবং শিকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। বাংলায় ব্রিটিশদের আসার পর যে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে এরা ডাকাতির মত বিপদজনক পথ গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। শিকারী ডাকাতদের প্রধান কেন্দ্র ছিল বারাসাত। তাঁরা দুটি বৃহৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল যার একটি ভাগ ছিল উত্তর পশ্চিম দিকে। অপরটি ছিল জেলার কেন্দ্রস্থলে যেটি সুন্দরবনের বাঙ্গুর যানা থেকে নদিয়ার গোবরডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুরের চুয়াড় সম্প্রদায় যা সিলেটের কীচক উপজাতির মত খাদ্য সংগ্রহকারী সম্প্রদায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নীতিকে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই অবস্থা সমগ্র সমাজকে বিপথগামী করেছিল। এই সময় নতুন সম্প্রদায় ও সামাজিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতির বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায় গুলি অনেক সময় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু উপনিবেশিক রাষ্ট্র এই আন্দোলনগুলির অর্থনৈতিক উৎস সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়নি। তারা এগুলিকে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবেই

দেখেছিল। এর পেছনে যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো ও মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাদের ভূমিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা।

ঔপনিবেশিকরা আইন ও শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব আরোপ ও অন্যান্য সংবেদনশীল সম্প্রদায়গুলির প্রতি কঠোর পরিদর্শকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে Criminal Tribes Act পাশ করা হয়। উত্তর ভারতের একটি সম্প্রদায় Minas দের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বপ্রথম Criminal Tribes Act পাশ করা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অপরাপর কিছু সম্প্রদায় ও বিপজ্জনক ('dangerou') বলে মনে হয়েছিল। এই আইনের মাধ্যমে প্রশাসকদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যেকোন সম্প্রদায়, জাতি ও উপজাতিকে অপরাধী বিপজনক হিসাবে ঘোষণা করার। 1897, এবং 1911 খ্রীঃ 1923 খ্রীঃ আইনটির পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল। মাদ্রাজের মাদুরাতে Piramalai Kalloers সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সম্প্রদায়ের সদস্যদের ক্রিমিন্যাল আখ্যা দিয়ে সমবেত হবার ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। তাদের বিশেষ সময়ে সীমা অনুপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে তাদের অবস্থানের সম্মতি দেওয়া হয়েছিল। Criminal Tribes Act কিন্তু ব্রিটিশদের বন নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অরণ্যের সম্প্রদায়গুলির স্থানান্তরিত করণের সঙ্গে ক্রিমিন্যাল ট্রাইব অ্যাক্টের অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পর্ক ছিল। খক্ক উপজাতি যাদেরকে এই আইনের আওতাধীন করা হয়েছিল তারা ছিল বাজাখদের একটি শাখা। এই বাজাখরা অযোধ্যায় নেপালের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করত। তারা প্রায় ব্রিটিশ ভূখণ্ডে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করত বিশেষত পূর্বদিকে ঊনবিংশ শতকে উত্তর ভারত থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার বিভিন্ন জাতি ও অদিবাসী সম্প্রদায়কে অপরাধী সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। 1916 এবং মেদিনীপুরে লোকদের ও অপরাধী সম্প্রদায় ঘোষণা করা হয়েছিল। লোকদের ছিল অত্যন্ত দরিদ্র গোষ্ঠী। প্রথাগতভাবে বন থেকেই তাদের অর্জিত আয়ের ওপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা তাদের আয়ের উৎস থেকে বিতাড়িত হয় এবং চুরি ডাকাতির জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের উদাহরণের সংখ্যা অসংখ্য।

৫.২.১.৭ : দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতের পরিবেশের ইতিহাসের চালচিত্র

দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশের ইতিহাস চর্চা শুরু হয়েছিল 1980-র দশক থেকে। কতকগুলি গ্রন্থ এবং অনুচ্ছেদ দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশের ইতিহাসকে সামনে এনেছিল। প্রথম দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি হল উত্তর আমেরিকার বন বিশেষজ্ঞ রবার্ট কে উইন্টার্স (Robert K. Winters) এর। অপর জন হল চরমপন্থী ভারতীয় এবং রাজনৈতিক ঐতিহাসিক রিচার্ড টাকের (Richar Traker)। টাকের পশ্চিম ভারতে ঔপনিবেশিক বন নীতি এবং জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন তাঁর এই অনুচ্ছেদের পর কাজের গতি পরিবর্তিত হয় এবং 1980 এর দশকের প্রথম থেকে বিভিন্ন ধারার লেখকরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরিবেশের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা 'পূনর্গঠন' করেন। এই সময় থেকে পরিবেশের ইতিহাস বিশেষত ভারতের যন্ত্রের ইতিহাসকে উদ্দেশ্যগত ভাবে রাজনীতিকরণ করা শুরু হয়েছে। এই রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া

শুরু হয়েছিল উত্তর ভারতে চিপকো আন্দোলনের উদ্ভবের সাথে সাথে। 1980 ও 90 এর দশকে পরিবেশ ঐতিহাসিকরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে আলোচনার মধ্যে রেখেছিলেন—

(১) ভারতে বন সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রকৃত ইতিহাস কি এবং কোন প্রেক্ষাপট থেকে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদে এটিকে অঙ্গীভূত করা যায়।

(২) ভারতে বস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে আশঙ্কা দেখা গিয়েছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির মতাদর্শগিত ইতিহাস কেমন।

(৩) 1980 খ্রীঃ Forest Act পাশ হবার পর এই বিতর্ক কিন্তু নতুন মাত্রা পেয়েছে ভারতে, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড অনেকে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন, ক্রান্তীয় অঞ্চলে ব্যবহার এবং পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতী, সেখানে ভারতীয় গবেষকরা উপনিবেশিক বননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইতিহাস এবং বননীতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মতাদর্শ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতী।

রামচন্দ্র গুহ তাঁর অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তীতে গ্রন্থে দেখিয়েছে যে, প্রাক-উপনিবেশিক যুগে বনের বা বনজ সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা ছিল না। এই ভাবে গুহ দেখিয়েছেন পার্থিব বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপনিবেশিকরা বননীতি ও সংরক্ষণ চেয়েছিল যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কলাকৌশল ও রাজস্ব আদায়ের সাহায্য করেছিল। সুতরাং গ্যাডডিল এবং গুহ-র মতে, রেলপথ, জাহাজ নির্মাণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রচুর কাঠের প্রয়োজন হওয়ায় তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বন আইন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু রিচার্ড গ্রেভ এই মতের বিরোধিতা করে ব্রিটিশদের সংরক্ষণনীতির মধ্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করে বলেন যে এটি ক্রমবর্ধমান বৃক্ষচ্ছেদন ও দুর্ভিক্ষের জন্য গড়ে উঠেছিল। গ্রোভ মনে করেন, শুষ্কতার বিষয়টি (desiccationism) ব্রিটিশদের উপনিবেশগুলিতে বন সংরক্ষণে বাধ্য করেছিল। বৃক্ষছেদন ও দুর্ভিক্ষ জলৎ সম্পদের হ্রাস, মৃত্তিকা ক্ষয়, এবং উৎপাদনের বিষয়টি শুষ্কতার সঙ্গে জড়িত ছিল। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই বিষয়টিকে তাদের দৃষ্টিতে এনেছিলেন। এই সমস্ত মানুষরা শুষ্কতার বিষয়টিকে তুলে ধরে এবং বন সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কথা বলে। এইভাবে, ব্রিটিশদের বন নীতির পেছনে সাম্রাজ্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক লোভকে তিনি অস্বীকার করে অপরাপর বিষয়গুলিকে আলোচনার মধ্যে এনেছেন। মহেশ রঙ্গরাজন অবশ্য এই দুই ধারার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন এবং বলেন যে বিষয়টির প্রতি একটি একমুখিনতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, শুষ্কতার ভীতিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় বনের আকার গঠনের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। অজয় সাকরিয়া (Ajay Skaria) বলেন শুষ্কতার পরিপ্রেক্ষিতে বন সংরক্ষণের বিষয়টি ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের সভ্য করার মানসিকতার (Civilising mission) একটি অঙ্গ। সাকরিয়া ক্ষোভের মতকে অস্বীকার করে বলেন যে, বন সংরক্ষণের বিষয়টি ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিষয়ে একেবারে অগ্ন (innocent of colonial domination) ছিল না। ডি. ডি. ডাঙ্গায়ল (D. D. Danagwal) সাকরিয়া (Skaria)-র বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে দেখিয়েছেন যে, হিমালয়ের বনাঞ্চলের (উত্তরাখণ্ডে) ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুষ্কতার বিষয়টিকে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু মূল সমস্যাটিকে বিচার করলে দেখা যায় এটি ছিল ক্ষমতা প্রয়োগের একটি অন্যতম মাধ্যম যার প্রধান লক্ষ্য ছিল শেতাঙ্গ সাহেবদের মাধ্যমে ভারতীয় উপনিবেশে আধিপত্যটাকে সুদৃঢ় করা। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে মনে হয়েছিল জঙ্গলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারলে ভারতে ঔপনিবেশিকীকরণের কাজ অসমাপ্ত থাকবে।

একটি আঘাতেই এর Forest Act এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার বনের ওপর তাদের দাবীকে বৈধ করে এবং শিকার করা, খাদ্য সংগ্রহ করা এবং বনে গাছ কাটা অবৈধ করে। প্রধান অপরাধী গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয় শিকারীরা, বন্যজন্তু আরোহণকারী এবং মৎসজীবীরা। এইভাবে বন্য অপরাধের একটি নতুন শ্রেণী তৈরী করা হয়। বনের অভ্যন্তরে মানুষের যে সমস্ত কার্যকলাপ ইতিপূর্বে গণ্য করা হত না, সেগুলি এখন রাষ্ট্রের তীক্ষ্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। ঔপনিবেশিক শাসন জুড়েই আইন প্রণয়নকারীরা তাদের বন্য অপরাধের পরিধিকে বৃদ্ধি করেছিল। যদিও 'বন্য অপরাধ' বিষয়ে সাধারণের ধারণা একই রকম রয়ে যায়। বনের ওপর সরকারের আধিপত্য আইনি বৈধতা পেল। নতুন বননতি বন ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বোধশক্তি নিয়ে আসে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে ঔপনিবেশিক শাসকদের নিষ্ঠুর বাণিজ্যিক শোষণই বন ধ্বংসের জন্য দায়ী। প্রথমে ব্রিটিশরা বন ধ্বংস করে এবং তারপর নিজস্ব ভঙ্গিতে সেই বনের রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজরাই ছিল প্রকৃত অপহরণকারী (poacher) কিন্তু তারা দেশীয় জনগণকে এইভাবে দোষী সাব্যস্ত করে যারা বন থেকেই আশৈশবকাল থেকে উপার্জন করত। দেশীয় জনগণ তাদের বহু পুরানো বনজ অধিকার হারিয়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সরকারের অধিকারের দাবীকে অস্বীকার করে এবং ইচ্ছা অনুসারে চাষ, গাছ কাটা, বনে আগুন জ্বালানো প্রভৃতি কাজ করতে থাকে যা তারা বহু যুগ থেকেই করে আসছিল। এইভাবে বন্য প্রাণীগুলিকে ধ্বংস করে ইউরোপীয় শিকারীরা নিজস্ব ভঙ্গিতেই সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হয় এবং ক্রান্তীয় অরণ্য ও প্রাণীকে রোমান্টিসাইজ করতে থাকেন।

গুহ দক্ষিণ এশিয় পরিবেশের ইতিহাসকে সুবর্ণযুগ ('a golden age') হিসাবে চিহ্নিত করলেও Grove এই মতকে অস্বীকার করেছেন এবং গ্রোস প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে সাধারণের সম্পত্তির অস্তিত্ব এবং প্রচলিত বন ব্যবহারের বিষয়কে প্রশ্ন করেছেন। রঙ্গরাজন, সাকরিয়া, দামোদারান এবং অন্যান্যদের সাম্প্রতিক গবেষণা টাকের এবং নিম্নবর্গীয়দের আদি পর্বের কাজের সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে। তবে আলফ্রেড ক্রসবি (Alfred Cresby) এবং ক্রিস্টোফার বেইলি (Beyly)-র রচনার দ্বারা ও এই সমস্ত পণ্ডিতরা অনেকাংশে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বেইলী পরিবেশবাদী ঐতিহাসিদের ঔপনিবেশিক শাসনকে জলবিভাদিকা হিসাবে চিহ্নিত করতে নিষেধ করেছেন। বরং প্রাক ঔপনিবেশিক যুগের থেকে শুরু করে যে ধারা প্রবহমান ছিল সেটি হল গুরুত্বপূর্ণ। গ্রোভ ও দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের ইতিহাসের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছেন যা 1857 খ্রীঃ পর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল। রঙ্গরাজন এবং গ্রোভ উভয়েই অত্যন্ত সঠিকভাবে মোগলদের পতনের পর তার উত্তরসুরি রাষ্ট্রগুলি যে বননীতি গ্রহণ করেছিল তার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। গ্রোভ বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি। বর্তমান যুগে আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাবকে এখনও যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা আগামী বছরগুলিকে দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশের ইতিহাসে আরো বেশ কয়েকটি আন্দোলনকে আশা করতে পারি। গ্রোভ এবং অন্যান্য বেশ কিছু পণ্ডিতদের রচনায় এই বিষয়টি কিছুটা স্থান পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার

পরিবেশের ইতিহাসে উপনিবেশিক শাসনকে একটি জলবিভাজিকা ধরা হয়। মানব সভ্যতার অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বা ঔপনিবেশিকোত্তর রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপ মূলক ভূমিকার একটি নৈতিবাচক প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। এই ইতিহাসচর্চার নতুন মোড় তাকে নবযৌবন দান করতে সাহায্যা করবে।

৫.২.১.৮ : সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান

সরকারী সংরক্ষণ নীতির ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বস্তুতন্ত্র ও বন্যপ্রাণী সম্পকিত যে জ্ঞান ছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। এই সমস্ত জ্ঞান এবং তাদের ব্যবহারিক রীতি নীতি ও ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্পদ ও সংরক্ষণকে তেমনভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি। একজন বন অধিকর্তার মতানুসারে এই ধরনের জ্ঞান গুলিকে এবং পরিবেশগত উপাদানের বিষয়ে কথা বলতে বিশেষ আগ্রহী নয়। কিন্তু জৈব উপাদানের সম্পর্কে ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে বুঝতে হবে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে এবং তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদ জগতের কি সম্পর্ক রয়েছে তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সরকারী পরিবেশ দপ্তরের নীতির মধ্যে এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন উপজাতির সদস্যতে ডাকা হয় না। বর্তমান সময়েও বিভিন্ননীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে চলেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলি সমাজের ধ্বংসসাধন এবং জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংসসাধনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে সরকার যে আয় করে তাঁর সিংহভাগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। উদাহরণস্বরূপ সরকার টুরিজম থেকে যে রাজস্ব আদায় করে তার বেশীরভাগ অংশই ভারতীয় শহরগুলির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ নীতির প্রতি আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিভঙ্গি অনেকক্ষেত্রেই বিদ্বেষপূর্ণ। দেশে বনদপ্তর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে সংগঠিত বহু সংঘর্ষের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে 222 টি সংরক্ষিত এলাকার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এরূপ 47 টি সংঘর্ষের উদাহরণ পাওয়া গেছে। 1990 এর দশকে এই পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে উঠেছিল। এইসব সংঘর্ষের মধ্যে 1981 সালে ভারতপুর অভয়াররণ্যের কথা বলা চলে যেখানে পুলিশের গুলিতে নয়জনের মৃত্যু হয়। অতি সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত অর্থে পুনর্বাসন কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে পুলিশ নাগরহোল বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্রে উপজাতিগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে উপজাতি জনসংখ্যার হ্রাস ঘটানো।

রাষ্ট্রের সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে হিংসাত্মক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বন্য কাঠ এবং বিভিন্ন জন্তুর গরীব চোরা কারবারী করা, বন্য প্রাণীদের বিষ প্রয়োগ, বনে অগ্নি সংযোগ এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বাঘ মানুষের এই সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ হল সাম্প্রতিককালে অন্ধ্র প্রদেশের ঘটনাটি যেখানে 20 টির মধ্যে 15 টি বাঘকে বিষ প্রদান করা হয়েছিল। একইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিমালয়ে মধ্যবর্তী অঞ্চলে মানুষ বন দপ্তরকে সাহায্য করেছিল আগুন নেভাতে সেখানে মানুষ বর্তমানে বন দপ্তরের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে এই ধরনের সম্প্রদায়গুলি বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। এই বিচ্ছেদক্ষমতা অপর একটি নিদর্শন হল গুজরাটের শুলপানেশ্বর অভয়ারণ্যের কার্যকলাপ

যেখানে রাজ্য সরকার সেখানকার উপজাতিগুলিকে লিষিদ্ধ করলেও একটি পেপার মিলকে ধোঁয়া সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করেছে। সাম্প্রতিককালে গজদন্ত ও চন্দনকাঠ শিকারী বীরাপ্পান (Veerappan) দীর্ঘ সময় ধরে আত্মগোপন করে থাকতে সমর্থ হয়েছিল এবং একথা বলা হয়ে থাকে। এই সাহায্য হয়তো ছিল জবরদস্তিমূলক। কিন্তু একথা ও বলা চলে স্থানীয়রা তাঁর কাছ থেকে রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল। এর ফলে সরকারী পরিবেশ নীতি স্থানীয় মানুষকে দেশীয় জ্ঞান ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ সংরক্ষণের জন্য দেশীয় জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। বিরাপ্পানের উদাহরণ প্রমাণ করে যে, পশু শিকারের মত ঘটনাগুলি স্থানীয়দের সহযোগিতার মাধ্যমেই ঘটে। স্বভাবতই স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমেই এগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। রাষ্ট্রও সম্পদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে চোরা শিকারীরা আঞ্চলিক সমর্থন লাভ করে ও স্থানীয় জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে।

৫.২.১.৯ : পরিবেশ সংরক্ষণে সাধারণের অংশ গ্রহণ

সমগ্র বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ আন্দোলন ও দিনের পরদিন শক্তি অর্জন করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ সবুজ (পরিবেশ) কর্মী আমাদের রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে যেমন বুদ্ধিজীবীদের কাছে মার্কসবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ঠিক একইভাবে বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণের কারণটি আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যময় হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের পরিবেশ কর্মী হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, নরওয়ের জি. এইচ. ব্রাণ্ডল্যাণ্ড (G. H. Brundtland), পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেসর উলি ব্রাণ্ডট (Willy Brandt) তানজানিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নায়ার (Julius Nyrere), আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালগোর (Al Gore)-র নাম একই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরিবেশ আন্দোলন অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের মতই শান্তি প্রতিষ্ঠা, সামাজিক মর্যাদা ও লিঙ্গ বিচার, দরিদ্র দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত আন্দোলন প্রধানত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই পরিবেশ আন্দোলনের আবির্ভাব। শিল্প বিপ্লবের মূল্য হিসাবে যে সামাজিক পরিবেশের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া হল পরিবেশ আন্দোলন। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমাগত ক্ষয়, পরিবেশের অবনতি, ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যখন দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে তখন এই সমস্ত বিষয়গুলিকে আর পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করা যায় না। আর তাই গণক্ষেত্রগুলির মানসিকতার পরিবর্তন সাধনে ব্যক্তিগতভাবে বা বেসরকারীভাবে অনেক সংগঠন বর্তমানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনগুলির ভূমিকা (Role of Non-Governmental Organization)

সমগ্র বিশ্বে NGO গুলি পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করেছে এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সর্বজনস্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড (WWF, বর্তমান নাম Worldwide Fund for Nature) ইন্টারন্যাশনাল কনজারভেশন অব নেচার (IVCN গ্রীনপিস (Greenpeace) প্রভৃতি। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনগুলির এবং তাদের সামাজিক আন্দোলনকে উৎসাহদানের পাশাপাশি তারা মানুষের উন্নতিকে

তাদের আলোচনার কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরেছিল। পরিবেশ বহির্ভূত বিষয়গুলি হল দরিদ্র ও প্রান্তবাসী, আদিবাসী ও দেশীয় জনগণ, মহিলা ও সমাজের অপরাপর অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ। নমনীয় এবং ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক হওয়াই NGO বিভিন্ন আর্থসামাজিক বিষয়গুলিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত করতে পারে এবং বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে এগুলি রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে। পরিবেশ এবং উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত জটিল বিষয়গুলিকে জনগণের মধ্যে তারা শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল বিষয়গুলি নিয়েও তারা আলোচনা করে। তাদের কার্যক্রমের অপরিসীম মূল্যের কারণেই 1987 খ্রীঃ UN অনুমোদিত Brundtland Commission তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, জাতীয় সরকার NGO গুলিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায় এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে NGO-র কথা অনুসরণ করে চলবে।

1972 খ্রীঃ স্টকহোম কনফারেন্স (Stockholm Conference)-এর সময় থেকে UN এর প্রতি বৈঠকে NGO গুলি তাদের পূর্ণশক্তি নিয়ে যোগদান করে এটি থেকেই তার গুরুত্ব ও প্রভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উন্নতি সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন হওয়ায় NGO দরিদ্র, দুর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমানে বিভিন্ন দাতা সংস্থা উন্নতিমূলক কাজকর্মে অর্থ প্রদানের সময় NGO গুলিকে পরিসম্পর্ক হিসাবে নিয়োগ করে।

NGO মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে গড়ে ওঠে এবং উন্নত সত্তর এবং উন্নয়নশীল দক্ষিণের মধ্যে সহাবস্থান করে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষিত এবং নগরবাসী যদি ও তারা সমাজকল্যাণের পক্ষপাতী এবং একেবারে নিম্নস্তরে মানুষ তাদের আলোচনায় স্থান পায় তথাপি তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থান, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ তাদের কাজের ক্ষেত্রে প্রদান বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে। একইভাবে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত (background) থেকে আসায় NGO গুলি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ব্যাপারে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং উন্নতির তুলনায় পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া সত্বেও উন্নতদেশগুলিকে বেশী প্রাধান্য দেয়। সাধারণভাবে তারা নিজেদের দেশের সামাজিক পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনা। আবার দেশবাসীর ভোগের ধরন ও জীবন ধারাকে ও পরিবর্তন করতে পারে না। উন্নত দেশগুলির NGO-র কাছে উন্নয়ন, সামাজিক এবং বিশ্বব্যাপী সাম্য, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

৫.২.১.১০ : আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা (Role of International Agencies)

UNO-র মতে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের মত এর শাখা প্রশাখাগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ আন্দোলনে সাহায্য করেছিল। 1972 খ্রীঃ 5-16 জুন স্টকহোমের সুইডিশ ক্যাপিটালে ইউ.এন.কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট (UNCHE) নামে যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে পুরোপুরিভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছিল। পূর্ব জার্মানীকে এই সম্মেলন না রাখায় প্রতিবাদ হিসাবে রাশিয়া ও তার মিত্ররা ব্যতীত মোট 112 টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল। সম্মেলন শেষে এর প্রতিনিধিরা বিশ্বকে পরিস্কার রাখতে, বন্যা, ভূমিকম্প ও সাইক্লোনের মত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সংকেত ব্যবহার করতে বজ্য পদার্থ সমুদ্রে না ফেলতে এবং আরো বহুবিধ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল।

নরওয়ের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী Ms Gro Harlem Brundtland-এর সভাপতিত্বে UN World Commission of Environment and Development প্রতিষ্ঠা করে। 1983 খ্রীঃ এই কমিশন তার কাজ শুরু করে এবং 1987 তে Our Common Future নামে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট স্থিতিশীল উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বন্টন, গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং পরিবেশের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি আনয়দের ক্ষেত্রে মহিলা ও দেশীয় মানুষদের নীতি নির্ধারণের কমিটিতে নিয়ে আসা প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দারিদ্রের কারণকে রিপোর্ট চিহ্নিত করে। 1980 সালের Brandt Commission Report এবং 1992 সালে South Commission Report একই বক্তব্য পেশ করে। এই সমস্ত রিপোর্টগুলি বিশ্বব্যাপী দারিদ্রকে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করতে চেয়েছিল। এবং দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে তারা মনে করেছিল। এই রিপোর্টগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরেছিল যার ওপর পরিবেশ আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল। এবং পরিবেশভিত্তিক বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি অনুপ্রেরণার উৎস পেয়েছিল। ইতিমধ্যে 1992 খ্রীঃ ব্রাজিলের রিও তে UN এর পরিবেশ সংক্রান্ত দ্বিতীয় কনফারেন্স UN Conference on Environment and Development (UNCED) অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সর্বধিক উন্নতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিরা জোরপূর্বকভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করে। 1972 ও 1992 এই দুই বৈঠকেই NGO একটি গুরুত্ব পূর্ণভূমিকা পালন করে।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) এর পিরয়ডিক ওয়াল্ড রিপোর্ট, ইউনাইটেড নেশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম, (UNDP), বিশ্ব ব্যাঙ্ক, পরিবেশ, বিশ্ব বাণিজ্য, সমাজ কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান নির্ভর যে তথ্যগুলি তুলে ধরেছিল তার ওপর ভিত্তি করেই পরিবেশবিদরা তাদের বক্তব্যগুলিকে তুলে ধরেছিলেন।

৫.২.১.১১ : ভারতে প্রান্তিক পর্যায়ের বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলন (Some Grass Root Enviromental Movements in India)

ভারতীয় দর্শন প্রকৃতি ও তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। ঋকবেদের অনেকগুলি মন্ত্রই প্রকৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শক্তি গান্ধীবাদ (Gandhism) সাধারণ জীবনের কথা বলেছিল। গান্ধী আর্থিক সমৃদ্ধির যে মডেল তুলে ধরেছিলেন তা ছিল স্থিতিশীল উন্নয়নেরই মডেল যার কথা পরিবেশবিদরা বর্তমানে তুলে ধরেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমাদের নেতা ও নীতি নির্ধারকরা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণে সম্পদ শোষণ এই পশ্চিমী মডেলকে তুলে ধরেছেন। বেশ কিছু পশ্চিমী চিন্তাবিদ পশ্চিমী ধারাকে অনুসরণ না করার কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যকে অনেক সময় অনুন্নত করে রাখার মানসিকতা বলে সমালোচনা করা হয়। গান্ধীবাদীদের বক্তব্যকে ও অনেক সময় সমালোচনা করা হয়।

1970-র দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয় তখন 1972 খ্রীঃ স্টকহোম মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রণমেন্টে (UNCHE) যোগদান করেন। তাঁর বক্তব্য উচ্চস্বরে প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি ঐ বছর National Committee for Environmental Planing and Cooperation (NCEPC) প্রতিষ্ঠা করেন যা পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে পরামর্শ দিত এবং বিভিন্ন উন্নয়নশীল

কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশগত তাৎপর্যের মূল্যায়ন করত। পার্লামেন্টে এই সময় বেশ কিছু পরিবেশ সংক্রান্ত আইন এবং সাংবিধানিক সংস্কার পাশ করা হয়েছিল। UN কনফারেন্সের প্রথম বছরেই Wildlife Act, 1972 পাশ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে বলা চলে, ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য পরিবেশ কর্মী এবং যার জন্য তিনি সম্মানজনক International Union of Conservation of Nature পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে তথাকথিত উন্নতিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রান্তীয় স্তরে বেশ কিছু পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। হিমালয়ের পাদদেশে গাছ ধ্বংসের বিরুদ্ধে গান্ধাবাদী নেতা সুন্দরলাল বহুগুনার (Sunderal Bahuguna) নেতৃত্বে যে চিপকো আন্দোলন (Chipko Movrement) সংগঠিত ও সাফল্য লাব করেছিলতা আজ সর্বজনবিদিত। হিন্দী ভাষায় চিপো শব্দের অর্থ হল 'আলিঙ্গন করা' (embracing) চিপকো আন্দোলনে মহিলারা গাছগুলিতে জড়িয়ে ধরে ব্যবসাদারদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে।

রাজস্থানের বিষ্ণোই (Bishnoi) সম্প্রদায়ের মধ্যে গাছকে রক্ষা করা এবং প্রাণীদের ভালবাসার একটি ঐতিহ্য রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের গুরুত্বকে তারা জানত। 1731 খ্রীঃ Anita Bai এর নেতৃত্বে বিষ্ণোই মহিলারা প্রাসাদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে মহারাজার কর্মচারীদের গাছ কাটার হাত থেকে গাছকে রক্ষা করেছিল গাছকে জড়িয়ে ধরে। মহারাজার সশস্ত্র কর্মীদের হাতে অনিতা বাঈ, তাঁর স্বামী এবং তিন কন্যাসহ 363 জন নিহত হয়। অনিতা বাঈ ও তাঁর অনুগামীদের এই আত্মোৎসর্গ পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাসে পথপ্রদর্শকের ঘটনা হিসাবে কাজ করেছিল।

1972 সালে উত্তর প্রদেশের পার্বত্য এলাকায় দালালদের সশস্ত্র কর্মচারীরা Advani গ্রামের Bachni Devi এবং Rani গ্রামের Gouri Devi দ্বারা বিতাড়িত হয়। 1986 খ্রীঃ দুন উপত্যকায় (Doon Vally) Nahikala গ্রামে চুমন দেবীর নেতৃত্বে অনুরূপ আন্দোলন সংগঠিত হয়।

পরিবেশ আন্দোলনের আর একটি উদাহরণ হল কেরালায় Silent Vally hydro electric project এর বিরুদ্ধে। কেরালার সরকারী বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে Silent Valley র গভীর অরণ্যের পাশে Hydroelectric project তৈরীর পরিকল্পনা করে। এই অরণ্যটিই একমাত্র কেরালায় টিকে ছিল। পরিবেশবিদরা এই পরিকল্পনা বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা করলেও তারা হেরে যায়। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপে পরিকল্পনাটি বন্ধ হয়।

নর্মদা নদীর ওপর প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে মেধা পাটেকার এক পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তোলেন স্থানীয় আদিবাসীদের সহায়তা নিয়ে যাদের জমি এর ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। যদিও তিনি প্রকল্পটিকে বন্ধ করতে পুরোপুরি সফল হননি, তথাপি বাঁধটির উচ্চতা কমাতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে জলমগ্ন এলাকা হ্রাস পেয়েছিল। Centre for Science and Enviroment এর Anil Agarwal ও তাঁর অনুগামীরা Citizens Reports এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে সর্বসাধারণের সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। 1972 সালে এর প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টটি ভারতে

পরিবেশভিত্তিক জার্নালিজমের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছিল। Vandana Shiva তাঁর রচনার মাধ্যমে উন্নতিশীল মডেলকে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাঁর মতে, এটি অভিজাততান্ত্রিক ও দরিদ্র বিরোধী। তিনি একই সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্ক মজুরীকৃত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন কারণ এগুলি তাঁর মতে, দান গ্রহীতা দেশের তুলনায় দাতা দেশের স্বার্থই যেখানে গুরুত্ব পায়। তিনি একই সঙ্গে সফলভাবে নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে পরিবেশভিত্তিক আন্দোলনকে অবিচ্ছেদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এবং তিনি Alternate Nobel Prize-এ ভূষিত হয়েছিলেন।

Maneka Gandhi ও ছিলেন একজন পরিবেশভিত্তিক সাংবাদিক। তাঁর রচনা এবং টি. ভি. প্রোগ্রাম ভীষণ জনপ্রিয় এবং এর মাধ্যমে তিনি—মানুষ এক ঐতিহাসিক আন্দোলনে পরিবেশ সংরক্ষণের কারণ, প্রাণীদের প্রতি ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন, নিরামিষভোজন প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

৫.২.১.১২ : উড়িষ্যার পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movements in Orissa)

উড়িষ্যাতে বেশ কিছু সাফল্যের ইতিহাস রয়েছে। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী Shradhakar Supkar. কোর্টে একটি পিটিশন দেন Ib ও Mahanandi-র দূষণের জন্য, যা 1950 এর দশকে Brajarajnagar এর Orient Paper Mill এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে হীরাকুঁদ বাঁধ ছিল না। Ib নদীর দূষণ Sambalpur থেকে নিম্নদিকে গিয়ে Mahanandi-র সঙ্গে মিশেছিল। তাই ওড়িষ্যা সরকার এর প্রতিরোধের চেষ্টা করে এবং জলের দূষণ কমাবার চেষ্টা করে। Orissa River Act 1953 জলের, দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এই Act এর বাস্তবায়িত করার কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সদিচ্ছা ছিল না। ফলে ওড়িষ্যায় জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। এই Act নতুন রূপ পেয়েছে 1974 সালে Water Act এর মাধ্যমে (Prevention and Controll of Pollution)

1991-92 সালে ডাটা কোম্পানীর দ্বারা Chika farm তৈরীর প্রচেষ্টা Sri Banka Bihari Das এবং অপরাপর সংগঠনের নেতৃত্বে। ওড়িষ্যা কৃষক মহাসংঘ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই আন্দোলনের কারণে শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্প বাতিল হয়। শ্রী দাসের নেতৃত্বে অনুরূপ বহু আন্দোলন উন্নতিশীল প্রজেক্টের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল যা তার মতে, পরিবেশভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ (environment aggressive)

আদিবাসী এবং অনাদিবাসীদের নিয়ে সংগঠিত Gandhamardhan yuba Parishad এর নেতৃত্বে পশ্চিম ওড়িষ্যার মানুষ এক ঐতিহাসিক আন্দোলন সামিল হয় যার মাধ্যমে তারা Gandhamardhan Hills এ বক্সাইট খনন কার্য সরকারকে বন্ধ করতে বাধ্য করে। এই পার্বত্য এলাকায় বহু গাছ ছিল যেগুলি ওষুধ তৈরীতে ব্যবহৃত হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রকল্পটি বাতিল ঘোষিত হওয়াই আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। বক্সাইট প্রকল্প ব্যতিরেকে Gandhamardhan Hills-এ বৃক্ষছেদন চলতে থাকে। পশ্চিম ওড়িষ্যার মানুষ বনছেদনের ফলে কালাহান্দি ও কেলানগির এই দুই অবিভক্ত জেলার মানুষের অবস্থাকে উপলব্ধি করে। শেষ পর্যন্ত সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে Orissa Enviroment Consciousness Society (OECS) স্থাপিত হয়। পশ্চিমী জেলাতে পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে Jyoti Vihar তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শ্রী প্রসন্ন কুমার দাসের নেতৃত্বে Orrissa Environment Society (OFS) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে বাধ্য করে ময়ূরভঞ্জের সিমলিপাল বনকে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে, এটা ছিল দেশের পঞ্চদশ biosphere reserve এবং রাজ্যে প্রথম। (OFS) এটি কোন প্রকার আন্দোলন ছাড়াই, শুধু দলগত ভাবে এটি করতে সমর্থ হয়েছিল। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছিল। শেষ পর্যন্ত গজপতি জেলায় মহেন্দ্রগিরি পর্বতের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না উচ্চ বিচারালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা না হয়। বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে রায় ও বিচার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫.২.১.১৩ : সম্ভাব্য গ্রন্থাবলী

(1) Richand Grore (ed) : Nature and the Orient.

(2) Mahesh Rangarajan : Fencing the Forest

(3) Mahesh Rangarajan : Environmental Issues in India. (ed.) A Reader

(4) Ranjan Chakrabarti : Does Environmental History Matter.

(5) Ranjan Chakrabarti : Situating Environmental History

৫.২.১.১৪ : প্রশ্নমালা

(১) বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ বিতর্ক সম্পর্কে যা জান লেখ। অতীতে কি এই বিতর্ক ছিল না?

(২) পরিবেশের ইতিহাস কি? কিভাবে এর উৎপত্তি হয়?

(৩) ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতির উপর একটি প্রবন্ধ লেখ।

(৪) দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের ইতিহাসের মূল বিতর্ক সম্পর্কে মন্তব্য কর।

(৫) ভারতবর্ষের পরিবেশ আন্দোলনের উপর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

৫.২.১.১৫ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) উড়িষ্যার পরিবেশ আন্দোলনের উপর একটি টীকা লেখ।

(২) নর্মদা আন্দোলনের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতি আলোচনা কর।

(৩) Club of Rome Report কি?

(৪) পরিবেশের ইতিহাসের উৎপত্তি আলোচনা কর।

(৫) ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন প্রবর্তনের পেছনে ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্দেশ্য কি ছিল?

পর্যায় গ্রন্থ-১

একক-৩

Society and Culture of Different Ethnic Communities inhabiting Different Geographical Zones in India

বিন্যাস ক্রম :

৫.৩.২.০ : উদ্দেশ্য

৫.৩.২.১ : ভূমিকা

৫.৩.২.২ : উপজাতির ধারণা

৫.৩.২.৩ : ভারতের উপজাতি

৫.৩.২.৪ : উপজাতি থেকে অ-উপজাতি

৫.৩.২.৫ : পুন-উপজাতিকরণ

৫.৩.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (Suggested Readings)

৫.৩.২.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignments)

৫.৩.২.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

১। উপজাতি বলতে কি বোঝায়?

২। ভারতের বিভিন্ন উপজাতি।

৩। কিভাবে উপজাতি থেকে অ-উপজাতি এবং অ-উপজাতি থেকে পুনঃ উপজাতিকরণ ঘটছে।

৫.৩.২.১ : ভূমিকা

বহুজাতি, ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সম্পন্ন ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির সহাবস্থান নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়ের বিষয়। প্রতিটি সম্প্রদায়রই কিছু না কিছু নিজস্বতা আছে। এই নিজস্বতার চরিত্র অঞ্চল ও ভৌগলিক পরিবেশের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। আবার এই সম্প্রদায় (Community) গুলির আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের ধারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই তথাকথিত মূল ভারতীয় জনগোষ্ঠির সংস্কৃতির (Main Stream Indian culture) যুগপৎ সমান্তরাল ও আড়াআড়ি ভাবে প্রবহমান উপজাতিয় সংস্কৃতি (Tribalisation Culture) ও নানাবিধ কারণে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

রাজনৈতিক কারণে উপজাতিয় সমাজ ব্যবস্থায় অ-উপজাতীয় (Non-tribal) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (Political Institutions) উৎপত্তি ও বিকাশ উপজাতীয় সমাজের ক্ষমতাগত শ্রেণীবিভাজন (Power lurarchy) কে পরিবর্তিত করে অ-উপজাতি স্বত্তায় নিয়ে গেছে সরকার। একইভাবে অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা উপজাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় (Tribal mode of praduction) অউপজাতির উৎপাদন ব্যবস্থা (Non-tribal mode of production) বা আধুনিক অর্থনীতির (advanced economy) বৈশিষ্ট্য সমূহের ঘটেছে যা উপজাতি সমাজের অ-উপজাতিকরণ (de-tribalisation) প্রক্রিয়াকে মজবুত করেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে উপজাতি। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষ করে পাহাড়, অরণ্য ও নদীর প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বহুমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প (Multi-purpose development project) উপজাতি স্বত্তার পরিবর্তনে শক্তিসঞ্চার করেছে।

উপজাতি স্বত্তার অ-উপজাতি স্বত্তায় রূপান্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুঘটক হল সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। ভারতীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির প্রধানত অ-উপজাতিয় ধর্মীয় সংস্কৃতি (Non-tribal ruligious culture) গ্রহণ করার ফলে তাদের ভাষাগত, ধর্মগত, সামাজিক আচার, আচরণ, জীবনশৈলী, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মূলত হিন্দু ও খ্রীষ্টান এবং সামান্য পরিমানে ইসলাম ধর্মীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করায় ঐ সমস্ত ধর্মীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তাদের উপজাতীয় পরিচিতি (Tribal identity)-র রূপান্তর (transformation) ঘটেছে। ধর্মীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার বিস্তার উপজাতী সমূহকে অ-উপজাতীয় স্বত্তয়ে বিকশিত হওয়ার পথকে আরো মশৃন করেছে।

স্বাভাবিক ভাবেই উপজাতির অ-উপজাতিকরণ (de-tribalization) প্রক্রিয়া সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ে পরিনত হয়েছে মূলত উপনিবেশিক অমল থেকে। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থা (Colonial mode of production)-র বিকাশেরক জন্য উপজাতি শ্রমিক শক্তির (Tribal labour force) স্থানান্তর করণ উপজাতি বসতির (Tribal settlement) স্থানচ্যুতি (displacement) ঘটিয়েছে। এটা একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবশ্য প্রসবীয় সন্তান বিশেষত বাগিচা শিল্প ও খনি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে অন্যদিকে তেমনি উপজাতি সমাজের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে গভীর পরিবর্তন তথা সংকটের সূচনা করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে উপজাতি সমাজের প্রতি অহস্তক্ষেপ নীতি (policy of noninterferenec) ও উপজাতি সমাজকে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি (policy of seclusion) উপজাতি স্বত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহযোগী হয়েছিল। কিন্তু পিছিয়ে পড়া সামাজিক শ্রেণী (Backward class/Depressed caste/Deprssed Class/1936 থেকে তপজাতি উপজাতি Scheduled Tribe) হিসাবে উপজাতি সম্প্রদায় সমূহের জন্য সরকারের বিশেষ জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা উপজাতি সমাজের কে দ্রুত অ-উপজাতি করে তুলেছে।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে প্রাকৃতির অপক্ষয় (environmental degradation) ও উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের অশুভ প্রভাব (desrceptive impact) অ-উপজাতিয় উৎপাদন ব্যবস্থা (Non-tribal mode of production) বা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উপজাতি সমাজের উদ্বৃত্ত উৎপাদন (surplus generation) করার ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে ভারতের বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে (Tribal dominated V and VI Schedule

area) উপজাতীয় জনগোষ্ঠী উদ্ধৃত্ত-উৎপাদনে অক্ষম subsistence economy-র মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছে। এটাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনঃ উপজাতিকরণ (re-tribalisation) বলা যায়। পাশাপাশি অ-উপজাতি হওয়া পূর্বতন উপজাতি সমূহের অনেকগুলিই তপশিলি উপজাতি (scheduled tribe) হিসাবে সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য নিজেদের ST হিসাবে চিহ্নিত করার আন্দোলন শুরু করেছে। ভারতীয় জনগোষ্ঠির এই ধরনের পশ্চাৎগতি (downward social mobility)-ও একধরনের পুনঃ উপজাতিকরণ।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে উপজাতির অ-উপজাতিকরণ (de-tribalisation) এবং অ-উপজাতিয় স্বত্তার পুনঃউপজাতি করণ (tribalization) নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি 'উপজাতি' ধারণার বিতর্ক ও তাদের আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের সামাজিক শক্তি (social force) গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.৩.২.২ : উপজাতির ধারণা (CONCEPT OF TRIBE)

কোন নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে উপজাতি সমাজকে সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত তথা বিভিন্ন দেশে উপজাতিদের নিয়ে সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল হিসাবে পাওয়া জ্ঞান উপজাতির সংজ্ঞা নির্ণয়কে আরো কঠিন করে তুলেছে। এই গবেষণা লব্ধ জ্ঞান থেকে উপজাতি সমাজের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন নৃতাত্ত্বিক (anthrapalogists) ও সমাজ বৈজ্ঞানিকগণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে কোন উপজাতি সমাজকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

Dictionary of Sociology and Related Science

এ উপজাতি (Tribe)কে 'a social group usually comprising a number sibs. bands, villages or other sub-groups, which is normally characterised by the possession of a territory, a distinct dialect, a hemogenous and distinctive culture and either a unified political organisation or at least some sense of common solidarity as against outsiders' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন John Peter Murdok. অন্যদিকে R. Piddington-এর মতে উপজাতি হচ্ছে নির্দিষ্ট ভুখন্ডে বা অঞ্চলে বসবাসকারী বহু সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক স্বত্তা যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সামাজিক সংঘবদ্ধতা আছে। বৃহত্তর অর্থে উপজাতি হচ্ছে a social group usually with a definite area and deleact, cultural homogeneity and unifying social organisation. It can include several subgroups such as clans and sibs. The families or groups are linked through blood ties, religious, social and cultural functions.

তবে অনেক সমাজতত্ববিদই উপজাতির এই সরলীকৃত সংজ্ঞা গ্রহণ করতে রাজী নন। বিশেষ করে ভারতের মত সাংস্কৃতিক বহুত্বতা (Cultural Plurality)-র দেশে মূল সংস্কৃতি ও উপজাতির মত প্রান্তিক সংস্কৃতির সহাবস্থান সাংস্কৃতিক আদান প্রদান (cultural exchange) এর ধারাকে সচল রাখে। ফলে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রবাহমানতা (continuity of cultural change) উপজাতি সমাজকে সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিচিতি (a social group in continuous transition) হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উপজাতির সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক ও

বহুত্মতা থাকলেও International Labour Organisation (ILO) তার 169th Conventijon, Article এ উপজাতি সম্পর্কে নিম্নেবর্ণিত সংজ্ঞা দিয়েছে—

Tribal people in independent countries are those whose social, cultural and economc conditions distinguish them from other sections of national community and whose statues is regulated wholely or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulation.

1989 এ ILO এই সংজ্ঞাটি রাষ্ট্র সংঘ United Nations Organization) ও গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে UNO তত্বাবধানে Human Rights Commission-এর দ্বারা গঠিত Working Group on Indigenous Population আরো বিস্তৃতভাবে উপজাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে নিম্ন লিখিতভাবে—

They are those tribal and semitribal papulation that are regarded as having their descent from the population which inhabited the country on the geographical region to which the country belongs, at the time of the conquest or colonized by Europe. They are in addition are also thoe who, irrespective of their legal status, live more in conformity with their social, economic and cultural institution than with the institute of nation to which they belong. অন্যদিকে Semi-tribal বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা are in the process of lessing their indentity but not yet integrated in the national community.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উপজাতি বা আদিবাসীর ধারণায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত আদিবাসীরা ঔপনিবেশিক শাসন বা বাইরের কোন শক্তির দ্বারা পরাজিত হওয়ার আগে থেকেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করছে। দ্বিতীয় বাইরের শক্তির কাছে পরাজিত বা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তারা প্রান্তি জনগোষ্ঠি (Marginalized communties) তে পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত এই সমস্ত জনগোষ্ঠীগুলি মূলত নিজেদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রথা সমূহের পরিচালিত ও নিমন্ত্রিত হয়।

৫.৩.২.৩ : ভারতের উপজাতি

ভারতের Anthropological survey of India তার 'People of India Project এর গবেষণায় মোট 461 টি সম্প্রদায়কে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। 1991 সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার 8.08% হল আদিবাসী জনগোষ্ঠী। 1971 ও 1981 সালে এদের জনসংখ্যা ছিল ভারতের মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে 6.94% ও 7.85%। এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ শুধুমাত্র উপজাতি জনগোষ্ঠির জন্মহার বৃদ্ধি বা মৃত্যুহার হ্রাসের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। এর সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি নতুন করে নিজেদের উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার আন্দোলন যাকে Re-tribalization হিসাবে চিহ্নিত করার যেতে পারে।

ভারতের কোন জনগোষ্ঠিকে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কতগুলো জটিলতা আছে। প্রথমত অর্থনৈতিক ভাবে এই জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রায় অদ্ভূত বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। এখানে শিকারী ও ফলমূল সংগ্রহকারী (hunters and Food gatherers) (জারওয়া, বিরহোর, চেঞ্চুর উপজাতির পাশাপাশি পশুপালনকারী

(গুজ্জর, বাফরওয়াল) ও জুমচাষী ও (Shifting cultivators) উত্তর-পূর্ব ভারত, দক্ষিণ উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়) রয়েছে। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উদ্ভাষিত জনগোষ্ঠি ও ব্যক্তিও রয়েছে। তাসত্ত্বেও ভারতের উপজাতি সমূহের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (১) অঞ্চলের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সংযোগ, (২) নির্দিষ্ট ভাষা, (৩) সাধারণ (simple) ও স্বয়; সম্পূর্ণ (self-sufficient) অর্থনীতি, ও (৪) প্রথাগত স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথা ইত্যাদি। তবে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন তথা বিশ্বায়নের প্রভাবে 'উপজাতিয় সমাজের পরিবর্তনও হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তাছাড়া আছে কতগুলি প্রথাগত শক্তি যা উপজাতি সমূহকে অ-উপজাতি স্বত্মায় (Non-tribal identity) পরিণত করেছে বা করে চলেছে যা পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হল।

৫.৩.২.৪ : উপজাতি থেকে অ-উপজাতি

উপজাতি সমূহের অ-উপজাতি স্বত্তায় রূপান্তরের প্রকৃয়া অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রবহমান যার প্রধান পরিচালিকা শক্তিসমূহ হল (ক) রাজনৈতিক (খ) আর্থ-সামাজিক (গ) সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। উপজাতিয় জনগোষ্ঠীর পরিচিতি পরিবর্তনের কারণ হিসাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অতি-প্রাচীন কাল থেকেই অত্যন্ত কার্যকরী। বিশেষ করে উপজাতি গোষ্ঠীর দ্বারা রাজ্য গঠন প্রকৃয়ায় (Stateformation process) উপজাতিয় স্বত্ত্বার অ-উপজাতিকরণে (Detribalization/nontri-tribalization) শক্তি সঞ্চার করেছিল। কারণ উপজাতিয় সমাজ পরিচালিত হয় মূলত গোষ্ঠীপতি বা Chief এর দ্বারা অন্যদিকে রাজগঠন প্রকৃয়ায় গোষ্ঠিপতি প্রকৃত শাসক বা রাজায় পরিণত হতেন। রাজা এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়ে আলাদা স্বত্ত্বায় পরিণত হতেন। রাজার শাসনকে বৈধতা প্রদান (Legitimacy) করার জন্য অ-উপজাতীয়সুলভ সামাজিক আচার-আচরণ তথা উপাধি গ্রহণ করতেন রাজা। এক্ষেত্রে রূপ কুমার বর্মনের গবেষণা মূলক গ্রন্থ Form Tribalism to State : Reflection on the Emergence of Koch kingdom (Delhi, 2007) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে লক্ষ্য করা যায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে উত্তর পূর্বভারতের বিভিন্ন উপজাতি (বিশেষ করে কোচ্, মেচ্, আহোম, মণিপুরী, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরি প্রভৃতি) রাজ্যগঠন প্রক্রিয়াকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য অ-উপজাতিয় আচার আচরণ বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। সুরজিত সিনহার গবেষণাতেও (Tribal Polities and State System of Eastern and North Eastern India, 1987) অনুরূপ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারত ছাড়াও ছোটনাগপুর অঞ্চলেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উপজাতি সমূহের দ্বারা নতুন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারাও অ-উপজাতি করণ ঘটেছে ভারতের ক্ষেত্রে। মূলত Simple mode of production এর উপর নির্ভরশীল উপজাতি সমাজের অর্থনীতি (যা অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম নয়) জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা তথা নতুন উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি (Technique and Technology) গ্রহণ করার মাধ্যমে উপজাতির অর্থনৈতিক অ-উপজাতীয়করণ ঘটে। তাছাড়া বাজার অর্থনীতির প্রবেশ ভারতীয় উপজাতি সমূহকে-অউপজাতিয় স্বত্ত্বায় রূপান্তরিত করেছে দ্রুতগতিতে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে এই প্রকৃয়া অতিদ্রুত ধাবমান হতে থাকে।

তাছাড়া উপজাতি সমূহের দ্বারা সংগঠিত ধর্মীয় ও ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করার প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় ঔপনিবেশিক আমল থেকে। হিন্দুয়ায়ন, সংস্কৃতায়ন বা খৃষ্টানায়ন প্রকৃয়া উপজাতি সমূহের ধর্মীয় ধ্যান

ধারণার বিশেষ পরিবর্তন ঘটায়। তাছাড়া ভারতের জাতি গঠন প্রকৃয়ায়ও (Nation building process) পরোক্ষভাবে উপজাতি সমূহের ভাষা সংস্কৃতির পরিবর্তনে সহযোগী হয়েছে।

৫.৩.২.৫ : পুন : উপজাতিকরণ (RE-TRIBALIZATION)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 1971 সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার 6.94% ছিল উপজাতি যা শতাংশের হিসাবে 1991 সালে বৃদ্ধি পেয়ে দ্বারায় 8.08% এ। অর্থাৎ ভারতের উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাধারণ ব্যাখ্যা হল তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) হিসাবে সংরক্ষণ (Resrvation) অর্থাৎ সরকারী চাকরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক পক্ষপাতিত্ব (Posititive discrimation) এর ব্যবস্থা চালু করা ও একে চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু এটা অতিসরলীকৃত ধারণা। এর পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি হল ভারতীয় উপজাতি সমূহের মধ্যে আত্মচেতনা (Self consciousness)-র বিকাশ। আত্মচেতনা বিকাশের সবচেয়ে উল্লেখ ক্ষেত্রগুলো হল ভারতের বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে তাদের অবস্থান ও পরিচিতির নির্মাণ।

পরিচিতি নির্মাণের প্রধান চালিকা শক্তি হল উপজাতি সমূহের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার। মূলক ঔপনিবেশিক আমল থেকে শিক্ষা বিস্তারের একটা সদর্থক প্রভাব ভারতীয় উপজাতি সমূহের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যদিও ঔপনিবেশিক শাসনে তাদের আলাদা ভাবে রাখার (Excluded) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্যায়ে উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন উপজাতি সমূহের মধ্যে নিজস্ব পরিচিত নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাদের কতগুলি সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে Naga Nationalist council (NNC, 1946), Mizo National Famine Front (MNFF, 1946), Garo National Council (GNC, 1946), United Mizo Freedom Organization UMFO, 1946), Adivasi Mahasaebha (1939), ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। স্বাধীনোত্তর কালে এই রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ নানাবিধ বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার অর্জনের আন্দোলনকে বিকশিত করে। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি সমূহের জন্য পৃথক রাজ্য (separatio sate) বা সায়ত্বশাসিত পরিষদ গঠন করার সাফল্য অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু উপজাতিগুলিকেও উপজাতি-পরিচিতির নির্মাণ ও সুদৃঢ় করেন (structural integration) উৎসাহিত করে। ফলে ভাষা বা সংস্কৃতির পরিচিতির বিষয়টিকে সামনে রেখে উপজাতি সমূহের মধ্যে পুনঃ উপজাতিকরণ ভাবনা (Re-tribalization)-র বিকাশ ঘটতে থাকে। উদাহরণ হিসাবে নাগল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় রাজ্য বা কাবি অংলং স্বায়ত্বশাসিত পরিষদের কথা বলা যেতে পারে যা Badaland Territorial Council, Darjeeling Hill Council ঝাড়খণ্ড রাজ্য (২০০০) গঠনের আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল।

তবে উপজাতি পরিচিতি নির্মাণের সবচেয়ে বড় বাধা হল কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্নতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় উপজাতি সমূহের সাধারণ বৈশিষ্টের অন্যতম হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে উপজাতির সংযোগ। কিন্তু সংযোগ বিচ্ছিন্নতা পরিচিতি নির্মাণের প্রকৃয়াকে লংঘিত করে। ঔপনিবেশিক আমলে ব্যপক হারে ঝাড়খণ্ডের উপজাতি সমূহের স্থানান্তর করণ বর্তমানে ঝাড়খণ্ডী উপজাতি সমূহের Integrated Identity-র ভাবনাকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

তাছাড়া 'উপজাতি পরিচিতি' বা ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোরম মধ্যে 'উপজাতি পরিচিতি' হিসাবে তাদের অবস্থান উপজাতিদের আত্মচেতনার ফসল নয়। Virginiusxaxa-র মতে-The designation or description of tribes as indigenous people had not emerged from self identification. Or description by the tribal people themselves. It was not a part of positive identification and evaluation by the tribes. Rather the outsiders had imposed it on the tribes. তবে 1993 সালকে আন্তজাতিক আদিবাসী বর্ষ (International year of the Indigenous people) হিসাবে ঘোষণা করা ও উপজাতি সমূহকে আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে উপজাতি পরিচিতি এখন আর সামাজিকভাবে নীচু মাণের পরিচিত (lowly or inferior idnetity) নয়।

তাই উপজাতি হিসাবে নিজেদের পরিচিত করার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একসময় যারা সাংস্কৃত্যায়ন প্রকৃয়ার মাধ্যমে নিজেদের উপজাতি থেকে জাতিতে (From tribe to caste) পরিণত করে তারা পুনরায় নিজেদের উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। উদাহরণ হিসাবে উত্তরবঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতের কোচ রাজবংশীদের কথা বলা যেতে পারে যারা রাজ্য গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতিতে (caste) পরিণতি হয়েছিল তারা এখন তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। Scheduled Tribe হিসাবে সংরক্ষণের সুবিধাও এতে ইন্ধন যুগিয়েছে। এক্ষেত্রে 2007 সালের রাজস্থানের গুজ্জরদের আন্দোলন উল্লেখ্যনীয়।

৫.৩.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (SUGGESTED READINGS)

1. Barman, Rupkumar : From Tribalism to State : Reflections on the Emergence of the Koch kingdom (Delhi, Abhijeet Publication, 2007)

2. Barman, Rup Kumar : Contented Regionalism (Delhi, Abhijeet Publication, 2007)

3. Bara Joseph (ed) : Ordeals and vocies of the Indigenous Tribal People of India. (Guwahati, Indian Confederation of Indigenous and tribal People, 2006)

4. Betteills, A. : The concept of Tribe with Special References to India, European Journal Sociology, Vol 27, 1986.

5. Roy Burman : Transformation of tribes and Analogous Social Formation, EPW 1983.

6. Sinha Surajit (ed) : Tribal Politics and State System of Eastern and North Eastern India, (Calcutta, Centre for Social Science Research, 1987).

৫.৩.২.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (ASSIGNMENTS)

১। উপজাতির ধারণা ব্যাখ্যা করেন।

২। উপজাতি থেকে অ-উপজাতি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। পুনঃ উপজাতিকরন প্রক্রিয়ার শক্তি সমূহকে চিহ্নিত করুন।

পর্যায় গ্রন্থ-২
Spiritual and material culture
একক-৪, ৫
পঞ্চম পত্র (পছন্দসই পত্র)

বিন্যাস ক্রম :

৫.২.৪.১ : সূচনা

৫.২.৪.২ : ভারতীয় ধর্মে চিরাচরিত ধারা

৫.২.৪.৩ : ভারতীয় ধর্মে চিন্তায় আদিমতম বস্তুবাদীধারা

৫.২.৪.৪ : বুদ্ধের সমসাময়িক বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব

৫.২.৫.৫ : আজীবক ধর্মমত

৫.২.৫.৬ : জৈন ধর্ম

৫.২.৫.৭ : বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

৫.২.৫.৮ : বৈষ্ণবধর্ম

৫.২.৫.৯ : সুফীবাদ

৫.২.৫.১০ : উপসংহার

৫.২.৫.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.২.৫.১২ : সম্ভাব্য গ্রন্থাবলী

৫.২.৪.১ : সূচনা

বর্তমান পর্যায়টি ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বিবিধতার সম্পর্কে অবগত করাবে। ভারতীয় ধর্মীয় তত্ত্বের মধ্যে ভিন্ন মতে প্রাচুর্য্য এবং সেই সংক্রান্ত চিন্তাধারা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাশাপাশি বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির সমান্তরাল চিন্তাধারা রূপে বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক ধর্মমতের উদ্ভব ও বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২.৪.২ : ভারতীয় ধর্মে চিরাচরিত ধারা

ভারতীয় ধর্মে চিরাচরিত ধারা-ভারতীয় ধর্মীয় বিস্তার চিরাচরিত ধারার বৈদিক যজ্ঞ কেন্দ্রিক ধর্মের উদ্ভব ও তৎ সংক্রান্ত বিষয় সমূহের গভীর উপস্থিতি দেখা যায়। ঋগ্বৈদিক সময়কাল থেকে বিমূর্ত প্রাকৃতিক শক্তি

সমূহকে দেবতাজ্ঞানে পূজা এবং এই সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্য করে সরল যজ্ঞানুষ্ঠানের উপস্থিতি ঋগবৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে যজ্ঞানুষ্ঠান জটিল আকার ধারণ করতে শুরু করে। সেখানে গৃহে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের তুলায় শ্রৌতযজ্ঞ গুলি অর্থাৎ বৃহৎ আকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে বেশি প্রাধান্য পেতে শুরু হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে যজ্ঞের নিয়মাবলীকে সুসংহত করবার জন্য নতুন ধর্মীয় শাস্ত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এর ফলে ক্রমশ রচনা হয় সামবেদ, যর্জুবেদ ও ব্রাহ্মণশাস্ত্রগুলি। যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বানের রীতি প্রচলিত হতে থাকে।

নতুন যজ্ঞকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতদের গুরুত্ব পরবর্তী বৈদিক সময় থেকে বৃদ্ধি পেতে শুরু হয়। 'প্রার্থনা'র ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে তাঁকে 'বাচ', 'ব্রহ্মণস্পতি' নামে উপাসনা করা হয়। পাশাপাশি যজ্ঞের কার্যের বিভাগ হেতু চারধরনের পুরোহিতের অবতারনা হয়। যথা-(১) হোতৃ (যিনি স্তুতির মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান করতেন (২) উদগাত্রী (যিনি সামগান করতেন) (৩) অধ্বর্য' (যিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদনা করতেন) (৪) ব্রাহ্মণ (যিনি যজ্ঞের নিয়মাবলীর ওপর নজর রাখতেন) এছাড়া ঋত্বিজ শ্রেণীর পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল অগ্রগন্য। যজ্ঞের এই জটিলতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে A.L. Basam বলেছেন 'Performance of rituals itself acuqired greater prominace than the ideas behind them. The priests made it so in order to establish their prominance in the Aryan Social order''

এইভাবে যজ্ঞের অর্ন্তনিহিত অর্থ প্রাধান্য হারিয়ে যজ্ঞ কেন্দ্রিক আচার বড় হয়ে দাঁড়াতে থাকে। এর সাথে সাথে যজ্ঞ পদ্ধতি বিধি নিষেধের কড়াকাড়ি দেখা যায়। যর্জুবেদ সংহিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ঋষিদের যজ্ঞ পদ্ধতির বিভিন্নতাকে কাটিয়ে ওঠে। এই সংকলন গুলির মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি যজ্ঞগুলির রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতীকরূপে পরিকল্পিত হতে শুরু করে। রাজসূয়, অশ্বমেধ, রাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞগুলি রাজার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীকরূপে পরিগণিত হতে শুরু করে। পাশাপাশি ক্ষেত্রে পরজন্ম ও কর্মফলবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্ত বিষয়ের পাশাপাশি মানবজীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ চতুবর্গের কথা উল্লিখিত হতে দেখা যায়। এই চতুবর্গ ছিল (১) ধর্ম (২) অর্থ (৩) কাম (৪) মোক্ষ। অর্থাৎ ধর্মপালন সৎভাবে/সদুপায়ে অর্থ উপার্জন, নিজের জাগতিক কামনা পূরণ ও ঈশ্বরসাধনার মাধ্যমে মুক্তিলাভ। কিন্তু চিরাচরিত উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও আড়ম্বরপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের বিপরীতে ক্রমশ দার্শনিক চিন্তাভাবনার উন্মেষ দেখা দিতে থাকে।

সামাজিক পরিস্থিতিও ক্রমশ জটিল ও কঠোর আকার ধারণ করে। চতুবর্ণ প্রথা কঠোরতর হয়। ব্রাহ্মণ চরিত্রদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বৈশ্যরা দ্বিজ পর্যায়ভুক্ত হলেও তাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনমন হয়েছিল। অন্যদিকে শূদ্রদের অবস্থান ছিল নিম্নতম। তাদের প্রতি উচ্চবর্ণের অবহেলা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনে বৈশ্য ও শূদ্র সমাজে একটা বড় অংশ সামিল হয়েছিল।

এমন পরিস্থিতিতে চিরাচরিত ভাববাদী এবং ঈশ্বর উপাসক ধর্মীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিপরীতধর্মী চিন্তাভাবনার ক্রমশ উদ্ভব ও বিকাশ লক্ষ্য করা যেতে থাকে। ঔপনিষদিকে চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণরূপে বেদ বিরোধী না হলেও এর মধ্যে কিন্তু চিরাচরিত যজ্ঞকেন্দ্রিক আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মের বিপরীতে একেশ্বরবাদী দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ লক্ষ্য

করা যেতে থাকে। এইভাবেই চিরাচরিত ধারা বর্তমান থেকে ও সমান্তরালভাবে contradiction এবং conflict এর ধারা দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভূত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫.২.৩.৩ : ভারতীয় ধর্ম চিন্তায় আদিতম বস্তুবাদী ধারণার বিবরণ

চিন্তায় শক্তি ও অনুসন্ধানের প্রকৃতি এই দুটি বিশেষগুণ মানব সমাজকে প্রাণীকুলের মধ্যে অনন্য স্থান প্রদান করেছে। প্রাচীনতম যুগ থেকে যে চিন্তা মানবসমাজকে ভাবিত করেছে তা হল এই জগতের উৎপত্তির কারণ কি? এই কারণ সন্ধানে যে দুটি দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে **ভাববাদ** যেখানে একজন পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তিনিই সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করে। অন্যদিকে এই চিন্তার বিপরীতে চিন্তা করে বস্তুবাদ মনে করে সমস্ত কিছুর উদ্ভব বস্তু থেকেই হয়েছে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যা কিছু তাই সত্য এবং বাস্তব। তারা আত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক জনের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা হল ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন মূলত ভাববাদ কেন্দ্রিক কিন্তু সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতে বস্তুবাদে একটি প্রাগ-ইতিহাস আছে। বিভিন্ন সাহিত্য সূত্র অনুসন্ধান করতে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার মধ্যে চিরাচরিত চিন্তাধারার বিপরীতে বেশ কিছু বস্তুবাদী চিন্তার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মূলত ভারতীয় ভাববাদ, অর্থাৎ যাগজজ্ঞ, দান, প্রভৃতির মাধ্যমে সঞ্চিত পুণ্য আত্মাকে মোক্ষ প্রদান করে এই রূপ ধারণার প্রতিপক্ষ হিসাবে ভারতে আদি বস্তুবাদী ধারণার উদ্ভব হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে আদিমতম সাহিত্যিক উপাদান থেকে সংশয়বাদের ধারণা পাওয়া যায়। সংশয়বাদ সর্বসময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। এর মধ্যে চিরাচরিত শিক্ষা ও বেদের অভ্রান্ততার বিষয়ে সংশয়ের প্রকাশ ঘটেছে। ঋগ্বেদের মধ্যে এর প্রাথমিক আভাস লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎস, প্রাণের উৎস নিয়ে সন্দেহের বর্ণনা আছে। দশম মন্ডলের ১২৯ সূক্ত প্রশ্ন তুলেছে সৃষ্টির পূর্বে কি অবস্থা ছিল তা কে জানে? এবং কে বলতে পারে? আরো বলা হয়েছে যিনি পরমধানে প্রভুস্বরূপ আছেন তিনি এ বিষয়ে জানতে পারেন আবার না ও পারেন। এই সূক্ত অনুযায়ী দেবতার সৃষ্টির পরে এসেছেন। এবং এই সূক্তে অবিদ্যমান বস্তু থেকে বিদ্যমান বস্তুর উদ্ভবের বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে। আবার একই মন্ডলে ৬৪ সূক্তে বলা হয়েছে কে আমাদের কৃপা করেন? কে সুখ বিধান করেন? কেই বা রক্ষা করতে আমাদের কাছে আসেন। এই সমস্ত সূক্ত গুলিতে আদি সংশয়বাদ প্রকাশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে বাস্তবধর্মী উপায়ে চিন্তার প্রয়াস করেছে।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অন্যতম মূল ভিত্তি হল উপনিষদ। উপনিষদে মূলত ভাববাদী চিন্তাব প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বৃহপারন্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন দেবতারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা গূঢ় রহস্য পছন্দ করেন। উপনিষদের প্রকৃত জ্ঞান হল আত্মণ ও ব্রহ্মণ এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা, এর মধ্যে ভাববাদী চিন্তার প্রতিফলন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপনিষদের চিন্তার মধ্যে ফল্গুধারার ন্যায় বস্তুবাদী চিন্তা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায় উদ্দালক আরুনির কাহিনী থেকে যাকে Herman Jacobei আদিমবস্তুবাদ (archaic materialism) বলে অভিহিত করেছেন। P.C. Chatterjee মনে করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা জড়বাদী চিন্তা উদ্দালক আরুনীর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তাঁর মতবাদের মধ্যে

একধরনের প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরোধী মতাদর্শ পাওয়া যায়। উদ্দালক আরুনী জড়বাদী চিন্তার সূত্রপাত করেন। মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি নির্দিষ্ট তার্কিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন। সেই পদ্ধতির প্রাথমিক শর্তছিল প্রত্যক্ষণ (direct observation) কার্য কারণ সম্পর্ক (notion of causality), পরীক্ষণ (exmination)। উপনিষদের যুগে অবস্থান করে উদ্দালক সৃষ্টির প্রথম কারণটিকে নির্দেশ করেছেন। 'সৎ' (বিশুদ্ধ বস্তু) হিসাবে। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন এই সৎ হল অবিকশিত পদার্থ। উদ্দালক আরুনির মতে এই সৎ থেকে তিনটি মৌলিক পদার্থ বিকশিত হয়। এই তিনটি মৌলিক পদার্থ হল উত্তাপ, জল ও খাদ্যবস্তু। এই তিনটি বস্তু থেকে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। মনের ও উদ্ভব বস্তুতেই নিহিত। তাঁর মধ্যে তাপ বা উত্তাপ জল ও খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে। জল থেকে আসে প্রাণ এবং খাদ্য থেকে আসে মন। এই তিনটি বিষয় প্রমাণ করতে তার বেদজ্ঞ পুত্র শ্বেতকেতুর ওপর একটি পরীক্ষণ করেন। সেখানে কিছুদিন পুত্রকে খাদ্য বা জলপান করতে না দিয়ে বেদপাঠ করতে নির্দেশ দিলে শ্বেতকেতু বেদপাঠে অসমর্থ হন। যা দ্বারা উদ্দালক প্রমাণ করে খাদ্য ও জল ব্যতীত মনও প্রাণ ধারণ করা সম্ভব নয়। আবার একটি বটগাছের বীজের ক্ষুদ্রতম কনার মধ্যে সমগ্র গাছের গুণ লুকিয়ে আছে তা ব্যাখ্যা করার মধ্যে বস্তু জগতে পরমাণুর ধারণ প্রকাশ পায়। পরীক্ষণের মধ্যে নতুন ধারণা প্রকাশিত হয়।

তবে উদ্দালক আরুনির মত আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত নিজস্ব চিন্তাভাবনার কিছু অভিমত প্রদান করলেও সরাসরি উপনিষদের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। এই সময়ে প্রধানত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দীতে রাজতন্ত্র শক্তিশালী হবার ফলে কুরু পাঞ্চাল রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই রাজ্যগুলি পূর্বে পুরোহিতদের উপর নির্ভরশীল হলেও পরে ব্রাহ্মণদের থেকে স্বতন্ত্র হতে চায় এর ফলে তাদের মধ্যে কিছু বস্তুবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। আবার উপনিষদে কিছু অংশে বলা হয়েছে যে উপনিষদের দর্শন ব্রাহ্মণের পূর্বে রাজারা জানত। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন দ্বিতীয় নগরায়ণের সময় ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে বিভাজন হয়। এবং অনেক আদিম বস্তুবাদী ধারণা ব্রাহ্মণ্যদর্শনে স্থান পায়। উদ্দালক আরুনির সৎ পদার্থ ব্রহ্মনের একটি রূপ হিসাবে পরিগণিত হয়।

এছাড়াও অন্য উপনিষদের মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তাধারারও প্রকাশ পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে জগৎকারণ হিসাবে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণারূপে কাল, স্বভাব, নিয়তি, সদৃচ্ছা ও ভূতালি এই সাতটি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার উপনিষদের যুগে পরলোক অবিশ্বাসী মানুষজনের অস্তিত্বের প্রমাণ উপনিষদের যমের উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থ দীর্ঘনিকায়ের সামঞ্ঞফল সুত্তে বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন দার্শনিকের মধ্যে অন্যতম অজিত কেশকম্বলী মতবাদ পর্যালোচনা করলে তার মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাবতই তাঁর মতবাদ বেদবিরোধিতা করে। সমস্ত ভাববাদী দর্শনের মূল কেন্দ্র পরজন্ম এবং কর্মফলবাদকে অজিত কেশকম্বলী নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তার মতে এই জগৎ থেকে পরলোকে যাওয়া ঘটে না কারণ পরলোক বলে কিছু নেই। আত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব নেই। তেমনি যাগযজ্ঞ দান, পিতামাতার সেবা করলে কোন পারলৌকিক পুণ্য হয় না। তিনি মনে করেন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সঠিক পথ অনুসরণ করেননি। যারা পরলোক বিষয়ে অবহিত দাবী করেন তাদের কোন জ্ঞান নেই। মানুষ ৪টি মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত। যে মারা গেলে শরীর এবং মন এই

উপাদান সমূহ অর্থাৎ ভূমি, জল, বায়ু ও অগ্নিতে বিলীন হয়ে যায়, তবে উল্লেখ্য এই যে ব্রাহ্মণ্যধারা পঞ্চম মহাভূত ব্যোম এখানে অনুপস্থিত হয় শরীর মরে গেলে জ্ঞানী অজ্ঞানীর একই গতি হয়। অজিত কেশকম্বলীর বক্তব্য থেকে ধর্মীয় পরিসরের বাইরে কিছু বক্তব্য পাওয়া গেল যাকে বস্তুবাদের স্তম্ভ রূপে গ্রহণ করা হয়। যেমন (১) বেদঅপ্রামান্যবাদ অর্থাৎ বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করা। (২) নিরীশ্বরবাদ (ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার)। (৩) পরলোক বিলোপবাদ-অর্থাৎ পরলোকে অবিশ্বাস। (৪) ভূতচৈতন্যবাদ অর্থাৎ ভূত ও পদার্থ থেকেই প্রাণ ও চেতনার উৎপত্তি পরে যা লোকায়েতের মদ্যে বিকাশ লাভ করে। (৫) প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদ-অর্থাৎ যে কোন তত্ত্বকে প্রত্যয়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা। তবে এক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ অনুমান গ্রহণযোগ্য হবে।

বস্তুবাদীদের উদ্দেশ্য বহুল ব্যবহৃত 'চার্বাক' বা 'লোকায়াত' নামটির উল্লেখ পালি ও জৈনসূত্রে এবং মহাভারতে পাওয়া যায়। মহাভারতে চার্বাক দুর্যোধনের চিত্র ব্রাহ্মণবেশী রাক্ষস তিনি যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতি হত্যার জন্য অপমান করেন এবং অতঃপর ব্রহ্মশাপে নিহত হন। এখানে চার্বাক বা বস্তুবাদী এরুপ কোন অভিমত প্রদান করা হয়নি। পালি সাহিত্যও জৈনসূত্রে লোকায়ত শব্দটি বেদ বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। মহাভারতে কম্বমুনির আশ্রমের উপাখ্যানে 'লোকায়তিক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে তারা বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে এখানেও তাদের বস্তুবাদী বলা হয়নি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মনে করেন মহাভারত ও 'লোকায়তিক' বা 'লোকায়ত' বলছে ন্যায়শাস্ত্রকে ধরা হয়েছে। একদম প্রাচীনতম পর্যায়ে বস্তুবাদের পৃথক বিকাশ হয়নি। ব্রাহ্মণ্য পরিসরের অর্ন্তগত নৈয়ায়িক শাখা। কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্রেও লোকায়ত দের বস্তুবাদী অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। একথা মনে করা যায় যে ন্যায়শাস্ত্র ও বস্তুবাদ উভয়েই। Logic বা যুক্তিনির্ভর তাই ন্যায়শাস্ত্র থেকে বস্তুবাদের পৃথকীকরণ হওয়া সম্ভব।

পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের অভিধান ও অট্ত কথায় লোকায়ত শব্দের অর্থ হল 'বিতন্ডাশাস্ত্র' তাই মনে করা হয় লোকায়তে আদিতে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বৈসায়িকদের মধ্যে এরধরনের কার্য কারণ সম্পর্কে ধারণা ছিল। তাদের উদ্দেশ্যেই লোকায়ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অতঃপর যেখান থেকে একটি শাখা তর্ক সর্বস্ব বা pure logic আশ্রয় করে ন্যায় শাখায় পরিনত হয় এবং অপর একটি ধারা লোকায়ত নামে বস্তু, বর্হিজগৎ এবং পদার্থ নিয়ে যুক্ত হয়ে পড়ে। তবে উভয়ই যুক্তির ওপর বিশ্বাস করতেন। এ থেকে দেখা যায় যে সরাসরি বস্তুবাদ বলতে যা বোঝায় তার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া গেল না।

রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডে জাবালি উপাখ্যানে কিছু বস্তুবাদী চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। রামের বনে গমণের প্রাক্কালে জাবালি রামকে প্রতিনিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই, মৃত্যুর পর কেই অবশিষ্ট থাকে না। রামায়নের গৌড়ীয় পাঠে এই উপাখ্যান বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়। জাবালি বলেছেন দশরথ ও রাম পৃথক, মৃত দশরথ রামকে তিরস্কার করতে অসমর্থ। পিতৃপুরুষ মারা গেলে শ্রাদ্ধ করা হলে তাতে অন্নের অপচয় হয়। কারণ মৃত্যুর পর কিছু অবশিষ্ট থাকে না অন্যের ভুক্ত দ্রব্য কখনোই পিতৃশরীরে যেতে পারে না দেবপূজা, দান, দীক্ষা, ব্রত, গৃহত্যাগ পন্ডিতদের প্রবর্তিত। প্রত্যক্ষই প্রমাণ, পরলোক প্রত্যক্ষ করা যায় না তাই পরলোক নেই। তবে রাম ও অন্য ব্রাহ্মণরা তাকে তিরস্কার করেন। তবে এথেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সেই সময়ে এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল যার ফলে রামায়ণে এই উপাখ্যানের উপস্থাপনা করে সেটিকে নস্যাৎ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

উপরোক্ত বিভিন্ন সাহিত্য সূত্রের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে এই ধারণা করা যায় যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় দীর্ঘদিন ধরেই বস্তুবাদী চিন্তার বিক্ষিপ্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সুসংহত প্রতিষ্ঠিত না হলেও মূল দার্শনিক চিন্তার সমান্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রাথমিক চিন্তা থেকে বিভিন্ন প্রতিবাদী ধর্ম সমূহ তাদের কিছু উপাদান গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ও জৈনরা যেমন বেদ অপ্রমান্যবাদে বিশ্বাস করতেন। তবে এইভাবে আদিবস্তুবাদী চিন্তা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত ও গৃহীত হয়।

৩.২.৩.৪ : বুদ্ধের আর্বিভাবের পূর্ববর্তী সময়ে দার্শনিক তত্ত্ব

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্ব ও মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। তার মধ্যে যেমন বৈদিক যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মতত্ত্বছিল। তেমনি ছিল উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব, যেখানে এক ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে কল্পনার প্রবনতা দেখা যায়। তেমনই চিরাচরিত চিন্তাভাবনার বিপরীতে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ আছে।

জৈন গ্রন্থ সমূহে মহাবীরের সমকালীন ৩৬৩টি দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ আছে। যে গুলিকে চারটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) ক্রিয়াবাদ (২) অক্রিয়াবাদ (৩) অজ্ঞানবাদ ও (৪) বিনয়বাদ।

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব মনে করে দুঃখ ব্যক্তির নিজেদের সৃষ্ট, সেখানে বাইরের শক্তির কোনরকম ভূমিকা নেই। মূর্খব্যক্তিরা অসৎ কর্মের সংক্রমন আটকাতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানীরা সেটা পারে, ক্রিয়াবাদ ১৮০ রকম প্রকার-ভেদের হয়।

অক্রিয়বাদী তত্ত্ব অনুসারে কর্মের কোন ফল নেই, যাবতীয় মানবিক প্রচেষ্টাই নিস্ফল। এরা প্রায় ৮৪ প্রকার।

অজ্ঞানবাদী তত্ত্ব অনুসারে তারা কোন প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকত। ৬৭ প্রকারের অজ্ঞানবাদী পাওয়া যায়।

বিষয়বাদী গণ কিছু নৈতিক অনুশাসন মেনে চলতেন, যদিও যেগুলির তাৎপর্য বুঝত না। বিনয়বাদ ৩২ রকম ছিল।

বৌদ্ধগ্রন্থ সাম্ঞ্ঞফল সূত্তে বুদ্ধের সমসাময়িক সময় কিছু দার্শনিক তত্ত্বের হদিশ পাওয়া যায়। মহারাজ অজাতশত্রুর দরবারে তাত্ত্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই তাত্ত্বিকদের অবতারনা হয়েছে। তাদের মধ্যে অজিত কেশকম্বলীর উল্লেখ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ব্যাতীত আরো কয়েকজন দার্শনিকের কথা এই গ্রন্থ সমূহে প্রাপ্ত হয়।

পূরণকশ্যপ : আচার্য পূরণ কশ্যপ ছিলেন অক্রিয়াবাদী দার্শনিক। তিনি মনে করতেন চুরি, অঙ্গহানি, মিথ্যা ভাষণ, প্রাণী হত্যা প্রভৃতি নেতিবাচক কর্মে কোনরূপ পাপ হয় না। আবার দান, যজ্ঞ যম, সংযম, সত্যবাক্য প্রভৃতি কোন রকম পুণ্য প্রাপ্ত হয় না। অনেকে তাকে আজীবিকদের একজন প্রথম দিকের আচার্য ও গোশালের পূর্বসুরী মনে করেন।

পকুধ কচ্চায়ন ঃ পকুধ কচ্চায়ন নির্ধারনবাদী দার্শনিক। তার মতে সাতটি বস্তুদ্বারা জগৎ নির্মিত হয়েছে। এই সাত বস্তু গতিহীন, বিকারহীন, বিরোধশূন্য, পরস্পরের সুখ বা দুঃখ বিধানে পর্যাপ্ত নয়। এই সাতবস্তুর হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ, এবং জীব। তাই কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে না, কারণ মৃত্যু এই সাতটি উপাদানের রূপ পরিবর্তন মাত্র। এই হন্তানাই, ঘাতয়িতা নাই, শ্রাবক নাই, শ্রাবয়িতা নেই। হত্যা করলে একটা উপাদানকে অন্য উপাদান রূপান্তর করা হয় মাত্র।

সঞ্জয় বেলট্টিপুত্ত ঃ অজ্ঞানবাদ ছিল সঞ্জয়ের দর্শনের বিষয়বস্তু তার মধ্যে পরম সত্য কোন দিনও জানা যাবে না। এমনকি এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মত দেওয়া যাবে না। সঞ্জয়ের মতবাদকে ইংরাজীতে secptism বা agnosticism বলে মনে করা হয়। সঞ্জয়কে পরলোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পরলোক আছে তিনি সেটাও বলেন না, আবার নেই সেটাও তিনি বলেন না। অর্থাৎ এই রকম বলা যেতে পারে যে প্রত্যক্ষণের বাইরে অথবা প্রমানিত সত্যের বাইরে কোন দার্শনিক প্রশ্নকে সঞ্জয় জানি না বলার পক্ষপাতী ছিলেন। সেক্ষেত্রে সেটা থাকলেও থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

এছাড়া উল্লিখিত অজিত কেশকম্বলী (অশ্বের লোম যার একমাত্র বস্ত্র) বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রচার করেছেন, যা পূর্বেই উল্লিখিত। এছাড়া মংখ লিপুত্ত গোশাল এবং নিগ্রন্থ নামপুত্ত (মহাবীর) এর কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এদের সম্পর্কিত আলোচনা যথাক্রমে আজীবিক ও জৈন ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনায় বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হবে। তবে উক্ত আলোচনায় এই বিষয়টি দেখা গেল যে প্রতিবাদী ধর্ম সম্প্রদায় সমূহ হঠাৎ করে উদ্ভূত হয়নি। ঈশ্বরবাদ এবং যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মের সমান্তরালে ভিন্ন দার্শনিক চিন্তার অবস্থান ছিল, যা গোশাল, মহাবীর এবং সর্বপরি গৌতমবুদ্ধের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছিল।

৫.২.৩.৫ : আজীবিক ধর্ম

আজীবিক একটি অন্যতম মুখ্য ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্ম ২০০০ বছর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল। মকখলি গোসালা এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

এই ধর্মের মূল বিষয় ছিল *নিয়তি অর্থাৎ ভাগ্য*। এই ধর্ম মতানুসারে নিযতি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোনো পৌরুষাকার একে পরিবর্তন করতে পারে না।

আজীবিক ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম। ছোট ছোট গোষ্ঠী হিসাবে এই ধর্ম অনেক আগে থেকে গাঙ্গেয় মগধ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মঙখলি গোসাল এদের একত্রিত করে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত করেন। গোসাল-এর আগে দুজন আজীবিক গুরু নন্দ বচ্চ আর কিস সংকিচ্চ নাম পাওয়া যায়। এবং গোসালা পরবর্তী যুগে পূরণ কাশ্যপ নাম পাওয়া যায়। রাজা বিম্বীসার আজীবিক ছিলেন। বাংলায় তাম্রলিপ্তে প্রচুর আজীবিক ছিলেন তা হিউয়েন সাং এর বিবরনে পাওয়া যায়। আরেকটি মতে সাত জন মুক্ত পুরুষের উল্লযখ পাওয়া যায়। এরা হলেন এনেজাগ্গা, মল্লরামা, মান্ডিয়া, রোহা, ভারাদায়ী, অর্জুন গয়ামপুত্র, মঙখলি গোসাল।

মৌর্য যুগে আজীবিকগণ সারা ভারতে ও সিংহলে প্রচার পায়। নাগার্জুন গুহায় প্রাপ্ত অশোকের শিলালিপি এই কথার ও সমাজে আজীবিকদের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ। চীনা বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতে প্রতিবাদী ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ পর আজীবকদের উল্লেখ আছে। এতেই বোঝা যায় তখন এই ধর্মের কিরকম বিস্তার ছিল। বরাহ মিহির তার গ্রন্থে আজীবিকদের জ্যোতিষ চর্চার উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে আজীবিকরা প্রায় চতুর্দশ শতাব্দী অবধি ছিল এর উল্লেখ মণিমেখলাই নামক তামিল পুস্তকে পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থে সর্বশেষ 1292 এ আজীবিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন উত্তর ভারতে তারা গুপ্ত সংস্থা তৈরী করে কোন রকমে টিকে ছিল। এবং ধর্মে তখন সম্পূর্ণ রূপে বিকৃত তন্ত্র, কালো যাদুর কবলে চলে গিয়েছিল।

৫.২.৩.৬ : জৈনধর্ম

জৈনধর্ম হল ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রাচীন ধর্ম। জৈনরা চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের জীবনীর মধ্য দিয়ে তাঁদের ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কন করেন। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, বর্তমান কালচক্রার্ধের (অপসর্পিণী যুগ) প্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভনাথ। সর্বশেষ দুই তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ (২৩শ তীর্থঙ্কর, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮৭২-৭৭২ অব্দ) ও মহাবীর (২৪শ তীর্থঙ্কর, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭ অব্দ) ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ সম্পর্কে সীমিত ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। কিংবদন্তি অনুসারে, তিনি ছিলেন কৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা। জৈনধর্ম হল চিরস্থায়িত্বের দর্শন। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের ধর্ম হল একটি চিরস্থায়ী ধর্ম। হেইনরিক জিমারের মতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ সহস্রাব্দেও জৈনধর্মের অস্তিত্ব ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় পরবর্তী প্রস্তরযুগীয় একাধিক বৃহদাকার শহরের ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীগুলি পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

ড. বিলাস এ. সাংভি, চম্পৎ রাই জৈন, অধ্যাপক জর্জ বুলার, হারমান জেকবি, ড. হরনেল, পণ্ডিত সুখলাল সাংভি, অধ্যাপক বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্যরা বিশ্বাস করেন যে, জৈনধর্মই ভারতের প্রাচীনতম বিদিত ধর্মবিশ্বাস এবং সিন্ধু উপত্যকায় এই ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাঁদের মতে, হরপ্পায় খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত 'কায়োৎসর্গ' ভঙ্গিমার নগ্ন পুরুষমূর্তি, 'পদ্মাসন' ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট মূর্তি, সর্পমস্তক মূর্তি এবং ঋষভনাথের বৃষ প্রতীক জৈনধর্মের পরিচায়ক।

মহাবীর (Mahavira) হলেন ২৪শ তথা সর্বশেষ জৈন তীর্থঙ্কর (শিক্ষক দেবতা)। তিনি **বর্ধমান** নামেও পরিচিত। মহাবীরকেই সাধারণত জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। যদিও ২৩শ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেই বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে অধুনা ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৩০ বছর বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন এবং বস্ত্র সহ যাবতীয় জাগতিক সম্পত্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবর্তী সাড়ে বারো বছর মহাবীর গভীর ধ্যান অনুশীলন করেন এবং কঠোর তপস্যা করেন। এরপর তিনি 'কেবলী' (সর্বজ্ঞ) হন।

পরবর্তী ৩০ বছর তিনি জৈন দর্শন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া পরিভ্রমণ করেন। মহাবীর জীবনের মান উন্নত করার জন্য 'অহিংসা' (প্রত্যেক জীবের প্রতি কায়মনোবাক্যে হিংসা বর্জন), 'সত্য' (কার্যে ও বাক্যে সত্যাচরণ), 'অস্তেয়' (চুরি না করা), 'ব্রহ্মচর্য' (ইন্দ্রিয়-সংযম) ও 'অপরিগ্রহ' (সংসারে অনাসক্তি)— এই পাঁচটি ব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা শিক্ষা দেন। মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম স্বামী (ইন্দ্রভূতি গৌতম) তাঁর উপদেশগুলি সংকলিত করেন। এগুলিকে *আগম* বলা হয়। এই *আগমগ্রন্থগুলির* অধিকাংশই আজ আর পাওয়া যায় না। জৈনরা বিশ্বাস করেন, মহাবীর ৭২ বছর বয়সে (জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি) লাভ করেছিলেন।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে এক দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই সময় আচার্য ভদ্রবাহু দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কর্ণাটক অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। ভদ্রবাহুর শিষ্য স্থূলভদ্র মগধে থেকে যান। ভদ্রবাহুর অনুগামীরা মগধে প্রত্যাবর্তন করলে অঙ্গ শাস্ত্রের প্রামাণিকতাকে কেন্দ্র করে স্থূলভদ্র ও তাঁদের মধ্যে বিবাদ বাধে। এছাড়া মগধবাসী জৈনেরা সেই সময় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতে শুরু করেছিলেন। ভদ্রবাহুর অনুগামীদের কাছে এটি গ্রহণীয় ছিল না। তাঁদের মতে, নগ্ন থাকাই ছিল জৈন শাস্ত্রানুমোদিত বিধি। এইভাবে জৈন সমাজ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দিগম্বর জৈনরা নগ্ন অবস্থায় থাকতেন এবং শ্বেতাম্বর জৈনরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতেন। দিগম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করাকে জৈন মতবিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করতেন। তাঁদের মতে, জৈন মতবাদ অনুসারে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় জীবনযাপন করতে হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়ের দাবি, তাঁরাই প্রাচীন শ্রমণপ্রথাটিকে সংরক্ষণ করছেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর গ্রিক নথিতে যে 'জিমনোসোফিস্ট'দের (নগ্ন দার্শনিক) উপস্থিতির কথা জানা যায়, তার থেকে দিগম্বর সম্প্রদায়ের এই দাবির সমর্থন পাওয়া যায়।

প্রথাগত বিশ্বাস অনুসারে, জৈনধর্মের মূল মতবাদ পূর্ব নামক শাস্ত্রে লিখিত ছিল। মোট চোদ্দোটি পূর্ব শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। জৈনদের বিশ্বাস, এই পূর্ব শাস্ত্রগুলির উৎস প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ। মহাবীরের মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে একটি দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সেই সময় মগধের শাসক ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং জৈন সমাজের প্রধান ছিলেন ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহু তাঁর অনুগামীদের নিয়ে দক্ষিণে কর্ণাটক অঞ্চলে চলে যান। স্থূলভদ্র নামে অপর এক জৈন প্রধান মগধে থেকে যান। এই সময় জৈন মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল। তখন পাটলীপুত্রে এক সভার আয়োজন করা হয় এই সেই সভায় অঙ্গ নামে পরিচিত ১১টি শাস্ত্র রচনা করা হয়। স্থূলভদ্রের অনুগামীরা দ্বাদশ অঙ্গ *দিট্ঠিবায়* গ্রন্থে চোদ্দোটি পূর্ব শাস্ত্রের অবশিষ্টাংশ সংকলিত করেন। দিগম্বর সম্প্রদায় স্থূলভদ্র কর্তৃক সংকলিত জৈন আগমের প্রামাণিকতা অস্বীকার করে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ইন্দ্রভূতি গৌতমের পর ২৩শ শিক্ষক ধরাসেনের সময় মাত্র একটি অঙ্গ শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল। এটি ছিল মহাবীরের নির্বাণের ৬৮৩ বছর পরে। ধরাসেনের শিষ্য পুষ্পদন্ত ও ভূতবলীর সময়কালে তাও হারিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য শাস্ত্রগুলিও হারিয়ে যেতে শুরু করে। মহাবীরের নির্বাণের ৯৮০ থেকে ৯৯৩ বছর পরে গুজরাতের বল্লভীতে একটা সভা আয়োজন করা হয়। এই সভার নেতৃত্ব দেন দেবার্ধী ক্ষমাশ্রমণ। সেই সময় জানা যায় দ্বাদশ অঙ্গ দিট্ঠিবায় গ্রন্থটিও হারিয়ে গিয়েছে। অপর দুটি অঙ্গ রচিত হয়। এই

হল জৈনধর্মের সম্প্রদায় বিভাজনের প্রথাগত কাহিনি। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে, আটবার 'নিহ্নান' বা বিভাজন ঘটেছিল।

দিগম্বর প্রথা অনুসারে, গণধর চোদ্দোটি পূর্ব ও এগারোটি অঙ্গ জানতেন। মহাবীরের নির্বাণের প্রায় ৪৩৬ বছর পরে পূর্ব শাস্ত্রের জ্ঞান এবং ৬৮৩ বছর পরে অঙ্গ শাস্ত্রের জ্ঞান লুপ্ত হয়। যে গ্রন্থগুলি অঙ্গ শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়, তাকে বলা হত অঙ্গবাহ্য। চোদ্দোটি অঙ্গবাহ্য ছিল। প্রথম চারটি অঙ্গবাহ্য শাস্ত্রের নাম সাময়িক, চতুর্বিমাশ্বিক, বন্দন ও প্রতিক্রমণা এগুলি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মূলসূত্র গ্রন্থের কিছু অংশের অনুরূপ। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অঙ্গবাহ্য শাস্ত্রগুলি হল দশবৈকালিক, উত্তরাধ্যয়ন ও কল্পব্যবহার।

পার্শ্বনাথের নির্বাণের পর তাঁর শিষ্য শুভদত্ত সন্ন্যাসীদের প্রধান হয়েছিলেন। শুভদত্তের পর যথাক্রমে হরিদত্ত, আর্যসমুদ্র, প্রভা ও কেশী সন্ন্যাসীদের প্রধান হন। *উত্তরাধ্যয়ননামক* শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থে মহাবীরের শিষ্য ও কেশীর মধ্যে একটি কথোপকথনের বিবৃতি ধৃত হয়েছে। কেশী ও তাঁর অনুগামীরা মহাবীরকে তীর্থঙ্কর হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং মহাবীরের সঙ্গে যোগ দেন।

কথিত আছে, তীর্থঙ্করগণ 'কেবল জ্ঞান' (অনন্ত শুদ্ধ জ্ঞান) অর্জন করেছিলেন। মহাবীরের পর তাঁর শিষ্য সুধর্ম স্বামী জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান হন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫১৫ অব্দ পর্যন্ত তিনি জৈন সমাজের প্রধান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য জম্বুস্বামী সন্ন্যাসীদের প্রধান হন। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৩ অব্দ পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের প্রধান ছিলেন। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, সুধর্ম স্বামী ও জম্বুস্বামী 'কেবল জ্ঞান' অর্জন করেছিলেন এবং জম্বুস্বামীর পর আদ্যাবধি কেউ তা অর্জন করেননি।

সুধর্ম স্বামীর পর পাঁচ জন 'সূত্রকেবলী' (যাঁরা শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ) জৈন সমাজকে নেতৃত্ব দেন। ভদ্রবাহু ছিলেন সর্বশেষ সূত্রকেবলী। ভদ্রবাহুর পরে সাত জন (মতান্তরে এগারো জন) জৈন সমাজকে নেতৃত্ব দেন। এরপর শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান একে একে লুপ্ত হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্য :

প্রথাগত বিশ্বাস অনুসারে, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮ অব্দ) শেষ জীবনে ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) বৌদ্ধ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। অশোকের শিলালিপিগুলিতে জৈনদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিলালিপিগুলিতে 'ধম্মমহামাত্য' দের (সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত ধর্মপ্রচারক) কর্তব্য বর্ণিত আছে। একটি শিলালিপিতে রয়েছে :

দেবতাদের প্রিয় পিয়দসি এই কথা বলেছেন : আমার ধর্মমহামাত্যগম দয়ালু ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এছাড়া তাঁরা তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন যাঁরা সন্ন্যাসীদের কথা চিন্তা করেন এবং যাঁরা গৃহস্থদের কথা চিন্তা করেন। তাঁরা ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন। আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে তাঁরা (বৌদ্ধ) সংঘের ব্যাপারেও যোগাযোগ রাখতে পারেন। একই ভাবে, আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে তাঁরা

ব্রাহ্মণ এবং আজীবকদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারেন। আমি এমন ব্যবস্থাও করেছি, যাতে তাঁরা নিগন্থদের (জৈন) সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারেন। আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে তাঁরা (সকল) ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন।

কথিত আছে, অশোকের পৌত্র সম্প্রতি (খ্রিস্টপূর্ব ২২৪-২১৫ অব্দ) সুহস্তী নামক এক জৈন সন্ন্যাসী কর্তৃক জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তিনি উজ্জয়িনীতে বাস করতেন। মনে করা হয়, তিনি অনেক জৈন মন্দির স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে যে সকল মন্দিরের উৎস বিস্মৃত হয়েছিল, সেগুলিকে তাঁর নির্মিত মন্দির বলে উল্লেখ করা হত।

অন্যান্য রাজবংশ :

মহামেঘবাহন রাজবংশের সম্রাট খারবেল ছিলেন ধর্মসহিষ্ণু রাজা। তিনি জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। উদয়গিরির উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের একটি মূর্তি নির্মাণ করান এবং সন্ন্যাসীদের জন্য গুহানিবাস তৈরি করে দেন।

অন্য একটি কিংবদন্তি অনুসারে, উজ্জয়িনীর শক্তিশালী রাজা গর্দভিল্ল (খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) কলক নামে এক জৈন সন্ন্যাসীর ভগিনী সন্ন্যাসিনী সরস্বতীকে অপহরণ করেছিলেন। ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী ইন্দো-সিথিয়ান শাসক শক শাহির সাহায্য প্রার্থনা করেন। শক শাহি গর্দভিল্লকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। সরস্বতীকে উদ্ধার করা হয়। যদিও গর্দভিল্লকে ক্ষমা করা হয়। গর্দভিল্লর পুত্র বিক্রমাদিত্য শক শাসককে বিতাড়িত করেন। জৈনরা তাঁকে তাঁদের ধর্মের পৃষ্ঠপোষক মনে করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট জৈন সন্ন্যাসী সিদ্ধসেন দিবাকরের শিষ্য। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের শাসনের অবসান ঘটান। তিনিও ছিলেন জৈনধর্মের এক বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত মথুরা ছিল জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। খ্রিস্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর উৎকীর্ণ লিপিগুলি থেকে জানা যায় যে, তার আগেই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্মের বিভাজন ঘটে গিয়েছিল।

৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে জৈন শাস্ত্র রচনার জন্য বল্লভী সভার আয়োজন করা হয়। দিগম্বর সম্প্রদায় এই শাস্ত্রগুলিকে অপ্রামানিক বলে প্রত্যাখ্যান করে। জৈন সন্ন্যাসী সিলুঙ্গ সূরি যাদব রাজবংশের রাজা বনরাজকে (৭২০-৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) লালনপালন করেছিলেন। চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ নিজে জৈন না হলেও একটি জৈন মন্দির নির্মাণ করান। ভীমের (১০২২-১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে বিমল নামে এক জৈন গৃহস্থ আবু পর্বতের চূড়ায় অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। জৈন সন্ন্যাসী হেমচন্দ্র (জন্ম ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ) আট বছর বয়সে সন্ন্যাসী দেবচন্দ্র কর্তৃক দীক্ষিত হন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গুজরাতে জৈনধর্মের প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্র সোলাঙ্কিরাজবংশের রাজা কুমারপালকে জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। যদিও কুমারপালের ভ্রাতুষ্পুত্র তথা উত্তরাধিকারী অজয়পাল ছিলেন শৈব। তিনি জৈনদের দমন করেন।

৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মিহিরকুল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। জৈনরা তাঁকে জৈনধর্মের শত্রু মনে করেন। কারণ, তিনি জৈনদের প্রতি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

চীনা পর্যটকজ হিউয়েন সাং (৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন যে, রাজগৃহের কাছে বৈশালী, নালন্দা ও পুণ্ড্রবর্ধনে অসংখ্য জৈন বাস করতেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক কালে কলিঙ্গকে জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্র মনে করতেন।

সিদ্ধসেন দিবাকরের শিষ্য বাপ্পাভট্টি কনৌজের রাজা অমকে (খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী) জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। বাপ্পাভট্টি অমের বন্ধু বাকপতিকেও ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এই বাকপতি ছিলেন বিখ্যাত প্রাকৃত *গৌড়বাহ* কাব্যের রচয়িতা।

৫.২.৩.৭ : বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

বৌদ্ধধর্ম গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং জীবন দর্শন। অনুসারীদের সংখ্যায় বৌদ্ধধর্মে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তর ধর্ম। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের পরিনির্বানের পরে ভারতীয় উপমহাদেশ সহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি প্রধান মতবাদে বিভক্ত। প্রধান অংশটি হচ্ছে হীনযান বা থেরবাদ (সংস্কৃত : স্থবিরবাদ)। দ্বিতীয়টি মহাযান নামে পরিচিত। বজ্রযান বা তান্ত্রিক মতবাদটি মহাযানের একটি অংশ। শ্রীলংকা, ভারত, ভুটান, নেপাল, লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ও কোরিয়াসহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ এই ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী রয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাস করেন চীনে। বাংলাদেশের উপজাতীদের বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত।

সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি শাক্য রাজবংশের এক ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ পরিবারে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে এখনও অনেক ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তাগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ৪০০ খৃষ্টপূর্বের কিছু দশক আগে বুদ্ধ মারা গিয়েছিলেন। তাঁর শাক্য-ক্ষত্রিয় বংশের পরিবারগণ ব্রাহ্মণ গোত্রের ছিল, যা তাঁর পরিবার কর্তৃক প্রদানকৃত নাম ''গৌতম'' দ্বারা নির্দেশিত। উনবিশ শতাব্দির পন্ডিত এইতেল-এর মতে, সিদ্ধার্থ গৌতমের নাম গৌতম শব্দটি এক ব্রহ্মর্ষি গৌতম থেকে অনুপ্রাণীত। অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, বৌদ্ধ ছিলেন ব্রহ্মর্ষি অঙ্গিরসের বংশধর। উদাহরণস্বরূপ ঃ পালি মহাভাগ্য অঙ্গিরস গ্রন্থে বুদ্ধকে অঙ্গিরস হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যা মূলত গৌতম বুদ্ধ-কে অঙ্গিরস-সম্প্রদায়ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। লেখক এবং ইতিহাসবেত্তা এডওয়ার্ড জে. থমাসও বুদ্ধকে ব্রহ্মর্ষি গৌতম এবং অঙ্গিরসের বংশধর হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বৌদ্ধ পরম্পরাগত মতবাদানুযায়ী, সন্ন্যাসী জীবনযাপন ও ধ্যানের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম ভোগপরায়তণতা এবং স্ব-রিপুদমনের একটি সংযমী পথ আবিষ্কার করেছিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মূলত একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে যেটি বর্তমানে ভারতের বুদ্ধ গয়ায় বোধি বৃক্ষ হিসেবে পরিচিত। সিদ্ধিলাভের পর থেকে গৌতম বুদ্ধ ''সম্যকসমবুদ্ধ'' বা ''আলোকিত ব্যক্তিত্ব'' হিসেবে পরিচয় লাভ করেছিল।

তৎকালীন মগধ রাজ্যের সম্রাট বিম্বিসারের শাসনামলে বৌদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। সম্রাট বিম্বিসার তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয়-বিশ্বাস হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্যে অনেকগুলো বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের আদেশ প্রদান করেছিলেন। আর এই বিহারগুলোই বর্তমান ভারতের বিহার অঙ্গ-রাজ্যের নামকরণে ভূমিকা রেখেছিল।

উত্তর ভারতের বারাণসীর বর্তমান মৃগদাব নামক জায়গাটিতে বৌদ্ধ তাঁর পাঁচ-সঙ্গীকে প্রথম ধর্মদেশনা প্রদান করেছিল। বুদ্ধ সহ তাঁর এই পাঁচ সন্ন্যাস সহচর মিলে প্রথম সংঘ (ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের দ্বারা গঠিত সম্প্রদায়) গঠন করেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ-গ্রন্থ অনুযায়ী, প্রাথমিক অনিচ্ছা থাকার সত্ত্বেও গৌতম বুদ্ধ পরে সন্ন্যাসিনীদেরও সংঘের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের ''ভিক্ষুণী'' হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধের মাসি এবং তাঁর সৎ-মা মহাপজাপতি গৌতমী ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম ভিক্ষুণী। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে তিনি ভিক্ষুণী হিসেবে সন্ন্যাস পদ গ্রহণ করেন।

জানা যায়, বুদ্ধ তাঁর অবশিষ্ট জীবনের বছরগুলোতে ভারতের উত্তরাঞ্চল ও অন্যান্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলগুলোতে পরিভ্রমণ করেন।

বুদ্ধ কুশীনগরের পরিত্যক্ত এক জঙ্গলে দেহত্যাগ বা মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

জনশ্রুতিতে শোনা যায় যে, মারা যাওয়ার পূর্বে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রচার করা ধর্মীয়দেশনাই হবে তাদের নেতা যা তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবে। পূর্ববর্তী অড়হৎরা গৌতমের মুখ-নিঃসৃত বাণীকেই ধর্ম এবং বিনয়ের (শৃঙ্খলা ও সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নিয়ম) প্রাথমিক উৎস হিসেবে অভিহিত করেছিল। কিন্তু বাস্তবে বুদ্ধের কোন মুখ-নিঃসৃত বাণীরই হদিস মিলে নি। পালি, সংস্কৃত, চৈনিক ভাষা ও তিব্বতি ভাষায় যে ত্রিপিটক ও ধর্মীয়গ্রন্থগুলো পাওয়া যায় তা মূলত স্থানীয় মানুষদের মৌখিক বর্ণনা থেকে সংগৃহীত।

বৌদ্ধ-ধর্মের প্রারম্ভিক সময়

বৌদ্ধ ধর্ম পূর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত থাকলেও পরে এই প্রাচীন ভূ-খন্ড থেকে বৌদ্ধ ধর্ম অন্যত্র ছড়িয়ে পরে। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় শাস্ত্রের উৎসগুলো দুইটি ধর্মীয় মহাসঙ্গীতি সংরক্ষণ করেন, যার একটি হলো বুদ্ধের পাঠগত শিক্ষা সংরক্ষণের জন্য সন্ন্যাসী সংঘ ও আরেকটি হলো সংঘের অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতামূলক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়সমূহ।

প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী)

প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি গঠিত হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর অর্থাৎ বুদ্ধের দেহত্যাগের পর। খৃষ্ট-পূর্ব ৫ম শতাব্দিতে মহাকাশ্যপ নামক বুদ্ধের একজন কাছের শিষ্যের তত্ত্বাবধানে এবং রাজার অজাতশত্রুর সমর্থনে এই প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি গঠিত হয়। এই মহাসঙ্গীতি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাণীগুলোকে মতবাদ-সংক্রান্ত শিক্ষায় (তথা সূত্রে) এবং অভিধর্মে রূপান্তরিত করা এবং বৌদ্ধের সন্ন্যাসগত নিয়ামাবলীকে

লিপিবদ্ধ করা। এই মহাসঙ্গীতি বৌদ্ধের খুড়তুতো ভাই এবং তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডাকা হয় বুদ্ধের উপদেশ এবং অভিধর্ম আবৃত্তি করার জন্য এবং বুদ্ধের আরেক প্রধান শিষ্য উপালি কে বলা হয় বিনয়ের সূত্রসমূহ পাঠ করার জন্য। এগুলোই মূলত ত্রিপিটকের মূল ভিত্তি হিসেবে পরিচয় লাভ পায় যেগুলো পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়।

তবে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে অভিধর্মের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ নেই। এটি শুধুমাত্র দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির পরই অস্তিত্ব লাভ করে।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (খৃষ্ট-পূর্ব ৪র্থ শতাব্দী)

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বৈশালিতে যেটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ম-শৃংখলার বিভিন্ন বিষয়ের শিথিলকরণের বিতর্ক থেকে উত্থান হয়েছিল। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে মূল বিনয় গ্রন্থের সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শিথিলকরণসমূহের কারণগুলো বুদ্ধের শিক্ষার পরিপন্থী হওয়ায় দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আবির্ভাবের কারণ হয়ে ওঠে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্রাট অশোক (২৭৩-২৩২ খৃষ্ট-পূর্ব) প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কলিঙ্গ রাজ্যের (বর্তমান ভারতের ওড়িশা প্রদেশ) রক্তাক্ত বিজয়ের পর বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। ভয়াবহ কলিঙ্গ যুদ্ধ যে আতংক ও দূর্বিপাক সৃষ্টি করেছিল, সেইসব বিষয় নিয়ে অনুতপ্ত হয়ে সম্রাট অশোক সহিংসতা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং মহানুভবতার সাথে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট কলিঙ্গ রাজ্যের জনগণের দুঃখ দূর্দশাকে সম্মান এবং যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেন। সম্রাট স্তুপ এবং স্তম্ভ নির্মাণের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকার্য শুরু করেন এবং পশু-পাখিদের প্রতি দয়াশীল এবং মানুষের জীবনযাপনকে ধর্মমুখী করার জন্য তাঁর ধর্ম-প্রচারের মাধ্যমে আহ্বান করতে থাকেন। তাঁর নির্মাণকৃত স্তুপগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতের অঙ্গরাজ্যে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে অবস্থিত সাঁচী স্তুপ। এটার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল খৃষ্ট-পূর্ব ৩য় শতাব্দীতে এবং পরবর্তীতে এটার নির্মাণ কাজ আরো সম্প্রসারণ করা হয়। এই স্তুপের উৎকীর্ণ ফটক যেটি তোরণ নামে পরিচিত, মূলত ভারতে বৌদ্ধ শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সম্রাট এছাড়াও পুরো দেশ জুড়ে অনেক রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, পান্থশালা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি তাঁর প্রজাদের ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত, রাজনীতি নির্বিশেষে সমান আচরণ করতেন।

সম্রাট অশোকের আমলেই বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে ছড়িয়ে পরে। অশোকের স্তম্ভ ও স্তুপ থেকে জানা যায়, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্যে সম্রাট তাঁর প্রতিনিধিদের ভারতের দক্ষিণের দিকে শ্রীলংকা পর্যন্ত, পশ্চিমের গ্রীক-সাম্রাজ্যে, বিশেষ করে প্রতিবেশী গ্রিক-ব্যাক্ট্রিয় রাজ্য এবং সম্ভবত ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

৩য় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি

সম্রাট অশোক খৃষ্ট-পূর্ব ২৫০ অব্দে পাটলিপুত্র (বর্তমান ভারতের বিহার অঙ্গরারাজ্যের রাজধানী পাটনায়) ৩য় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আহ্বান করেন। এই ৩য় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির তত্ত্বাবধান করেছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

মোগাঁলিপুত্ততিসসা। এই মহাসঙ্গীতির উদ্দেশ্য ছিল সংঘের শুদ্ধিকরণ, বিশেষ করে অ-বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যারা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আকৃষ্ট ছিল। ৩য় মহাসঙ্গীতির মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ মিশনারী পৃথিবীর অন্যত্র প্রচার হতে থাকে।

হেলেনিষ্টিক বিশ্ব :

অশোকের কিছু স্থম্ভ থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধ বিশ্বাস হেলেনিস্টিক বিশ্বে প্রচারের জন্য তিনি যে কার্য-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা ভারতের সীমানা পেড়িয়ে সুদূর গ্রীস অবধি ছড়িয়ে পরেছিল। পাশাপাশি অশোকের স্তম্ভ থেকে হেলেনিস্টিক অঞ্চলের তৎকালীন রাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রাচীন গ্রীকের রাজাদের নাম এবং তাদের রাজ্যের অবস্থান এবং এমনকি কিছু গ্রীক সম্রাট যেমন : সেল্যুসিড সাম্রাজ্যের ''এন্টিওকাস ২য় থিউওস'' (২৬১-২৪৬ খৃষ্ট-পূর্ব), মিশর সাম্রাজ্যের তৎকালীন অধিপতী ''টলেমি ২য় ফিলাডেলফোস'' (২৮৫-২৪৭ খৃষ্ট-পূর্ব), ম্যাকাডোনিয়া সাম্রাজ্যের সম্রাট ''অ্যান্টিগোনাস গোনাটাস'' (২৭৬-২৩৯ খৃষ্ট-পূর্ব), সিরেনেইকা (বর্তমান লিবিয়া) সাম্রাজ্যের ''মাগাস'' (২৮৮-২৫৮ খৃষ্ট-পূর্ব) এবং এপিয়াস (বর্তমান গ্রীসের উত্তর-পশ্চিমাংশ) সাম্রাজ্যের ''অ্যালেক্সান্ডার ২য়'' (২৭২-২৫৫ খৃষ্ট-পূর্ব) প্রমুখ সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে বলে দাবী করা হয়।

পালি সূত্র থেকে আরো জানা যায় যে, সম্রাট অশোকের কিছু প্রতিনিধিরা গ্রীক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন যারা দুই উপমহাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে ভূমিকা রাখতেন :

অশোক এছাড়াও গ্রীক এবং আর্মাইক ভাষায় তাঁর ধর্ম-স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন যেগুলো আফগানিস্তানের কান্দাহারে পাওয়া গিয়েছিল। গ্রীক সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য তিনি গ্রীক শব্দ ''eusebeia'' কে ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেন :

শ্রীলঙ্কা ও বার্মায় বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ :

শ্রীলংকায় বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারিত হয়েছিল খৃষ্ট-পূর্ব ৩য় অব্দে, সম্রাট অশোক পুত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু মহিন্দ ও তাঁর ছয় সহচরের সহায়তায়। তাঁরা শ্রীলংকার তৎকালীন রাজা দেবানাপিয়া টিস্সা ও রাজ্যের আরো অভিজাত শ্রেণীর লোকদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। পাশাপাশি সম্রাট অশোকের মেয়ে সংঘমিত্রাও শ্রীলংকায় মেয়ে-সন্ন্যাসীন্নিদের প্রথা চালু করেন। এছাড়াও অশোক তনয়া তাঁর সাথে একটি বোধি বৃক্ষের চারা গাছও নিয়ে এসেছিলেন এবং সেটি শ্রীলঙ্কা অনুরাধাপুরাতে রোপণ করেছিলেন। সেখানেই মূলত মহাবিহার নামক সিংহলিদের

প্রাচীন মঠ অবস্থিত। মূলত শ্রীলংকায় পালি ভাষায় ধর্ম-সূত্রগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছিল রাজা ভট্টগমনীর শাসনামলে (২৯-১৭ খৃষ্ট-পূর্ব) এবং থেরবাদ ভক্তি আন্দোলন মূলত সেখানে থেকেই বিকশিত হয়েছিল। বুদ্ধঘোষ (৪র্থ ও ৫ম শতাব্দি) ও ধর্মপালের (৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দি) মতো অনেক প্রখ্যাত বুদ্ধ সন্ন্যাসী থেরবাদ ভক্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল এবং তারা এই মতাদর্শের অনেক নিয়মাবলীও প্রণয়ন করেছিল। যদিও মহাযান বৌদ্ধ শাখা শ্রীলংকায় বেশ অনেক সময় অব্দি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তথাপি শ্রীলংকায় পরবর্তীতে থেরবাদ-ই স্থায়ী হয় এবং এটি এখনও পালন করা হয়। শ্রীলংকা থেকে পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম একাদশ শতাব্দিতে ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাকি দেশগুলোতে প্রচার হতে থাকে।

ভারতীয় উপমহাদেশের একেবারে পূর্বে বার্মা ও থাইল্যান্ডের মানুষজনদের মাঝেও বৌদ্ধ ধর্মের দরুণ তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বৌদ্ধ ধর্মের দুই শাখা মহাযান ও হীনযান বিভক্তির পূর্বে খৃষ্ট-পূর্ব ৪র্থ শতাব্দিতে থাইল্যান্ড ও বার্মার লোকেরা সম্রাট অশোকের শাসনাকালে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। খৃষ্ট-পূর্ব ১ম থেকে ৫ম শতাব্দিতে নির্মিত মধ্য মিয়ানমারে অবস্থিত প্রাচীন বার্মিজ বুদ্ধ মন্দির ''পেইকথানো'' হলো মিয়ানমারে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন।

থাইল্যান্ড ও বার্মায় যে বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় তা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের গুপ্ত সাম্রাজ্যের চিত্র শিল্প কর্তৃক প্রভাবিত। পাশাপাশি তাদের বিশেষ শিল্প ধারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আরো ছড়িয়ে পরে যখন ৫ম থেকে ৮ম শতাব্দিতে মোন গোত্রের লোকদের (থাইল্যান্ড ও বার্মিজ মানুষ) সাম্রাজ্য আরো বিস্তার লাভ করে। খৃষ্ট-পরবর্তী ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে মহাযান শাখা প্রভাব বিস্তারের পূর্বে থেরবাদ বিশ্বাস মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তরাংশে মোন জাতিগোষ্ঠীর কারণেই আরো বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। অশোকাবদান (খৃষ্টপরবর্তী ২য় শতাব্দি) থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক উত্তরে হিমালয়ের দিকেও একটি বৌদ্ধ মিশনারী প্রেরণ করেন যারা খোতান, তারিম বাসিন, ইন্দো ইউরোপীয়ভাষাভাষি তুষারি লোকদের মাঝেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন।

শুঙ্গ রাজবংশের উত্থান (খৃষ্টপূর্ব ২য়-১ম অব্দ)

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর ৫০ বছর পর শুঙ্গ রাজবংশ (১৮৫-৭৩ খৃষ্টপূর্ব) ১৮৫ খৃষ্টপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ মৌর্য্য কে হত্যার মধ্য দিয়ে সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সিংহাসন আরোহণ করেন। অশোকাবদানের মতো বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরোধী ছিলেন এবং বৌদ্ধ-বিশ্বাসীরা তাঁর শাসনামলে নির্যাতিত হয়েছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে আরো উল্লেখ আছে যে, তিনি শত শত বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেছিলেন এবং হাজারের উপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করেছিলেন। ৮,৪০,০০০ বুদ্ধ-স্তূপ যা সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল, তা রাজা পুষ্যমিত্র ধ্বংস করে ফেলেন এবং প্রত্যকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মাথার বিনিময়ে তিনি ১০০টি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানের পুরষ্কার ঘোষণা করেন। এর পাশাপাশি অন্যান্য বৌদ্ধ সূত্রগুলো আরো দাবী করে যে, রাজা পুষ্যমিত্র নালন্দা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও মথুরার মতো স্থানগুলোতে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারগুলোকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের নিরিখে উপরিউক্ত তথ্যগুলোর সাথে তাদের মতবিরোধ প্রকাশ করেন। তাদের মতামত

অনুযায়ী, অশোকের বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার দরুণ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার-প্রসারে ভাটা পরেছিল ঠিক, কিন্তু পুষ্যমিত্র কর্তৃক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সক্রিয় নির্যাতনের প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া যায় নি। বেলজিয়ান পাদ্রী এবং গ্রীক ভাষার প্রভাষক এতিয়ান লেমোতের ভাষ্যানুযায়ী ''নথি থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায়, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে পুষ্যমিত্রকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না''। কিন্তু অন্য দিকে ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইতিহাসবেত্তা রোমিলা থাপার, এতিয়ান লেমোত ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তাদের মতামত নিয়ে দ্বি-মত পোষণ করেন। রোমিলা থাপরের ভাষ্যমতে ''পুষ্যমিত্র ছিলেন না একজন ধর্মান্ধ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী''। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ''বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থের দাবী অনুযায়ী পুষ্যমিত্র আসলে ৮,৪০,০০০ অশোক স্তূপ ধ্বংস করেন নি।'' থাপার আরো বিশদভাবে বলেন যে, পুষ্যমিত্র কর্তৃক মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্যই বৌদ্ধ সূত্রগুলো তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছিল বাড়তি তথ্যগুলো অতিঃরঞ্জিত করে উপস্থাপনের মাধ্যমে।

সেই সময় পুষ্যমিত্রের শাসনামলে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গাঙ্গেয় উপত্যকা ছেড়ে কেউ কেউ উত্তরের দিকে আর কেউ বা দক্ষিণের দিকে যাত্রা করেন। বিপরীতক্রমে, বৌদ্ধ শিল্প মগধ রাজ্যে বিকশিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং মগধ ছেড়ে তা উত্তর পশ্চিমাংশের গান্ধার ও মথুরাতে এবং দক্ষিণ-পূর্বের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অমরাবতীতে বিকাশ লাভ করে। এছাড়াও কিছু বৌদ্ধ শিল্প পুষ্যমিত্রের শাসনামলে মধ্য ভারতের ভারহুত অঞ্চলেও বিকশিত হয়েছিল।

গ্রেকো-বৌদ্ধ আন্তঃক্রিয়া (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দি-খৃষ্টপরবর্তী ১ম শতাব্দি)

রেশম পথ (সিল্ক রোড) সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই ভারত ও চীনের মধ্যে গঠিত আন্তঃসড়ক মূলত আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে সম্রাট আলেক্সান্ডারের বিজয়ের পর থেকেই গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। প্রথমে ছিল সেল্যুসিড সাম্রাজ্যযার আনুমানিক সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে, তারপর গ্রিক-ব্যাক্ট্রিয় রাজ্য যার সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দ, এবং সর্বশেষে ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্য যা খৃষ্টপূর্ব ১০ শতাব্দির আগ পর্যন্ত টিকে ছিল।

গ্রিক-ব্যাক্ট্রিয় রাজ্যের রাজা ব্যাক্ট্রিয়ার প্রথম দেমেত্রিওস ১৮০ খৃষ্টপূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ করে ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। আক্রমণের পরেই ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম আবার বিকশিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে কারণ হিসেবে পাওয়া যায় যে, মৌর্য্য সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এবং শুঙ্গ রাজবংশের নির্যাতন থেকে বৌদ্ধদের রক্ষার জন্যই এই আক্রমণ করা হয়। ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজা ছিল প্রথম মেনান্দার সোতের (১৬০-১৩৫ খৃষ্টপূর্ব) যিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মহাযান বৌদ্ধ শাখায় তাকে বৌদ্ধ ধর্মের হিতকারি হিসেবে সম্রাট অশোক ও সম্রাট কণিষ্কের সমতুল্য হিসেবে অভিহিত করেন। মেনান্দারের শাসনামলে তার রাজ্যের মুদ্রায় তাকে ''পরিত্রাণকারি রাজা'' হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং কিছু মুদ্রায় আটটি কাঁটা বিশিষ্ট ধর্ম-চক্রেরও হদিস পাওয়া যায়। এছাড়া মিলিন্দপঞ্হ এর মতো বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থেও সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়ার হদিস পাওয়া যায় যেখানে মহারাজ মেনান্দ্রোস ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের (যিনি ছিলেন গ্রীক বৌদ্ধ-ভিক্ষু মহাধর্মরক্ষিতার শিষ্য) মধ্যে কথোপকথনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজা মেনান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর দেহাবশেষ তাঁর শাসনকৃত শহরে অবস্থিত স্তুপগুলোতে তাঁর সম্মানার্থে সংরক্ষণ করা হয়। মেনান্দারের অন্যান্য উত্তরসূরীগণ তাদের শাসনামলে মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপিতে ধর্মদেশনা লিপিবদ্ধ করেন এবং মুদ্রা সঙ্গীতে তাদের নিজ নিজ গুণাবলী বর্ণনা করেন।

বুদ্ধের প্রথম নরত্বারোপমূলক উপস্থাপনার বা মূর্তির হদিস পাওয়া যায় গ্রীক-বৌদ্ধ শাসনামলে। বুদ্ধের নরত্বারোপমূলক উপস্থাপনার প্রতি অনীহা মূলত বুদ্ধের বাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত যেটি দিঘা নিকায়ার মতো বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে, যেখানে বুদ্ধ বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাকে যেন কোন রূপ মূর্তি বানিয়ে বা চিত্র এঁকে উপস্থাপন করা না হয়। এসব বিধি-নিষেধ পালনে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না করে এবং সম্ভবত তাদের পূর্ববর্তী সংস্কৃতির প্রভাবের বশীভূত হয়েই গ্রীকরা প্রথম বৌদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রীকরা বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে দেব-দেবী সমূহের রূপায়ন করেছিলেন তা কালক্রমে বিভিন্ন বিশ্বাসী মানুষদের মাঝে সাধারণ ধর্মীয় অনুশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে উঠে। এটির উল্লেখযোগ্যা উদাহরণ হলো বিভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা দেবতা স্যারাপিসের রূপায়ণ যা টলেমি প্রথম এর শাসনামলে মিশরে পরিচয় লাভ পায় যা মূলত গ্রীক ও মিশরীয়, উভয় ঈশ্বরদেরই সমন্বয়ের ফলস্বরূপ। তাই ভারতের মতো স্থানে গ্রীকদের একটি মহাপুরুষের রূপায়ণ প্রচেষ্টায় হাত দেওয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার যা তাঁরা করেছিল তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের সূর্য দেবতা অ্যাপোলো অথবা ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাক্ট্রিয়ার প্রথম দেমেত্রিওস এর শারীরিক গঠন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, যা পরবর্তীতে গ্রীকরা বুদ্ধের ভৌত-বৈশিষ্ট্য গঠনে প্রতিফলন করেন। মূলত দুই কাঁধ ঢেকে বুদ্ধের কাপড়ের পরিহিত অবস্থায় যে মূর্তি আমরা দেখতে পাই তা প্রাচীন গ্রীক-রোমান সাম্রাজ্যে পরিহিত এক ধরনের গ্রীক ঐতিহ্যগত পোশাক টোগা ও হিমাশনের সমতুল্য বলে অনেক ইতিহাসবেত্তাগণ মনে করেন। এছাড়া বুদ্ধের কোঁকড়ানো চুল এবং উষ্ণীষ (মাথার উপর ডিম্বাকৃতি চুলের ঝুঁটি) মূলত ভাস্কর্য বেলভেদের অ্যাপোলো এর অনুকরণে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ভারত ও হেলেনিস্টিক শাসনামলে নির্মিত বুদ্ধের ভাস্কর্য সমূহের একটি বড় অংশই আফগানিস্তানর জালালাবাদ শহরের গান্ধার অঞ্চলের হাজ্জা নামক জায়গাটিতে মাটি খুঁড়ে ভাস্কর্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

এছাড়াও গ্রীক-বৌদ্ধ শাসনামলে আন্তঃসাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয় গ্রীক ভিক্ষু মহাধর্মরক্ষিত কে যিনি জাতিতে ছিলেন গ্রীক এবং মহাবংশ গ্রন্থের ২৯তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে রাজা মেনান্দার প্রথমের শাসনামলে (খৃষ্টপূর্ব ১৬৫-খৃষ্টপূর্ব ১৩৫) ভিক্ষু মহাধর্মরক্ষিতের অধীনে গ্রীক ঔপনিবেশিক শহর আলাসান্দ্রা (যা বর্তমানে ১৫০ কি.মি. জায়গা জুড়ে কাবুলের উত্তরে অবস্থিত) থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ এর মতো তাঁর বৌদ্ধ শিষ্য ছিল, যা ছিল মূলত সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের অবদান হিসেবে দেখা হয়।

মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ :

আফগানিস্তানের তিলিয়া তেপের প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে খৃষ্ট-পরবর্তী ১ম শতাব্দির একটি বৌদ্ধ মুদ্রার হদিস পাওয়া যায় যেটি প্রাচীন ভারতের বলে জানা যায়। মুদ্রাটির বিপরীত পিঠে একটি চলন্ত সিংহকে দেখা যায় যার সম্মুখভাগে নন্দিপদ (ষাঁড়ের খুর সম্বলিত এক ধরনের প্রাচীন প্রতীক) রয়েছে এবং সেখানে খরোষ্ঠী লিপিতে

সিংহটিকে বর্ণনা করা হয়েছে ''Sih [o] vigatabhay [o]'' হিসেবে, যার মানে হলো ''যে সিংহ ভয় দূরীভূত করে''।

বৌদ্ধ ধর্মে মহাযান শাখায় বুদ্ধকে সিংহ, হাতি, ঘোড়া এবং ষাঁড়ের মতো প্রাণীদের দ্বারা প্রতিকায়িত করা হয়। এছাড়া জোড়া পায়ের পাতা দিয়েও অনেক সময় বুদ্ধের স্বরূপকে বুঝানো হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবেত্তারা এই প্রতীকগুলোকে নন্দিপদ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও এগুলো আসলে বিভিন্ন প্রতীকের একটি যৌগিক সংমিশ্রণ বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রতীকের উপরের অংশ মূলত বৌদ্ধ ধর্মের ''মধ্য পন্থাকেই'' রূপায়িত করে। প্রতীকের মধ্যভাগের গোলাকৃতি অংশটি দ্বারা বুঝায় ''ধর্ম-চক্র''। এইভাবেই পুরো প্রতীকই আসলে ধর্ম-চক্র অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের স্বরূপ-কেই প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবে মুদ্রার দুই পিঠে চিহ্নিত প্রতীক দুইটির সম্মন্বয় রূপ মিলে মূলত বৌদ্ধ ধর্ম-চক্র ঘুরাচ্ছে, এটিই বুঝানো হয়। এভাবেই ভারতের সিংহের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত বারাণসীর সারনাথ শহরে অবস্থিত বৌদ্ধ নিদর্শনের জায়গাগুলোর স্তম্ভে উল্লেখিত সিংহ, হাতি, ঘোড়া ও ষাঁড় কর্তৃক নন্দিপদ ঘুরানো দ্বারা মূলত বুদ্ধের ধর্ম চক্র ঘুরানোর স্বরূপকে প্রতিকায়িত করে। আরও একটি প্রতীক পাওয়া যায় যেখানে একজন ক্লামাইস (বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে পরিহিত সম্রাট ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিদের পোশাক) ও মাথায় একটি কাপড় পরিহিত উলঙ্গ-প্রায় একজন ব্যক্তি ধর্মচক্র আবর্তন করছেন। খরোষ্ঠী লিপিতে এই প্রতীকের বর্ণনাতে বলা হয়েছে, ''ধর্মচক্র-প্রাবাতা (কো)'' অর্থাৎ ''যিনি আইনের ধর্মচক্র ঘুরাচ্ছেন''। এই প্রতীক থেকে এটা বলা যায় যে, এটি বুদ্ধকে নিয়ে উপস্থাপন করা প্রাচীন প্রতীকগুলোর মধ্যে একটি।

ক্লামাইস পরিহিত মানুষটির মাথার কাপড় দ্বারা বুঝানো হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম নির্দেশিত মধ্যপথ। এভাবেই মাথার কাপড় পরিহিতা ব্যক্তিদের মূলত মধ্য-পথ অবলম্বনকারি হিসেবে পরিচায়িত করা হয়। একইভাবে সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহরে ৯ জন মহিলার হদিস মিলে যাদের মাথাতেও একই ধরনের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।

এছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবেত্তাদের দ্বারা যেহেতু বৌদ্ধ সাহিত্য ও বুদ্ধের শারীরিক প্রতীকের কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয় নি, তাই এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হতে পাওয়া মুদ্রা, সীল-মোহর এবং অন্যান্য শিলালিপি-তে দেখতে পাওয়া প্রতীকগুলো নিয়ে দেওয়া বর্ণনাগুলোকে অনেক সময় কল্পনা ও ব্যাখ্যার ভুল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

মহাযানের উত্থান (খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দি-খৃষ্ট-পরবর্তী ২য় শতাব্দি)

বেশ কয়েকজন পন্ডিতদের মতে, ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় বসবাসরত মহাসাংঘিক নামক এক প্রাচীন আদি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের আবির্ভাব হয়েছিল যা প্রাচীন মহাযানের সূত্রগুলোর মধ্যে একটি।

প্রাচীন মহাযান সূত্র হতে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের প্রথম দিককার সংস্করণের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে অক্ষোভ্য বুদ্ধের পরিচয় মিলে, যেটি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই রচিত হয়েছিল। এছাড়া বিখ্যাত ভারতবিদ্যা-বিশারদ এ. কে. ওয়ার্ডও এই অভিমত ব্যাক্ত করেন যে, বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখার উত্থান দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশেই উত্থান ঘটেছিল।

পন্ডিত অ্যান্থোনি বার্বার ও শ্রী পদ্মও একই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নাগার্জুন, দিগ্‌নাথ, চন্দ্রকীর্তি, আর্যদেব, ভাববিবেক-এর মতো যেসব বৌদ্ধ পন্ডিতরা মহাযানশাখায় ভূমিকা রেখেছিল, তাদের সবারই বসবাস ছিল বর্তমান দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে।

আর মহাযান শাখার উত্থানের জায়গাগুলো মূলত অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা উপত্যকার নিচু ভূমি সম্বলিত গুন্টুর জেলার অমরাবতী, নাগার্জুনকোন্ডা, জগ্‌গয়াপেটা-রে মতো অঞ্চলে অবস্থিত। জাপানী ইতিহাসবেত্তা আকিরা হিরাকাওয়াও বলেন, ''বিভিন্ন প্রামাণিক দলিলসমূহ এটাই বলে যে, প্রাচীন মহাযান গ্রন্থগুলো দক্ষিণ-ভারতেই সম্ভূত''।

১০০ শতকে, কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্রাট কণিষ্কের তত্ত্বাবধানে। ধারণা করা হয় যেখানে চতুর্থ মহাসঙ্গীতের উত্থান হয়, সেটি বর্তমানে কাশ্মীরের জলান্ধার নামক জায়গা। থেরবাদ বৌদ্ধ শাখা প্রায় ৪০০ বছর আগে শ্রীলঙ্কাতে পালি ভাষায় তাদের চতুর্থ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেছিল। তাই চতুর্ত মহাসঙ্গীতি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; যার চারভাগের দুই ভাগ শ্রীলংকাতে আর বাকি দুই ভাগ কাশ্মীরে।

অভিধর্ম নামক বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে এটা জানা যায় যে, সম্রাট কণিষ্ক বসুমিত্রের নেতৃত্বে ৫০০ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা এই চতুর্থ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেন। সেখান থেকে জানা যায় যে, সেই মহাসঙ্গীতিতে তিন লক্ষ শ্লোক এবং নয় মিলিয়ন বক্তব্য সংরক্ষণ করা হয়। এই মহাসঙ্গীতির ফলে সবচেয়ে যে বড় ফলাফল পাওয়া যায় তা হলো, ''মহা-বিভাষা'' নামক গ্রন্থের সংকলন এবং ''সর্বস্তিবধিন অভিধর্মের'' সারসংক্ষেপণ রচনা।

বিভিন্ন ভাষাবিদরা এটাও অভিমত করেন যে, এই মহাসঙ্গীতির ফলে ''সর্বস্তিবধিন অভিধর্ম'' গ্রন্থের ভাষারূপের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যেখানে প্রাকৃত ভাষা থেকে এটিকে সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছিল। ভাষারূপের পরিবর্তন সাধিত হলেও ধর্মীয়-গ্রন্থটির মূল উপজীব্য হারিয়ে যায় নি। এছাড়াও তৎকালীন ভারতে উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের ভাষা সংস্কৃত হওয়ায়, সর্বস্তিবধিন অভিধর্ম গ্রন্থটি ভাষা রূপান্তরে আলাদা তাৎপর্য পায়। আর এইভাবে ভাষারূপের পরিবর্তন সাধন করে সর্বস্তিবধিন অভিধর্ম গ্রন্থটি ভারতের বহু চিন্তাবিদ ও মানুষদের মধ্যে পাঠক-প্রিয়তা অর্জন করে। আর ঠিক এই কারণেই বহু বৌদ্ধ পন্ডিতদের মধ্যে তাদের অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থের শ্লোক ও বক্তব্যগুলো সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করার ঝোঁক বেড়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্মের অন্যান্য শাখা ধর্মী-গ্রন্থ অনুবাদে ব্যস্থ হয় পরলেও থেরবাদ শাখা কিন্তু সে দিকে পা বাড়ায় নি। কারণ জীবিত অবস্থায় বৌদ্ধ স্পষ্টভাবে বারণ করে গিয়েছিল, তার দেয়া বাণীসমূহ কোন বিশেষ ধর্মের উচ্চমার্গের ভাষায় যেন লিপিবদ্ধ করা না হয়; বরং তা যে কোন স্থানীয় নিচুমার্গের ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু এতো কিছুর পরেও থেরবাদ শাখায় ধর্মীয়-গ্রন্থগুলো যে নিচু-শ্রেণীর যে পলি ভাষায়রচিত হয়েছিল, সেই পলি ভাষা কালক্রমে উচ্চ-শ্রেণীর মানুষের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মহাযান শাখার পরিব্যপ্তি (খৃষ্টপরবর্তী ১ম থেকে ১১শ শতাব্দি)

কিছু শতাব্দির মধ্যেই, বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখা বিকশিত হতে থাকে এবং তা ভারত থেকে ছাড়িয়ে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া এবং সর্বশেষ খৃষ্ট-পরবর্তী ৫৩৮ সালে জাপানে এভং ৭ম শতাব্দিতে তিব্বতে প্রচারিত হতে থাকে।

কুষাণ সাম্রাজ্যের সমাপ্তির পর বৌদ্ধ ধর্ম গুপ্ত সাম্রাজ্যে (খৃষ্ট-পরবর্তী ৪র্থ থেকে-৫ শতাব্দি) বিকশিত হতে থাকে। সেই সময় ভারতের বর্তমান বিহার প্রদেশের নালন্দায় মহাযান শাখার অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত মহাযান শাখার এই বৌদ্ধ-অধ্যয়ন কেন্দ্রটি বহু শতাব্দী ধরে বৃহত্তর ও প্রভাবশালী বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত ছিল এবং নাগার্জুনের মতো বৌদ্ধ পন্ডিত ছিল উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। গুপ্ত সাম্রাজ্যে বিকশিত বৌদ্ধ-শিল্পকলা পরবর্তীতে সুদূর চীন দেশেকেও প্রভাবিত করেছিল।

হুন জাতির আক্রমণ এবং মিহিরকূলের অত্যাচারের পর থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দি থেকে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব দূর্বল হয়ে যায়।

৭ম শতাব্দিতে ভারত ভ্রমণের সময় বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক ও অনুবাদক হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম সেই সময় অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, বিজয়ওয়াড়া তথা সমস্ত দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তিনি নেপালে জনমানবশূণ্য বৌদ্ধ-স্তুপের বর্ণনা ও গৌড় রাজ্যের রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধ নিপীড়নের কথা উল্লেখ করলেও, সেই একই সময়কালীন সময়ে রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ভূয়শী প্রশংসা করেন। হর্ষবর্ধনের শাসনামলের সমাপ্তির পর অনেক ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান ঘটে যা পরবর্তীতে গাঙ্গেয়ত্রেয় উপত্যকায় রাজপুত জাতির উত্থান ঘটায় এবং বৌদ্ধ-রাজবংশেও সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা অঞ্চলে পাল সাম্রাজ্যের উত্থানের পর থেকে বৌদ্ধ-রাজবংশ পুনরায় তাদের গৌরবে ফিরে পায়। হিন্দু সেন রাজবংশ কর্তৃক পাল রাজ্য আক্রমণের আগ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম পাল সাম্রাজ্যের অধীনে বিকশিত হয়ে বাংলা অঞ্চল হতে ৭ম থেকে ১২শ শতাব্দি পর্যন্ত সিক্কিম, ভূটান এবং তিব্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে পরে। পাল রাজবংশের শাসনমলে বহু মন্দির ও বৌদ্ধ-শিল্পকলা বিকশিত হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ্গ আরও উল্লেখ করেন যে, তার পরিভ্রমণের সময় তিনি অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু ধর্ম ও জৈন ধর্মে ধর্মান্তরীত হতে দেখেছেন। কেননা দশম শতাব্দিতে পাল রাজবংশের পরাজয় ও বৈষ্ণবীয় মতবাদ উত্থানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হতে থাকে।

এছাড়া উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের মাইলফলক তখনই ঘটেছিল, যখন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কি আক্রমণকারি ও মুসলিম যোদ্ধা বখতিয়ার খিলজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দির শেষের দিকে বিহারে মুসলিম শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার পর থেকে মধ্য ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হতে থাকে এবং অনেক বৌদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাসীরা সেই সময় ভারতের একেবারে উত্তরের দিকে অর্থাৎ হিমালয়ার অঞ্চলগুলোতে এবং একেবারে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কার দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে। পাশাপাশি

ভারতবর্ষে সেই সময় অদ্বৈত মতবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের পুনরুত্থানের এবং সুফিবাদের আগমনের ফলে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়।

৫.২.৩.৮ : বৈষ্ণব ধর্ম

বৈষ্ণব ধর্ম হিন্দুধর্মের একটি শাখাসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে বিষ্ণু বা তাঁর অবতারগণ (মুখ্যত রাম ও কৃষ্ণ) আদি তথা সর্বোচ্চ ঈশ্বর রূপে পূজিত হন। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে, বিশেষত ভক্তি ও ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে, বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তি উপনিষদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বেদ ও অন্যান্য পৌরাণিক শাস্ত্র। যথা— ভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ।

বৈষ্ণবধর্মের অনুগামীদের *বৈষ্ণব* নামে অভিহিত করা হয়। বৈষ্ণবরা হিন্দু সমাজের অন্যতম বৃহৎ অংশ। এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বাস ভারতে। তবে সাম্প্রতিককালে ধর্মসচেতনতা, স্বীকৃতি ও ধর্মপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাইরেও বৈষ্ণবদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আসছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখাটি। মুখ্যত ইসকন হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের প্রচারগত ও ভৌগোলিক প্রসার ঘটিয়ে এই কাজটি সম্পাদন করছে। এছাড়াও অতি সম্প্রতি অন্যান্য বৈষ্ণব সংগঠনও পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেছে।

ভাগবতধর্ম, আদি রামধর্ম ও কৃষ্ণধর্মের মিলন ঘটেছে ঐতিহাসিক বিষ্ণুবধর্মে। ঐতিহাসিক বিষ্ণুধর্ম আবার ঐতিহাসিক বৈদিকধর্মের একটি অঙ্গ। বিষ্ণু পূজার প্রাধান্য অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলি থেকে পৃথক করেছিল ঐতিহাসিক বিষ্ণুধর্মকে। বিষ্ণুধর্মের আকারেই ভারতে সর্বপ্রথম বৈষ্ণব ধর্মমতের চর্চা শুরু হয়। এককথায় বিষ্ণুধর্ম ছিল ভারতের প্রথম দেশজ সম্প্রদায়গত ধর্মমত। এই ধর্মমতে বিষ্ণুকে সকল অবতারের উৎসস্বরূপ বলে স্বীকার করে নেওয়া হলেও, বিষ্ণু নামটি কেবলমাত্র সর্বোচ্চ দেবতা অনেকগুলি নামের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হয়। তাঁর অন্যান্য নামগুলি হল নারায়ণ, বাসুদেব ও কৃষ্ণ। প্রত্যেকটি নামের সঙ্গে স্বকীয় দিব্য বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হয়; যেগুলিকে বৈষ্ণব ধর্মের সংশ্লিষ্ট উপসম্প্রদায়সমূহ পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষ্ণধর্ম বৈষ্ণবধর্মেরই একটি শাখা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য সম্প্রদায় কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বা স্বয়ং ভগবান মনে করে। কিন্তু বিষ্ণু মতের অনুগামীরা তা স্বীকার করেন না।

বৈষ্ণবধর্মের বিষ্ণুকেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলি বিষ্ণু বা নারায়ণকে সর্বোচ্চ দেবতা মনে করে। আবার বল্লভ সম্প্রদায় বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো কৃষ্ণকেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলি কৃষ্ণকেই সর্বোচ্চ দেবতা তথা সকল অবতারের উৎস মনে করে। বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসটির মূল ভিত্তি পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর নানা অবতারের উপাখ্যান। এই সকল উপাখ্যানে তাঁর সঙ্গে গণেশ, সূর্য, দুর্গা প্রমুখ দেবতার পার্থক্য প্রতিপাদন করে তাঁদের উপদেবতার পর্যায়ে পর্যবসিত করা হয়েছে। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুসারে, হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা শিব হলেন বিষ্ণুর অনুগত ভক্ত এবং স্বয়ং এক বৈষ্ণব। স্বামীনারায়ণ হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বামীনারায়ণ এই মতের বিরোধী। তাঁর মতে, শিব ও বিষ্ণু একই ঈশ্বরের দুই পৃথক সত্ত্বা। তবে উল্লেখ্য, স্বামীনারায়ণের মতবাদ বৈষ্ণবদের একটি সংখ্যালঘু অংশের মত।

বৈষ্ণব দর্শনের মূলভিত্তি হিন্দুধর্মের কয়েকটি কেন্দ্রীয় ধর্মমত; যথা : বহুদেববাদ, পুনর্জন্ম, সংসার, ধর্ম এবং বিভিন্ন যোগশাস্ত্র। তবে ভক্তিযোগের পথে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির প্রতিই এই ধর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ভক্তির অঙ্গ হল বিষ্ণুর নামগান (ভজন ও কীর্তন), তাঁর রূপচিন্তন (ধারণা) এবং দেপূজা।

দেবপূজার তত্ত্ব ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে পঞ্চরাত্র ও বিভিন্ন সংহিতায়।

পূজার মাধ্যমে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে তাঁদের অন্তরে অধিষ্ঠিতরূপে কল্পনা করেন। এই রূপে তাঁরা তাঁদের সত্ত্বার উৎস ঈশ্বরকে অন্তর্যামী নামে অভিহিত করেন। এই নামটি নারায়ণনামের সংজ্ঞার একটি অংশ। হিন্দুধর্মের অন্যান্য শাখাসম্প্রদায়ের জীবনের উদ্দেশ্য যেখানে মোক্ষ লাভ বা পরমব্রহ্মের সঙ্গে মিলন, সেখানে বৈষ্ণবদের জীবনের উদ্দেশ্য বিষ্ণু তাঁর কোনো অবতারের সেবায় মায়াময় জগতের বাইরে 'বৈকুণ্ঠধামে' অনন্ত আনন্দময় এক জীবনযাপন। ভাগবত পুরাণ অনুসারে বৈষ্ণবদের সর্বোচ্চ সত্ত্বার তিন বৈশিষ্ট্য—ব্রহ্মণ, পরমাত্মা ও ভগবান—অর্থাৎ, যথাক্রমে, *বিশ্বময় বিষ্ণু, হৃদয়যামী বিষ্ণু ও ব্যক্তিরূপী বিষ্ণু।*

৫.২.৩.৯ : সুফিবাদ

সুফিবাদকে বিভিন্নভাবে ইসলামী আধ্যাত্মবাদ হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়, তা হল একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। সুফিবাদের একমাত্র মূল বিষয়টি হল, আপন নফসের সঙ্গে, নিজ প্রাণের সাথে, নিজের জীবাত্মার সাথে পরমাত্মা আল্লাহ যে শয়তানটিকে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন তার সাথে জিহাদ করে তার থেকে মুক্ত হয়ে এ জড় জগত থেকে মুক্তি পাওয়া। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হল এই দর্শনের মর্মকথা। সুফিবাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টা করা হয়। হযরত ইমাম গাজ্জালি এর মতে, *আল্লাহর ব্যতীত অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার নামই সুফিবাদ বলে।* 'সুফ অর্থ পশম আর তাসাওউফের অর্থ পশমী বস্ত্রে পরিধানের অভ্যাস (লাব্‌সু'স-সুফ)-অতঃপর মরমীতত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজেকে এইরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামের পরিভাষায় তিনি সুফি নামে অভিহিত হন। ইসলামি পরিভাষায় সুফিবাদকে **তাসাওউফ** বলা হয়, যার অর্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান। তাসাওউফ বা সুফিবাদ বলতে আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনাকে বুঝায়। সুফীরা দাবি করে যে, আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে ফানাফিল্লাহ (আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান করা) এবং ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ (আল্লাহর সঙ্গে স্থায়িভাবে বিলীন হয়ে যাওয়া) লাভ করা যায়। তাসাওউফ দর্শন অনুযায়ী আল্লাহ-প্রাপ্তির সাধনাকে 'তরিকত' বলা হয়। বলা হয়, তরিকত সাধনায় মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। সেই পথ হলো ফানা ফিশ্‌শাইখ, ফানা ফিররাসুল ও ফানাফিল্লাহ। ফানাফিল্লাহ হওার পর বাকাবিল্লাহ লাভ হয়। বাকাবিল্লাহ অর্জিত হলে সুফি দর্শন অনুযায়ী সুফি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হন। তখন সুফির অন্তরে সার্বক্ষণিক শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে। সুফিগণের মতে, হযরত মহম্মদ (সা.) স্বয়ং সুফিদর্শনের প্রবর্তক। এর সপক্ষে সুফিগণ মহম্মদ (সা.) এর একটি হাদিস উল্লেখ করেন যা হল, ''সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি। সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড

আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়-এটা হচ্ছে কলব (হৃদপিণ্ড)। ''সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে কল্‌বকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহর প্রেমার্জন সুফিবাদের উদ্দেশ্য। যাঁরা তাঁর প্রেমার্জন করেছেন, তাঁদের তরিকা বা পথ অনুসরণ করে ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ অর্জন করাই হলো সুফিদর্শন।

সুফিবাদ উৎকর্ষ লাভ করে পারস্যে। সেখানকার প্রখ্যাত সুফি-দরবেশ, কবি-সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ নানা শাস্ত্র, কাব্য ও ব্যাখ্যা-পুস্তক রচনা করে এই দর্শনকে সাধারণের নিকট জনপ্রিয় করে তোলেন। কালক্রমে বিখ্যাত ওলিদের অবলম্বন করে নানা তরিকা গড়ে ওঠে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান তরিকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে :

1. আব্দুল কাদের জিলানীর নামে প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া তরিকা,

2. খাজা মু'ঈনুদ্দিন চিশতি প্রতিষ্ঠিত চিশতিয়া তরিকা,

3. খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দি তরিকা,

4. শাইখ আহমেদ আল ফারুকি সিরহিন্দি প্রতিষ্ঠিত মুজাদ্দিদিয়া তরিকা ও

5. সৈয়দ আহমদ উল্লাহ প্রতিষ্ঠিত মাইজভাণ্ডারী তরিকা।

এছাড়া সুহরাওয়ার্দিয়া, মাদারিয়া, আহমদিয়া ও কলন্দরিয়া নামে আরও কয়েকটি তরিকার উদ্ভব ঘটে।

৫.২.৩.১০ : উপসংহার

এই ভাবে দেখা যায় যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। সেই সমস্ত সম্প্রদায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমান ভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন।

৫.২.৩.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, জেনারেল।

(২) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি।

(৩) ''Buddhism | Foundations, History, Systems, Mythology, & Practice''। Encyclopedia Britannica

৫.২.৩.১২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় ধর্মে আদিতম বস্তুবাদী চিন্তা সম্পর্কে লেখ।

(২) বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করো।

(৩) জৈনদের সম্পর্কে কী জানো।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক-৬, ৭

Dalits in India

বিন্যাস ক্রম :

৫.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য (Objective)
৫.৩.৬.১ : দলিত ইতিহাসচর্চা
৫.৩.৭.২ : ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলন
৫.৩.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থ
৫.৩.৭.৪ : নমুনা প্রশ্ন (Model Question)

৫.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় জাতি, বর্ণ, সমাজ, শ্রেণী ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশই বাড়ছে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দলিত শ্রেণীর অনুন্নয়নের রূপরেখা, তাদের প্রতি বঞ্চনা ও দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ব্যবস্থায় তাদের গুরুত্ব ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে আগ্রহের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। দলিত ইতিহাসচর্চার এই আঙ্গিক সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ইতিহাস পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই কারনে আলোচ্য পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের ফলে শিক্ষার্থীরা 'দলিত' নামক পিছিয়ে পড়া একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব, তাদের সামাজিক বিবর্তন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবীতে তাদের আন্দোলন এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রদান সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। সর্বোপরি, দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনধারা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ইতিহাস চর্চার গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও শিক্ষার্থী ও পাঠকগন বিশেষ ভাবে অবহিত হবে।

৫.৩.৬.১ : দলিত ইতিহাসচর্চা

কাদের বলা হত দলিত

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যরা ভারতে আসে। এই সময় আর্যরা ভারতীয় জনসমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণে ভাগ করেন। প্রথম তিন বর্ণের মানুষকে সেবা করতে বাধ্য হত শূদ্ররা। উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে এরা ছিল অস্পৃশ্য। পরবর্তীকালে (বৃটিশ শাসনকালে) এরাই 'দলিত' নামে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য, দলিতরা নানা দিক থেকেই উচ্চবর্ণের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার হয়েছিল।

'দলিত' শব্দটি 1930 এর দশকে প্রথম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই আবার বর্তমান প্রশাসনিক পরিভাষায় তপশিলিজাতি ও তপশিলি উপজাতি ভুক্ত সকলকেই **'দলিত'** বলে আখ্যায়িত করতে চান। ভারতের এই

তথাকথিত দলিত বা অনুন্নতশ্রেণির মানুষদের বিরুদ্ধে অনাচার, বিভিন্ন মানবিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা বা অস্পৃশ্যতা দেশের সব মানুষ মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে বারংবার প্রতিবাদ উঠেছে এবং ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক গোষ্ঠী অস্পৃশ্যতা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দলিত.....মতাদর্শ ও অধিকার নিয়ে ভারতীয় আন্দোলনের প্রাণপুরষ গান্ধীজী এবং দলিত আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতা ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড. বি. আর. আম্বেদকর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

বৈদিক যুগ থেকে কতকগুলি পীড়নমূলক ও অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের একটা গোষ্ঠীকে 'অস্পৃশ্য' বলে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। হিন্দু সমাজের অংশ হয়েও তারা ছিল হিন্দু সমাজে পরিত্যক্ত। এ আর দেশাই-এর মতে, 'অস্পৃশ্যতা হল ভারতবর্ষে আর্য অধিকারের সামাজিক পরিনাম'। সামাজিক লেনদেন প্রক্রিয়ায় বিজিত ভারতীয়দের একাংশ আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে যারা সব থেকে অনুন্নত তারাই বংশানুক্রামিক অস্পৃশ্যজাতে পরিণত হয়েছিল। বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে অস্পৃশ্যরা 'দলিত' বা নিপীড়িত শ্রেণী হিসেবে পরিচিত হতে থাকে। গান্ধিজী তাদের 'হরিজন' নামে অভিহিত করেছেন। Louis Dumont-এর মতে, ভারতে সামাজিক মর্যাদাগত স্থান নির্ধারণের বিষয়টি মুলত ছিল ধর্মীয়। এভাবে নির্ধারিত হত সামাজিক পদমর্যাদা ও স্থান। ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সবার উপরে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ হিসেবে অস্পৃশ্যদের সবার নিচে স্থান দেওয়া হতো।

ধর্মীয় বিধান বা অনুশাসন দ্বারা অস্পৃশ্য বা দলিত শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হবার ফলে এই শ্রেণীর উপর শোষণ ও নিপীড়ন সামাজিক স্বীকৃত পায়। হিন্দু সমাজে বংশানুক্রমিক অস্পৃশ্যদের হীন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে হতো। সামাজিক বা বিধিগত কোন বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার দলিতদের থাকতো না। মন্দিরে প্রবেশ করা, একই পঙক্তিতে বসে ভোজন করা, উচ্চবর্ণের পাশাপাশি বসবাস করা ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মানবিক অধিকার ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত থেকেই দলিতদের বাঁচা ছিল সামাজিক বিধান।

ধর্মের বিধান থেকেই অস্পৃশ্যতাকে সামাজিক রূপ দেওয়া হলেও মাঝে মাঝে ধর্মের বিচার থেকেই এই অমানবিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়েছে। ধর্মভাবনা সর্বদা সর্বজনীন ছিল না। বিভিন্ন সময় ধর্মের ভিতর থেকেই ধর্মের প্রাধান্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। মধ্যযুগের ভক্তিবাদী আন্দোলন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ধর্মসংস্কারক ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। তারা ধর্মাচার ভিত্তিক জাতি ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিশুদ্ধ ভক্তির নিরিখে সকল সামাজিক মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। এই আন্দোলন সামাজিক গতিশীলতা বা social mobility র সম্ভাবনা দৃঢ় করেছিল।

জাতি ব্যবস্থার উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিকরা দলিত ইতিহাস চর্চায় লিপ্ত হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নের উত্থান ঘটে। এগুলি হল—

(১) দলিত বিষয় নিয়ে লিখিত গ্রন্থগুলি কিভাবে ইতিহাসচর্চার একটি কার্যকর মডেল গড়ে তুলেছে?

(২) তারা কি আদৌ কোন বিকল্প ইতিহাস চর্চা গড়ে তোলে?

(৩) এই ধরনের ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি কি হতে পারে?

(৪) Elite colonialist, জাতীয়তাবাদী এবং নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার বিকল্প হিসাবে এই ধরনের ইতিহাস চর্চাকে কি প্রতিপন্ন করা উচিত?

উল্লেখ্য, দলিত activists এবং লেখকরা দলিত ইতিহাস চর্চার আলচনা প্রসঙ্গে নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। তাদের প্রধান বক্তব্য হল নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার সাথে যুক্ত পার্থ চ্যাটার্জীর ন্যায় অন্যান্য ঐতিহাসিক ও গবেষকরা কেন আম্বেদকরের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন? এছাড়াও বলা হয় যে নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরা মুলত Dumont এবং Dirks দের সম্পর্কে যতটা আলোচনা করেছেন, Periyar, Phule, অথবা Ambedkar সম্পর্কে তারা ততটাই নীরব থেকেছেন।

প্রসঙ্গত একথা বলা যায় যে, নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের কাজের পরিধি বিশ্লেষণ করলে দলিত গবেষকদের উপরিউক্ত সমালোচনাকে গ্রহণ করা যায় না। যেমন নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিক জ্ঞ্যানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর 'A History of Prejudice : Race, Caste and Difference in India and the United States' নামক গ্রন্থে আম্বেদকর, দলিত আত্মচরিত, ১৯৫৬ সালের দলিত ধারণার রূপান্তর, দলিত রাজধানী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। একই ভাবে পার্থ চ্যাটার্জী ২০০৪ সালে প্রকাশিত 'The Politics of the Governed' নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তথা 'The Nation in Hetergeneous Time'-এ আম্বেদকরের রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের রাজনৈতিক গঠনে তার গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্গীয় চর্চার সাথে যুক্ত গবেষকরা জ্ঞানদীপ্তোর যুগের নৈতিক গুণসমূহ যথা স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ইত্যাদির সাথে 'দলিত' এর যুগপৎ আলোচনায় সমস্যা অনুভব করেছেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক গবেষক ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, 'the problem is so haunting in this case that Chakravorty and Pandey find it difficult to have intellectual alignment with either of those two diametrically opposite personalities and their philosophies that are situated at the two ends of India's political spectrum—Gandhian village life of *Ram rajya* on the one hand, and an "Ambedkarite modernity" on the other। দীপেশ চক্রবর্তী এবং জ্ঞ্যানেন্দ্র পাণ্ডে উভয়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বি আর আম্বেদকর দলিত এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুক্তির প্রেরনা। কিন্তু যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই সমস্ত শোষিত ও পরাধীন মানুষদের মাঝে নিখুঁত বেশভূষা, দ্ব্যর্থহীনভাবে যুক্তিসংগত ও জ্ঞানী, শিক্ষিত, শান্ত ও অবিচল এবং একজন বলিষ্ঠ আধুনিক নেতা হিসাবে আম্বেদকরের ভাবমূর্তি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা দলিত কথন কে আধুনিকতার অভিব্যক্তি হিসাবে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। ঐতিহাসিক Gail Omvedt তাঁর 'Dalits and the Democratic Revolution : Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India' গ্রন্থে উনিশ শতকের সময়কাল থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সালে আম্বেদকরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দলিত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগুলি তুলে ধরেছেন। মুলত অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে এবং কর্ণাটকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে Dr. Omvedt একদিকে যেমন দলিত আন্দোলনের আদর্শ এবং সাংগঠনিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন (বিশেষ করে গান্ধী তথা গান্ধীবাদ) এবং মার্কসবাদের প্রেক্ষাপটে কৃষক-শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের সাথে এর বোঝাপড়া তুলে ধরেছেন। একই সাথে তিনি জাতিভেদ ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং বিকাশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যদিকে ভারতীয় দলিত সাহিত্য মূলত জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা থেকে উদ্ভূত। মনুষ্য সমাজের এই প্রক্রিয়া ভাঙার চেষ্টা বহুবার বহু সময়ে হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে একে ভাঙার যে শক্তি, একে টিকিয়ে রাখার শক্তি তার থেকে অনেকগুণ বেশি। বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্য দখল এবং হিন্দু স্ক্রিপচারগুলিকে পুনর্লিখনের ভিতর দিয়ে সেই শক্তি প্রথমে সংহত হয়। তারপর, সেন রাজাদের প্রয়াস এবং শঙ্করাচার্যের প্রচারে সেই ভিত অনেক মজবুত হয়। মধ্যযুগের প্রায় ৬০০ বছরের মুসলমান রাজত্বে এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজত্বে এদেশে বর্ণবিভাজন, পুরোহিততন্ত্র ও মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে স্বাধীনোত্তরকালেও দলিতদের অবস্থান, তাঁদের উপর শোষণ, নির্যাতন, গণনিধন, দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এদেশে 'ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম' তার সঠিক উদ্দেশ্য লাভে আদৌ সফল হতে পারবে কিনা!

স্বাধীনতা-পূর্ব কালে যেমন জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সমাজে বিষের মতো ছড়িয়ে ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালেও চরিত্রগত কিছু হেরফের হলেও তার মূল কাঠামো অপরিবর্তনীয় আছে। তবে আশার কথা এই যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের ইতিকথা ইতিমধ্যেই অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিশ শতকের ষাটের দশকের দলিত আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এখন ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দি ভাষাভাষী প্রদেশগুলির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলিও পিছিয়ে নেই এই মুহূর্তে।

মারাঠি দলিত সাহিত্য

দলিত সাহিত্যের জনক বলা হয় থাকে মহারাষ্ট্রকে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকেই ধীরে ধীরে দলিত সাহিত্যচর্চা মহারাষ্ট্রে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে চর্চিত হতে থাকে। ঔরঙ্গাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গঙ্গাধর পান্তাবানে সম্পাদিত 'অস্মিতাদর্শ' নামক সাহিত্য ত্রৈমাসিকের এক বিশেষ সংখ্যায় প্রথম 'দলিত সাহিত্য' কথাটা উঠে আসে। 'গোলামগিরি' গ্রন্থের রচয়িতা জ্যোতিবা ফুলে এবং পরবর্তীকালে তাঁরই চিন্তা-চেতনার অনুসারী ড. বি. আর. আম্বেদকর সমাজ বিবর্তনের যে আন্দোলন সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে শুরু করেছিলেন তার ফলেই সমাজে 'অস্পৃশ্য' বলে চিহ্নিত শিক্ষিতরা জন্ম দেন এই নতুন ধারার।

মারাঠি দলিত সাহিত্য যাঁদের অবদানে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে দয়া পাওয়ার, যশবন্ত মনোহর, বামন নিম্বালকর, অরুণ কামলে, নামদেও ধাসাল, শরণ কুমার লিম্বালে, কেশব মেশ্রাম, জে ভি পাওয়ার, কুমুদ পাওরে, শঙ্কররাও খারাত, প্রকাশ খারাত, জ্যোতি লাঞ্জেয়ার, অর্জুন দাংলে, হীরা বানসদে, মীনা গজভিয়ে, লক্ষণ গায়কোয়াড়, সুধাকর গায়কোয়াড়, লক্ষণ মানি, কিশোর কালে, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শরণ কুমার লিম্বালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'বেজন্মা' উপন্যাস। বিস্মিত হয়ে আমরা লক্ষ্য করি যে, 'বেজন্মা' শিরোনাম দিয়ে আত্মচরিতমূলক উপন্যাস লিখে কোনও ঔপন্যাসিক তাঁর শূদ্রা জননী দু'মুঠো ভাতের জন্য পরপর তিনজন উচ্চ বর্ণের প্রভুর কাছে কিভাবে বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে যাচ্ছেন। 'বেজন্মা' এককথায় তাঁরই আত্মোপাখ্যান।

মারাঠি দলিত সাহিত্যের অন্যতম বড় স্তম্ভের নাম দয়া পাওয়ার। কবি হিসেবেই তাঁর অধিক সুখ্যাতি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'কোন্ডওয়ারা' (১৯৭৪), 'ক্লিতান' (১৯৮৩), 'চাওড়ি' (১৯৯৩), প্রভৃতি। 'কোনড্ওয়ারা' (১৯৭৪) কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৭৫ সালে মহারাষ্ট্র সরকারের থেকে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের সম্মান লাভ করেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'বলুত' (১৯৭৮) পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়।

মারাঠি ভাষার দলিত কবিদের মধ্যে সবথেকে ব্যতিক্রমী ও অন্যতম শক্তিশালী কবি নিঃসন্দেহে নামদেও ধাসাল। দয়া পাওয়ার, অরুণ কাম্বলে, জে ভি পাওয়ার, বাবুরাও বাগুল, ডি কে বেদকর, অর্জুন দাংলে, উমাকান্ত রণধীর, রামদাস সোরতে, ত্রয়ম্বক সপকালে, প্রমুখদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন 'দলিত প্যান্থার' নামে ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বদলের একটি বিপ্লবী সংগঠন। অত্যাচার, শোষণ, আর বঞ্চনা ভেঙে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি ছিলেন দলিত প্যান্থাররা। ধাসালের 'গোলপিঠা' কাব্যগ্রন্থ গোলপিঠার মানুষদের নিয়ে মূলত তাদেরই মুখের ভাষায় রচিত।

গুজরাতি দলিত সাহিত্য

দলিত প্যান্তারদের আন্দোলন মহারাষ্ট্র থেকে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়েছিল গুজরাতে। নীরব প্যাটেল, মঙ্গল রাঠোর, যশবন্ত বাঘেলা, জয়ন্ত পারমার, রাজু সোলাঙ্কি, প্রমুখ কবিরা গুজরাতি ভাষায় দলিত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। গুজরাতে প্রতিবাদের অন্যতম প্রধান কবি নীরব প্যাটেল। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আক্রোশ'। এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে 'BURNING FROM BOTH THE ENDS' শিরোনামে কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয় দলিত প্যান্থারদের উদ্যোগে।

আমেদাবাদে শ্রীমতি সদ্গুনা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গুজরাতি ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক যশবন্ত বাঘেলাও অন্যতম খ্যাতনামা গুজরাতি দলিত কবি। তাঁর লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি প্রবন্ধ সংকলন দলিত সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। এছাড়া কবি মঙ্গল রাঠোরের কবিতাতেও খুব জোরালো ভঙ্গীতে দলিত মানুষের কথা উঠে এসেছে। এসেছে দলিত-অদলিত দুর্বল আত্মীয়তার কথা।

শুধুমাত্র কবিতা লিখে সমাজ বদলানো যায় না এই সত্য জেনেও কবিদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায় নি। বিশেষ করে হিন্দুত্বের দলনের প্রক্রিয়া অন্যান্য রাজ্যের থেকে গুজরাতে কম কিছু নয়, আর তাই দলিত সাহিত্যের প্রতিবাদও এখানে জোরালো। আসলে বর্ণবিভাজিত ধর্মের অঙ্গনের মূল্যবোধ ও সাম্যের সন্ধানে তাঁদের যাত্রাপথের মূল্যবোধে অনেক তারতম্য বর্তমান। তবে একদা যে উগ্র হিন্দুত্ব প্রবলভাবে গ্রাস করেছিল গুজরাতি মানুষের মন ও মেজাজ, দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলনের ফলে তা আজ অনেকাংশে স্বাভাবিকতার পথে।

পাঞ্জাবি দলিত সাহিত্য

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতো পাঞ্জাবেও প্রেম গোরখি, আত্তারজিৎ, কিরপাল কাজাক, ভুরা সিংহ কালের, লাল সিংহ দিল, নাচ্ছাতার, গুরুদাস রাম আলম, প্রমুখ সাহিত্যিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দলিত

সাহিত্যচর্চা বিশেষ মাত্রা পায়। পাঞ্জাবি ভাষা-ভাষীরা কখনোই 'অধিকারভেদে মনুষ্য সমাজ বিভাজিত' বিষয়টি মেনে নেননি। সকল শিখগুরু এবং তাঁদের ভক্তেরা ছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। সেইদিক থেকে বিচার করলে 'আদি গ্রন্থ' পাঞ্জাবে দলিত সাহিত্যের মূল তত্ত্ব সূচিত করেছিল কয়েকশো বছর আগেই।

দলিত ঔপন্যাসিক হিসেবে নানক সিংহ, যশন্ত সিংহ কানওয়াল, কর্তার সিংহ দুগগাল, সুরিন্দার সিংহ নরুলা, প্রমুখেরা বিশেষ পরিচিত। এঁদের রচনায় পাত্র-পাত্রীরা সরাসরি দলিত সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা মানুষজন। তাই তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা, যন্ত্রনার কাহিনী মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে আখ্যানগুলিতে। প্রেম গোরখির 'গর হাজির আদমি' (১৯৯৪) লেখকের নিজেরই আত্মজীবনী। এছাড়া ষাটের দশকের শেষভাগে প্রকাশিত গুরদিয়াল সিংহের 'মারহি দা দিওয়া' পাঞ্জাবি উপন্যাসের চিরাচরিত ধারা বদলে দেওয়া উপন্যাস বলে পরিচিত। সোহন সিংহ শীতলের 'যুগ বদল গিয়া' অন্যতম উল্লেখযোগ্য দলিত উপন্যাস।

সত্তরের দশকে পাঞ্জাবে যে বৈপ্লবিক চেতনা পাঞ্জাবি সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই ধারারই অনুসারী কবি লাল সিংহ দিল। মূলত তাঁর এবং কবি গুরুদাস রাম আলমের কবিতায় দলিত জীবন স্পষ্ট মাত্রা পেয়েছে।

কন্নড় দলিত সাহিত্য

কন্নড় প্রদেশের প্রতিটি জেলায় সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গড়ে উঠে 'বান্ডাইয়া' আন্দোলন। দলিতদের উপর সামাজিক এবং দৈহিকভাবে অত্যাচারের কথা কখনো কোথাও শোনা গেলেই বান্ডাইয়া আন্দোলনকারীরা এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতেন। দলিত-অদলিত উভয়েরই উদার মনস্ক মানুষ ছিলেন এই আন্দোলনের শরিক। কন্নড় দলিত সাহিত্যের সবথেকে শক্তিমান কবি নিঃসন্দেহে সিদ্ধা লিঙ্গাইয়া। ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্নড় ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক সিদ্ধা লিঙ্গাইয়ার কবিতায় দলিতদের মুখের ভাষা ও সমাজের করুণ চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কবি এইচ গোবিন্দাইয়া, কে রামাইয়া, গঙ্গারাম চণ্ডাল, এল হনুমন্তাইয়া, প্রমুখ কবিদের মতোই তাঁর কবিতাতেও আছে লোকগীতির প্রভাব। সিদ্ধা লিঙ্গাইয়ার বিখ্যাত কবিতা ও নাটকের বইগুলি হল 'সবিরারু নাডিগালু', 'হোলেমাডি গারা হাডু', 'কপ্পু কাডিন হাডু', 'পঞ্চমা নেলাসামা'।

দেবানুর মহাদেব কন্নড় দলিত সাহিত্যের ব্যতিক্রমী লেখক। তাঁর ছোটগল্পের সংকলন 'দ্য ভনরু' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। 'ওডালালা' ও 'কুসুমাবালে' নামক উপন্যাস দুটি যথাক্রমে প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ এবং ১৯৮৮ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৯০ সালে দেবানুর মহাদেব তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'কুসুমাবালে'র জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

কন্নড় ভাষার দলিত বর্গের নারী গীতা দেবীও সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন ২০০৪ সালে, গুলবর্গা অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষা উপন্যাসের ফুটিয়ে তুলে। দলিত মানুষদের নিয়ে এখনও পর্যন্ত তিনি প্রায় আঠারোটি উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। এছাড়া ড. অরবিন্দ মালাগাট্টি কন্নড় দলিত সাহিত্যের বিভিন্ন

দিক বিশেষ করে কন্নড় দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের মৌলিক আলোচনা করেছেন তাঁর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে।

তামিল দলিত সাহিত্য তামিলনাড়ুতে দলিতদের উপর অত্যাচার ব্রিটিশ আমল থেকেই ভীষণভাবে চলে আসছিল। অচ্ছুৎ পশুর মতো দলিতরা চিহ্নিত হলেও সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর অস্তিত্ব যেভাবে আছে, তাঁদের আশা-আকাঙ্খার কথা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা যেকোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে চিন্তা মথিত করে। আশির দশকের প্রথমেই তামিল সাহিত্যের দলিতদের কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে শোনা যায়। 'কোডঙ্গি', 'কালাম', 'মানুষাঙ্গাদা', 'নিরাপ্পিরিহাই', 'দলিত', 'কালাক্কু' প্রভৃতি পত্রিকা দলিত সমাজ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। অভিমানী, ইদয়ভেন্দান, পুন্নি, বামা, উঞ্জাই রাজন, চো দারমান, দানিয়েল, প্রমুখ লেখকদের হাত ধরে তামিল দলিত সাহিত্য পুষ্ট হয়।

ইমায়াম তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কোভেরু কালুদাইহাল' তে দেখিয়েছেন ক্রিশ্চান-দলিত, দলিতদের মধ্যে আরও বেশি দলিত। ভিলি পা ইদয়ভেন্দানের রচনায় উঠে আসে দারিদ্র ও দলিত জীবনের রূঢ় বাস্তবতা। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'পিরাহু' উপন্যাসেও লেখক পুন্নি এক দরিদ্র মুচির জীবন কাহিনীর করুণ বিবরণ আমাদের শুনিয়েছেন। দলিত মহিলা লেখিকা বামার আত্মচরিতমূলক উপন্যাস 'কারুক্কু' তে ফুটে উঠে নিম্নবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত সন্ন্যাসিনীরাও কিভাবে অস্পৃশ্যতার শিকার। এছাড়া তেলেগু ভাষার দলিত কবি বোয়ি ভিমান্না তাঁর 'গুডিসেলু কালিপোত্থুনেয়ি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৭৫ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

বাংলা দলিত সাহিত্য

১৯০৯ সালে রাসবিহারী রায়ের সম্পাদনায় 'নমঃশূদ্র দর্পণ' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ বাংলায় দলিত সাহিত্য আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উল্লেখ্য সম্পাদক নিজে সে সময় নিজের কাঁধে পত্রিকা নিয়ে খুলনা, যশোর, ২৪ পরগণা, হুগলি জেলার প্রত্যন্ত তপশিলি অঞ্চলে গিয়ে, কার্যত 'পুশ সেল' করে পত্রিকার খরচ নির্বাহ করতেন। অনেকের মতে তাঁর এই উদ্যোগ ও দায়বদ্ধতা জঙ্গিপুরের 'দাদাঠাকুর' কিংবা কুমারখালির 'কাঙাল হরিনাথের' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ক্রমেই সারা বাংলা জুড়ে ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে শুরু করে। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের 'জিতেন্দ্রনাথ' কে নিয়ে লিখে পৌণ্ড্র জাতির মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল সমাজকর্মীরূপে পরিচিত হন। বরিশালের স্বরূপকাঠির মালুহার গ্রাম থেকে ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে শশিকুমার বাড়ৈবিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নমঃশূদ্র দ্বিজতত্ত্ব'। মাথাভাঙ্গার খালসামারি গ্রামের ঠাকুর পঞ্চাননের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ'। এছাড়া বলরাম সরকার সম্পাদিত 'নমঃশূদ্র জ্ঞানভাণ্ডার' ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'নমঃশূদ্র চন্দ্রিকা' এই সময়ের উল্লেখযোগ্য দলিত পত্রিকারূপে বিবেচিত হয়। বর্ধমান জেলার দরিদ্র নমঃশূদ্র পরিবারের সন্তান হরিদাস পালিতের আত্মচরিত 'একজন পতিত জাতির কর্মী' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। সাতের দশকে নরেশ দাশের সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'নবযুগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ'। আটের দশকে নকুল মল্লিকের উদ্যোগে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ'।

শুধুমাত্র বাংলা ভাষাতেই নয়, ইংরেজি ভাষাতেও যাতে দলিত সাহিত্যের বিকাশ ঘটে সেকথা মাথায় রেখে ড. এ আর বিশ্বাস ও ড. জে পি মণ্ডলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাইটিং আকাদেমি অফ লেটার্স'। 'দলিত মিরর' ইংরেজি পত্রিকাও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়ের মতো বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী লেখকদের রচনার পাশাপাশি সাম্প্রতিককালের বাংলা দলিত রচনার মধ্যে অনিল ঘড়াইয়ের 'মুকুলের গন্ধ', মহীতোষ বিশ্বাসের 'মাটি এক মায়া জানে', কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের 'উজানতলীর উপকথা', সমরেন্দ্র বৈদ্যের 'পিতৃগণ', প্রসাদ মণ্ডলের 'মানস সরোবর', অনিলরঞ্জন বিশ্বাসের 'রঙবেরঙের দিনগুলি', যুধিষ্ঠির জানার 'নিমকি মালের দিনরাত', গোবিন্দদাস শৌণ্ডের 'অনাদৃতা', সুনীল কুমার দাসের 'দলিত মানুষের গল্প', 'ব্ল্যাক দলিত', ড. মনোরঞ্জন সরকারের 'একজন দলিতের আত্মকথা', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আসলে দলিত সাহিত্য শুধুমাত্র বাংলার মাটিতে নয়, সারাভারতবর্ষেই এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের। সহানুভূতি দিয়ে শুধু নয়, দলিত সাহিত্যে পাওয়া যায় সমানুভুতির স্পন্দন। ধর্মনিরপেক্ষতার বোধের পাশাপাশি বর্ণনিরপেক্ষতার বোধ যেকোনো দেশের পক্ষে সমানভাবে জরুরি।

৫.৩.৬.২ : ভারতর্ষে দলিত আন্দোলন

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার-এর সূত্রে ভারতে যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তাঁরা মানসিকসতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, সোশাল রিফর্ম কনফারেন্স প্রভৃতি সংগঠনসহ মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত হরিজন সংঘ'-এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন দলিত বা হরিজনদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার চালান। দলিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুত্রেই এই শ্রেনী থেকে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মত বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি হয়। তিনি দলিত শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় ''All India Depressed Classes Federation'। এছাড়াও দলিত শ্রেনীভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য স্থানীয় ও গোষ্ঠীগত সংগঠন ছিল। এইসব সংগঠনের নেতৃত্বে দলিতদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ শুরু হয়।

ভারতে দলিত শ্রেনীর জাগরণে খ্রিস্টান মিশনারিদের পরোক্ষ অবদান উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টান মিশনারীরা দলিতদের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের খ্রিস্টধর্মের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে দলিতরাও ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আগ্রহ বোধ করেন। একইসঙ্গে মিশনারিরা দলিতদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিশেষ চেষ্টা চালান। নতুন শিক্ষা প্রসারের ফলে দলিতদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগরিত হয়। গবেষক পি. কনস্টেবল তাঁর 'Modern Asian Studies' গ্রন্থে *'দলিত শ্রেণীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি'* বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আত্মসম্মানের এই বানীকে দলিতদের মধ্যে কিছু সুসংবদ্ধ মানুষ ভক্তিবাদী আদর্শের সাথে যুক্ত করে নেন এবং জাতিগত অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাবাদর্শ গড়ে তোলে'।

জাতিগত আত্মসম্মানবোধ এবং জাতিগত অবমাননার বিরুদ্ধে দলিতদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রতিবাদী জাগরণের ঘটনা সামনে আসে। কেরলে 'পুনারা', তামিলনাড়ুতে 'নাদার', মহারাষ্ট্রে 'মাহার', বাংলার 'নমঃশূদ্র',

দিল্লি, ছত্রিশগড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের 'চামার' প্রভৃতি শ্রেনীর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়। দলিত শ্রেনী প্রতিবাদের ভাষা ও পদ্ধতি হিসেবে হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রীতি পদ্ধতি অমান্য বা ভঙ্গ করার পথ বেছে নেয়। যেমন অস্পৃশ্যরা হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতো না। তাই প্রতিবাদ হিসাবে তারা জোটবদ্ধ হয়ে মন্দিরে প্রবেশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিংশ শতকের গোড়ায় এমনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল—১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ভাইকম সত্যাগ্রহ, গুরুভায়ু সত্যাগ্রহ (১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দ), ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কালী মন্দির সত্যাগ্রহ (মুন্সিগঞ্জ), ১৯৩০-৩৫ খ্রিস্টাব্দে কালারাম মন্দির সত্যাগ্রহ (নাসিক) ইত্যাদি।

ধর্মীয় অধিকারের দাবির পাশাপাশি দলিত শ্রেনী সামাজিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনমুখী হয়। দলিতরা দাবি করে যে, তারাই ভারতের আদি অধিবাসী, যারা বহিরাগত আর্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এখন তারা পূর্বের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিতে সোচ্চার হয়। দলিত শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে পোশাক বিধির নানান কঠোরতা সামাজিক ভাবে চালু ছিল। উচ্চবর্ণের মহিলাদের অনুরূপ পোশাক নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারতে এজভ এবং নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাতেও ১৮৭০-এর দশকে নমঃশূদ্র শ্রেণী উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন চালায়। পানীয় জলের কূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দলিতদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ ছিল। এই কূপের জল ব্যবহারের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করার দাবিতে মহারাষ্ট্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে চামারদের প্রতিবাদ সংগঠিত হয়।

দলিতদের জাগরণবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রীঃ) দেশে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মুক্তি ছাড়া ভারত শক্তিশালী জাতি রূপে গড়ে উঠতে পারবে না। তিনি 'দলিত' শ্রেণীকে (Depressed Class) 'হরিজন' নামকরনের বিরোধিতা করেন। আম্বেদকর এর মতে, সামাজিক পার্থক্য থাকার জন্য হিন্দুদের জাতীয়তাবাদের মধ্যেই অস্পৃশ্যতার ধারণা লুকিয়ে আছে। অবশ্য তাঁর সামাজিক তত্ত্ব সম্পর্কে সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্ক আছে। যাইহোক একাধিক দলিত সংগঠন তৈরি করে তিনি দলিত-মুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মাহার এলাকার (মহারাষ্ট্র) স্থানীয় পুরসভার নিয়ন্ত্রণভুক্ত পানীয় জলের কূপ ব্যবহারের দাবীতে কয়েক হাজার দলিতের সমন্বয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। একই বছরে মনুস্মৃতি আগুনে পুড়িয়ে তিনি অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে, এই গ্রন্থটি অস্পৃশ্যতার ধারণা বিষয়ক আদি গ্রন্থ।

জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে জাতি ভেদাভেদ বা অস্পৃশ্যতার বিষয়গুলিকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। গান্ধীই প্রথম অস্পৃশ্যতার কুফল সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করেন। অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২ খ্রিঃ) প্রস্তাবে স্বরাজ অর্জনের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিষয়ে জোর দেন। কিন্তু গান্ধী হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথাকে অস্বীকার না করেই হরিজন শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা

বৃদ্ধির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মূলত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণ হিন্দুদের কাছে নিপীড়িত শ্রেণিকে আপন করে নেবার পরামর্শ দেন। ডঃ আম্বেদকর জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচিকে দলিত শ্রেণীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সহায়ক বলে মনে করতেন না। তাই তিনি গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯৩১ খ্রিঃ) দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করেন। 'সর্বভারতীয় নিপীড়িত শ্রেণীর সমিতি'র সভাপতি এম সি রাজা স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষয়ে আম্বেদকরের বিরোধিতা করেন। তবে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের ঐক্যে ভাঙন ধরানোর লক্ষ্যে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award)-এ দলিতদের 'তপশিলি জাতি' (Scheduled Caste) হিসেবে পৃথক নির্বাচনে অধিকার প্রদান করে। গান্ধী এর বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেন। এমতাবস্থায় আম্বেদকর 'পুনাচুক্তি' স্বাক্ষর করে একটা সমঝোতার আসেন। এই চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকে এবং তপশিলি জাতির জন্য 151 টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।

দলিতদের সংগঠিত করার বিষয়ে গান্ধীর সাথে কংগ্রেসের মতান্তর ঘটে। গান্ধী 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ'-এর মাধ্যমে দলিতদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কাজ শুরু করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা জগজীবন রামের নেতৃত্বে 'সর্বভারতীয় নিপীড়িত শ্রেণীর লিগ' গঠন করে (১৯৩৫ খ্রিঃ) সংরক্ষিত আসনগুলি দখলের উদ্যোগ নেন। তবে ১৯৩৭-এর নির্বাচন সফল হয়নি। অন্যদিকে আম্বেদকরের 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' বোম্বাইয়ে বিপুল সাফল্য পায়। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে দলিত শ্রেণীর মানুষেরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয় রাজনীতির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও আম্বেদকর পরিস্থিতির দাবি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি পদে আম্বেদকরকে নির্বাচিত করে কংগ্রেস তাদের সদিচ্ছা প্রকাশ করে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে 'তপশিলি জাতি' ও 'তপশিলি উপজাতি'-এই পর্যায়ে দলিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য বহুমুখী সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

৫.৩.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। 'Dalit Studies'–Rammarayan S. Rawat

২। 'Dalits and the Democratic Revolution : Dr Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India'–Gail Omvedt.

৩। 'Dalit Movement in India and Its Leaders, 1857-1956'–Ramacandra Kshirasagara

৫.৩.৬.৪ : নমুনা প্রশ্ন (Model Question)

১। দলিত কারা? ভারতীয় জাতি ব্যবস্থায় দলিত শ্রেণীর উত্থান ও বিবর্তন ব্যাখ্যা কর?

২। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলনের রূপরেখা বিশ্লেষণ কর?

৩। তুমি কি মনে কর যে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার সাথে যুক্ত গবেষক ও ঐতিহাসিকরা দলিত ইতিহাস চর্চাকে উপেক্ষা করেছেন?

পঞ্চম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৪

একক-৮, ৯, ১০, ১১

Culture and heritage of India

বিন্যাস ক্রম :

৫.৪.৮.০ : ভূমিকা

৫.৪.৮.১ : বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ

৫.৪.৯.২ : বাংলার লোকসংস্কৃতি

৫.৪.১০.৩ : হিন্দু মন্দির

৫.৪.১১.৪ : মন্দিরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

৫.৪.১১.৫ : উপসংহার

৫.৪.১১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.১১.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

৫.৪.৮.০ : ভূমিকা

বর্তমান পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে, এবং তার সাথে ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হবে তারা। এর মাধ্যমে সমাজের নানা দিক ফুটে উঠবে।

৫.৪.৮.১ : বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ

আসাম :

বিহু অসমের জাতীয় উৎসব। বিহুর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই উৎসব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসঙ্গে উদযাপন করেন। বিহু মূলতঃ এক কৃষি ভিত্তিক উৎসব। মূলতঃ তিন প্রকার বিহু উৎসব পালিত হয়, এগুলি হল ব'হাগ বিহু বা রঙ্গালী বিহু, কাতি বিহু বা কঙ্গালী বিহু এবং মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু।

বিহু শব্দের উৎপত্তি :

'বিহু' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে, কিন্তু কোনো মতই সর্বসম্মত নয়। কোনো পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত 'বিষুবত' শব্দ থেকে বিহু শব্দের উদ্ভব হয়েছে। বৈদিক 'বিষুবন' শব্দের অর্থ বছরের যে সময়ে দিন এবং রাত সমান হয়। অনেকের মতে, বিহু শব্দটি বৈ (উপাসনা) এবং হু (গরু) এই শব্দ দুটি থেকে এসেছে।

বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার মতে বিহু শব্দটি কৃষিজীবী ডিমাসা জনজাতির মধ্যে প্রচলিত শব্দ। তাঁরা তাঁদের দেবতা ব্রাই শিবরাইকে শস্য উৎসর্গ করে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করেন। বি শব্দটির অর্থ প্রার্থনা করা এবং শু শব্দের অর্থ শান্তি ও সমৃদ্ধি। বিশু শব্দ থেকে বিহু শব্দের উৎপত্তি। অন্যমতে হু শব্দটির অর্থ দান করা।

বহাগবিহু বা রঙ্গালী বিহু

অসমর মূল বিহু উৎসব বসন্তের শুরুতে উদযাপন করা হয়। রঙ্গালী বিহু যৌবনের উৎসব। বহাগ বা রঙ্গালী বিহু সাতদিন ধরে উদযাপন করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে পরের মাসে ৬ তারিখ পর্যন্ত এই উৎসব হয়ে থাকে। এই সাত দিনে প্রত্যেক দিনে বিহুর পৃথক নাম রয়েছে। একে সাত বিহু বলে জানা যায়। এই উৎসবে কৃষকেরা ধান উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুত করেন এবং মহিলারা পিঠা, নাড়ু প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এই বিহুর প্রথম দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন গরু বিহু নামে পরিচিত। এই দিন গরুদের পরিষ্কার করিয়ে পূজা করা হয়। পরের দিন মআনুহ বিহু বা মানুষ বিহু পালন করা হয়। এই দিন নতুন বস্ত্র পরিধান করে নতুন বছর উদযাপন করা হয়। পরের দিন দেবতার মূর্তিকে স্নান করিয়ে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়ে 'গোসাই বিহু বলে এই উৎসব পালন করা হয়। এই সময় বিহুগীত সহযোগে বিহু নৃত্যের মাধ্যমে যুবক যুবতীরা উৎসব পালন করে থাকেন।

রঙ্গালী বা বহাগ বিহু অনুষ্ঠান

রঙ্গালী বা বহাগ বিহু হচ্ছে আনন্দের বিহু। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকেই গান-বাজনা ও বিহু নৃত্যের মাধ্যমে রঙ্গালী বিহু অনুষ্ঠান পালন করা হয়। রঙ্গালী বিহু মূলত অসমিয়া জাতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিন্তু এখানে অসমের বিভিন্ন জনজাতি যেমন : বড়ো, তিবা, কছাড়ি ইত্যাদি জনজাতিরা নিজেদের সংস্কৃতি প্রকাশ করার সুযোগ পায়। অসমীয়া সংস্কৃতির বাদ্যযন্ত্র ঢোল, পেপা, বাশি ব্যবহার করে গাওয়া গান ও বিহু নর্তকদের নাচ বিহু মঞ্চকে সুমধুর করে তোলে। উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানটি বিনামূল্যে উপভোগ করার সুবিধা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোট-বড় সবাই নিজের প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। সাধারণতঃ এই অনুষ্ঠান সন্ধ্যাকাল থেকে আরম্ভ হয় ও পরদিন সূর্য উদয় হওয়ার ঠিক পূর্বে সমাপ্ত করা হয়। আসামের বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী দ্বারা গানের অনুষ্ঠান করা হয়। আগেকার বিহু অনুষ্ঠানে কেবল বিহু ও অসমীয়া গান গাওয়ার অনুমতি ছিল কিন্তু বর্তমান দিনে স্থানভেদে হিন্দী, বাঙ্গালী ও নেপালী গান গাওয়ার প্রচলন হয়েছেন।

কাতি বিহু বা কঙ্গালী বিহু

কার্তিক সংক্রান্তির দিনে কাতি বিহু উদযাপিত হয়। এই সময় আউশ ধানের চাষ শেষ হয়। এই বিহুকে কঙ্গালী বিহুও বলা হয়ে থাকে। এই সময় কৃষকদের শস্যভান্ডার প্রায় শূন্য থাকে এবং শস্য মাঠে ফলনশীল অবস্থায় থাকে। এই বিহুতে তুলসী রোপন করে তার সামনে, ক্ষেতে, শস্য ভান্ডারে ও বাড়িতে মাটির তৈরী প্রদীপ বা সাকি জ্বালানো হয়। ফলনশীল ধানকে রক্ষা করার জন্য কৃষক একটি বাঁশদন্ড ঘুরিয়ে *রোয়া-খোয়া* নামক মন্ত্র উচ্চারণ করে অশুভ শক্তি ও পোকামাকড়কে দূরে সরানোর চেষ্টা করেন। বিকেলবেলায় গৃহপালিত পশুদের পিঠা খাওয়ানো হয়। এই বিহুতে লম্বা বাঁশদন্ডের ডগায় আকাশ বস্তি বা আকাশি গঙ্গা নামক প্রদীপ জ্বালিয়ে

মৃতদের আত্মার স্বর্গের রাস্তা দেখানোর রীতিও প্রচলিত। কাতি বিহুতে তুলসী গাছের সামনে আর ক্ষেতে প্রদীপ জ্বালানো হয়।

মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু

মাঘ মাসে ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহু পালন করা হয়। ভোগালী শব্দটি ভোগ বা খাদ্য থেকে এসেছে। এই বিহু তিন দিন ধরে পালন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিনের বিকেলবেলায়, যা উরুকা নামেও পরিচিত, যুবকেরা নদীর তীরে মাঠে উৎপাদিত শস্যের খড় দিয়ে ভেলাঘর নামক কুটীর নির্মাণ করেন এবং তা দিয়ে রাত্রে মেজি নামক আগুন জ্বালিয়ে উৎসব পালন করেন। রাত্রিবেলায় তাঁরা মেজির চারপাশে জড়ো হয়ে বিহুগীতের গান করেন, ঢোল আদি বাদ্যযন্ত্র বাজান এবং সমবেত ভাবে খাবার খান। পরের দিন সকালে তাঁরা স্নান করে মূল মেজিতে আগুন জ্বালান এবং ঐ আগুনে পিঠা ও সুপুরি ছুঁড়ে দেন। এরপর তাঁরা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করেন। এরপর এলাকার ফলগাছগুলিতে শস্য বেঁধে দেওয়া হয়। এই দিন সারাদিন ধরে মোষের লড়াই, মোরগের লড়াই প্রভৃতি ক্রীড়া চলতে থাকে। আহোম রাজত্বকালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিহু পালন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। বিহুর সময় রংঘড় প্রাঙ্গনে বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হত। আহোম রাজারা সেখানে উপস্থিত থেকে এই উৎসব উপভোগ করিতেন। সেই সময় থেক অসমে মহিষের যুদ্ধ, মোরগের যুদ্ধ ইত্যাদির প্রচলন হয়েছে বলা জানা যায়। বিহুর উরুকা দিনে নির্দিষ্ট পুকুর, খাল বা অন্য কোন জলাশয় থেকে সবাই একত্রে মাছ ধরেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মাছ ধরে আনন্দ উপভোগ করেন। এই প্রথার মাধ্যমে সকলে পুকুর, খাল বা অন্য জলাশয় থেকে আহরণ করা মাংস দ্বারা রাত্রের ভোজন করেন। উরুকার রাত্রে যুবকদের অন্যের গৃহ থেকে শস্য, ক্ষেত থেকে ফসল চুরি করার পরম্পরা রয়েছে। চুরি করার প্রথা থাকার জন্য এই বিহুকে চোর বিহু নামেও জানা যায়।

অম্বুবাচী

অম্বুবাচী মেলা হিন্দু ধর্মের বাৎসরিক উৎসব। লোকবিশ্বাস মতে আষাঢ় মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রের তিনটি পদ শেষ হলে পৃথিবী বা ধরিত্রী মা ঋতুময়ী হয়। এই সময়টিতে অম্বুবাচী পালন করা হয়।

অম্বুবাচীর দিন থেকে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত কামাখ্যা দেবীর দুয়ার বন্ধ থাকে ও এই সময় কোনো ধরনের মাংগলিক কার্য করা যায় না। চতুর্থ দিন থেকে মঙ্গলিক কাজের কোনো বাধা থাকে না। অম্বুবাচীর সময় লাঙ্গল ধরা, গৃহ প্রবেশ, বিবাহ ইত্যাদি শুভ কাজ নিষিদ্ধ থাকে ও এই সময়ে মঠ-মন্দিরের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে।

অম্বুবাচীর মেলা

অম্বুবাচীর সময় হিন্দু ধর্মীয় লোকেরা শক্তি পূজার স্থানগুলোতে আয়োজন করা উৎসবকে অম্বুবাচী মেলা বলা হয়। ভারতের অসম রাজ্যের গুয়াহাটি শহরের কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে প্রতি বৎসর অম্বুবাচী মেলার আয়োজন করা হয়। অম্বুবাচী আরম্ভের প্রথম দিন থেকে কামাখ্যা দেবীর দ্বার বন্ধ রাখা হয় ফলে আম্বুবাচীর সময় দেবী দর্শন নিষিদ্ধ থাকে। চতুর্থ দিন দেবীর স্নান ও পূজা সম্পূর্ণ হওয়ার পর কামাখ্যা মাতার দর্শন করার অনুমতি

দেওয়া হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের থেকে আসা লক্ষ লক্ষ ভক্তেরা (বর্তমান দিনে বিদেশ থেকে আসে) কামাখ্যা মন্দিরের চতুর্দিকে বসে কীর্ত্তন করেন। মন্দিরের বাহিরে প্রদীপ ও ধূপকাঠী জ্বালিয়ে দেবীকে প্রনাম করেন। অম্বুবাচী নিবৃত্তির দিন পান্ডারা ভক্তদের রক্তবস্ত্র উপহার দেন। দেবী পীঠের এই রক্তবস্ত্র ধারণ করিলে মনোকামনা পূর্ণ হয় বলে ভক্তেরা বিশ্বাস করেন। এই রক্তবস্ত্র পুরুষেরা ডানহাত বা গলায় ও মহিলারা এই বস্ত্র বাওহাত বা গলায় পরিধান করেন। রক্তবস্ত্র পরিধান করে শ্মশান বা মৃতের ঘরে যাওয়া নিষিদ্ধ। কামাখ্যা ধামের অম্বুবাচী মেলা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

সংস্কৃতি

উৎসব

মিজোদের তিনটি বড় উৎসব রয়েছে : মিম কুট (গরস কঁঃ) ছাপচার কুট (ঈযধঢ়পযধৎ কঁঃ) এবং পাউল কুট (চধষি কঁঃ)। এ তিনটি উৎসব কোন না কোন ভাবে কৃষিকর্মের সাথে সম্পৃক্ত।

মিম কুট

এই উৎসবটি সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভুট্টা ফসল ঘরে তোলার সময় অনুষ্ঠিত হয়। মৃত আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণে উৎসর্গীকৃত এ উৎসবটির মূলে রয়েছে কালের স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের চেতনা। মৃতদের স্মরণে তৈরী একটি উঁচু মাচানের উপর প্রথম ফসল উৎসর্গ করা হয়।

ছাপচার কুট

বসন্তকালে জুম কাটা শেষ হলে এ উৎসবটি পালন করা হয়। মিজোদের সব চাইতে আনন্দময় উৎসব এটি। ঋতুটিও খুবই উপযোগী। বসন্ত ঋতুকে জায়গা করে দিয়ে শীত ধীরে ধীরে বিদায় নেয়। এ সময় প্রকৃতি পুনরুজ্জীবন লাভ করে ও মানুষের জীবনে সজীবতা বয়ে নিয়ে আসে। বয়স ও লিঙ্গ ভেদে মিজোরা এ উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। বর্ণিল পোশাকে সজ্জিত হয়ে ছেলেমেয়েরা নাচের উৎসবে মেতে উঠে যা অনেক সময় সারা রাত ধরে চলতে থাকে।

পাউল কুট

ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফসল কাটার পরে এ উৎসবটি উদ্যাপিত হয়। এখানেও ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয় কারণ জমি কর্ষণ ও ফসল কাটার মত কঠিন কাজটি এখন শেষ হয়েছে। সমবেত ভুরি ভোজন ও নাচের আয়োজন হয়। স্মারক মাচানের উপর মায়েরা বসে তাদের শিশু সন্তানদের খাওয়ায়। তঁভধহম বা ধেনো মদ পানও এ উৎসবের একটি অংশ। দু'দিন ধরে উদ্যাপিত এ উৎসবের পরের পুরো একটি দিন বিশ্রামের দিন। এ দিন কেউই কাজে বেরোয় না।

নৃত্য

মনোরম পরিবেশ ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ মিজোরা জাতি হিসেবে প্রাণবন্ত ও অত্যন্ত মিশুক। গান করতে যেমন, নাচতেও মিজোরা ভালবাসে। তারা এমন কিছু লোকজ ও সমবেত নৃত্যের গর্ব করতে পারে যা তারা কালের ধারায় বংশানুক্রমে ধারণ করে আসছে। মিজোদের নাচগুলো তাদের উচ্ছল ও নিরুদ্বেগ প্রাণসত্তার প্রকাশ। এটি এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, মিজোদের নাচগুলো মঞ্চের উপর অনুষ্ঠানযোগ্য কোন ধর্ম নয়। এটি তারা স্বভাবগত ভাবে বিকশিত করেছে সমবেত ভাবে সম্পৃক্ত হ'তে ও অংশগ্রহণ করতে।

চিরাউ

মিজো নাচের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণিল ও ঈষবৎধি নৃত্য। এ নাচে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। বাঁশগুলো ঠুকলে যে শব্দ বেরোয়, সেই শব্দই এ নাচের তাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নৃত্যশিল্পীরা সমান্তরাল একজোড়া বাঁশের মধ্যে পরিবর্তন সাপেক্ষে একবার লুকিয়ে ঢুকে আবার বোরয়ে এসে এবং জোড়া বাঁশের একদিক থেকে অন্যদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ করতে থাকে। কিছু ব্যক্তি উভয় পার্শ্বে মুখোমুখি বসে বাঁশগুলোকে মাটি বরাবর ধরে রাখে। ছন্দোময় তালে তারা বাঁশগুলোকে ঠুকে পর্যায়ক্রমে একবার ফাঁক ও একবার সংযুক্ত কারে। এটি নাচের গতিকেও নির্দেশ করে। এ নাচে পা ফেলা ও তার ধরনের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে এবং তা অঞ্চলভেদে ভিন্নও। আজকাল চিরাউ নাচটি যে কোন সময়ে করা হয়। কিন্তু আগেকার দিনে সন্তান প্রসবের সময় মরে যাওয়া মায়ের আত্মার নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য এ নাচ করা হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে ?-এর অনুরূপ তাদের নিজস্ব বাঁশনৃত্য রয়েছে। মিজোরাম, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত চিরাউ উৎসবের সময় ১০ হাজার নৃত্যশিল্পীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নাচের অনুষ্ঠানটি করে বৃহত্তম গণ-বাঁশ নৃত্য হিসেবে ''গিনেস বুক''-এর রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে।

কোনো দেশকে জানতে চাইলে সেই দেশের ইতিহাস, ভূগোল, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুধু তা-ই নয়, সেখানকার উৎসবগুলোও দেশটিকে জানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎসবের মধ্যে দিয়ে একটি জাতির স্বকীয়তা, নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-উদ্দীপনার এক উজ্জ্বল রূপ প্রকাশিত হয়।

কেরালার জাতীয় উৎসব 'ওনাম' সেখানকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানার এক প্রধান উৎস। কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের মধ্যে ভাষা ও জাতিগত মিল যেমন আছে, তেমনি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অমিলও প্রচুর। সময় ও উৎসব পালনের রীতিনীতির দিক থেকে কেরালার জাতীয় উৎসব ওনামের সাথে প্রতিবেশী তামিলনাড়ুর পঙ্গল বা কর্ণাটকের দশেরার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

সার্বজনীন ও ধর্ম নিরপেক্ষ এক উৎসব ওনাম

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে কেরালার ওনাম উৎসবটি পালিত হয়। এটি সেখানকার সবচেয়ে বড় এবং ঐ অঞ্চলের সবার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক উৎসব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উৎসবের সাথে ওনামের

পার্থক্য আছে। এই উৎসব সার্বজনীন ও ধর্ম নিরপেক্ষ। ওনামের উৎসবের সাথে আছে হিন্দু পুরাণের এক কাহিনী। তা সত্ত্বেও কেরালার সব ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে ওনাম বেশ তাৎপর্যবাহী এক উৎসব হিসেবে বিবেচিত। এর পেছনে কারণও রয়েছে। খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাথে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান কেরালার এক ঐতিহাসিক সত্য। সমাজ জীবন, পোশাক-আশাক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে কেরালার হিন্দু খ্রিস্টান এবং মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কেরালার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক মুহম্মদ বশির, কমলা সুরাইয়া এবং জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা মামুট্টি ছিলেন মুসলমান। একসময়ের জনপ্রিয় গায়ক যিশু দাস ছিলেন খ্রিস্টান। এমনকি হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যমন্ডিত বিখ্যাত কথাকলি নৃত্যের আবহসঙ্গীতের নামকরা একজন জনপ্রিয় গায়কের নাম হায়দার আলী। শুধু তাই-ই নয়, সামাজিক অনাচার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে সব সম্প্রদায়ের যুবকরা সামনে উৎসাহী। বহু বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক কেরালার জনগণ তাই এই ওনাম উৎসবকে নিজেদের জীবনের সাথে একাত্ম করে নিয়েছে। সব ধর্মের মানুষের এক মিলন মেলা এই উৎসব। রাজ্যের সমস্ত ধর্মের, জাতের মানুষ একত্রিত হন এই উৎসবে।

ওনাম উৎসবের সাথে সম্পর্কিত পৌরাণিক গল্পগাঁথা

পুরাণের যে চরিত্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই উৎসব পালিত হয়, তিনি কোনো দেবতা নন, তিনি একজন অসুর। তার নাম মহাবলী। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, পুরাকালে এই অসুররাজ কেরালায় রাজত্ব করতেন। তখন কেরালার স্বর্ণযুগ। অসুর হয়েও রাজ্যের সকল প্রজার প্রতি ছিল তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি। রাজ্যে ছিল না কোনো অভাব, ছিল না ঐশ্বর্যের কমতি। সেই সাথে মহাবলী ছিলেন তেজস্বীও। তার দাপটে দেবতারা সর্বদা থাকতেন তটস্থ। দেবতাদের আসন তখন টলমল অবস্থায়। ফলে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। অসুররাজকে দমন করার জন্য ভগবান বিষ্ণু বামন অবতার রূপে কেরালায় অবতীর্ণ হলেন। মহাবলী যেমন বীর, তেমনি দানশীল। সাহায্যপ্রার্থী কাউকে তিনি ফেরাতেন না। এই সুযোগটি নিলেন বিষ্ণু। তিনি সাহায্যপ্রার্থী হয়ে মহাবলীর কাছে উপস্থিত হলেন।

বামন দেব মহাবলীর কাছে বসবাসের জন্য তিন পদক্ষেপ মাপের জমি চাইলেন। মহাবলি বামনরূপী বিষ্ণুকে চিনতে পারলেন না। তাই বামনের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। প্রথমবার পা রাখতেই বিষ্ণু গোটা পৃথিবী অতিক্রম করেন। দ্বিতীয়বার শেষ করেন স্বর্গ ও পাতাল। তৃতীয়বার পা তুলে মহাবলিকে প্রশ্ন করেন, ''কই? আর একবার পা রাখার জায়গা কোথায়? স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যে শেষ।''

মহাবলি সবই বুঝলেন, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মাথা নিচু করে মহাবলী বামন দেবকে তার মাথায় পা রাখতে বললেন। বামন তখন মহাবলির মাথায় পা রেখে এত জোরে চেপে দেন যে মহাবলী মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। শেষ মুহূর্তে মহাবলি কাতর কণ্ঠে বিষ্ণুর কাছে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন তার প্রিয় রাজ্যে প্রতিবছর একবার এসে প্রিয় প্রজাদের দেখে যেতে পারেন। বিষ্ণু মহাবলীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। বামন দেবের আশীর্বাদে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মহাবলী। ধারণা করা হয়, ওনাম উৎসবের মাধ্যমে অসুররাজ মহাবলী তার প্রিয় কেরালায় ফিরে আসেন। তার আগমন উপলক্ষে পালিত হয়ে থাকে এই ওনাম উৎসব।

দশ দিনের আয়োজন

প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসে দশ দিনব্যাপী চলে এই ওনাম উৎসব। এই দশ দিন নানা আচার ও আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। তবে উৎসবের প্রথম ও শেষ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১ম দিন : আত্তম

ওনামের দশদিন আগে হলো 'আত্তম' নক্ষত্র। সকালে স্থানীয় মন্দিরে দেবতার কাছে প্রসাদ নিবেদন করে ওনাম উৎসবের আয়োজন শুরু হয়। সেদিন প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে ফুলের এক বৃত্ত এঁকে ওনাম উৎসবের সূচনা হয়। এই আল্পনাকে বলা হয় পোক্কালম। প্রতিদিন এই বৃত্তের সংখ্যা বাড়ে একটি করে। অর্থাৎ, ওনাম দিনের সকালে বৃত্তের সংখ্যা দাঁড়ায় দশটি। সেদিন সকালে ছেলেমেয়েরা শেষ বৃত্ত রচনা করে নানা বর্ণের ফুল দিয়ে। তবে প্রথমদিন হলুদ ফুলের প্রাধান্য থাকে। উৎসবের পরের দিনগুলোয় বিভিন্ন ফুল আল্পনাতে যুক্ত হতে থাকে।

২য় দিন: চিথিরা

উৎসবের দ্বিতীয় দিন সকলে তাদের বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। স্থানীয়রা উৎসব উপলক্ষে ঘর-বাড়িতে রং করে, আলোকসজ্জা দিয়ে বাড়ির চারপাশ সাজিয়ে তোলে। বাড়ির সদর দরজায় আল্পনা আঁকা হয়।

৩য় দিন: চোধি

উৎসবের তৃতীয় দিন যেন কেনাকাটার উৎসব। উৎসব উপলক্ষে সকলেই তাদের সাধ্যমতে নিজেদের জন্য, পরিবারের জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য উপহার সামগ্রী, উৎসবের পোশাক কিনে থাকেন।

৪র্থ দিন: ভিসাকাম

উৎসবের এই দিন দুপুরে আয়োজন করা হয় মহাভোজের। স্থানীয় মালয়ালম ভাষায় তাকে বলা হয় সাদ্য। কেরালার প্রতিটি বাড়িতেই তা বানানো হয়। একেবারে যাকে বলে পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে রান্না। ২৬ এর অধিক পদ থাকে খাবারের তালিকায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিনরকম কলা ভাজা, পাঁপড়, থোরান, মেজহুক্কুপুরাত্তি, কালান, ওলান, আভিয়াল, সাম্বার, ভাত, ডাল, চার রকম আচার, দুই-তিন পদের পায়েস-সে এক এলাহি ব্যাপার।

৫ম দিন: আনিঝাম

ওনামে নৌকা বাইচ নিয়ে প্রচুর হইচই হয়। কেরালা হলো নদীনালা ও হ্রদের দেশ। সমুদ্রের সমান্তরালে যে লবণ হ্রদমালা রয়েছে, সেসব এলাকা এই নৌকা বাইচের উত্তম স্থান। আর উৎসবের পঞ্চম দিন সারা রাজ্য জুড়ে আয়োজিত হয়ে থাকে নৌকা বাইচ। বড়-বড় নৌকার সত্তর-আশিজন লোক গান করতে করতে মহা উৎসাহে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। যে নৌকা প্রথম হয়, তার চালকরা পুরস্কৃত হন। এই প্রতিযোগিতায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি পর্যন্ত নৌকা থাকে, যা দেখার জন্য হ্রদ বা নদীর ধারে লোকেরা ভিড় করে নিজ নিজ গ্রামের দলকে উৎসাহ দেন।

৬ষ্ঠ দিন : থিরিকেটা

উৎসবের এই দিনে পোক্কলমের আকার বাড়তে থাকে। অনেকে এই দিনটিতে প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যান। অনেকে আবার পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাতে তাদের ভিটেমাটি থেকে ঘুরে আসেন।

৭ম দিন : মুলাম

উৎসবের সপ্তম দিনে উৎসব যেন আরও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই মেতে ওঠে উৎসবের আনন্দে। মন্দিরগুলোতে বিশেষ প্রসাদ সাদ্যর আয়োজন করা হয়। বাড়িতে, উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েরা কেরালার বিখ্যাত লোকনৃত্য কায়কোট্টিকলির আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও থিরুভাতিরাকলি, পুলিকলি, থুম্বি থুল্লাল ও কথাকলির মতো নৃত্যকলা পেশ করা হয়। শুধু নারীরারই নন, পুরুষরাও এতে অংশ নেয়। প্রতিটি নৃত্যই একে অপরের চেয়ে আলাদা।

৮ম দিন: পুরাদম

উৎসবের অষ্টম দিনে মহাবলী ও বামন দেবতার ছোট মূর্তি এনে ফুলের সাজানোর আল্পনার মাঝে স্থাপন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে মহাবলীকে রাজ্যবাসী তাদের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানায়। পোক্কালমের কারুকাজ যেন আরও আকর্ষণীয় ও বর্ণিল হয়ে ওঠে।

৯ম দিন: উথরাদম

ওনাম সন্ধ্যা হিসেবে দিনটি পালিত হয়। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, উৎসবের শেষ চারদিন রাজা মহাবলী রাজ্য ভ্রমণে বের হয়ে প্রজাদের আশীর্বাদ করেন। তাই উৎসবের শেষ দিনগুলো শুভদিন হিসেবে মানা হয়। নানা উপাদেয় খাবার-দাবার, নানা আনন্দ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উৎসবের এই দিনটি পালিত হয়।

১০ম দিন : থিরুভুনাম

ওনাম উৎসবের শেষ দিন হলো থিরুভুনাম। সকালে স্নান সেরে নতুন কাপড় পরে ঘরবাড়িতে নতুন করে আল্পনা দেয়া হয়। সরকারিভাবে সারা রাজ্যো আলোকসজ্জা ও আতশবাজির ব্যবস্থা করা হয়। শহরজুড়ে বের হয় বর্ণিল শোভাযাত্রা। এসব শোভাযাত্রায় থাকে কেরালার ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত ও নৃত্য। উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের গ্রামগুলোতে স্থানীয় নানা ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

এভাবে বেশ জাঁকজমক আর ধুমধামের সাথে উৎসবের শেষ দিনের সমাপ্তি ঘটে। আর উৎসবের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে বছরব্যাপী সুদীর্ঘ অপেক্ষায় বসে থাকেন কেরালাবাসী, কবে তিনি আসবেন।

৫.৪.৯.২ : বাংলার লোকসংস্কৃতিঃ

লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালী, চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই হল লোকসংস্কৃতি। এটা সম্পূর্ণই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি তাদের প্রকৃত পরিচয় বহন করে।

কোনো দেশের জাতীয় সংস্কৃতি ধারা প্রধানত দুটি: নগরসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি। বঙ্গসংস্কৃতির ধারা মূলত তিনটি: নগরসংস্কৃতি, গ্রামসংস্কৃতি ও উপজাতীয় সংস্কৃতি। বাংলা একটি গ্রামপ্রধান অঞ্চল। গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী নিজস্ব জীবনপ্রণালীর মাধ্যমে শতকের পর শতক ধরে যে বহুমুখী ও বিচিত্রধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, তা-ই বাংলার লোকসংস্কৃতি নামে অভিহিত। আধুনিক রাজনৈতিক মানচিত্র ব্যাতিরেকে বঙ্গ-সংস্কৃতির ব্যাপ্তি পরিদৃশ্যমান ব্যাপ্তি পরিদৃশ্যমান। যা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ এই দুই অংশের সংস্কৃতির রূপ।

নগরের স্বল্প পরিসরে ঘন বসতিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসায়, বৃত্তি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আনন্দোৎসব, যাতায়াত ও উৎপাদন পদ্ধতির সংমিশ্রণে নগরসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ সংস্কৃতি সূক্ষ্ম, জটিল, বৈচিত্র্যময়, গতিশীল ও জাঁকজমকপূর্ণ। গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নগরসংস্কৃতি পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত বিস্তার ও উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতিনির্ভর গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা প্রধানত ঐতিহ্যমুখী, গতানুগতিক ও মন্থর। গ্রামবাসীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। তারা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে উৎপাদন, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ধর্মকর্ম, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাকে অবলম্বন করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সরলতা, সজীবতা ও অকৃত্রিমতা লোকসংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

বাংলায় অনেক উপজাতি রয়েছে। উপজাতীয় সংস্কৃতি এক অর্থে লোকসংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত, তবে বেশকিছু বিষয়ে পার্থক্য থাকায় তা পৃথক সংস্কৃতি রূপে বিবেচিত হয়। উপজাতীয় সংস্কৃতি অধিক মাত্রায় রক্ষণশীল, পরিবর্তনবিমুখ ও ঐতিহ্যপন্থী। বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের অপরিবর্তনীয় অর্থনীতি ও অন্তর্মুখী মানসিকতায় কারণে যে প্রাচীন পরিস্থিতি থেকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিল, বর্তমানেও প্রায় অনেকটাই সেখানেই রয়ে গেছে। একই রাষ্ট্রব্যবস্থায় বসবাস করেও তারা বৃহত্তর লোকসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে এগিয়ে না এসে বরং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নামে প্রাচীন সংস্কার, প্রথা ও অব্যাহত রাখছে। সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা না থাকায় তাদের সংস্কৃতিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায় না।

প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসরত অক্ষরজ্ঞানহীন ও ঐতিহ্যানুসারী বৃহত্তর গ্রামীণ জনসমষ্টিকে 'লোক' বলে অভিহিত করা হয়। এই অভিধাযুক্ত বিশ্বের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিকশিত সংস্কৃতিতে বিস্ময়কর মিল আছে। লোককলাবিদ স্টিথ থমসন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোককাহিনী ও পুরাণকে অবলম্বন করে ৬ খন্ডে যে মোটিফ ইন্ডেক্স রচনা করেছেন, তা থেকেই বিশ্বের এই লোক-মানসিকতার অভিন্ন গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বাংলার কৃষক ফসল তোলার সময় এক গোছা ধান মাঠ থেকে এনে ঘরের চালে লুকিয়ে রাখে। একে বলা হয় 'লক্ষ্মীর ছড়'। বিশ্বের নানা দেশের কৃষকসমাজেও একই প্রথা চালু আছে; কোথাও তা 'শস্যরাণী', কোথাও 'শস্যপুতুল', কোথাও বা 'শস্যমাতা' নামে অভিহিত। বিষয়, চিন্তা-ভাবনা ও আবেদনের দিক থেকে লোকসংস্কৃতির একটা বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন রূপ আছে।

লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাদানের রূপ-প্রকৃতির বিচার করে একে চারটি প্রধান ধারায় ভাগ করা হয় : বস্তুগত (material), মানসজাত (formalised), অনুষ্ঠানমূলক (functional) এবং প্রদর্শনমূলক (performing)। লোকসমাজ জীবনধারণের জন্য যেসব দ্রব্য ব্যবহার করে সেসব বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, যেমন : বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, যানবাহন, সকল পেশার যন্ত্রপাতি, কুটিরশিল্প, সৌখিন দ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটির আবার বহুবিধ প্রকারভেদ আছে। যেমন কৃষক প্রায় সব ধরনের ফসল উৎপাদন করে, তাঁতি সব ধরণের বস্ত্র, কুমার সব ধরনের হাঁড়ি-পাতিল, ছুতার কাঠের যাবতীয় আসবাবপত্র, কামার লোহার বিবিধ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্মাণ করে। ধোপা, নাপিত, সোনারু, কাঁসারু, শাঁখারি, ময়রা, চর্মকার, ঘরামি, জেলে, কাহার প্রভৃতি বৃত্তিধারী শ্রমজীবী মানুষ পেশাগত কাজে নানারকম হাতিয়ার ব্যবহার করে। গ্রামের মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য নিজেরাই উৎপাদন ও বিতরণ করে; এজন্য তাদের অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না। স্যার মেটকাফ তাই বাংলার স্বল্পতুষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিকে ছোট ছোট রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছেন। পর্ণকুটিরে বসবাস গ্রামের একটি সাধারণ দৃশ্য। পাশাপাশি আবার একচালা থেকে আটচালা ঘরও নির্মিত হয়। সৌখিন ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা আটচালা গৃহ নির্মাণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনীয়তা নয়, নান্দনিকতারও ব্যাপার আছে। বাংলার লোকসংস্কৃতি এখানে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

বাংলার তাঁতিরা মসলিন তৈরি করে এককালে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিল। জামদানি বস্ত্রের সুনাম এখনও আছে। কুমার নির্মিত মাটির দেবদেবীর মূর্তি এখনও মৃৎশিল্পের অনন্য নির্দশন। তারা সখের হাঁড়ি, মনসার ঘট, লক্ষ্মীর সরা ইত্যাদি তৈরি করে অন্যান্য শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছে। ছুতার প্রাচীন কাল থেকেই কাঠের খাট-পালঙ্গ, দরজা, চৌকাঠ, নৌকা ইত্যাদি দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করে আসছে। এক সময় বাংলার ময়ূরপঙ্খি, সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দডিঙ্গা প্রভৃতি সমুদ্রগামী নৌকার সুনাম ছিল। বাঁশ, বেত, কাঠ, পাঠ ও শোলা দিয়ে নানারকমের নিত্য ব্যবহার্য ও সৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়। সিলেটের নকশি পাটির সুনাম দীর্ঘকালের।

পাটের তৈরি নকশি শিকা আন্তর্জাতিক বাজারে সৌখিন পণ্যরূপে সমাদর পাচ্ছে। নকশি পাখা, শিকা ইত্যাদি পল্লীর রমণীরাই তৈরি করে। তারা বিচিত্র ধরণের ও বিচিত্র স্বাদের রন্ধনশিল্পেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। বাঙালির রন্ধন-তালিকায় বত্রিশ ব্যঞ্জনের উল্লেখ আছে। রন্ধনকর্মে নারী কীরূপ পারদর্শিনী তা বিচার করে এক সময় বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করা হতো। বিচিত্র ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন তৈরিতে বাঙালি ময়রার দক্ষতা এখনও তুলনাহীন। দুধ, চিনি, আটা ও ময়দা দ্বারা শতাধিক ধরণের মিষ্টান্নের নাম পাওয়া যায়। এতে ভোজনরসিক বাঙালির পরিচয় ফুটে ওঠে। এখানে বস্তুগত লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাদানের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকটি ধারার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

মৌখিক ধারার লোকসাহিত্যকে মানসজাত লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর সঙ্গে কিছু চিত্রকর্মকেও যুক্ত করা যায়। অনুমান হলেও সত্য যে, মানুষ যখন থেকে ভাষা পেয়েছে তখন থেকেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করে আসছে। এ অর্থে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের লোকসাহিত্যও বেশ প্রাচীন। বিশ্বের প্রায় সব ধারার লোকসাহিত্যের উপাদানই বাংলা ভাষায় বিদ্যমান। বাংলায় লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, লোকগাথা, লোকনাট্য,

ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি গদ্যে-গদ্যে রচিত মৌখিক ধারার সাহিত্যের প্রচলন আছে। বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি। পলি দ্বারা গঠিত বাংলার নরম মাটি, শ্যাম প্রকৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য, কৃষি-অর্থনীতি, দীর্ঘস্থায়ী সামন্ত সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে বাংলা লোকসাহিত্যের ভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে। মুখ্যত কৃষকসমাজই লোকসাহিত্যের স্রষ্টা ও ধারক-বাহক। এর সঙ্গে গো-মহিষের রাখাল, নৌকার মাঝি-মাল্লা, গায়ক সম্প্রদায় বাউল, ভিক্ষোপজীবী ফকির-বৈরাগী ও পেশাজীবী বেদে-বেদেনিরা লোকসঙ্গীতের চর্চা করে থাকে। লোকচিকিৎসার সঙ্গে জড়িত ওঝা ও মন্ত্রগুপ্তিরা মন্ত্রের চর্চা করে। সাপের ওঝা সর্পবিষের ও ভূতের ওঝা তথাকথিত ভূত-প্রেতাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করে। শিরালি মন্ত্রগুণে আকাশের মেঘ-শিলাবৃষ্টি পর্যন্ত বিতাড়িত করতে পারে বলে লোকসমাজ বিশ্বাস করে।

বিগত একশ বছর ধরে লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা ও তা নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে। সব ধরনের উপাদান একত্র করলে এ সাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করবে। লোককথা, রূপকথা, ব্রতকথা, কিংবদন্তি ও লোকপুরাণ মিলে লোককাহিনীর এক বিশাল ভান্ডার গড়ে উঠেছে। স্বপ্ন, কল্পনা, আবেগ ও চিন্তা মিশ্রিত এসব রচনায় জাতির অতীতের অনেক কিছুই নিহিত আছে। বাংলার রূপকথায় ড্রাগন নেই, আছে রাক্ষস-খোক্কস ও ভূত-প্রেত। এসব অলৌকিক জীবের প্রতীকে মূলত অত্যাচারী কোনো প্রবল শক্তিকেই রূপায়িত করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুদ্ধে রূপকথার রাজপুত্রকে জয়ী করা হয়েছে। সে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে আগামী দিনগুলিতে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবে। কাহিনী-নির্মাতা রাজপুত্রের নিরাপদ ও দ্রুততম বাহন হিসেবে পঙ্খিরাজ ঘোড়ার পরিকল্পনা করেছে; অসহায়ের বন্ধু হিসেবে সাহায্যকামী ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির চিন্তা করেছে। এগুলি প্রতীক চরিত্র, যা লোকমনের ইচ্ছাপূরণ করে থাকে। ব্রতকথায় হিন্দু রমণীর ধর্মবোধের অন্তরালে বৈষয়িক ও জাগতিক কামনা-বাসনা নিহিত থাকে। কিংবদন্তিতে আছে লুপ্ত ইতিহাসের খন্ড ক্ষুদ্র উপাদান।

অঞ্চলভেদে বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশত প্রকার লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, গম্ভীরা, কীর্তন, ঘাটু, ঝুমুর, বোলান, আলকাপ, লেটো, গাজন, বারমাসি, ধামালি, পটুয়া, সাপুড়ে, খেমটা প্রভৃতি ধারার শতশত গান আজও প্রচলিত আছে। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ এসব গানের বাণীতে জাতির অন্তর্জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কতক গানে ধর্মীয় আবেগ জড়িত আছে; তবে অধিকাংশ গানই চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে হিসেবে গীত হয়। খেমটা, পটুয়া ও সাপুড়ে গানগুলি জীবিকার সঙ্গে জড়িত। মেয়েলি গীত, সহেলি গীত, হুদমা গীত ইত্যাদিতে নারীসমাজের কামনা-বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে।

বাউল একটি বিশেষ লোকাচার ও ধর্মমত। এই মতের সৃষ্টি হয়েছে বাংলার মাটিতে। বাউলকূল শিরোমণি লালন সাঁইয়ের গানে মধ্য দিয়ে বাউল মত পরিচিতি লাভ করে। বাউল গান যেমন জীবন দর্শনে সম্পর্কিত তেমনি সুর সমৃদ্ধ। বাউলদের সাদামাটা কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন আর একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোই তাদের অভ্যাস। ২০০৫ সালে ইউনেস্কো বিশ্বের মৌখিক এবং দৃশ্যমান ঐতিহ্যসমূহের মাঝে বাউল গানকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে।

বাউল শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতান্তর রয়েছে। অতিপ্রাচীনকাল হতে বাউল শব্দটির প্রচলন লক্ষ করা যায়। আনুমানিক সপ্তদশ শতক হতে বাউল নাম এর ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়, চৈতন্যচরিতামৃত গৃন্থের আদিলীলা অংশে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়, চৈতন্যচরিতামৃত গৃন্থে মহাপ্রভু, রামানন্দ রায় ও সনাতন গোস্বামীর নিকট কৃষ্ণ বিরহ বিধুর নিজেকে মহাবাউল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সেই থেকে অনুমান করা হয়, বাউল শব্দের উৎপত্তির কথা। বাউলের রয়েছে নানাবিধ শাখা প্রশাখা, একেক সম্প্রদায়ের বাউলেরা একেক মত অনুসারী, সেগুলো তাদের সম্প্রদায়ভেদে ধর্মীয় উপাসনার একটি অংশ।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া-পাবনা এলাকা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম-বোলপুর-জয়দেবকেন্দুলি পর্যন্ত বাউলদের বিস্তৃতি। বাউলদের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই প্রকারই রয়েছে। বাউলরা তাদের গুরুর আখড়ায় সাধনা করে। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলিতে বাউলদের একটি মেলা শুরু হয়, যা ''জয়দেব বাউলমেলা'' নামে বিখ্যাত।

বাউলেরা উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মসাধক। তারা মানবতার বাণী প্রচার করে। বাউল মতে বৈষ্ণবধর্ম এবং সূফীবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাউলরা সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় আত্মাকে। তাদের মতে আত্মাকে জানলেই পরমাত্মা বা সৃষ্টিকর্তাকে জানা যায়। আত্মা দেহে বাস করে তাই তারা দেহকে পবিত্র জ্ঞান করে। সাধারণত প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও বাউলরা জীবনদর্শন সম্পর্কে অনেক গভীর কথা বলেছেন।

বাউল সাধকদের সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছেন জগন্মোহন গোসাঁই ও লালন সাঁই। লালন তার বিপুল সংখ্যক গানের মাধ্যমে বাউল মতের দর্শন এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রচার করেছিলেন। এছাড়াও বাউল কবিদের মধ্যে জালাল খাঁ, রশিদ উদ্দিন, হাছন রাজা, রাধারমণ, সিরাজ সাঁই, পাঞ্জু সাঁই, পাগলা কানাই, শীতলং সাঁই, দ্বিজদাস, হরিচরণ আচার্য, মনোমোহন দত্ত, লাল মাসুদ, সুলা গাইন, বিজয় নারায়ণ আচার্য, দীন শরৎ (শরৎচন্দ্র নাথ), রামু মালি, রামগতি শীল, মুকুন্দ দাস, আরকুন শাহ্, সিতালং ফকির, সৈয়দ শাহ্ নূর, শাহ আব্দুল করিম, উকিল মুন্সি, চা খাঁ পাঠান, তৈয়ব আলী, মিরাজ আলী, দুলু খাঁ, আবেদ আলী, উমেদ আলী, আবদুল মজিদ তালুকদার, আবদুস সাত্তার, খেলু মিয়া, ইদ্রিস মিয়া, আলী হোসেন সরকার, চান মিয়া, জামসেদ উদ্দিন, গুল মাহমুদ, প্রভাত সূত্রধর, আবদুল হেকিম সরকার, আমীর উদ্দিন আহমেদ, ফকির দুর্বিন শাহ, শেখ মদন, দুদ্দু সাঁই, কবি জয়দেব, কবিয়াল বিজয় সরকার, ভবা পাগলা, নীলকণ্ঠ, দ্বিজ মহিন, পূর্ণদাস বাউল, খোরশেদ মিয়া, মিরাজ উদ্দিন পাঠান, আব্দুল হাকিম, মহিলা কবি আনোয়ারা বেগম এবং দলিল উদ্দিন বয়াতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ছৌ নাচ বা ছো নাচ বা ছ নাচ একপ্রকার ভারতীয় আদিবাসী যুদ্ধনৃত্য। এই নাচ ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় জনপ্রিয়। ছৌ নাচের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা। উৎপত্তি ও বিকাশের স্থল অনুযায়ী ছৌ নাচের তিনটি উপবর্গ রয়েছে। যথা—পুরুলিয়া ছৌ সরাইকেল্লা ছৌ ও ময়ূরভঞ্জ ছৌ।

সরাইকেল্লা ছৌ-এর উৎপত্তি অধুনা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সরাইকেল্লা খরসাওয়াঁ জেলার সদর সরাইকেল্লায়। পুরুলিয়া ছৌ-এর উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা এবং ময়ূরভঞ্জ ছৌ-এর উৎপত্তিস্থল ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা। এই তিনটি উপবর্গের মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি দেখা যায় মুখোশের ব্যবহারে। সরাইকেল্লা ও পুরুলিয়া ছৌ-তে মুখোশ ব্যবহৃত হলেও, ময়ূরভঞ্জ ছৌ-তে হয় না।

ছৌ নাচের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের মত রয়েছে। ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো ও ডঃ সুধীর কারণের মতে এই নাচের নাম ছো, আবার বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও ডঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতোর মতে এই নাচের নাম ছ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম ছ বা ছো নাচের পরিবর্তে ছৌ নামে অভিহিত করেন এবং এই নাচের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার পরে এই নাচ ছৌ নাচ নামে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে।

রাজেশ্বর মিত্রের মতে, তিব্বতী সংস্কৃতির ছাম নৃত্য থেকে ছৌ নাচ উদ্ভূত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে শৌভিক বা মুখোশ থেকে নাচটির নামকরণ ছৌ হয়েছে। কুর্মালী ও ওড়িয়া ভাষায় ছুয়া বা ছেলে থেকে এই নাচের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন, কারণ ছৌ প্রধানতঃ ছেলেদের নাচ। ডঃ সুধীর করণের মতে ছু-অ শব্দের অর্থ ছলনা ও সং। কোনো কোনো আধুনিক গবেষক মনে করেন, ছৌ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। তবে সীতাকান্ত মহাপাত্র মনে করেন, ছাউনি শব্দটি থেকে এই শব্দটি এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রচলিত ছৌ নাচের ধারাটি পুরুলিয়া ছৌ নাচের পরিচিত। এই ধারার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুলিয়া ছৌ-এর সৌন্দর্য ও পারিপাট্য এটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ট্যাবলোর থিমই ছিল ছৌ নাচ। ছৌ মূলত উৎসব নৃত্য। পুরুলিয়ার ছৌ নাচে বান্দোয়ান ও বাঘমুন্ডির দুটি পৃথক ধারা লক্ষ করা যায়। বান্দোয়ানের নাচে পালাগুলি ভাব গম্ভীর এবং বাগমুন্ডির নাচে পালাগুলি হয় বীরত্ব ব্যঞ্জ। জেলায় ছৌ নাচের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভূমিজ মুন্ডারা। পরে এই নাচে মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষেরা নর্তক হিসেবে ও ডোম সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাদক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে কুপল্যান্ডের ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার মানভূম গ্রন্থে ছৌ নাচের কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে মনে করেন ১৯১১-এরপরে ছৌ নাচের উদ্ভব হয়েছে। মানভূম গবেষক দিলীপ কুমার গোস্বামীর মতে শিবের গাজনে মুখে কাল মেখে বা মুহা বা মুখোশ করে নাচকেই ছৌ নাচের আদি রূপ বলে মনে করেছেন। এরপর অনাড়ম্বর মুখোশ সহকারে একক ছৌ বা 'এ কৈড়া ছো' নাচের উদ্ভব হয়। এ কৈড়া ছো নাচের পরে 'আলাপ ছো' বা 'মেল ছো' নাচের উদ্ভব হয়, যেখানে মুখোশ ছাড়া দুইজন বা চারজন নতর্ক নাচ করতেন। এছাড়া সম্ভ্রান্ত বাড়ির নর্তকরা আড়ম্বরপূর্ণ সাজপোশাক পরে 'বাবু ছো' নামক একপ্রকার নাচের প্রচলন করেন। এই নাচে ধুয়া নামক ছোট ঝুমুর গান গাওয়া হয়ে থাকে। ১৯৩০-এর দশকে 'পালা ছো' নাচের সৃষ্টি হয়।

ছৌ শিল্পীরা সারা চৈত্র মাস ধরে অনুশীলন করে থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস ও জ্যৈষ্ঠ মাসে তেরো তারিখে অনুষ্ঠিত রহিন উৎসব পর্যন্ত ছৌ নাচ নাচা হয়ে থাকে। পুরুলিয়া জেলায় শিবের গাজন উপলক্ষে ছৌ নাচের আসর বসে।

ছৌ নাচ বিষয়গতভাবে মহাকাব্যিক। এই নাচে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনয় করে দেখানো হয়। কখনও কখনও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনিও অভিনীত হয়। ছৌ নাচের মূল রস হল বীর ও রুদ্র। নাচের শেষে দুষ্টের দমন ও ধর্মের জয় দেখানো হয়। গ্রামাঞ্চলে এই নাচের আসর কোনো মঞ্চে হয় না; খোলা

মাঠেই আসর বসে, লোকজন চারিদিকে জড়ো হয়ে নাচ দেখে। তবে শহরাঞ্চলে সাধারণ মঞ্চেই ছৌ নাচ দেখানো হয়। নাচের শুরু হয় ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে। এরপর একজন গায়ক গণেশের বন্দনা করেন। গান শেষ হলে বাদ্যকারেরা বাজনা বাজাতে বাজাতে নাচের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। প্রথমে গণেশের বেশধারী নর্তক নাচ শুরু করেন। তারপর অন্যান্য দেবতা, অসুর, পশু ও পাখির বেশধারী নর্তকেরা নাচের আসরে প্রবেশ করেন। প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে ঝুমুর গানের মাধ্যমে পালার বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেন।

ছৌ নাচে মুখে মুখোশ থাকার ফলে মুখের অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় না বলে শিল্পী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন ও সঙ্কোচন-প্রসারণের মধ্য দিয়ে চরিত্রের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ নাচের অঙ্গসঞ্চালনকে মস্তক সঞ্চালন, স্কন্ধ সঞ্চালন, বক্ষ সঞ্চালন, উল্লম্ফন এবং পদক্ষেপ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। বাজনার তালে হাত ও পায়ের সঞ্চালনকে চাল বলা হয়ে থাকে। ছৌ নাচে দেবচাল, বীরচাল, রাক্ষসচাল, পশুচাল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের চাল রয়েছে। চালগুলি ডেগা, ফন্দি, উড়ামালট, উলফা, বাঁহি মলকা, মাটি দলখা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত।

মুখোশ

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি থানার চড়িদা গ্রামের চল্লিশটি সূত্রধর পরিবার এবং জয়পুর থানার ডুমুরডি গ্রামের পাঁচটি পরিবার ছৌ নাচের মুখোশ তৈরী করেন। এছাড়া পুরুলিয়া মফস্বল থানার গেঙ্গাড়া, ডিমডিহা ও কালীদাসডিহি গ্রামে, পুঞ্চা থানার জামবাদ গ্রামে এবং কেন্দা থানার কোনাপাড়া গ্রামেও এই মুখোশ তৈরী হয়ে থাকে।

মুখোশ তৈরীর জন্য প্রথমে নদীর দোয়াশ মাটি দিয়ে একটি কাঠের ওপর ছাঁচ তৈরী করে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট রৌদ্রে শুকিয়ে ছাঁচের নাক, মুখ, চোখ বানানো হয়। এরপর কাপড়ে ছাই রেখে তাতে ফুটো করে মুখোশের ওপর ঝেড়ে ঝেড়ে ছাই দেওয়া হয়, এতে পরে ছাঁচ থেকে মুখোশকে পৃথক করা সহজে সম্ভব হয়। এরপর জলে ময়দা ও তুঁত মিশিয়ে আঠা তৈরী করে মুখোশের ছাঁচে তিন থেকে চার স্তরে কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয়। একদিন পরে কাগজের স্তরগুলি শুকিয়ে গেলে আট-দশটি স্তরে কাগজ লাগাতে হয়। এঁটেল মাটি জল দিয়ে ঘোলা করে আট দশ দিন রেখে দেওয়া হয়, যাকে কাবিজ বলা হয়। এরপর আট থেকে দশটি স্তরে সুতীর কাপড় কাবিজের সাথে লাগিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে রাখা হয়। মুখোশের নাক, মুখ, চোখ, কান পালিশ করে রৌদ্রে রেখে দেওয়া হয় ও দুই তিন পরে মুখোশের অবয়ব এবং মাটির ছাঁচটি পৃথক করা হয়। এরপর মুখোশের কিনারার কাগজ ও কাপড় কেটে ভেতরের দিকে মুড়ে মুখোশটিকে দুই-আড়াই ঘন্টা উল্টো করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর তেঁতুলের বীজ সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে সারারাত ভিজিয়ে আঠা তৈরী করে তার সাথে খড়িমাটি মিশিয়ে মুখোশের ওপর বার বার লাগিয়ে মুখোশের রঙ সাদা করা হয়। এরপর বিভিন্ন মূর্তিতে পৃথক পৃথক রঙ লাগিয়ে মুখোশের বিভিন্ন অংশ এঁকে সবশেষে চোখের মণি এঁকে রঙের কাজ শেষ করা হয়। এরপর মুখোশের কাঠামোর কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে তার দিয়ে বাইরের কাঠামো তৈরী করে পুঁতি, মালা, কানপাশা, কলগা, পালক প্রভৃতি লাগিয়ে কাঠামোর সাজসজ্জা সম্পন্ন করা হয়। মুখোশ তৈরী হয়ে গেলে লোহার রড গরম করে চোখের ফুটো তৈরী করা হয় এবং কানের পাশে দুইটি ফুটো করে তাতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, যার

সাহায্যে নর্তক মুখোশটি মুখের সাথে বেঁধে নিতে পারেন। এরপর মুখোশে সাবুর মিশ্রণ লাগিয়ে, রৌদ্রে শুকিয়ে বার্ণিশ লাগিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা হয়।

গম্ভীরা :

গম্ভীরা বাংলার লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি ধারা। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। গম্ভীরা দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। এটি বর্ণনামূলক গান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অঞ্চলের গম্ভীরার মুখ্য চরিত্রে নানা-নাতি খুব জনপ্রিয়।

ধারণা করা হয় যে, গম্ভীরা উৎসবের প্রচলন রয়েছে শিবপূজাকে কেন্দ্র করে। শিবের এক নাম 'গম্ভীর', তাই শিবের উৎসব গম্ভীরা উৎসব এবং শিবের বন্দনাগীতিই হলো গম্ভীরা গান। মালদহে মূলত চৈত্রসংক্রান্তির শিবপূজা উপলক্ষে বিগত বছরের প্রধান-প্রধান ঘটনাবলি নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে সমালোচিত হয়; অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট তামাশা, বড় তামাশা ও ফুলডাঙ্গা অনুষ্ঠানের গম্ভীরা মুখোশনৃত্য পরিবেশিত হয়। গম্ভীরা উৎসবের সঙ্গে এ সঙ্গীতের ব্যবহারের পেছনে জাতিগত ও পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তির গাজন উৎসবই গম্ভীরা পূজা ও উৎসব নামে পরিচিত (উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে এটি গমীরা নামে খ্যাত)। চৈত্রের শেষ চারদিনে মূল অনুষ্ঠান হয়, তবে অঞ্চলভেদে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এমনকি শ্রাবণ মাসেও শিবমূর্তি স্থাপন করে গম্ভীরা পূজা হয়। বর্তমানে মূলত শিবপূজা নামে খ্যাত হলেও প্রাচীনকালে এটি সূর্যের উৎসব ছিল বলে মনে করা হয়।

মালদহে নিম্নবর্ণের হিন্দু, কোচ-রাজবংশী, পোলিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমদিন 'ঘটভরা' অনুষ্ঠান; গম্ভীরা মণ্ডপে ঘট স্থাপন করে শিবপূজার উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে হয় 'ছোট তামাশা'; ঢাক-ঢোল বাদ্য সহযোগে মণ্ডপে নানা নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় দিনে 'বড়ো তামাশা'র দিনে সন্ন্যাসীরা শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধাচারে কাঁটা-ভাঙ্গা, ফুল-ভাঙ্গা ও বাণফোঁড়ায় অংশ নেয়। এদিন মালদহে বিভিন্ন সঙের দল ঘোরে; রাতে গম্ভীরা মণ্ডপে মুখোশনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ দিনে মণ্ডপে শিবের সঙ্গে নীলপূজাও হয়, সঙ্গে গম্ভীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে।

গম্ভীরা গান সাধারণত দুপ্রকার—আদ্যের গম্ভীরা এবং পালা-গম্ভীরা। প্রথমত, দেবদেবীকে সম্বোধন করে মানুষ তাঁর সুখ-দুঃখ পরিবেশন করলে তাকে আদ্যের গম্ভীরা বলা হয়। দ্বিতীয়ত, পালা-গম্ভীরায় নানা-নাতির ভূমিকায় দুজন ব্যক্তির অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটা সমস্যা তুলে ধরা হয়।

পরবর্তী সময়ে গম্ভীরা গানের ধরন অনেকাংশে বদলে গেছে। গানের সুরে দেবদেবীকে সম্বোধন করে বলা হয় গ্রামীণ দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের সুখ-দুঃখ। কখনও সারা বছরের প্রধান ঘটনা এ গানের মাধ্যমে আলোচিত হয়। পালা-গম্ভীরায় অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটা সমস্যা তুলে ধরা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে বছরের সালতামামি উপলক্ষে পালা-গম্ভীরা পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে 'গম্ভীরা' বলতে বিশেষ একটি অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে বোঝায়।

গম্ভীরা গানের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় হিন্দুসমাজে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মালদহ থেকে গম্ভীরা গান রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জে চলে আসে। ওই সময় থেকে এখানে এ গানের পৃষ্ঠপোষক হয় মুসলিম সমাজ। তখন স্বাভাবিকভাবে গানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্রমে রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে এ গান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পূর্বে গম্ভীরা গানের আসরে শিবের অস্তিত্ব কল্পনা করা হত। বর্তমানে বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের আসরে শিবের পরিবর্তে 'নানা-নাতি'র ভূমিকায় দুজন অভিনয় করে। নানার মুখে পাকা দাড়ি, মাথায় মাথাল, পরনে লুঙ্গি; হাতে লাঠি। আর নাতির পোশাক ছেঁড়া গেঞ্জি, কোমরে গামছা ইত্যাদি। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। 'নানা-নাতি'র সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে দ্বৈতভাবে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়। এক সময় গম্ভীরা গান একতাল, ত্রিতাল, দাদরা, খেমটা, কাহারবা প্রভৃতি সুরে গাওয়া হতো। বর্তমানে সুরের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাতে হিন্দি ও বাংলা ছায়াছবির গানের সুর প্রাধান্য পাচ্ছে। এ ছাড়া লোকনাট্যের বহু বিষয়, চরিত্র ও সংলাপও গম্ভীরা গানে সংযুক্ত হয়েছে। নবাবগঞ্জের কুতুবুল আলম, রকিবউদ্দীন, বীরেন ঘোষ, মাহবুবুল আলম প্রমুখ গম্ভীরা গানের বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁরা নতুন নতুন সুর সৃষ্টির মাধ্যমে গম্ভীরা গানকে সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

লোকগাথার মতো দীর্ঘ পালাগান এ সমাজজীবনের বাস্তব চিত্রটি ধরা পড়েছে। প্রেমই গাথাগুলির মুখ্য বিষয়; তবে কিছু বীরত্ব ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্রও আছে। ছড়ায় আছে কল্পনা ও বাস্তবতার মিশ্রণজাত বিচিত্র বিষয়। শিশুতোষ রচনা হিসেবে ছড়া সুদূর অতীত থেকে শিশুর সরস চিত্তকে অভিষিক্ত করে আসছে। মন্ত্র ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম, কেননা এতে জাদুশক্তি আছে। বাঙালি তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাসী; তারা বাহুবল অপেক্ষা মন্ত্রবলে বৈরি ও অপশক্তিকে দমন করার বাসনা পোষণ করে। মারণ, উচাটন ও বশীকরণ মন্ত্রও জাদুবিশ্বাসের ফল। বুদ্ধি ও মননপ্রসূত বাঁধা, প্রবাদ ও প্রবচনগুলি জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। প্রবাদ-প্রবচন সব দেশের ভাষার এক অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হয়।

চিত্রকলাকে বলা যায় বস্তু-আশ্রিত মানস ফসল। আলপনা, পটচিত্র, ঘটচিত্র, দেওয়ালচিত্র, অঙ্গচিত্র প্রভৃতিতে রঙ-তুলির ব্যবহার আছে। ঘরের মেঝে, খুঁটি, দেওয়াল, কুলা, ডালা ইত্যাদিতে আলপনা দেওয়া হয়। ব্রতপূজা উপলক্ষে ব্রতের আলপনা দেওয়ার রীতি আছে। বর্তমানে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এমনকি জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষেও পথে-প্রাঙ্গণে আলপনা দেওয়া হয়। এই আলপনা বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব ধারা। পটুয়ার পটচিত্র ও পটগীত বাঙালির ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। কালীঘাটের পটচিত্র এর রূপান্তরিত ও অবক্ষয়িত রূপ। কালীঘাটের পট লোপ পেয়েছে, কিন্তু পটুয়ার পটচিত্রের প্রচলন আজও আছে।

নকশি গাঁথা সূচিশিল্পের মধ্যে পড়ে। এটি একান্তভাবে পল্লিরমণীর নিজস্ব সম্পদ। বিছানার চাদর এবং লেপ ও বালিশের কভার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও নানা চিত্রকর্মে শোভিত এসব কাঁথা নান্দনিকতা গুণে দেশ-বিদেশের শিক্ষিত সমাজেও সমাদৃত হয়েছে। শহরে এখন নকশি কাঁথা সৌখিন পণ্য হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হয়।

অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনমূলক লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকনাট্য, যাত্রা, নৃত্য ও খেলাধুলা প্রধান। অভিনয় ও অঙ্গক্রিয়া দ্বারা এসব রূপায়িত হয়। বাউল, গম্ভীরা প্রভৃতি গান, নাচ ও অভিনয় ত্রি-অঙ্গের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়। জারি গানের সঙ্গে জারি নাচ, সারি গানের সঙ্গে সারি নাচ, লাঠি খেলার সঙ্গে লাঠি নাচ, খেমটা গানের সঙ্গে খেমটা নাচ এবং ঘাটু গানের সঙ্গে ঘাটু নাচ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলি সকল শ্রেণির মানুষের চিত্তবিনোদনের উৎস। হোলির গীত, গাজীর গীত, মাগনের গীত, বিবাহের গীত, হুদমার গীত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে নিজস্ব কিছু আচাসহ পরিবেশিত হয়। কতক গান পেশাজীবী গানে, বয়াতি ও গীদালরা পরিবেশন করে; আর বাকিগুলি বাড়ি-ঘরে, মাঠে-ঘাটে ও খেতে-খামারে নানা শ্রেণির মানুষ কাজ করতে করেত বা কাজের অবসরে গেয়ে শ্রান্তি দূর ও আনন্দ উপভোগ করে।

প্রথম জমি চাষ থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত নানা ধরনের লোকাচার আছে। এর কতগুলি প্রাকফসল, আর কতকগুলি ফসলোত্তর আচার। বৃষ্টির জন্য মেঘারাণী, হুদমা দেওয়া, বেঙ বিয়া, ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেতবন্ধন, কাকতাড়ুয়া, গাম্বি উৎসব প্রভৃতি প্রাকফসল আচার; আর লক্ষ্মীর ছড়, নবান্ন, মাগন প্রভৃতি ফসলোত্তর অনুষ্ঠান। এসব আচার-অনুষ্ঠান পালনে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই; তবে টুসু, ভাদু, করম, বসুধারা প্রভৃতি ব্রতাচার হিন্দু রমণীরাই পালন করে থাকে।

শরীরচর্চা, আমোদ-প্রমোদ ও অবসরযাপনের জন্য লোকসমাজে খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষভেদে তিন ধরনের লোকক্রীড়া আছে। শ্রমসাপেক্ষ শরীরচর্চার খেলা ও শ্রমহীন আনন্দের খেলা হিসেবে অন্তরঙ্গন ও বহিরঙ্গনের খেলারূপেও এগুলিকে ভাগ করা যায়। হাডুডু একটি জনপ্রিয় খেলা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে হাডুডু স্বীকৃতি লাভ করেছে। বলীখেলা, নৌকা বাইচ, বউছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, নুনতা, চিক্কা, ডাংগুলি, ষোলোঘুঁটি, মোগল-পাঠান, এক্কাদোক্কা, বউরাণী, কড়িখেলা ঘুঁটিখেলা, কানামছি, ঘুড়ি উড়ানো, কবুতর উড়ানো, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি খেলায় সকল স্তরের লোকজন অংশগ্রহণ করে। দেশের অভ্যন্তরে কতক অঞ্চলে নৌকা বাইচ, বলীখেলা ও ষাঁড়ের লড়াই বাদ্যযন্ত্রসহ বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় উৎসবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কতক খেলাধুলা শরীরচর্চা ও শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে স্কুলের বালক-বালিকারাও অনুশীলন করে।

'বার মাসে তের পার্বণ' প্রবাদ দ্বারা উৎসবমুখের বাঙালি জাতির মৌলিক পরিচয় ফুটে ওঠে। হিন্দুদের ব্রতাদি আচার-অনুষ্ঠানের আধিক্যের কথা বিবেচনা করেই এরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বার, তিথি, মাস ও ঋতুভিত্তিক এসব পার্বণের উদ্ভবের পেছনে প্রাকৃতিক ও দৈব শক্তির কল্পনা আছে। শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশাপাশি হিন্দুরা লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, ওলাদেবী, বনদুর্গা, দক্ষিণরায়, সত্যনারায়ণ, পাঁচু ঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজাচার পালন করে থাকে। দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের ফলে নিম্ন শ্রেণির মুসলমানদের ওপরেও এসবের প্রভাব পড়েছে। তারা সত্যপীর, গাজীপীর, মানিকপীর, মাদারপীর, খোয়াজ খিজির, ঘোড়াপীর, বনবিবি, ওলাবিবি, হাওয়া বিবি প্রভৃতি কাল্পনিক, লৌকিক ও ঐতিহাসিক পীর-পীরানিকে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে পূজা-মানত করে থাকে। এসবের পেছনে অসহায় মানুষের রোগ-ব্যাধি ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কামনা-বাসনা নিহিত রয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কতক পূজা-মানত পৃথকভাবে করে,

আবার কতক ক্ষেত্রে উভয়ে পরস্পরের অংশীদার হয়। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর, বনদুর্গা ও বনবিবি যে একই ভাবনার ভিন্ন রূপ তাতে সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে অসংখ্য মেলা আছে যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যোগদান ও আনন্দোপভোগ করে। হিন্দুর রথযাত্রার মেলায় মুসলমান এবং মুসলমানের মহরম মেলায় হিন্দুর অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই। বৈশাখী মেলা এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। হিন্দুরা দেওয়ালি উৎসবে প্রদীপ ভাসায়, মুসলমানরা মহরম অনুষ্ঠানে বেরা ভাসায়। শুভ অনুষ্ঠানে মঙ্গলঘট স্থাপন ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো আগে শুধু হিন্দু সমাজেই প্রচলিত ছিল, এখন মুসলমানের অনুষ্ঠানেও মঙ্গল কামনায় ওইরূপ করা হয়। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু আচার-অনুষ্ঠান আছে। গায়ে হলুদ, ডালা, বর-কনে স্নান, মাড়োয়া সাজানো, আয়নামুখ, কড়ি খেলা, বরবধূ বরণ, ফিরানি ইত্যাদি আচার কমবেশি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পালিত হয়।

নৃতত্ত্বের বিচারে বাঙালির দেহে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, নেগ্রিটো, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রক্তধারা প্রবাহিত; এর সঙ্গে পরবর্তীকালে অ্যালপানীয়, পলিনীয়, সেমিটিক প্রভৃতি জাতির রক্তও মিশেছে। এদিক থেকে বাঙালি একটি সংকর জাতি। বাংলার লোকসংস্কৃতিতেও বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষ করে কৃষিকাজ ও কৃষকজীবনের ক্ষেত্রেই মিশ্রণ বেশি হয়েছে। ধর্ম, মত ও পথ নির্বিশেষে যুগযুগ ধরে বিভিন্ন বর্ণ ও পেশার মানুষের একত্র বসবাস ও পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের ফলে গ্রামীণ জীবনে বিরোধ অপেক্ষা ঐক্যের সুরই বেশি ধ্বনিত হয়েছে। এজন্য ভারতীয় সংস্কৃতির মতো বাংলার লোকসংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিফলন ঘটেছে এবং এর মধ্যেই বাঙালির জাতিগত পরিচয় নিহিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ Wikipedia and

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%

E0%A6%A4%E0%A6%BF

৫.৪.৯.১০ : হিন্দু মন্দির

হিন্দুদের দেব-উপাসনার স্থান হল হিন্দু মন্দির। 'মন্দির' বা 'দেবালয়' বলতে বোঝায় 'দেবতার গৃহ'। মানুষ ও দেবতাকে একত্রে নিয়ে আসার জন্য হিন্দুধর্মের আদর্শ ও ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত প্রতীকগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত ভবন বা স্থানকেই 'মন্দির' বলা হয়। জর্জ মিশেলের মতে, হিন্দু মন্দির এমন একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র যেখানে মায়ার জগৎ থেকে মানুষ তীর্থযাত্রী বা পূণ্যার্থীর বেশে জ্ঞান ও সত্যের জগতের সন্ধানে আসেন। গুপ্তযুগ থেকে মূলত মন্দির কেন্দ্রিক আরাধনা শুরু হয়।

স্টেলা ক্র্যামরিসের মতে, হিন্দু মন্দিরের প্রতীকতত্ত্ব ও গঠনভঙ্গিমা বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত আছে। একটি মন্দিরের মধ্যে হিন্দু বিশ্বতত্ত্বের সকল ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ভাল, মন্দ ও মানবিক দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর কালচক্র ধারণা এবং পুরুষার্থ ধারণার সব কিছুই প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ধর্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষ, কর্ম ও ভক্তির দার্শনিক ধারণাগুলিও প্রতীকের মাধ্যমে মন্দিরে উপস্থিত থাকে।

ভারতে প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে মন্দির স্থাপত্যের সূচনা হয়। ইঁট ও কাঠের নির্মিত প্রাচীনতম মন্দিরের অস্তিত্ব এখন আর টিকে না থাকলেও পরবর্তীকালের পাথর নির্মিত মন্দিরগুলো অনেকাংশেই টিকে আছে। কাঠামোগত ভাবে কোন একটি মন্দির বৈদিক নৈবেদ্যতা থেকে ভক্তি বা ভালোবাসার ধর্মে রূপান্তরিত হয় এবং তা থেকে একটি সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তি বিশেষের বিশ্বাসে পরিণত হওয়ার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে দক্ষিণ এশীয় মন্দির ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে চমৎকার অভিন্ন ধারা গড়ে উঠেছে। গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের পাথরের স্বল্পতার কারণে এ অঞ্চলের মন্দির নির্মাতাদের পাথর ব্যতীত অন্যান্য নির্মাণ উপকরণের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ফলে পোড়ামাটির ইটের গাঁথুনীতে গড়া মন্দিরের দেয়াল অলংকরণে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহারও হয়েছে যা বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অনন্য বৈচিত্র্য দান করেছে।

হিন্দু মন্দিরে প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থিত আধ্যাত্মিক আদর্শগুলির কথা পাওয়া যায় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থগুলিতে (যেমন, বেদ, উপনিষদ্ ইত্যাদি)। অন্যদিকে মন্দিরের গঠনভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তা বর্ণিত হয়েছে স্থাপত্য-সংক্রান্ত সংস্কৃত প্রবন্ধগুলিতে (যেমন, বৃহৎসংহিতা, বাস্তুশাস্ত্র ইত্যাদি)। মন্দিরের নকশা, অলংকরণ, পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীর মধ্যে প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতি, জ্যামিতিক প্রতীকতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। হিন্দু মন্দিরগুলি হিন্দুদের আধ্যাত্মিক গন্তব্য। সেই সঙ্গে মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন শিল্পকলা, সম্প্রদায়গত উৎসব ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

হিন্দু মন্দিরগুলি শিল্পকলা, ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও হিন্দু জীবনদর্শনের এক সংমিশ্রণ। এগুলি হল একটি পবিত্র ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষ, দেবতা ও পুরুষের (ব্রহ্ম) মিলনকেন্দ্র।

৯ × ৯ (৮১) গ্রিড-বিশিষ্ট 'পরম সায়িক' নকশা দেখা যায় বৃহদাকার প্রথাগত হিন্দু মন্দিরগুলিতে। হিন্দু মন্দির নির্মাণে যে বিভিন্ন প্রকার গ্রিড ব্যবহৃত হয়, এটি তার মধ্যে অন্যতম। এই ধরনের মন্দির হল সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতির মন্দির। এখানে প্রত্যেকটি সমকেন্দ্রিক নকশার বিশেষ গুরুত্ব আছে। 'পৈশাচিক পাদ' নামে পরিচিত বাহ্যিক নকশাটি অসুর বা অশুভের প্রতীক। অন্যদিকে ভিতরের 'দৈবিক পাদ' নকশাটি দেবতা বা শুভের প্রতীক। শুভ ও অশুভের মধ্যে এককেন্দ্রিক 'মানুষ পাদ' মানবজীবনের প্রতীক। প্রতিটি নকশা 'ব্রহ্মপাদ' কে ঘিরে থাকে। ব্রহ্মপাদ সৃষ্টিশক্তির প্রতীক। এখানেই মন্দিরের প্রধান দেবতার মূর্তি থাকে। ব্রহ্মপাদের একেবারে কেন্দ্রস্থলটি হল 'গর্ভগৃহে'। এটি সবকিছু ও সবার মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মের প্রতীক।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলিতে মন্দিরকে বলা হয়েছে 'তীর্থ'। এটি একটি পবিত্র ক্ষেত্র যার পরিবেশ ও নকশা হিন্দু জীবনদর্শনের প্রতিটি ধারণাকে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করে। জীবন সৃষ্টি ও রক্ষার প্রতিটি বিশ্বজনীন উপাদান হিন্দু মন্দিরে উপস্থিত—আগুন থেকে জল, দেবতার মূর্তি থেকে প্রকৃতি, পুরুষ থেকে নারীসত্ত্বা, অস্ফুট শব্দ ও ধূপের গন্ধের থেকে অনন্ত শূন্যতা ও বিশ্বজনীনতা—সবই মন্দিরের মূল আদর্শের অন্তর্গত।

সুজান লেওয়াান্ডোস্কি বলেছেন, সবকিছুই এক এবং সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত—এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই হিন্দু মন্দির নির্মাণের মূল নকশাটি প্রস্তুত করা হয়। ৬৪-গ্রিড বা ৮১-গ্রিড গাণিতিকভাবে নির্মিত স্থান ও

শিল্পকলায় মণ্ডিত স্তম্ভের মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রীকে স্বাগত জানানো হয়। মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধারণগুলি —যেমন অর্থ (উন্নতি, সম্পদ), কাম (বিনোদন, যৌনতা), পুরুষার্থ (সদগুণ ও নৈতিক জীবন) ও মোক্ষ (জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি, আত্মজ্ঞান)—এগুলির অনুসন্ধানে মানুষকে প্রবুদ্ধ করার জন্য স্তম্ভগুলি খোদাইচিত্র বা মূর্তিতে শোভিত থাকে। মন্দিরের কেন্দ্রে, সাধারণত দেবতার নিচে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপরে বা পাশে, খানিকটা ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। এখানে কোনো অলংকরণ থাকে না। এটি সর্বোচ্চ উপাস্য ব্রহ্ম বা পুরুষের প্রতীক। ব্রহ্ম নিরাকার, সর্বত্রব্যাপী, সবকিছুর মধ্যে যোগসূত্রধারী ও সবকিছুর সারবস্তু। হিন্দু মন্দিরের উদ্দেশ্য ব্যক্তির মনকে পবিত্র করা ও ভক্তের আত্মজ্ঞান জাগরিত করা। বিশেষ পদ্ধতিগুলি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরের প্রধান দেবতা এই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

হিন্দুধর্মে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় চেতনার মধ্যে কোনো বিভাজনরেখা নেই। সেই অর্থে, হিন্দু মন্দিরগুলি শুধু পবিত্র স্থানই নয়, ধর্মনিরপেক্ষ স্থানও বটে। এগুলির অর্থ ও উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জীবনের বাইরে সামাজিক রীতিনীতি ও দৈনিক জীবনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়ে এগুলিকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান করে তুলেছে। কোনো কোনো মন্দিরে বিশেষ বিশেষ উৎসবের জন্য বিখ্যাত। সেখানে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে শিল্পের চর্চা করা হয়। আবার হয় বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানও পালিত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও হিন্দু মন্দিরগুলি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক হিন্দু রাজবংশের বংশপরম্পরার সঙ্গে হিন্দু মন্দিরের যোগাযোগ আছে। আবার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গেও অনেক হিন্দু মন্দির অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

মন্দির স্থাপত্য

লিপি ও সাহিত্য-সংক্ষ্যে জানা যায়, প্রাচীন বাঙলায় মন্দির নির্মিত হইয়াছিল অসংখ্য; কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন, অর্ধভগ্ন মন্দির ছাড়া এই অসংখ্য মন্দিরের কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। অথচ ভারতীয় স্থাপত্যের মন্দিরেই যাহা কিছু বাঙলার বৈশিষ্ট্য। বাঙলার মন্দিরই ব্যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্যের মূল প্রেরণ। সমসাময়িখ লিপিমালা ও সাহিত্যে প্রাচীন বাঙলার কোনও কোনও মন্দিরের সমৃদ্ধির বর্ণনা দৃষ্টিগোচর; কোনও কোনও মন্দিরের আপেক্ষিক প্রসিদ্ধিও ছিল, সন্দেহ নাই। এমন দুই চারিটি মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা যায় সমসাময়িক পাণ্ডুলিপিচিত্রে এবং তক্ষণফলকে, যেমন রাঢ় ও পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দির, বরেন্দ্রর তারা-মন্দির, সমতট, বরেন্দ্র, রাঢ় এবং দণ্ডভুক্তির লোকনাথ মন্দির। এই সব মন্দিরের প্রতিকৃতির আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন বাঙলায় মোটামুটি চারিটি বিভিন্ন শৈলীর মন্দির-নির্মাণে রীতি প্রচলিত ছিল। রীতি ও শৈলীর এই বিভিন্নতা ভূমি-নকশানির্ভর নয়, বস্তুত, প্রত্যেকটি রীতিতেই ভূমি-নকশার যুক্তি ও বিন্যাস প্রায় একই ধররেন। এই বিভিন্নতা প্রধানত গর্ভগৃহের উপরিভাগ অর্থাৎ ছাদ বা চালের রূপ ও আকৃতিনির্ভর। সদ্যোক্ত চারিটি রীতি নিম্নোক্ত ভাবে তালিকাগত করা যাইতে পারে।

১. ভদ্র বা পীড় দেউল। রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি হইয়া ধাপে, ধাপে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ধাপ বা স্তর সংখ্যায় তিনটি, পাচটি বা সাতটি। সর্বোচ্চ এবং ক্ষুদ্রতম স্তরের উপরে আমলক ও চূড়া। এই ভদ্র বা পীড় দেউলই ওড়িশার রেখা বা শিখর-মন্দির সমূহের সম্মুখভাগের জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ।

২. রেখা বা শিখর দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ঈষদবক্র রেখায় শিখরাকৃতি হইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। শিখরের উপরিভাগে আমলক ও চূড়া। এই রেখা বা শিখর দেউল উত্তর-ভারতীয় এবং ওড়িশার নাগর পদ্ধতির মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত।

৩. স্তূপযুক্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলে চালের ক্রমহ্রস্বয়মান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপরে একটি স্তূপ। স্তূপটির উপর চূড়া।

৪. শিখরযুক্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলের চালের ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপর একটি শিখর। শিখরের উপর চূড়া।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই চার বিভিন্ন রীতির প্রত্যেকটির স্থাপত্য-নিদর্শন আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই; তৃতীয় ও চতুর্থ রীতির মন্দিরের কোনও নির্দশন আমরা আজও জানি না, যদিও ঐ ধরনের মন্দির ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। প্রথমোক্ত রীতির নিদর্শনও জানি, দুয়ে তাহা বলা যায় না, তবে, দ্বিতীয় রীতির মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন আজও দৃষ্টিগোচর।

১. প্রথমোক্ত রীতির, অর্থাৎ, ভদ্র বা পীড় দেউল যে প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচুর ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় অগণিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতিগুলিতে। এই রীতির প্রাথমিক রূপটি দেখিতেছি ঢাকা আশ্রফপুরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের ব্রোঞ্জনির্মিত একটি ফলকে। চারটি খাজকাটা কাঠের স্তম্ভের উপর ঢালু ক্রমহ্রাসয়মান দুটি চাল, তাহার উপর সুন্দর একটি চূড়া। ইহাই এই রীতির মন্দিরের মূল রূপ; এই রূপই ক্রমশ আরও সমৃদ্ধ এবং জটিল হইয়াছে। একটি একটি করিয়া ঢালু চালের সংখ্যা গিয়াছে বাড়িয়া, সর্বোচ্চ চালটির উপর চূড়ার নীচেই গ্রীবাদেশের গোলাকৃতি অংশটি ক্রমশ আমলক শিলায় বিবর্ধিত হইয়াছে, এবং গ্রীবানিম্নের চালটির (ঘাড়ে চক্রের) চারিকোণে চারিটি ঝম্পসিংহ-মূর্তির অলংকরণ সংযোজিত হইয়াছে। ভূমি-নকশা সাধারণত চতুষ্কোণ রথাকৃতি; প্রত্যেক দিকের বিলম্বিত রেখাটি কেন্দ্রীয় অংশটির সম্মুখ দিকে বাড়াইয়া দিয়া রথের আকৃতি দান করা হইয়াছে। এই ধরনের রথাকৃতি ভূমি-নকশায় উপর দুই বা ততোধিক ঢালু ক্রমহ্রস্বায়মান চালের মন্দির, মধ্যযুগের বাঙলাদেশেও সুপ্রচলিত রীতি ছিল, সন্দেহ নাই। ষোড়শ-শতকের অনেক মৃৎফলকে এই ধরনের মন্দিরের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। প্রায় সমসাময়িক কালের ইষ্টকনির্মিত এই রীতির মন্দিরের একাধিক নির্দশন (যেমন বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর মন্দিরের নদীমণ্ডপ)। আজও দৃষ্টিগোচর। লোকায়ত বাঙলার দ্বিতল বা ত্রিতল খড়ের চালের রূপ হইতেই যে এই রীতির উদ্ভব, তাহাঁতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। যাহাই হউক, প্রাচীনতর রূপের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর একমাত্র প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি-চিত্রেই দৃষ্টিগোচর; মন্দিরাবশেষ কিছু নাই বলিলেই চলে। হিলিতে প্রাপ্ত এবং ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কল্যাণ-সুন্দর শিবমূর্তির ফলকে, চব্বিশ পরগণা-কুলদিয়ার এবং রাজশাহীর-বরিয়ার সূর্যমূর্তির ফলকে, বিক্রমপুরের রত্নসম্ভব-মূর্তির ফলকে, ঢাকা-মধ্যপাড়ার বুদ্ধমূর্তি-ফলকে, বিরোলের উমা-মহেশ্বর প্রতিমা-ফলকে, এবং রাজশাহী-কুমারপুরের একটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিতে এই রীতির মন্দিরের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি ধরিতে পার খুব কঠিন নয়।

২. দ্বিতীয়োক্ত রীতির অর্থাৎ রেখা বা শিখর-দেউলের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বোধ হয় বর্ধমান-বরাকরের ৪ নং মন্দিরটি। এই মন্দিরটি পাথরে তৈরি, নিচু ভিতের উপর গর্ভগৃহটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং গর্ভগৃহের উপর খর্বাকৃতি একটি রেখা বা শিখরের চাল। গোড়া হইতেই শিখরের ক্রমবিক্র রেখাটি উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; শিখরের উপর একটি বৃহৎ আমলক-শিলা। শিখরের রেখাগুলি সুতীক্ষ্ণ ও সুকঠোর সারল্যে নিয়ন্ত্রিত। স্থাপত্যরূপের দিক হইতে এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সমকালীন, অর্থাৎ অষ্টম শতকীয়।

এই রেখা-দেউলের বিবর্তনের পরবর্তী স্তরটি ধরা পড়িয়াছে তিনটি ক্ষুদ্রায়তন নিবেদন-মন্দিরে; এই তিনটির দুইটি পাথরে তৈরি (একটি দিনাজপুরে এবং আর একটি রাজশাহী নিমদীঘিতে প্রাপ্ত), তৃতীয়টি ব্রোঞ্জে গড়া (এবং চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারীতে পাওয়া)। আকৃতি-প্রকৃতি এবং বিবর্তনের দিক হইতে এই তিনটিই সমকালীন, সন্দেহ নাই। রেখাকৃতি ভূমি-নকশার উপর গর্ভগৃহ; গর্ভগৃহের চারদিকে চারিটি ত্রিবলীতে তোরণা বা কুলুঙ্গি; চালে ক্রমবিক্রাকৃতি শিখর এবং শিখরের শীর্ষে সংকীর্ণ গ্রীবার উপর আমলক। বিবর্তনের এই স্তরেও পগরেখা তীক্ষ্ণ ও সরল, তবে শিখরের অঙ্গে চৈত্য-গবাক্ষের অলঙ্কার। পাথরের নিদর্শন দুইটিতে গর্ভগৃহ ও শিখরের মাঝখানে দুই বা তিনস্তরে মণ্ডনায়িত রেখা, কিন্তু ব্রোঞ্জ-নিদর্শনটিতে তাহা নাই।

বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে প্রায় চারি পাঁচটি ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন নিদর্শন বিদ্যমান—বর্ধমানের সিদ্ধেশ্বর-মন্দির, বাঁকুড়া জেলার দোহার-গ্রামের পাথরে তৈরি সরেশ্বর ও সল্লেশ্বর-মন্দির, এবং সুন্দরবনের জটার-দেউল। প্রথম চারিটি মন্দিরের অত্যন্ত ভগ্নদশা; পঞ্চম মন্দিরটির এমন সংস্কার-সংরক্ষণ করা হইয়াছে যে, ইহার মূল আকৃতি-প্রকৃতিই গিয়াছে বদলাইয়া। এই মন্দিরগুলি ভূমি-নকশা, গর্ভগৃহ, শিখর ও অলংকরণ প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ধরা পড়ে, সদ্যোক্ত শিখরাকৃতি নিবেদন-মন্দিরগুলির সঙ্গে ইহাদের মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছু নাইষ তবে এই মন্দিরগুলি আয়তনে ও অলংকরণে আরও সমৃদ্ধতির, আকৃতি-প্রকৃতিতে আরও জটিলতর। মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে শুধু দেখিতেছি, শিখরের পগরেখাগুলির তীক্ষ্ণতা মার্জনা করিয়া একটু গোলাকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে সমগ্র শিখরটিরই আকৃতি হইয়া পড়িয়াছে খানিকটা গোলাকার। তাহা ছাড়া, মূল শিখরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকারে সজা সংযোজিত হইয়াছে এবং প্রবেশ তোরণের দিকে একটি অলিন্দ ও যোগ করা হইয়াছে। দেউলিয়ার মন্দিরটি বোধ হয়। পাচটির মধ্যে সর্বপ্রাচীন এবং ইহার কিছুকাল পরেই বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর-মন্দির। এই দুইটি মন্দিরেই শিখরের পগরেখা গর্ভগৃহের ভূমি পর্যন্ত আলম্বিত এবং রেখার তীক্ষতা মার্জিত ও গোলায়িত। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরটির গর্ভগৃহের বহিঃপ্রাচীরে কুলুঙ্গির অলংকার এবং শিখরের কেন্দ্রীয় রথটিতে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরাংলাকর। এই মন্দির দুটি বোধ হয় দশম-একাদশ শতকীয়। দেহারের সরেশ্বর ও সল্লেশ্বর-মন্দির দুইটির গর্ভগৃহের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; তবে, গর্ভগৃহের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এই দুটি মন্দির ও বহুলারার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের সমসাময়িক। সুন্দরবনের জটার-দেউলিটও বোধ হয় একই কালের, কিন্তু যুক্তিহীন, জ্ঞানহীন সংস্কার ও সংযোজনার ফলে মন্দিরটির মৌলিক রূপ আজ আর কিছু বুঝিবার উপায় নেই। তবে পুরাতন এবং সংস্কারপূর্ণ একটি আলোকচিত্র হইতে মনে হয়, এই দেউলটিও অনেকটা সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের মতনই ছিল, তবে শেষোক্ত মন্দিরের শিখরের রেখা বোধ হয় ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বক্র।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ধমান-বরাকরের ১, ২ ও ৩ নং মন্দির তিনটিকে দ্বাদশ-শতকীয় বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুত গঠনরীতির দিক হইতে এই তিনটির একটিও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের আগেকার মন্দির বলিয়া মনে হয় না। বর্ধমান-গৌরাঙ্গপুরের ইছাইঘোষের দেউলটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে; এই মন্দিরটি যেন আরও পরবর্তী। তবে, মধ্যযুগেও যে বাংলাদেশে রেখা বা শিখরা-দেউল নির্মিত হইত, বিশেষভাবে পশ্চিম-বাঙলায়, এই মন্দিরগুলি তাহার প্রমাণ।

প্রাচীন বাংলার রেখা বা শিখর-দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের শত্রুঘ্নেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায় এবং পূর্ববর্তী। তাহা ছাড়া, বাঙলার মন্দরগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে; ওড়িশার মন্দিরগুলির মতো এই মন্দিরগুলির কোনও জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ কিছু নাই, আমলক-সহ শিখর-শীর্ষ গর্ভগৃহই দেউলের একমাত্র অঙ্গ; অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে জগমোহনের পরিবর্তে সম্মুখ দিকে দেয়ালে একটি অলিন্দের সংযোজন আছে। ওড়িশার লিঙ্গরাজ ও পরবর্তী মন্দিরগুলির ভূমি-নকশায়ও অলংকরণে যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাও বাংলার মন্দিরগুলিতে নাই। বস্তুত, বাংলার মন্দিরগুলি ক্ষুদ্রকায় হইলেও খুব মার্জিত ও সংযত রুচির পরিচয় বহন করে; চৈত্য-গবাক্ষ ও ক্ষুদ্রায়তন শিখরালংকার ছাড়া এই মন্দিরগুলির বিশেষ আর কোনও অলংকরণ নাই।

৩. স্তূপশীর্ষ ভদ্র বা পীড়-দেউলের নিদর্শন প্রাচীন বাংলায় খুব বেশি দেখা যায় না। তবে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে নালেন্দ্র নামক স্থানের লোকনাথ-মন্দিরের একটি প্রতিকৃতি আছে। এই প্রতিকৃতিতে এই ধরনের মন্দিরের অন্তত একটি নিদর্শন দৃষ্টিগোচর। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর ক্রমহ্রস্বায়মান ঢালু চালের কয়েকটি স্তর, তাহার উপর একটি বৃহদায়তন স্তূপ এবং প্রত্যেকটি স্তরের চারিটি কোণে কোণে একটি একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপের অলংকরণ। ইট বা পাথরের তৈরি এই রীতি কোনও দেউল নির্মাণের কোনও সাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে নাই। তবে নির্মিত যে হইত। তাহার প্রমাণ এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রটি। ব্রহ্মদেশ-পাগানের অভয়দান এবং পাটো থ্যামা-মন্দির (একাদশ-শতক) দুটির স্থাপত্যরূপ ও রীতির পশ্চাতে যে এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই।

৪. শিখর শীর্ষ পীড় বা ভদ্র দেউলেরও নির্মাণ-নিদর্শন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; তবে একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দিরের যে প্রতিকৃতি আছে এবং কয়েকটি প্রস্তর-ফলকে যে ধরনের কয়েকটি মন্দির উৎকীর্ণ আছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, এই শিখর শীর্ষ পীড় বা ভদ্র দেউলও বাঙলাদেশে সুপরিচিত সুপ্রচলিত ছিল। এই ধরনের মন্দিরের চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর স্তরে স্তরে ক্রমহ্রস্বায়মান চাল এবং সর্বোচ্চ চালটির উপর বক্ররেখায় একটি শিখর, শিখরের উপর আমলক-শিলা; বৌদ্ধমন্দির হইলে আমলক-শিলার উপর একটি অতি ক্ষুদ্রকায় স্তূপের প্রতীক। শিখরের আকৃতি কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘায়িত। ব্রহ্মদেশের পাগান নগরে একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় থাইবিঞ, টিহ্-লো-মিনহ-লো. শোয়েগু-জ্যি ও অন্যান্য অনেকগুলি মন্দিরের পশ্চাতে প্রাচীন বাঙলার এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান।

পাহাড়পুরের মন্দির

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ উন্মোচন করিয়া একটি বিপুলকায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিদিকে কক্ষসারি লইয়া সুবিস্তৃত বিহারের ধ্বংসাবশেষ, তাহারই সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরের চাল নাই, চুড়া নাই; চারিদিকের প্রাচীর পড়িয়াছে ভাঙিয়া; প্রদক্ষিণ পথ, পূজাকক্ষ, সমস্তই ইটে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; তবু এই বিরাট ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহার গঠনরেখা ও রীতি ধীরে ধীরে অনুসরণ করিলে ইহার সামগ্রিক আকৃতি-প্রকৃতি ক্রমশ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। তখন স্বীকার করিতে বাধা থাকে না, এই মন্দির প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময়। ভারতীয় ও বর্হিভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এই মন্দির গরিমায় উজ্জ্বল এবং রূপে ও রীতিতে তুলনাহীন না হইলেও এই জাতীয় আপাতজ্ঞাত সকল সর্বতোভদ্র মন্দিরের পুরোভাগে ইহার স্থান।

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে 'সর্বতোভদ্র' নামে একশ্রেণীর মন্দিরের উল্লেখ ও পরিচয় আছে। এই ধরনের মন্দির চতুষ্কোণ এবং চতুঃশালগুহ, অর্থাৎ ইহার চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ এবং সেই গৃহে প্রবেশের জন্য চারিদিকে চারটি তোরণ। শাস্ত্রানুযায়ী এই ধরনের মন্দির হইত। পঞ্চতল, প্রত্যেক তলের ষোলোটি কোণ অর্থাৎ চতুষ্কোণের প্রত্যেকটি বাহু সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া এক এক দিকে চারিটি (চারিদিকে ষোলোটি) কোণ রচনা, প্রত্যেক তল ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ পথ এবং প্রাচীর; সমগ্র মন্দিরটি অলংকৃত হইত। অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ও চূড়ায়। পাহাড়পুরের সুবিস্তৃত মন্দিরটি এই সর্বতোভদ্র মন্দিরের উজজুল নিদর্শন। এই ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দির ভারতের নানাস্থানে নিশ্চয়ই নির্মিত হইয়াছিল, নহিলে বাস্তুশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ থাকিবার কথা নয়; কিন্তু এক পাহাড়পুর ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের মন্দির আজ আর দৃষ্টিগোচর নয়, আর কোনও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বোধ হয় মন্দির-স্থাপত্যের এই রূপ ও রীতি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই; তবে এই রূপ ও রীতি যে বহির্ভারতে, অন্তত প্রাচীন যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের মনোহরণ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সুপ্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশে প্রাচীন পাগান নগরের, শোয়েগু- জ্যি, টিহ্ন-লো-মিনহ-লো প্রভৃতি মন্দিরের পশ্চাতে এই ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দিরের অনুপ্রেরণা ছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। যবদ্বীপে প্রাস্বনাম নগরীর প্রাচীন লোরো-জোংরাং মন্দির, শিব-মন্দির প্রভৃতিও একই অনুপ্রেরণায় কল্পিত ও গঠিত। কালের দিক হইতে অষ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির ইহাদের সকলের আদিতে।

স্বর্গত কাশীনাথ দীক্ষিত ও অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়দের আলোচনা-গবেষণার ফলে পাহাড়পুর মন্দিরের মৌলিক রূপ-প্রকৃতি ও গঠন আজি ধরিতে পারা সহজ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ মন্দির উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬.৫ ফিট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪.২৫ ফিট বিস্তৃত। মূলত মন্দিরটির ভূমি-নকশা চতুষ্কোণ; প্রত্যেক দিকের বাহু সম্মুখ দিকে একাধিকবার (তিনবার) বিস্তৃত করিয়া অনেকগুলি কোণের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং সমগ্র নকশাটিকে সমান্তরালে প্রসারিত করা হইয়াছে চারিদিকে। মূল চতুষ্কোণ নকশাটির সমগ্র ভূমির উপর একটি শূন্যগর্ভ বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; ইহারই সর্বোচ্চ স্থাপিত ছিল মন্দিরের শীর্ষ, কিন্তু সে-শীর্ষ এবং স্তম্ভটিরও উপরের অংশ ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে; কাজেই শীর্ষটি কি শিখরাকৃতি ছিল, না ছিল স্তুপাকৃতি তাহা নির্ণয়ের কোনও উপায় আজ আর নাই। শূন্যগর্ভ দৈত্যকায় স্তম্ভটির দেয়াল অতি প্রশস্ত, কারণ চারিদিকের

সমান্তরাল প্রসারের চাপ ও ভারের অনেকাংশ পড়িত এই দেয়ালের উপর। এই চতুঃসংস্থান-সংস্থিত স্তম্ভটিই সমগ্র মন্দিরটির কেন্দ্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেকটি ক্রমহ্রাসমান স্তর এবং স্তরোপরি প্রদক্ষিণ পথ ও প্রাচীর চতুঃশালগুহ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত, রচিত ও প্রসারিত। ভিত্তিস্তর বাদ দিলে মন্দিরটির সর্বসুদ্ধ ক'টি ক্রমহ্রাসমান স্তর ছিল, বলা কঠিন। শাস্ত্রানুযায়ী সর্বসুদ্ধ পাচটি স্তর বা তল থাকিবার কথা; হয়তো তাহাই ছিল, কিন্তু আপাতত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ভিত্তিস্তরসহ মাত্র তিনটি। মন্দিরটি চতুর্মুখ, অর্থাৎ ''সর্বতোভদ্র হওয়া সত্ত্বেও ইহার প্রবেশ তোরণ উত্তর দিকে। অঙ্গন হইতে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেই ভিত্তিস্তরের সমতলে একটি সুপ্রশস্ত চত্বর; এই চত্বর অতিক্রম করিলেই দক্ষিণতম প্রান্তে বেষ্টনী প্রাচীরের তোরণ ভেদ করিয়া ভিত্তিস্তরের সর্বতোভদ্র প্রদক্ষিণ-পথে প্রবেশ। প্রদক্ষিণ-পথটি ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে মন্দিরের চারিদিকে এবং পথটির প্রান্ত বাহিয়া বেষ্টনী-প্রাচীর। এই প্রদক্ষিণ-পথের যে কোনও দিক হইতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া হ্রস্বায়িত প্রথম তলে বা স্তরে আরোহণ করা যায়। এই স্তরেও একই প্রকারের প্রদক্ষিণ-পথ, বেষ্টনী-প্রাচীর, তদুপরি এক একদিকে এক একটি করিয়া মণ্ডপ। প্রথম তল হইতে সোপান বাহিয়া দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিলেই স্পষ্টত বুঝা যায়, এই তলই সর্বপ্রধান তল, কারণ এই তলই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, এই তলেই কেন্দ্রস্থিত শূন্যগর্ভ স্তম্ভটি চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ এবং প্রত্যেক গর্ভগৃহের সম্মুখে এক একটি করিয়া বৃহৎ মণ্ডপ। সন্দেহ নাই, এই চারিটি গর্ভগৃহই ছিল প্রধান দেবগৃহ বা পূজাগৃহ এবং ইহাদেরই সম্মুখের মণ্ডপে পূজারীরা নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া সমবেত হইতেন। মণ্ডপ ও দেবগৃহ দক্ষিণে রাখিয়া চারদিক ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ-পথ এবং বেষ্টনী-প্রাচীর। এই তলের উপরে আর কোনও তল ছিল। কিনা এবং সেই তলে কোনও পূজাগৃহ ছিল কিনা, বলা কঠিন। ইহার উপর আর যাহা কিছু ছিল সমস্তই ভাঙিয়া ধবসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই এই মন্দিরের উপরিভাগের আকৃতি-প্রকৃতি কী ছিল তাহা লইয়া কল্পনা-জল্পনা করা চলে, কিন্তু নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না।

কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, পাহাড়পুরে বোধ হয় একটি চতুর্মুখ জৈন-মন্দির ছিল এবং এই চতুর্মুখ জৈন-মন্দিরটিই বোধ হয় ছিল পাহাড়পুর-মন্দিরের মূল অনুপ্রেরণা। এ-অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। এই ধরনের চতুর্মুখ বা সর্বতোভদ্র মন্দির ব্রহ্মদেশের প্রাচীন পাগান-নগরীতেও নির্মিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ বিদ্যমান। আনন্দ, সর্বজ্ঞ, টিহু-লো-মিনহ-লো প্রভৃতি মন্দিরেও দেখা যায়, কেন্দ্রে একটি বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উঠিয়া গিয়াছে উপরের দিকে এবং তাহার শীর্ষে শিখর বা স্তূপ। এই স্তম্ভটির চারিদিকের চারিমুখে প্রত্যেক তলে চারিটি সুউচ্চ সুবৃহৎ কুলুঙ্গি কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে; প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে বুদ্ধ-প্রতিমা। প্রত্যেক দিকের তোরণদ্বার হইতে একটি সুদীর্ঘ অলিন্দ পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে প্রতিমার সম্মুখ পর্যন্ত; দুই দিকে সমান্তরালে আরো দুইটি অলিন্দ এবং এই অলিন্দ রেখাশ্রেণী ভেদ করিয়া কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির চারদিক ঘিরিয়া একাধিক প্রদক্ষিণ-পথ চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর-মন্দিরের বিন্যাসের সঙ্গে পাগানের এই জাতীয় মন্দিরগুলির বিন্যাসের সমগোত্রীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এ-কথা সত্য যে, পাহাড়পুর-মন্দিরের কেন্দ্রীয় স্তম্ভে কোনও কুলুঙ্গি কাটা নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্তে চারিদিকের দেয়ালের সম্মুখেই স্থাপনা করা হইয়াছে চারটি গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ। আসল কথা হইল কেন্দ্রীয় স্তম্ভটি এবং তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকের পূজারি স্থান ও প্রদক্ষিণ-পথ। এই রূপ চতুর্মুখ সর্বতোভদ্র মন্দিরের রূপ এবং এই রূপই পাহাড়পুর, পাগানে এবং লোরো-জোংরাং—এ দৃষ্টিগোচর।

পোড়ামাটির ইটে, কাদার গাঁথুনীতে পাহাড়পুর-মন্দির তৈরি। বহিঃপ্রাচীরের দেয়ালের স্কন্ধে কিছু কিছু অলংকরণ এবং অগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া ঐশ্বর্য প্রচারের আর কোনও চেষ্টা নাই মহাস্থানের গোকুল এবং গোবিন্দভিটার স্তূপেও কিছু কিছু এই ধরনের অলংকরণ ও মৃৎফলক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরের ভিত্তি প্রাচীর গাত্রে প্রস্তরফলক। নিদর্শনও অপ্রচুর নয়। এই সুবৃহৎ মন্দির একদিনে নির্মিত হয় নাই, বলাই বাহুল্য; বহুদিনের অনবসর চেষ্টায় এত বড় মন্দির নির্মাণ সম্ভব। পরবর্তীকালে নানা সময়ে নানা সংযোজনও হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমগ্র মন্দিরটির পরিকল্পনায় ও গঠনে এমন একটি সুসম সংহত সমগ্রতা আছে যে, মনে হয় মন্দিরটি আগাগোড়া একই ভাবনা-কল্পনার সৃষ্টি এবং মোটামুটি একই সময়ে নির্মিত। খুব সম্ভব, পালরাজ ধর্মপালই ইহার পোষক এবং তাঁহারই রাজত্বকালে সোমপুরের এই মন্দির ও বিহার রচিত হইয়াছিল। এই মন্দির ও বিহার প্রাচীন বাঙলার গৌরব।

প্রাচীন বাঙলা ও বহির্ভারতের মন্দির

পাহাড়পুর-মন্দিরের সঙ্গে বহির্ভারতের পাগান, লোরো-জোংরাং প্রভৃতি স্থানের কোনও কোনও শ্রেণীর মন্দিরের সমগোত্রীয়তার কথা বলিয়াছি। কিন্তু শুধু পাহাড়পুর-মন্দিরই নয়। প্রাচীন বাঙলার যে কয়েকটি রূপ ও রীতির মন্দিরের কথা কিছু আগে বলিয়াছি সে-সব রূপ ও রীতির মন্দিরের সঙ্গে বর্হিভারতের বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশের এবং যবদ্বীপের অনেক মন্দিরের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-সব মন্দিরের তুলনা করিলে প্রাচীন বাঙলার মন্দিরগুলির আকৃতি-প্রকৃতিও অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারে। যে ক্রমহ্রস্বায়মান ঢালু। চালের ভদ্র বা পীড় রীতির মন্দিরের কথা আগে বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশে এই রীতি এক সময়ে সুপ্রচলিত ছিল এবং পরেও সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া কাঠে ও ইটে, বেশির ভাগ কাঠে, এই ধরনের 'পায়াথাট' বা প্রাসাদ-মন্দির প্রচুর নির্মিত হইত। পাগানের আনন্দ-মন্দিরের অনেকগুলি প্রস্তরফলকে পঞ্চস্তলে, সপ্ততিলে, এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ আছে। এই পাগানেরই বিদগ তাইক (ত্রিপিটক)—মন্দির ও মিমালাউং চ্যঙ্গ মন্দির (একাদশ ও দ্বাদশ শতক) এই ধরনের মন্দিরের সুস্পষ্ট নিদর্শন। ক্ষুদ্রাকৃতি এবং একটি মাত্র পাথরে তৈরি এই ধরনের মন্দির যবদ্বীপের চণ্ডী-পানাতরমের প্রাঙ্গণে দুই চারিটি আজও বিদ্যমান। বলিদ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে তো এই ধরনের ভদ্র বা পাড় দেউল আজও নির্মিত হয়, তবে সাধারণ কাঠের। এই ভদ্র বা পাড় শ্রেীর মন্দির ছাড়া চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর স্তূপ বা শিখর শীর্ম ভদ্র বা পীড় দেউল তো প্রাচীন ব্রহ্মদেশের চিত্তই হরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং তাহা প্রায় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতেই। লমে'থনা, ইয়াহানাদা-প্ত প্রভৃতি মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পাগানের একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় স্তূপশীর্ষ পাটো থাম্মা ও অভয়দান এবং শিখর শীর্ষ আনন্দ, সর্বজ্ঞ, থিটুসোয়াদা, টিহ্ন-লো-মিনহ-লো মন্দির পর্যন্ত সমস্তই এই ধরনের দেউলের সউজ্জল নিদর্শন। তাহা ছাড়া, হামজা ও পাগানের প্রচুর মুৎ ও প্রস্তর-ফলকে এই ধরনের মন্দিরের উৎকীর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। যবদ্বীপের স্তূপশীর্ষ চণ্ডা-পাওন মন্দিরও এই রীতিরই অন্যতম নিদর্শন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন প্রাচ্যদেশ, বিশেষভাবে প্রাচীন বাঙলাদেশই এই সব বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা।

উপরোক্ত চারিপ্রকারের মন্দিরশৈলী ছাড়া খননবিষ্কারের ফলে প্রাচীন বাঙলার আরও কয়েকটি এমন মন্দিরের অস্তিত্ব জানা যায় যাহা কোনও শ্রেণী-চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না। এই মন্দিরগুলির যে কিছু সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এমন নয়; তবু ইহাদের কথা না বলিলে মন্দির-কাহিনী অসম্পূণ থাকিয়া যায়। দিনাজপুর

জেলায় বৈগ্রামের যে-মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান সে-মন্দিরটি বোধ হয় ৪৪৮-৪৯ খ্রী তারিখের গুপ্তপট্টোলীকথিত শিবানন্দী-মন্দির। ভূমি-নকশা হইতে মনে হয়, ইহার গর্ভগৃহ ছিল চতুষ্কোণ এবং চারিদিক ঘিরিয়া ছিল প্রদক্ষিণ-পথ; পশ্চিম দিকে ছিল ইহার প্রবেশ তোরণ। চালের কী যে ছিল রূপ বলিবার কোনও উপায় নাই। গুপ্ত-আমলের এক ধরনের মন্দিরে যে প্রদক্ষিণ-পথযুক্ত চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ এবং সমতল চালের রীতি প্রচলিত দেখা যায়, এই মন্দিরটি সেই রীতির হওয়া বিচিত্র নয়। মহাস্থানের আশে পাশেও দুই চারিটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বৈরাগী-ভিটায় পাল-আমলের দুইটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; ইহাদের মধ্যে একটির ভূমি-নকশা যে প্রাচীন বাঙলার সুঅভ্যস্ত ও সুপরিচিত প্রসারিত চতুষ্কোণ, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মহাস্থানের গোবিন্দ-ভিটায়ও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মন্দির গুপ্ত-আমলের হওয়াও অসম্ভব নয়; কিন্তু আজ আর ইহাদের মৌলিক রূপ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। এই স্থানেরই গোকুল-পল্লীতে, সুবৃহৎ মোড়স্তাপে এক সময় একটি অতিকায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। খনানাবিষ্কারের ফলে আজ শুধু তাহার ভিত্তিভূমির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভিত্তিভূমির বিন্যাস ঠিক একটি মাকড়সার জালের মতন করিয়া বোনা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কোষকক্ষের সমষ্টি মাত্র। একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, এই কোষকক্ষের জালের পরিকল্পনা শুধু বৃহৎ পরিকল্পনার একটি মন্দিরের ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করিয়া গড়িবার জন্য। মন্দিরটির ভূমি-নকশা শুধু ধরা যায়, আর কিছুই বিদ্যমান নই। বহু বাহুবিশিষ্ট এই ভূমি-নকশার বহু কোণ এবং ইহাদের মধ্যে বিধৃত একটি সুবৃহৎ বৃত্ত। এই বৃত্তের চারিপাশ ঘিরিয়া নিরেট সুপ্রশস্ত দেয়াল এবং এই দেয়াল চারিটির উপরই ছিল মন্দিরটির স্থাপনা। দেয়াল এবং বৃত্তের ফাক ভরাট করা হইয়াছে, সমান্তরালে দেয়ালের পর দেয়াল গাথিয়া এবং মাটি ভরাট করিয়া। এ-সমস্তই যে মন্দিরটির ভিত্ সুদৃঢ় করিয়া গড়িবার জন্য তাঁহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুবৃহৎ মন্দিরের কী যে ছিল আকৃতি-প্রকৃতি, তাহা বুঝিবার এতটুকু উপায় আজ আর নাই।

সমসাময়িক ওড়িশার ভুবনেশ্বরে বা পুরী-কোনারকে বা মধ্য-ভারতের খাজুরাহোতে, ব্রহ্মদেশের পাগানে বা যবদ্বীপের প্রাম্বনাম-পানাতরমে, কাম্বোজের অঙ্কোর-থোমে বা দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চীপুরে বা অন্যত্র যে সুবিস্তৃত মন্দির-নগরীর কথা আমরা জানি, প্রাচীন বাঙলার কোথাও সে ধরনের সুবিস্তৃত মন্দির-নগরীর পরিচয় পাইতেছি না। প্রত্নসাক্ষ্যই হোক আর সাহিত্য বা লিপি-সাক্ষ্যই হোক, সমস্ত সাক্ষ্যেরই ইঙ্গিত যে বিচ্ছিন্ন দুই চারিটি মন্দিরের দিকে এবং সে-মন্দিরও খুব বৃহদায়তন নয়। বস্তুত, এক পাহাড়পুর এবং গোকুলের মন্দির দুটি এবং হয়তো আরও দুই চারিটি ছাড়া বৃহৎ কল্পিত, বিস্তৃতায়তন মন্দিরের কথা বড় একটা জানা যায় না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্যে তেমন প্রমাণ নাই। মনে হয়, অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বল্পায়তন। বস্তুত, প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় খুব বেশী নাই; গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে সে-সুযোগও ছিল স্বল্পই। প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্যেই শুধু নয়, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই, খুব প্রশস্ত ও গভীর গঠনকর্মে নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করে নাই। ইহার কারণ দুর্বোধী নয়। তাহার কৃষিনির্ভরজীবনের অর্থসম্বল ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত এবং বৃহৎ গভীর দুঃসাহসী জীবনের গভীর ও ব্যাপক উল্লাসের কোনও গভীর ও প্রশস্ত স্পর্শ সে জীবনে লাগে নাই কাজেই শিল্পেও সে পরিচয় নাই।

৫.৪.৯.১১ : মন্দিরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

মন্দিরকে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন ধর্মীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে মন্দিরের বড় ভূমিকা থাকে তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মন্দিরের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ গড়ে ওঠে। গুপ্তযুগে (আনুঃ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতক) অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে মঠ, মন্দির এবং সঙ্ঘকে ভূমিদান করা হতে থাকে। এই ভূমিদান আবার ব্রাহ্মণদের করা হত, যাকে বলা হত 'ব্রহ্মদেয়'। দেবতার উদ্দেশে মন্দিরে জমিদান করা হলে তাকে বলা হত 'দেবদান'। এই 'দেবদান' পদ্ধতির ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্দির গুলি ভূ সম্পদের মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই উপরিউক্ত দানের বিষয়টি গুপ্তযুগে আরম্ভ হলেও পরবর্তী আদিমধ্য যুগেও এর ধারা অব্যাহত ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো মন্দির গুলির কথা বলতে পারি, যেগুলি অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে চান্দেল্ল রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতার নির্মিত হয়েছিল। পাশাপাশি বলা যায় যে এই দান কিন্তু কেবল রাজাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এই পৃষ্ঠপোষকতায় অংশ নিয়েছিল। বিশেষত বনিকদের মধ্যে এরকম দানের প্রবনতা লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ ভারতে কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলে শিব ও বিষ্ণু উপাসনার কেন্দ্র রূপে মন্দির গুলি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দেবতাদের সমন্বয়বাদী উপাসনা পদ্ধতি গড়ে ওঠার ফলে ধ্রুপদী সংস্ক্রিত গড়ে ওঠে।

আদি মধ্যযুগে সামাজিক ও আর্থিক দিকে মন্দিরগুলি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

(১) কৃষি উদ্বৃত্ত গ্রহণ ও কৃষির বিস্তারে মন্দিরের বড় ভূমিকা ছিল। ভূমি দানের ফলে উপজাতি অঞ্চলে কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়েছিল।

(২) উপরিউক্ত কারণে উপজাতি সমাজে ভাঙন দেখা দেয়, এবং তারা ব্রাহ্মণ্য জাতি-বর্ণ সমন্বিত সমাজ কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

(৩) নবগঠিত সমাজ কাঠামোতে মন্দির একটি সংযোগের কাজ করত, যেখানে উচ্চ ও নিম্ন উভয়বর্ণ তাদের সেবা দান করত। তাই নানা জাতির মানুষকে মন্দির আকর্ষণ করতে পারত।

(৪) এই ধরনের সমন্বয়বাদী ভাবমূর্তি ব্রাহ্মণ্য মদতপুষ্ট রাজশক্তির উত্থানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মন্দির রাজশক্তিকে বৈধতা দান করত, যাতে মনে করা হয় এই রাজশক্তি ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত।

(৫) ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম সমাজের বাঁধন মজবুত করেছিল। পাশাপাশি ভক্তি আন্দোলনে মন্দিরের একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ছিল।

(৬) এর সাথেই মন্দিরগুলির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে, জমিকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সম্পদ ক্রমশ রত্নভাণ্ডারে পরিণত হয়। তার সঙ্গে অভিজাত মানুষদের আনাগোনা ও দান মন্দিরগুলির মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

(৭) ক্রমশ এইভাবে মন্দিরগুলি এক একটি সুরক্ষিত নগরীতে পরিনত হয়েছিল, যেখানে নিজস্ব বাজার, পথঘাট, এমনকি স্বাধীন সুরক্ষা বাহিনী পর্যন্ত ছিল।

(৮) পাশাপাশি সাংস্কৃতিক একীকরণে মন্দিরের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল।

এই ভাবে দেখা যায় যে ভারতে মন্দির গুলি আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আজও তার ব্যতিক্রম নয়। উদাহরন স্বরূপ তিরুপতি মন্দিরের কথা বলা যায়, যেটি অন্যতম ধনী মন্দিরের একটি। বিভিন্ন প্রথা পালনের মাধ্যমে এটি সমাজে একটি বিশেষ অবদান রেখেছে।

তিরুপতি মন্দিরের নানান প্রথা

'প্রসাদম্'

তিরুমালার বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে 'প্রসাদম্' বা প্রসাদ হিসেবে দেবতাকে নিবেদন করা হয় বিখ্যাত 'তিরুপতি লাড্ডু'। এই লাড্ডুর জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ রয়েছে। কেবলমাত্র তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম্ই এই লাড্ডু তৈরি বা বিক্রি করতে পারে।

এই মন্দিরে নিবেদিত অন্যান্য প্রসাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দদ্দোজনম্' (দই-বরফ) 'পুলিওহোরা' (তেঁতুল-ভাত), 'বাদা' ও 'চক্কেরা-পোঙ্গালি' (মিষ্টি পোঙ্গল), 'নির্যালা-পোঙ্গালি', 'আপ্পাম', 'পায়স, জিলিপি, 'মুরকু', দোসা, 'সিরা' (কেশরী) ও 'মালহোরা'। তীর্থযাত্রীদের রোজ বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার 'তিরুপাবদ সেবা'য় নানারকম খাদ্যসামগ্রী নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করা হয়।

মস্তক মুণ্ডন

তিরুমালা বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের একটি বিশেষ প্রথা হল 'মোক্কু' (মাথার চুল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন)। প্রতিদিন প্রায় এক টন চুল মন্দিরে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত চুল বছরে কয়েক বার আন্তর্জাতিক বিক্রেতাদের কাছে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এগুলি কৃত্রিম চুল রোপণ, ও সজ্জাদ্রব্য হিসেবে তারা কিনে নেয়। চুল বিক্রি করে মন্দিরের কোষাগারে বছরে ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সঞ্চিত হয়। হুন্ডি সঞ্চয়ের পরই এটি মন্দিরের দ্বিতীয় বৃহত্তম আয়ের উৎস।

কথিত আছে, রাখাল যখন বেঙ্কটেশ্বরের মাথায় আঘাত করেছিল, তখন তাঁর মথার একটি অংশের চুল পড়ে গিয়েছিল। নীলাদেবী নামে এক গন্ধর্ব রাজকুমারী সেটি দেখতে পান। তাঁর মনে হয়, বেঙ্কটেশ্বরের এত সুন্দর মুখে কোনে খুঁত থাকা উচিত নয়। তিনি নিজের চুলের একটু অংশ কেটে নিয়ে তাঁর জাদুশক্তির সাহায্যে সেটি বেঙ্কটেশ্বরের মাথায় প্রতিস্থাপন করে দেন। নারীশরীরে চুল একটি সুন্দর সম্পদ। তাই বেঙ্কটেশ্বর নীলাদেবীর এই আত্মত্যাগ দেখে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর মন্দিরে আগত প্রত্যেক ভক্ত বেঙ্কটেশ্বরকে নিজেদের মাথার চুল অর্পণ করবেন এবং সেই চুল নীলাদেবী পাবেন। তাই ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা নীলাদেবীকে চুল নিবেদন করছেন। উল্লেখ্য, তিরুমালার সাতটি পর্বতের অন্যতম নীলাদ্রি এই নীলাদেবীর নামেই উৎসর্গিত।

'হুন্ডি' (দানপাত্র)

কথিত আছে, বেঙ্কটেশ্বরকে নিজের বিবাহের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়েছিল। শেষাদ্রি পর্বতে দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বেঙ্কটেশ্বর কুবের ও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার কাছ থেকে ১১,৪০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। এই কথা স্মরণ করে ভক্তেরা তিরুপতি বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের 'হুন্ডি' তে (দানপাত্র) অর্থ দান করেন। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, ভক্তদের দানের অর্থ দিয়ে বেঙ্কটেশ্বর কুবেরের ঋণ পরিশোধ করছেন। ২২৫,০০০,০০০ টাকা হুন্ডিতে সঞ্চিত হয়। মন্দিরে সোনা দান করেও ভক্তেরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মন্দির সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে, ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে হুন্ডিতে প্রদত্ত দানের থেকে ৩,০০০ কিলোগ্রম সোনা ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে সঞ্চিত হয়েছে। পূর্বের কয়েক বছরে এই সোনা হুন্ডিতে জমেছিল।

'তুলাভারম্'

'তুলাভারম্' তিরুমালা বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। এই প্রথায় একটি তুলাদণ্ডের একদিকে ভক্ত নিজে বসেন এবং অন্যদিকে তাঁর সমান ওজনের চিনি, তালমিছরি, তুলসীপাতা, কলা, সোনা বা মুদ্রা রাখেন। সেই সব দ্রব্যসামগ্রী বেঙ্কটেশ্বরকে দান করা হয়। 'তুলাভারম্' প্রথায় সাধারণত সদ্যোজাত শিশুদেরই ওজন করা হয়ে থাকে।

জগন্নাথ মন্দির

আবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রথ যাত্রা উপলক্ষে অনেক মানুষের সমাগম হয়। এখানেও দেবতার ধন ভাণ্ডার নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই। মন্দিরের গোপন কক্ষে সাতটি ঘর আছে। সেই ঘরগুলিই হল রত্নভাণ্ডার। ৩৪ বছর আগে মাত্র তিনটি ঘরের তালা খুলতে সক্ষম হয়েছিলেন কর্মকর্তারা। বাকি ঘরগুলিতে কী আছে, তা আজও রহস্যই রয়ে গিয়েছে। শ্রীজগন্নাথের 'ব্রহ্মবস্তু'র মতোই রত্নভাণ্ডারের রহস্য অধরাই রয়ে গিয়েছে। যে কক্ষগুলি খোলা সম্ভব হয়েছিল, সেখান থেকে উদ্ধার হয় ১৮০ রকমের মণিমুক্তো খচিত স্বর্ণ অলঙ্কার। যার মধ্যে আছে মুক্তো, প্রবালের মতো অত্যন্ত দামী পাথর। এছাড়া, ১৪৬ রকমের রৌপ্য অলঙ্কার। তবে, এই সবই 'ভিতর রত্নভাণ্ডার'-এর কথা। 'বাহার ভাণ্ডার'-এর চিত্র কিছুটা অন্যরকম। পুরী শ্রীজগন্নাথ মন্দির আইন, ১৯৫২ অনুযায়ী রেকর্ড জানার অধিকারে ১৯৭৮ সালে তালিকা তৈরি হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী, বাহার ভাণ্ডারে ১৫০ রকমের স্বর্ণ অলঙ্কার আছে। যার মধ্যে তিনটি স্বর্ণহার আছে। যার এক একটির ওজন প্রায় দেড় কেজি। শ্রীজগন্নাথ এবং বলভদ্রের বর্ণ শ্রীভুজ ও শ্রীপায়রের ওজন যথাক্রমে সাড়ে ৯ কেজি এবং সাড়ে ৮ কেজি। জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার স্বর্ণ মুকুটের ওজন ৭ কেজি, ৫ কেজি এবং ৩ কেজি। ১৯৭৮ সালের ১৩ থেকে ২৩ মে'র মধ্যে পুরী মন্দির প্রশাসনের তৈরি হিসেব অনুযায়ী, মণিমুক্তো খচিত ১২০ কেজি ৮৩১ গ্রাম স্বর্ণ অলঙ্কার, ২২০ কেজি ১৫৩ গ্রাম রৌপ্য অলঙ্কার, রুপোর বাসনপত্র সহ বিভিন্ন দামী বস্তু রত্নভাণ্ডারে পাওয়া গিয়েছে। প্রতি বিজয়াদশমী, কার্তিক পূর্ণিমা, পৌষ পূর্ণিমা এবং মাঘী পূর্ণিমার দিন শ্রীক্ষেত্রে ভক্তদের সামনে রাজবেশে দর্শন দেন মহাপ্রভু। তাঁর সেই সজ্জা দেখে ভক্তরা ধন্য ধন্য করেন। যে সব অলঙ্কারে জগন্নাথদেবকে সাজানো হয়, সেগুলি হল, শ্রীচরণে শ্রীপায়র, হাতে শ্রীভুজ, কর্ণে কীরিটি, ওড়না, সূর্যচন্দ্র, কানা, আড়াকানি, ঘাগরা, মালি, কদম্বমালি,

তালিকচন্দ্রিকা, অলকাতিলকা, ঘোবা, কণ্ঠী, স্বর্ণচন্দ্র, রৌপ্য শঙ্খ, হরিদা, সেবতী মালি। দাদা বলভদ্রের অঙ্গে থাকে শ্রীপায়র, শ্রীভুজ, শ্রীকীরিটি, অধ্যয়নী কুণ্ডর, সূর্যচন্দ্র, আড়াকানি, কদম্বমালি, তিলক চন্দ্রিকা, হল, মুষল, বহড়া মালি। সুভদ্রার অঙ্গে থাকে শ্রীপায়র, শ্রীভুজ, কীরিটি, ওড়না মালি, ঘাগরা মালি, কানা মালি, সূর্যচন্দ্র, আদাকানি, সেবতী মালি তড়াগি ইত্যাদি।

৫.৪.৯.১২ : উপসংহার

এই ভাবে দেখা গেল ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন জনপ্রিয় ও প্রধান প্রথার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, লোক সংস্কৃতির যেমন তাতে অবদান আছে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সেখানে সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

৫.৪.৯.১৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) আসামের লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

(২) মন্দির কিভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি তে প্রভাব ফেলতে পারে লেখ।

৫.৪.৯.১৪ : সহায়ক গ্রন্থ

Geogre Michell (1988), The Hindu Temple : An Introduction to Its Meaning and Forms, University of Chicago Press

Stella Kramrisch, *The Hindu Temple,* Vol 2, Motilal Banarsidass

Susan Lewandowski, The Hindu Temple in South India, in Buildings and Society : Essays on the Social Development of the Built Environment, Anthony D. King (Editor)

তথ্যসূত্র ঃ Wikipedia

পঞ্চম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৫

Unit-12 : Decline of Indigenous Education

(দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন)

Unit-13 : Western Education, National Council of Education

(পাশ্চাত্য শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ)

Unit-14 : University Education and the Educated Bengalis

(বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়)

বিন্যাস ক্রম

৫.৫.১২.১ : উদ্দেশ্য
৫.৫.১২.২ : পুরাতন দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ভাঙন
৫.৫.১২.৩ : দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন
৫.৫.১৩.৪ : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬)
৫.৫.১৪.৫ : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা
৫.৫.১৪.৬ : শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়
৫.৫.১৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
৫.৫.১৪.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৫.১২.১ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে জানা যাবে :

(১) বাংলায় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল।

(২) দেশীয় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্বরূপ কেমন ছিল।

(৩) দেশীয় শিক্ষার ভাঙন কিভাবে ও কেন হয়।

(৪) বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার কিভাবে হয়েছিল।

(৫) কারা কারা পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

(৬) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কিভাবে ও কখন গঠিত হয়।

(৭) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যাবলী কি ছিল।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বাংলাদেশে কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীদের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল এবং তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কতটা সমৃদ্ধ করেছিল।

কোন দেশের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করে ইংরেজরা ভারতীয় জনগণকে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্যের ব্যাপক ও গভীর সাফল্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে কোম্পানির সরকারের হস্তক্ষেপের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল শিক্ষা এবং বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন।

৫.৫.১২.২ : পুরাতন দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ভাঙন (Decline of Indigenous Education)

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাংলায় এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। F.W. Thornas তাঁর 'History and Prospects of British Education in India' গ্রন্থে লিখেছেন যে ''ভারতের ইংরেজরা প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন।'' ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে উইলিয়াম এ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণী পেশ করেন তা থেকে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক) দেশীয় শিক্ষা :

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—'পাঠশালা' ও 'মক্তব'। এইসব গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলি চেহারা সারা ভারতে প্রায় একইরকম ছিল। সাধারণত পাঠশালায় হিন্দু ছাত্ররা পড়াশুনা করত। আর মক্তবে পড়ত মুসলমান ছাত্ররা। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন বিচার বিভাগে বিশেষ সুবিধা পাবার জন্য কিছু হিন্দু ছাত্র মক্তবে পড়াশুনা করতে যেত। সাধারণভাবে ফারসী ভাষার বিদ্যালয়গুলিকে বলা হত মক্তব। আর ভারতীয় আধুনিক ভাষার বিদ্যালয়গুলিকে বলা হত পাঠশালা। মুসলিম মৌলবীরাই ছিলেন মক্তব্যের শিক্ষক। আর হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত হত 'পাঠশালা'গুলি। গ্রাম ও শহর সর্বত্রই মক্তব ও পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল ব্যাপক। মসজিদগুলি ছিল মক্তবী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। সেখানে নামাজের মন্ত্রপাঠ ও কোরাণ পাঠ শেখানো হত। এছাড়া রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির জন্য ফারসী ভাষা শেখানো হত। দরবারী ভাষ্য হিসাবে ফারসী ও উর্দু সকলকেই শিখতে হত। যেখানে এসব ভাষা শেখানোর গুরুত্ব দেওয়া হত। পাঠশালাগুলি গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানা বা আলাদা ঘরে আসতো। এইসব পাঠশালায় সাহিত্য, ব্যাকরণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পড়ানো হত। তাছাড়া হিসাবশাস্ত্র, জমি জরীপ, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতিও শেখানো হত। পাঠশালাগুলির খরচ বহন করতেন গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা। অনেকক্ষেত্রে গ্রামের মানুষেরা সবাই মিলে খরচ বহন

করতেন। পাঠশালার শিক্ষকদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল। গ্রামের মানুষেরা তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন।

(খ) দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ :

(১) দেশীয় পাঠশালাগুলি ছিল জন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যা পরিচিতি ইত্যাদি শেখানো হত।

(২) যাঁরা এইসব পাঠশালায় পড়াতেন তাঁদের সাধারণ জ্ঞানের বেশি বিদ্যা ছিল না। শিক্ষকরা শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য কোন বৃত্তিব্যবসা গ্রহণ করতেন।

(৩) বিদ্যালয়গুলির সাজসরঞ্জাম ছিল খুবই সাধারণ মানের। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ঘর ছিল না। অনেক সময় ঠাকুর মন্দিরে বা গাছতলায় পড়ানো হত।

(৪) ছাপা বই ছিল না। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী ছিল না, ছাত্ররা শ্লেট-পেন্সিল ব্যবহার করত। সাধারণত শ্রুতলিপি, অংক ইত্যাদি শেখানো হত।

(৫) শিক্ষাদানের সময় ও দিন স্থানীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর নির্ভর করত। বিদ্যালয় ভর্তির কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না।

(গ) দেশীয় উচ্চশিক্ষা :

দেশীয় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি দুভাগে বিভক্ত ছিল : (১) হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হত 'টোল' বা চতুষ্পাঠী (২) আর মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ছিল 'মাদ্রাসা'। সমগ্র ভারতে এই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ছড়িয়ে ছিল। এ্যাডামের হিসাব অনুযায়ী সে সময়ে বাংলা ও বিহারে টোলের সংখ্যা ছিল ১৮০০। শিক্ষকরা নিজেদের ঘরে টোল বা চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতেন। ঘর ছিল মাটির। অনেক ক্ষেত্রে টোলগুলি মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকত। টোল ছিল আবাসিক। শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্ররা ভিক্ষা করে খাদ্যা সংগ্রহ করত। টোলের পণ্ডিতরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। অব্রাহ্মণ ছাত্ররা টোলে পড়ার সুযোগ পেত না। মেয়েরা টোলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। টোল সাধারণত তিন ধরনের ছিল : (১) প্রথম ধরনের প্রতিষ্ঠানে শেখানো হত ব্যাকরণ, ছন্দ ও সাহিত্য (২) দ্বিতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে ন্যায়শাস্ত্র ও প্রাচীন কাব্য শেখানো হত (৩) আর তৃতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রধানতঃ তর্কশাস্ত্র পড়ানো হত। তবে তন্ত্রবিদ্যা ও জ্যোতিষ চর্চাও শেখানো হত। শিক্ষকদের পণ্ডিত্য ছিল প্রশংসনীয়। তাঁরা সমাজ সম্মানের পাত্র ছিলেন।

টোলের তুলনায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল অনেক কম। তবে শিক্ষার মান ছিল অনেক উন্নত। উচ্চতম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মৌলবীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলি এখানে শেখানো হত। সাধারণ আরবী ও ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। মাদ্রাসাগুলির পরিচালন ব্যবস্থা টোলের তুলনায় অনেক নিম্নমানের ছিল। বাদশাহী ও নবাবী দরবারে উচ্চপদ লাভের জন্য অনেকেই মাদ্রাসায়

উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যেত। এই উদ্দেশ্যে হিন্দু ছাত্ররাও মাদ্রাসায় ভর্তি হত। মৌলবীরা ধর্মীয় ও নৈতিক মান বজায় রাখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। শুধুমাত্র অর্থের জন্য তাঁরা শিক্ষকতা করতেন না। তাঁরা শিক্ষাকর্তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে টোলগুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে পিতাপুত্র সম্পর্ক গড়ে উঠত। মাদ্রাসায় তা লক্ষ্য করা যেত না।

(ঘ) দেশীয় উচ্চশিক্ষার স্বরূপ :

(১) অধ্যাপক এ. আর. দেশাই সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশীয় উচ্চশিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষকতার দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। ব্রাহ্মণদেরই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ ছিল। হিন্দুরাষ্ট্রের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী অন্য জাতের লোকদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার বন্ধ ছিল।

(২) মেয়েরা, নিচু জাতের লোকেরা ও কৃষকরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেত না। তবে ব্যবসায়ীর ছেলেদের সুযোগ ছিল।

(৩) হিন্দু-সমাজের জাতিভিত্তিক কাঠামোর দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করা হত। যেমন বয়স্ক ব্যক্তি, পিতামাতা, শিক্ষক ও রাজার প্রতি নিঃশর্ত বাধ্যতা শেখানো হত। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে প্রচলিত সামাজিক কাঠামো গ্রহণ ও স্বীকার করানো হত।

(৪) হিন্দুদের মতো মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা কোন গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে ছিল না। ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক প্রকৃতির জন্য যে-কোন মুসলমানই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতে পারত।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা যুক্তিভঙ্গী গড়ে উঠত না। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলমানে পরিণত করা নিজ নিজ ধর্ম ও সামাজিক কাঠামোর প্রতি হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীদের আনুগত্যপরায়ণ করে তোলা হত।

৫.৫.১২.৩ : দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন

আশ্চর্যের বিষয় হল, যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বিচার ও সংস্কার করেছিল, ভারতের দেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যান্ডের মত ভারতের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তারা প্রাণসঞ্চার করার কোন চেষ্টাই করেনি। বরং তাকে অবহেলা ও সমালোচনা করে তার অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছিল। ভারতের প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তারা বর্তমান শিক্ষার সোপান তৈরি করেছিল।

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙনের অনেকগুলি কারণ ছিল—

প্রথমতঃ, দেশীয় শিক্ষার ভেতরেই অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। যেমন সেই শিক্ষাব্যবস্থায় নারী, হরিজন, শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের প্রবেশধিকার ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কোন উপযুক্ত শিক্ষা ছিল না। শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন এনেছিল। শিক্ষকদের পারিশ্রমিকও ছিল খুবই স্বল্প।

তৃতীয়তঃ, পাঠ্যক্রম ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। উপরন্তু ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল খুবই কঠোর।

চতুর্থতঃ, ব্রিটিশরা আসার পর সরকারী ক্ষেত্রে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার চালু হবার ফলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি হয়।

পঞ্চমতঃ, আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে দেশীয় বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়ী, বিত্তশালী ব্যক্তি ও দেশীয় রাজাদের আর্থিক আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতিকেও দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙনের একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। বহু রাজনৈতিক আবর্তেও সেই ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়নি। ভারতে আধুনিক শিক্ষার কাঠামো এই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারত এবং তা হওয়া সম্ভব ও উচিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের মনে অন্য ভাবনা ছিল। তাই দেখা যায় জনগণের সঙ্গে সহজ সম্পর্কযুক্ত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটিয়ে ব্রিটিশরা নতুন শিক্ষা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জনগণের সঙ্গে শিক্ষার স্বাভাবিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এর ফলে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবহেলিত হতে থাকে ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা :

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী, মিশনারী ও সরকারী প্রচেষ্টার যৌথভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে যখন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজ শাসকরা উদাসীন ছিলেন, তখন ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন প্রাচ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁদের অন্যতম। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি। লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতের শিক্ষাজগতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল।

(ক) বেসরকারী উদ্যোগ : বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হয় বেসরকারী উদ্যোগে। রামনারায়ণ মিশ্র এর সূচনা করেন কলকাতায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে। কলকাতার ইউরোপীয়রা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। শেরবোর্ন জোড়াসাঁকোয় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে দ্বারাকানাথ ঠাকুর প্রথম ইংরাজী শেখেন। মার্টিন বোল ছিলেন বিখ্যাত শীল পরিবারের ইংরাজী শিক্ষক। তিনি শীল পরিবারের উৎসাহে স্কুল খুলেছিলেন। ড্রামন্ড-এর 'ধর্মতলা একাডেমী'তে প্রথম পাঠ্যসূচী অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮১৭ সালে বেসরকারী উদ্যোগে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলার ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়।

তৎকালীন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ডেভিড হেয়ারও কলকাতার অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকরা।

ডেভিড হেয়ার বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি ছিলেন 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা। সোসাইটির কিছু সদস্য পরে প্রতিষ্ঠা করেন 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'। এর কার্যকলাপ মূলতঃ ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রসারেই সীমাবদ্ধ ছিল। ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন হেয়ার স্কুল। বেথুন প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়'। মাদাম লস্‌ন্‌ প্রতিষ্ঠা করেন 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। শিক্ষক তারাচাঁদ চক্রবর্তী রচনা করেন বাংলা-ইংরাজী অভিধান।

(খ) মিশনারী প্রচেষ্টা : পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্য উইলিয়াম কেরী বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের ধর্ম প্রচারক। ১৮১৮ সালে তিনি একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চুঁচুড়ায় লন্ডন মিশনারী সোস্যাইটির উদ্যোগে রবার্ট মে একটি ইংরাজী স্কুল খোলেন। দু-বছরের মধ্যে ঐ স্কুলের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫০ জন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ প্রতিষ্ঠা করেন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ্‌ ইনস্টিটিউশন'। ইউনিয়ন স্কুল ও গৌরমোহন আঢ্যর ওরিয়েন্টাল সেমিনারীও ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। মফঃস্বলে টাকী ও বীরভূম জেলাতে স্থানীয় জমিদাররা ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সরকারের দিক থেকে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে আগ্রহ না থাকলেও মিশনারী ও স্থানীয় শিক্ষাপ্রেমী মানুষ এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

(গ) সরকারী উদ্যোগ : ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে প্রথমদিকে সরকার নির্লিপ্ত থাকলেও ধীরে ধীরে তারা আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন। এর পিছনে অবশ্য ইংল্যান্ডের চার্লস গ্রান্ট ও উইলবার ফোর্স-এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁরা ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোম্পানির কাছে সুপারিশ করেন। ফলে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইন ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার কথা বলা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হেস্টিংসের উদ্যোগে জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি সংস্কৃত কলেজের জন্য অর্থ বরাদ্দ রামমোহন রায় তাতে আপত্তি জানিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ঐ অর্থ ব্যয় করতে দাবী জানান। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। প্রিন্সেপ কোলব্রুক প্রমুখ ইউরোপীয় প্রাচ্যপন্থীগণ এদেশে প্রাচ্যশিক্ষা প্রসারের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যার প্রসারের জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করার দাবি জানান। কিন্তু রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড আর্মহার্স্টকে এক পত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করতে অনুরোধ জানান। জনশিক্ষা কমিটির কিছু সদস্য রামমোহনের মত পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন।

জনশিক্ষা কমিটির সভাপতিরূপে যোগ দেন লর্ড মেক্‌লে। তিনি ছিলেন ঘোর পাশ্চাত্যবাদী। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেন। এই সুপারিশ তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারী অনুদান ব্যয় করার কথা বলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে ঘোষণা করেন যে, এরপর থেকে সরকারী

অনুদান ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিং-এর এডুকেশনাল ডেসপ্যাচ্ ছিল এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই ডেসপ্যাচে বলা হয় সরকারী চাকরী করতে হলে ইংরাজী ভাষায় যারা লিখতে পড়তে জানে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই নীতি ঘোষণা করার পর ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারী উদ্যোগে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে যুক্তি ছিল এই যে, শিক্ষার স্রোত উচ্চতর শ্রেণী থেকে নিম্নতর শ্রেণীতে প্রবাহিত হবে। তবে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উড ভারতে শিক্ষা বিষয়ক যে নির্দেশনামা পাঠান, তা সরকারী নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। এই নির্দেশনামায় ভারতীয়দের জন্য শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ভারত সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এইসব বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তার গতি তেমন দ্রুত ছিল না। ভারতীয়দের অনাগ্রহ ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পুরানো শিক্ষার মাধ্যম ভার্নাকুলার বা ভারতীয় ভাষা অবহেলিত হতে থাকে। সরকারী চাকরীতে ইংরাজীতে জ্ঞান আবশ্যিক করার ফলে একদিকে ইংরাজী শিক্ষার জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমনি সমাধি রচিত হল ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে পুরানো শিক্ষাব্যবস্থার।

৫.৫.১৩.৪ : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬) (National Council of Education 1906)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার পরিবেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়। এর আগে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ভারতীয়দের জাতীয় আশা-আকাঙ্খাকে উপেক্ষা করে তাঁর শিক্ষা-সংকোচন নীতি ঘোষণা করেন। এতে শিক্ষিত ভারতীয়রা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। এরপরই কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলন, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন এবং বিদেশী শিক্ষার পরিবর্তে স্বদেশী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ডন সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সোসাইটির পক্ষে স্যার আশুতোষ চৌধুরীর বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনে'র অফিসে ১৯৫০ সালের ১৬ই নভেম্বর একটি বৈঠক করেন। সেখানে একটি প্রাদেশিক কমিটি তৈরি হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারকনাথ পালিত। সুবোধ মল্লিক, ব্রজেন শীল, বিপিন পাল, ভুপেন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার প্রমুখ মনীষীরা। প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৬ সালের ১৬ই মার্চ সতীশচন্দ্রের ডন সোসাইটি 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে' রূপান্তরিত হল। ১লা জুন পরিষদকে রেজেস্ট্রি করা হয়। তৈরী করা হল একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনা।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল : (১) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। তবে ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাখা হয় (২) বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কলা, সংস্কৃতি ও মানবিক বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করা হয় (৩) নীতি, ধর্ম ও শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় (৪) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়।

১৯০৬ সালের ১৪ই আগস্ট রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে কলকাতার 'টাউন হলে' এক বিরাট সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অনুমোদিত 'বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ ও স্কুল' স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়। ঐ সভায় উপস্থিত জনগণের সামনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ''প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সেজন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জাতীয় প্রথায় শিক্ষা দেওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।'' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছিলেন যে ''স্কুল কলেজের শিক্ষা আমাদের পরাস্ত করেছে। আমরা বিদেশী শিক্ষার তলায় চাপা পড়ে গেছি।'' তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষার নাগপাশ ছিন্ন করে শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হবার আশা প্রকাশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ হলেন বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র হলেন অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ। কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা-এই তিনটি শাখায় কলেজের পাঠক্রমকে ভাগ করা হয়। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, সতীশ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রমাধব মল্লিক, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন। এছাড়া বাইরে থেকে যাঁরা নিয়মিত বক্তৃতা দিতে আসতেন তাঁরা হলেন—সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অর্থনীতিতে পিয়ারীমোহন মুখার্জী, উপনিষদে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গণিতে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদার্থ বিদ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৯০৭ সালে এই বিদ্যায়তনের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০৭ জন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। যেমন—(১) প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ পাঠশালা থেকেই হাতের কাজকে আবশ্যিক করা হয়। (২) মাধ্যমিক স্তর থেকে পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। (৩) বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য সংস্কৃত, পালি, মারাঠী ও হিন্দি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। (৪) কলেজ স্তরে উচ্চতর বিজ্ঞানের পাঠক্রম রাখা হয়। (৫) কলেজের কারিগরি বিভাগে বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। (৬) প্রয়োগমূলক শিক্ষা হিসাবে কাঠের কাজ, লোহার কাজ ঢালাইরে কাজ, যন্ত্রপাতি চালনা ইত্যাদির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বহু ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠায়।

জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিষদের নেতাদের মতভেদ ছিল। তারকানাথ পালিত ও নীলরতন সরকার মনে করতেন ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করছে কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর। তাঁদের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ''কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি'' (Society for the promotion of Technical Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ এই সমিতির সভাপতি হন। ঐ বছরই সমিতি কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (Bengal Technical Insutitue) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এখানে কারিগরী ও ফলিত বিজ্ঞান পড়ানো হত। কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য ১৯১০ সালে সমিতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে মিশে যায়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন কেবলমাত্র কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় পরিষদ অনুমোদিত জাতীয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার দশটি শহরে পরিষদের আর্থিক সহায়তায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরিষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশটি। এইসব বিদ্যালয় স্থাপনে স্থানীয় জনগণের উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা ছিল লক্ষ্যণীয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। তিলকের প্রচেষ্টায় বোম্বাইতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজেও কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলার পরিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। ১৯০৬৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা আধিবেশনে জাতীয় শিক্ষার সমর্থনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে পরিষদের আদর্শে দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও ক্রমশঃ সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৮ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইটি। কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতারা যাদবপুরে যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি স্থাপন করেছিলেন তা আজও সগৌরবে টিকে আছে। ১৯৫৬ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক পর্বের এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অবলুপ্তির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়।

প্রথমতঃ, যেহেতু এই শিক্ষা আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, সেজন্য সেই রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা আন্দোলনেও ভাঁটা পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আর্থ-সামাজিক চাপে মানুষ শিক্ষা আন্দোলন থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ, আন্দোলনের নেতাদের শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা ছিল অনেকটাই বিক্ষিপ্ত, জাতীয় শিক্ষার পরিপূর্ণ পরিকল্পনা রচনা করতে তাঁরা পারেননি। কোন বিকল্প *স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা কাঠামো তাঁরা উপস্থিত করতে পারেননি।*

চতুর্থতঃ, আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে আদর্শগত মতবিরোধ ছিল তবে ব্যর্থ হলেও এই শিক্ষা আন্দোলন জনগণের মনে এক জাতীয় শিক্ষার চেতনা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সাধারণ মানুষ, দেশের নেতা ও কংগ্রেসের মধ্যে যে উৎসাহের সাঞ্চার হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়নি। পরবর্তীকালে নতুন পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন চলতে থাকে। সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী উঠতে থাকে। দেশের নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতীয় উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক গণশিক্ষার প্রয়োজন আছে।

৫.৫.১৪.৫ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা :

১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উডের নির্দেশনামা অনুসারে ১৮৫৭ সালের প্রথম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই নির্দেশনামায় যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলির লক্ষ্য ছিল নিম্নতম অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চতম বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে সংগতি স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে ঐ নির্দেশনামায় প্রত্যেক জেলায় সরকারী বিদ্যালয়, কলেজ ও সমস্ত উচ্চশিক্ষাকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের

তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল ৭১টি কলেজ। কিন্তু লর্ড কার্জন ভাইসরয় হয়ে ভারতে এসে দেখেন শিক্ষার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। তিনি সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্যার টমাস র‍্যালের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিশন যেসব সুপারিশ করেছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ (ক) কলেজগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন করা।

র‍্যালে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কার্জন ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কঠোরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সিনেট ও সিন্ডিকেটের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সিনেটে পাশ হওয়া আইনকে বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হল সরকারকে। আসলে কার্জন ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কঠোরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিণত হয় সরকারী বিভাগে। এজন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা এই আইনের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছিলেন। তথাপি একথা স্বীকার করতে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা এনেছিল, উচ্চশিক্ষার মানকে উন্নত করেছিল, মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তন ঘটিয়েছিল।

উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ও তার সমস্যাগুলি পর্যালোচনার জন্য ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার আর একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাডলার। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ ছিলেন এই কমিশনের অন্যতম ভারতীয় সদস্য। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন। অর্থের অভাবে কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তবে এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়।

উচ্চশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সর্বজনবিদিত। এর রূপকার ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। লর্ড কার্জন যখন তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গ আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯০৬ সালে স্যার আশুতোষ সেই পদ গ্রহণ করেন। আশুতোষ তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতায় ও দৃঢ়তায় বিদেশী শাসকদের দূরভিসন্ধি ব্যর্থ করে কার্জন প্রবর্তিত আইনকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিলেন, তার গুরুত্ব পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষিত মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখেছিলেন তা হল :

(১) সারা দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের একত্রিত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব দেন। (২) বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার প্রভূত উন্নতি করেন। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের সাহায্যে তিনি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন করেন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সি. ভি. রমণ, পি. সি. মিত্র প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন (৩) বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। (৫) গবেষণাপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। (৬) কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন কলেজ স্থাপন করেন। (৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৩ সালের মধ্যে এগারোটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়।

৫.৫.১৪.৬ : শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়

উনিশ শতকের প্রথমে বাংলা তথা ভারতে শিক্ষিত মানুষদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক বিশাল শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা ও ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রধান কারণ ছিল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার জন্য মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যোগ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে গড়ে উঠেছিল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের উত্থান ও জাতীয় আন্দোলনে এই সম্প্রদায়ের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। ১৮৮০-এর দশকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫০,০০০। ১৯০৭ সালে তা ৫,০৫,০০০-তে পৌঁছায়।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে অনেক বৃত্তি লাভের সুযোগ আসে যেগুলির অস্তিত্ব প্রাক্-উপনিবেশিক আমলে ছিল না। তাঁরা আইনজীবী, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রমুখ হবার সুযোগ পান। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে আইন ব্যবস্থা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ বেশিরভাগ নিয়েছিলেন হিন্দুরা এবং বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। বাংলার কলেজ ছাত্রদের অধিকাংশই আসতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার থেকে। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকাও খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত বিদ্যাচর্চায় খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা নতুন ধরনের বৃত্তি ও চাকুরীতে প্রবেশ করার ফলে এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। তবে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশজ শিকড় ছিল সুদৃঢ়। দেশের ঐতিহ্যকে তারা ভোলেননি।

ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত এইসব শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা কিন্তু ঔপনিবেশিক নীতি, আদর্শ মতাদর্শের সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁর উপলব্ধি করতে পারেন যে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ধারণা বা যুক্তি এবং সাম্য ও আইনের শাসনের মিল খুব কমই আছে। শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা শিক্ষার মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে যা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সুসংবদ্ধ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমালোচনা শুরু করে। সংগঠিত জাতীয়তাবাদ এদের মাধ্যমেই বিকশিত হতে থাকে। এই শিক্ষিত বাঙালীরা ভারতীয়রাই প্রথম জাতীয় সচেতনতা অর্জন করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জনগণের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরাই অনেকাংশে ভারতীয় জনগণকে আধুনিক জাতিতে সংহত করেছিলেন। তাঁরাই ছিলেন রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, সংগঠক ও নেতা। শিক্ষামুলক ও প্রচারমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে তাঁরাই জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে স্বদেশিকতা ও স্বাধীনতার ধারণা এনে দিয়েছিলেন। তাঁরাই সৃষ্টি করেছিলেন সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য যার মধ্যে দিয়েই তাঁরা ভারতে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বীজ বুনতে চেয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী আন্দোলনে এঁরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ বাঙালী ও ভারতীয় সংগ্রামশীল নেতৃবৃন্দ সবাই ইংরাজী জানা বুদ্ধিজীবী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণী দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন গণভিত্তি পায়, তখন এই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবিরাই এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৫.৫.১৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। N. L. Basak–History of Vernacular Education in Bengal.

২। সুখময় সেনগুপ্ত—বাঙালী মনীষীর শিক্ষাচিন্তা ও সাধনা।

৩। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়—উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি।

৪। সমর কুমার মল্লিক—আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর।

৫। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশী থেকে পার্টিশান।

৫.৫.১৪.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলায় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনা কর।

(২) দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন কিভাবে হয়েছিল? এর কারণ কি কি?

(৩) বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা কিভাবে প্রসারলাভ করে? কারা এর উদ্যোক্তা ছিলেন?

(৪) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের পটভূমি আলোচনা কর। এর উদ্দেশ্য কি ছিল? এর কার্যাবলী আলোচনা কর।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যা জান লিখ।

(৬) শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা কর।

পঞ্চম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৬

Evolution of different forms of music and dance as performing arts.

বিন্যাস ক্রম

৫.৬.১৫.০ : উদ্দেশ্য

৫.৬.১৫.১ : ভারতের সঙ্গীত

৫.৬.১৫.২ : উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

৫.৬.১৫.৩ : লোকসঙ্গীত

৫.৬.১৫.৪ : জনপ্রিয় সঙ্গীত

৫.৬.১৫.৫ : পশ্চিমী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

৫.৬.১৬.৬ : ভারতে নৃত্য

৫.৬.১৬.৫.১ ওড়িশি

৫.৬.১৬.৫.২ কথক

৫.৬.১৬.৫.৩ মণিপুরি নৃত্য

৫.৬.১৬.৬ : উপসংহার

৫.৬.১৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৬.১৬.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৬.১৫.০ : উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য হল ভারতের বিভিন্ন নৃত্য সঙ্গীতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এগুলির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানতে পারবে।

৫.৬.১৫.১ : ভারতের সঙ্গীত

বলতে বোঝায় বহুমুখি বৈচিত্র্যের উচ্চাঙ্গ সংগীত, লোক সংগীত, চলচ্চিত্র সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, ভারতীয় রক সংগীত এবং ভারতীয় পপ সংগীত। ভারত রাষ্ট্রের উচ্চাঙ্গ সংগীত ঐতিহ্যের মধ্যে আছে হিন্দুস্থানি এবং কর্ণাটক সংগীত, যার ইতিহাস সহস্রাব্দ জুড়ে নিহিত এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে এক উন্নত রূপ নিয়েছে। ভারতে সংগীত সামাজিক-ধার্মিক জীবনের সঙ্গে এক আত্মিক সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় শুরু হয়েছিল।

ইতিহাস

মধ্য প্রদেশের ইউনেস্কো বিশ্ব উত্তরাধিকার স্থানে ভীমবেতকা পাথর আশ্রয়স্থিত ৩০,০০০ বছর আগেকার পুরোনো প্রস্তরযুগীয় এবং নতুন প্রস্তরযুগীয় গুহা চিত্রে সাংগীতিক যন্ত্রানুষঙ্গগুলো এবং নৃত্যভঙ্গিমা দেখা যায়।

নৃত্যরত নারীমূর্তি (আনুঃ ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) সিন্ধু সভ্যতা থেকে দেখা যায়। সেখানে সিন্ধু সভ্যতা যুগের মাটির পাত্রের ওপর চিত্রে দেখা যায় পুরুষের কাঁধে ঝোলানো ঢোল এবং মহিলাদের বাঁহাতের নিচে একটা ড্রাম ধরা অবস্থায় আছে।

বেদসমূহ (C. ১৫০০-C. ৮০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বৈদিক যুগ), আচারআচরণের দলিলে প্রদর্শিত শিল্প এবং নাটক। উদাহরণস্বরূপ, শতপথ ব্রাহ্মণ (C. ৮০০-৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) অধ্যায় ১৩.২ অনুযায়ী দুজন অভিনেতার মধ্যে নাটকে প্রতিযোগিতা ছিল। তাল হল একটা সাংগীতিক ধারণা, যেটা বৈদিক যুগে পাওয়া যায়, যেমন সামবেদ এবং বৈদিক স্তোত্র গাওয়ার পদ্ধতি। স্মৃতিশাস্ত্র (৫০০ থেকে ১০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) একটি বৈদিক-পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যার মধ্যে আছে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ (৫০০ থেকে ১০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ), যাতে বিবৃত আছে নৃত্য ও সংগীত (উর্বষী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা পঞ্চাপ্সরা, এরকম অপ্সরাগণ দ্বারা নৃত্য, এবং রাবণ-এর মহত্তম ভঙ্গিমা, *নৃত্যগীত* অথবা 'গান গাওয়া এবং নৃত্য' এবং *নৃত্যবাদিত্রা* অথবা 'সাংগীতিক বাদ্যযন্ত্র বাজানো'), গন্ধর্বদের দ্বারা সংগীত এবং গায়কী, নানা রকম তারের বাদ্যযন্ত্র (বীণা, তন্ত্রী, বিপানসি এবং বীণার সমতুল্য ভাল্লাকি), সুষির যন্ত্র (শঙ্খ, বেণু এবং *বেণুগান*-কয়েকটা বাঁশিকে একসঙ্গে বেঁধে একটা মাউথ অর্গানের মতো), রাগা, স্বর প্রতিষ্ঠিত (সাত স্বর অথবা সুর, অনা অথবা *একশ্রুতি* স্বরলিপি, মন্ত্রতে স্বরের নিয়মিত ওঠা ও নামা হল *মূর্ছনা* এবং ত্রিপ্রমাণ ত্রি-স্তর *তিন তাল লয়* যেমন দ্রুত অথবা তাড়াতাড়ি, মধ্য অথবা মাঝামাঝি, বিলম্বিত অথবা ধীর), রামায়ণের বালকাণ্ডতে কবিতা আবৃত্তি এবং উত্তরকাণ্ডেও লব ও কুশ দ্বারা মার্গ ধারায়।

চোদ্দো শতকের অসমিয়া কবি মাধব কান্দালি লিখেছিলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, তিনি তাঁর লেখা 'রামায়ণে' কিছু বাদ্যযন্ত্র তালিকাভুক্ত করেন, যেমন, মার্দালা, খুমুচি, ভেমাচি, দাগার, গ্রাতাল, রামতাল, তবল, ঝাঁঝর, জিঞ্জিরি, ভেরি মহরি, তোকারি, দোসারি, কেন্দারা, দোতারা, বীণা, রুদ্র-বিপঞ্চি, ইত্যাদি (যা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর সময় অর্থাৎ চোদ্দো শতক থেকে এসব বাদ্যযন্ত্র চালু ছিল।

৫.৬.১৫.২ : উচ্চাঙ্গ সংগীত

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের দুটো প্রধান ঐতিহ্যের মধ্যে এটা হল কর্ণাটকি সংগীত, যা প্রধানত উপদ্বীপ অঞ্চলে দেখা যায়; এবং হিন্দুস্থানি সংগীত, যার প্রাধান্য আছে ভারতের উত্তর, পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলগুলোতে। এই সংগীতের মূল ধারণার মধ্যে আছে : *শ্রুতি (সূক্ষ্ম আওয়া),* স্বর লিপি), অলংকার (আলংকারিক), রাগ (সংগীতের সাধারণ নিয়ম থেকে তান সম্পাদন), এবং তাল (আঘাত বাদ্য দিয়ে ছান্দিক ধরনকে ব্যবহার)। এই সংগীতের সুরের পদ্ধতি অষ্টক ২২টা ভাগে বিভক্ত, যাকে বলে শ্রুতি, সবটা একই না-হলেও, পশ্চিমি সংগীতের সার্বিক সুরের এক-চতুর্থাংশের সঙ্গে মোটামুটি সমান।

হিন্দুস্থানি সংগীত

হিন্দুস্থানি সংগীতের ঐতিহ্য অনেক পুরোনো, সেই বৈদিক কাল থেকে, যেখানে একটা ধর্ম শাস্ত্র, সাম বেদের স্তোত্র থেকে সাম গান আবৃত্তি নয়, গাওয়া হোত। প্রাথমিকভাবে ইসলামের প্রভাবের ফলে তেরো-চোদ্দো খ্রিস্ট শতকের আশপাশ সময়ে এটা কর্ণাটকি সংগীত থেকে আলাদা ছিল। অনেক শতক জুড়ে একটা মজবুত এবং আলাদা ঐতিহ্য উন্নতিলাভ করেছিল প্রাথমিকভাবে ভারতে, কিন্তু অধুনা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও। দক্ষিণ থেকে উদ্ভূত অন্য এক ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ঐতিহ্য, কর্ণাটকি সংগীতের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে, হিন্দুস্থানি সংগীত যে শুধুমাত্র অতীত হিন্দু সাংগীতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক বৈদিক দর্শন এবং দেশি ভারতীয় আওয়াজ দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল তা-ই নয়, বরং মুঘলদের পারসিক প্রদর্শন অনুশীলন দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধরনগুলো হল : ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, তারানা ও সাদ্রা, এবং এছাড়াও কতগুলো প্রায়-উচ্চাঙ্গ ধরনের সংগীতও আছে।

কর্নাটকি সংগীত

কর্ণাটকি সংগীতের খোঁজ পাওয়া যায় চোদ্দো-পনেরো খ্রিস্ট শতক এবং তার পর থেকে। বিজয়নগর সাম্রাজ্য শাসনের সময়কালে দক্ষিণ ভারতে এই সংগীতের উন্মেষ ঘটে। হিন্দুস্থানি সংগীতের মতো এটা হল সুরসমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পাদনের সঙ্গে, কিন্তু অনেক স্থায়ী সমন্বয়ের দিকে ঝোঁক আছে। এর মধ্যে আছে সমন্বয়ের সঙ্গে অলংকরণ সম্পাদ রাগ আল্পনা, কল্পনাস্বরম, নিরাভাল ধরনের সঙ্গে যোগ করা, এবং আরো অগ্রগামী ছাত্রদের ক্ষেত্রে রাগ, তাল, পল্লবী। যে লিখিত সমন্বয়গুলো গাওয়া হবে গায়কী নামে পরিচিত, প্রদর্শন করার সময় গাইবার ধরন, এমনকি যখন যন্ত্রানুষঙ্গে বাজানো হয়, আসলে স্বরক্ষেপণের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রায় ৩০০ রাগম বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। আন্নামায়া হলেন কর্ণাটকি সংগীতের প্রথম পরিচিত সংগীতজ্ঞ। তিনি অন্ধ্র পদ কবিতার পিতামহ হিসেবে ভীষণভাবে বিখ্যাত (তেলুগু সংগীত-রচনার ধর্মপিতা)। পুরন্দরা দাসা হলেন কর্ণাটকি সংগীতের জনক। ত্যাগরাজা, শ্যামা শাস্ত্রী এবং মুথুস্বামী দিক্ষিতার প্রমুখ পরবর্তী সংগীতজ্ঞদের কর্ণাটকি সংগীতের একের ভিতর তিন বলা হয়।

বিশিষ্ট কর্ণাটকি সংগীতের শিল্পীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন : আর্যকুদি রামানুজা আয়েঙ্গার (সাম্প্রতিক ঐকতান ধারার জনক), সেম্মানগুডি শ্রীনিবাসা আয়ার, পালাঘাট কে ভি নারায়ণাস্বামী, অলাথুর ভাইগণ, এমএস সুব্বুলক্ষ্মী, লালগুডি জয়ারামন; এবং অতি সাম্প্রতিক বালামুরলিকৃষ্ণা, টিএন শেষাগোপালন, কে জে জেসুদাস, এন রামানি, উমায়ালপুরম কে শিবারামন, সঞ্জয় সুব্রহ্মানিয়ান, মণিপল্লবম কে সরঙ্গন, বালাজি শঙ্কর, টিএম কৃষ্ণা, বোম্বে জয়শ্রী, টি এস নন্দকুমার, অরুণা সাইরাম মাইশোর মঞ্জুনাথ প্রমুখ।

প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসে চেন্নাই শহরে একটা দীর্ঘ আট সপ্তাহব্যাপী সংগীত ঋতু, বলা ভালো সংগীতের অধিবেশন চলে, যেটাকে বিশ্বের দীর্ঘতম সংগীত মেলা বলা যায়।

কর্ণাটকি সংগীতকে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মূল ভিত্তি হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে; এর সঙ্গে যুক্ত আছে লোক সংগীত, বিভিন্ন আঞ্চলিক উৎসবের সংগীত এবং অবশ্যই এই বিস্মৃতি সামাজিকভাবে চলচ্চিত্র সংগীতকেও গত ১০০-১৫০ বছর কিংবা তার আশপাশ প্রভাবান্বিত করেছে।

হালকা উচ্চাঙ্গ সংগীত

মানব জীবনের প্রয়োজনে সমাজের মধ্যে অনেক ধরনের সংগীতের উন্মেষ ঘটে; যেগুলো হালকা উচ্চাঙ্গের অথবা প্রায়-উচ্চাঙ্গের। যেমন এই ধারার মধ্যে আছে; ঠুংরি, দাদরা, গজল, চৈতি, কাজরি, টপ্পা, নাট্য সংগীত অথবা নৃত-গীতিনাট্য এবং অবশ্যই কাওয়ালি। এই ধারাগুলো খুব স্পষ্টভাবেই শ্রোতাদের তরফ থেকে আবেগের ওপর জোর দেয়, যেখানে এগুলো আদি উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিপরীত ধরন।

৫.৬.১৫.৩ : লোক সংগীত

রবীন্দ্র সংগীত (বাংলার সংগীত)

রবীন্দ্র সংগীত বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে; *রবীন্দ্র সংগীত,* সারা বিশ্বে রবীন্দ্র সংগীতকে **টেগোর সঙ্গস্** বলা হয়, এই গান এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত এবং সুরারোপিত। এই গানের অভিনব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে বাংলার সংগীত, যেটা ভারত, বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। সংগীত অর্থে গান, 'রবীন্দ্র সংগীত' অর্থাৎ (অথবা যথাযথভাবে গান) রবীন্দ্রনাথের গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় প্রায় ২,২৩০ সংখ্যক গান লিখেছিলেন, যেগুলোকে এখন *রবীন্দ্র সংগীত* বলা হয়, উৎস হিসেবে উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং লোক সংগীত ব্যবহার করা হয়েছিল।

অসমের বিহু সংগীত

বিহু (অসমীয়া : বিহু) হল মাঝ-এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হওয়া অসম রাজ্যের নববর্ষ উৎসব। এই উৎসব হল প্রকৃতি এবং পৃথিবী মাকে উৎসর্গিত, যে উৎসবের প্রথম দিনটা গোরু এবং মহিষদের জন্যে বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় দিনের উৎসব হল মানুষের জন্যে। বিহু উৎসবের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে বিহু নাচ এবং গানগুলো ঐতিহ্যপূর্ণ ড্রাম এবং বাঁশিজাতীয় যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহার। বিহু গানগুলো ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ এবং ছন্দের সঙ্গে ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানানো হয়ে থাকে। বিহুতে অসমীয়া ডাম (ঢোল), শিঙা (সাধারণত মহিষের শিং দিয়ে বানানো), গোগোনা এবং বেশির ভাগ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ডান্ডিয়া

ডান্ডিয়া অথবা রাস হল দুহাতে দুটো কাঠি নিয়ে প্রদর্শিত একটা গুজরাতি সাংস্কৃতিক নৃত্য। বর্তমান সাংগীতিক ধারাটা ঐতিহ্যপূর্ণ লোকনৃত্যের সঙ্গত থেকে অনুগৃহীত। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রধানত গুজারাট রাজ্যে দেখা গেলেও সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছে। ডান্ডিয়া/রাসের সঙ্গে আরো একটা ধারার নৃত্য এবং সংগীত সংযুক্ত, যাকে বলা হয় গরবা।

উত্তরাখণ্ডী সংগীত

আঞ্চলিক পার্বত্য ভূখণ্ডের প্রকৃতি মায়ের কোল থেকে মূল উৎসারিত হয়ে উত্তরাখণ্ডী লোক সংগীত সমাজে প্রতিষ্ঠিত। উত্তরাখণ্ডের লোক সংগীতের সাধারণ বিষয়গুলো হচ্ছে : প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিভিন্ন ঋতুবৈচিত্র্য, উৎসবগুলো, ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো, সাংস্কৃতিক কাজকর্মগুলো, লোক গাথাগুলো, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো, এবং পূর্বসূরিদের সাহসিকতার কাহিনি। উত্তরাখণ্ড রাজ্যের লোকগীতিগুলো হল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং হিমালয়ের কোলে বসবাসকারী জনগণের জীবন যাপনের প্রতিফলন। উত্তরাখণ্ড সংগীত পরিচালনায় যেসব যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার হয় সেগুলো হল : ঢোল, দামৌন, তুরি, রণসিংহ, ঢোলকি, দাউর, থালি, ভাঙ্কোরা মসকভজা। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশেষ করে নথিভুক্ত করা লোক সংগীতের ক্ষেত্রে কখনো কখনো তবলা এবং হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আধুনিক জনপ্রিয় লোক সংগীতশিল্পী নরেন্দ্র সিং নেগি, মোহন উপ্রেতি, গোপাল বাবু গোস্বামী এবং চন্দ্র সিং রাহী প্রমুখ দ্বারা লোক সংগীতের ক্ষেত্রে ভারত বর্গীয় এবং বৈশ্বিক যন্ত্রসংগীতগুলোর অবতারণা করা হয়েছিল।

লাবনি

লাবনি নামটা এসেছে 'লাবণ্য' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল সুন্দর। এটা ভীষণভাবে জনপ্রিয় নৃত্য এবং সংগীতের একটা ধারা, যেটা সারা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে এটা মহারাষ্ট্রীয় জনতার লোক সংগীত প্রদর্শনগুলোর একটা অত্যাবশ্যকীয় অংশ। ঐতিহ্যগতভাবে এই গানগুলো মহিলা শিল্পীরাই গেয়ে থাকে, কিন্তু কখনো বা পুরুষ শিল্পীরাও লাবনি গান গায়। লাবনি গানের সঙ্গে যে নাচের ধারা সংযুক্ত তাকে বলা হয় তামাশা। লাবনি হল একটা ঐতিহ্যপূর্ণ গান ও নাচের সমাহার, যেটা বিশেষত ড্রামের মতো এক যন্ত্র, 'ঢোলকি'র মোহিত করা বাজনা দিয়ে প্রদর্শিত হয়। ন-গজ শাড়ি পরে আকর্ষণীয় মহিলারা নাচ প্রদর্শন করে। তারা একটা ঝটিতি উত্তেজক গান গায়। মহারাষ্ট্রে এবং মধ্য প্রদেশের শুকনো অঞ্চল থেকে লাবনির উদ্ভব হয়েছে।

রাজস্থান

রাজস্থান রাজ্যের এক বিচিত্র ধরনের সাংস্কৃতিক সংগ্রহের সংগীতজ্ঞের জাতিগোষ্ঠী আছে, যেমন : লঙ্গস, সপেরা, ভোপা, যোগী এবং মঙ্গনিয়ার (ভাষাগতভাবে, 'একজন, যে চায়/ভিক্ষে করে')। *'রাজস্থান ডায়েরি' বয়ান* দিয়েছে যে, এটা একটা ঐকতানের বৈচিত্র্য নিয়ে হৃদয়োৎসারিত, পূর্ণস্বরীয় সংগীত। রাজস্থানের তান বিচিত্র সব যন্ত্রসংগীত থেকে আসে। তারের বাজনার বহুমুখিতার মধ্যে আছে সারেঙ্গি, রাবণাহাতা, কামায়াচা, মরসিং এবং একতারা। পার্কাসান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সবরকম আকার ও সাইজের প্রচুর নাগারা এবং ঢোল থেকে ছোটো ডাম ছিল। ডাফ এবং চ্যাং হল হোলি খেলার (রঙের উৎসবের) জনপ্রিয় যন্ত্রবাদ্য। বাঁশি এবং ব্যাগপাইপারগুলো এসেছে স্থানীয় উদ্যম থেকে; যেমন সানাই, পুঙ্গি, আলগোজা, তার্পি, বীণ এবং বাঙ্গিয়া।

রাজস্থানি সংগীত তন্ত্রবাদ্যা, পার্কাসন বাদ্য এবং হাওয়া বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণে এবং সহযোগে উদ্ভূত যেটা লোক সংগীতশিল্পীদের দ্বারা পেশ করা এক সম্মিলিত উদ্যোগ। এটা বলিউডে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রমোদ সংগীত হিসেবে মান্যতা পেয়েছে।

৬.১৫.৩ : জনপ্রিয় সংগীত

চলচ্চিত্র সংগীত

সবচেয়ে বড়ো আকারের ভারতীয় জনপ্রিয় সংগীত হল চলচ্চিত্র সংগীত, অথবা ভারতীয় সিনেমার গান, এটা ভারতের সংগীত বিপননের ৭২ শতাংশ সম্পূর্ণ করে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প একদিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওপর শ্রদ্ধা রেখে সমর্থনযোগ্য সংগীত এবং যখন অন্যদিকে পশ্চিমি অর্কেস্ট্রার সংমিশ্রণে ভারতীয় তানের একটা সমর্থনের সংগীত বেরিয়ে আসছে। সংগীত স্রষ্টাগণ: শচীন দেব বর্মন, শংকর জয়কিষান, রাহুল দেব বর্মন, মদন মোহন, নৌসাদি আলি, ওপি নায়ার, হেমন্ত কুমার সি রামচন্দ্র, সলিল চৌধুরী, কল্যাণজি আনন্দজি, ইলাইয়ারাজা, এআর রহমান, যতীন ললিত, অনু মালিক, নাদিম-শ্রবণ, হরিশ জয়রাজ, হিমেশ রেশম্মাইয়া, বিদ্যাসাগর, শংকর এহসান লয়, সেলিম-সুলেমান, প্রীতম, এমএস বিশ্বনাথন, কেভি মহাদেবন, ঘন্টাসালা এবং এসডি বাতিশ একতার নীতিকে কার্যকর করেন যখন উচ্চাঙ্গ এবং লোক সংগীতের সুরভিকে জাগ্রত রাখেন। রবি শংকর, বিলায়েৎ খান, আলি আকবর খান এবং রাম নারায়ণ প্রমুখ উচ্চাঙ্গ সংগীতের কিংবদন্তীরাও চলচ্চিত্রের জন্যে সংগীত রচনা করেছেন। ঐতিহ্যগতভাবে, গোড়ার যুগে সিনেমার নায়ক-নায়িকারা কাহিনির মধ্যে নিজেদের গলায় গান গাইতেন; যেমন কিশোর কুমার এবং কানন দেবী প্রমুখ। কিন্তু বর্তমান যুগের ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা গানের স্বর দেননা, তার বদলে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীরা তাঁদের গান গেয়ে দেন, শব্দকে আরো উন্নত, তানযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী করতে, যখন অভিনেতারা পর্দায় গানের গলা মিলিয়ে ঠোঁট নাড়েন। অতীতে অল্প কয়েকজন সংগীত শিল্পী হিন্দি চলচ্চিত্রে স্বর দিতেন। তাঁদের মধ্যে আছেন : কেজে জেসুদাস, মহম্মদ রফি, মুকেশ, এসপি বালাসুব্রহ্মনিয়াম, টিএম সুন্দরারাজন, হেমন্ত কুমার, মান্না দে, পি সুশীলা, লতা মঙ্গেশরকর, আশা ভোঁসলে, কেএস চিত্রা, গীতা দত্ত, এস জানকী, শমসাদ বেগম, সুরাইয়া, নূরজাহান এবং সুমন কল্যাণপুর। সাম্প্রতিক নেপথ্য সংগীত শিল্পীরা হলেন : উদিত নারায়ণ, কুমার শানু, কৈলাশ খের, আলিশা চিনাই, কেকে, শান, মধুশ্রী, শ্রেয়া ঘোষাল, নিহিরা যোশী, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, হরিহরণ (গায়ক), ইলাইয়ারাজা, এআর রহমান, সোনু নিগম, সুখবিন্দর সিং, কুণাল গাঁজাওয়ালা, অণু মালিক, সুনিধি চৌহান, অণুষ্কা মানচন্দা, রাজা হাসান, অরিজিৎ সিং এবং অলকা যাজ্ঞিক। রক ব্যান্ডগুলো হল : ইন্দাস ক্রীড, ইন্ডিয়ান ওসেন, সিল্ক রুট এবং ইউফোরিয়া। কেবল্ টেলিভিশন সংগীতের উন্নতির ফলে এগুলো বর্তমানে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

অ-ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া

গত শতকের সাত এবং আটের দশকে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে রক অ্যান্ড রোল মিশ্রণের যে প্রকাশ হয়েছিল সেটা সারা ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা জুড়ে সুপরিচিত হয়েছিল। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আলি আকবর খান যে প্রদর্শন করেছিলেন সেটাই সম্ভবত এই প্রবণতার শুরুয়াত ছিল।

জ্যাজ অগ্রগামী যেমন জন কোল্ট্রান—যিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের সময়কাল নাগাদ 'ইন্ডিয়া' নামে একটা রচনা তাঁর লিভ অ্যাট দ্য ভিলেজ ভ্যানগার্ড অ্যালবামের জন্যে রেকর্ড করেন (এই কাজটা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোল্ট্রন-এর অ্যালবাম ইম্প্রেশন্স প্রকাশ না-হওয়া পর্যন্ত)—এই মিশ্রণটা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। জর্জ হ্যারিসন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে (দ্য বিটলস-এর) 'নরওয়েজীয় উড (দিস বার্ড হ্যাজ ফ্লোন)' এই গানে সেতার

বাজিয়েছিলেন, যার ঝলকের আগ্রহ পেয়েছিলেন রবি শংকর থেকে, যিনি পরবর্তীকালে তাঁকে তাঁর শিক্ষাণবিশ হিসাবে নিয়েছিলেন। জ্যাজ প্রবর্তক মাইলস ডেভিস—খলিল বালাকৃষ্ণা, বিহারি শর্মা এবং বাদল রায় প্রমুখ সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে তাঁর বৈদ্যুতিক ঐকতান বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ড এবং প্রদর্শন করেছিলেন। ভির্তুয়োসো জ্যাজ গিটারবাদক জন ম্যাকলগলিন মাদুরাইতে কর্ণাটকি সংগীত শিক্ষার জন্যে অনেক বছর কাটিয়েছেন এবং এই সংগীত তাঁর শক্তিসহ অনেক কাজের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন যেখানে বিশিষ্ট ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের অবদান আছে। অন্যান্য পশ্চিমি শিল্পী যেমন গ্রেটফুল ডেড, ইনক্রেডিবল্ স্ট্রিং ব্যান্ড, দ্য রোলিং স্টোন্স, দ্য মুভ এবং ট্র্যাফিক এরা সেই সময়ই ভারতীয় প্রভাবে বাদ্যযন্ত্রগুলো এবং ভারতীয় প্রদর্শকদের প্রয়োগ করেছিলেন। কিংবদন্তি গ্রেটফুল ডেড প্রমুখ জেরি গার্সিয়া তাঁর উচ্চাঙ্গের সিডি 'ব্লু ইনক্যান্টেশন' (১৯৯৫)-তে গিটারবাদক সঞ্জয় মিশ্রকে যুক্ত করেছিলেন। মিশ্রজি ফরাসি চিত্র পরিচালক এরিক হিউম্যানকে তাঁর *পোর্ট জেমা* (১৯৯৬) ছবির জন্যে এক আসল স্বরলিপি রচনা করে দিয়েছিলেন, যেটা হ্যাম্পটন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ রচনা বিবেচিত হয় এবং বার্লিনে স্বর্ণ ভালুক লাভ করে। তিনি ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ড্রামার ডেনিস চেম্বার্স (কার্লোস সান্তানা, জন ম্যাকলগলিন প্রমুখ)-এর সঙ্গে রেসকিউ রেকর্ড হলেন এবং ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে চাতেয়ু বেনারস ডিজে লজিক এবং কেলার উইলিয়ামস (গিটার এবং উদারা)-এর সঙ্গে কাজ করেন।

যদিও ভারতীয় সংগীতের উত্তেজনা দর্শক-শ্রোতারা মূল স্রোত থেকে প্রশমিত হয়েছিল, গোঁড়া অনুগামী এবং অভিবাসীরা মিশ্র প্রবাহ জারি রেখেছিল। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে একটা বিট-প্রভাবিত রাগ রক শংকর, যাকে সেতার শক্তি বলা হয়, অশ্বিন বাতিশ সেতারকে পশ্চিমি জাতিগুলোর কাছে পুনরায় পরিচয় করিয়েছিলেন। সেতার শক্তি রেকর্ড প্রমাণ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং নিউ জার্সির শানাচি রেকর্ডস দ্বারা তীব্র আকর্ষণ করায় তাদের ওয়ার্ল্ড বিট এথনো পপ বিভাগে প্রধান হওয়ার জন্যে ডাকে।

গত শতকের আটের দশকের শেষ দিকে ভারতীয়-ব্রিটিশ শিল্পীরা ভারতীয় এবং পশ্চিমি ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে তৈরি করেন এশিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ড। গত শতকের নয়ের দশক থেকে কানাডীয় বংশোদ্ভূত সংগীতজ্ঞ নাদাকা, যিনি তাঁর জীবনের অনেকটা সময় ভারতে কাটিয়েছেন, পশ্চিমি ধারায় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সংমিশ্রণে শ্রুতিমধুর এক সংগীতের সৃষ্টি করেন। এরকমই একজন সংগীতশিল্পী যিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের ভক্তিগীতিকে পশ্চিমি অ-ভারতীয় সংগীতের মিলিয়েছিলেন, তিনি হলেন কৃষ্ণ দাস এবং তিনি তাঁর সংগীত, সাংগীতিক সাধনা করেছিলেন। আরেকটা উদাহরণ হল, ইন্দো-কানাডীয় সংগীতজ্ঞবন্দনা বিশ্বাস যিনি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *মোনোলগস* অ্যালবামে পশ্চিমি সংগীতের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

নতুন সহস্রাব্দে আমেরিকান হিপ-হপ ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং ভাঙড়া সংগীতকে বৈশিষ্টযুক্ত করেছিল। মূলস্রোতের হিপ-হপ শিল্পীরা নমুনা হিসেবে বলিউড সিনেমা থেকে গানগুলো নিত এবং ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগে কাজ করত। উদাহরণ হিসেবে তিম্বালন্দ-এর 'ইন্ডিয়ান ফ্লুট', এরিক সারমন এবং রেডম্যান-এর 'রিঅ্যাক্ট', স্লাম ভিলেজ-এর 'ডিস্কো' ট্রুথ হান্টস-এর জনপ্রিয় গান 'অ্যাডিক্টিভ', যেটা নমুনা হিসেবে নেওয়া হয় একটা লতা মঙ্গেশকর গান এবং দ্য ব্ল্যাক আইড পিজ নমুনা হিসেবে আশা ভোঁসলেজির গান 'ইয়ে মেরা দিল' তাদের জনপ্রিয় গানটা 'ডোন্ট ফুঙ্ক উইথ মাই হার্ট' নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ব্যান্ড কর্নারশপ আশা ভোঁসলেকে তাদে গান *ব্রিমফুল অফ আশা* দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল, যেটা আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয়

হয়েছিল। ব্রিটিশ-জাত ভারতীয় শিল্পী পাঞ্জাবি এমসি-এরও আমেরিকায় একটা জনপ্রিয় ভাঙড়া 'মুন্দিয়ান তো বচ কে' ছিল, যা তীব্রভাবে জয়-জেডবিশিষ্টতা দিয়েছিল। এশিয়ান ডাব ফাউন্ডেশন সেরকম প্রচুর মূলস্রোতের শিল্পী নয়, তবুও তাদের রাজনৈতিকভাবে সমর্থিত র যাপ এবং পুঙ্ক রক নিজেদের দেশ যুক্তরাজে বহু-গোষ্ঠীযুক্ত দর্শকশ্রোতাদের প্রভাবে আওয়াজ উঠেছিল। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক শিল্পী স্নুপ ডগ সিং ইজ কিং ছবিতে একটা গানে আবির্ভূত হয়েছিল। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে হিপ-হপ প্রস্তুতকর্তা মদলিব প্রকাশ করেছিলেন বিট কন্ডাক্টা খণ্ড ৩-৪ : বিট কন্ডাক্টা ইন ইন্ডিয়া; এই অ্যালবামটা প্রচণ্ডভাবে নমুনায়িত হয়েছিল এবং ভারতের সংগীত দ্বারা উৎসাহিত হয়েছি।

কখনো কখনো ভারতের সংগীত অন্যান্য দেশগুলোর সংগীতের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লি 2 ডাবলিন, একটা কানাডা ভিত্তিক ব্যান্ড, ভারত এবং আইরিশ সংগীতের সংমিশ্রণ, এবং ভাঙড়াটন হল ভাঙড়া এবং রেগ্গাটন সংগীতের একটা সংমিশ্রণ, যেটা নিজেই হিপ-হপের একটা সংমিশ্রণ, রেগ্গা, এবং ঐতিহ্যপূর্ণ লাতিন আমেরিকান সংগীত।

সাম্প্রতিকতম উদাহরণের মধ্যে আছে ভারতীয়-বিটিশ সংমিশ্রণ, লরা মার্লিন এবং পাশাপাশি মামফোর্ড অ্যান্ড সন্স সহযোগপূর্ণভাবে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ধরোহার প্রোজেক্ট-এর সঙ্গে ফোর-সং ইপি-তে। বিটিশ ব্যান্ড বোম্বে বাইসাইকল ক্লাবও 'মন দোলে মেরা তন দোলে' গানটাকে তাদের একক 'ফীল' সংগীতের নমুনা হিসেবে নিয়েছিল।

ভারতীয় পপ সংগীত

ভারতীয় লোক সংগীত এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আধুনিক বিট নিয়ে ভারতীয় পপ সংগীতের ভিত্তি গড়া হয়েছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে নেপথ্য সংগীতশিল্পী আহমদ রুশদির গান 'কো কো কোরিনা' দিয়ে প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে পপ সংগীতের শুরুয়াত হয়েছিল, যেটা গত শতকের ছয়ের দশকে মহম্মদ রফি এবং সাতের দশকে কিশোর কুমার অনুসরণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে, বেশির ভাগ ভারতীয় পপ সংগীত এসেছিল ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প থেকে, বিগতশতকের নয়ের দশক পর্যন্ত অল্প কয়েকজন সংগীতশিল্পী, ঊষা উত্থুপ, শারন প্রভাকর এবং পীনাজ মাসানি প্রমুখ ভারতের বাইরে একে জনপ্রিয় করেছেন। তখন পর্যন্ত ভারতীয় পপ সংগীতশিল্পীরা হলেন : দালের মেহেন্দি, বাবা সাইগল, আলিশা চিনাই, কেকে, শান্তনু মুখার্জি, একে এ শান, সাগরিকা, কলোনিয়াল কাজিন্স (হরিহরণ, লেসলি লুইস), লাকি আলি, এবং শোনু নিগম, এবং সংগীতকাররা হলেন : জিলা খান অথবা জওহর ওয়াত্তাল, যিনি উচ্চ বিপননের অ্যালবাম প্রস্তুত করেছেন দালের মেহেন্দি, শুভা মুদগল, বাবা সাইগল, শ্বেতা শেট্টি এবং হংস রাজ হংস প্রমুখকে নিয়ে।

সাম্প্রতিককালে, ভারতীয় পপ 'রিমিক্সিং' অথবা পুনর্মিশ্রণের সঙ্গে একটা চমকদার মোড় নিয়েছে, যা নেওয়া হয়েছে অতীত চলচ্চিত্র সংগীত থেকে, যেখানে নতুন নতুন বিট লাগিয়ে ভারতীয় পপ সংগীতকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

রক এবং মেটাল সংগীত

রাগা রক

রাগা রক হল রক অথবা একটা ভীষণ ভারতীয় প্রভাবযুক্ত পপ সংগীত, হয় এটার গঠন, এর ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, অথবা এর যন্ত্রানুষঙ্গ, যেমন সেতার ও তবলা। রাগা এবং অন্যান্য ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধরন গত শতকের ছয়ের দশক ধরে অনেক রক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল : এর মধ্যে বিখ্যাত হল দ্য বীটলস। প্রথম খোঁজ পাওয়া 'রাগা রক' শুনতে পাওয়া যায়, যেমন দ্য কিঙ্কস দ্বারা 'সী মাই ফ্রেন্ডস' এবং দ্য ইয়ার্ডবার্ডস দ্বারা 'হার্ট ফুল অফ সোল', গিটারবাদক জেফ বেক দ্বারা সেতারের মতো ঝলকের বৈশিষ্ট্য দিয়ে আগের মাস প্রকাশ করেছিল। বীটলসদের গান 'নরওয়েজিয়ান উড (দ্য বার্ড হ্যাজ ফ্লোন)', যেটা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যান্ডের প্রথম প্রকাশিত রাবার সোলঅ্যালবামে আবির্ভূত হয়েছিল, এটা ছিল প্রথম পশ্চিমি পপ গান যাতে প্রকৃতপক্ষে সেতার সহযোগ ছিল (প্রখ্যাত গিটারবাদক জর্জ হ্যারিসন প্রদর্শিত মার্চ ১৯৬৬, দ্য ব্যর্ডস কৃত একক 'এইট মাইলস হাই' এবং এর পাশে 'হোয়াই' সমেত প্রভাবান্বিত হয়ে একট উপধরনের সংগীত সৃষ্টি করেছিল। যদিও 'রাগা রক' শব্দটা উদ্ভাবিত হয়েছিল এভাবে-দ্য ব্যর্ডসের এই এককের প্রচারে সংবাদ প্রকাশের ছাপানো সমীক্ষা 'এইট মাইলস হাই' দ্য ভিলেজ ভইস-এর জন্যে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন সাংবাদিক সেলি কেম্পটন। জর্জ হ্যারিসনের ভারতীয় সংগীতে আগ্রহে বিগত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি যে গানগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলো হল : 'লাভ ইউ টু', 'টুমরো নেভার নোজ' (লেনন-ম্যাককার্টনিকে কৃতজ্ঞতা), 'উইদিন ইউ উইদাউট ইউ' এবং 'দ্য ইনার লাইট'। বিগত শতকের ছয়ের দশকের রক কার্যকলাপ ব্রিটিশ ও আমেরিকা উভয় দেশের গোষ্ঠীগুলো এবং ভারতীয় রকের অবস্থান সব মিলিয়ে এক সাম্প্রতিক ধারায় এল ভারতীয় রক।

ভারতীয় রক

ভারত রক সংগীত 'দৃশ্য' চলচ্চিত্র অথবা মিশ্র সাংগীতিকার 'দৃশ্যগুলো' কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক ধরনের অবস্থানে গভীর ভক্তি অর্জন করে এর নিজের মতো আবির্ভূত হয়েছে। বিগত শতকের ছয়ের দশকে ভারতে রক সংগীত আসল রূপ পেয়েছিল, যখন দ্য বিটলস প্রমুখ আন্তর্জাতিক শিল্পীরা ভারত সফর করেন এবং এখানে তাঁরা তাঁদের সংগীত উপস্থাপন করেন। এই শিল্পীদের ভারতীয় সংগীতজ্ঞ, যেমন রবি শংকর এবং জাকির হুসেন প্রমুখের সঙ্গে সহযোগিতা রাগা রক সংগীতের উন্নয়নে ছাপ ফেলেছি। আন্তর্জাতিক সফ্টওয়্যার রেডিয়ো স্টেশন, যেমন ভয়েস অফ আমেরিকা, বিবিসি, এবং রেডিয়ো শ্রীলংকা জনগণের মধ্যে পশ্চিমি পপ, লোক সংগীত, এবং রক সংগীত স্প্রচারের ব্যাপারে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল।

ভারতীয় রক ব্যান্ডগুলো চেহারা পেতে আরম্ভ করে একমাত্র খানিকটা পরে, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া দশকের শেষদিক নাগাদ।

এটা ছিল এই সময়কাল নাগাদ যে, রক ব্যান্ড ইন্দাস ক্রীড, আগে বলা হোত দ্য রক মেশিন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই ব্যান্ড রক-এন-রোল রেনেগাদের সঙ্গে নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছিল। অন্যান্য ব্যান্ড তাড়াতাড়ি এটা অনুসরণ করে। নতুনকে সাদরে গ্রহণ করায় ভারতীয় রক সংগীত দিনকে দিন আরও সমর্থন পেতে থাকে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে শুরু দশকের গোড়ায় এমটিভি আবির্ভাবের সঙ্গে, ভারতীয়রাও বিভিন্ন ধারার রক, যেমন গ্রুঞ্জে এবং

স্পিড মেটাল হাজির করতে থাকে। এই প্রভাব আজও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যান্ডের মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহরগুলো, প্রধানত কলকাতা, গুয়াহাটি, শিলং, দিল্লি, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরু হয়ে ওঠে রক এবং মেটাল সংগীত উন্মাদনার আঁতুড়ঘর! বেঙ্গালুরু হয়ে ওঠে ভারতে রক এবং মেটাল আন্দোলনের পীঠস্থান। অনেক স্বনামধন্য ব্যান্ডের মধ্যে আছে : দোরিয়ান প্লেটোনিক, নিকোটিন, ক্যানিবলস, ফিনিক্স, জাস্ট, ভুদু চাইল্ড, রুবেলা, ক্রিস্টাল অ্যান, মর্গুই, ইন্ডিয়ান ওসেন, ক্রিপ্টোস, পেন্টাগ্রাম, থার্মাল অ্যান্ড এ কোয়ার্টার, অ্যাবান্ডন্ড অ্যাগনি, নো আইডিয়া, জিরো, হাফ স্টেপ ডাউন, স্ক্রাইব, ইস্টার্ন ফেয়ার, ডেমোনিক রেসারেকশন, জিগনেমা, মাদারজানে, সোলমাতে, অ্যাভিয়াল এবং পরিক্রমা। ভবিষ্যৎ আরো উদ্যমপূর্ণ অবস্থাননকে ধন্যবাদ, যেমন গ্রিন ওজোন, ডগমা টোন রেকর্ডস, ইস্টার্ন ফেয়ার মিউডিক ফাউন্ডেশন, যারা ভারতীয় রককে সমর্থন এবং বিপণনে উৎসর্গিত। মধ্য ভারত থেকে নিকোটিন, একটা ইন্দোর-ভিত্তিক মেটাল ব্যান্ড, যাদের ওই অঞ্চলে অগ্রগামী মেটাল সংগীত স্রষ্টা হিসেবে বিস্তৃতভাবে সম্মান প্রাপ্য।

৫.৬.১৫.৫ : পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীত

ভারতে পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃতি এবং অনুসরণ প্রায় নেই বললেই চলে। এটা প্রধানত জরথুস্ট্রবাদী সম্প্রদায় এবং অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী দ্বারা পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের ঐতিহাসিক প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। অন্য অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী হল চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরুর প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যারা বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। পশ্চিমি সংগীত ভারতে খুবই মারাত্মকভাবে অবহেলিত ছিল এবং যৎসামান্য অস্তিত্ব বজায় ছিল। পশ্চিমি কিবোর্ড, ড্রাম এবং গিটার নির্দেশনা এক ব্যতিক্রম হিসেবে কিছুটা আগ্রহ দেখা যেত প্রধানত সমসাময়িক জনপ্রিয় ভারতীয় সংগীতের সেবায় সংগীতজ্ঞ তৈরির ক্ষেত্রে। ভারতে পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের অস্পষ্টতা বিষয়ে অনেক কারণ উল্লেখ করা যায়, একটা দেশ তার নিজস্ব সাংগীতিক উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ হওয়া তার অধিকার, যাই হোক, দুটো প্রধান কারণ হল, চূড়ান্ত প্রকাশে অনীহা এবং অসাড় অনাগ্রহ যাতে অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী প্রধানত যুক্ত। এছাড়াও, পশ্চিমি সাংগীতিক বাদ্যযন্ত্রগুলো এদেশে আমদানি করার অসুবিধে এবং তাদের অসাধারণত্ব পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের দুর্বোধ্যতাকে বাড়িয়ে দেয়।

এদেশে পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রকট হওয়ার পর এক শতকের বেশি সময় পার হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রায় দু-শতক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনেও উচ্চাঙ্গ সংগীত কখনোই আনুষ্ঠানিক বা 'সাজানো' এর বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। অতীতে পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতকে জনপ্রিয় করার অনেক চেষ্টা ভারতে হয়েছে, কিন্তু সেগুলো আগ্রহ না-থাকা এবং উঁচুতে ধরে রাখার অবদানের অভাবে সফল হয়নি। বর্তমানে ভারতে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীাত শিক্ষার হাল উন্নত হয়েছে। এধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে : কেএম মিউজিক কনজারভেটরি (অস্কার-বিজয়ী সংগীতকার এআর রহমান প্রতিষ্ঠিত), ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক, ব্যাঙ্গালোর স্কুল অফ মিউজিক, ইস্টার্ন ফেয়ার মিউজিক ফাউন্ডেশন, দিল্লি স্কুল অফ মিউজিক, উস্তাদগড় ফাউন্ডেশন, দিল্লি মিউজিক অ্যাকাডেমি, গিটারমঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতে উৎসর্গিত হয়ে প্রগতি অথবা উন্নতি এবং সমর্থনে অবদান রাখছে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত মেহলি মেহতা বোম্বে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা তৈরি করেন। দার্জিলিঙে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া দশকের গোড়ায় মিস্টার

জীবন প্রধান প্রতিষ্ঠা করেন 'মেলোডি অ্যাকাডেমি'; যিনি নিজে একক চেষ্টায় দার্জিলিং পাহাড়ে পশ্চিমি সংগীত এনেছিলেন, যেটা খুব উন্নত একটা সাংগীতক উত্তরাধিকাররূপে রয়ে গিয়েছে।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে দ্য বোম্বে চেম্বার অর্কেস্ট্রা (বিসিও) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দে মুম্বইতে এনসিপিএ অঞ্চলে স্থাপিত এবং আশ্রিয় হয় সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা অফ ইন্ডিয়া। বর্তমানে এটাই ভারতের একমাত্র পেশাদার সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা এবং যারা প্রতি বছর দুটো কন্সার্ট ঋতু দর্শক-শ্রোতাদের উপহার দেয়, যেখানে বিশ্ববিখ্যাত সংগীত পরিচালক এবং একক সংগীতজ্ঞরা প্রদর্শন করে থাকেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়, পশ্চিমি উচ্চাঙ্গ সংগীতবেত্তা হলেন :

আন্দ্রে দে কোয়াদ্রস, পরিচালক এবং সংগীত শিক্ষক।

জুবিন মেহতা, পরিচালক।

মেহলি মেহতা, জুবিনের পিতা, বেহালাবাদক এবং বোম্বে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার পরিচালক।

অনিল শ্রীনিবাসন, পিয়ানোবাদক।

ইলাইয়ারাজা, প্রথম ভারতীয়, যিনি রয়াল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা দ্বারা লন্ডনের ওয়ালথামস্টও টাউন হলে প্রদর্শিত পুরো সিম্ফনি প্রস্তুত করেছিলেন।

নরেশ সোহেল, ব্রিটিশ ভারতীয়-জাত সংগীতকার।

পরম বীর, ব্রিটিশ ভারতীয়-জাত সংগীতকার।

করিশ্মেহ ফেলফেলি, ভারতীয়-জাত ইরানি পিয়ানোবাদক এবং বেতার সঞ্চালক।

দেশপ্রেম এবং সংগীত

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ থেকে ভারতীয়দের মধ্যে সংগীতের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল। দেশব্যাপী ঐক্যের অভিন্ন সুরে সংগীতের মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত জাতীয় জয়গাথা জনগণমনভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এটি এবং ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দে মাতরম্ জাতীয় সংগীত হিসেবে মর্যাদা পায়। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর যে গানগুলো বৈশিষ্ট্য লাভ করে: অ্যয়ে মেরে ওয়াতন কে লোগো, মিলে সুর মেরা তুমহারা, তব তুমহারে হাওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, এ আর রহমান কৃত মা তুঝে সালাম-এই গানগুলো দেশভক্তিকে মিলিত করা, জাতীয় সংহতি এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনে।

৫.৬.১৬.৫ : ভারতে নৃত্য

অনেক ধরনের নৃত্য নিয়ে গঠিত, যা সাধারণত ধ্রুপদী বা লোক নৃত্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি অন্যান্য দিকের মত, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে, যা স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী উন্নত হয়েছে এবং দেশের অন্যান্য অংশ থেকে উপাদান আত্মভূত করেছে।

সংগীত নাটক একাডেমী, নাট্যশালার জন্য ভারতের জাতীয় একাডেমী, ৮ প্রকারের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকে ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যেখানে অন্যান্য পণ্ডিত ও সুত্রসমূহ আরও নাচকে ধ্রুপদী নৃত্যতে অন্তর্ভুক্ত করে। এইসব নাচের উৎস সংস্কৃতি গ্রন্থ নাট্য শাস্ত্র, এবং হিন্দুধর্মের ধর্মীয় শিল্প কলায় পাওয়া যায়।

অনেক সংখ্যায় এবং শৈলীর লোকনৃত্য পাওয়া যায় নিজ নিজ রাজ্য, জাতিগত বা ভৌগলিক অঞ্চলের স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিবর্তিত। সমসাময়িক নাচের মধ্যে বিভিন্ন ধ্রুপদী, লোক ও পাশ্চাত্য ধরনের পরিমার্জিত ও পরীক্ষামূলক মিশ্রন অন্তর্ভুক্ত। ভারতের নাট্য ঐতিহ্য শুধু পুরো দক্ষিণ এশিয়ার নাট্য ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেনি, বরং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নাট্য ঐতিহ্যকেও প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় সিনেমায় নাচ প্রায়ই তাদের মেজাজের বৈশিষ্ট্যর জন্য প্রসংশিত হয়, এবং ভারতীয় উপমহাদেশের জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে থাকে।

নামকরণ

ভারতীয় নৃত্য সাধারণত ধ্রুপদী এবং লোক নৃত্যের, পাশাপাশি মাঝেমধ্যে আধাধ্রুপদী ও উপজাতীয় নৃত্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

একটি ধ্রুপদী নাচ হচ্ছে সেই যার তত্ত্ব, প্রশিক্ষণ, অর্থ এবং ভাবপূর্ণ অনুশীলনের জন্য যুক্তি প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে, যেমন নাট্য শাস্ত্র, নথিভুক্ত এবং তা অনুসরণ করা হয়। ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য ঐতিহাসিকভাবে একটি বিদ্যালয় বা গুরু-শিষ্য পরম্পরা (শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক) ঘিরে আবর্তিত হয় এবং থিয়েটার নৃত্যে মঞ্চস্থ করার জন্য নাচের সাথে তার অন্তর্নিহিত খেলা বা রচনা, গায়ক এবং অর্কেস্ট্রার ধারাবাহিকভাবে সুসংগত রাখার জন্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অধ্যয়ন, শারীরিক চর্চা এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

লোক নৃত্য হচ্ছে মূলত একটি মৌখিক প্রথা, যার ঐতিহ্য ঐতিহাসিকভাবে শিখানো হয়েছে এবং বেশীরভাগ সময় মুখে মুখে ও অনিয়মিত যৌথ অনুশীলনের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে গেছে। আধা ধ্রুপদী নাচ হচ্ছে সেই নাচ যার একটি শাস্ত্রীয় ছাপ রয়েছে কিন্তু একটি লোকনৃত্যে পরিণত হয়েছে এবং তার গ্রন্থ বা বিদ্যালয় হারিয়েছে। একটি উপজাতীয় নাচ হচ্ছে লোকনৃত্যের একটি স্থানীয় রূপ, সাধারণত যা একটি নির্দিষ্ট উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়; সাধারণত সময়ের সাথে উপজাতি নাচ লোকনৃত্যে পরিণত হয়।

ভারতে নৃত্যের উৎপত্তি

ভারতে নাচের উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন কালে। বেদে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে অনেক শিল্পকলাকে সংযুক্ত করা হয়েছে যেমন নাটকে, যেখানে দেবতাদের প্রশংসা কেবল শুধু আবৃত্তি করা বা গাওয়া হয় না বরং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয় নাটকীয় উপস্থাপনায় সংলাপ আকারে বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের (আনুঃ ৮০০-৭০০ খ্রিস্টপূর্ব) সাংস্কৃতিক শ্লোক ১৩.২ টি দুই অভিনেতার মধ্যে একটি নাটক আকারে লেখা হয়েছে।

‘‘বৈদিক উৎসর্গের অনুষ্ঠানকে (যজ্ঞ) এক ধরনের যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে এর অভিনেত, এর সংলাপ, এর অংশকে এর গর্ভাভিনয় ও চরম মুহূর্ত অনুসারে নির্ধারণ করা হয়।

—লুইস, রেনূউ, বৈদিক ভারত (Vedic India)

আদিতম নৃত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ হচ্ছে নটসূত্র, যার উল্লেখ পাওয়া যায় পাণিনির লেখায়, একজন ঋষি যিনি শাস্ত্রীয় সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছিলেন এবং যার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালে মনে করা হয়। এইরকম শিল্পকলা সম্পর্কিত সূত্রের কথা অন্যান্য প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেমনটি শৈলালিন এবং কৃষসভ (Krsasva) নামক দুইজন পণ্ডিতকে প্রাচীন নাটক, গান গাওয়া, নাচ ও এই শিল্প কলার সংস্কৃত রচনার ওপর গবেষণার অগ্রদূত হিসেবে কৃতিত্ব দেয়া হয়। রিচমন্ড এই অ্যালের অনুমান যে নটসূত্র ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচনা করা হয়েছিল যার পাণ্ডুলিপি আধুনিক যুগে এসে হারিয়ে গিয়েছে।

নৃত্য ও শিল্প কলার যে শাস্ত্রীয় গ্রন্থটিকে টিকে থাকতে পেরেছে সেটি হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্র নাট্য শাস্ত্র, যার রচয়িতা হিসেবে ধরা হয় ঋষি ভরতকে। তিনি তার লেখায় বলেছেন এই কলা তার সময়ের আগে সৃষ্টি হয়েছে, যার স্বীকৃতি তিনি ব্রহ্মাকে দিয়েছেন যিনি ঋগ্বেদ থেকে শব্দ, সামবেদ থেকে সুর, যজুর্বেদ থেকে মূকাভিনয়, অথর্ববেদ থেকে আবেগ নিয়ে নাট্য বেদ সৃষ্টি করেছেন। নাট্য শাস্ত্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংকলন ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং ২০০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে সংকলিত হয়, কিন্তু ধারণা করা হয় ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং ৫০০ খ্রিষ্টাব্দর মধ্যে। নাট্য শাস্ত্রের বহুল চর্চিত সংস্করণ ৬০০০ শ্লোক যা ৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের মূল নাট্য শাস্ত্র বলে ধরা হয়।

ভারতের অনেক প্রকারের ধ্রুপদী নৃত্য আছে, যা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য, মহাকাব্য ও পুরাণ থেকেও ধ্রুপদী ও লোক নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে।

ধ্রুপদী নৃত্য

ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য একপ্রকারে নৃত্য-নাট্যের সৃষ্টি করেছে যা নিজে একটি পরিপূর্ণ থিয়েটার। নর্তকীরা শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গি দ্বারা একটি গল্প উপস্থাপন করে। ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যের অধিকাংশই হিন্দু পুরাণের গল্প উপস্থাপন করে। প্রতিটি নৃত্যই একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের তত্ত্ব ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে।

ধ্রুপদী হিসেবে বিবেচিত হবার প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে নাট্য শাস্ত্রে উল্লেখিত নির্দেশিকা মেনে চলা, যা ভারতীয় অভিনয় শিল্প ব্যাখ্যা করে। সংগীত নাটক একাডেমী ৮ প্রকারের ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যকে ধ্রুপদী নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় : ভরতনাট্যম (তামিল নাড়ু), কত্থক (উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারত), কথাকলি (কেরল), কুচিপুডি (অন্ধ্র প্রদেশ), ওড়িশি (ওড়িশা), মণিপুরি (মণিপুর), মোহিনীঅট্টম (কেরল), এবং সত্রীয়া (আসাম)। ভারতের সকল ধ্রুপদী নৃত্যের মূলে হিন্দু ধর্মীয় আচার ও শিল্পকলা রয়েছে।

নৃত্যের ঐতিহ্য নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং একটি নাচ সম্পন্ন হয়েছে বলে তখনই ধরা হবে যখন একটি নির্দিষ্ট ভাব (অঙ্গভঙ্গি বা মুখভঙ্গি) এর মাধ্যমে নর্তকী দর্শকদের মাঝে একটি রস (আবেগ) তৈরি করতে পারে। ধ্রুপদী নৃত্য লোকনৃত্য থেকে আলাদা করা হয় কারণ একটি নাট্য শাস্ত্রে নিয়মানুযায়ী পরিচালনা করা হয় এবং শুধুমাত্র এর অনুসারে সঞ্চালন করা হয়।

ভরতনাট্যম

১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পুরানো, ভরতনাট্যম দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য তামিলনাড়ুর একটি ধ্রুপদী নৃত্য, যা আধুনিক সময় প্রধানত নারীদের দ্বারা চর্চা করা হয়। এই নাচ সাধারণত শাস্ত্রীয় কর্ণাট সঙ্গীতের সাথে চর্চা করা হয়।

ভারতনাট্যম ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের এক প্রধান ধারা যা তামিল নাড়ু এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু মন্দির হতে উৎপত্তি হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, ভরতনাট্যম একটি একক নাচ যা কেবলমাত্র নারীদের দ্বারা সঞ্চালন করা হয়, এবং হিন্দু ধর্মীয় বিষয় ও আধ্যাত্মিক ধারণা, বিশেষত শৈবধর্ম, কিন্তু বৈষ্ণব এবং শাক্তধর্মও, প্রকাশ করে।

ভরতনাট্যম এবং ভারতের অন্যান্য ধ্রুপদী নাচ ব্রিটিশ রাজের ঔপনিবেশিক আমলে অবহেলিত এবং দমন করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগের পরে, এটা ভারতে এবং বিদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের শৈলীতে পরিণত হয়েছ, এবং অনেক ভারতীয় সংস্কৃতির নাচ এবং শিল্পকলার বৈচিত্র্য সম্পর্কে অজ্ঞ বিদেশিদের দ্বারা এটিই ভারতীয় নাচের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কথাকলি

কথাকলি (কথা মনে ''গল্প''; কালি মানে ''অভিনয়'') একটি অত্যন্ত শৈল্পিক ধ্রুপদী নৃত্য-নাট্য যা ১৭ শতকের মধ্যে কেবল থেকে উদ্ভব হয়েছে। এই ধ্রুপদী নাচের ধরন আরেক প্রকারের ''গল্প অভিনয়'' শিল্পের ধারা, এটিকে সাধারণত আলাদা করা হয় রঙিন-মেক আপ, পরিধানসমূহ এবং মুখের মুখোশ দ্বারা যা অভিনেতা-নর্তকীরা পরে থাকে, যারা ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ হয়ে থাকে।

হিন্দু কলা হিসেবে কথাকলির উৎপন্ন হয়েছিল, যাতে হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কিংবদিন্ত ও নাটক অভিনয় করা হত। যদিও এর উৎপত্তি আরো সাম্প্রতিক কালে হয়েছিল, এর উৎস সাধারনত মন্দির এবং লোকশিল্পে যেমন কুটিয়াত্তম এবং ধর্মীয় নাটক যার উৎস ১ম সহস্রাব্দে। একটি কথাকলি সঞ্চালনে প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় মার্শাল আর্ট এবং খেলাধুলার উপাদান সংযুক্ত থাকে। যদিও প্রাচীন মন্দির নাট্য ঐতিহ্য যেমন কৃষ্ণনাট্যম, কুটিয়াত্তম, এবং অন্যান্যের সাথে তাকে সংযুক্ত করা হয়, কথাকলি এদের থেকে আলাদা কারণ প্রাচীন কাল যেখানে অভিনেতা-নর্তকী-গায়ক একজন ব্যক্তি হয়ে থাকে সেখানে তাদের মত না করে, কথকলি এই ত্রয়ী ভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করে অভিনেতা নর্তকীকে নৃত্যপরিকল্পনা উপর মনোযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তার নাচের সঞ্চালনের উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে গায়ককে তার গায়কীর উপর মনোযোগের মাধ্যমে ভালো গান গাইতে সাহায্য করে।

কত্থক

কত্থক ঐতিহ্যগতভাবে সংযুক্ত করা হয় প্রাচীন উত্তর ভারতের ভ্রাম্যমান গায়ক-কবিদের সংগে যারা কথাকার বা গল্পকার নামে পরিচিত। কত্থক শব্দটি এসেছে বৈদিক সংস্কৃত শব্দ কথা থেকে যার অর্থ ''গল্প'', এবং সংস্কৃততে কথাকার শব্দটির অর্থ হচ্ছে ''যিনি গল্পে বলেন'' যা ''গল্পের সাথে কাজ করা''। ভক্তি আন্দোলনের সময় কত্থক প্রসূত হয়েছিল, বিশেষ করে হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের শৈশব কালের প্রণয় কাহিনীগুলোকে অন্তর্ভুক্ত

করার দ্বারা, পাশাপাশি স্বাধীনভাবে উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলোর রাজদরবারে। এটি ১৬ ও ১৭ শতকের মোঘল রাজদরবার দ্বারা প্রভাবিত রুচি ও ফার্সি কলাকে রুপান্তর, উপযোগী করে এবং অংশভুক্ত করেছিল, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলে এর অবহেলা ও হ্রাস ঘটেছিল, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এর নবজন্ম ঘটে।

কত্থকের তিনটি স্বতন্ত্র রূপ খুঁজে পাওয়া যায়, নামকরণ করা হচ্ছে শহরগুলোর নামের সাথে মিল রেখে যেখানে কত্থক নাচের ঐতিহ্য বিকশিত হয়েছিল—জয়পুর, বারাণসী ও লখনউ। শৈলীগতভাবে, কত্থক নাচ ছোট ঘন্টাধ্বনির (ঘুঙরু) সাথে নাচুনে পায়ের ছন্দময় নড়নের উপর জোর দেয়, সেই নড়ানোকে সংগীতের সাথে একতকান করানো হয়, পা এবং ধড় সাধারণত সোজা হয়, এবং গল্প এক উন্নত শব্দভাণ্ডারের মাধ্যমে যার ভিত্তি হচ্ছে বাহুর অঙ্গভঙ্গি ও শরীরের উপরের অংশের চালনা, মুখের অভিব্যক্তি, মঞ্চে অবস্থান পরিবর্তন, বাঁকের ও পালাবদন দ্বারা।

কুচিপুডি

কুচিপুচি ধ্রুপদী নাচের উৎপত্তি হয়েছে বর্তমান ভারতীয় রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার একটি গ্রামে। এর শিকড় প্রোথিত আছে প্রাচীন যুগে এবং ভারতের অন্যান্য ধ্রুপদী নৃত্যের মত এটি ভ্রাম্যমান গায়ক-কবি, মন্দির ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সম্পর্কিত ধর্মীয় কলা হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এর ইতিহাসে কুচিপুচি নর্তকীরা ছিল সব পুরুষ, সাধারণত ব্রাহ্মণ যারা উপযুক্তভাবে অনুযায়ী পোশাক পরে গল্পের নারী ও পুরুষের ভূমিকা পালন করত।

আধুনিক কুচিপুডি ঐতিহ্য বিশ্বাস করে যে তীর্থ নারায়ণ জাতী ও তাঁর শিষ্য সিদ্ধেন্দ্র যোগী নামক একজন ব্যক্তি ১৭ম শতকে এই শিল্প প্রতিষ্ঠা ও নিয়মাবদ্ধ করেন। কুচিপুডি মূলত হিন্দু দেবতা কৃষ্ণ ভিত্তিক একটি বৈষ্ণব ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল, এবং এটা সবচেয়ে জনপ্রিয়ভাবে তামিলনাড়ুতে পাওয়া যায় ভাগবত মেলা নামক শিল্পকলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কুচিপুডি সঞ্চালনে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিশুদ্ধ নাচ (নৃত্য), এবং সঞ্চালনের ভাবপূর্ণ অংশ (ব্যাখ্যামূলক নাচ ''নৃত্য''), যেখানে ছন্দময় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে একটি চিহ্ন ভাষা দ্বারা মূকাভিনয় করা হয়। গায়ক এবং সঙ্গীতশিল্পীরা শিল্পীর সঙ্গে থাকে, এবং তাল ও রাগ কর্ণাট সঙ্গীতের নির্ধারণ করা হয়। আধুনিক যুগে, কুচিপুডি নর্তকী নারী ও পুরুষ উভয়ই হয়।

ওড়িশি

ওড়িশি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় রাষ্ট্র উড়িষ্যার হিন্দু মন্দির হতে উৎপত্তি হয়েছে। ওড়িশি, তার ইতিহাসে, প্রধানত নারী দ্বারা সঞ্চালিত হত, এবং ধর্মীয় গল্প এবং আধ্যাত্মিক ধারণা বিশেষ করে বৈষ্ণব (জগন্নাথ যেমন বিষ্ণু) কিন্তু এর পাশাপাশি অন্যান্য যেমন হিন্দু দেবতা শিব ও সূর্য এবং হিন্দু দেবী (শাক্তধর্ম) সম্পর্কিত ঐতিহ্য প্রকাশ করতো। ওড়িশি ঐতিহ্যগতভাবে নাট্যকলার একটি নাচ-নাটক রীতি, যেখানে শিল্পী এবং সঙ্গীতশিল্পীরা একটি পৌরাণিক কাহিনী যেমন একটি আধ্যাত্মিক বার্তা বা হিন্দু গ্রন্থে থেকে ভক্তিমুলক কবিতা, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অনুযায়ী প্রতীকী পরিচ্ছদ, অভিনয় (অভিব্যক্তি) এবং মুদ্রার (অঙ্গভঙ্গি এবং চিহ্ন ভাষা) মাধ্যমে অভিনয় করে বলতে থাকেন।

সত্রীয়া

সত্রীয়া একটি ধ্রুপদী নৃত্য-নাট্য নাট্যকলা যা আসামের কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক বৈষ্ণব আশ্রম থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং ভক্তি আন্দোলন এর পণ্ডিত এবং সন্ত শ্রীমন্ত শংকরদেব ১৫ শতকে এর প্রচলন করেন। সত্রীয়ার একটি একাঙ্ক নাট্য হচ্ছে *অংকীয়া নাট* যা চারণকাব্য, নাচ ও নাটকের মাধ্যমে নান্দনিকতার ও ধর্মের মিশ্রন বলা যেতে পারে। এই নাচ সাধারণত আশ্রম মন্দিরের (সত্র) কমিউনিটি হলে (নামঘর) নৃত্য করা হয়। এর প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে কৃষ্ণ ও রাধা কিন্তু বিষ্ণুর অন্য অবতারসমূহ যেমন রাম ও সীতার কথাও বলা হয়।

মণিপুরি

মণিপুরি যা জাগই নামেও পরিচিত, মায়ানমারের (বার্মা) সীমান্তে ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্য মণিপুরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে আসামের সিলেট অঞ্চলে এ নাচের উৎপত্তি। এটা বিশেষ করে তার হিন্দ বৈষ্ণব বিষয়াবলী, এবং রাস যাত্রা নামক রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-অনুপ্রাণিত নৃত্যনাট্যের সঞ্চালনের জন্য পরিচিত। তবে এই নাচ এইছারাও শৈবধর্ম, শাক্তধর্মও অন্যান্য স্থানীয় দেবতা যেমন *লাই হারাউবার* সময় *উমাং লাই* এর বিষয়ের উপরও নাচা হয়। মণিপুরি নাচ হচ্ছে দলগত নাচ, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তার নিজস্ব অনন্য পরিধানসমূহ (একটি পিপা আকৃতির, সূচারূভাবে সজ্জিত স্কার্ট), এর নান্দনিকতা, নিয়মাবলী এবং নাট্যসংঘের কর্তৃক নিয়মিত নাচ মঞ্চস্থ করা। মণিপুরী নৃত্যনাট্য, বেশীরভাগ ভাগ সময়ে শোভাময়, চপল, সর্পিল হাত ও দেহের উপরের অংশের অঙ্গভঙ্গি সহ সঞ্চালনের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়।

মোহিনীঅট্টম

মোহিনীঅট্টম কেরল রাজ্য থেকে বিকশিত হয়েছে, যার নামকরণ করা হয়েছে বিষ্ণুর সম্মোহিনী অবতার মোহিনী থেকে, যিনি হিন্দু পুরাণ মতে তার সম্মোহিনী শক্তি ব্যবহার করে ভালো এবং মন্দের মধ্যে যুদ্ধে দেবতাদের জয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন। মোহিনীঅট্টম *নাট্য শাস্ত্রে* বর্ণিত লাস্য শৈলী অনুসরণ করে, একটি নাচ যা নাজুক, নমনীয় প্রচলন এবং মেয়েলী ভাবে নাচা হয়। এটা ঐতিহ্যগতভাবে একটি একক নাচ যা ব্যাপক প্রশিক্ষণের পরে নারীদের দ্বারা নাচা হয়। মোহিনীঅট্টম সাধারণত আবৃত্তি সহ সোপান (ধীর সুর) শৈলীর গানের সাথে বিশুদ্ধ এবং ভাবপূর্ণ নৃত্য-নাচ্য হিসেবে মঞ্চস্থ করা হয়। গীতিকাগুলি সংস্কৃত ও মালয়ালম ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত মণিপ্রভালম-এর রচিত।

লোক এবং উপজাতী নৃত্য

ভারতের লোকনৃত্য ও নাটক গ্রামাঞ্চল সমূহে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এইগুলো গ্রাম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন কাজের অভিব্যক্তি এবং ধর্মানুষ্ঠান প্রকাশ করে।

মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্য বিভিন্ন প্রকারের দলনৃত্যের বর্ণনা করে যেমন *হাল্লিসাকা, রাসকা, দান্ড রাসকা এবং চরাচরি।* নাত্যশাস্ত্রে নাটক শুরু হবার পূর্বে মহিলাদের দলগত নাচও অন্তর্ভুক্ত।

ভারতে অনেক লোকনৃত্য রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের তার নিজস্ব লোকনৃত্য আছে যেমন কর্ণাটকের *বেদারা ভেশা, দল্লুকুনিঠা নাচ, কেরলের থিরায়াত্তম এবং থাইয়াম নাচ, গুজরাটের গার্বা, গাগারী, গোধাখুন্ড এবং*

ডান্ডিয়া নাচ, রাজস্থানের কালবেলিয়া, ঘুম রং এবং রাসিয়া নাচ, জম্মু ও কাশ্মীরের নেইয়োপা, এবং বাচানুাগমা নাচ, পাঞ্জাবের ভাংরা ও গিদ্ধা নাচ, উত্তরাখণ্ডের ছুলিয়া নাচ, আসামের বিহু এবং বাগুরুম্বা নাচ, পশ্চিম উড়িষ্যার সাম্বালিপুরী নৃত্য এবং একইভাবে প্রতিটি রাজ্য এবং এর ছোট অঞ্চল সমূহের বিভিন্ন নাচ। লাভালি ও কলি নাচ মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাচের মধ্যে অন্যতম।

সমসাময়িক নাচ

ভারতে বর্তমানে সমসাময়িক নাচ হিসেবে ব্যাপক পরিধির নাচ মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য নৃত্যপরিকল্পনা, আধুনিক ভারতীয় ব্যালে এবং বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা বিদ্যমান ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

উদয় শংকর ও শাবানা জয়সিংহকে আধুনিক ভারতীয় ব্যালের নেতৃত্বস্থানীয় হিসেবে ধরা হয় কারণ তারা ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য ও গানের সাথে পশ্চিমা মঞ্চ কৌশলকে সংমিশ্রিত করেছেন। তাদের প্রযোজনার বিষয়বস্তু ছিল শিব-পার্বতী, লঙ্কা দহন, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ ও অন্যান্য।

চলচ্চিত্রে নৃত্য

চলচ্চিত্রে ভারতীয় নাচ শৈলীর উপস্থাপনা, বিশেষ করে হিন্দি সিনেমায়, বিশ্বব্যাপী ভারতীয় নৃত্যের পরিসীমাকে তুলে ধরেছে। সারা ভারতব্যাপী নাচ ও গানের দৃশ্য চলচ্চিত্রের একটি অবিচ্ছেদ অংশ। ১৯৩১ সালে আলম আরা চলচ্চিত্রের দ্বারা চলচিত্রে শব্দ প্রবর্তনের সঙ্গে, নৃত্য পরিকল্পনার সহিত নাচ ক্রমে হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় চলচ্চিত্রে সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে।

প্রথম দিকের হিন্দি চলচ্চিত্রে নৃত্য প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য শৈলী হিসেবে যেমন কত্থক বা লোক নৃত্য অনুসারে পরিচালিত হত। আধুনিক ছায়াছবিতে প্রায়ই পশ্চিমী নৃত্য শৈলীর (এমটিভি বা ব্রডওয়ে থিয়েটারের মধ্যে) সঙ্গে এই পুরনো শৈলীর মিশ্রন ঘটানো হয়, যদিও একই চলচ্চিত্রে পশ্চিমা নৃত্যের সাথে পরিবর্তিত ধ্রুপদী নাচ পাশাপাশি দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাধারণ, নায়ক বা নায়িকারা একদল পার্শ্ব নর্তকীদের সাথে নেচে থাকেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে অনেক গান ও নাচ দৃশ্যের মধ্যে গানের কলির সাথে পোশাক বা জায়গায় নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। নায়ক ও নায়িকাদের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বা স্থাপত্যে দিয়ে তৈরি বিশাল মঞ্চে বা দৃশ্যে, যাকে ''পিকচারাইজেশন'' বলে, একটি পাস ডি ডিউক্স (একটি ফরাসি ব্যালে শব্দটি, যার অর্থ ''দুই এর নাচ'') গাওয়া ও নাচা খুবই জনপ্রিয় ব্যাপার। বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রায় একটি ''আইটেম নম্বর'' থাকে যেখানে একজন নায়িকা অতিথি চরিত্র হিসেবে একটি গানের দৃশ্য নৃত্যে অংশ নেন।

বেশীরভাগ সময় চলচ্চিত্রে, অভিনেতারা যে গানের উপর নেচে থাকেন তা তারা গান করেন না, কিন্তু অন্য শিল্পীরা পটভূমিতে গেয়ে থাকেন। একজন অভিনেতার গানটির গাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু বিরল নয়। বলিউডের নাচ ধীর নাচ থেকে শুরু করে দ্রুত হিপ হপ শৈলীর নাচ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। নাচটি সকল নাচের সংমিশ্রণ হতে পারে। এটা হতে পারে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য, ভারতীয় লোকনৃত্য, ব্যালী ড্যান্সিং, জ্যাজ, হিপ হপ এবং অন্য সব কিছু যা আপনি কল্পনা করতে পারেন।

নৃত্য শিক্ষা

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতার পর, উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিকতা বা শুধুমাত্র ব্যায়াম এবং সুস্থতার একটি উপায় হিসেবে নৃত্য শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।

ভারতের প্রধান শহরগুলোতে এখন অনেক বিদ্যালয় আছে যারা নাচের যেমন ভরতনাট্যম নৃত্যের শিক্ষা দেয়, এবং এই শহরগুলো সারা বছর জুড়ে অনেক নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নৃত্য সমূহ যা শুধুমাত্র এক লিঙ্গের লোকের একচেটিয়া ছিল, এখন নারী ও পুরুষ উভয়ই অংশগ্রহণ করে। অ্যানি-ম্যারি গেস্টন এর মতে, ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের আধুনিক প্রশিক্ষণের অনেক উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একটি আধা ধর্মীয় ধরনের হয়ে থাকে।

ভৌগোলিক বিস্তার

ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য কিছু ঐতিহ্য পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে চর্চা করা হয়, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ, যারা ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অংশীদার। ভারতীয় পুরাণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর নাচ শৈলীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, একটি উদাহরণ হচ্ছে জাভার নাচ যা রামায়ণ উপর ভিত্তি করে মঞ্চস্থ হয়।

৫.৬.১৬.৫.১ : ওড়িশি

ওড়িশি পূর্ব ভারতের ওড়িশা রাজ্যের একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী। এটি ভারতের আটটি ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীরও অন্যতম। ভারতীয় নৃত্যের আদিগ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র এই নৃত্যশৈলীটিকে ওড্র-মাগধী নামে অভিহিত করেছে। ভুবনেশ্বরের নিটকস্থ উদয়গিরি পর্বতে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে নির্মিত একটি খোদাইচিত্র থেকে এই নৃত্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। অনুমিত হয়, ব্রিটিশ আমলে এই নৃত্যশৈলীটি কিছুটা অবদমিত হয়েছিল; কিন্তু স্বাধীনতার পর আবার এক পুনরুজ্জীবন ঘটে। ওড়িশি নৃত্যে ত্রিভঙ্গি (মাথা, বুক ও শ্রোণীর স্বতন্ত্র সঞ্চালনা) এবং চৌকা (মৌলিক চতুষ্কৌণিক ভঙ্গিমা)—এই দুয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ ওড়িশিকে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী থেকে পৃথক করেছে।

ওড়িশি সংস্কৃতিতে তিনটি ঘরানার উপস্থিতি লক্ষিত হয় : মহারি, নর্তকী ও গোতিপুয়া। ওড়িশার মন্দিরগুলিতে দেবদাসীদের মহারি নামে অভিহিত করা হত। শব্দটির উৎস মহা ও নারী শব্দদ্বয়; দুয়ে মিলে মহারি বা নির্বাচিত কথাটি এসেছে। এই দেবদাসীরা মূলত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নর্তকী ছিলেন। প্রাচীন মহারিগণ মন্ত্র ও শ্লোকের ভিত্তিতে নৃত্য (বিশুদ্ধ নৃত্য) ও অভিনয় (কাব্যপাঠ) উপস্থাপনা করতেন। পরবর্তীকালে মহারিগণ জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ কাব্যের গীতিকবিতাগুলির সঙ্গতে নৃত্য উপস্থাপনা শুরু করেন। ভিতরি গৌণী মহারি-র মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকেন। কিন্তু বাহার গৌণী মহারি-রা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলেও গর্ভগৃহে তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই।

গোতিপুয়া ঘরানার উদ্ভব হয় খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এই ঘরানার উদ্ভবের অন্যতম কারণ ছিল বৈষ্ণবধর্মে নারীর নৃত্য স্বীকৃত ছিল না। গোতিপুয়ারা ছিল ছোটো ছোটো ছেলে; যাদের মেয়ে সাজিয়ে দেবদাসীদের

দ্বারা নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হত। এই সময় বৈষ্ণব কবিরা ওড়িয়া ভাষায় অনেক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনা করেন। গোতিপুয়ারা এই সকল পদের সঙ্গতে মন্দিরের বাহিরে প্রাঙ্গনে নৃত্য করত।

নর্তকী নৃত্যশৈলীটির উদ্ভব প্রাক-ব্রিটিশ যুগে। ওড়িশার রাজপ্রাসাদে এই নৃত্য উপস্থাপিত হত। এই সময় দেবদাসীপ্রথার অবমূল্যায়ণ ভীষণভাবে সমালোচিত হয়। এই কারণে মন্দির থেকে দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদ করা হয় এবং রাজসভাতেও এই প্রথা প্রচলিত হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র গোতিপুয়া ঘরানার কিছু উদাহরণ টিকে যায়। এই নৃত্যর পুনরুজ্জীবনের সময় প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার ফলে বর্তমানে এই নৃত্যশৈলীতে শুদ্ধতাবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সনাতন ওড়িশি নৃত্য নিম্নলিখিত অঙ্গ ও শৈলীগুলির সমন্বয়ে গঠিত :

মঙ্গলাচরণ : একটি সম্ভাষক নৃত্যাঙ্গ। জগন্নাথ প্রণামের পর দেবদেবীর স্তবগানবাচক একটি শ্লোক গাওয়া হয়, যার অর্থ উপস্থাপনা করা হয় সমগ্র নৃত্যের মাধ্যমে। মঙ্গলাচরণে ভূমিপ্রণাম করা হয়, মাতা বসুমতীর কাছে তাঁকে পদদলিত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এছাড়া করা হয় ত্রিখণ্ডী প্রণাম বা তিন অঙ্গের প্রণাম। এই প্রণামে মস্তক দ্বারা ঈশ্বরকে, মুখাগ্র দ্বারা গুরুদের এবং বক্ষাগ্র দ্বারা দর্শকদের প্রণাম করা হয়।

বাট্টু নৃত্য : এটি ওড়িশির একটি বিশেষ নৃত্যশৈলী যা নটরাজ শিবের বটুকভৈরব রূপটিকে উদ্দেশ্য করে নিবেদন করা হয়।

পল্লবী : এটি একটি বিশুদ্ধ নৃত্যশৈলী যা কোনো একটি রাগকে চক্ষুসঞ্চালন, দেহভঙ্গিমা ও জটিল পদচালনা দ্বারা ফুটিয়ে তোলে।

অভিনয় : এই শৈলীটিতে কবিতার মাধ্যমে কোনো একটি কাহিনি দর্শকের সামনে উপস্থাপনা করা হয় এবং নৃত্যশিল্পী মুদ্রা বা হস্তভঙ্গিমা, মুখাভিব্যক্তি ও দেহচালনা দ্বারা সেই কাহিনিটির নৃত্যায়ন ঘটান।

দশাবতার : এটি একটি নৃত্যশৈলী যার মাধ্যমে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ কাব্যের বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনাটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়।

মোক্ষ : এটিকে মুক্তির নৃত্য বলে অভিহিত করা হয়। এটি একটি বিশুদ্ধ নৃত্যশৈলী যা মাদল ও পাখোয়াজের সঙ্গতে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

৫.৬.১৬.৫.২ : কথক

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের আট ধরনের মধ্যে একটি। এই নৃত্যের রূপ প্রাচীন উত্তর ভারতের যাযাবর সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান চারটি ধারার বাকি তিনটি হচ্ছে ভরতনট্যম, কথাকলি, মণিপুরী। কথক শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ধারা। সব রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে কথক সবচাইতে জনপ্রিয়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেবদেবীর মহাত্ব বর্ণনায় কয়েকটি সম্প্রদায় ছিলো যারা নৃত্য ও গীত দিয়ে দেবদেবীর মহাত্মাবলী পরিবেশন করতেন। এসব সম্প্রদায়গুলো কথক, গ্রন্থিক, পাঠক ইত্যাদি ইত্যাদি। সবকটির মধ্যে কথক একটি বিশেষ স্থান আজও অধিকার করে রয়েছে। কথক নৃত্যে প্রধানত রাধা কৃষ্ণের লীলা

কাহিনীই রূপায়িত হত। দীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় উৎসব ও মন্দির কেন্দ্রিক পরিবেশনা হওয়ায় কত্থক নৃত্যের কোনো সুসংহত রূপ গড়ে ওঠেনি। মোঘল আমলে দরবারী সংগীত ও নৃত্যের যুগ সূচিত হলে কত্থক নৃত্যের একটি সুসংহত রুপ গড়ে ওঠে। কত্থক নৃত্যের সবচেয়ে বেশী বিকাশ ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোখনৌ এর আসাফুদ্দৌলা ও ওয়াজীদ আলী শাহ এর দরবারকে কেন্দ্র করে। কত্থকের দ্বিতীয় ধারার বিকাশ ঘটে জয়পুর রাজ দরবারে। পরবর্তীতে বারাণসীতেও কত্থক নৃত্যের বিস্তার ঘটে। নৃত্যই কত্থকের প্রাণ তবে সহযোগী সঙ্গীত এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালন করে। কত্থক নৃত্যে মোট বারোটি পর্যায়। তবলা বা পাখোয়াজের লহরায় তাল নির্ভর নৃত্য পদ্ধতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বারোটি পর্যায়ে রয়েছে গণেশ বন্দনা, আমদ, থাট, নটবরী, পরমেলু, পরণ, ক্রমলয়, কবিতা, তোড়া ও টুকরা, সংগীত ও প্রাধান। প্রাম্ভিক পর্যায়ে থাকে গনেশ বন্দনা ও আমদ। নটবরী অংশে তাল সহযোগে নৃত্য পরিবেশিত হয়। পরমেলু অংশে বাদ্যধ্বনীর সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। পরণ অংশে বাদক বোল উচ্চারণ করে ও নৃত্যশিল্পী পায়ের তালে তার জবাব দেয়। এরপর তবলা বা পাখোয়াজের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। ক্রমানবয়ে বিলম্বিত ও পরে দ্রুত তালের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। করতালি দিয়ে তাল নির্দেশ করাকে বলে প্রাধান। কতক নৃত্যের প্রধান পোশাক লম্বা গোড়ালী পর্যন্ত পেশোয়াজ নামক এক ধরণের সিল্কের জামা ও চুড়িদার পাজামা। উজ্জল প্রসাধন ও অলংকার ব্যবহৃত হয়।

৫.৬.১৬.৫.৩ : মণিপুরি নৃত্য

নৃত্যশৈলীর একটি প্রাচীন ধারা। মণিপুরের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এই নৃত্যকে মণিপুরের সুপ্রাচীন নৃত্যধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি মূলত একটি নৃত্য-উৎসব হিসেবে মণিপুরে পালিত হয়।

মণিপুরি লাই শব্দের অর্থ হলো—দেবতা, হারাউবা, শব্দের অর্থ হলো—আনন্দ-নৃত্য। মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রাধান্যলাভের আগে, শৈবমতের ব্যাপক প্রভাব ছিল। দেবতা শিবের প্রতীক হিসেবে 'লাই' ছিল শিবলিঙ্গের প্রতীক। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মণিপুর শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের সহাবস্থানে একটি শান্তির জনপদে পরিণত হয়েছিল।

১৭০৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পামহৈবা মণিপুরের রাজত্ব লাভের পর বৈষ্ণবদের আধিপত্য প্রবলতর হয়ে মণিপুরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কারণ, রামানন্দীর ভাবদর্শের বিশ্বাসী বৈষ্ণব সাধক শান্তি দাস অধিকারীর অনুপ্রেরমায় রাজ পামহৈবা বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তাঁর মতকে একরকম জোর করেই মণিপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এই অঞ্চলে শৈবমতাদর্শের লোকের এরকম কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই সময় রাজা পামহৈবা অন্যান্য মতের গ্রন্থাদি ও নিদর্শন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মণিপুরের ইতিহাসও ধ্বংস হয়ে যায়।

মণিপুরের বৈষ্ণবরাও দেবতা হিসাবে শিবকে শ্রদ্ধা এবং পূজা করতো। ফলে প্রবল বৈষ্ণব আধিপত্যের যুগেও শিব-পার্বতীর লীলা ভিত্তিক গীত ও নৃত্য বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ফলে 'লাইহারাউবা'-নৃত্য মর্যাদা হারাতে হারাতে প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যায়। রাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহাসনে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসার পর তিনি এই নাচকে আবার প্রচলন করেন।

বর্তমানে লাইহারাউবা নৃত্য দুই ভাবধারায় পরিবেশিত হয়। এই ভাবধারা দুটি হলো মৈরাঙ লাইহারাউবা ও উমঙ লাইহারাউবা। এই দুটি ধারাতেই পরিবেশিত হয় নানা ধরনের কাহিনি নির্ভর নৃত্যগীত। এর ভিতরে

খাম্বাথৈবী, নঙ্পক্নিঙ্থুপানথেবী, থনজিঙ লাইরেম্বী উল্লেখযোগ্য। এই নাচে তাণ্ডব ও লাস্য উভয় ধারাই ব্যবহৃত হয়। এই নৃত্য শৈব নৃত্যধারার হলেও, এতে পরবর্তী সময়ে রাসনৃত্যের ভঙ্গীপারেঙ-এর প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে।

এই নৃত্যধারার সাথে জড়িত আছে, মণিপুরের সনাতন ধর্মে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব। মণিপুরের লোক পুরাণ মতে-নয়জন লাইবুঙথ (দেবতা) এবং সাতজন লাইনুরা (দেবী) পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, আর সেই জলের উপর সাতজন লাইনুরা নৃত্য করছিলেন। এই দৃশ্য দেখে নয়জন লাইবুঙথ স্বর্গ থেকে লাইনুরাদের লক্ষ্য করে মাটি নিক্ষেপ করতে থাকেন। নৃত্যরতা সাতজন লাইনুরা সেই ছুঁড়ে দেওয়া মাটির উপর নেচে নেচে পৃথিবীর স্থলভাগ তৈরি করেন। এই ভাবনা থেকে লাইহারাউবা নৃত্যের সূচনা হয় 'লাইএকাউবা'। এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন কিছু দেবদাস এবং দেবদাসী। উল্লেখ্য, মণিপুরে দেবতাদের সেবায় যে পুরুষরা সারাজীবন নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, তাদের বলা হয় মৈবা (দেবদাস)। একইভাবে যে নারীরা দেবতাদের সেবায় সারাজীবন নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, তাদের বলা হয় মৈবী (দেবদাসী)।

৫.৬.১৬.৫.৪ : উপসংহার

এই ভাবে দেখা যায় ভারতে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত ও নৃত্য ভারতের সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রতিটি সঙ্গীত ও নৃত্যের নির্দিষ্ট ইতিহাস ও রূপরেখা আছে। এগুলি সাংস্কৃতিক চর্চার উল্লেখযোগ্য মাধ্যমে।

৫.৬.১৬.৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ML Varadpande (1990), History of Indian Theatre, Volume 1.

(২) William Alves (২০১৩)। *Music oif the Peoples of the World*। Cengage Learning

(৩) McFee, Graham (১৯৯৪)। *The concept of dance education*

(৪) Sunil Kothari : Avinash Pasricha (১৯৯০)। *Odissi, Indian classical dance art*

(৫) Gupta, Shobhna (২০০৫)। *Dances of India*

৫.৬.১৬.৫.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) বিভিন্ন ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা কর।

(২) ওডিশি নৃত্য সম্পর্কে কি জান।

(৩) ভারতীয় নৃত্য কিভাবে একটি উচ্চমানের সংস্কৃতি চর্চা গড়ে তুলেছিল?

(৪) যেকোন তিনটি ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে লেখ।

তথ্যসূত্র ঃ Wikipedia

NOTES

NOTES

ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্র পাঠযুক্ত (CBCS) স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম.এ. দ্বিতীয় সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ - ৬

Colonial India with special reference to Bengal

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

জুন ২০১৯
মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

SYLLABUS

SEMESTER- II

CC-5	4 CREDITS	100 MARKS	100 HOURS

CC-6: Colonial India with special reference to Bengal

BLOCK 1: Towards 20th century Bengal and Growth of Nationalism

Unit-1: A new society and Culture, Indological Discourses,Socio-economic conditions of the Hindus and Muslims.

Unit-2: New Political ideas,Political Asociations,Administrative measures.

BLOCK 2: Partition and Swadeshi Movement and Militant Nationalism.

Unit-3: The British plan and Bengal Protests

Unit-4: The Partition of Bengal-1905

BLOCK 3: Phases of National Movement

Unit-5: Gandhian Movements and Gandhi-Tagore debate, Swarajya Party

Unit-6: Bengal congress, Subhas Chandra Bose, Bose-Sengupta Split.

BLOCK 4: Communal and Caste Politics

Unit-7: Muslim league in Bengal,Fazlul haque,Krishak Proja Party

Unit-8: Caste politics and Scheduled caste organization.

BLOCK 5: Rural Politics

Unit-9: Village communities

Unit-10: Communalism in Village communities.

BLOCK 6: Partition and Aftermath

Unit-11: World war II and Bengal towards partition

Unit-12: Refugee influx

BLOCK 7: Left politics in Bengal

Unit-13: Communist Party and Trade Union Movement

Unit-14: Tebhaga Peasant Movement of Bengal.

BLOCK 8: Economy,Education,Society and Culture.

Unit-15: Swadeshi enterprises in Bengal

Unit-16: Education and Society.

Contents

Blocks	Titles	Pages
1	Towards 20th century Bengal and Growth of Nationalism	1-37
2	Partition and Swadeshi Movement and Militant Nationalism	38-76
3	Phases of National Movement	77-93
4	Communal and Caste Politics	94-114
5	Rural Politics	115-132
6	Partition and Aftermath	133-145
7	Left politics in Bengal	146-176
8	Economy, Education, Society and Culture	177-200

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-১

TOWARDS 20TH CENTRURY BENGAL AND GROWTH OF NATIONALISM

বাংলায় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঃ রাজনৈতিক সভা-সমিতির আত্মপ্রকাশ ও গণ প্রতিরোধ-কৃষক অভ্যুত্থানের গতিপ্রকৃতি

একক-১

(a) A new society and cultrue

(b) Indological discourses

(c) Socio-economic conditions of the Hindus and Muslims.

বিন্যাস ক্রম

৬.১.১.০ : উদ্দেশ্য

৬.১.১.১ : নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি

৬.১.১.২ : ভারততাত্ত্বিক সম্পর্ক

৬.১.১.৩ : হিন্দু এবং মুসলমিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৬.১.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.১.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.১.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) বিংশ শতকে বাংলায় নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশ

(২) বিংশ শতকের বাংলায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্কৃতির বিকাশ

(৩) বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় গড়ে ওঠা ভারততাত্ত্বিক সম্পর্কে ধারা ও বিকাশ

(৪) বিংশ শতকের বাংলায় হিন্দু ও মুসলিমদের আর্য-সামাজিক অবস্থা

(৫) হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষাগত ও সামাজিক বৈষম্য।

৬.১.১.১ : নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি

আমাদের এই পর্যায়ের আলোচনার লক্ষ্য বিংশ শতকের বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা ও অনুধাবন করা। বিংশ শতকের বাংলার সম্পর্কে যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপট বুঝে নেওয়া জরুরী। কারণ উনিশ শতকের গর্ভ থেকেই বিংশ শতকের সূত্রপাত। ফলতঃ উনিশ শতকের থেকে বিংশ শতাব্দীতে উত্তরণ আমাদের বুঝতে হবে ধারাবাহিকতা (Continuity) ও বিচ্ছেদের (break) দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

উনিশ শতকের বাংলা ঔপনিবেশিক বাংলা। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বাংলা তথা ভারত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের দ্বারা পদানত। অন্যভাবে বললে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার স্বার্থে। তার ফলশ্রুতি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতন ভূমি রাজস্ব নীতি, করণিক সৃষ্টির জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে বন্দর শহর ও রেলপথ নির্মাণ, ঔপনিবেশিক আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। ১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহের পর এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে ভারতের শাসনভার স্থানান্তরিত হলে বাংলা তথা ভারতের উপর ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়া আরো সংগঠিত আকার ধারণ করে। বলা বাহুল্য, এর প্রভাব উনিশ শতকের সমাজ কাঠামো ও চিন্তা চেতনার উপর দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল।

উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ছিল মুখ্যতঃ শ্রেণী নির্ভর, কিন্তু বর্ণর গুরুত্ব সম্পূর্ণ হ্রাস পেয়েছিল তা কিন্তু নয়। সমাজের সবচেয়ে উপরের তলায় ছিল ধনী ভূমধ্যকারী শ্রেণী, মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী প্রমুখরা। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় উচ্চবর্ণ অথবা মধ্যবর্ণের মানুষ। সমাজের সবচেয়ে তলায় ছিল প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও শহরের কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রেণী সমূহ। এই শ্রেণীগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের ও খুব অল্প ক্ষেত্রে ম্যবর্ণের। এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শ্রেণীর মধ্যে অবস্থান ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর-এরা মূলতঃ শিক্ষিত, মানসিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত এবং উচ্চ বা মধ্যবর্ণের মানুষ। স্পষ্টতই উনিশ শতকে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসননীতির কল্যাণে পুরাতন বর্ণ ব্যবস্থায় কিছু পরিমানে পরিবর্তন এসেছিল এবং সীমিত পরিমানে হলেও সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের চরিত্র সীমিত ও সীমাবদ্ধ হওয়ায় তা বর্ণ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ভাঙতে পারেনি।

এই সীমিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের বাংলার 'নবজাগরণের' মূল ধারক ও বাহক ছিল এই উদীয়মান বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আধুনিক চিন্তা বিস্তার, সমাজ সংস্কার (বিশেষত নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধন) ও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক চেতনার সংগঠিত বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার জীবনবোধের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের সবটাই ভারতীয়দের পক্ষে কল্যাণকর নয়। ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন সংগঠিত রাজনৈতিক উদ্যোগ। এই গোটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাঙালীর মধ্যবিত্তর চেতনা-চিন্তার উৎক্রমণ দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ধর্মীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

বিশেষ ঝোঁক ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ সংস্কারের পরিবর্তে রাজনৈতিক চেতনার সংগঠিত প্রকাশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক চেতনার সংগঠিত প্রকাশ শুধু যে বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেসেও তা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ১৮৭০ সালে মহারাষ্ট্রে গঠিত হওয়া পুণা সার্বজনিক সভা, ১৮৭৬ সালে বাংলায় তৈরী হয় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৮৪ সালে মাদ্রাজে মাদ্রাজ মহাজন সভা এবং ১৮৮৫ সালে বোম্বেতে গঠিত হয় প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন। বস্তুত উনিশ শতকের মধ্যেই সংগঠিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতাদর্শগত আধিপত্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে ১৮৭০-এর দশকের মধ্যে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছিল। তাঁর ভাষায়, ''By the 1870s the cultural forms of expression of the Bengali bhadraloks had developed a stylistic unity which resulted from the patronage of a social group that had become economically, culturally and politically unified'' বিংশ শতাব্দীর বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে আমাদের এই প্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে হবে।

রজতকান্ত রায় 'Social conflict and Political Urest' গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নের বাংলার সামাজিক কাঠামো আলোচনা করতে গিয়ে 'differential modernization' এর কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন। অর্থাৎ বাংলা বা ভারতের কোথাও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া একমাত্রিক ছিল না। সমাজের এক এক অংশের উপর আধুনিকীকরণের প্রভাব এক এক ভাবে পড়েছিল। এই বহুমাত্রিক আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলায় ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার উত্থানকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে প্রাধান্য ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্তৃক সৃষ্ট জমিদারশ্রেণীর। জমিদারদের কেন্দ্র করে দল বা গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেছিল। বিংশ শতাব্দীতে গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রভাব হ্রাস পায়, তার জায়গা নেয় শ্রেণী ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ জন ব্রমফিল্ড 'ভদ্রলোক' সংস্কৃতির বিকাশের কথা এই প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। ব্রুমফিল্ডের মতে, যদিও এই ভদ্রলোক গোষ্ঠী মূলতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের নিয়ে গঠিত ছিল, কিন্তু এটি আদৌ কোন 'close status group' বা আবদ্ধ সমাজ ছিল না। তিনি মন্তব্য করেছেন, ''Bhadralok was almost synonymous with high caste Brahmin, Baidya, and kayastha-but not quite, for this was an open, not a closed status group''. ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও বৃত্তির কল্যাণে যে সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল তা বিংশ শতকের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সমাজ স্বীকার করে নিয়েছিল। ব্রুমফিল্ডের মতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী তৎকালীন সমাজে নিজেদের স্বাভাবিক নেতা বলে মনে করত। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা মনে করত তারাই সমাজের একমাত্র রাজনৈতিক শ্রেণী যারা সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের উপর প্রাধান্যকারী ভূমিকা নিতে পারে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর এই উদীয়মান সত্তার প্রকাশ ঘটে অতীতের ব্যাখ্যায়, সাংস্কৃতিক বোধে, জীবনযাত্রার বিশিষ্টতায়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর আত্মসত্ত্বার বিকাশ ও আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটেছিল জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে। রজতকান্ত রায়ের মতে, বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর দুর্বলতার জায়গা ছিল এই যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে তাদের কোন স্বাধীন আত্মনির্ভর স্থান ছিল না। এমনকি উৎপাদনী শক্তির নতুন বিকাশের সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। রজতকান্ত রায়ের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রনিধানযোগ্য ঃ ''But they were a sharply distinct element in Bengali society, cut off their position in the dual economy from the lower classes and dependent for their superior position on

their share in the running of the colonial administration. They had no independent position in the economy, nor did they control new productive forces that could be deployed in their struggle for political power. The lack of a productive role connecting the respectable society of calcutta with the working population of Bengal constitutes the objective econoic factor limiting the possibilities of mobilization.

রজকান্ত রায়ের গবেষণা থেকে স্পষ্ট যে বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর পুঁজি বা শ্রম-কোনটার উপরেই নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বে কোন শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক সমীকরণ বাংলায় গড়ে ওঠেনি। কলকাতা ও তার আশপাশের শিল্পাঞ্চলে যে শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটে তা ছিল মুখ্যতঃ অবাঙালী চরিত্রের। শ্রমিক শ্রেণীর একটি বড়ো অংশ এসেছিল বিহার ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, যার সঙ্গে বাঙালী চৈতন্যর কোন সম্পর্ক ছিল না। দীপেশ চক্রবর্তীর গবেষণা থেকে স্পষ্ট যে পাট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার পরিবর্তে গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত চেতনা অনেক প্রবল ছিল। আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি বিংশ শতকে বাংলায় যে সংগঠিত রাজনীতির বিকাশ ঘটেছিল তা মুখ্যতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী নির্ভর ও সমাজের অবস্থাপন্ন সুবিধাভোগীদের অথবা আপেক্ষিক সুবিধাভোগীদের।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বাংলার সমাজ বৃত্তে আরো দুধরনের লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথমতঃ ধর্ম নির্ভর সম্প্রদায়গত চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয়তঃ নিম্নবর্ণের মানুষের আশা আকাংখার প্রতীক স্বরূপ বর্ণ চেতনা ও বর্ণ রাজনীতির সূচনা ঘটে। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সবচেয়ে বঞ্চিত হয় মুসলিম সম্পদায়। গোটা উনিশ শতক ধরে ইংরাজী শিক্ষা ও সদ্য সৃষ্ট ঔপনিবেশিক বৃত্তি সমূহের পূর্ণ সুযোগ করায়ত্ত করে বর্ণ হিন্দু গোষ্ঠীগুলি মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয় আশরফ সম্প্রদায়ের অভিজাত মুসলিমদের যারা নবাবী আমলে সমস্ত রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করত। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব হ্রাস ও কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি ছিল সমাজ কাঠামোতে মুসলিম সম্প্রদায়ের গুরুত্ব হ্রাসের ও হিন্দুদের গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রতীক। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা বিংশ শতকের রাজনীতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশের বীজ এই সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে মুসলিম সংগঠনগুলির বিকাশ ঘটেছিল সেগুলি ছিল উর্দু ভাষী আশরাফ মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে গঠিত হওয়া। এই সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'Muhammedan Literary Society এবং 'Central National Mahomedan Association.'

উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাঙালী মুসলিম সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার প্রসার নিঃসন্দেহে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক ঘটনা যা পরবর্তীকালের বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত এই সময় থেকে বাঙঅলী মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের পৃথক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। অমলেন্দু দে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে (Bengal Proper) হিন্দুর সংখ্যা ১৭,২৫৪,১২০ ও মুসলমানের সংখ্যা ১৭,৮৬৩,৪১১ হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু সংখ্যা ১৮,০৬৮,৬৫৫ ও মুসলমানের সংখ্যা ১৯,৫৮২,৩৪৯ হয়।....জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা আত্মসচেতন হন এবং এক গভীর আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের সম্পর্কে যে অনেক বেশী সচেতন হন তার পিছনে ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতনতা।" অমলেন্দু দের ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার যে বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলিম সমাজ মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীর দ্বারা অনুপ্রানিত ছিল। বাঙালী মুসলিম সমাজে এই ধারনা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে অতীতে তারা এক স্বর্ণযুগে বাস করত যা আজকে নেই। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে যে মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় যে পিছিয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ নিচের সারণীটি—

সরকারী পদ	মোট সংখ্যা	মুসলমান
হাইকোর্ট জজ	৩	১
ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ	১০	২
সাব জজ	৬২	১
মুন্সেফ	৩৪৩	১৮
প্রতিন্মিয়াল জজ	৩	—
এডিশনাল জজ	৭	—
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর	৫২৯	৭৬
হাইকোর্টের আইনজীবী	২১৫	১১

মুসলিম সমাজের মধ্যে এই ধারনা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম প্রার্থীদের বিভিন্ন সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলিম কৃষক শোষণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছিল হিন্দুরা। হিন্দু সমাজের আপেক্ষিক সমৃদ্ধি ও মুসলিম সমাজের তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া বিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক কাঠামোর অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

১৯০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ এর মধ্যে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে গভীর সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই সময় থেকে বাঙালী মুসলমানরা আত্মপ্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। পাট চাষের প্রসার বাংলা বিশেষত পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে সুগভীর পরিবর্তন আনে। পাটের মতন বাণিজ্যিক ফসলকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ আকারে হলেও অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। অমলেন্দু দে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুগত বসু প্রমুখের গবেষণা থেকে দেখা যায় পাটের চাষ ও পাট রপ্তানীকে কেন্দ্র করে একটি সম্পন্ন মুসলিম কৃষক শ্রেণী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জন্ম নেয়। ১৮৯৯ থেকে ১৯১০ খ্রীঃ মধ্যে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মুসলিম কৃষক ও মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থানের প্রভাব মুসলিম সমাজের অন্যান্য অংশেও পড়ে। সরকারী চাকরী, ব্যবহারজীবী, জমিতে বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক লেনদেন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রসারণ ঘটে। 'মুসলিম চেম্বার অফ কমার্সের' প্রতিষ্ঠা মুসলিম ব্যবসায়ীদের স্বাতন্ত্র্যবোধের

পরিচয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Bengal : The Land Question' এ দেখিয়েছেন সম্পন্ন মুসলিম কৃষকরা সাধারণভাবে মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক নেতায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ব বাংলার বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে মুসলিম কৃষকদের উপর এই উদীয়মান সম্পন্ন মুসলিম কৃষকদের (যাদেরকে জোতদার শ্রেণী বললে অতুক্তি হয় না) আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত আধিপত্য বা ideological hegemony সৃষ্টি হয় যা দীর্ঘমেয়াদী পথে বাংলার ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। পূর্ব বাংলার সামাজিক কাঠামোতে শ্রেণীর বিকাশ ঘটলেও শ্রেণী চেতনার বিকাশ ঘটেনি। মুসলিম কৃষক শ্রেণীর ক্ষোভ, হতাশা, আশা ও আকাংখা সম্প্রদায়গত পথে বিকশিত হয়েছিল। মুসলিম সমাজের কাঠামোতে শ্রেণী চেতনার পরিবর্তে সম্প্রদায়গত চেতনার প্রভাব সক্রিয় ছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পূর্ব বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে যে ক্ষমতা সম্পর্ক বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল তা সম্প্রদায়গত ক্ষমতা সম্পর্ক বা Communal mode of Power, পুঁজিবাদী (capitalist) বা সামন্ততান্ত্রিক (feudal) নয়।

এই আলোচনা থেকে একটি কথা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তা হল বিংশ শতকের গোড়ার দিককার বাঙালী সমাজ এক রকমের বা একমাত্রিক ছিল না। কলকাতার সমাজের যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, তার সঙ্গে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর কোন মিল ছিল না। কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল; জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতেও এর ছাপ পড়ে এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতাদর্শগত আধিপত্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যভাবে বললে উনিশ শতকের শেষ থেকেই বাঙালী সমাজের মধ্যে নানা জটিলস্তর সৃষ্টি হয়। এক একটি স্তরে ক্ষমতা সম্পর্ক এক এক ভাবে বিন্যস্ত ছিল, কোথাও শ্রেণী ক্ষমতা রূপে, কোথাও ধর্মীয় সম্প্রদায়গত রূপে, কখনও বর্ণগত রূপে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নানা ভাবে নিজ স্বার্থে এই ক্ষমতা সম্পর্কগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করত, ব্যবহার করত। এর ফলে ক্ষমতা সম্পর্কগুলির আন্তঃসম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি এই জটিল আবর্ত থেকে উত্থিত।

উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ধর্ম ভিত্তিক সম্প্রদায়গত চেতনা ছাড়াও বাংলার সামাজিক কাঠামোতে বর্ণ ভিত্তিক চেতনার সংগঠিত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, নমঃশূদ্রদের মতন তথাকথিত নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীগুলি ক্রমশঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয়েছে। নিম্নবর্ণের সামাজিক রাজনৈতিক চেতনার সংগঠিত প্রকাশের অর্থই ছিল চিরাচরিত বর্ণভিত্তিক হিন্দু সামাজিক, কাঠামোতে ভাঙন। সুতরাং একদিকে যেমন (মূলতঃ) বর্ণহিন্দুদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান বিংশ শতকের বাংলার সমাজে বর্ণহিন্দুদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করেছিল, অন্যদিকে তেমনি নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীগুলির স্বাধীন চেতনার প্রকাশ বর্ণহিন্দুদের আধিপত্যকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীগুলির এই সামাজিক প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় নিম্নবর্ণের শিক্ষিত ও চেতনাগতভাবে অগ্রবর্তী একটি ক্ষুদ্র অংশ। এই আন্দোলনগুলি হয়ে ওঠে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পাওয়ার হাতিয়ার। অন্যভাবে বললে নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীগুলি স্বাধীন আত্মসত্ত্বা নির্মাণের এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যা বাংলার সমাজ কাঠামোতে আলোড়ন তোলে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিভেদ ও অনৈক্যের সুযোগ নেয়।

৬.১.১.২ : ভারততাত্ত্বিক সম্পর্ক

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারততত্ত্বর বিকাশ আধুনিক ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল উদারনৈতিক ধর্ম সংস্কর আন্দোলনের বিকাশ। এর পিছনে একদিকে যেমন ব্রাহ্ম ধর্মের ভূমিকা ছিল, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যাসাগরের মতন কালজয়ী ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্রকে বিদ্যাসাগর আধুনিকতার প্রেক্ষিতে বিচার করেন এবং ব্যাখ্যা দেন। ভারততত্ত্বের আরে দুটি স্পষ্ট ধারা ছিল—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান ও (২) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আমাদের আলোচনার সময়সীমার বাইরে হলেও কয়েকটি সাধারণ কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ভারততত্ত্ব ঔপনিবেশিকতাবাদারে বিরুদ্ধে পাল্টা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দর্শনকে উপস্থিত করে। এখানে বৃদ্ধি ও জ্ঞানের চর্চা অনেক বেশি। বঙ্কিমের লেখায় কৃষ্ণ লোকত্তম রূপে আবির্ভূত যাকে আদর্শ পুরুষ রূপে ভারতবাসী স্বীকার করে নিতে পারে। দেশজ সংস্কৃতিতে বিদেশী শাসকবর্গ আদৌ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা বলে বঙ্কিম মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধারনা বস্তুতপক্ষে ভারতীয় সমাজের সার্বভৌমিকতার পক্ষে সওয়াল করে এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিস্পর্ধী মতাদর্শ রূপে আবিভূত হয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের ভারততত্ত্ব যার ভিত্তি গীতার ব্যাখ্যা অনুশীলন তত্ত্ব এবং কৃষ্ণকে নরোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠা কথা—মূলতঃ একটি রাজনৈতিক—সাংস্কৃতিক মতাদর্শ ও দর্শন যা ঔপনিবেশিক শাসনে লুপ্ত হয়ে যাওয়া ভারতীয়ত্বকে পুননির্মান করতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ আন্দোলনের মূল ভিত্তি একদিকে সর্বজন প্রীতি, অন্যদিকে বেদান্ত। এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল রামকৃষ্ণ মিশন। ভারতীয়ত্ত্বর যে তাত্ত্বিক ধারনা বঙ্কিমের লেখায় এসেছিল। শিব জ্ঞানে জীব সেবার মধ্যদিয়ে তাকে দারিদ্র্যজীর্ণ ভারতের মাটিতে নামিয়ে আনল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলন। বঙ্কিমের ভারততত্ত্ব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর ভারততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত প্রেমের উপর, সর্বজনপ্রীতির উপর, ভালোবাসার উপর।

বিংশ শতকের ভারততত্ত্ব কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভারততত্ত্ব থেকে অনেকটাই আলাদা। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের চিন্তায় দেশ ও জাতির কল্পনা জ্ঞান থেকে প্রেমের ডানাতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। এর মধ্যে তাৎক্ষণিক কোন রাজনৈতিক চাহিদা ছিল না। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সাময়িক রাজনৈতিক প্রয়োজন অনেক বেশি হয়ে দাড়ায়। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফলগুলি পরিত্যাজ্য ছিল না। কিন্তু বিংশ শতকের চরমপন্থার দ্বারা প্রভাবিত ভারততত্ত্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কোন ইতিবাচক দিক দেখতে পায়নি। এই প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রীপাঠীর মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে।

‘‘পাশ্চাত্য সভ্যতার যেসব ত্রুটির কথা বিবেকানন্দ বন্ধুর মতো বলেছিলেন, স্বজাত্যভিমানে চরমপন্থীরা সেগুলির নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু নিরাময়ের কথা ভাবেননি। তাঁদের বোধের পরিধির বাইরে ছিল বলেই পশ্চিমের সমস্ত কিছুই দুঃসহ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। বিবেকানন্দর আত্মসমালোচনার ক্ষমতা তাদের ছি না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ধর্ম বলে খ্রীস্টধর্মের প্রতি তাঁদের বিরূপতা গোপন থাকেনি। অথচ হিন্দুধর্মের ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হতেও পারেনি। চরম পন্থীদের দেশপ্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতা ছিল প্রশ্নাতীত, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে দৃষ্টির স্বচ্ছতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন।’’

চরমপন্থার দ্বারা প্রভাবিত ভারততত্ত্ব অতীত ভারতের গরিমা প্রচারে ব্যস্ত ছিল, তার নেতিবাচক রক্ষণশীলতা সম্পর্কে সচেতন ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলন এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা অনুধাবন করার মতন ক্ষমতা তাদের ছিল না। যেমন বিপিনচন্দ্র পালের মনে হয়েছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একটি আধ্যাত্মিক উদ্যোগ অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন যে অরবিন্দর বিচারে স্বরাজ্যের প্রকৃত তাৎপর্য ছিল—আধুনিক পরিবেশে প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠা; জাতীয় গৌরবের সত্যযুগের পুনরুজ্জীবন, বিশ্বমানবের সুর রূপে তার পূর্ব ভূমিকা পুনগ্রহণ।' এই বিচার সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই ভারততত্ত্বের মূল শিকড় নিহিত রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণযুগের কল্পনায়। এই স্বর্ণযুগের কল্পনার পিছনে সক্রিয় ছিল আর্য শ্রেয়োমন্যতা যা তীব্র ভাবে সমালোচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখায়। বিংশ শতকের চরমপন্থা প্রভাবিত ভারততত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল প্রাচীন ভারতের গরিমা সম্পর্কে যুক্তিহীন গরিমাবোধ। অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র পাল উভয়েরই ধারণা ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে তুলনীয় কোন কিছুই এখন পর্যন্ত পশ্চিমে গড়ে ওঠেনি। বর্ণব্যবস্থার দুঃসহ কুফল অরবিন্দ বা বিপিনচন্দ্রের চোখে পড়েনি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগের' উপর গীতার প্রভাব অতি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এই পুরো প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বৈদিক সংস্কৃতি, আর্য সভ্যতার দীপ্তি ও প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণযুগকে ইতিহাসের ব্যাখ্যা দ্বারা মহিমান্বিত করার প্রয়াস। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিতে এর দীর্ঘমেয়াদী ছাপ পড়ে এবং তাতে মুসলিম মানুষ মূল জাতীয়তাবাদী স্রোত থেকে দূরে সরে যায়। এমনকী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল ('গোরা' লেখার আগে পর্যন্ত) চিরাচরিত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে সযত্নে রক্ষা করে রাখে ব্রাহ্মণরা। এই কাল পর্বে ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। 'ব্রাহ্মণ' নামক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাবে লেখেন, ''সেই বৃহৎ সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবার ও বিধি বিধান স্মরণ করাইয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণদের উপর ছিল। ব্রাহ্মণ এই সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক এই কার্যসাধনের উপযোগী সম্মানও তাঁহার ছিল।

যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি ইউরোপীয় প্রণালীতে বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে, তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আদর্শ-স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন। ইহাই আদর্শ।...এই আদর্শ উন্নততম আদর্শ, এবং ভারতবর্ষের আদর্শ।" এই পর্বের লেখায় তিনি অতীতকে নতুন বল দিতে বলেন, নতুন প্রাণ দিতে বলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার 'গোরা' লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই সংকীর্ণ অতীত দৃষ্টি কাটিয়ে ওঠেন। 'গোরা' উপন্যাসের শেষের দিকের একটি পঙ্‌তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

''গোরা কহিল" মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলাম। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।

উপসংহারে বলা যায় বিংশ শতকের ভারততত্ত্ব মূলতঃ একটি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রকল্প, উনিশ শতকের মতন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রকল্প নয়। উনিশ শতকের ভারততত্ত্বে সবচেয়ে বেশি জোর পড়েছিল সমাজসংস্কারের

উপর। বিংশ শতকের ভারততত্ত্বের বিষয় নির্বাচন করা হল আর্য গৌরব গাথার কল্পনা নির্মাণের উপর। মুঘল ও ইংরেজদের হাতে পরাভূত 'হিন্দু' পৌরুষ তার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি পূরণ করতে চাইল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে স্বর্ণযুগের সভ্যতা কল্পনা করে। ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বঙ্কিমের কাছে যেখানে অনুশীলন তত্ত্ব ও বাঙালীর ইতিহাস চর্চা জরুরী ছিল, সেখানে বিংশ শতকে তা হয়ে দাড়াল হিন্দু গৌরব নির্মাণে এবং পাশ্চাত্যকে হীন প্রমাণের মধ্য দিয়ে। এই অর্থে 'ভারততত্ত্ব' মূলতঃ প্রতিনিধিত্ব করে 'বিংশ শতকের ঔপনিবেশিকতাবাদের বন্ধনে আবদ্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের 'আন্তকে'। এটি একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে উপস্থিত করে যা ভারতকে, তাঁর সংস্কৃতিকে, তাঁর ইতিহাসকে একটি বিশেষভাবে দেখতে শেখায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বীজ বপন করা হয়েছিল এই ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা।

৬.১.১.৩ : হিন্দু এবং মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আমাদের হাতে এমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মুঘল আমলে হিন্দুরা মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনায় খারাপ অবস্থায় ছিল। অথবা মুসলিমদের অবস্থা বেশি ভালো ছিল। বস্তুত মুঘল শাসকরা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমদর্শ নীতি নিয়ে চলত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার পর এই অবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে হিন্দুরা রাজের আনুকুল্য বেশি লাভ করে। ইংরাজী শিক্ষা, সরকারী চাকুরী, নতুন ভূমি বন্দোবস্ত প্রভৃতির উপর হিন্দুদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ে। ১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের পর ভারতশাসনের ভার সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে যায়। ১৮৮৫ খ্রীঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রথম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংগঠিত রাজনৈতিক চেতনার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য যে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী ও পরিপন্থী তা বুঝতে ব্রিটিশ সরকারের খুব দেরী হয়নি। তারা দ্রুত 'সংখ্যালঘু' মুসলিমদের (এমন কি অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরও) পৃথক করার জন্য উদ্যোগী হয়। বলা বাহুল্য এর লক্ষ্য ছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্য বিভাজন সৃষ্টি করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে মজবুত করা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সরকার নানা ধরনের প্রয়াস গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের বিংশ শতকে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বুঝতে হবে।

এটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বিংশ শতাব্দীর বাংলায় হিন্দুদের আর্থ সামাজিক অবস্থা সাধারণভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনায় ভালো ছিল। এর মূল কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কৃষিজমির উপর হিন্দুদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভবানী সেনকে উদ্ধৃত করে অমলেন্দু যে দেখিয়েছেন বাংলা দেশের সমস্ত জমিদারীর এক-তৃতীয়াংশ ছিল বৃহৎ ন'টি পরিবারের হাতে। এবং এরা প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু। এই ন'টি পরিবার ঔপনিবেশিক সরকারকে মোট রাজস্বের তিনভাগের একভাগ দেন যার পরিমাণ এক কোটি টাকা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল বর্ধমানের মহারাজা যার বাৎসরিক আয় ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। বড় জমিদারীগুলি বাদ দিয়েও যে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামো আমরা

দেখতে পাই তাও ছিল হিন্দু প্রভাবিত। যেমন ছোট জমিদারী, মধ্যস্তত্ত্বভোগী বিভিন্ন শ্রেণী প্রত্যেকেই ছিল মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়। পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষকরা ছিল মুসলিম এবং জমিদাররা ছিল হিন্দু। সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসলিম কৃষকদের অবস্থা এই সময় আদৌ ভালো ছিল না; তার কারণ বাংলার কৃষিতে অতি জটিল মধ্যসত্ত্বভোগী একাধিক শ্রেণীর বিকাশ। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষিজাত আয় কমে গিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি কৃষক শোষণের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯২৯-৩০ খ্রীঃ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটির প্রতিবেদনে দেখতে পাওয়া যায় যে বাংলাদেশে কৃষি পরিবারের বাৎসরিক উদ্বৃত্ত মাত্র ৩০ টাকা। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় বিংশ শতাব্দীর বাংলায় কি বিপুল পরিমাণে আর্থিক অসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরাই কিন্তু দারিদ্র্য পীড়িত ছিল। এর ফলে ছিল কৃষকরা নিদারুণ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯২৯-৩০ সালে বাংলার কৃষকদের ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। ১৯৩৪ খ্রীঃ এই পরিমাণ দাড়ায় ২১০ কোটি টাকা। অমলেন্দু দে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন ঋণভার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলস্বরূপ জমি হস্তান্তরের হার বহুগুণে বেড়ে যায়। কৃষকদের জমি মহাজন ও অ-কৃষিজীবী শ্রেণীর-হাতে চলে যায়। তিনি এই বিষয়ে ১৯৪০ খ্রীঃ Land Revenue Commission এর প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন, ''Free transferability has tended and maintained to facilitate the transfer of raiyati lands into the hands of mahajans and non-agriculturists, with the result that the number of rack-rented bargadars and under-raiyats is going up by leaps and bounds. It is as great a danger to the stability of the existing raiyats as their opportunities for subletting. এই তথ্য ও ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কিন্তু কৃষক শ্রেণীর অবস্থা ভালো ছিল না। ১৯৩০-১৯৪২ এর মধ্যে জমি হস্তান্তরের পরিমাণ অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে যায়। এই সময় তা অন্তত চারগুণ বৃদ্ধি পায়। এর থেকে বোঝা যায় যে গ্রামীণ বাংলার আর্থসামাজিক কাঠামোতে কি পরিমাণে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল যার ফল ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর।

মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল অতিসাধারণ কৃষক। ফলতঃ কৃষি অর্থনীতির উপর আঘাত এলে তা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলত। বিংশ শতকে বাংলার কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। সুগত বসুর গবেষণা থেকে দেখা গেছে এই সময় বাংলার কৃষি গভীর ভাবে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং আন্তর্জাতিক বাজারের বৃদ্ধি/মন্দা বাংলার কৃষি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করত। ১৯২৯-৩০ এর বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময় এই প্রভাব গভীরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ববাংলার প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের দাম মারাত্মক ভাবে পড়ে গেলে পূর্ববাংলার মুসলিম পাট চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। পশ্চিমবাংলার চাকুরীজীবী হিন্দুদের উপর এই মন্দার প্রভাব পড়লেও তা পূর্ববাংলার মতন এত সুদূরপ্রসারী ছিল।

সামাজিক বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় আশরাফ ও আজলাফ নামক দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শহরে বসবাসকারী মুসলিমদের একটি বড়ো অংশই ছিল উর্দু ব্যবহারকারী। গ্রামীণ বাংলয় মুসলিমরা ছিল বাংলাভাষী। এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক বিভাজন ছিল। বস্তুত আশরাফ ও আজলফরা ভিন্ন সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রতিনিধি ছিল। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখার দরকার যে হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে কিন্তু মুসলিম কৃষকদের

খুব বেশি সামাজিক যোগাযোগ ছিল না। অন্যদিকে আমরা কিন্তু দাঙ্গা বা ধর্মীয় সংঘর্ষের কোন তথ্য উনিশ শতকের আগে পাই না। বস্তুত দুটি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করছিল। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। পূর্ব বাংলায় 'ইসলামের' যে নির্মাণ হয়েছিল তার সঙ্গে কৃষি অর্থনীতির প্রসার ও স্থানীয় লোকসংস্কৃতির আত্তীকরণ উভয়ই জড়িত ছিল। এর ফলে পূর্ববঙ্গের ইসলাম প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে অনেক বেশি সহনশীল। এর সঙ্গে নগরভিত্তিক উর্দু প্রভাবিত আশরাফ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সাদৃশ্য ছিল না।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের দ্বারা সৃষ্টি শিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা যতখানি নিতে পেরেছিল মুসলিমরা তা প্রায় পারেনি বললেই চলে। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ ছিল হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যতখানি হয়েছিল মুসলিমদের মধ্যে তার কিছুই হয়নি। ১৮৭৪-৭৫ সালের একটি হিসেব থেকে দেখা যায় যে বাংলায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ২৯ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের এবং ৭০ শতাংশ হিন্দুসম্প্রদায়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরেই যেখানে মুসলিম ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা এত কম, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম অনুপাতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব আরো কমে যাবে এটাই স্বাভাবিক। ১৮৭৫ সালে কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ৫.৪ শতাংশ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের, যেখানে হিন্দুদের অনুপাত ছিল ৯৩.৯ শতাংশ। শিক্ষিত মুসলিমদেরপ মধ্যে মাত্র ১.৫০ শতাংশ ইংরাজীতে দক্ষ ছিল। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৪.৪০ শতাংশ। এই সংখ্যাতত্ত্বগুলি থেকে বোঝা যায় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর হিন্দু সম্প্রদায়ের কি অস্বাভাবিক মাত্রায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ফলে মুসলিম সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুদের তুলনায় চাকুরীর ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে। ১৮৭১ সালে মুসলিম সম্প্রদায় সরকারী চাকুরীর ৫.৯ শতাংশ দখল করেছিল, যেখানে হিন্দুদের অংশে ছিল ৪১ শতাংশ। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভূমি বন্দোবস্ত, শিক্ষা, সরকারী চাকুরী প্রভৃতি প্রায় সবকটি ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পশ্চাদগামিতা শুরু হয়েছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে। বাংলার ভূমি কাঠামোর উপর হিন্দু মুৎসুদ্দী, বেনিয়া প্রমুখদের সার্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৭ সালে ইংরাজী ভাষাকে রাজভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়, ফার্সি ভাষার অপসারণের ফলে ফার্সি শিক্ষিত মুসলিমরা সরকারী চাকুরী থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়, হিন্দুরা যতখানি দ্রুত ইংরাজী শিখে নিয়েছিল মুসলিমরা তা পারেনি। ফলে দীর্ঘমেয়াদীভাবে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর বৈষম্যের সৃষ্টি হয় যার রাজনৈতিক তাৎপর্য পরবর্তীকালে জটিল আকার ধারণ করে। বাংলায় সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এই বৈষম্যের চেহারাকে বিশ্লেষণ করা দরকার।

৬.১.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(1) Modern South Asia : Sugata Bose and Ayesha Jalal

(2) Modern India : Sumit Sarkar

(3) From Plassey to partition : Sekhar Bandyopadhyay

(4) Agrarian Bengal–Economy, Social Structure, Politics Sugata Bose

(5) Bengal–The Land Question : Partha Chatterjee

(6) The Muslims of British India : Peter Hardy

(7) The Nation and its Fragments : Partha Chatterjee

(8) The Bengal Muslims : 1871-1906 Rafiuddin Ahmad.

৬.১.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) বিংশ শতকের নূতন সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ তুমি কি বাংলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারো? এই প্রসঙ্গে রজতকান্ত রায়ের মত আলোচনা কর।

(২) বিংশ শতকের বাংলায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্কৃতির বিকাশ ব্যাখ্যা করো।

(৩) বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় যে ভারততাত্ত্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে কি তুমি হিন্দু চেতনার বিকাশ দেখতে পাও?

(৪) বিংশ শতাব্দীর বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যে যে শিক্ষাগত ও সামাজিক বৈষম্য গভীর আকার ধারণ করেছিল তার উৎস কি বাংলার আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসে লুকিয়ে আছে?

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-১

TOWARDS 20TH CENTRURY BENGAL AND GROWTH OF NATIONALISM

বাংলায় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঃ রাজনৈতিক সভা-সমিতির আত্মপ্রকাশ ও গণ প্রতিরোধ-কৃষক অভ্যুত্থানের গতিপ্রকৃতি

একক-২

(a) New Political Ideas

(b) Political Associations

(c) Administrative Measures, Popular Response, Peasant and Tribal Protests.

বিন্যাস ক্রম

৬.১.২.০ : উদ্দেশ্য

৬.১.২.১ : নতুন রাজনৈতিক ভাবধারা ও আদর্শ

৬.১.২.১.১ : ভূমিকা

৬.১.২.১.২ : পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও জাতীয় জাগরণ

৬.১.২.১.৩ : পশ্চিমী রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও বাংলার পরিবর্তিত ভাবজগৎ

৬.১.২.১.৪ : উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ও নয়া রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উন্মেষ ও প্রসার

৬.১.২.১.৫ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যলালিত জাতীয় চেতনা ও স্বাজাত্যবোধ

৬.১.২.২ : বাংলায় রাজনৈতিক সভা-সমিতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

৬.১.২.২.১ : পটভূমি

৬.১.২.২.২ : প্রাথমিক পর্বের সংগঠনসমূহ

৬.১.২.২.৩ : মহাবিদ্রোহ-পরবর্তীকালে গঠিত বাংলার রাজনৈতিক সভা-সমিতি

৬.১.২.৩ : জাতীয় জাগরণের প্রেক্ষাপট : জনবিরোধী প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ও কৃষক-আদিবাসী বিদ্রোহ

৬.১.২.৩.১ : প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ ও গণ অসন্তোষ
৬.১.২.৩.২ : বাংলার গণপ্রতিরোধ ও সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানসমূহ
৬.১.২.৩.৩ : অরণ্যচারী উপজাতি-আদিবাসীদের বিদ্রোহ
৬.১.২.৪. : সংক্ষিপ্তসার
৬.১.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
৬.১.২.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.১.২.০ : উদ্দেশ্য

সংশ্লিষ্ট পাঠটির উদ্দেশ্য হল একটি পরাধীন জাতির শোষণ-বঞ্চনা-অবমাননা-বর্ণবৈষম্যের কৃষ্ণগহ্বর থেকে উঠে আসার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হওয়া। ব্রিটিশ শাসনাধীনে স্বাধীনতার কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা গিয়েছিল বাংলা থেকে। অবিভক্ত বাংলার জনগণ সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশিকরণের বিরুদ্ধে বহুমুখী ধারায় সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার বাংলার মানুষের চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়েছিল। সেই চেতনা আবর্তিত হয়েছিল গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, উদারনৈতিক প্রভৃতি পশ্চিমী আধুনিক রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাগুলিকে অবলম্বন করে। শিক্ষিত যুবসমাজ সেই ভাবাদর্শকে সামনে রেখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিল। জন্ম নিয়েছিল একটির পর একটি রাজনৈতিক সংগঠন। জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের এই অনুকূল প্রতিবেশ তৈরির অন্তরালে ছিল উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতি। এসবের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক সরকারের শোষণ-শাসন বিস্তৃত গ্রামবাংলায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের বিশেষত সমাজের প্রান্তস্থিত নিম্নকোটির জনগণ, কৃষক, কারিগর শ্রেণীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অত্যাচার-নিপীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শুরু হয়েছিল সেইসব শোষিত মানুষজনের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। সমগ্র উনিশ শতক ধরে একটির পর একটি গণ অভ্যুত্থান ও কৃষক বিদ্রোহ বিদেশি শাসকপ্রভু ও তাদের দেশীয় সহযোগী-জমিদার-ইজারাদার, মহাজনদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। পিছিয়ে ছিলনা জঙ্গলনিবাসী আদিবাসী-উপজাতিরা। সাঁওতাল বিদ্রোহসহ একাধিক উপজাতীয় বিদ্রোহ কখনও কখনও ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল। এসবই বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। জাতীয়তাবাদের উত্থানের সেই প্রেক্ষিত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বর্তমান পাঠটি অত্যন্ত জরুরী।

৬.১.২.১ : নতুন রাজনৈতিক ভাবধারা ও আদর্শ (New Political Ideas and Ideologies)

৬.১.২.১.১ ঃ ভূমিকা (Introdcution)

ঔপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমবিস্তার সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ধরে দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে যেভাবে আলোড়িত করেছিল তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিল বহুমুখী। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তা পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিল। সব মিলিয়ে সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে রূপান্তর ঘটে চলেছিল তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ

একদা নতুন নতুন রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিমী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার সাথে সাথেই জাতীয়তাবাদ, উদারনৈতিকতা, গণতন্ত্র ও স্বশাসন-স্বরাজের আদর্শ এ-দেশে প্রবেশ করেছিল এবং প্রধানত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীরা সেই নতুন নতুন ভাবধারাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। এর পরিণামে জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে চলে ক্রমান্বয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, গণ প্রতিরোধ, প্রতিবাদ এবং সর্বোপরি, রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকে। এই পরিবর্তনের জোয়ারে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় সবার আগে প্লাবিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলা। বলা বাহুল্য, এর ঐতিহাসিক কারণটি দুর্বোধ্য ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা যেমন হয়েছিল বাংলায় তেমনি দীর্ঘ সময় ধরে (১৯১১ সাল) পর্যন্ত কলকাতাই ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের কেন্দ্রস্থল তথা এশিয়ার অন্যতম অগ্রগণ্য আলোকপ্রাপ্ত নগরী। বস্তুত, কলকাতা থেকেই নব নব রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারা বাংলা তথা ভারতের নানা অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। এই পটভূমিতেই উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন।

৬.১.২.১.২ ঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও জাতীয় জাগরণ (Spread of Western Education and National Awakening)

পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার এ-দেশে কার্যত, একদল উচ্চশিক্ষিত, সমাজসচেতন, মননশীল ও যুক্তিবাদী মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল যা চিন্ত ও চেতনার জগতে এক প্রকার বিপ্লব এনেছিল বললে অতিশয়োক্তি হয় না। স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী সেই তরুণ জনগোষ্ঠী ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রচলিত সনাতন ধর্মীয়-সামাজিক জীবনধারার পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিল। উনিশ শতকের সেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক দোলাচলে আধুনিকতার অনুসারী ঐ বুদ্ধিবিভাসিত শ্রেণীটি বাংলায় যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল তা নবজাগরণ বা রেনেসাঁ নামে পরিচিত। উনিশ শতকের বাংলার ভাবজগতে সেই আলোড়নকে অবশ্য কেউ কেউ প্রকৃত অর্থে ‘রেনেসাঁ’ (‘Renaissance’) বলতে রাজী নন। কিন্তু এ-ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কম যে পরিবর্তনের সেই বেগমান ধারা ক্রমশ জাতীয় চেতনার অভাবনীয় বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়েছিল। কে. এন. পানিক্কর যথার্থই বলেছেন, ‘...এইসব সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনগুলি প্রকৃতপক্ষে জায়মান জাতীয় জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।’[১]

এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই সহমত পোষণ করেন যে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার একাধারে বাংলায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল এবং পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আমদানি করা নতুন নতুন গণবাদী রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থার প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। অবশ্য ভারতের ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার এক দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ঘটেছিল। কোম্পানির প্রশাসন ১৭৭২ থেকে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সেরূপ কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। প্রাচ্যবাদ বনাম পাশ্চাত্যবাদ বিতর্কটি এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে চলে আসে। প্রথম গভর্নর জেনারেল তথা বাংলার প্রথম ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন প্রাচ্যবাদী ভাবধারার অনুগামী। প্রাচ্যবাদের প্রসারে তিনি যেমন বিবিধ

১. ‘...the socio-religious movement was an integral part of the evolving national consciousness’– K.N. Panikkar, *Indian struggle for Independence.*

উদ্যোগ নিয়েছিলেন তেমনি সংস্কৃত ও ফারসি-র মতো প্রাচ্যভাষার বিকাশে তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই ধারাকে আরও সংহত রূপ দেন লর্ড ওয়েলেসলি যিনি ১৭৯৮ সালে গভর্নর জেনারেল রূপে এ-দেশে আসেন। প্রাচ্যজ্ঞান সম্পন্ন একদল ইংরেজ আমলা-প্রশাসক তৈরি করতে তাঁর উদ্যোগে ১৮০০ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। উইলিয়াম কেরি-র মতো প্রতিভাবাবান খ্রিস্টান মিশনারিরাও প্রাচ্যভাষার উন্নতি ও প্রসারে বিশেষভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বস্তুত, ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক-এর শাসনকালে কোম্পানির প্রশাসন প্রথমবার এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে সরকারি দায়িত্বের কথা ঘোষণা করে। ইতিপূর্বে ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্থা General Committee of Public Instruction সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিল। তবে পাশ্চাত্যপন্থী মেকলের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রকৃত প্রবর্তন বেন্টিংকই করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল উডের বিখ্যাত শিক্ষা দলিল (Education Despatch)। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডঁার নির্দেশনামায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ক্ষেত্রে পশ্চিমী শিক্ষাধারার ওপরই বিশেষ জোর দেন। এই ধারাতেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় গতি এল এবং তিনটি প্রেসিডেন্সিতে ১৮৫৭ সালে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করলো। সেই বিষয়ে পরবর্তী উদ্যোগটি ছিল ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে উপরোক্ত প্রশাসনিক উদ্যোগের বাইরে প্রাথমিকপর্বে অবশ্য ইউরোপীয় মিশনারিরা ও ডেভিড হেয়ার, বেথুন প্রমুখ হিতবাদী পশ্চিমী মনীষীদের অবদানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে প্রধানত রামমোহন এ-বিষয়ে নিরলস প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

৬.১.২.১.৩ ঃ পশ্চিমী রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও বাংলার পরিবর্তিত ভাবজগৎ (Western Political Ideas and Changed Intelligentisa of Bengal)

পশ্চিমী শিক্ষা আলাদাভাবে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের সূত্রে এই দেশের মানুষ পাশ্চাত্যের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করে। এর পরিণতিতে কূপমণ্ডুকতার অবসান ঘটেছিল এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের ফলস্বরূপ কুসংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটেছিল। এর পরিণামে জাতীয় চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। সমগ্র উনিশ শতক ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রসারের ফলে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বাংলার মানুষ ক্রমে পশ্চিমী গণতন্ত্র, উদারতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়। তারা এভাবে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারের দরজাও তাদের সামনে খুলে যায়। রুশো, ভলতেয়াব, টম পেইন, লক, হিউম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ইউরোপীয় বা আমেরিকান দার্শনিক-চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের রচনা ও ভাবাদর্শ শিক্ষিত বাঙালি বোদ্ধাজগৎকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশে দেশে সংঘটিত জনগণতান্ত্রিরক আন্দোলনের কাহিনিও তাদেরকে উদ্দীপ্ত করেছিল। আমেরিকানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, যুগান্তকারী ফরাসি বিপ্লব এবং ইটালি ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলন উক্ত শ্রেণীর মানুষদের নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জর্জ ওয়াশিংটন, জন এ্যাডামস্, আবে সিঁয়ে, মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও আইরিশ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ তাদের মনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

পরাধীনতার গ্লানিবোধ থেকে জন্ম নিল একটি আপোষহীন জাতি যারা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-অবিচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। দেশীয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, ইতিহাস চর্চায় অতঃপর পরিবর্তন স্থান গ্রহণ করেছিল; পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয় ভাবাবেগে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সর্বভারতীয় ঐক্যচেতনা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এযাবৎ প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল একাধিক আঞ্চলিক ভাষার উপস্থিতি যা সংহতিবোধেরও পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ইংরেজি ভাষার প্রসার স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভেদাভেদ দূর করতে অনেকাংশে সক্ষম হয় এবং তা বিভিন্ন অঞ্চলের সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধন ও সংহতিগঠনে জোরালো ভূমিকা পালন করে। এভাবে শিক্ষিত দেশবাসী সেদিন জাতীয় চেতনার বিকাশের পথ সুগম করে দিয়েছিল বললে অতিশয়োক্তি হয় না। পশ্চিম থেকে আগত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মতো ভাবধারাগুলি এককথায়, আলোচ্য সময়কালে অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলার ভাবজগতে এক দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন বয়ে এনেছিল।

৬.১.২.১.৪ ঃ উনিশ শতকর বাংলার নবজাগরণ ও নয়া রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উন্মেষ ও প্রসার ((Nineteenth Century Bengali Renaissance and emergence of New Political Ideas)

বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সংস্কৃতি ও চেতনার জগতে যে প্রবল আলোড়ন উঠেছিল তা অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদের কাছে 'নবজাগরণ' (Renaissance) নামে পরিচিত। সেই দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল নবজাগ্রত রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবাদর্শ। ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে পশ্চিমী শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নজিরবিহীন বিস্তারের প্রেক্ষাপটেই সেই নবজাগরণ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

উনিশ শতকের বাংলায় ভাবজগতের সেই পরিবর্তনের ধারাকে অবশ্য কোনও কোনও পণ্ডিত 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ বলতে রাজী হননি এবং কারও কারও মতে সেই 'তথাকথিত নবজাগরণ' (Socalled Renaissance)[২]-এর প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতাগুলি বড় বেশি বিসদৃশ ছিল। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ[৩] ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয় ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত সেই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে রেনেসাঁ পদবাচ্য মনে করেন না। তিনি এই নবজাগরণকে যুগপৎ 'অতিকথা' (Myth) এবং 'ঐতিহাসিক ছলনা' (historical hoax) বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এরূপ ভিন্নমত সত্ত্বেও ঐতিহাসিক-গবেষকদের একটি বিশাল অংশের নিকট উনিশ শতকীয় নবজাগরণ ছিল তার আপন মহিমায় ভাস্বর। নতুন রাজনৈতিক চেতনা তথা জাতীয়তাবাদের বিকাশে উনিশ শতকের রেনেসাঁ ও তার অন্যতম উপজীব্য হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-ঐতিহ্যচর্চা এবং আধুনিক চিন্তাভাবনার আলোকে তার যুগোপযোগী ব্যাখ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদারের[৪] মতে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপে উদারনৈতিকতা, উপযোগবাদ ও জাতীয়তাবোধের মতো যেসব দার্শনিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছিল উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনাধীনে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পরিণতিতে সেগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; সূচিত

২. Asoke Mitra, I.A.S.

৩. বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি

৪. R. C. Majumder, History of Bengal

হয়েছিল নবজাগরণ। যদুনাথ সরকার ও রজনীপাম দত্তের মতো ইতিহাসবিদরাও ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাংলার এই নবজাগরণকে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন। ঐতিহাসিক সুশোভন সরকারও[৫] উনিশ শতকের রেনেসাঁর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে মতাদর্শগতভাবে বাংলার নবজাগরণ ছিল উদারপন্থা, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ আশ্রয়ী।

অবশ্য এই প্রশ্নে দ্বিমত প্রায় নেই বললেই চলে যে বাংলার নবজাগরণ মূলত আলোকিত করেছিল শিক্ষিত, উচ্চকোটির অন্তর্গত মধ্যবিত্ত সমাজকে; আপমার জনসাধারণ এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়নি। পণ্ডিত নেহরুও তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থে প্রায় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে উচ্চবর্গীয় বাঙালি হিন্দুরাই প্রধানত নবজাগরণপ্রসূত জ্ঞানদীপ্তির প্রসাদ লাভ করেছিল। অমলেশ ত্রিপাঠীও প্রায় সমরূপ মতের অনুসারী হয়ে বলেছেন যে বাঙালি বেনিয়া ও নয়া ভূম্যধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা সমৃদ্ধ তাই নবজাগরণের উপযুক্ত নেতৃত্ব ছিল না। তবে এসব সমালোচনার উত্তরে অনেকে বলে থাকেন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীই সেযুগে প্রবল আগ্রহে পশ্চিম থেকে আগত নতুন নতুন রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে গ্রহণ করেছিল এবং তার পরিণতিতে প্রসারিত হয়েছিল জাতীয় চেতনা, সূচিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ। নবজাগরণের এই অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার একদা মন্তব্য করেছিলেন ঃ '...It was truly a Renaissance, wider, deeper and more revolutionary than that of Europe...'[৬]

যাইহোক্ নবজাগরণের রূপকাররা পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-রাজনীতি চর্চার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে ভারতের ঐতিহ্যময় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ও আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে ভারতের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে দেশবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং আত্মবিশ্বাস ও স্বাভিমানবোধ ফিরে এসেছিল। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটেই উনিশ শতকব্যাপী আত্মপ্রকাশ করেছিল একের পর এক রাজনৈতিক সমিতি-সংগঠনগুলি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও দেশপ্রেমী ভারতবাসীর উত্থানের, প্রেক্ষাপটে তৈরি করে দিয়েছিল রেনেসাঁর আলোকপ্রাপ্ত রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিরা। বলাবাহুল্য, নবজাগরণের প্রদর্শিত পথে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে নতুন ভাবাদর্শ সজ্জিত আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল। প্রাচ্যবাদ ও পাশ্চাত্যপন্থা-এই দুই আপাত-বিপরীত বিচারধারার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ মেলবন্ধনের মধ্য দিয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।

৬.১.২.১.৫ ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যলালিত জাতীয় চেতনা ও স্বাজাত্যবোধ (National consciousness and Partiotism, sponsored by Bengali Language and Literature)

পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও অভাবনীয় বিকাশ সাধিত হয়েছিল যা কার্যত, জাতীয় চেতনা ও স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যগ্রন্থ

৫. Sushobhan C. Sarka, Bengal Renaissance...

৬. J. N. Sarkar, History of Bengal.

ও প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি এককথায়, উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের পটভূমি বহুলাংশে প্রস্তুত করেছিল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সম্পাদকরা তাঁদের রচনায় নানাভাবে পরাধীন দেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য-শোষণ বঞ্চনার কথামালা গেঁথেছিলেন এবং পাশাপাশি বিদেশি শাসক-প্রভুর জনবিরোধী নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে বাংলার মতো আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষাগুলি আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে বিদেশি শাসকরা তাদের নিজ স্বার্থেই প্রয়াসী হয়েছিল। তাদের আগ্রহেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যেমন রচিত হয়েছিল, সংকলিত হয়েছিল অভিধান, তেমনই গদ্য সাহিত্যের বিকাশেও তাদের অবদান ছিল প্রশ্নাতীত। বিদেশি শাসককুলের পাশাপাশি খৃস্টান মিশনারিরাও যেমন গিলখ্রিষ্ট, গ্ল্যাডউইন, উইলিয়াম কেরি প্রমুখ বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। ছাপাখানা ও তার অনুষঙ্গ হিসেবে মুদ্রিত গ্রন্থের আবির্ভাব বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে অতিশয় সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের নিবিড় সম্পর্কও এভাবে স্থাপিত হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল বাংলা হওয়ায় সেদিন বাংলা সাহিত্যেই সর্বপ্রথম বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল। বাংলা ভাষায় কবিা, কথাসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, প্রবন্ধ ও রম্য রচনা লেখার মধ্য দিয়ে যাঁরা একাধারে বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং সাথে সাথে বাঙালি জাতিকে দেশাত্মবোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন....তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭০), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), নবীনচন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮১৫-৯৬), অক্ষয় কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩০-৭৮) এবং সর্বোপরি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; নাট্যকার ও নির্দেশক রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬), দীনবন্ধুমিত্র (১৮১৯-৭৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যারত্ন (১৮৬৩-১৯২৭); ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩২-৯৪), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), প্যারিচাঁদ মিত্র; প্রাবন্ধিক ও গদ্যশিল্পী স্বামী বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিও নতুন ধ্যানধারণার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনমত গঠনে সংবাদপত্রগুলি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এ. আর. দেশাই অত্যন্ত সংগতভাবে বলেছেন 'The Press was a powerful factor in building and developing Indian nationalism?[৭] জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীশ্রেণী তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করতো পত্রপত্রিকাগুলির মাধ্যমে। ক্রমে উপনিবেশিক তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসকপ্রভুদের বিরোধিতার শক্তিশালী আয়ুধ হয়ে ওঠে সংবাদপত্র সমূহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি হল 'সম্বাদ কৌমুদি', 'সম্বাদ প্রভাকর', 'সোমপ্রকাশ', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বঙ্গদর্শন', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি। এভাবে সাহিত্যিকার ও সাংবাদিকরা জনমত গঠনে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রতিবাদী সাহিত্য ও সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করতে শাসক প্রভুরাও নানা কালাকানুন তৈরি (যেমন ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন প্রণীত মাতৃভাষায় সংবাদপত্র আইন) করতে পিছপা হয়নি। তারা লেখার মাধ্যমেও মতপ্রকাশকে অনুমোদন দেয়নি।

৭. A.R. Desai, Social Background of India National Movement.

৬.১.২.২ : বাংলায় রাজনৈতিক সভা-সমিতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of Political Association in Bengal)

৬.১.২.২.১ ঃ পটভূমি (Background)

উপরোক্ত বৃহত্তর প্রেক্ষিতে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের সূত্র ধরে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অংশে একের পর এক রাজনৈতিক সংগঠন-সভা-সমিতি সমগ্র উনিশ শতসক ধরে গড়ে উঠেছিল। ড. অনিল শীল ঊনবিংশ শতাব্দীকে তাই 'The Age of Associations' বা 'সভা-সমিতির যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, Associations brought nineteenth-century India across the threshold of modern politics.'[৮] এই কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিক যথার্থই বলেছেন যে আদিপর্বের সমিতি ও সংস্থাগুলি প্রেসিডেন্সি-রাজধানীসমূহে অর্থাৎ কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এই তিনটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কারণ ঐসব অঞ্চলেই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং কোম্পানির প্রশাসনের সংহতরূপ সনাতন চিন্তাধারা ও ব্যবস্থাকে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত দেশবাসী ঐসব সংস্থা-সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তারা সবাই ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিকে যেমন গ্রহণ করেছিল তেমনি শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শেরও শরিক হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গড়ে ওঠা সভা সমিতিগুলির সূতিকাগৃহ বলা যেতে পারে হিন্দু কলেজ ও তার পারিপার্শ্বিককে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এগারো বছর পর এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা গঠন করেছিল তাদের নিজস্ব সংগঠন 'Academic Association'। 'নব্যবঙ্গ' নামে পরিচিত ছাত্রমণ্ডলী বিশিষ্ট শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। নব্যবঙ্গ-দের রাজনীতি গজদন্তখচিত মিনারে অবস্থান করলেও তার প্রভাব ছিল দূরবর্তী ও সুদূরপ্রসারী। ১৮৩৮ সালে অপর একটি ছাত্র সম্মিলনী—'Acquisition of General Knowledge' ও বাংলায় ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জমি প্রস্তুত করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। ১৮৪৩ সাল নাগাদ ও সংগঠনের ২০০ মতো সদস্য যাদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, বাঙালির জাতীয় চেতনাকে বহুলাংশে সংহত ও সম্প্রসারিত করেছিলেন। অসংখ্য পত্রপত্রিকা সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট গড়ে তুলেছিলেন।

৬.১.২.২.২ ঃ প্রাথমিক পর্বের সংগঠনসমূহ (Organisation of the Primary Phase)

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ সমগ্র উনিশ শতক ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনমত গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিল। এই বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলা তথা ভারতে জাতীয় জাগরণ সূচিত হয়েছিল তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। তিনি ছিলেন এদেশে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সংগঠক। রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামমোহনের প্রয়াণের পর তাঁর রাজনৈতিক চেতনার অনুসারী তাঁর সহযোগী ও অনুগামীবৃন্দ প্রাক্-মহাবিদ্রোহ পর্বে প্রথম রাজনৈতিক উপাদানবিশিষ্ট একটি

৮. A. Seal, **The Emergence of Indian Nationalism,** CUP, P. 194

সংস্থা গঠন করেন। ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সেই সংগঠনটির নাম 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'। এই সংস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন রামমোহনের একদা সহকর্মী ও সুহৃদ দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ। অনেকের মতে এটিই ছিল 'বাংলার প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান'। বাংলা ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি এই সংস্থাটি জনসাধারণের পক্ষ নিয়ে কোম্পানির প্রশাসনের নানাবিধ জনবিরোধী ও পীড়নকর নিয়ম-নীতি-আইন-কানুনের সমালোচনা করত এবং সেসব প্রত্যাহারের দাবি জানাত।

ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিনদারস্ এ্যাসোসিয়েশন (Landholders' Society or Zamindars' Association) ঃ 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'-র দুই বছরের মধ্যেই ১৮৩৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিদার-সভা। এটিই ছিল আধুনিক ভারতের আদিতম রাজনৈতিক সংগঠন। প্রাথমিকভাবে এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সির ভূম্যধিারী অর্থাৎ জমিদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা। কিন্তু এই সমিতির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে এদেশের সমস্ত মানুষের কল্যাণে ব্রতী হওয়া। এই সংস্থা 'ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিটি জেলায় শাখা খোলার পরিকল্পনা নিয়েছিল এবং ইংল্যাণ্ডের একজন ইংরেজ নাগরিকের সমান অধিকারের দাবি জানিয়েছিল।'[৯] এই সংস্থার সঙ্গে রাজা রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মতো প্রভাবশালী ভূস্বামীরা সম্পর্কিত ছিলেন। নামকরণে জমিদারদের সংগঠন হলেও এই সমিতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক বা রায়তদের নানাবিধ দাবি আদায়েও সক্রিয় ছিল। সরকারের নিকট নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একাধিক দাবি দাওয়া পেশ করে সংস্থাটি ইংরেজ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অনিল শীল এই সংস্থাটিকে কলকাতাস্থ 'প্রেসারগ্রুপ' বলে উল্লেখ করেছেন।[১০]

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (Bengal British India Society) ঃ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। এটি সাধারণভাবে সব শ্রেণীর ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষায় ('....protection of the interests of all classes') নিবেদিত প্রাণ ছিল। পূর্বতন ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির চেয়ে এই সংস্থার জনপ্রিয়তার পরিধি অনেক বেশি ছিল। ভারতের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে, জাতি-ধর্ম-জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সক্রিয় ছিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। 'বেঙ্গল হরকরা' (২৪ এপ্রিল, ১৮৪৩)-য় বলা হয়েছিল ঐ সংগঠনটি ছিল আইনানুগ ও শাসনতান্ত্রিক প্রকৃতির। উপরোক্ত সংস্থা দুটির মধ্যে এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় ছিল। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইট যখন জমিদারদের অধিকার রক্ষায় সতর্ক ছিল, অন্যদিকে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি আলাদাভাবে সেটির উদ্যমী সচিব প্যারীচাঁদ মিত্র তখন জমিদারি ব্যবস্থার সমালোচনার মাধ্যমে কৃষক শ্রেণীর অধিকার রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন। দুটি সংগঠনই শেষ অবধি স্থায়িত্ব পায়নি।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (British Indian Association) ঃ ১৮৫১ সালে পূর্বোক্ত সংগঠন দুটি মিলে মিশে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমিতির প্রথম

৯. B. B. Majumdar, **History of Political Thought from Rammahun to Dayananda (1821-84).** Vol. 1. Kolkata, 1934, PP. 163-4.

১০. Anil Seal, **Op.cit** p. 198.

সভাপতি ছিলেন। এই সংস্থার সাথে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্রের মতো বিশিষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত তিনটি প্রেসিডেন্সিতে স্থাপিত এই ধরনের এ্যাসোসিয়েশনগুলির হাতেই ভারতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত ছিল।[১১] এই সময়কাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তনের সময়। বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সবিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই সংস্থা শিক্ষিত ভারতীয়দের জন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ বাড়ানোর দাবি তোলে। ১৮৫৬ ও ১৮৬০ সালে সংস্থা একই সাথে ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানায়। ১৮৬১-র কাউন্সিল এ্যাক্টের তারা তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অল্প কথায় বলা যায়, 'After the foundation of British India Assocation in 1851 in dominated Indian political life in the Presidency.' এই সংস্থার অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল ১৮৫৪-র পুরবিলের বিরোধিতা এবং ১৮৫৫ সালে লবণের ওপর সরকারের একচেটিয়া মালিকানার বিরুদ্ধাচরণ এবং ১৮৬০ সালে একটি দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিল গঠন। এই সংস্থার সংবাদপত্র-হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি কাগজ। বলাবাহুল্য, কলকাতা শহরেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় ছিল। কিন্তু এই সংস্থাও শেষ অবধি তার শ্রেণী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আমজনতার রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে পারেনি। এখানেই ব্রিটিশ ভারত সভা-র মূল সীমাবদ্ধতা ছিল।

৬.১.২.২.৩ ঃ মহাবিদ্রোহ-পরবর্তীকালে গঠিত বাংলার রাজনৈতিক সভা-সমিতি (Political Associations of Bengal during post-mutiny period)

মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে আলাদাভাবে ১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত একাধিক জাতীয়বাদী রাজনৈতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই পর্বের সংগঠনগুলির নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটেছিল; জমিদার ও বিত্তশালী মানুষদের পরিবর্তে ১৮৫৭-৮৬ পর্যন্ত সময়কালে গড়ে ওঠা সংস্থাগুলির নেতৃত্বে আরও বেশি করে এসেছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন।[১২] এই পর্বের বাংলায় যুবসমাজ জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন ও সংস্থার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিল। বিশিষ্ট সংগঠক রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর সহযোগীরা ১৮৬৬ সালে গঠন করেন 'বাংলার শিক্ষিত জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনাবর্ধক সমিতি' বা 'Society for the Promotion of National Feeling among the Educative Natives of Bengal'। পরবর্তী বছরে ১৮৬৭-তে রাজনারায়ণ বসু ও তার সুহৃদ ও সহকর্মী নবগোপাল মিত্র গঠন করেন 'হিন্দু মেলা'। এই শেষোক্ত সংগঠনটির ঘোষিত দুটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে বাঙালি তথা ভারতবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং (২) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা। প্রতি বাংলা বছরের চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে হিন্দু মেলা-র বাৎসরিক অনুষ্ঠান হতো। স্বাদেশিকতার প্রসারে এই সংস্থাটির ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। 'হিন্দু মেলা'-র উদ্যোক্তারা ঐ সময়ে বাংলা ভাষায় কবি-সাহিত্যিকদের সম্মান জানাতেন। এর উদ্যোগে 'National Paper' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৮০ সাল অবধি প্রতি বছর নিয়ম করে হিন্দু মেলা অনুষ্ঠিত হতে। আলোচ্য পর্বের অপর একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'। এটির স্থপতি ছিলেন বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১. Anil Seal **op. cit,** p. 200.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' শীর্ষক স্মৃতিচারণে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গঠিত অপর একটি বিশিষ্ট সংস্থা ছিল 'ইণ্ডিয়ান লিগ' (Indian League)। ১৮৭৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় এই সংস্থাটি গড়ে তোলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ। এর সদস্যরা অধিকাংশই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত এবং পেশায় আইনজীবী। 'Englishman' পত্রিকায় এই সংস্থাকে 'রাজনৈতিক জীবনে ভারতবাসীর পদক্ষেপের প্রথম চিহ্ন' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই সংগঠন পৌর নির্বাচন ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ বিবাদের কারণে এই সংস্থাটি দীর্ঘায়ু হয়নি।

ভারত সভা (Indian Association) ঃ ১৮৭৬ সালে জুলাই মাসে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ভরত সভা' (Indian Association)। কংগ্রেস-পূর্ববর্তীকালীন সময়ে বাংলা তথা ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনটি ছিল ভারতসভা। মধ্যবিত্তরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ ও কৃষকরাও এই সংগঠনের সদস্য হতে পারত। বাংলায় স্থাপিত অথচ প্রকৃতি ও কর্মধারায় সর্বভারতীয় এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল ঃ (১) জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ শক্তিশালী জনমত গঠন করা, (২) একটি সাধারণ রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে বর্ণ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা, (৩) হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা ও (৪) জাতীয়তাবাদী জাগরণে সমাজের নিম্নবর্গের জনগণকেও সামিল করা। এই সংস্থার মুখপত্র ছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকা।

সুরেন্দ্রনাথ বাগ্মিতায় ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই রাজনৈতিক সংস্থার ছত্রছায়ায় সমবেত হয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ভারতসভার প্রায় ১২৪টির মতো শাখা ছিল। কালক্রমে অবিভক্ত ভারতের নানা শহরে-লক্ষ্ণৌ, মিরাট, লাহোর ও অন্যত্র এর অসংখ্য শাখা ও দপ্তর গঠিত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালের 'Rent Act'-র বিরুদ্ধে ও পাবনা কৃষক বিদ্রোহের সপক্ষে ভারতসভা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ১৮৮৪-তে প্রজাস্বত্ব আইনের খসড়ার বিরুদ্ধেও সভা রুখে দাঁড়ায়। সভা-র উদ্যোগে বাংলার জেলায় জেলায় 'Rent Union' নামের আড়ালে কৃষক সংগঠনগুলি গঠিত হয়েছিল। চা বাগিচার শোষিত ও লাঞ্ছিত কুলিদের পক্ষ নিয়েও এই সংস্থা সরব হয়েছিল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার বয়স ২১ থেকে ১৯-এ কমিয়ে হলে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই সমিতি। ১৮৭৮ সালের বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালে মাতৃভাষায় সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইন-এর মতো কালা কানুনের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতসভা দেশ-জুড়ে আন্দোলন শুরু করে। শেষ অবধি ১৮৮১-তে লর্ড রিপনের আমলে সংবাদপত্র আইন প্রত্যাহার করা হয়। ভারত সভা-র সাফল্য ও জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষনীয়।

ভারতসভার সবচেয়ে সাহসী উদ্যোগটি ছিল ইলবার্ট বিল বিষয়ক আন্দোলন। ১৮৮৩ সালের রিপনের আমলে এই প্রস্তাবিত বিলে ভারতীয় বিচারকদের ও অপরাধী শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার অধিকার দেওয়া হলে ইংরেজসহ শ্বেতাঙ্গ সমাজ যে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন শুরু করে তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর এসেছিল বিলের

১২. সমর মল্লিক, **আধুনিক ভারতের রূপান্তর (১৮৫৮-১৯৪৭)** পৃ. ২২২

সমর্থনে ভারতসভার সংগঠিত পাল্টা জন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনা দেশজুড়ে জাতীয়তাবাদের জোয়ার এনেছিল। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে ভারত সভা-র অভিজ্ঞতার দ্বারা আলোকিত সুরেন্দ্রনাথ 'নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন' আহ্বান করেন। 'জাতীয় পার্লামেন্ট' বলে পরিচিত এই সম্মেলনকেই অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো ইতিহাসবিদরা 'জাতীয় কংগ্রেসের সূতিকাগৃহ' বলে অভিহিত করেছেন। পরিশেষে ১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ভারতসভা তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাংলার যশস্বী বুদ্ধিজীবী ও নেতা সমর্থকরা জাতীয় কংগ্রেসের গঠনে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যাইহোক, এভাবে সমগ্র উনিশ শতক ধরে বাংলায় জাতীয়তাবাদী জনজাগরণের সুবিস্তৃত প্রেক্ষিত প্রস্তুত হয়েছিল। বাঙালির এই জাতীয় ভাবাবেগের লাগামহীন প্রসারে বিদেশি শাসককুল যে অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বড়লাট লড কার্জনের বাংলা বিভাগের কূট পরিকল্পনার মধ্যে। বলাবাহুল্য, জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি সেদিন ও সেই সরকারি অশুভ প্রসারের বিরুদ্ধে জীবনপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের পরতে পরতে সেই বীরগাঁথা বিধৃত আছে। বাংলার মানুষের প্রতিবাদের সামনে সরকার শেষ অবধি ১৯১১ সালে বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা বাতিল করেছিল।

৬.১.২.৩ : জাতীয় জাগরণের প্রেক্ষাপট ঃ জনবিরোধী প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ, বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ও কৃষক-আদিবাসী বিদ্রোহ (Perspective of National Awakening : Anti-people Administrative Measures, Spontaneous Resistances and Peasants'–Tribal Uprisings of Bengal)

ভারতে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী জাতীয় জাগরণের উৎস নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বহুমাত্রিক ইতিহাসের গভীরে। এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ও তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ নির্লজ্জ লুণ্ঠন-শোষণ পরাধীন জনগণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল; এক সময় তা বিদেশি শাসনবিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান, বিদ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই জনগারণের চূড়ান্ত রূপ ছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ যা শতাব্দী প্রাচীন ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ প্রশাসকরা দমনপীড়ন চালিয়ে সেইসব বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান নিয়ন্ত্রণে এনেছিল ঠিকই কিন্তু তা ঔপনিবেশিক ভারতে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের জমি প্রস্তুত করে দিয়েছিল। অতঃপর জাতীয়তাবাদী, স্বদেশী, বৈপ্লবিক, শাসনতান্ত্রিক প্রভৃতি ভিন্ন ধারার স্বাধীনতা সংগ্রাম অচিরেই শুরু হয়েছিল এবং পরিশেষে বিদেশি শাসন-শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বাধীন, সার্বভৌম ভারত।

৬.১.২.৩.১ ঃ প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ ও গণ অসন্তোষ (Administrative Measures and Peoples' Discontent)

ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব থেকে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের জনবিরোধী রূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল। কোম্পানির শাসনাধীনে প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমল থেকে লর্ড ডালহৌসির শাসনকাল পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময়ে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শাসন কায়েম হলে যে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো গড়ে

উঠেছিল তার প্রধান লক্ষ্য ছিল এদেশে যেনতেনপ্রকারেন ব্রিটিশ স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখা। বিদেশি শাসক প্রভুদের এই 'নেটিভ'দের স্বার্থের পরিপন্থী কুশলী নীতির পরিচয় মেলে তাদের প্রণীত আইন বিধি ও শাসন পদ্ধতির মধ্যে। ১৭৭৩-র রেগুলেটিং এ্যাক্ট (Regulating Act); ১৭৮৪-র পিটের ভারত আইন (Pitt's India Act), এবং ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩, ১৮৫৩, ১৮৬১, ১৮৯২ সালের সনদ আইন (Charter Act) ও ভারতীয় কাউন্সিলস্ আইনগুলি বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত সত্যটি দিবালোকের মতো সামনে আসে। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাদেশিকতার প্রসারকে রোধ করতে সময়ে সময়ে মাতৃভাষায় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্রআইন, রাওলাট আইন-এর ন্যায় নানাবিধ 'কালা কানুন' (Black Act) প্রবর্তন ও প্রয়োগ।

অন্যদিকে এদেশে ঔপনিবেশিক সরকারের সীমিত সংস্কার ভারতবাসীদের ক্রমশ হতাশাচ্ছন্ন করে তুলেছিল। ১৮৫৩ সালের সনদ আইন, ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন এবং ১৮৬১-র কাউন্সিল আইনগুলি যেসব প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেছিল সেগুলি একাধারে ছিল অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি সচেতন মানুষ এই সীমিত শাসন সংস্কারে সন্তুষ্টতো হয়নি, উপরন্তু প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ১৮৫৩ সালের আইনে ভারতে সংসদীয় রীতি ও ব্যবস্থার সাংকেতিক সূচনা হলেও ১৮৬১ সালের আইনে সেই প্রবণতার রাশ টানা হয়েছিল। আসলে ভারতে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনও বাসনাই ইংরেজ শাসকদের ছিল না। ১৮৬১-র আইনের মস্ত বড় ত্রুটি ছিল, এর দ্বারা আইন পরিষদকে কার্যত পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল। এসব আইন বিধিতে জনপ্রতিনিধিত্বের সুব্যবস্থা না-থাকায় শিক্ষিত ভারতীয়রা প্রচণ্ড হতাশ হয়েছিল। এই হতাশা থেকেই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯২ সালের আইনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এই আইনে যদিও আইন পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল তথাপি দেশীয় সদস্যরা ভোটদানের অধিকারপ্রাপ্ত ছিল না।

ইতিমধ্যে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও ১৮৯২-এর আইনের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। এই আইনেও আইন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছিল। অল্পকথায়, ঔপনিবেশিক শাসনকুল ভারতে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল, সেখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পণ করার বিষয়ে। এই কেন্দ্রমুখীনতার অগ্রগণতান্ত্রিক প্রবণতাও বাংলার জনগণকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। এই প্রবণতায় একটি নজির ছিল ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারত সচিনের হাতে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়।

এসবের সাথে সাথে সরকারি প্রশাসনের উচ্চপদে ইংরেজরা কোনদিনই ভারতীয়দের দেখতে প্রস্তুত ছিল না। প্রধানত জাতিগত বিদ্বেষই ছিল এর প্রধান কারণ। কোম্পানির শাসনের প্রায় গোড়ার দিকে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস জনপ্রশাসনের (Civil Service) উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের ঘোর-বিরোধী ছিলেন। কার্যত, মুন্সেফ, সদর আমিন ও ডেপুটি কালেক্টরের ওপরের কোনও সরকারি পদে ভারতীয়দের নিযুক্তি হত না। ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষণাপত্রে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে চাকুরির ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য থাকবে না বলে ঘোষিত হলেও বাস্তবে তা হয়নি। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরেপ করতে একদিকে যেমন পরীক্ষায় সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ বছর করা হয়েছিল তেমনি

শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ডেই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিদ্বেষগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলার পূর্বোক্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি অনেকেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। সেনাবাহিনীতেও এই জাতি বিদ্বেষ ও বঞ্চনার নজির ছিল প্রচুর। ভারতীয় সিপাহীদের যেমন নিয়ম মাফিক পদোন্নতি ঘটত না তেমনি শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের তুলনায় তাদের বেতন, ভাতা ও সুযোগ সুবিধা ছিল অনেকটাই কম।

বলাবাহুল্য, এ সমস্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয় গণজাগরণের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে গিয়েছিল সমগ্র উনিশ শতক ধরে। কখনও শাসনতান্ত্রিক বিধিবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবার কখনও কৃষক, আদিবাসী ও সমাজের নিম্নকোটির মানুষের প্রতিরোধ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরাধীন দেশবাসীর ক্ষোভ-অসন্তোষ-হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ছিল শেষোক্ত প্রকারের প্রতিবাদী আন্দোলনের উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

৬.১.২.৩.২ ঃ বাংলার গণ প্রতিরোধ ও সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানসমূহ (Peoples' Protests and Armed peasants' uprisings of Bengal)

ঔপনিবেশিক শাসন যেহেতু সর্বাগ্রে বাংলায় কায়েম হয়েছিল এবং বাংলা থেকেই ভারতের অন্যত্র প্রসারিত হয়েছিল তাই স্বভাবতই এই বিদেশি শাসক প্রভুদের বিরুদ্ধে আঠারো শতকের শেষ ও সমগ্র উনিশ শতক ধরে বাংলাদেশের নানা স্থানে একাধিক সশস্ত্র গণ প্রতিরোধ-অভ্যুত্থান-কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এইসব প্রতিরোধ সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল ঔপনিবেশিক শোষণ লুণ্ঠনের প্রাথমিক শিকার সমাজের প্রান্তবাসী, নীচুতলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ, কৃষক-ক্ষেতমজুর, কারিগর, কর্মচ্যুত সেপাইসান্ত্রীরা। বিপরীত দিকে আবার কখনও কখনও প্রতিপত্তিহীন ভূসম্পত্তি হারানো জমিদাররাও সমাজের নিম্নবর্গের এই সব প্রতিরোধ অভ্যুত্থানে সামিল হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভূমি রাজস্বের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর সূত্র ধরে জমিদার-মহাজনদের নজিরবিহীন শোষণ ও অত্যাচার, জমি থেকে উচ্ছেদ ও বিদেশি শাসক ও বণিক সম্প্রদায়ের নজিরবিহীন শোষণ ও অত্যাচার, জমি থেকে উচ্ছেদ ও বিদেশি শাসক ও বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থে দেশীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি বাংলার গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষদের প্রতিরোধ-সংগ্রামকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই এই ধরনের প্রতিরোধ অভ্যুত্থান ও কৃষক-আদিবাসী-জনজাতিদের সশস্তর বিদ্রোহ বাংলার রাজনৈতিক তথা সামাজিক জীবনকে আলোড়িত করে চলেছিল। ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ অবধি কোম্পানির শাসনাধীন বাংলায় তথা ভারতে সংঘটিত এই ধরনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও কৃষক বিদ্রোহগুলি নিয়ে শশীভূষণ চৌধুরী[১৩] একদা অমূল্য গবেষণা করেছিলেন। ক্যাথলিন গাফ (Kathleen Gough) ও এই স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানগুলির প্রকৃতি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।[১৪] নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ[১৫] ও আলোচ্য পর্বের বিদ্রোহগুলিতে বৈপ্লবিক কৃষক মানসিকতকার প্রতিফলন নিয়ে বিশদ গবেষণা করেছেন।

১৩. S. B. Chowdhury, Civil Disturbances During the British Rule in India. (1765-1875).

১৪. K. Gough, 'Indian Peasants' uprisings' in **EPW**, Spl, No. Augt. 1974.

১৫. R. Guha, Elementary, Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India.

প্রতিরোধ সংগ্রামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics of the Popular Uprisings) ঃ বাংলার কৃষক-কারিগরসহ নিম্নবর্গের মানুষরা একসময় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে মরণপণ সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল প্রধানত তাদের আর্থিক দুর্দশার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও তার দেশীয় সহযোগী অত্যাচারী জমিদার-নায়েব, মহাজনশ্রেণী। এই পর্বে অসামরিক গণপ্রতিরোধ ও কৃষক অভ্যুত্থানগুলির মধ্যে গবেষকরা কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। **প্রথমত,** প্রাক-মহাবিদ্রোহ পর্বের গণ প্রতিরোধ ও অভ্যুত্থানগুলি চরিত্রগতভাবে সর্বাত্মক ছিল না; সেগুলি ছিল স্থানীয় প্রকৃতির এবং সাধারণত কৃষি অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলই ছিল তাদের উৎসস্থল। **দ্বিতীয়ত,** কয়েকটি ক্ষেত্রে সেগুলি ধর্মকে আশ্রয় করে সূচিত হলেও মোটের ওপর ঐ পর্বের কৃষক বিদ্রোহগুলি ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। এককথায়, নীচুতলার সব শ্রেণীর শোষিত মানুষই ঐসব প্রতিরোধের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। **তৃতীয়ত,** প্রতিরোধকারীরা প্রাথমিকভাবে তাদের দুর্দশার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী অত্যাচারী জমিদার, সুদখোর মহাজন ইত্যাদিদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিলেও ক্রমে তাদের আক্রমণের অভিমুখ ঘুরে বিদেশি শাসক প্রভুদের দিকে। কালক্রমে তাদের লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটানো। **চতুর্থত,** ১৮৫৭-র পূর্ববর্তী সময়ে সংঘটিত অভ্যুত্থানগুলি একাধারে ছিল ঔপনিবেশিকতা-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই। বিদেশি শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সমাজে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্যপর্বের গণপ্রতিরোধ ও বিদ্রোহগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য। অবশ্য এই প্রকার কৃষক অভ্যুত্থানগুলি আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতামুক্ত ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অভ্যুত্থানগুলি অধিকাংশই শেষপর্যন্ত আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। ভিন্ন একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গত অপরিহার্য, সেটি হল আলোচ্য বিদ্রোহ-অভ্যুত্থানগুলি প্রায় সবকটিই ছিল প্রকৃতিতে সশস্ত্র ও হিংসাশ্রয়ী। আন্দোলনকারীরা প্রথাগত অস্ত্র নিয়েই তাদের প্রতিরোধের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের হাতে বেশ কিছু অত্যাচারী ভূস্বামী, মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, ইজারাদার এবং সরকারি পুলিশ, দারোগ, সেপাই নিহত হয়েছিল।

যাইহোক, বাংলার অত্যাচারিত ও শোষিত মানুষদের প্রতিরোধ লড়াইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র নীচে বিবৃত হল।

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (Sannayasi and Fakir Uprisings) ঃ ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের বিরুদ্ধে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী, ফকির ও কৃষিজীবীরা প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত চলা এই সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল কোম্পানির পরিবর্তিত শোষণমূলক নীতিপদ্ধতি ও কোম্পানির দেশীয় ইজারাদারদের জুলুম ও অত্যাচার। বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিলেন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, ফকির মজনুশাহ, চিরাগ আলি, মুসা শাহ প্রমুখ। বিদ্রোহের প্রসার ঘটেছিল মালদা, দিনাজপুর, কুচবিহার সহ অধুনা বাংলাদেশের রংপুর, চসুড়া, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। ফকিররা অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী। কোম্পানির ভূমিরাজস্ব আদায় পদ্ধতি ও ইজারাদারদের অত্যাচার তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এরা অনেকেই রেশম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের কাছ থেকে কাঁচামাল হিসেবে রেশম জোরপূর্বক আদায় করত। এছাড়া তীর্থকর আরোপন ও পীরস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে নানারূপ বাধানিষেধ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের রুষ্ট করেছিল।

এক সময় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। তাদের বিদ্রোহে এলাকার দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকরাও সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে বিদ্রোহীরা কোম্পানির কুঠি, নীলকুঠি, রাজস্ব দপ্তর ও বাণিজ্য চৌকি, জমিদারদের বাড়ি আক্রমণ করেছি। এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ফকির মজনু শাহ্ কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে বগুড়াতে আহত হন ও পরে বিহারে আত্মগোপনকালে মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসেও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটি রূপরেখা অংকন করে গেছেন। প্রকৃতিতে এই বিদ্রোহ ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী উদ্যোগ অপেক্ষা বহুলাংশে গণপ্রতিরোধ ছিল।

চুয়াড় বিদ্রোহ (Chuar Revolt) ঃ ১৭৬৯-৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ধানভূম অঞ্চলে চুয়াড় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। চুয়াড়রা স্থানীয় ভূস্বামীদের অধীনে পাইক-বরকন্দাজের কাজ করত এবং তার পরিবর্তে নিষ্কর জমি ভোগ করত। কোম্পানির প্রবর্তিত নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এইসব নিম্নবর্গের মানুষদের রেহাই দেয়নি। একসময় তারা নিরুপায় হয়ে কোম্পানিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৭৬৭-৬৯, ১৭৮৩-৮৪ এবং ১৭৯৮-৯৯ সালে তিনটি পর্যায়ে এই প্রতিরোধ সংঘটিত হয়েছিল। কোম্পানির রাজস্বনীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জমিদাররাও অনেকে এই বিদ্রোহে সামিল হয়। বাঁকুড়ার রাইপুর অঞ্চলের জমিদার দুর্জন সিংহ এই চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। বলা বাহুল্য, কোম্পানির প্রশাসন নির্দয়ভাবে শেষ অবধি এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। এক শ্রেণীর কৃষক ও নিম্নবর্গের মানুষদের এই বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত।[১৬] কোম্পানির সরকার চুয়াড়দের জমি জায়গা বাজেয়াপ্ত করলে মেদিনীপুরের রানিও বিদ্রোহীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন।

রংপুর বিদ্রোহ (Rangpur Rebellion) ঃ ১৭৮৩ সালে রংপুর অঞ্চলের কৃষকরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কোম্পানির রাজস্ব ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এই কৃষক বিদ্রোহ ঝড়ের বেগে দিনাজপুর ও কুচবিহারে ছড়িয়ে পড়েছিল। হাজার হাজার সশস্ত্র কৃষক দেবীসিংহের প্রাসাদ আক্রমণ করে সেটিকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করেছিল।[১৭] স্থানীয় জমিদাররা অনেকেই সেদিন বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান। রংপুরের কালেকটর গুডল্যাট বেশ কয়েক কোম্পানি সেনা নিয়ে বিদ্রোহী চাষীদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলে এই অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে পরিণত হল। এই বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নুরুলউদ্দিন যিনি খাজনা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন 'নবাব' উপাধিধারী দির্জেনারায়ণ। গোরা সেনারা পাশবিকতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল যদিও কোম্পানর প্রশাসন দেবীসিংহকেও ইজারাদারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের ডাক বাংলার অন্যত্র কৃষককুলকেও প্রভাবিত করেছিল। ১৭৮৬ সালে বীরভূমের কৃষকরাও খাজনাবন্ধ আন্দোলন শুরু করেছিল।

পাগলপন্থীদের আন্দোলন (Resistance of the 'Madmen' peasants) ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহটি ছিল ১৮২৪-৩৩ সালে ময়মনসিংহের শেরপুর অঞ্চলের পাগলপন্থী

১৬. নরহরি কবিরাজ, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা,** ১৯৬১, পৃ. ৪৮।

১৭. R. Guha, **Elementary Aspects of Peasant insurgency.**

আন্দোলন। ঐ এলাকার হতদরিদ্র কৃষকরা ফকির করম শাহ্-এর প্রভাবে পাগলপন্থী ধর্মধারার অনুগামী ছিল। ইংরেজ প্রশাসনের ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি ও নানা ধরনের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে 'পাগলপন্থী' কৃষকরা একসময় সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করেছি। পাগলপন্থী গারো বিদ্রোহীদের নেতৃত্বদাতা ছিলেন পূর্বোক্ত করম শাহ্-এর পুত্র টিপু শাহ্। গবেষকদের মতে পাগলপন্থীরা একটি ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীরূপে পরিচিত হলেও তাদের আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা মুখ্য ছিল না, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল এই আন্দোলনে। ঐতিহাসিক বিনয় ভূষণ চৌধুরী[১৮] পূর্ববঙ্গের পাগলপন্থীদের আন্দোলনের দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন; প্রথমটি ছিল জমিদারি শোষণ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়টি ছিল জমিদার ও কোম্পানির প্রশাসনের সম্মিলিত শক্তি জোটের বিরুদ্ধে। তিনি এই আন্দোলনকে একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান বলে অভিহিত করেছেন। ইংরেজ সরকার কড়া হাতে এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

ওয়াহাবি বিদ্রোহ (Wahabi Movement) ঃ আঠারো শতকের ধর্মপ্রাণ মুসলমান আব্দুল ওয়াহাব-এর উদ্যোগে আরব দুনিয়ার ইসলামের শুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা হলেও পরবর্তী সময়ে তা ভারতে বিশেষ করে বাংলায় প্রসারিত হয়েছিল এবং সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছিল। উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহমেদ ভারতের নানাস্থান ঘুরে ওয়াহাবি আদর্শ প্রচার করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের সংস্কারমুক্ত পুনরুজ্জীবনের কথা বললেও তাঁর প্রচারে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এ-দেশ হতে বিধর্মী ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে ভারতবর্ষকে দার-উল-হারব (শত্রুরাষ্ট্র) থেকে পুনরায় দার-উল-ইসলাম (ধর্মরাষ্ট্র)-এ পরিণত করার বিষয়ে। ১৮২১ সালে কলকাতায় আসেন। বারাসাত অঞ্চলের মির নিসার আলি বা তিতুমির ওয়াহাবি ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশে ওয়াহাবি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।

তিতুমির মক্কা থেকে হজ করে এসে বাংলায় ওয়াহাবি আদর্শ প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের নিয়ে একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। ওয়াহাবিরা মুলত চব্বিশ পরগণার বারাসত-গোবরডাঙা-নারকেলবেড়িয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে সক্রিয় ছিল। তিতুমিরের চেষ্টায় বহুসংখ্যক মুসলমান কৃষক ও জোলা ওয়াহাবি মতাদর্শে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। ওয়াহাবিদের এই প্রভাব বৃদ্ধি স্থানীয় পুঁড়া গ্রামের জমিদার দোর্দন্তপ্রতাপশালী কৃষ্ণকান্ত রায়ও কোম্পানির প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কৃষ্ণকান্ত রায় ও তাঁর অনুগামী কুরগাছি ও নগরপুর অঞ্চলের জমিদাররা অতঃপর ওয়াহাবিদের প্রতিপত্তি খর্ব করতে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যেমন ওয়াহাবি গোষ্ঠীর লোকদের কাছ থেকে জমিরানা আদায় ইত্যাদি। তিতুমিরের বাহিনী দরিদ্র অত্যাচারিত মুসলমান কৃষকদের রক্ষা করতে উদ্যোগ নিলে জমিদারদের লেঠেল-বরকন্দাজরে সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। ১৮৩১ সাল নাগাদ বারাসত অঞ্চলে ওয়াহাবি বিদ্রোহ পুরোদমে শুরু হয়েছিল। বিদ্রোহী ওয়াহাবিরা পুঁড়া, লাওঘাট্টি, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রাম আক্রমণ করে, রাজার হাটে লুটপাটে চালাতে থাকে। একসময় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করতে পথে নামে। কিন্তু প্রাথমিক পর্বে তিতুমিরের বাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীকে প্রতিহত করেছিল। তাদের হাতে জমিদারদের লেঠেল-পাইকদের পাশাপাশি অসংখ্য সিপাহীও নিহত হয়েছিল। বিদ্রোহী-ওয়াহাবিরা একসময় বসিরহাট থানার দারোগা রামরতন চক্রবর্তীকে হত্যা করে এবং স্থানীয় নীলকুঠিগুলি একের পর এক জ্বালিয়ে দেয়।

১৮. বিনয় ভূষণ চৌধুরী, 'ধর্ম ও **পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন', ইতিহাস অনুসন্ধান-৩।**

তিতুমিরের নেতৃত্বে ওয়াহাবি বিদ্রোহ ক্রমে দক্ষিণবঙ্গের একটা বড় অংশে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে শোষিত কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন থেকে কালক্রমে সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী বৃহত্তর মুক্তি সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। তিতুমির তাঁর গ্রাম নারকেলবেড়িয়ায় একটি 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করেন এবং 'বাদশাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। একটি সুশৃঙ্খল যোদ্ধাবাহিনী গড়ার পাশাপাশি তিনি সমান্তরাল প্রশাসন গড়তেও প্রয়াসী হন। ১৮৩১-এর ১৪ নভেম্বর ব্রিটিশ বাহিনী কামান নিয়ে নারকেলবেড়িয়া আক্রমণ করে। স্বভাবতই কামানের গোলাবর্ষণের সামনে বাঁশের কেল্লা ও তিতুর বাহিনী দীর্ঘক্ষণ লড়াই চালাতে পারেনি। যুদ্ধক্ষেত্রেই তিতুমির বীরের মৃত্যুবরণ করেন ও তাঁর আটশো অনুগামী ওয়াহাবি যোদ্ধাকে বন্দী করে ইংরেজরা নিয়ে যায়। পরে তাদের ফাঁসি অথবা দীপান্তর হয়। চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকার নিম্নবর্গীয় মানুষদের এই গণঅভ্যুত্থানকে দমন করেছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অধিকাংশই ওয়াহাবি বিদ্রোহকে বহুলাংশে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী বিদ্রোহ হিসেবে তুলে ধরলেও প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহ ছিল সুপ্রকাশ রায়[১৯]-এর মতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের প্রাথমিক স্তর। ওয়াহাবি বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা থাকলেও তা কোনও অবস্থাতেই লাগামহীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়নি; সার্বিক কৃষক চেতনাই বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্তরণ করেছিল। তিতু-র জীবনীকার বিহারীলাল সরকার দেখিয়েছেন যে অনেক হিন্দু দরিদ্র কৃষকও স্বেচ্ছায় তিতুর নেতৃত্ব বরণ করে নিয়েছিল।

ফরাজি বিদ্রোহ (Farazi Rebellion) ঃ ফরাজি বিদ্রোহের বিস্তার ঘটেছিল পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে। এই ধর্মাশ্রয়ী কৃষক অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদাতা ছিলেন ফরিদপুরের হাজি শরিয়তুল্লা ও তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসিন ওরফে দুদুমিঞা। ওয়াহাবিদের মতো ফরাজিরাও ছিল একটি ভিন্ন গোত্রের ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং এরা কোরান বহির্ভূত সব ধরনের আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবের বিরোধী ছিল। দুটি আন্দোলনই শুরু হয়েছিল ইসলামের পুনরুত্থানবাদী ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে এবং কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, 'দুদুমিঞা জমিদারি শোষণ ও বিদেশি ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন।'[২০]

১৮১৮-১৯ সাল নাগাদ বাংলায় মক্কাফেরত হাজী শরিয়তুল্লাহ্ ফরাজি আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধনের পাশাপাশি বাংলার দরিদ্র মুসলমান চাষীদের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসিন বা দুদুমিঞা সেই প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন। এই সময় ফরাজি বিদেরাহ তার ধর্মীয় চরিত্রের ঊর্ধ্বে উঠে ক্রমশ নিপীড়িত কৃষক শ্রেণীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। শশীভূষণ চৌধুরী বলেছেন, 'ইসলাম ধর্মভাবনার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে যে ধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তা একটি ধর্মনিরপেক্ষ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেল।' ১৮৩৮ সালে দুদুমিঞা তাঁর অনুগামী কৃষকদের জমিদারি খাজনা দিতে ও নীল চাষ করতে নিষেধ করেন। অতঃপর ফরাজি বিদ্রোহীরা ফরিদপুর অঞ্চলে নীলকুঠিগুলি আক্রমণ করতে থাকে। ঐ সময়ে শিবচুর গ্রামে দরিদ্র মুসলমান চাষী ও ফরাজিদের একটি ঐতিহাসিক সমাবেশে দুদুমিঞা

১৯. সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত।

২০. প্রাগুক্ত।

নেতা নির্বাচিত হন। ফরাজিরাও ওয়াহাবিদের মতো সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তুলতে নিজস্ব আইন-আদালত গঠন করেছিল। একদা দুদুমিঞার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ফরাজিরাজ কায়েম হয়। ধর্মীয় আদর্শের বিরোধীদের ওপর নির্যাতন চালানো তাদের কাছে পাপ কাজ ছিল না। দুদুমিঞার নেতৃত্বে শোষিত, নির্যাতিত মুসলমান কৃষকদের পাশাপাশি নিম্নবর্গের হিন্দু চাষী ও রায়তরাও অত্যাচারী জমিদার, মহাজন ও নীরকরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল। একসময় দুদুমিঞা তাঁর সংগ্রামকে অসাম্প্রদায়িক কলেবর দিতে ধর্মীয় ভেদাভেদকে তুচ্ছ ঘোষণা করেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন কৃষক বিদ্রোহ তথা ফরাজি বিদ্রোহ পূর্ব-বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানে স্থানে কৃষকরা খাজনা দেওয়া ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করা বন্ধ করে দেয়। একাধিক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীর জমিদার-নীলকর-সরকারি পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। স্থানে স্থানে কৃষকরা খাজনা দেওয়া ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করা বন্ধ করে দেয়। একাধিক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা জমিদার-নীলকর-সরকারি পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৪৮ সালে দুদুমিঞা ইংরেজ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ও বিচারে তার আর্থিক জরিমানা সহ কারাদণ্ড হয়। ১৮৬০ মতান্তরে ১৮৬২ সালে ঢাকায় দুদুমিঞা মারা যান।

প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে দুদুমিঞা ফরাজি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় চরিত্র হয়ে আছেন। জমিদার-নীলকর-কোম্পানির পুলিশ-প্রশাসনের সম্মিলিত শক্তিজোটের কাছে শেষপর্যন্ত পরাজিত হলেও ফরাজিরা উপনিবেশবাদবিরোধী লড়াইয়ে একটি নতুনতর মাত্রা যুক্ত করেছিল। দুদুমিঞার মৃত্যুর পরেও বিক্ষিপ্তভাবে ফরাজি বিদ্রোহ চলেছিল। কার্যত, দুদুমিঞা পরবর্তী যোগ্য নেতা সংগঠকের অভাবে একসময় বিদ্রোহের আবেগ স্তিমিত হয়ে আসে।

নীল বিদ্রোহ (Indigo Revolt) ঃ ১৮৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত কৃষক অভ্যুত্থানগুলি সাধারণভাবে সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত ছিল না। ঐ বিদ্রোহগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং আঞ্চলিক প্রকৃতির। কৃষক-রায়তরা নিজেদের সমস্যাগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে ঐপর্বে বিদ্রোহ-অভ্যুত্থানগুলি সেভাবে জাতীয় চেতনার দ্বারা পুষ্ট ছিল না। কিন্তু মহাবিদ্রোহ পরবর্তীকালে গণ অভুত্থানগুলি প্রকৃতিতে অনেক বেশি সুসংগঠিত ও জাতীয় চরিতর সমন্বিত হয়ে ওঠে। এই পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষক বিদ্রোহ ছিল নীল চাষীদে বিদ্রোহ।

জমিতে নীল বোনাকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত বাংলার নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা, দিনাজপুর, মালদা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় কৃষকদের ওপর ইউরোপীয় নীলকরদের ক্রমবর্ধমান চাপ ও অত্যাচারকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত পরিমাণে ১৮৫৯-৬০ সালে নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। অবশ্য এই বিদ্রোহ জমিদার-মহাজনবিরোধী কোন আন্দোলন ছিল না। বাংলার কৃষকদের মূল প্রতিপক্ষ ছিল নীলকুঠির সাহেবরা অর্থাৎ ইণ্ডিগো প্ল্যান্টাররা। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলার কৃষককুল যে মানসিক দৃঢ়তা ও চেতনার প্রমাণ দিয়েছিল তা অভূতপূর্ব। বলাবাহুল্য, এই আন্দোলন অত্যন্ত সুসংগঠিত হওয়ার দরুন শেষ অবধি সাফল্য অর্জন করেছিল। এই বিদ্রোহ ছিল পুরোমাত্রায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি স্মারকস্বরূপ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নীল বিদ্রোহে গ্রাম বাংলার শোষিত মানুষ যোগদান করেছিল। কৃষকদের পাশাপাশি এই বিদ্রোহে বেশ কয়েকজদন জমিদার, তালুকদার ও পত্তনিদারও সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল।

নীল কুঠিয়ালরা যেভাবে চাষীর জমিতে জোর করে অথবা 'দাদন' (অগ্রিম) গছিয়ে নীল বুনতো এবং নীলচাষীদের ওপর অত্যাচার পীড়ন চালাতো তার বিবরণ প্রায় সবারই জানা। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে (১৮৬০) সেই নৈরাজ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকিত রয়েছে। ১৮৬০ সালের গোড়াতেই বাংলার চাষীরা তাদের জমিতে নীল বুনতে অঙ্গীকার করে যে বিদ্রোহের সূচনা করেছিল ক্রমে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে তা বিশেষ ব্যাপ্তি পায়। এই বিদ্রোহের নেতা সংগঠকরা-যশোহর জেলার চৌগাছার দুই ভাই বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস, নড়াইলের জমিদারের নায়েব মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মালদহের ওয়াহাবি সংগঠক রফিক মণ্ডল, খুলনার রহিমুল্লা প্রমুখ প্রতিবাদী কৃষকদের প্রতিরোধ সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শেষ অবধি ১৮৬১ সালে 'নীল কমিশন' গঠন করে সরকার এই সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহের রাশ টেনে দিল। পরিশেষে, সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে নীলচাষ কৃষকের স্বেচ্ছাধীন; এই বিষয়ে কোনোরূপ জোর জবরদস্তি করা যাবে না। এর পরিণতিতে নীলবিদ্রোহের অবসান হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাঙালি বুদ্ধিজীবীসমাজ এই নীলবিদ্রোহে নীল চাষীদের নানাভাবে সাহায্য ও সমর্থন করেছিল।

পাবনা বিদ্রোহ (Pabna Rebellion) ঃ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের পাবনার কৃষক বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল যথেচ্ছভাবে জমির খাজনাবৃদ্ধি। এই বিদ্রোহ ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে সম্পন্ন কৃষক ও জোতদার শ্রেণীর বিদ্রোহ। খাজনাবৃদ্ধির সেই হার ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ১৭৯৩ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে করের বোঝা অন্তত সাতগুণ বেড়েছিল।[২১] ১৮৫৯ সালের দশম আইনকে অগ্রাহ্য করে পাবনার জমিদার-ভূস্বামীরা কৃষকদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে কর আদায় করতো। জমিদারদের অনুসৃত নতুন জমি জরিপ পদ্ধতিও কৃষকদের ক্ষোভ বাড়িয়েছিল। সরকারি ও বেসরকারি উভয়প্রকার তথ্য প্রমাণ থেকে নিশ্চিত হয়া যায় যে অত্যধিক কর বৃদ্ধিই ছিল পাবনার কৃষক বিদ্রোহের একমাত্র কারন। অবশ্য পাশাপাশি এই বিষয়েও সংশয় কম যে শুধু বর্ধিত ভূমি রাজস্ব নয়, ঐ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু কৃষিজীবীসমাজ সবধরনের জমিদারি অত্যাচার ও শোষণের অবসান ঘটাতে বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল। এই বিষয়ে সরকার কৃষক বিরোধিতার পথে হাঁটেনি অন্তত গোড়ার দিকে।

১৮৭৩ সালে পাবনার কৃষকরা জমিদারি খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে আদালতের আশ্রয় নিয়ে লড়াই চালাতে মনস্থ করে। তাদের উদ্যোগে গঠিত 'কৃষিজীবী সমিতি' (Agrarian League) প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই সমগ্র পাবনা জেলা জুড়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মামলা-মোকদ্দমা চালানোর প্রয়োজনে বিদ্রোহী কৃষকরা একটি অর্থ ভাণ্ডারও গড়ে তুলেছিল। পাবনা বিদ্রোহের নেতা ও সংগঠকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দৌলতপুরের জোতদার ও ব্যবসাদার ঈষাণচন্দ্র রায়, মেঘুল্লা গ্রামের প্রধান শম্ভুনাথ পাল, জোতদার খুদিমোল্লা প্রমুখ। বিদ্রোহী কৃষকরা তাদের নিজস্ব লেঠেল বাহিনী গঠন করেছিল। সম্পন্ন চাষীদের এই বিদ্রোহে অস্থায়ী কৃষক, ভাগচাষী, কৃষিমজুররাও স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামিল হয়েছিল। বিনয় চৌধুরী ও সুপ্রকাশ রায় পাবনার কৃষক বিদ্রোহকে প্রকৃতিতে হিংসাশ্রয়ী বললেও কেউ কেউ তা মানতে চাননি। যাইহোক্, বিদ্রোহী কৃষকরা কখনও কখনও জমিদারদের ঘরদালান আক্রমণ করে ও তাতে আগুন লাগিয়ে ত্রাসের আবহ তৈরি করতে চেয়েছিল। তবে এই প্রবণতা সেভাবে বিস্তৃত হয়নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন-এর মতো জমিদারদের প্রাধান্যপূর্ণ

২১. Sumit Sarkar, **Modern India, P.5**

সংগঠন এই বিদ্রোহে জমিদারদের পাশে দাঁড়ায়। 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' ও 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-র মতো কাগজে পাবনার কৃষক বিদ্রোহকে নৈরাজ্যের নামান্তর বলে চিহ্নিত করা হয়। মধ্যবিত্ত বুদিধজীবীদের একাংশ অবশ্য বিদ্রোহ কৃষকদের পাশেই ছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পাবনার বিদ্রোহী কৃষকদের সমর্থন করেছিলেন।

যাইহোক্, পরের দিকে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তনের দরুন প্রশাসনিক তৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং যার পরিণতিস্বরূপ ঈষাণচন্দ্র রায় ও অন্যান্য কৃষক নেতারা পুলিশের জালে ধরা পড়েছিলেন। এভাবে বিদ্রোহ একসময় দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহ থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার প্রজার স্বার্থ বজায় রাখতে ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে। মনে রাখতে হবে বিদ্রোহী কৃষকরা জমিদারবিরোধী হলেও সরকার-বিরোধী তেমন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই বিদ্রোহ একাংশের যুক্তিসত্ত্বেও প্রকৃতিতে সাম্প্রদায়িক ছিল না এবং বিদ্রোহ অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল।

৬.১.২.৩.৩ ঃ অরণ্যচারী উপজাতি-আদিবাসীদের বিদ্রোহ (Tribal Resistances)

ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে সীমান্ত বাংলায় প্রধানত ছোটনাগপুর মালভূমি লাগোয়া জঙ্গলমহলে বসবাসকারি বিভিন্ন-উপজাতি জনজাতি ও আদিবাসী মানুষের দল বারংবার বিদ্রোহ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। বিদেশি শাসকদের আমলে 'অরণ্যের অধিকার' হারিয়ে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসীরা গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সময়ে সময়ে প্রতিরোধ-বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিল। দীর্ঘকাল ধরে আদিবাসী-উপজাতিদের বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানগুলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ব্রাত্য ছিল। কিন্তু এই ধরনের অসংখ্য বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়েছিল বিদেশি শাসকদের। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমপ্রসার অরণ্যবাসী উপজাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় উপর্যুপরি আঘাত হেনেছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বের উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রা ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রসারের কারণে দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত জমিদার ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী প্রাধান্য, নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিস্তার এবং শোষণ ও মহাজনী অত্যাচার বৃদ্ধি উপজাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংস করেছিল এবং তাদের সামগ্রিক অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। এমত পরিস্থিতিতে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল প্রভৃতি উপজাতিগুলি একাধারে হিন্দু জমিদার-মহাজন -ব্যবসায়ীদের শোষণ এবং এসবের রক্ষাকর্তাস্বরূপ ব্রিটিশ শাসকপ্রভুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও খেরওয়ার আন্দোলন (Santal Rebellion and Kherwar Movement) ঃ বাংলার সাঁওতাল বিদ্রোহ দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল - (১) ১৮৫৫-৫৭ সালের বিদ্রোহ ও (২) ১৮৭১-৮২ সালের খেরওয়ার আন্দোলন। একসময়, সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপজাতীয় সামাজিক সংহতির বিরুদ্ধে বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়নের প্রতিবাদে সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সাঁওতালরা নিজেদের সময় ও শ্রম দিয়ে সাঁওতাল পরগণা ('দামিন-ই-কোহ্') অঞ্চলেক বাসযোগ্য ও উর্বর করে তুললে ক্রমে 'দিকু' অর্থাৎ বহিরাগত হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা নানা অসাধু উপায় অবলম্বন করে তাদের সেইসব জমি গ্রাস করে চলেছিল। উচ্চবর্ণের জমিদার ও মহাজন-ব্যবসায়ীদের শোষণ মাত্রা ছড়িয়ে গেলে তারা বিদ্রোহ

ঘোষণা করেছিল। কোম্পানির নজিরবিহীন ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধিও তাদের জীবন দুর্বিষহ করেছিল। উইলিয়াম হান্টার[২২] লিখেছিলেন মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করার মতো জমি-ফসল মাত্র সংগতি দরিদ্র সাঁওতালদের থাকত না। লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে সাঁওতাল পরগণায় রেলপথের সম্প্রসারণও তাদের জীবনের নানা ধরনের উৎপাত বয়ে এনেছিল। রেলওয়ে ঠিকাদার ও কর্মচারীরা সাঁওতালদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার, উৎপীড়ন চালাতো। নীলকর সাহেবরাও জোর করে তাদের জমিতে নীল বুনতো। এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে কোম্পানির প্রশাসনও তাদের বিমুখ করেছিল। অগত্যা ১৮৫৫ সালের গোড়ায় শুরু হল সশস্ত্র সাঁওতাল বিদ্রোহ-'হুল'।

বিদ্রোহী সাঁওতাল নেতা সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে অতঃপর সাঁওতালরা অত্যাচারী জমিদার, ঠিকাদার, মহাজন, নীল কুঠিয়াল ও ইংরেজ পুলিশ-দারোগাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়াতে বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন জমিদার-জোতদার-দারোগাকে হত্যা করে তারা সমগ্র সাঁওতাল পরগণাকে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে। পরিশেষে, নদীয়া বিভাগের পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী নির্দয়ভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিল। ১৫ থেকে ২৫ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতালকে হত্যা করা হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে বিদ্রোহী সাঁওতাল নেতা কানু ধরা পড়েন ও তার ফাঁসি হয়।

দ্বিতীয় পর্বে ১৮৭১-৮২ সাল পর্যন্ত চলা সাঁওতালবিদ্রোহ 'খেরওয়ার আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল। নজিরবিহীন খাজনা বৃদ্ধি ও সাঁওতাল মোড়লদের ('মাঝি') দুঃসহ দারিদ্র্য ও প্রতিপত্তি নাশ এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। এই পর্যায়ে বিদ্রোহী সাঁওতালদের সংগঠিত করেছিল ভগীরথ মাঝি, যদু মাঝি প্রমুখ। নেতৃস্থানীয়দের কারারুদ্ধ করে ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহের রাশ টেনেছিল। সুপ্রকাশ রায় সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, 'এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।'

সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ববর্তী ১৮৩২ সালের কোল উপজাতির বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে মুণ্ডাদের বিদ্রোহ ও পূর্বভারতের উপজাতীয় অভ্যুত্থানগুলির ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে মুণ্ডা বিদ্রোহ ছিল একটি আপোষহীন সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান যা নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৃহত্তর জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। উপরোক্ত গণবিদ্রোহ এবং উপজাতি-আদিবাসী অভ্যুত্থানগুলি যেগুলি সাধারণভাবে নিম্নবর্গের আন্দোলন (Subaltern movement) নামে পরিচিতি পেয়েছে, ঔপনিবেশিক ভারতের আপোষহীন স্বাধীনতার লড়াইয়ের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে।

৬.১.২.৪ : সংক্ষিপ্তসার (Summary)

বর্তমান পাঠটিতে বাংলায় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের এক বৃহৎ ও জটিল প্রেক্ষিত আলোচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার ও পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণার আগমন বাংলার ভাবজগতে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল এবং জাতীয় জাগরণের জমি প্রস্তুত করেলি অন্যদিকে তেমনি নতুন রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ এবং আলাদাভাবে বাংলা ভাষা-

২২. W.W. **Hunter, Annals of Rural Bengal.**

সাহিত্যের বিকাশ বাঙালি জাতীয় চেতনাকে বিশেষ সমৃদ্ধি করেছিল। আলোচ্য সময়কালে জাতীয় সচেতনতার অভাবনীয় বিস্তার রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলির আত্মপ্রকাশ অনিবার্য করে তোলে। জন্ম নেয় একের পর এক রাজনৈতিক সংগঠন—ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি থেকে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। অপরদিকে, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের জনবিরোধী নীতি ও সীমিত শাসন সংস্কার রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত জনগণকে নিদারুণ হতাশাগ্রস্ত করেছিল এবং অন্যদিকে জনসাধারণের ক্ষোভ-অসন্তোষ ধূমায়িত করেছিল। কোম্পানির শাসনকালের একপ্রকার শুরু থেকে তাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-অপশাসনের বিরুদ্ধে গ্রামীণ বাংলার কৃষক, নিম্নবর্গের প্রান্তবাসী-মানুষজন ও অরণ্যবাসী উপজাতি-আদিবাসীরা বারংবার সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিল। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ থেকে শুরু করে পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ অবধি সুবিস্তৃত ছিল সেই গণপ্রতিরোধ-অভ্যুত্থানের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস। এসবই সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আমাদের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এভাবে বিচার করলে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ফসল বোনার মরসুম এবং সেই প্রার্থিত স্বাধীনতার ফসল গোলায় উঠেছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।

৬.১.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Further Readings)

1. Adenwalla, M. D., *From Rammohun Roy to Gandhi : a study of Political Ideology in the National Movement,* 1986

2. Bose, N. S., *Indian Awakening and Bengal,* Kolkata, 1960

3. Bandhyopadhyay, Sekhar, *From Plassey to Partition : A History of Modern India,* N. Delhi, 2004

4. Chandra, Bipan, *Modern India : Nationalism and Colonialism in India,* N. Delhi, 1929.

5. Chowdhury, S. B., Civil Disturbances During the British Rule in India (1765-1857)

6. Desai, A. R., *Social Background of Indian National Movement,* Mumbai 1966.

7. Deasi, A. R. (*ed.*) *Peasant Struggle in India, Mumbai,* 1979

8. Dutta, K. K. *The Santal Insurrection of 1855-57*

9. Guha, Ranajit (ed.) *Subaltern Studies,* Vol. *I-IV,* N. Delhi, 1982-86 *Elementary aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* 1983

10. Gopal, S., *British Policy in India 1858-1905,* N. Delhi, 1975

11. Hardiman, D (ed.), *Peasant Resistance in India,* Delhi, 1993

12. Hunter, W. W., *Annals of Rural Bengal.*

13. Joshi, V. C. (ed), *Rammohon Roy and The Process of Modernization in Bengal,* N. Delhi 1970.

14. Kaviraj, Narahari, *A Peasat Uprising in Bengal, 1783,* N. Delhi, 1972.

15. *Wahabi and Farazi Rebels of Bengal,* N. Delhi, 1982

16. Kopf, Devid, *British Orientalism and the Bengal Renaissance,* kolkata, 1969

17. Palit, Chittabrata, *New Viewpoints on Nineteenth Century Bengal,* Kolkata, 2006

18. Ray, Rajat, K., *Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927, 1984*

19. Sarkar, Sumit, *Modern India 1885-1947,* N. Delhi, 1983

20. Sarkar, S. C., *Bengal Renaissance and Other Essays,* Delhi, 1970

21. Seal, Anil, *Emergence of Indian Nationalsim, Cambridge,* 1968

22. Sen, Sunil, *Peasant Movements in India,* Kolkata, 1982

বাংলা বই

১। গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) **নিম্নবর্গের ইতিহাস,** কলকাতা, ১৯৯৮।

২। বীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, **সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,** কলকাতা, ১৯৭৬

৩। বিনয় ঘোষ, **বাংলার নবজাগৃতি,** কলকাতা, ১৯৯৩।

৪। সুপ্রকাশ রায়, **ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,** কলকাতা, ১৯৬৬।

৫। শ্যামাপ্রসাদ বসু, **ওয়াহাবি থেকে খিলাফৎ।**

৬। আবদুল্লা রসুল, **নীল বিদ্রোহের অমর কাহিনী।**

৭। সুশীল কুমার গুপ্ত, **ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ।**

৮। স্বপন বসু, **বাংলার নবচেতনার ইতিহাস।**

১.২.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer-Type Question) মান ঃ ১০

১। বাংলার ইংরেজি শিক্ষার প্রসার কীভাবে জাতীয় জাগরণের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল?

(How did spread of western education in Bengal prepare the background of national awakening?)

২। বাংলার জাতীয় চেতনর বিকাশে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ভূমিকা পর্যালোচন কর।

(Examine the role of western political ideas in the development of national consciousness in the development of national consciousness in Benal)।

৩। টীকা লেখ ঃ (ক) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (খ) ভারত সভা।

(Write short note on (a) British Indian Association (b) Indian Association)

৪। প্রাক্-মহাবিদ্রোহকালীন বাংলায় গণ অভ্যুত্থান ও কৃষক বিদ্রোহগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(Discuss, in brief, about the 'common characteristics of peoples' uprisings and peasants' protests in pre-mutiny Bengal).

৫। টীকা লেখ ঃ (ক) সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, (খ) রংপুর বিদ্রোহ (গ) ওয়াহাবি আন্দোলন

(Write short notes on (a) Sannyasi and Fakir Rebellions, (b) Rangpur Uprising, (c) Wahabi Movement)

৬। বাংলায় ফরাজি বিদ্রোহের সূচনা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

(Assess the origin and nature of the Farazi Movement in Bengal)

খ. রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay-type Questions) **মান ঃ ১৬**

১। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ কীভাবে জাতীয় চেতনার উন্মেষে সহায়ত হয়েছিল। প্রসঙ্গত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা আলোচনা কর।

(How did Nineteenth Century Bengali Renaissance help the growth of national awakening? Examine the role of Bengali langauge and literature.)

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ক্রম প্রতিষ্ঠা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(Discuss the growth of political organisations in Nineteenth Century Bengal)

৩। ঔপনিবেশিক সরকারের জনবিরোধী প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ কীভাবে গণ অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল?

(To what extent anti-people administrative measures of the Colonial Government gave birth of popular unrest?)

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গণ প্রতিরোধ ও কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

(Write an essay on people's protests and peasants uprisings in Nineteenth Century Bengal)

৫। নীল বিদ্রোহ ও পাবনার-কৃষক বিদ্রোহের ওপর আলোপাত কর।

(Discuss about Indigo Revolut and Pesants Revolts of Pabna)

৬। উনিশ শতকের বাংলায় উপজাতি-আদিবাসী বিদ্রোহের পরিচয় দাও।

(Review the tribal uprisings of Bengal in the Nineteenth Century).

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-২

PARTITION (1905) AND SWADESHI MOVEMENT AND MILITANT NATIONALISM

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও স্বদেশী আন্দোলন ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ

একক-৩

(1) The British Plan and Bengal Protests

(১) ব্রিটিশ পরিকল্পনা—বঙ্গভঙ্গ ও লর্ড কার্জনের দায়িত্ব

বিন্যাস ক্রম

৬.২.৩.০ : উদ্দেশ্য

৬.২.৩.১ : ভূমিকা

৬.২.৩.২ : বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক পরিকল্পনা

৬.২.৩.৩ : সরকারী আমলাদের দায়িত্ব

৬.২.৩.৪ : কার্জনের দায়িত্ব

৬.২.৩.৫ : উপসংহার

৬.২.৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৬.২.৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.২.৩.২ : বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক পরিকল্পনা

১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে সম্ভাব্য কারণগুলি নিয়ে বিচার করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা সামগ্রিকভাবে এর পশ্চাতে সম্ভাব্য তিনটি কারণ উল্লেক করেছেন। এগুলি হল যথাক্রমে—প্রশাসনিক সুবিধা; ব্রিটিশ আমলাদের কায়েমি স্বার্থপ্রসূত বাঙালি বিরোধী মনোভাব; এবং কার্জনের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলন দমনের অভিপ্রায় এবং বাংলায় 'ভেদ ও শাসন' নীতি। প্রথমে ইংরজদের প্রশাসনিক পরিকল্পনাটির কথা আলোচনা করা যাক।

বাংলা প্রেসিডেন্সি যা তদানীন্তনকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভিত্তিপ্রস্তর ছিল তার প্রশাসনিক স্বার্থ ও সুবিধার কথা নিয়ে ইংরেজ সরকার ভাবনা-চিন্তা শুরু করে। একের পর

এক অঞ্চল অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে ক্রমেই বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ফলে এর সীমানা উত্তর-পশ্চিমে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, উত্তর পূর্বে আসাম পর্যন্ত এবং দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান পর্যন্ত। বস্তুতঃ বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন এটাই বিশাল ছিল যে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। ১৮৬৭ তে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময় এই বর্ধিত আয়তন যে সুশাসনের অন্তরায় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। সেই সময় বোম্বাই ও মাদ্রাজের ন্যায় বাংলা প্রেসিডেন্সিকেও একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের দায়িত্বে আনার প্রস্তাব করা হয়। অন্য প্রস্তাবও বিভিন্ন সময়ে পেশ করা হয়। কিন্তু জন লরেন্স বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলির আয়তন হ্রাস করার প্রস্তাব দেন। তিনি আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, একজন 'চিফ' (মুখ্য) কমিশনারের অধীনে তিনটি ভাগে ভাগ করে স্থাপন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এর ফলে বাংলা সরকারের দায়-দায়িত্ব হ্রাস পাবে। তিনি মনে করতেন যে আর্থিক ব্যয় সংকোচনের সঙ্গে আসামের উন্নতি সাধন হবে এই পরিকল্পনার ফলে। পরে তিনি আসামের সঙ্গে তৎসন্নিহিত জেলাগুলিকে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন।

১৮৭২ সালে প্রথম আদমসুমারি বা লোকগণনায় বাংলার যে বিশাল জনসংখ্যার চেহারাটি ফুটে উঠে তার ফলে বিশাল প্রেসিডেন্সিতে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন চালানো অসম্ভব হয়ে উঠে। ইংরেজ সরকার যে নতুন 'সেস' বা কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এর ফলে জমিদারদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে রায়তদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং রাজস্ব সংগ্রহ আরও সহজ করার জন্য জেলাগুলির আয়তন কমানো বিশেষ দরকার ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার আসামকে কার্যত আলাদা করে দেওয়া হয়। বাংলাভাষী সিলেট, গোয়ালপাড়া ও কাছাড় অঞ্চল তিনটিও আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ে এই ধরনের বিভাজনী নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আসামের স্বার্থরক্ষাই বোধ হয় বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল; বাংলাকে দুর্বল করার চাইতে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গোটা চট্টগ্রাম বিভাগটিকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব ওঠে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামের তৎকালীন চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড আবার প্রস্তাব দেন এই মর্মে যে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা দুটিকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক, যাতে আসাম একটি লেঃ গভর্নরের প্রদেশ হয়ে উঠতে পারে এবং আলাদা করে একটি সিভিল সার্ভিসের কাঠামো থাকে। কিন্তু এই পরিকল্পনাটি কারো পছন্দ হয়নি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শুধুমাত্র লুসাই পাহাড় অঞ্চল হস্তান্তরিত হয়। বাকি পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ আর বিশেষ এগোয়নি।

১৯০০ সালে লর্ড কার্জনের আসাম পরিদর্শনর সময় উক্ত পরিকল্পনার কথা আবার উঠে। সে সময়ে আসামের চা-বাগানগুলির ইউরোপীয় মালিকরা রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নতুন বন্দর গঠনের দাবি জানান। ১৯০২ সালে সীমান্ত বিন্যাসের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য যখন কাজ সামনে আসে, তখন নিজামের থেকে লব্ধ ধারাকে সেন্ট্রাল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবা হয়। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, এই সময় অবধি বৈজ্ঞানিকভাবে সীমা বিন্যাসের প্রশ্নটাই বড় ছিল; রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি যুক্ত হয়নি।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আদমসুমারির প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলার জনসংখ্যা ৭৮.৫ মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছেছে। এই অবস্থায় বাংলার গভর্ণর স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার ওড়িশা ও সম্বলপুরকে সেন্ট্রাল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। বাংলা, আসাম, সেন্ট্রাল প্রদেশ এবং মাদ্রাজের সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রেজারকে একটি

পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। ফ্রেজারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯০৩ এর পয়লা জুন, সীমানা নির্ধারণের মিনিট তৈরি হয়। স্বরাষ্ট্র সচিব রিজ্‌লীর অনুমোদন পাওয়ার পর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর রিজলি পেপার প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম ডিভিশন, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ছোটনাগপুরকে সেন্ট্রাল প্রভিন্সেসের সঙ্গে যুক্ত করার কথা হয়। বিনিময়ে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হবে সম্বলপুর সেন্ট্রাল প্রভিন্সেসের সামন্ত রাজ্যগুলি, গন্ডাম জেলা এবং মাদ্রাজ থেকে বিশাখাপত্তনম অঞ্চল। ১৯০৪ সালের গোড়াতে পরিকল্পনাটি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়, যদিও গোপনে। হস্তান্তরিত জেলার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি কার্জন বাংলা ভাগের চূড়ান্ত পরিকল্পনা সেক্রেটারি অব স্টেট্ ব্রড্‌রিকের হাতে তুলে দেন। ব্রড্‌রিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। ১৯শে জুলাই বাংলা ভাগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। পরিকল্পনাটি তিন মাস বাদে অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রদেশের অন্তর্গত হয় চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদা এবং আসাম। নতুন এই প্রদেশে লোকসংখ্যা থাকবে ৩১ মিলিয়ন। এদের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন হবে মুসলমান আর ১৩ মিলিয়ন হবে হিন্দু। নতুন প্রদেশে হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি থাকবে। অন্যদিকে পুরনো প্রদেশে বাঙালি হিন্দুরা হবে ভাষাগত সংখ্যালঘু; কারণ এই প্রদেশে থাকবে প্রচুর সংখ্যক হিন্দি ও উড়িয়াভাষী লোক।

৬.২.৩.৩ : সরকারী আমলাদের দায়িত্ব

কিন্তু এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অনুচিত হবে। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক সুবিধা সীমান্ত বিন্যাসের প্রধান কারণ থাকলেও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পশ্চাতে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কার্জনের দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯০৩ সালে প্রকাশিত রিজ্‌লি পেপারের মধ্য দিয়ে। ফ্রেজার এবং রিজ্‌লির পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গের প্রথম পরিকল্পনা যে চরমপন্থীদের দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে যায় ফ্রেজারের মন্তব্য থেকে। তাঁর মতে, বাংলা প্রদেশের বেশ কয়েকটি জেলা বাঙালিদের নিজস্ব আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। রিজ্‌লি মনে করতেন প্রাদেশিক রাজনীতিতে বাঙালি হিন্দুদের আধিপত্য কমানোর প্রয়োজন আছে এবং তা একমাত্র বাংলাকে ভাগ করলেই সম্ভব হবে। ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু বাংলাকে ভাগ করলে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে বাংলাভাগের পরিকল্পনাটির একটি উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলকে দুর্বল করে দেওয়া। কাজেই বাংলা ভাগের প্রকৃত কারণ ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যেই খোঁজা দরকার।

বস্তুত ঔপনিবেশিক সরকারি আমলাদের মধ্যে বাঙালি বিরোধী মনোভাব বরাবরই ছিল। মেকলে এবং ট্রেভেলিয়ান ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালিকে ব্রিটিশ শাসনের সহায়ক শক্তি হিসেবে মনে করলেও পরবর্তীকালের আমলারা ১৮৬০-এর দশক থেকেই বাঙালিদের সম্পর্কে নানারকম অপপ্রচার করতে থাকে। তাদের বক্তব্য হোল, প্রশাসনের কাজে প্রয়োজনীয় সাহস, কর্মনৈপুণ্য বাঙালীদের মধ্যে নেই। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এদের নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হলে এরা বাঙালিদের প্রতি আরও ক্ষুব্ধ হয় এবং এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কথা চিন্তা

করতে থাকে। বাংলায় জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং কংগ্রেসী আন্দোলনের সূচনা হলে সরকারী আমলাদের বাঙালি বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ এবং জাতীয় কংগ্রেসের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইংরেজ আমলাদের শঙ্কিত করে তোলে। অন্যদিকে ন্যায্যা দাবি-দাওয়া অস্বীকৃত হওয়ায় শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ জন্ম নেয়। বাংলায় জাতীয় আন্দোলন যত তীব্র হতে থাকে আমলাদের বাঙালি বিদ্বেষও তত তীব্র হতে থাকে। এই বিদ্বেষের ফলেই তারা বঙ্গ ভঙ্গের পরিকল্পনা করে। বড়লাট হয়ে ওঠার আগেই কার্জনের এই বাঙালি বিরোধী ভাবের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাই কার্জনের মধ্যেও বরাজনৈতিকভাবে সুসংবদ্ধ বাঙালি সম্প্রদায়কে দুর্বল করার অভিপ্রায় ছিল।

৬.২.৩.৪ : কার্জনের দায়িত্ব

এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে কার্জনের দায়িত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। কার্জন নাকি রাজদ্রোহী কংগ্রেসকে ধ্বংস করার জন্য বঙ্গভঙ্গ করেন। বাংলা ছিল একদিকে জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি এবং অন্যদিকে চরমপন্থী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। তাই কার্জন মনে করতেন বাংলাকে আঘাত করতে পারলে আন্দোলনের শক্ত ভিত নড়বড়ে হয়ে যাবে। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গব্যবচ্ছেদে হয়। এছাড়া বাঙালি বিদ্বেষ, হিন্দুবিরোধী এবং কংগ্রেস বিরোধী শাসননীতিতে তাঁর পূর্বেই দীক্ষা হয়। যে মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি পূর্বের থেকেই প্রস্তুত ছিল কার্জন তার পরিণতি প্রদান করেন। তাই সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব বোধ হয় তিনি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেই চরমপন্থী আন্দোলন দমন করতে সুপরিকল্পিতভাবে কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেন এই মতামত অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে কার্জনের দায়িত্ব গৌণ বলেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু তিনি আবার কার্জনকে সম্পূর্ণভাবে নিরপরাধও বলতে চান না। ঘটনার কালক্রম কখনই বলে না যে কার্জন প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত আগাগোড়াতেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। সূচনাপর্বে পরিকল্পনাটির জনক হয়তো তিনি নন; কিন্তু পরিশেষে এক দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না ভাইসরয় হিসাবে। ব্রড্‌রিকের সঙ্গে তার চিঠিপত্রের আদানপ্রদান থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কার্জনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং তাঁর ক্রমাগত চাপেই আগ্রহী ব্রড্‌রিক ও তাঁর কাউন্সিল তড়িগড়ি এই পরিকল্পনা পাশ করে। অতএব বঙ্গভঙ্গ যে একেবারেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়; বরং প্রাদেশিক সুবিধার জন্যই তা করা হয়েছে এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এই ব্যবস্থার সঙ্গে 'ভেদ ও শাসন' নীতির সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুপ্রবেশ। সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতার উপরও জোর দেওয়া হতে থাকে। এক মুসলিম অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা হয় যাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এক বিরোধী ঘাঁটি বাংলায় গড়ে তোলা যায়। J. R. Mc Lane এর মত ঐতিহাসিক অবশ্য স্বপক্ষীয় সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তিনি বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের কোন রূপ দেখতে পাননি। তাঁর লেখায় তিনি প্রশাসনিক সুবিধার বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলিকে গৌণ বলে দাবি করেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে যে ইংরেজদের বিভেদ নীতি ও সাম্প্রদায়িকতার রং পাওয়া যায় তার প্রমাণ হল ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় দেওয়া কার্জনের বক্তৃতায়। এখানে বঙ্গভঙ্গের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ রাজনৈতিক ঐক্য বঞ্চিত; সে ঐক্য তাদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

কার্জন প্রকৃতই বাংলার সন্নিকটে একটি মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রদেশ গড়ে তুলতে চাইছিলেন। তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেন তাঁর তিন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা ফ্রেজার, ফুলার ও রিজলি। এদের মধ্যে রিজলি তো নিজেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নতুন প্রদেশ গড়ে তোলার কথা বলেন। রিজ্‌লি পেপারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল বাঙালীদের মধ্যে। কংগ্রেস রিজ্‌লি পেপারকে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট করার অপচেষ্টা বলে গণ্য করে। তিন সিভিলিয়ানের প্রস্তাবগুলি কার্জনের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। তাই কার্জন ঢাকার নবাব সালিমুল্লা খাঁকে অতি সহজেই পূর্ববঙ্গ সফলে গিয়ে দলে টানলেন এবং একটা মুসলমান প্রধান প্রদেশ গঠনের জন্য বড়লাটের প্রস্তাবে জয়ধ্বনি দেবার মতো মুসলমান শ্রোতা সংগ্রহ করতেও নবাব সালিমুল্লা খাঁর কোন অসুবিধা হল না। ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কার্জনের এক চিঠিতে ভাইসরয়ের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে দুরভিসন্ধিমূলক তা প্রকাশলাভ করে। তিনি লিখেছেন, ''কলকাতাকে ঘাঁটি করে কংগ্রেস সমগ্র বাংলায় এমন কি গোটা ভারতবর্ষে আন্দোলন পরিচালনা করছে।....তাদের উদ্দেশ্য এমন একটি শক্তিশালী দল গঠন যা সরকারের সামান্য দুর্বলতার সুযোগেই নিজ দাবি পূরণে তাকে বাধ্য করবে।'' কংগ্রেস, কলকাতার নেতৃবৃন্দ, কলকাতার উকিল' এ জাতীয় একটি অতি সরল সমীকরণ ছিল কার্জনের মনে। অতএব বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে কার্জনের দায়িত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

৬.২.৩.৫ : উপসংহার

সুতরাং উপরের আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যায় যে বঙ্গভঙ্গ কার্জনের একক দায়িত্ব ছিল না। ভারতে তাঁর আসার পূর্বেই সরকারী আমলাস্তরে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় এবং বিভিন্ন সময়ে এ ব্যাপারে অনেক পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয়। কার্জনের চিন্তাধারা এই মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই বিবেচনা করতে হবে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন কিভাবে আমলারা ভাইসরয়কে তাদের চিন্তাধারায় চিন্তা করতে বাধ্য করেন। ঔপনিবেশিক আমলাদের কাছে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক সমস্যা গুরুত্ব পেলেও, পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক কারণই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাভাগের সর্বশেষ পরিকল্পনাটি কার্যে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে কার্জন যথেষ্ট উৎসাহ ও তৎপরতা দেখান। তাঁর অনমনীয় মনোভাবই ভারত কাউন্সিলে বিরোধিতা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনাকে পাশ করিয়ে আনে। কার্জন বিশ্বাস করতেন যে, ''বাংলা ভাগ যে কংগ্রেসের অপছন্দ এটাই আমাদের বাংলা ভাগ প্রস্তাবের রাজনৈতিক সুবিধার সবচেয়ে বড় নিশ্চিতি।'' বাংলা ভাগের ফলে আরেকটি উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে। কার্জন পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর একটি স্মারকলিপি থেকে জানা যায় (৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ খ্রীঃ), বাংলা ভাগ কার্যত বাঙালি ভদ্রলোকদের ''শ্রেণীশাসন'' ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। বাঙালি ভদ্রলোক, জমিদার, মহাজন এবং পেশাদারি শ্রেণী যাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য, তাদের আধিপত্য বিনষ্ট করার জন্যই বাংলা ভাগের চিন্তা করা হয়েছিল। অন্য সব সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে শিক্ষা ও চাকরি-বাকরি পুরোপুরি তাদের দখলে ছিল। এই একাধিপত্যই ছিল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। কাজেই এইসব ভদ্রলোকদের ক্ষমতাকে খর্ব করার উপায় হল অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিকাশকে উৎসাহ দেওয়া। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানেরই ঔপনিবেশিক শাসকদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৬.২.৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় — পলাশি থেকে পার্টিশান

— আধুনিক ভারতের ইতিহাস

(From Plassey to Partition–A History of Modern India.)

২। Sumit Sakar — The Swadeshi Movement in Bengal.

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

৪। সুমিত সরকার — আধুনিক ভারত

৫। Rajat Kanta Ray – Social Conflict and Political Unrest in Bengal.

৬। John R. Mclane – Indian Nationalism and Early Congress.

৬.২.৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের কারণগুলি আলোচনা কর।

২। বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে কার্জনের দায়িত্ব আলোচনা কর।

৩। প্রশাসনিক সুবিধা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্ কারণটি অধিক দায়ি বলে মনে হয়?

(2) Swadeshi and Boycott Movements

(২) বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন : নানা ধারা বা প্রবণতা

বিন্যাস ক্রম

৬.২.১.২.০ : উদ্দেশ্য

৬.২.১.২.১ : ভূমিকা

৬.২.১.২.২ : নরমপন্থী ধারা

৬.২.১.২.৩ : গঠনমূলক স্বদেশী

৬.২.১.২.৪ : চরমপন্থী ধারা — বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

৬.২.১.২.৫ : সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

৬.২.১.২.৬ : স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

৬.২.১.২.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৬.২.১.২.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.২.১.২.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্ব

২। এই আন্দোলনের চারটি প্রধান ধারা বা প্রবণতা যেমন (১) নরমপন্থী ধারা, (২) গঠনমূলক স্বদেশী (৩) চরমপন্থী ধারা—যেমন বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, (৪) সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

৩। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা।

৬.২.১.২.১ : ভূমিকা

বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা লর্ড কার্জন কর্তৃক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাংলায় এর বিরোধিতা ও প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন বাংলায় শুরু হলেও এই আন্দোলনের প্রতিফলন অন্যান্য প্রদেশেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। জুলাই ১৯০৫ পর্যন্ত এই আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ নরমপন্দীদের অধীনে ছিল। এরপরে আন্দোলনের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, অমলেশ ত্রিপাঠী এবং ড্যানিয়েল আরগভ্ এই আন্দোলনকে একটি ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেছেন। অবশ্য তাঁরা একথাও বলেছেন যে, অবশেষে এই আন্দোলন নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই ধারায় ভাগ হয়ে যায়। অন্যদিকে সুমিত সরকারের মতে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে চারটি প্রবণতা বা ধারা বিদ্যমান ছিল। (১)

নরমপন্থী ঐতিহ্যের ধারা; (২) গঠনমূলক স্বদেশী (৩) বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (৪) সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা।

৬.২.১.২.২ : নরমপন্থী ধারা

ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জুলাই ১৯০৫-এ সময়কালে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা হয়েছিল প্রথাগত নরমপন্থী পদ্ধতিরই ঐকান্তিক প্রয়োগের মাধ্যমে—যেমন পত্র-পত্রিকায় প্রচার, অসংখ্য সভা-সমিতি ও দরখাস্ত (বিশেষত ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায়)। মার্চ ১৯০৪ ও জানুয়ারি ১৯০৫ এ কলকাতার টাউন হলে বহু জেলার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে দুটি বড় সভা হয়েছিল এবং বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে কিছু কিছু আবেদনপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের কাজকর্মের কৌশলগত দিক নিয়ে বিতর্ক উঠল কংগ্রেসের ভিতরেই। এই ধরনের ক্রিয়াকৌশলের সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতার থেকে শুরু হলো নতুন নতুন পথের সন্ধান। ১৩ই জুলাই ১৯০৫ এ কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্রিকা সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'তে প্রথম প্রস্তাব করা হয় ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের। ৭ই আগস্ট টাউন হল—এর সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত নেতারা যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর তা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আবেদনে অনুষ্ঠিত হল রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের মতো সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিবসে ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে পরস্পরের হাতে পরিয়ে দেওয়া হলো নানা রঙের রাখী। শোকের চিহ্ন হিসেবে উনুনে আগুন দেওয়া হল না এবং অরন্ধন পালন করা হল। ব্রিটিশরাও কার্লাইল সার্কুলার (২২ এ অক্টোবর প্রকাশিত) জারি করে ছাত্রদের ওপর অত্যাচার চালাল। জাতীয়তাবাদী প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অনুদান, বৃত্তি ও অনুমোদন প্রত্যাহারের ভয় দেখানো হল। ছাত্রদের উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে দেখা দিল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের আন্দোলন ও জাতীয় বিদ্যালয় সংগঠন।

বাংলায় শীঘ্রই এই আন্দোলনে অভ্যন্তরীণ মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিল। ১৯০৫ সালের বারাণসী কংগ্রেস থেকেই মহারাষ্ট্র এবং বাংলার চরমপন্থীদের মধ্যে বোঝাপড়া লক্ষ্য করা যায় এবং কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। স্বদেশীর কর্মসূচীও গৃহীত হয়। ১৯০৬ সালের কলকাতা অধিবেশনে চরমপন্থীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ বয়কটের প্রস্তাব রাখেন। অন্যদিকে নরমপন্থীরা চেয়েছিলেন সীমিত কয়েকটি ব্রিটিশ পণ্যের বয়কট। কলকাতার পূর্ণ অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী শেষপর্যন্ত উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে স্বরাজ লাভই ভারতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। সুমিত সরকার মনে করেন যে, এই ধরনের সব অভ্যন্তরীণ মতভেদের স্পষ্টতই একটা উপদলীয় দিকও ছিল। যে সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এতকাল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল (যেমন মতিলাল ঘোষ ও তাঁর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বা বিপিনচন্দ্র পাল বা অরবিন্দ ঘোষ), তাঁরা এবার জোর করে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন তাদের এতকালের বন্ধ এলাকায় এবং ভাঙতে চাইছিলেন 'উকিলদের চক্র'। অধ্যাপক সরকার এসব সত্ত্বেও মন্তব্য করেন যে, গোটা কাহিনীটিকে যদি 'ভেতরের ও বাইরের' লোকের সংঘাত হিসেবে হাজির করা হয় তবে তা অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে, আর রিক্ত করা হবে বাংলায় স্বদেশী যুগের সত্যিকারের আগ্রহের দিক ও তাৎপর্যকে। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় তাঁর "Social conflict and Political unrest in Bengal 1875-1927" গ্রন্থে বলেছেন যে,

নরমপন্থী নেতাদের ইতিবাচক কার্যকলাপ সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে ব্যাপক স্বদেশী আন্দোলনে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে নরমপন্থী নেতাদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে সুমিত সরকার নরমপন্থী নেতাদের কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা বয়কটের ব্যাপারটি প্রত্যাহারের কথা বলেন। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন যে, নরমপন্থীগণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 'বয়কটকে সাময়িক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সাধারণ জনগণের যোগদানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রূপান্তরিত করার কথা চিন্তা করেননি।

৬.২.১.২.৩ : গঠনমূলক স্বদেশী

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে বাংলায় রাজনৈতিক জীবনে, সুপ্রতিষ্ঠিত নরমপন্থী ঐতিহ্য ছাড়াও তিনটি প্রধান ধারাকে তত্ত্বগত স্তরে আলাদা করা যায়। এর একটি হল—'গঠনমূলক স্বদেশী'-নিষ্ফল ও আত্ম-অবমাননাকর 'ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতির পরিবর্তে স্বদেশী শিল্প, জাতীয় শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠনের মাধ্যমে আত্মসহায়তা। অধ্যাপক সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পূর্ব থেকেই স্বদেশী মেলা, দেশীয় ভাষা, রীতিনীতি, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে স্বদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত করবার প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয়েছিল। গ্রামে গঠনমূলক স্বদেশীর মূল চিন্তার ছক পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' ভাঙ্গন এবং প্রবন্ধে (১৯০৪)। চিরায়ত হিন্দু 'সমাজ' বা জনসম্প্রদায়ের পুনরুভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গ্রামে গঠনমূলক কাজকর্মের একটা নকশা রবীন্দ্রনাথ ছকে ফেলেছিলেন। পুরনো রাজনৈতিক পদ্ধতি ত্যাগ করে গ্রামভিত্তিক গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির কথা তিনি বলেছিলেন।

স্বদেশীর আদর্শকে কাজে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের নব্বই এর দশক থেকে। এরই সূত্র ধরে ১৮৯৭ এ খেলা হয়েছিল স্বদেশী ভাণ্ডার, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ইন্ডিয়ান স্টোরস এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সরলাদেবীর লক্ষ্মীভাণ্ডার। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল খোলা হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্রিকা 'ডন' ও ডন সোসাইটিতে স্বদেশী শিল্প ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। ভাগবত চতুষ্পাঠী (১৮৯৫), ডন সোসাইটিতে সাপ্তাহিক আলোচনা সভা, সারস্বত আশ্রম (১৯০২) এবং বোলপুরের আশ্রমের মতো জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অতএব ১৯০৫ এ যখন বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন শুরু হচ্ছে তখন আত্মশক্তি এবং স্বদেশীর আদর্শ বাংলার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমার দত্ত স্বদেশবান্ধব সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। বরিশাল, বাখরগঞ্জ -এ অশ্বিনীকুমার দত্ত-র এই সমিতি তার প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে (সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) দাবি করেছিল যে, ৮৯টি সালিশি কমিটি মারফত ৫২৩টি গ্রাম্য বিবাদের সুরাহা করা হয়েছিল। এপ্রিল ১৯০৭-এ প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বলা হয়, বাংলায় প্রায় এক হাজার গ্রামসমিতি কাজ করছে। উত্তরকালে গান্ধীজির কর্মসূচীর অনেকখানিরই সুস্পষ্ট পূর্বাভাস 'স্বদেশী' জাতীয় বিদ্যালয় ও গঠনমূলক গ্রামীণ কাজের মধ্যে পাওয়া যায়।

৬.২.১.২.৪ : চরমপন্থী ধারা - বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'আত্মশক্তি' বলেছিলেন, তার ঐ ধীর ও অনাড়ম্বর বিকাশের প্রেক্ষিত বাংলার উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদের মনে তেমন কোনো সাড়া জাগায়নি। তাঁরা অনেক বেশি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন অধিকতর রাজনৈতিক চরমপন্থার প্রত্যয়ের দিকে। নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি এবং 'আত্মশক্তির' পথ থেকে সরে গিয়ে এরা 'স্বরাজে'র জন্যে সংগ্রামর ডাক দিচ্ছিল। বিপিনচন্দ্র পালের (নিউ ইণ্ডিয়া', অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দে মাতরম', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' এর মতো পত্র-পত্রিকা স্বরাজের জন্যে সংগ্রামের ডাক দিচ্ছিল। স্বরাজ লাভের পদ্ধতি হিসেবে চরমপন্থীরা বেছে নিয়েছিলেন বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে 'বন্দে মাতরম'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছে—(পরে যা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোএধর নীতি' নামে পুনর্মুদ্রিত) অরবিন্দ ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ এবং সরকারী প্রশাসন বয়কট এবং এইসঙ্গে স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের বিরোধিতার কথা বলেন। আর তিনি প্রতীক্ষা করেছিলেন, ব্রিটিশদের দমন-পীড়ন যদি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে অসামাজিক আইন অমান্য আন্দোলন, রাজভক্তদের 'সামাজিক বয়কট' ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেওয়া হবে। ২১শে নভেম্বর, ১৯০৬ এর 'সন্ধ্যা' পত্রিকাতেও ঐ একই পরিপ্রেক্ষিতের পরিকল্পনা করেছিল ঃ '...চৌকিদার, পাহারাওয়ালা, ডেপুটি, মুন্সেফ, কেরানি—সেপাই-এর কথা না বললে চলে—প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে এক নিমেষেই এদেশে ফিরিঙ্গিদের শাসন শেষ হতে পারে।' অহিংসার গোঁড়ামি বাদ দিয়ে, গান্ধীবাদের পুরো ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মসূচিই এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

বয়কট ও স্বদেশী :

স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও গঠনমূলক কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্পে ও উৎপাদনে স্বয়ংভরতা অর্জন। ১৯০৫ সাল থেকে চরমপন্থী নেতৃত্ব বয়কট ও স্বদেশীকে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে মনে করেন। সুমিত সরকারের মতে, ১৯০৫ এর পরে গঠনমূলক স্বদেশীয় বদলে চরমপন্থী নেতৃত্ব Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনীতিকে গ্রহণ করেন যার মধ্যে বয়কট ও স্বদেশী শিল্প গঠন একটি অংশমাত্র ছিল। বয়কট কিছু প্রাথমিক সাফল্য অর্জনও করেছিল। বিদেশী দ্রব্য বর্জন স্বদেশী কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রধানত ম্যাঞ্চেস্টারের উৎপাদিত বস্ত্র, লিভারপুলের নুন এবং চিনি, সিগারেট ইত্যাদি দ্রব্য বয়কটের কথা বলা হয়েছিল। কলকাতার শুল্ক দফ্তরের কালেক্টর সেপ্টেম্বর ১৯০৬-এ লক্ষ্য করেন যে, আগস্ট ১৯০৫-এর তুলনায় আগস্ট ১৯০৬-এ সুতির থানে ২২%, তুলোজাত ও পাকানো সূতায় ৪০%, লবণে ১১%, সিগারেটে ৫৫%, বুটজুতোয় ৬৮% আমদানি কমেছে। লবণের আমদানি ১৯০৮-০৯ এ আরও কমে যায়। ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বিক্রি কমে যাওয়ার জন্য অনেকটাই দায়ি ছিল ব্যবসার শর্ত নিয়ে কলকাতার মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিদেশী মিল মালিকদের কোন্দল। তবে পূর্ব বাংলার বাখরগঞ্জ, ঢাকা জেলায় সমিতির সদস্যরা পিকেটিং, সামাজিক বহিষ্কার ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বয়কটকে সফল করে তুলেছিল। এর ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশালে বিদেশী বস্ত্র এবং লবণের আমদানি কমে যায়। এসব সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, বয়কট আন্দোলন বাস্তবে কিন্তু প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

বাংলায় স্বদেশী শিল্পোদ্যাগের ক্ষেত্রে স্বদেশী মেজাজ লক্ষণীয়ভাবে পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিল। স্বদেশী অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার সবচেয়ে নতুন দিক ছিল পশ্চিমী ধাঁচে বৃহদাকার শিল্প গঠনের পরিকল্পনা বর্জন। এই সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মতো স্বদেশী কাপড়ের মিল, চিনেমাটি, চামড়া, দেশলাই বা সাবানের কারখানা গড়ে উঠেছিল। সুমিত সরকারের মতে, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে অর্থনৈতিক স্বদেশী ক্রমশ: একটি সংগঠিত আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত বিদ্যা ও গবেষণা শুরু হয়েছিল, অন্যদিকে দেশীয় কারিগরী শিল্প এবং আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়াও স্বদেশী ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি ইত্যাদি ব্যবসার শুরু হতে দেখা যায় স্বদেশীযুগে।

বয়কট ও স্বদেশী ছাড়াও ১৯০৫-০৮ এর আন্দোলনের আরও যেসব প্রধান উপাদান ছিল তা হলো—জাতীয় শিক্ষা, শ্রমিক সংগঠন, সমিতি গঠন ও নানা গণসংযোগের পদ্ধতি। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো স্বদেশী বাংলায় জাতীয় শিক্ষা প্রয়াসেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। সুমিত সরকারের মতে, এর বিস্তার ছিল আরও বেশি, কারিগরী শিক্ষণের দাবি থেকে শুরু করে মাতৃভাষায় শিক্ষার সমর্থনে প্রচার। অবশ্য ছাত্র সম্প্রদায়ের বড় অংশকে জাতীয় শিক্ষা আকর্ষণ করতে পারেনি। কারণ, তাতে চাকরির সম্ভাবনা ছিল নগণ্য। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষাকে সর্বব্যাপী করে তোলা। শিক্ষা ও স্বদেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল ঃ ''আমাদের সমাজ যদি বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করে, তবে একদিন বলিতে হইবে।'... ডন সোসাইটির একটি সভায় কার্লাইল সার্কুলারের কথা উত্থাপন করে তিনি বলেন ঃ ''আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে''...জাতীয় শিক্ষা নিয়ে বিশিষ্ট মনীষীদের চিন্তাভাবনা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়ে ছিল যখন লর্ড কার্জন ১৯০৪ এ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা উচ্চশিক্ষার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিলেন। সরকারী দমনমূলকনীতির প্রতিবাদে এবং জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯০৫ এর ১০ই ডিসেম্বর Landholders Association এর একটি সভায় 'National Council of Education' বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এবং বিদ্যালয় গঠন করা হয়। এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। এছাড়া বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারিগরী ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হল : পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের প্রায় বারোটি এবং পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে তার চেয়েও যথেষ্ট পরিমাণে বেশি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন। ১৯০৮ এর মধ্যে প্রায় চল্লিশটা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যদিও কার্যত, একেবারেই কথায় ও কলমের লড়াই-এ এবং কংগ্রেস সংগঠন নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রচুর শক্তি ক্ষয় করেছিলেন বাংলার চরমপন্থীরা, তথাপি গুরুত্বপূর্ণ জেলা সংগঠন বা সমিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, বেশ কিছুটা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে তারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। গণ-জমায়েতের ক্ষেত্রে সমিতিগুলির ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম থেকেই সমিতিগুলি জনকল্যাণমূলক কাজে নিযুক্ত ছিল। এই সব সমিতিগুলিতে শরীরচর্চা, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা এবং স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হত। যাত্রা, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পল্লীসমাজ ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে সমিতিগুলি স্বদেশী চেতনা সম্প্রসারণে সাহায্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ গঠনের আদর্শ এবং অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনৈতিক

আদর্শ বাস্তবে পরিণত করবার দায়িত্ব নিয়েছিল সমিতি ও নানা সংগঠনগুলি। ১৯০৬ সালের একটি পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় কলকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় বয়কট আন্দোলনের সময় থেকে। বন্দেমাতরম সম্প্রদায়, ব্রতী, ভারত অনুশীলন সমিতি, শক্তি সমিতি ইত্যাদি অসংখ্য ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান এবং সমিতি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি নামে ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় যে সমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল স্বদেশ বান্ধব, ব্রতী, ঢাকা অনুশীলন সমিতি, সুহৃদ ও সাধনা। বিভিন্ন সভার মধ্য দিয়ে এই সমিতিগুলি সমিতি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করত। এছাড়া সমিতির নিজস্ব স্বদেশী ভাণ্ডার ও তাঁত বোনার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

স্বদেশী যুগে শ্রমিক বিক্ষোভ ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। 'অ্যান্ড্রু ফ্রেজার -এর অধীনে বাংলার প্রশাসন, ১৯০৩-০৮' শীর্ষক সরকারি সমীক্ষায় 'শিল্প বিক্ষোভ'কে এই শতাব্দীর বিশিষ্ট লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, আর 'পেশাদার বিক্ষোভকারী'দের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বেশ অভিনব ব্যাপার বলে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও সেইসঙ্গে প্রায়শঃই জাতিগত অপমান যা শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত শিল্প উত্যোগে শ্রমিকদের ধর্মঘটের ইন্ধন যোগাচ্ছিল। শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটগুলি বাংলায় জাতীয়তাবাদী মহল থেকে সংবাদপত্র যথেষ্ট সহানুভূতি, কখনও বা আর্থিক সহায়তা এবং এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার সাহায্যও পাচ্ছিল। অগ্রণী শ্রমিক নেতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তিন ব্যারিস্টার—যথা অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, অপূর্বকুমার ঘোষ। স্বদেশীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল মূলতঃ বিভিন্ন কারখানা বা সাহেব কোম্পানিগুলির কেরানিদের সঙ্গে এবং বাঙালী চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে। কিন্তু এই শ্রমিক বিক্ষোভ ১৯০৮ এর গ্রীষ্মের পর পুরোপুরিই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ১৯১৯-২১ এর পূর্বে তা আর নতুন করে দেখা দেয়নি।

৬.২.১.২.৫ : সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

স্বদেশী আন্দোলনের চতুর্থ ধারাটি ছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের ধারা। এই ধারাটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে জন্ম নিয়েছিল। প্রকাশ্য গণ আন্দোলনের পরিবর্তে এবং পরোক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনের স্থলে গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নতুন ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়েছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদই হয়ে উঠল শেষপর্যন্ত স্বদেশী বাংলার সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধিকার। র‍্যাডিকাল শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মনে তা মোহিনী মায়া বিস্তার করেছিল অন্ততঃ একপুরুষ বা তারও বেশি সময় ধরে।

অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন, এই পর্যায়ে অত্যাচারী রাজকর্মচারী বা বেইমানদের খতম করা, তহবিল সংগ্রহের জন্য স্বদেশী ডাকাতি, আর খুব বেশি হলে, ব্রিটেনের বিদেশী শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ায় আশায় সামরিক চক্রান্তে—'বিপ্লবী' আন্দোলন এইসব রূপ নিয়েছিল। কখনও কখনও কারও কারও যে ইচ্ছে থাকলেও, এটি কখনোই নাগরিক গণ-অভ্যুত্থান বা গ্রামাঞ্চলে গেরিলা ভিত্তির পর্যায়ে ওঠেনি। তাই সরকারের মতে, 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি বেঠিক নয়। ১৯০২ সালের মধ্যে বাংলায় চারটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল অনুশীলন সমিতি। ১৯০৫ সালে বিপ্লবী সংগঠনগুলি স্বদেশী আন্দোলনকে

কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পুনরায় কার্যকরী হয়ে ওঠে। অনুশীলন সমিতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাদের শাখা বিস্তার করে। ১৯০৬-এর ডিসেম্বরে প্রথম বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি সভ্য অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী যুগের বহু বিপ্লবী সংগঠনের শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে। সন্ত্রাসবাদ গড়ে উঠেছিল পূর্ববঙ্গে ও এর অগ্রণী ভূমিকায় ছিল পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে সংগঠিত ঢাকা অনুশীলন। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ধারা বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, ব্রিটিশ প্রশাসন কখনোই এই বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের ফলে ভেঙ্গে পড়ার মতো বড় বিপদে পড়েনি। সবচেয়ে বড় কথা, জনসাধারণকে সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামে টেনে আনার প্রচেষ্টাকে পিছিয়ে দিল এই বিপ্লবী কার্যকলাপ। তা সত্ত্বেও এদের অবদান হল, ব্রিটিশরা প্রায়ই খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ত এদের কার্যকলাপে। এদের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বার্থে স্থাপিত হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্বের বিরল দৃষ্টান্ত। শিক্ষিত ভারতীয়দের বহু ব্যাপক অংশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী বীরত্ব জাগিয়ে তুলেছিল বিরাট প্রশংসার ভাব। যেমন, ক্ষুদিরামকে নিয়ে এক পথের ভিখিরির বিলার তাঁর ফাঁসির কয়েক দশক পরেও বাংলায় শোনা যেত।

৬.২.১.২.৬ : স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

স্বদেশী আন্দোলন নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও এই আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তার ব্যর্থতা ডেকে এনেছিল। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে, স্বদেশী আন্দোলন 'ভদ্রলোক' এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কৃষকদের জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচিন না থাকার ফলে, গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য কৃষক এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দিতে পারেনি। আন্দোলনে 'বয়কট' প্রথমদিকে সাফল্যলাভ করলেও পরে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। স্বদেশী তাঁতের কাপড় ছিল নিম্নমানের। এছাড়া গ্রামের মানুষের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অতিরিক্ত মূল্যে কেনা সম্ভব ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বয়কট তার তাৎপর্য হারিয়েছিল। পুঁজির অভাব এবং সরকারী সাহায্যের অভাবের জন্য স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ খুব প্রসারলাভ করেনি।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি বড় অন্তরায় ছিল উপদলীয় কোন্দল। অধ্যাপক সরকার এই উপদলীয় কোন্দলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির আগমনের ফলে কোনো একটি সুষ্ঠু, সুনির্দিষ্ট বিশেষ রাজনৈতিক পদ্ধতি বা ধারা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতা আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন (১৯০৬) ও জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ছাত্রসমাজকে আকৃষ্ট করতে পারেনি; কারণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরিয়ে উপযুক্ত চাকুরির সম্ভাবনা ছিল কম। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি গণশিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দেয়নি।

তৃতীয়ত, স্বদেশী আন্দোলন ছিল মূলতঃ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আন্দোলন এবং তারাই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এরা কৃষক, শ্রমিক এবং জনসাধারণকে সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামে টেনে আনার প্রচেষ্টা তেমনভাবে চালাননি। নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্নবর্গীয় জাতি সম্প্রদায়ের মানুষও এই আন্দোলনে সামিল হয়নি। অধ্যাপক সুমিত সরকার স্বদেশী নেতাদের গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কথা বলেছেন।

চতুর্থত, স্বদেশী যুগে সমিতি আন্দোলনের কতকগুলি সীমাবদ্ধতা ছিল। সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ দরিদ্র কৃষকগণ স্বদেশী আন্দোলনকারীগণকে ভূমিজ বা ভূমধ্যকারী শ্রেণীর সমার্থক বলে মনে করতেন। এই ভূমধ্যকারী শ্রেণী ও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত বিরোধ ছিল। কৃষক ও ভূমিজ শ্রেণীর এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল যখন সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ কৃষকদের স্বদেশী পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য কনে। এইভাবে সমিতিগুলির সঙ্গে কৃষকদের একটি ব্যবধান গড়ে ওঠে।

পঞ্চমত, আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে, স্বদেশী বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এই আন্দোলন ও বিক্ষোভ ছাপাখানা ও রেলের কেরানি এবং কলকাতা ও তার আশেপাশের চটকলগুলির বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বহিরাগত শ্রমিকরা এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তাছাড়া স্বদেশীযুগের শ্রমিক আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে স্বদেশীযুগের মূল আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করার কোন প্রচেষ্টা চালানো হয়নি।

সবশেষে বলা যায়, স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঐ সময়কার একটি গুরুতর লক্ষণীয় পরিবর্তন ছিল মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্রুত বৃদ্ধি যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

৬.২.১.২.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

Sumit Sarkar – The Swadeshi Movement in Bengal

Sekhar Bandyopadhyay – From Plassey to Partition – A History of Modern India.

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশি থেকে পার্টিশান

—আধুনিক ভারতের ইতিহাস

Rajat Kanta Ray–Social conflict and Political unrest in Bengal

সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭

গণশক্তি (প্রকাশনা)—বজ্রশিখায় বাংলা।

৬.২.১.২.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Give a brief account of the Swadeshi Movement in Bengal.

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

2. Analyse the different trends in the Swadeshi Movement in Bengal.

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা আলোচনা কর।

3. Analyse the nature and programme of constructive Swadeshi as followed in the wake of the Swadeshi Movement.

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অনুসৃত গঠনমূলক স্বদেশীর স্বরূপ এবং কর্মসূচি বিশ্লেষণ কর।

4. Discuss the limitations of the Swadeshi Movement.

স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাগুলি আলোচনা কর।

(3) Hindu-Muslim Reactions and Relations

(৩) স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়া

বিন্যাস ক্রম

৬.২.৩.০ : উদ্দেশ্য

৬.২.৩.১ : স্বদেশীযুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

৬.২.৩.২ : মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদ

৬.২.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৬.২.৩.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.২.৩.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন বাংলায় হিদু-মুসলমানের সম্পর্কের প্রকৃতি।

২। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ।

৬.২.৩.১ : স্বদেশীযুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

অধ্যাপক সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। বাংলাকে ভাগ করে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যকে প্রকট করে তোলাই ছিল ব্রিটিশ প্রশাসকদের উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিক সরকারের বিভেদমূলক নীতি এবং একশ্রেণীর রাজনৈতিক চরমপন্থীদের হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক দিকগুলির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ বা তিলকের 'শিবাজী উৎসব' এবং সদর্প ঘোষণা, ''আমরা হিন্দু ও আমরা পৌত্তলিক এবং এর মধ্যে কোন লজ্জা নেই।''—এই ধরনের মানসিকতা এমনকি জাতীয়তাবাদী মুসলিমদেরও বিচলিত করেছিল। 'ছোলতান' ও 'মুসলমান' পত্রিকায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই বিচলিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার মুসলমান তেমনভাবে এগিয়ে আসেনি বলে যে অনেকে মনে করেন তা সঠিক নয়। ঐ যুগে অনেক বিখ্যাত, স্বল্পখ্যাত ও অখ্যাত মুসলমান, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ ও নিম্নবর্গের বহু মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। এমনকি স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব পদেও ছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান যেমন—ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, আবুল হোসেন, আবদুল হক, আবদুল গফুর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সোচ্চার আবেদন, ভ্রাতৃত্বের স্মরণীয় দৃশ্য উল্লেখ করার মত। ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—এ কলকাতায় ১০,০০০ হিন্দু—মুসলমান ছাত্রের মিলিত শোভাযাত্রা, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বড় দৃষ্টান্ত। লিয়াকৎ হোসেনের সাহস ও আত্মত্যাগ কলকাতার যুবকদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। উর্দুভাষী মুসলমানদের ওপরেও লিয়াকৎ হোসেনের

প্রভাব ছিল। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই 'ভেদ ও শাসন' নীতি অনুসরণ করে সরকার এই আন্দোলনকে দুর্বল করতে তৎপর হয়।

৬.২.৩.২ : মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদ

কিন্তু খুবই সক্রিয় ও নিষ্ঠাবান স্বদেশী মুসলমান প্রচারক গোষ্ঠীর উপস্থিতি সত্ত্বেও নতুন প্রদেশ মানেই আরও বেশি চাকরি—এই ব্রিটিশ প্রচার উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিতে যথেষ্ট সফল হয়েছিল। কয়েকজন প্রভাবশালী মুসলিম নেতা কার্জনের বাংলা ভাগের প্রস্তাব সমর্থন করেন। অধ্যাপক সুমিত সরকারে মতে, স্বদেশী বাংলায় সত্যিকারের গুরুতর পরিবর্তন হলো মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্রুত বৃদ্ধি। ঢাকার নবাব সালিমুল্লা ও তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী এবং অক্টোবর ১৯০৬ এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা শুরু করে। সালিমুল্লা ছাড়াও ময়মনসিংহের নবাব আলি চৌধুরী ও কলকাতার নবাব সৈয়দ আমির হোসেন স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এর ফলে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন বিরোধী সম্প্রদায়গত মনোভাবই প্রকট হয়। পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবির্ভাব ঘটে। মে ১৯০৬-এ ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে, কুমিল্লায় মার্চ, ১৯০৭-এ; এপ্রিল-মে ১৯০৭ এ জামালপুরে, দেওয়ানগঞ্জ ও বক্সীগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। তাতে পরিস্থিতি খুবই জোরালো হয়ে উঠে। কুমিল্লা শহরের দাঙ্গার লক্ষণীয় ছিল, 'বাজারের নিচু শ্রেণীর সাধারণ মুসলমানরা' অংশ নিয়েছিল।

অন্যদিকে ময়মনসিংহের গোলযোগের একটা কৃষিঘটিত চরিত্র ছিল প্রকট। দাঙ্গাকারীদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা—এদের মধ্যে কেউ কেউ তখন হিন্দু দেবদেবীর পুজো বহাল রাখার জন্যে 'ঈশ্বরবৃত্তি' চাপাতে শুরু করেছিলেন। তাই নানান জায়গায় ঋণপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, কখন কখনও দাঙ্গায় 'গরিবরা বড়লোকদের লুঠতরাজ করেছে'—এমনরূপ নিয়েছিল। কোথাও কোথাও এমনকি হিন্দু চাষীরাও এতে যোগ দিয়েছিল, মৌলবিরা নাকি গুজব রটাচ্ছিলেন ব্রিটিশরা ঢাকার নবাব সালিমুল্লার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে এবং 'নবাব সাহাবের সুবিচার' নামে এক সাম্প্রদায়িক পুস্তিকায় তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছিল একজন ভাতা হিসেবে। মুসলিম প্রচারমূলক লেখাপত্রে জমিদার—মহাজন শোষকদের সঙ্গে এক করা হয়েছে হিন্দুদের। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমাবনতির চিত্র রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। ১৯০৭-০৮ এ রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একগুচ্ছ নিবন্ধে তথা পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের (ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) সভাপতির অভিভাষণে মন্তব্য করেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য শুধুমাত্র ইংরেজদের দোষ দেওয়া যথেষ্ট নয়। ''শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না'' আর সমস্যা হচ্ছে এই যে ''শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটি মহাসমুদ্রের ব্যবধান''। (ব্যাধি ও প্রতিকার)। এই ব্যবধান দূর করাই একান্ত অপরিহার্য ছিল, যা হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের কোন সুস্পষ্ট কৃষিভিত্তিক কর্মসূচি না থাকায় গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম কৃষক শ্রেণীকে ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়নি।

৬.২.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সুমিত সরকার—The Swadeshi Movement in Bengal.

২। সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত

৩। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশি থেকে পার্টিশান—আধুনিক ভারতের ইতিহাস

৪। গণশক্তি (প্রকাশনা)—বজ্রশিখায় বাংলা।

৬.২.৩.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। স্বদেশী যুগে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক কি রকম ছিল তা আলোচনা কর।

২। স্বদেশী যুগে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতির কারণ কি কি?

৩। স্বদেশী যুগে কি মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রকট হয়েছিল?

৪। স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

৫। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ স্বদেশী আন্দোলনের উপর কি প্রভাব ফেলেছিল?

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-২

Partition (1905) and Swadeshi Movement and Militant Nationalism

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও স্বদেশী আন্দোলন ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ

একক-৪

বঙ্গভঙ্গ ঃ (The Patition of Bengal–1905)

বিন্যাস ক্রম

৬.২.৪.০ : উদ্দেশ্য

৬.২.৪.১ : বঙ্গভঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য

৬.২.৪.২ : স্বদেশী আন্দোলন (The Swadeshi Movement in Bengal)

৬.২.৪.৩ : সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism)

(ক) চরমপন্থার উদ্ভব ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ (Growth of extremism and extremist leaders);

কয়েকজন চরমপন্থী নেতা

৬.২.৪.৩.১ : অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)

৬.২.৪.৩.২ : বাল গঙ্গাধর তিলক

৬.২.৪.৩.৩ : লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫-১৯২৮)

৬.২.৪.৩.৪ : বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)

(খ) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ (Revolutionary Terrorism)

(গ) বাংলার সমিতিসমূহ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ও তাদের কর্মপদ্ধতি,

৬.২.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থ

৬.২.৪.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.২.৪.০ : প্রস্তাবনা

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করা হয়। এর পিছনে ইংরেজ সরকারের প্রধান প্রকাশ্য

যুক্তি ছিল প্রশাসনিক সুবিধা। একের পর এক অঞ্চল অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে ক্রমেই বাংলা প্রেসিডেন্সির সীমানাবৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৮৫৪ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল এবং এর প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন লেফটোন্যান্ট গর্ভনরের হাতে ন্যস্ত ছিল। বস্তুত বাংলা প্রেসিডেন্সি আকারে এতটা বৃহৎ ছিল যে, একজন প্রশাসকের পক্ষে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাবার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সুদূর কলকাতা থেকে ত্রাণকার্যের ঘোরতর অসুবিধা দেখা দেয়। এই সময় থেকে বাংলা প্রেসিন্ডিকে ভাগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন সরকারি মহলে আলোচনা শুরু হয়। ১৮৭৪ সালে বাংলা থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং আসামের প্রশাসন একজন কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এ সময় গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট এই তিনটি বাংলা ভাষাভাষী জেলাও আসামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। তবে এই পর্যায়ের বাংলা বিভাজন নীতিতে হয়ত প্রশাসনিক সুব্যবস্থার দিকটিই বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল।

ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, কার্জন ভাইসরয় নিযুক্ত হওয়ার আগেই (১৮৯৯) ব্রিটিশ প্রশাসকরা বাংলা ব্যবচ্ছেদের কথা ভেবেছিলেন এবং এর পিছনে হয়তো প্রশাসনিক কারণই বড় ছিল। লর্ড কার্জন ভারতের শাসনভার নিয়ে প্রথমদিকে এই আঞ্চলিক পুনর্গঠনের দিকে বিশেষ নজর দেননি। ১৯০০ সালের মার্চ মাসে কার্জন আসাম সফরে গেলে সেখানকার ইউরোপীয় চা-বাগিচা মালিকরা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে সমুদ্র যাওয়ার পথ কলকাতা বন্দর অপেক্ষা কাছাকাছি কোথাও দাবি করে, যাতে আসাম-বাংলা রেলপথের উপরে তাদের কম নির্ভর করতে হয়। তারা চট্টগ্রামের মত নিকটবর্তী বন্দর মারফত চা রপ্তানির সুযোগ করে দেওয়ার আর্জি জানান। এই সময় কার্জন একযোগে বাংলা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কর্মসূচী নেন। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলার জনসংখ্যা ৭৮.৫ মিলিয়নে পৌঁছে গেছে। ফলে বাংলা ভাগ জরুরি ভিত্তিতে দরকার হয়ে পড়ে। ১৯০৩ সালের ২৮শে মার্চ বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর Andrew Fraser আবার নতুন করে এক বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন। কার্জন সমর্থিত এই প্রস্তাবে চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সাথে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব Sir H. H. Risley একটি চিঠিতে বাংলা সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন যে, সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সাথে সংযুক্ত করা হোক (৩রা ডিসেম্বর, ১৯০৩)। রিজলের পরিকল্পনা প্রকাশিত হলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ইংরেজদের মুখপত্র 'ইংলিশ ম্যান' পত্রিকা এবং ইউরোপীয় বণিক সংখ্যাগুলিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে কার্জন ১৯০৪ সালে পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি ঢাকার নবাব ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবর্গকে বোঝালেন যে, বঙ্গভঙ্গ পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের সামনে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে। এর পাশাপাশি গোপনে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হতে থাকে।

১৯০৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি কার্জন বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি ইংলণ্ডে পাঠান। ভারত সচিব ব্রডরিক এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু কার্জনের দৃঢ়তার কাছে নতিস্বীকার করে, শেষপর্যন্ত তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গের সরকার আদেশনামা জারি করেন ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করা হয়। চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং রাজশাহি বিভাগ, মালদহ এবং দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি জেলা, তৎসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আসামসহ গঠিত হল 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'। এই প্রদেশের প্রশাসক হলেন একজন 'লেফটোন্যান্ট-গভর্নর' ও রাজধানী হল ঢাকা নগর। এই

প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ৩১ মিলিয়ন, যার মধ্যে ১৮ মিলিয়ন ছিল মুসলমান এবং ১২ মিলিয়ন ছিল হিন্দু। অপরদিকে অবশিষ্ট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় 'বাংলা প্রদেশ (Bengal) ও এর রাজধানী হল কলকাতা। এই প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫৪ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৪২ মিলিয়নই ছিল হিন্দু। তবে এই প্রদেশে বাঙালি হিন্দুরা ছিল ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু। এইভাবে বঙ্গভঙ্গের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা যায়নি ঠিকই, কিন্তু জনমতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে, এইভাবে বাংলা ভাগ একটি প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করল।

৬.২.৪.১ : বঙ্গভঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার সমর্থনে লর্ড কার্জন যে প্রকাশ্য যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তাতে প্রশাসনিক প্রয়োজনের কথা বারবার উঠে এসেছে। তাঁর মতে, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এবং আসাম প্রদেশের উন্নয়নের জন্য বাংলাকে দ্বি-খণ্ডিত করা উচিত। মাত্র একজন গভর্নরের পক্ষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত এতবড় একটি প্রদেশের শাসনভার পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতা থেকে সুদূর পূর্ববঙ্গকে শাসন করা যাচ্ছে না বলে এই অঞ্চলের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাছাড়া, আসাম সমস্যাটিরও সমাধান প্রয়োজন ছিল। স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে গঠিত হলেও আসাম অবহেলিত ছিল। কোনও দক্ষ ইংরেজ কর্মচারী সেখানে যেতে চাইত না। তাই আসাম, পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত হয়ে একটি নতুন প্রদেশ-এ পরিণত হলে সেখানে একটি দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তাছাড়া আসামের চা, তেল, কয়লা প্রভৃতি চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কম খরচে বাইরে রপ্তানি করা যাবে। তবে এইসব যুক্তিগুলির মধ্যে কিছু ফাঁক রয়েছে, যা তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, ১৯০৩ পর্যন্ত সরকার প্রশাসনিক উপযোগিতার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারটি বিবেচনা করেছিলেন। এরপর ব্যাপারটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতে থাকে। যদি শুধুমাত্র প্রশাসনিক সুবিধা দেখা হতো, তাহলে বাংলা ভাষভাষী অঞ্চলগুলিকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ না করে ভাষার ভিত্তিতে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভাগ করা হতো। এই ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন অনেক যুক্তিসঙ্গত হতো। রিজলে পরিকল্পনার বিকল্প হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেন—এক, ভিন্ন ভাষাভাষী বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ও জনসংখ্যা হ্রাস করা হোক অথবা, দুই, প্রশাসনের সুবিধার জন্য একজন পূর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন প্রশাসকের অধীনে একটি শাসন পরিষদ গঠন করা হোক, যে ব্যবস্থা বোম্বাই ও মাদ্রাজে ছিল। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা কোন প্রস্তাবকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। বাংলার জাতীয়তাবাদকে দমন করতে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করার দরকার তারা মনে করেন। আর, বাংলায় একজন পূর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন প্রশাসক ও কাউন্সিল নিযুক্ত হলে, ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হত। সুতরাং দুটি প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করা হয়। বস্তুতঃ ফ্রেজার ও রিজলের মতো ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা মনে করতেন যে বাঙালি নেতৃবর্গ কর্তৃক পরিচালিত জাতিয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য বাংলা ভাগ প্রয়োজন। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, বাংলা ভাগের মূল পরিকল্পনা কার্জনের নয়—ফ্রেজারের মস্তিষ্ক প্রসূত এই পরিকল্পনাটি স্বরাষ্ট্র-সচিব রিজলের অনুমোদন লাভ করলে, কার্জন তাকে বাস্তবায়িত করেন। এটি ছিল ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের তীব্র বাঙালি বিদ্বেষের অন্যতম ফসল।

বড়লাট নিযুক্ত হবার আগেই কার্জনের, আমলাদের এই বাঙালিবিরোধী মনোভাবের সাথে পরিচয় ছিল। কার্জন নিজেও বাঙালি সম্প্রদায়কে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করতে ইচ্ছুক ছিলেন। রাজনৈতিক কারণেই কার্জন ভাষাভিত্তিক বাংলা ভাগের প্রস্তাবকে খারিজ করে দেন। ভাষাভিত্তিক বিভাজন হলে বাঙালি রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আরও সংহত হত ও তাঁরা রাজনৈতিকভাবে আরও সবল হতেন। ১৯০৩-র ৩১শে ডিসেম্বর কার্জন ভারত-সচিব ব্রডরিককে লিখেছিলেন যে, বাঙালিরা নিজেদের একটা মহাজাতি মনে করে এবং তারা ইংরেজদের বিতাড়ন করার স্বপ্ন দেখে। যদি তাদের কাছে নতিস্বীকার করা হয় তাহলে ভারতের পূর্বসীমান্তে তারা একটি সুদৃঢ় শক্তিতে পরিণত হবে, যা ক্রমবর্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে উঠবে। কার্জনের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ভেদনীতি নিয়ে ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব কার্যকরী করতে চান। বস্তুতঃ বাংলা বিভাজনের প্রকৃত কারণ আমাদের ঔপনিবেশিক সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই খুঁজতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী কার্জন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে উস্কে দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী ঐক্যে ভাঙন ধরানোর উদ্যোগ নেন। তিনি পূর্ব বাংলার মুসলিমদের বোঝান যে, তারা নবগঠিত মুসলিম প্রধান প্রদেশে বিকাশের সুযোগ পাবেন ও তাদের হৃতগৌরব ফিরে পাবেন। মুঘল আমলের ঢাকার গৌরব ফিরিয়ে আনার কথা তিনি ঢাকায় এক ভাষণে বলেছিলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে সহজ শর্তে এক লক্ষ পাউন্ড সরকারি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে, কার্জন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল, নতুন প্রদেশে রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে অনগ্রসর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সরকারের প্রতি অনুগত রাখা এবং সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের পঙ্গু করে রাখা। অপরদিকে বিহার ও উড়িষ্যার সাথে পশ্চিমবাংলাকে সংযুক্ত করে, সেখানকার রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত বাঙালি হিন্দুদের বিহারী ও উড়িয়াদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে নতজানু করা। এরফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙালি হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়বে। ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্রসচিব রিজলে তাঁর সরকারি মন্তব্যে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দেন—"Bengal united is a power : Bengal divided will pull in several different ways" অন্যদিকে কার্জন বিশ্বাস করতেন যে, কংগ্রেস যেহেতু বঙ্গভঙ্গের বিরোধী, সুতরাং বঙ্গভঙ্গ সরকারের পক্ষে রাজনৈতিক দিক থেকে লাভজনক। এইভাবে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির ফল হিসাবে বঙ্গভঙ্গ রূপায়িত হয় (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫)

৬.২.৪.২ : স্বদেশী আন্দোলন (The Swadeshi Movement in Bengal)

বাংলা তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ একটি চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে। বাংলার জাতীয়তাবাদীদের বিভক্ত করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করা বঙ্গভঙ্গের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—বরং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী তথা স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে তারা আরও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়। ১৯৫০ সালেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকলে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' ('Bengali') পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয় বলে আখ্যা দেন এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের উপর জোর দেন। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে লালমোহন ঘোষ বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার সমালোচনা করেন। ১৯০৪ সালের জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে বাঙালির জাতিসত্তাকে খণ্ডিত করার পরিকল্পনা

বলে অভিহিত করা হয়। প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেলেও ঔপনিবেশিক সরকার সেটিকে বেশী গুরুত্ব দেননি। তাদের এই ধারণা হয়েছিল যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রতিবাদ কিছুদিনের মধ্যেই থেমে যাবে এবং আবেদন-নিবেদনের প্রচলিত সীমানার বাইরে কোন আন্দোলনের ব্যপ্তি ঘটবে না। কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে ঘোষিত ও কার্যকরী হওয়ার পরে আন্দোলন আরও শক্তিশালী ও সংগঠিত হয়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ রদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু খুব দ্রুত এই আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়কে জড়িয়ে নিয়ে আরও বড় আকার ধারণ করে। ডঃ সুমিত সরকারের মতে আন্দোলন প্রচলিত গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসে, নানা নতুন ও জঙ্গী কৌশল গ্রহণ করে এবং বহু মানুষকে সংগঠিত করে স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯০৩-র ডিসেম্বর থেকে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার পর্যন্ত (১৯১১) প্রতিবাদী আন্দোলন কোন না কোনভাবে প্রচলিত ছিল। তবে তত্ত্বগতভাবে স্বদেশী আন্দোলন জোরদার ছিল ১৯০৮ সালের আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আন্দোলনের পদ্ধতি ও তীব্রতার তারতম্য ঘটেছিল—আন্দোলনের প্রকৃতিও সেই অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছিল। ডঃ সুমিত সরকার তাঁর 'Swadeshi Movement in Bengal, 1903-8' গ্রন্থে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে চারটি ধারা বা পর্বকে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি হল—(ক) নরমপন্থী ধারা, (খ) গঠনমূলক স্বদেশী বা আত্মশক্তির ধারা, (গ) রাজনৈতিক চরমপন্থার ধারা এবং (ঘ) বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী ধারা। তবে ডঃ সরকারের মতে এই ধারাগুলির মধ্যে কালগত পরম্পরা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ আলোচ্য সময়ে এগুলি মোটামুটি এক সঙ্গেই উপস্থিত ছিল।

১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার সময় থেকেই নরমপন্থী নেতারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করেন। ডঃ সরকারের মতে, "The traditional techniques of moderate agitation got a full trial during the first phase of the anti-partition movement from Dec., 1903-July 1905." এই সময়ের আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক পথেই পরিচালিত হয়েছিল। নরমপন্থী পরিচালিত কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের উদ্যোগকে সমালোচনা করে, তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে প্রয়াসী হয়। নরমপন্থী নেতাদের আন্দোলনের কৌশল ছিল বিভিন্ন সভা-সমিতির দ্বারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন, সংবাদপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আবেদন পত্র সরকারের কাছে প্রেরণ, পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশের মাধ্যমে বঙ্গবিভাজনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। ১৯০৩-র ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সারা বাংলায় প্রায় দু-হাজার সমাবেশে নরমপন্থী নেতারা বক্তব্য রাখেন। ১৯০৪ সালের মার্চ এবং ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দুটি বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যোগদান করেন। ভারত সরকার এবং ইংলন্ডে ভারত সচিবের কাছে বহু স্মারকলিপি পাঠানো হয়। ব্রিটিশ কমন্সসভার হস্তক্ষেপ দাবি করে ৬০ হাজার মানুষের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি হাউস অব কমন্স পেশ করা হয়। 'বেঙ্গলী', 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বঙ্গভঙ্গের অপ্রয়োজনীয়তা ও পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রচার করে। বাংলার অন্যান্য পত্রিকাগুলি, এমনকি ভারত ও ভারতের বাইরের ব্রিটিশ মালিকানাধীন পত্রিকাগুলি, যেমন 'স্টেটসম্যান', 'দি টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া', 'পাইওনীয়ার', 'দ্যা টাইমস্', 'ডেইলি নিউজ' প্রভৃতি সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। লন্ডনের Daily News পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'অদূরদর্শী রাজনীতিক জ্ঞানের পরিচায়ক' বলে মন্তব্য করা হয়।

নরমপন্থী নেতারা আশা করেছিলেন যে, আবেদন, নিবেদন, জনসভা, প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে তাদের সিদ্ধান্তের পুনর্বিচারে বাধ্য করবেন। কিন্তু সমবেত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষিত হয় ও ১৬ই অক্টোবর তাকে কার্যকর করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাকে চরমপন্থীরা 'নরমপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতা' বলে অভিহিত করেছেন। তবে নরমপন্থীরা বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হবার পর, তাঁদের নিয়মতান্ত্রিক আবেদন নিবেদনের রাজনৈতিক পদ্ধতি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। ১৯০৫ সালের ১৭ই জুলাই কলকাতার এক জনসভায় নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাক দেন। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বয়কটের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পালন হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই সভায় যোগদান করে স্বদেশী ও বয়কটের শপথ গ্রহণ করে। এই সময় থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিছুটা দ্বিধা সত্ত্বেও নরমপন্থী নেতারা বয়কট কর্মসূচী সফল করতে এগিয়ে আসেন। তবে তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন অপরিবর্তিতই থাকে। তাঁরা শুধু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাতে বঙ্গ ভঙ্গ পরিকল্পনাটির পুনর্বিবেচনা হয়। এই সময় উদারপন্থী বলে পরিচিত Morley ভারত-সচিব নিযুক্ত হন। নরমপন্থীরা আশা করেছিলেন Morely হয়ত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে সংশোধন করবেন। কিন্তু তিনিও বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। এমতাবস্থায় চরমপন্থী ধারার বিকাশ ঘটে।

ডঃ সুমিত সরকারের মতে, ১৯০৫ সালের মধ্যে চরমপন্থী ধারার দুটি প্রধান দিক লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। একটি হল গঠনমূলক স্বদেশী, যেখানে জোর দেওয়া হয় আত্মনির্ভরতার ভাব জাগিয়ে তোলার ওপর। অপরটি হল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা বয়কট। এই পর্বের আন্দোলনে 'গঠনমূলক স্বদেশী' বা আত্মশক্তি বিকাশের ধারা এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ধারা পাশাপাশি অগ্রসর হয়।

'স্বদেশী' ও 'বয়কট' সম্পর্কিত ধারণা ভারতে কোন নতুন আদর্শ ছিল না। ম্যাঞ্চেস্টার মিল জাত বস্ত্র থেকে ভারতীয় বস্ত্র শিক্ষাকে রক্ষা করার জন্য ১৮৭৪-৭৬ সালে বয়কটের কথা বলা হয়েছিল। ১৮৮৩-৮৪তে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে এবং নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। ১৮৪৯ সালে গোপালরাও দেশমুখ পুনায় স্বদেশীর কথা বলেছিলেন। ১৮৬৭তে 'হিন্দুমেলা' ও স্বদেশী আদর্শ প্রচার করে। এছাড়া মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, স্বামী দয়ানন্দ প্রমুখরাও স্বদেশীর কথা প্রচার করেন। 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' ধারণা দুটি পরস্পর সম্পর্কিত। ভগিনী নিবেদিতার মতে, ''Swadeshi and Boycott are the two necessary aspects of one and the same thing. One cannot flourish and strive without the help of the other'. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, যদিও স্বদেশী ও বয়কটের আদর্শ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তবুও বয়কটের আদর্শই মানুষকে প্রথম অনুপ্রাণিত করে এবং পরে তার পরিপূরক হিসাবে 'স্বদেশী' ভাবনা জনপ্রিয় হয়েছে। যাইহোক ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে বয়কট ও স্বদেশী নতুন তাৎপর্য লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলনের নানা পর্বে এই দুটি আদর্শ রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক রূপে গণ্য হয়েছে। তবে এই দুটি আদর্শের প্রয়োগের তারতম্যের ব্যাপারে নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল।

ডঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, প্রথম দিকে বাংলার চরমপন্থীদের গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল। ডঃ সুমিত সরকার লিখেছেন, নিষ্ফল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি বর্জন করে স্বদেশী শিল্প,

জাতীয় শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠনের মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জন করাই ছিল এই ধারার উদ্দেশ্য। ৯০-র দশক থেকেই এই ধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল। সতীশচন্দ্র মুখার্জির ভগবৎ চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠার (১৮৯৫) মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডন সোসাইটি (১৯০২-০৭)। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ সালে প্রদত্ত তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক ভাষণে তিনি আত্মশক্তি জাগরণের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কর্মসূচীর রূপরেখা দেন। তবে ১৮৯০-১৮৯৮ সালের মধ্যে তাঁর রচিত একাধিক প্রবন্ধে বাংলার আত্মশক্তি অর্জনের কথা পাওয়া গিয়েছিল। এই রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, 'মন্ত্রী অভিষেক' (১৮৯০), 'শিক্ষার হেরফের' (১৮৯২), 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩), 'অপমানের প্রতিকার' (১৮৯৪) প্রভৃতি। এই রচনাগুলিতে তিনি বলেন, আত্মশক্তি অর্জন দ্বারাই ইংরেজের জাতিবিদ্বেষ নীতি ও অপমানকর আচরণের প্রতিবাদ করা যাবে।১৯০৪ সালের 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় তিনি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে 'আত্মশক্তি' ও গঠনমূলক স্বদেশীর ধারণাকে স্পষ্ট রূপ দেন। তিনি উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে, মাতৃভাষার মাধ্যমে যোগসাধনের ওপর জোর দেন। গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের চেতনা জাগ্রত করার পরামর্শ দেন। অনেকের মতে, আত্মশক্তি জাগরণের পাশাপাশি ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের উপর জোর দেওয়া হয়। ডঃ সুমিত সরকারের মতে, বিংশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে চরমপন্থার স্বদেশী রাজনীতি অন্যতম ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর সাথে জড়িয়ে ছিল হিন্দু-পুনরুত্থানের সমস্যা। একটা বিশেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাপারটি এড়াতে পারেননি। তাঁর ভাষায়, ''The intervening years 1901-6 are marked by the definite ascendancy of revivalist ideas in Rabindranath's mind....' বস্তুতঃ সরকারের মতে ১৮৮২ থেকে ১৯০৮-এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য রচনাতে আধুনিকতা (Modernist) এবং সাবেকি (Traditionalist) ধারার মধ্যে টানাপোড়েন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৫ এবং ১৯০১ থেকে ১৯০৬-র গদ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন, আর মধ্যবর্তী বাকি সময়ে এবং ১৯০৮-র পর থেকে তাঁর রচনায় আধুনিকার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানেই ১৯০৫-র ১৬ই অক্টোবর বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান বাঙালিজাতির অখন্ডতার প্রতীকরূপে একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে দেয়, যে রাখি ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক, ভ্রাতৃত্বের প্রতীক—উভয় বঙ্গের মিলনের প্রতীক। তাঁর কাছে, শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য নয়, তাদের সমকক্ষতার প্রয়োজন ছিল, কারণ তারা এক ভারত-ভাগ্যের শরিক।

যাইহোক ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে প্রচারিত গঠনমূলক কর্মসূচী তথা স্বদেশী উদ্যোগের ধারা স্বদেশী আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশী যুগের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ডঃ সুমিত সরকার পাঁচটি ধারা লক্ষ্য করেছেন—(১) কারিগরি শিক্ষা এবং শিল্প গবেষণার প্রসার (২) প্রদর্শনী, স্বদেশী দোকান ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় ও স্বদেশীর প্রসার (৩) দেশীয় হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন (৪) নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপন এবং (৫) স্বদেশী ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানি ও জাহাজি কোম্পানি স্থাপন। এ সবই স্বদেশী শিল্পদ্যোগের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। একটি রিপোর্টে দেখা যায়, অবশিল্পায়নের

কারণে যে বিপুল সংখ্যক তাঁতি তাদের জীবিকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন ১৯০৮ সাল নাগাদ তাঁদেরই অনেকেই পুরোনো কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসেন। ১৯০৬-০৭ সালে পূর্ব বাংলায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনে ইউরোপীয় দ্রব্যের আমদানি বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং ১৯০২-০৭ সালে রাজশাহী ডিভিশনে দেশি সুতিবস্ত্রের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯০৫-০৮ সালে নোয়াখালি জেলায় বিদেশি কাপড়ের আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায় এবং দেশি কাপড়ের চাহিদা বাড়ে। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় স্বদেশী কর্মোদ্যোগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, বস্ত্র, রাসায়নিক ও ঔষধ, লৌহ, দেশলাই, তামাক, সাবান, চর্ম, বাষ্পীয় নৌচালন, রবারজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, লেখাপড়া সংক্রান্ত দ্রব্যাদি ইত্যাদি। এই সব শিল্পের সাথে বিভিন্ন কোম্পানি উদ্যোগ জড়িত ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'। প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক' (১৯০৮), 'ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি' প্রভৃতি। স্বদেশী দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য বাংলার শহর ও গ্রামে বহু স্বদেশী দোকান খোলা হয়। 'স্বদেশী বাজার', 'স্বদেশী বস্ত্রালয়', 'স্বদেশী ভাণ্ডার', 'ভারত ভান্ডার' প্রভৃতি দোকানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিংবা ট্রেনের কামরায় ঘুরে ঘুরে স্বদেশী দ্রব্য ফেরি করে বেড়াতেন।

স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পচর্চা নতুন রূপ ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের 'বোলপুর আশ্রম' (১৯০১), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি' (১৯০২) জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের পথ দেখায়। ১৯০৫ সালের ৫ই নভেম্বর 'ডন সোসাইটি'র আহ্বানে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ৯২ জন সদস্য নিয়ে ''জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'' গঠিত হয়। এই পরিষদের অধীনে অরবিন্দ ঘোষকে অধ্যক্ষ করে 'বেহগল ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে অনুরূপ বিদ্যালয় বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়। ১৯০৬ সালের ২৫ শে জুলাই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ''বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'', জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বাংলার বাইরেও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশী গান সাহিত্য, শিল্পচর্চা নতুন রূপ ধারণ করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের কিছু দেশাত্মবোধক গান হল—'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা', 'বাংলার মাটি বাংলার জল' প্রভৃতি। রজনীকান্ত সেন এ সময়ে লিখেছিলেন—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই''। এই সময়ে রচিত সংগীত, কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক নব উন্মাদনা এনেছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখের শিল্পচেতনা ও শিল্পকার্যে, স্বদেশী প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও যুগান্তর আসে।

গ্রাম বাংলায় স্বদেশী চেতনা প্রসারে সমিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯০৮ পর্যন্ত এই সব সমিতি 'গুপ্ত সমিতি' ছিল না। অধিকাংশ সমিতিতে ব্যায়ামাদির চর্চা হত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা হত। এগুলির মুখ্য কাজ ছিল দেশাত্মবোধক যাত্রা, গান, নাটক, লোক-উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে গণ-সংযোগ ও স্বদেশচেতনা বৃদ্ধি করা। কলকাতায় ১৯টি সমিতি থাকলেও, পূর্ববঙ্গে সমিতির সংখ্যা বেশী ছিল। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি বিখ্যাত সমিতি হল, বাখরগঞ্জের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ঢাকার অনুশীলন

সমিতি, মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি, সাধনা সমিতি, অশ্বিনী কুমার দত্তের পরিচালনায় স্বদেশ বান্ধব সমিতি বরিশালে একটি ব্যাপক গণসংগঠনে রূপান্তরিত হয়; গ্রামে গ্রামে এই সমিতির ১৭৫টি শাখা ছিল।

যাইহোক গঠনমূলক স্বদেশীর ধারাকে, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা সমালোচনা করেন। তারা মনে করতেন স্বাধীনতা ছাড়া জাতীয় জীবনের প্রকৃত পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। ১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ('The Doctrine of Passive Resistance') শিরোনামায় প্রকাশিত প্রবন্ধমালায় অরবিন্দ ঘোষ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, শিক্ষা, বিচার, শাসনতন্ত্র ও আইন ব্যবস্থা বয়কট বা বর্জন করে দেশীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে ঐ সব প্রতিষ্ঠান গঠনের আহ্বান জানান। চরমপন্থী নেতাদের হাতে বয়কটের আদর্শ একটি সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দর্শনে রূপান্তরিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য আর শুধুমাত্র বঙ্গভঙ্গ রদ করার দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে স্বরাজ লাভ হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ের আন্দোলনে চারটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—(১) ব্রিটিশ দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বয়কট (২) এগুলির বিকল্প হিসাবে দেশীয় দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ সাধন, (৩) অন্যায় আইনগুলিকে অমান্য এবং (৪) প্রয়োজনে ব্রিটিশ দমন নীতির বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন জনসংযোগের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ ঘোষের মত নেতারা ধর্মকেই মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। ফলে ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদ এই নতুন ধারার রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। এই সব চরমপন্থী নেতাদের হিন্দু ধর্মীয় প্রতীকের ওপর জোর দেওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি হয়। ১৯০৫-০৭ সময়কালে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা বয়কট আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। 'স্বদেশী' প্রচারের মতো বয়কট আন্দোলনেও ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'A National in Making' গ্রন্থে লিখেছেন, ''They had become the self appointed missionaries to the cause'' তাদের চেষ্টায় বয়কট আন্দোলন এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিণত হয়। বিদেশী পণ্যের দোকানের সামনে পিকেটিং শুরু হয়। বিলাতি দ্রব্যে অগ্নিসংযোগ করা হতে থাকে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনও শুরু হয়। সরকার-ছাত্রদের আন্দোলন বিমুখ করগার জন্য Carylye Circular (১৯০৫, ২২শে অক্টোবর) জারি করে। এই নির্দেশনামায় ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখার জন্য নানান রকমের শাস্তির বিধান ঘোষিত হয়। এই স্বৈরাচারী বিধানের বিরুদ্ধে Anti-Circular society গঠিত হয়, যার সাথে বহু দেশপ্রেমিক মুসলমান যুক্ত ছিলেন। বস্তুত হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ করা হলেও বহু শিক্ষিত মুসলিম এই স্বদেশী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পিছিয়ে ছিলেন না, বাংলার নারীসমাজ ও শ্রমিকজনতা।

বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ ছিল স্বদেশী আন্দোলনের আরেকটি ধারা। এই ধারার নেতারা সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার দ্বারা ব্রিটিশ শাসন পোপের কথা বলেন। 'বন্দেমারতম', 'নবশক্তি', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা সন্ত্রাসের পথে স্বাধিকার অর্জনের কথা প্রচার করে। কলকাতায় যুগান্তর গোষ্ঠী ও ঢাকায় পুলিন দাশের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতি গুপ্ত হত্যার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। যুগান্তর গোষ্ঠীর নির্দেশে ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দেন।

বঙ্গবিরোধী আন্দোলন বাংলার বাইরেও বিস্তার লাভ করে। শেষপর্যন্ত ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সরকার বঙ্গভাষা রদ করে। বিহার ও উড়িষ্যাকে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ

যুক্ত করে একজন গভর্নরের অধীনে নতুন প্রদেশ গড়া হয়। এই প্রদেশের রাজধানী কলকাতা থাকলেও, ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কলকাতা তথা বাংলার গুরুত্ব হ্রাস পায়।

স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার দিকে ঐতিহাসিকরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, ''The movement began with a bang and ended with a whimper'' স্বদেশী ও বয়কটের পরিকল্পন কোন বিরাট সাফল্য পায়নি। ডঃ সুমিত সরকার বলেছেন, ''ব্যবসায়িক স্বার্থ জাতীয়তাবাদী মানসিকতাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আগের মতোই আমদানি শুরু করেছিল।'' এই আন্দোলন মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় বাংলার শ্রমিক-কৃষকরা এই আন্দোলনের সাথে কোন আত্মিক যোগ খুঁজে পায়নি। ডঃ ত্রিপাঠীর মতে, ''শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবমুখী করে তোলায় চরমপন্থীদের অক্ষমতার মধ্যেই গোটা আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল নিহিত আছে।'' তবে এ কথা মানতে হবে যে, আবেদন-নিবেদমূলক রাজনীতির থেকে স্বদেশী আন্দোলন ছিল একটি বলিষ্ঠ অগ্রগামী পদক্ষেপ। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ডঃ সরকারের মতে, 'No other phase of our national movement can boast of a cultural accompaniment as rich as swadeshi''. সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলন ছিল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

৬.২.৪.৩ : সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নরমপন্থী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা ক্রমশঃ অতি প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের আবেদন-নিবেদন নীতির ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মধ্যেই একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি যুগোপযোগী কার্যকরী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে মনস্থ করেন। এই নতুন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বক্তব্যা সাধারণভাবে 'চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ' (Extremism) বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism) নামে অভিহিত হয়। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও সমর্থকগণ 'চরমপন্থী' নামে অভিহিত হয়েছেন।

(ক) চরমপন্থার উদ্ভব ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ (Growth of Extremism and Extremist Leaders) ;

John Gallaghar; F. Robinson, Anil Seal, David Washbrook প্রমুখ Cambridge School ভুক্তক ঐতিহাসিকরা চরমপন্থার উন্মেষ-এর কোন আদর্শগত ভিত্তি নেই বলেই মনে করেন। তাদের মতে, কংগ্রেস সংগঠনে ক্ষমতা দখলই ছিল নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধের অন্যতম কারণ। এটা ঠিকই যে, ১৮৯০-র দশকে কংগ্রেসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভাব ছিল না। শুধুমাত্র কংগ্রেসেই নয়, এই সময় দেশের সংগঠিত জনজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরেই ভালমত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল বলেই যে, চরমপন্থার উদ্ভবকে শুধুমাত্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব উদ্ভূত বলা যাবে—এটি সঠিক যুক্তি নয়। ডঃ সুমিত সরকারের মতে, নরমপন্থী নেতাদের সাথে মতাদর্শগত বিরোধের কারণেই ভারতের নানা স্থানে সমালোচক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। সেই সময় প্রকৃত রাজনৈতিক দল বলতে যা বোঝায়, কংগ্রেস তা ছিল না—এটা ছিল বার্ষিক তিন দিনের একটি মিলনমঞ্চ। এর তহবিল ছিল

স্বল্প এবং কেউই দলের সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন না। এমন একটি সংগঠনের কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চরমপন্থার উদ্ভব হতে পারে না। ডঃ সরকারের মতে, বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম মতিলাল ঘোষ, পাঞ্জাবে লালা হরকিষণলাল বনাম লাজপৎ রায়, মাদ্রাজে মায়লাপুর গোষ্ঠী বনাম এগমোর গোষ্ঠী, পুনায় গোখেল ও আগরকর বনাম তিলক—এদের দ্বন্দ্ব ছিল আদর্শগত। জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার প্রসারের সাথে সাথে কংগ্রেসের মধ্যে যে আদর্শগত সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, তা কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরা লক্ষ্য করেননি।

চরমপন্থী নেতারা নরমপন্থী নেতাদের আবেদন নীতি এবং ইংরাজ জাতির ন্যায় বিচারবোধের প্রতি অগাধ আস্থাকে তীব্র আক্রমন করেন। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব নরমপন্থীদের হাতে ছিল। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তারা যুক্তিপূর্ণ আবেদনের দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলি আদায় করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তাঁদের দাবিগুলিকে সরকার গুরুত্ব দিতে রাজি ছিল না। ফলে নরমপন্থী রাজনীতিতে এক ধরনের হতাশা এসে যায়। যা চরমপন্থীদের উত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থী নেতারা নরমপন্থীদের আবেদন নীতিকে 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' (Political mendicancy) বলে ধিক্কার জানান। তাদের মতে ভিক্ষার দ্বারা স্বরাজ অর্জন সম্ভব নয়—আত্মশক্তি ও আত্মত্যাগ দ্বারাই জাতিকে তা অর্জন করতে হবে।

চরমপন্থী মতাদর্শের উদ্ভব ও বিকাশ একাধিক উপাদানের সমন্বয়ের ফলশ্রুতি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভাবজাগতিক পরিবর্তন ও আত্মনির্ভরতার বিকাশ, ঔপনিবেশিক সরকারের নিরন্তর অর্থনৈতিক শোষণ, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সংগ্রাম-বিমুখতা, আন্তর্জাতিক পরিবর্তন ইত্যাদি।

সরকারের শিল্প ও কৃষিনীতি, বৈষম্যমূলক করভার, দেশীয় শিল্পের ধ্বংসপ্রাপ্তি, বেকারত্ব ভারতীয়দের চরম অর্থনৈতিক দুর্গতির দিকে ঠেলে দেয়। ভারতের চিরাচরিত কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হয়, কিন্তু সেখানে কোনও আধুনিক শিল্পের বিকাশ না হওয়ায় জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্য, অনাহার, দুর্ভিক্ষ এবং রোগ-মহামারী ভারতবাসীর নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। দাদাভাই নওরোজী তাঁর 'Poverty and un-British Rule in India' (1901) গ্রন্থে, রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'Economic History of India' (1902) গ্রন্থে এবং গোবিন্দ রানাডে তাঁর 'Indian Economy' গ্রন্থে ব্রিটিশ শোষণের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন। তারা যথেষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যানের দ্বারা ভারতের আর্থিক নির্গমনের (Drain of Wealth) ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। ফলে ভারতবাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের রূপ উপলব্ধি করতে পারেন।

ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী চরমপন্থী মতাদর্শের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব ও অনুকরণের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ লক্ষ্য করেছেন। তিনি প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যের ব্যর্থ অনুকরণ প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে চরমপন্থার উদ্ভবের কথা বলেছেন।

চরমপন্থী আন্দোলনের আদর্শবাদের বীজ বপন করেন স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী দয়ানন্দ। এইসব মনীষীরা প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৯৩ সালে শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য সভ্যতা ও হিন্দুধর্মের মহত্বকে বিশ্বের সামনে প্রচার করলে শিক্ষিত যুব

সম্প্রদায় গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করে। বিবেকানন্দ যে নব বেদান্তবাদ প্রচার করেন তা চরমপন্থীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তিনি জাতির হীনমন্যতা দূর করে পরাদীনতাজানিত পরজায়ের মানসিকতা দূর করে জাতিকে নব বলে বলীয়ান হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। আত্মনির্ভরতা, শৃঙ্খলাবোধ, সংগঠনী শক্তি এবং প্রেমের অনুশীলন দ্বারাই ভারতের মুক্তি সম্ভব—এই সত্য বিবেকানন্দ প্রচার করেন। আলস্য, জড়তা, কুপমন্ডুকতার পরিবর্তে তিনি শক্তি, পৌরুষ, ক্ষাত্রতেজ ও ব্রহ্মতেজে উদ্দীপিত হওয়ার আহ্বান জানান অরবিন্দ বিবেকানন্দের কাছে চরমপন্থীদের ঋণ স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, যুক্তিবাদ, গভীর সমাজ সচেতনতা এবং সর্বোপরি গভীর জাতীয়তাবোধ তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তিনি ঘোষণা করেন, দেশমাতাই হলেন ঈশ্বর; দেশপ্রেমই ধর্ম এবং দেশসেবাই ঈশ্বরের উপাসনা। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি বলেন যে, ''সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।'' তাঁর 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত এবং 'আনন্দমঠ' (১৮৮০ খ্রীঃ) উপন্যাস দেশবাসীকে সংগ্রামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা দেয়। ১৮৮৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'-র প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধাবলীতে তিনি মহা ভারতের 'শ্রীকৃষ্ণের' মত এক মহা নায়কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেন। ডঃ ত্রিপাঠীর মতে, শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর অসামান্য নেতৃপ্রতিভার উপর, তাঁর সামরিক জ্ঞান ও সাম্রাজ্য সংগঠনী কুশলতার উপর।'' শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধর্মরাজ্য স্থাপনের কল্পনা চরমপন্থীদের অনুপ্রাণিত করে। 'আর্যসমাজ'-র প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্ম ও জীবনধারার উপর ভিত্তি করে জাতীয় চরিত্র গঠনের চেষ্টা করেন। অবশ্য দয়ানন্দ আর্যসমাজীদের সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে আগ্রহী ছিলেন। তবে আর্যসমাজ আন্দোলনের প্রভাব চরমপন্থীদের প্রেরণা হিসাবে সক্রিয় ছিল। ডঃ ত্রিপাঠীর মতে, ''লালা লাজপৎ রায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উৎস ছিল আর্যসমাজের আদর্শ ও কর্মপন্থা।''

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের 'নব্য-হিন্দুবাদ' যুবমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে চরমপন্থী আন্দোলন চালাতে মনস্থ করেন। চরমপন্থার বিকাশে লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ ত্রিপাঠী জানান যে, ''চিন্তার দিক থেকে চরমপন্থার যতই প্রস্তুতি থাকুক, কার্জনের নীতি তাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছিল।'' কার্জনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ জাতীয়তাবাদী ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৮৯৯ সালের কলকাতা পৌর সংশোধনী আইন অনুযায়ী কলকাতা পৌরসভাকে পুনরায় গঠন করা হয়। সেই সময় পৌরসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এরপর কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষে চরমপন্থীরা ফেটে পড়েন।

নরমপন্থীরা ভারতীয় জাতিকে আধুনিক পথে উন্নত করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের আধুনিকতা ছিল পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা প্রভাবিত এবং তারা এই মানসিকতার কারণেই ভারতে পাশ্চাত্য শক্তির শাসনকে বিলুপ্ত করার কথা বলেননি। অন্যদিকে চরমপন্থীরা পাশ্চাত্য শাসনের বিরোধিতা করে ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরার নিরিখেই ভারতীয় জাতি নির্মাণের চেষ্টা করেন। এটা করতে গিয়ে তারা ভারতে গৌরবময় অতীতের আহ্বান করে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের দিকে এগিয়ে যান। তিলক বা অরবিন্দের মত চরমপন্থী কিছু নেতা বিশ্বাস

করতেন যে, তাদের বক্তব্যকে জনপ্রিয় করতে হলে হিন্দু কল্পকাহিনী ও ইতিহাসের যুগপৎ ব্যবহার করতে হয়। এ ধরনের বক্তব্যে নরমপন্থীরা বিশ্বাস করতেন না। পরিণামে ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে দুই গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে বিভাজন ঘটে যা, যা 'সুরাট বিচ্ছেদ' নামে খ্যাত।

কয়েকজন চরমপন্থী নেতা

৬.২.৪.৩.১ ঃ অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)

অরবিন্দ ঘোষ ১৮৯৩-৯৪ সালে নরমপন্থী রাজনীতির বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেন। বোম্বাই-এর 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় 'New Lamps for the old' শিরোনামায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে তিনি নরমপন্থী নীতির ব্যর্থতা তুলে ধরেন। তিনি লেখেন যে, নরমপন্থী নেতৃবৃন্দদের লক্ষ্য ভ্রান্ত, উদ্যোগ আন্তরিকতাবর্জিত, কর্মপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ লেখেন ঃ 'স্বাধীনতা ও স্বাধিকার মানুষের সহজাত অধিকার'। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে তিনি কলকাতায় এসে 'জাতীয় কলেজ'-র অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালনায় 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্রে পরিণত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশবাসীকে 'স্বদেশী' ও 'স্বরাজ'-র আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই বোঝেননি। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছে ছিল ধর্ম। তাঁর কাছে সনাতন হিন্দুধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের নামান্তর। বাংলার বিপ্লববাদের মন্ত্রগুরুও তিনি ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ উৎসাহে মানিকতলা বাগানবাড়িতে 'যুগান্তর' দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আলিপুর বোমার মামলায় তিনি ধৃত হন। পরে অবশ্য তিনি মুক্তি পান।

৬.২.৪.৩.২ ঃ বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০)

তিলক ছিলেন চরমপন্থী রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। ১৮৮৯-এ তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেও, নরমপন্থী কার্যকলাপে খুশি হতে পারেননি। তাঁর জাতীয়তাবাদী আদর্শের মূল ভিত্তিই ছিল ভিক্ষানীতি বর্জন ও আত্মশক্তির বলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করব'। চরমপন্থী ভাবধারা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি মারাঠি ভাষায় 'কেশরী' (১৮৯৪) এবং ইংরেজি ভাষায় 'মারাঠা' (১৮৯৫) নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাগুলির মারফৎ তিনি ইংরেজদের শোষণমূলক চরিত্র তুলে ধরেন ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানান। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি মহারাষ্ট্রে 'গণপতি উৎসব' (১৮৯৩) ও 'শিবাজী উৎসব' (১৮৯৫)-র প্রবর্তন করেন। মহারাষ্ট্রে চরমপন্থী ভাবধারা বিস্তারে এই উৎসব দুটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে শিবাজি উৎসবের সূচনা তিলকের এক স্মরণীয় অবদান। তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিবাজীর নামে তিনি সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সংহত করতে পারবেন।' তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল নিশ্চয়ই চরমপন্থী ও প্রগতিশীল, কিন্তু তাঁর সামাজিক চিন্তাধারায় ধর্মীয় সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে তিলক মহারাষ্ট্রের সর্বত্র 'স্বদেশী' ও 'বয়কটে'র বার্তা ছড়িয়ে দেন।

৬.২.৪.৩.৩ ঃ লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫-১৯২৮)

লালা লাজপৎ রায় পাঞ্জাব অঞ্চলে চরমপন্থী আদর্শ প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেন। প্রথম জীবনে তিনি আর্য সমাজ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৮৮৮ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েন। তিনি মনে করতেন, কংগ্রেসের আন্দোলনের সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। ১৯০১ সালে 'কায়স্থ সমাচার' পত্রিকায় তিনি নরমপন্থীদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ নেন।

৬.২.৪.৩.৪ ঃ বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)

বাংলার চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ১৮৮৫ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন ও তিনি নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে বিরাট পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি তিলক ও অরবিন্দের চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সামিল হন। 'New India' পত্রিকা এবং অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নরমপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ১৯০৪ সালে ইংলণ্ডে গিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র বিদেশী হস্তক্ষেপ বর্জিত স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জানান। তিনি ছিলেন 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-র আদর্শের অন্যতম প্রবক্তা। অন্যান্য চরমপন্থী নেতাদের ন্যায় তিনিও আধ্যাত্মিকতার সাথে জাতীয়তাবাদের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে চরমপন্থী নেতারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। তাঁরা অতীত ঐতিহ্য ও হিন্দুধর্মের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তবে তাদের মতাদর্শকে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। A. R. Desai-র মতে, ''The founders of the new nationalism were subsequently criticized for basing the movement of Swaraj on the Hindu religion and traditions of Hindu society'' চরমপন্থী নেতারা মুসলিম বিরোধী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু আন্দোলনে হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রতীকগুলিকে বারবার ব্যবহার করার ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতারা অসন্তুষ্ট হন। চরমপন্থীরা গণমুখী আন্দোলনের কথা বললেও শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তাছাড়া তাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল এবং একটি সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে তাঁর সর্বদা কাজ করতে পারননি। এ সব সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংগ্রামী জাতীয়তাবাদই দেশবাসীকে সাহসিকতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে। চরমপন্থী নেতাদের মূল লক্ষ্য ছিল 'স্বরাজ' এবং এই 'স্বরাজ' লাভের জন্য তাঁরা দেশবাসীর হাতে 'স্বদেশী' ও 'বয়কটে'র অস্ত্র তুলে দেন। চরমপন্থীদের মতাদর্শ ও কার্যপদ্ধতি পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

(খ) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ (Revolutionary Terrorism)

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি ধারা ছিল 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ'। বলপূর্বক ব্রিটিশ শাসনের অবসান

ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনার জন্য যে সশস্ত্র প্রচেষ্টা, ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে চলেছিল, তাকেই সাধারণভাবে 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ' বা 'বিপ্লবী আন্দোলন' বলা হয়। বিপ্লবীরা গুপ্ত সমিতি গঠন করে, গুপ্তহত্যা ও সশস্ত্র পথে স্বাধীনতা আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই বিপ্লবীদের নানাভাবে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন 'সন্ত্রাসবাদী', 'নৈরাজ্যবাদী', 'বিপ্লবী' ইত্যাদি। যেহেতু বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল গুপ্তহত্যার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে, তাদের ভারত থেকে বিতাড়ন—এই কারণে অনেকে এই আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন বলেছেন। বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে সন্ত্রাসবাদী নামকরণের প্রতিবাদ করেছেন সন্ত্রাসবাদ কথাটির মধ্যে যে হীন অর্থ নিহিত আছে, তা ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্পর্কে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন ঃ 'শাসনতান্ত্রিক পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও অহিংস-অসহযোগিতার মাধ্যমে যেমন ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল, তেমনি তা এসেছিল জঙ্গী জাতীয়তাবাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।' সুতরাং এই ধারাকে শুধুমাত্র 'সন্ত্রাসবাদ' বলে খাটো করা যায় না। 'সন্ত্রাসবাদ' নামকরণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দান। এই বিপ্লবীরা ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক। তাঁরা নরমপন্থী, বয়কট, স্বদেশীমূলক চরমপন্থার নিষ্ফলতা উপলব্ধি করে বিকল্প পথ হিসাবে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন। তাদের পথ ঠিক না ভুল, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা ও আত্মবলিদানকে মূল্য দেওয়া উচিত। তাই তাঁদের 'বিপ্লবী' (Revolutionary) এবং তাঁদের কর্ম প্রয়াসকে 'বিপ্লবী আন্দোলন' (Revolutionary Movement) বলাই যুক্তিযুক্ত।

সাধারণভাবে চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের পটভূমিকাই ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভবের পটভূমিকা। কংগ্রেসী আন্দোলনের আশানুরূপ সাফল্যের প্রভাব, ঔপনিবেশিক শোষণ ও দমন নীতি, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দের শিক্ষা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক আদর্শ, মাৎসিনী, গ্যারিবল্ডীর মতো বিপ্লবীদের আদর্শ ও কর্মপন্থা ইত্যাদি ভারতীয় বিপ্লবীদের চেতনাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া বাংলার অরবিন্দ ঘোষ মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই-র মতো চরমপন্থী নেতাদের বক্তৃতা এবং রচনাও বৈপ্লবিক আদর্শে যুবসমাজকে প্রভাবিত করেছিল। চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল একই, তবে কর্ম পদ্ধতিতে পার্থক্য ছিল। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, সকল বিপ্লবীরাই চরমপন্থী, কিন্তু সকল চরমপন্থী, বিপ্লবী নন। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের একটি অংশ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে সরকারি প্রশাসন স্তব্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু অপর অংশটি সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করতে প্রয়াসী ছিলেন। দেশের জন্য আত্মত্যাগকেই বিপ্লবীরা পরমধর্ম বলে মনে করতেন। আনন্দমঠের বন্দেমাতরম মন্ত্র বিপ্লবীদের কণ্ঠে দেশমাতার পূজার মন্ত্রে পরিণত হয়। অরবিন্দের মতে, বিপ্লবীদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ এবং গীতার নিষ্কাম কর্মের ভাষ্য ছিল বিশেষ প্রেরণাস্থল। বিপ্লবীদের উপর হিন্দুত্বের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে Valentine Chirol তাঁর 'Indian Unrest' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ইউরোপীয় জাতি, খ্রীষ্টীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে হিন্দু জাগরণবাদীদের প্রবল ঘৃণার বলেই বিপ্লববাদের উদ্ভব হয়। এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়—কারণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীদের আদর্শবাদকে Chirol গুরুত্ব দেননি।

বিপ্লবীরা বেশীর ভাগ ছিলেন মধ্যবিত্ত হিন্দু। এই শ্রেণীর যুবকদের হতাশাবোধ, অর্থনৈতিক দুর্দশা, প্রশাসনিক বৈষম্য, তাদের ইংরেজ শাসকদের প্রতি মরীয়া করে তোলে। Judith Brown বলেন যে, এই বিপ্লবীরা ছিলেন বাস্তব জ্ঞান বর্জিত রোমান্টিক। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে গণ আন্দোলন ছাড়া শুধুমাত্র গুপ্তহত্যা ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিতাড়ন সম্ভব নয়। তারা কোন ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী নেননি। গণ সংযোগের চেষ্টা তাঁরা করেননি। অবশ্য তাদের কর্মপন্থায় বেশী গণসংযোগ করা সম্ভবও ছিল না। যাইহোক গণভিত্তির অভাব এই আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ। সীমাবদ্ধ গন্ডিতে আবদ্ধ ভারতীয় বিপ্লববাদ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দমনপীড়ন বেশীদিন সহ্য করতে পারেনি। হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী এই আন্দোলন থেকে সঙ্গত কারণেই মুসলিমরা দূরে সরে যান। আন্দোলনের সাংগঠনিক দুর্বলতাও, আন্দোলনটিকে দীর্ঘস্থায়ী করেনি। তবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের আত্মবলিদান, অন্যান্য ধারার জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁদের কর্মপ্রয়াস জাতীয় আন্দোলনকে আরও গতিশীল ও সংগ্রামমুখী করেছিল।

(গ) বাংলার সমিতিসমূহ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ও তাদের কর্মপদ্ধতি (Bengal Samities, Bengal Volunteers and their actions);

মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হলেও, এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে ছিল বাংলা। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলায় বিভিন্ন সমিতি গড়ে উঠতে থাকে যেগুলি বিপ্লববাদ প্রসারে ভূমিকা গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিপ্লববাদী আন্দোলন বাংলায় বিস্তার লাভ করলেও এর সূচনা হয়েছিল আগেই। রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণা এবং নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা'র উদ্যোগে ব্যায়াম ও শরীরচর্চার মাধ্যমে বাংলার তরুণ সমাজের মধ্যে বিপ্লববাদী কার্যকলাপের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। ১৯০২ সালের ২০শে মার্চ সতীশচন্দ্র বসু কলকাতায়; বাংলার প্রথম বিপ্লবী কেন্দ্র 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' গ্রন্থটি থেকে নামটি নেওয়া হয় এবং সমিতির এই নামকরণ করেন 'নিউ ইন্ডিয়ান স্কুল'-র প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সতীশচন্দ্র ও অন্যান্যদের অনুরোধে কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ব্যারিস্টার মিত্র, অনেক আগে থেকেই বাংলায় বিপ্লবী সংস্থা গঠনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অনুশীলন সমিতি গঠিত হবার আগে তিনি অন্ততঃ চারবার বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি সমিতির সদস্যদের লাঠিখেলা, দেহচর্চা ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র গঠনের উপরেও জোর দেন। এই সময় বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান। আপার সার্কুলার রোডে তাঁর গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই সমিতিরই উদ্দেশ্য ছিল দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ফলে দুই সমিতি যুক্ত হয়ে যায় এবং প্রমথনাথ মিত্র এই সম্মিলিত দলের সভাপতি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষসহ সভাপতি এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ভগিনী নিবেদিতাও এই সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ সমিতির বিভিন্ন আলোচনা সভায় যোগদান করতেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন চলাকালীন বাংলার যুব সম্প্রদায় বিপ্লবী আদর্শের দিকে আরও বেশী আকৃষ্ট হয়। পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ১৯০৭ সালের মধ্যে কেবলমাত্র ঢাকা 'অনুশীলন সমিতি'র অধীনেই কমপক্ষে ৫০০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র প্রধান পরিচালক ছিলেন পুলিনবিহারী দাস। 'অনুশীলন সমিতি' ছাড়াও এ সময় বাংলাদেশের নানা স্থানে একাধিক গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে ময়মনসিংহের 'সাধনা সমিতি' ও 'সুহৃদ সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি', ঢাকার 'মুক্তিসংঘ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫-০৬ সালে বিপ্লবী সমিতিগুলির সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেলে, এগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য ১৯০৬-র ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে বিপ্লবী দলগুলির একটি মহাসম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়।

তবে সমিতির কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রমথনাথ মিত্রের সাথে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো প্রভৃতি নেতাদের মনমালিন্য শুরু হয়। তাঁরা শুধুমাত্র শরীরচর্চার উপর জোর না দিয়ে বিপ্লববাদী কার্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে 'ভবানীমন্দির' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় (১৯০৫)।

ধর্মের ভিত্তি উপর বৈপ্লবিক কর্মসূচীর কথা এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এরপর অরবিন্দ ঘোষের পরামর্শে ও ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের উৎসাহে ১৯০৬ সালের ১৮ই মার্চ 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সরাসরি সশস্ত্র পথে ভারতের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তরের আদর্শ সম্বন্ধে বলেন ''Our paper Yugnatr was dediceted to the service of the country and was the first newspaper of the revolutionary party.'' বিপ্লবী দলের মুখপত্র হিসাবেই যুগান্তর জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সময় অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম' এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকাও বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করে।

বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহযোগীগণ যুগান্তর গোষ্ঠী নামে পরিচিত হন। তাঁরা গুপ্তহত্যার মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী মহলে ত্রাসের সঞ্চার ঘটাতে চান। বাংলায় 'যুগান্তর সমিতি'ই হল বোমা তৈরির কাজে পথ প্রদর্শক। বোমা তৈরি শিক্ষার জন্য হেমচন্দ্র দাস কানুনগো প্যারিস যাত্রা করেন ও বোমা তৈরির কলাকৌশল শিক্ষা করেন। যুগান্তর গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় বাংলায় প্রথম গুপ্তহত্যার অভিব্যক্তি ঘটে। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু বিচারক কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করেন (৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮)। কিন্তু ভুলক্রমে তাঁদের হাতে দুজন ইউরোপীয় মহিলা নিহত হন। পুলিশের কাছে ধরা না দিয়ে প্রফুল্লচাকী আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয় (১১ই আগষ্ট, ১৯০৮)। এই ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশ মুরারি পুকুরে যুগান্তর গোষ্ঠীর গোপন কেন্দ্রে অভিযান চালায় ও অরবিন্দসহ বহু বিপ্লবীকে বন্দী করে। শুরু হয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা। শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ ঘোষ মুক্তিলাভ করলেও অধিকাংশ বিপ্লবীরই দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তরের শাস্তি হয় (১৯০৯)।

এই সময় পূর্ববাংলায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্যা। সরকার গঠিত Sedition Committee রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে ঢাকা অনুশীলন সমিতি ছিল সর্বাধিক

সুগঠিত ও শক্তিশালী। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন পুলিনবিহারী দাস। এই সমিতির নিয়মকানুনগুলি ছিল কঠোর। সদস্য হওয়ার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সদস্য গ্রহণ করা হতো। এই সমিতির শাখা জেলা এবং মহকুমার স্তরেও প্রসারিত ছিল। এই সমিতি গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল সরকারি কর্মচারীকে নিহত করে। বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে সরকার আশঙ্কিত হয় ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়ের করা হয়। যেমন—'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯১০), 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯১০), 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯১২-১৩) শেষোক্ত মামলাটির মাধ্যমে পুলিন দাস ও অন্যান্য কর্মীরা গ্রেপ্তার হন ও তাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সাথে যাদুগোপাল মুখার্জী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভূপতি মজুমদার বিপ্লবী জড়িত ছিলেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন বিপ্লবী সমিতিগুলি বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সন্ত্রাস থেকে কিছুটা সরে এসে সংঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া, শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নও তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় নানা ধরনের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শুরু হয়—যেমন, ভারতের ভিতরে ও বিদেশে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের প্রয়াস, দেশে সুশৃঙ্খল যোদ্ধা বাহিনী গঠন, সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা প্রভৃতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু ইউরোপীয় সেনা ভারতের বাইরে চলে গেল, বিপ্লবীরা ভারতে সশস্তর বিপ্লব ভারতে উৎসাহিত হয়। বাংলার অধিকাংশ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। তাঁর দলটি 'যুগান্তর' নামে পরিচিত ছিল। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য, যাদুগোপাল মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীগণ। এঁরা জার্মানী থেকে অস্ত্র সংগ্রহে প্রয়াসী হন। বাংলার বিপ্লবীদের জন্য একটি জাহাজে করে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ পাঠানোর কথা হয়। কিন্তু পুলিশ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে। ফলে মাভেরিক জাহাজ-এ করে অস্ত্র প্রেরিত হলে, জাহাজটি ভারতে আসতে ব্যর্থ হয়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বাঘাযতীন ও চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী মারা যান এবং অন্যান্যরা ধরা পড়েন (সেপ্টেম্বর, ১৯১৫)। এরপর সরকার ১৯১৫ সালের 'ভারত-রক্ষা আইন' কঠোরভাবে প্রয়োগ করে বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। যোগ্য নেতারও অভাব দেখা যায়। বিপ্লবী সমিতিগুলি সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯২২ সালে গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে বিপ্লবী কার্যকলাপ পুনরায় শুরু হয়। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে গোপনে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে বিপ্লবীরা মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর পুনরাবির্ভাব ঘটে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এই সময় বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯২৩ সালে সূর্য সেন চট্টগ্রামে এক বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। ক্রমবর্ধমান বিপ্লববাদী কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে ১৯২৪-র অক্টোবর মাসে সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে ও সুভাষচন্দ্র বসুসহ বহু বিশিষ্ট নেতাকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে বিপ্লববাদী কার্যকলাপকে দমানো যায়নি। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বাধীন Bengal Volunteers দল বা বি. ভি. ঢাকার বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার যুগান্তর গোষ্ঠীর সাথে এই দলের যোগাযোগ ছিল। সুভাষচন্দ্র বসুও এই দলের

সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুবোধচন্দর সেনগুপ্ত ''India Wrests Freedom'' গ্রন্থে বি. ভি.-র কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই গোষ্ঠী অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারীদের গুপ্তহত্যার কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাংলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তা মিঃ লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হডসন ঢাকায় মিটফোর্ড হাসপাতাল পরিদর্শনকালে বি. ভি.-র সদস্য ও মেডিক্যাল ছাত্র বিনয়কৃষ্ণ বসুর দ্বারা আক্রান্ত হন (২৯ আগস্ট, ১৯৩০)। গুলিতে লোম্যান নিহত হন। এরপর বিনয় বসু কলকাতা চলে আসেন ও বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের সাথে মিলিত হয়ে ৮ই ডিসেম্বর (১৯৩০) বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের মূলকেন্দ্র 'মহাকরণ' বা 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এ দুঃসাহসিক অভিযান চালান। তাঁদের আক্রমণে কারা-বিভাগরে অধিকর্তা সিম্পসন নিহত এবং একাধিক উচ্চপদস্থ আমলা আহত হন। এরপর লালবাজার থেকে আগত বিরাট সংখ্যক পুলিশ বাহিনীর সাথে তাঁদের গুলি বিনিময় হয়, যা 'অলিন্দ যুদ্ধ' নামে খ্যাত। শেষে বাদলগুপ্ত আত্মহত্যা করেন, হাসপাতালে বিনয় বসুর মৃত্যু হয় ও দীনেশ গুপ্ত-র ফাঁসি হয় (৭ই জুলাই, ১৯৩১)। চিরাচরিত R. R. Garlick, যিনি দীনেশ গুপ্তকে মৃত্যুদণ্ড দেন,—এক বছর পরে বিচারালয়ের মধ্যেই কানাইলাল ভট্টাচার্যের গুলিতে নিহত হন।

মেদিনীপুরে বি. ভি.-র সদস্যদের কর্মধারা প্রশাসনিক মহলে আলোড়ন তোলে। ১৯৩১ সালে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষের হাতে মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডি, ১৯৩২ সালে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের হাতে জেলাশাসক ডগলাস এবং ১৯৩৩ সালে অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্তের হাতে জেলাশাসক বার্জ নিহত হন। মেদিনীপুরে পরপর জেলাশাসক হত্যায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ভীত হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে কলকাতায় ১৯২৭ সালে অনুশীলন ও যুগান্তর দল দুটি, বিপ্লবী তৎপরতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুগান্তর গোষ্ঠী বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণের ব্যাপক পরিকল্পনা যুগান্তর গোষ্ঠী এই সময় গ্রহণ করেছিল। এর সাথে যুক্ত ছিলেন ডাঃ নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াসী প্রমুখ বিপ্লবীগণ। তবে পুলিশ বোমা তৈরির কারখানা ধরে ফেলে ও ৩২ জন যুবক গ্রেপ্তার করে মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে (এপ্রিল, ১৯৩০)।

এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কার্যকলাপ হল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০)। প্রথমে তিনি হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে নিউ ভায়োলেন্স পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সহকারী ছিলেন নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ। সূর্য সেন তাঁর পরিকল্পনা সফল করতে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি গঠন করেন ও ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐদিন রাত্রে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার, ইউরোপীয় ক্লাব, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করা হয়। এরপর ২২শে এপ্রিল বিপ্লবী বাহিনী জালালাবাদে পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। বহু বিপ্লবী মারা যান। সূর্য সেন আত্মগোপন করেন। চট্টগ্রামে দমননীতি চালানোর জন্য পুলিশ ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসানুল্লাহ, বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যের গুলিতে নিহত হন (আগস্ট, ১৯৩১) ১৯৩২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাবে অভিযান চালান। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন ধরা পড়েন ও ১৯৩৪-র ১৩ই ফেব্রুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়।

সারা বাংলা জুড়ে এ সময় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি সংঘটিত হতে থাকে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টসহ বহু ইংরেজ আমলার উপর আক্রমণ করা হয়। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামে দুই ছাত্রী কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করেন (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩১)। ছাত্রী বীণা দাস বাংলার গভর্নর জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন (৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২)। বিচারে তাঁর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বস্তুতঃ ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে বাংলায় ব্যাপক বৈপ্লবিক তৎপরতা দেখা যায়। এই সময়ের মধ্যে ২৩জন সরকারী কর্মচারী, ২০ জন বে-সরকারি কর্মচারী ও ৩৩ জন বিপ্লবী নিহত হন। আহতের সংখ্যা ছিল আরও বেশী। এই বৈপ্লবিক প্রয়াসে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মহিলা বিপ্লবীরাও পিছিয়ে থাকেননি। বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল সংশোধনী আইন অনুসারে ১৫ জন মহিলা বিপ্লবী অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা কর্পোরেশন বাংলার বিপ্লবাদকে সহযোগিতা ও সমর্থন করেছিল। তিনের দশকে বিপ্লবীরা ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। অনুশীলন দলের অনেক সদস্য কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের সাথেও জড়িত ছিলেন। অনুশীলন, শ্রীসংঘ ও বি. ভি গোষ্ঠী সুভাষচন্দ্রের কর্মসূচীকে সমর্থন করত। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে (মে, ১৯৩৯) এইসব সংগঠনগুলির অনেক সদস্য এই দলে যোগ দেন। সুতরাং বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা তথা ভারতে বৈপ্লবিক প্রয়াস স্তিমিত হয়ে পড়লেও বৈপ্লবিক চেতনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বৈপ্লবিক চেতনা, বামপন্থী আন্দোলন ও কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও গতিশীল করে তুলতে প্রয়াসী হয়।

৬.২.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থ

1. Chandra. Bipan and others : India's Struggle for Independence (New Delhi, 1989).

2. Sarkar, Sumit : Swadeshi Movement in Bengal, 1903-08 (New Delhi, 1973).

3. Sarkar, Sumit : Modern India, 1885-1947, (New Delhi, 1983).

4. Tripalhi, Amales : The Extremist Challenge (Calcutta, 1967)

5. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ঃ পলাশি থেকে পার্টিশান ঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস (কলকাতা, ২০০৬)

৬.২.৪.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Discuss the circumstances leading to the proposal of the partiton of Bengal in 1905. Why did the Indian nationalists oppose to it?

১৯০৫-র বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পটভূমিকা আলোচনা কর। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এই প্রস্তাবের বিরোধিকা কেন করেছিলেন?

2. Critically analyse the major trends of the Swadeshi movement in Bengal.

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনর মূল ধারাগুলি বিশ্লেষণ কর।

3. How did the ideas of Boycott and Swadeshi come to influence the anti partition movement?

বয়কট ও স্বদেশী ধারণা দুটি কিভাবে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল?

4. Discuss the origin and growth of extremism in Indian Politics. How would you interpret its social character?

ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা কর। এই আন্দোলনের সামাজিক চিত্র বিশ্লেষণ কর।

5. Explain the rise and growth of 'Revolutionary Terrorism' in Bengal with special reference to the role of the Begal Samities.

বাংলার সমিতিগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বাংলায় 'সশস্ত্র বিপ্লববাদের' উদ্ভব ও বিকাশ বিশ্লেষণ কর?

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৩

Phases of National Movement

একক-৫

(a) Gandhian Movements and Gandhi-Tagore Debate

(b) Swarajya Party and Bengal Pact (1923)

বিন্যাস ক্রম

৬.৩.৫.০ : উদ্দেশ্য

৬.৩.৫.১ : বাংলায় গান্ধীজীর আন্দোলন ঃ রাউলাট সত্যাগ্রহ এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

৬.৩.৫.২ : অর্থনৈতিক অবস্থা

৬.৩.৫.৩ : রাজনৈতিক অবস্থা

৬.৩.৫.৪ : রাউলাট আইন

৬.৩.৫.৫ : অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

৬.৩.৫.৬ : আন্দোলন পরবর্তী ঘটনা ও তার তাৎপর্য

৬.৩.৫.৭ : চরিত্র

৬.৩.৫.৮ : স্বরাজ পার্টি ঃ নির্বাচনী রাজনীতি, দল ও দলাদলি

৬.৩.৫.৯ : চিত্তরঞ্জন দাস কৃত বেঙ্গল প্যাক্ট

৬.৩.৫.১০ : কাউন্সিলের অভ্যন্তরে অসহযোগ; চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্ব

৬.৩.৫.১১ : কলকাতা কর্পোরেশন এবং স্বরাজ পার্টি

৬.৩.৫.১২ : স্বরাজ পার্টির সংকট

৬.৩.৫.১২.১ : সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

৬.৩.৫.১৩ : শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ব্যর্থতা

৬.৩.৫.১৪ : কাউন্সিলে সংকট

৬.৩.৫.১৫ : এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ...

৬.৩.৫.১৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.৫.১৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৩.৫.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থের প্রথম এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) বাংলায় গান্ধীবাদী আন্দোলন ঃ রাউলাট সত্যাগ্রহ এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

(২) আন্দোলন পরবর্তী ঘটনা এবং তার গুরুত্ব

(৩) স্বরাজ পার্টির গঠন, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী

(৪) বেঙ্গল প্যাক্ট

(৫) স্বরাজ পার্টির সংকট এবং তার প্রকৃতি।

৬.৩.৫.১ : বাংলায় গান্ধীবাদী আন্দোলন ঃ রাউলাট সত্যাগ্রহ এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা। আগেকার আঞ্চলিক রাজনৈতিক ভারসাম্য, যেখানে বাংলা এবং মহারাষ্ট্রের প্রাধান্য ছিল অনেকাংশে তা ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁর সময় ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চল আগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিষ্ক্রিয় ছিল সেগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে উড্রো উইলসনের ১৪ দফা প্রস্তাবনা (Fourteen Points) বিশেষতঃ উপনিবেশগুলিতে স্বশাসনের পক্ষে এক নতুন আশা সঞ্চার করেছিল। একই সময় রুশ বিপ্লব এবং রাশিয়ার ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলির প্রতি বিপ্লবী সরকারের মনোভাব পরাধীন মানুষের মধ্যে আশা জাগিয়েছিল।

৬.৩.৫.২ : অর্থনৈতিক অবস্থা

যুদ্ধের সময়ে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে যুদ্ধ ব্যবসায় জড়িত কোম্পানিগুলি প্রচুর লাভ করেছিল। নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। যুদ্ধের সময় তেজী বাজারের কারণে ভারতীয় বণিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর লাভ করে। কলকাতার বাণ্যি মহলে ইউরোপীয় বণিক প্রতিষ্ঠানগুলির একচেটিয়া অধিকার করলেও (যার কারণ অমিয় বাগচী তাঁর Private Investment in India, 1900-1939 বইটিতে আলোচনা করেছেন) যুদ্ধের বাজারে ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা 1604.04% হারে বাড়তে থাকে। মুম্বাই (তৎকালীন বোম্বাই) যেখানে ভারতীয় বাণিজ্য দীর্ঘদিন ধরেই শক্তিশালী সেখানেও এই হারে বৃদ্ধি ঘটেনি। ইউরোপীয়রাও এই সুযোগে মুনাফা করেছিল কিন্তু যুদ্ধশেষে ভারতীয়দের স্বশাসন দেওয়া হলে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এই আশঙ্কাতে তারা এই মুনাফা 'দেশে' (ব্রিটেনে) ফেরত পাঠিয়ে দেয় (remittance)। নতুন কর আর বড় মাত্রায় বিদেশি

পুঁজিনিবেশও হচ্ছিল না। এরফলে বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং অব্যবহিত পরেই ভারতীয় পুঁজির উত্থান ঘটে পূর্বভারতে বিশেষতঃ কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে।

ভারতীয় বণিককূল বিশেষতঃ বড়বাজার অঞ্চলের মাড়ওয়ারীরা এই মুনাফার একটা বড় অংশ এবার উৎপাদনের কাজে লাগাতে চাইলেন। এতদিন পর্যন্ত কলকারখান প্রতিষ্ঠায় পূর্বভারতে মোটের উপর ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার ছিল। স্বাভাবিকভাবেই মাড়ওয়ারীরা তাঁদের এই নয়া উদ্যোগে ইউরোপীয়দের কাছে বাধা পেলেন। এর ফলে এতদিনের সযত্নলালিত সহযোগিতার সম্পর্ক—Compradore relationship ভেঙ্গে গেলে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় যে মাড়ওয়ারী বণিকরা বিলাতী দ্রব্য কেনাবেচা করেছে তারাই এখন গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশি দ্রব্য বর্জনকে তুমুল সমর্থন জানাল। যুদ্ধ শেষ হলে সেনাবাহিনীর ছাঁটাই সৈন্যের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। অর্থনৈতিক মন্দা দেখা গেলে অফিস কাছারিতে কর্মরত লোক বরখাস্ত হল। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। শুধু অফিস কাছারিতে নয়, এই তেজী বাজারের কারণে স্বাভাবিকভাবেই কল-কারখানায় প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর মন্দার কারণে কারখানাগুলি উৎপাদন কমায় শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হল বা বিভিন্ন ভাতা কমান হল। এর ফলে অসন্তোষ চরম আকার নেয়। এই সময় চটকলগুলিতে ১৩৭টি ধর্মঘট হয়েছিল। কয়লাখনিগুলিও বাদ ছিল না। শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই সময়কার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশেষ উপজীব্য। অন্যদিকে যুদ্ধের শুরুতে কাঁচা পাটের দাম সাংঘাতিকভাবে পড়ে যায়। সরকার ইচ্ছুক থাকলেও এই সময় বাংলার ইউরোপীয় চটকল মালিকরা কৃষকদের সাহায্যার্থে কোন পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়, পরে যুদ্ধের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়লেও কাঁচা পাটের দাম অপরিবর্তিতই থাকে। এই সমস্ত কারণে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে, যেখানে পাটের উৎপাদন হত সবচেয়ে বেশী, অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সবচেয়ে প্রবল।

৬.৩.৫.৩ : রাজনৈতিক অবস্থা

এই হতাশাজনক পরিমণ্ডলে ১৯১৮ সালে কলকাতায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। মাড়ওয়ারী ব্যবসাদাররাই ছিলেন দাঙ্গাকারীদের প্রধান লক্ষ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতবাসীরা আর এক প্রস্থ শাসন সংস্কারের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রথমদিকে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার সম্পর্কে নরম মনোভাব নিলেও চিত্তরঞ্জন দাশ কড়া অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিস্থিতি আমূল বদলাল দমনমূলক রাউলাট আইনের প্রবর্তন ও প্রয়োগের ফলে।

৬.৩.৫.৪ : রাউলাট আন্দোলন

নরমপন্থীরা (moderate) এই আইনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ জাতীয় কার্যকলাপে রাজী ছিলেন না। তাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে উদারনৈতিক (liberal) মহাসঙ্ঘ (federation) তৈরি করেন। রাউলাট সত্যাগ্রহের প্রভাব বাংলায় খুব একটা পড়েনি। যেটুকু বিক্ষোভ দেখা যায় তাতে মাড়ওয়ারী যুবসমাজের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সদ্ভাবও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। তবে বাঙালি হিন্দুরা এই আন্দোলন

থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ বাঙলার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে নবোদিত সর্বভারতীয় নেতৃত্বে যারা ছিলেন অবাঙালি তাদের বনিবনা না থাকার কারণেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড উত্তর পরিস্থিতিতে অবশ্য অবস্থা পাল্টে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইটহুড' বা 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। এই মর্মে তিনি বড়লাটকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা যেন সমস্ত বাংলা তথা ভারতের অবমানিত, লাঞ্ছিত মানবতার নিরুদ্ধতাকে ভাষা দিয়েছে।

৬.৩.৫.৫ : অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

গান্ধীজি গোটা 1920 ধরে সারাদেশে প্রচার অভিযান চালিয়ে তাঁর পরিকল্পিত আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন। চিত্তরঞ্জন দাশও শেষপর্যন্ত গান্ধীর মত মানতে বাধ্য হন। ঐতিহাসিক লিওনার্ড গর্ডন ও অন্যান্যরা মনে করছেন যে চিত্তরঞ্জন দাশ-এর এহেন পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলার অনুভূতি প্রবণ রাজনীতিবিদ্‌দের মত তিনিও প্রথম প্রথম একজন বহিরাগত নেতার জনপ্রিয়তার চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে গান্ধীর পক্ষে মত দিলে বাংলার যুবসমাজ, যারা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাদেরকে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পাওয়া যাবে; কিন্তু একই সাথে তাঁর হাতে আন্দোলনের কর্মপন্থা স্থির করবার স্বাধীনতা থেকে যাবে। গর্ডন বা ব্রুমফিল্‌ড এরকম মত পোষণ করলে গান্ধীর সাথে বাংলার নেতাদের মতবিরোধ কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন আদৌ করা যাবে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে নয়। রজত কান্ত রায় মনে করছেন দ্বন্দ্বের কারণ আন্দোলনের চরিত্র নিরূপণ করা নিয়ে। গান্ধী এই আন্দোলনকে একটি নৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের চেহারা দিতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে বাংলার নেতারা চাইলেন একে একটি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা দিতে যেখানে 'স্বরাজ' একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে উঠে আসবে। অবশ্য গান্ধীর 'স্বরাজ' (যার অর্থ মূলতঃ গ্রাম পুনর্গঠন, আত্মনির্ভরতা এবং সংস্কারমূলক কাজ) এর তুলনায় চিত্তরঞ্জন দাশ বা বিপিন পাল এর স্বরাজ এর ধারণা ছিল মূলগতভাবে রাজনৈতিক। এই ব্যাখ্যাই কিন্তু গান্ধী শেষপর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গান্ধী তার আন্দোলনের কর্মসূচির প্রস্তাবে অর্থনৈতিক অসহযোগের তুলনায় জোর দিয়েছিলেন সরকারি চাকরি পরিত্যাগ, স্কুল কলেজ পরিত্যাগ ইত্যাদির উপর। অর্থাৎ তিনি চাকরিজীবী, ব্যবহারজীবীদের 'আত্মত্যাগ' এর উপর জোর দিলেন। কিন্তু বাংলায় যেখানে ইংরাজদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার মুখোমুখি হওয়াটাই রাজনৈতিক বাস্তবতা সেখানে ব্যবহারজীবীদের স্বার্থত্যাগের থেকেও জরুরি ছিল অর্থনৈতিক অসহযোগ। নাগপুরে শেষপর্যন্ত গান্ধী কাউন্সিল বয়কটের প্রশ্নে অটল থাকলেও চাকরী বা স্কুল-কলেজ পরিত্যাগের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বয়কট বা ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদির অনুমতি দিতে বাধ্য হন যদি সেগুলি অহিংস হয়।

গান্ধী এবং বাংলার নেতাদের এই বিতর্কে তিনটি পক্ষ ছিল ঃ

Whole hoggers–সৌকত আলি, জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী প্রমুখ যাঁরা গান্ধীর কর্মসূচীকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ যাঁরা এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদান করতে চাইলেন।

অ্যানি বেশান্ত, জিন্নাহ-এর মত নরমপন্থী নেতারা যাঁরা অসহযোগ সমর্থনই করলেন না।

দাশ-এর পরিকল্পনা ছিল অর্থনৈতিক অবরোধ, ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট ইত্যাদি এবং শেষ পর্যায়ে খাজনা (tax) বন্ধের আন্দোলন। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য দাশ চাইছিলেন কংগ্রেস সংগঠনের আমূল সংস্কার। একদম গ্রাম, ব্লকস্তর থেকে জেলা স্তরের কংগ্রেস কমিটি গঠন বা আগে থেকে থাকলে তার পুনর্বিন্যাস। সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্ব যাতে ঠিক থাকে তার জন্য জনসংখ্যার প্রতি 50,000 পিছু একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করবার প্রস্তাব দেন। এছাড়া আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থে তিনি একটি 'জাতীয় তহবিল' গঠনের প্রস্তাব দেন। আর দরকার ছিল একটি 'কার্য পরিচালন সমিতি' গঠন। এটিই ছিল ভবিষ্যতের Working Committee. তাই গর্ডন বা ব্রুমফিলডের মত নাগপুরের অধিবেশনকে গান্ধীর 'নৈতিক জয়' বা দাশ-এর পরাজয় হিসাবে না দেখে একে দাশের রাজনৈতিক বিজয় বলা যেতে পারে। যে সমস্ত বিষয় দাশ মেনে নিলেন যেমন কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা ইত্যাদি তার মধ্যে কাউন্সিল নির্বাচন আগেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় (যেখানে দাশ ও তাঁর সহযোগীরা আন্দোলনের ঐক্যরক্ষার স্বার্থে জেতার প্রভূত সম্ভাবনা থাকলেও অংশগ্রহণ করেননি) তার আর আপাততঃ কোন গুরুত্ব ছিল না। অন্যদিকে দাশের দাবি মেনে আন্দোলনের বিরোধমূলক (obstruction) উপাদানগুলিকে আরো প্রকট করা হল। এই দিকগুলি বিবেচনা করলে প্রকৃত প্রস্তাবে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন দাশ একজন গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বাংলায় প্রকৃত অর্থে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল চিত্তরঞ্জন দাশ নাগপুর থেকে ফিরে আসার পর। তিনি প্রথমেই সংগঠন তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। স্বেচ্ছাসেবী (Volunteer) জোগাড় করা, 'তিলক স্বরাজ' ফান্ড-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ চলতে থাকল। স্বেচ্ছাসেবীরা গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে অসহযোগের বাণী প্রচার করতে থাকলেন। ফলে আগে যে সমস্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক সক্রিয়তা খুব বেশী ছিল না সেখানেও রাজনৈতিক গতিবিধি বাড়ল। এ প্রসঙ্গে বীরভূমের উল্লেখ করা যায়।

অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে একটি প্রধান ঘটনা হল আসামের চা বাগানের 'কুলীদের' দলবদ্ধভাবে বাগান পরিত্যাগ। তারা গুজব শুনেছিল যে দেশে গান্ধীজি স্বরাজ এনেছেন, যেন একটা যুগান্তর ঘটে গেছে। তাই তারা তাদের বাসস্থান বিহারে ছোটনাগপুর ইত্যাদিতে ফিরে যেতে চাইল। পূর্ববঙ্গের চাঁদপুরে, যেখানে আসাম ফেরত কুলীরা স্টিমার এর অপেক্ষায় প্রতিক্ষারত সেখানে তাদের উপর গুর্খা বাহিনী নির্মম অত্যাচার করলে পূর্ববঙ্গে স্টিমার—রেলপথে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু হল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে।

এরকমই আরেকটা ঘটনা হল বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এর নেতৃত্বে পূর্ব মেদিনীপুরে ইউনিয়ান বোর্ড এবং চৌকিদারী tax বিরোধী আন্দোলন। চৌকিদারী ট্যাক্স প্রায় 50% বাড়াবার কথা হচ্ছিল। শাসমল মূলতঃ মাহিষ্য স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় তমুলক, কাঁথি অঞ্চলে এই আন্দোলন চালান। Union Board সদস্যদেরকে সামাজিক বয়কট শুরু করায় অনেকে বোর্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নতুন চৌকিদারী tax দান থেকে অনেকে বিরত থাকছে দেখে, যাতে তারা নিদেনপক্ষে পুরনো হারে চৌকিদারী tax দেয় তার জন্য Union board গুলিকে কর্তৃপক্ষ তুলে দেন। বস্তুতঃ এটি ছিল বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তথা অসহযোগ আন্দোলনের বিশাল জয়।

এছাড়া 17, November 1921 ভারতে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ এর আগমন উপলক্ষ্যে কলকাতায় সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এক সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ডিসেম্বর মাসে শুরু হল 'জেল ভরো' আন্দোলন। এই মাসেই আবার প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ এর বাংলায় আসার কথা। তাঁর কলকাতায় পদার্পণের দিনে কলকাতায় হরতাল হল

তবে তার আগেই চিত্তরঞ্জন দাশসহ অন্যান্য অগ্রগণ্য নেতারা কারারুদ্ধ হওয়ায় সেই দিনটা মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কেটে গেল।

এই সময়কার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ। চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী ছিলেন অগ্রগণ্যা। তিনি অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

সরকারের পক্ষে এর চেয়েও আরো গুরুতর চিন্তার বিষয় ছিল গ্রামাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন যার অভিমুখ ছিল সরকারি পুলিশ, গ্রামের চৌকিদার। এছাড়া চৌকিদারী ট্যাক্স এবং ইউনিয়ন বোর্ডের করও বন্ধ করা হয়। কিন্তু এর ফলে উজ্জীবিত কৃষকরা জমিদারকে দেয় খাজনা দিতেও অস্বীকার করে। স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় জমিদার-মেনিদীপুর জমিদারী কোম্পানি ছাড়াও এতে দেশীয় জমিদাররাও আশঙ্কিত হয়ে পড়ল। অসহযোগ আন্দোলনের সংগঠকদের মধ্যে ভূমধ্যধিকারী শ্রেণীর লোকেরা এর ফলে আগ্রহ হারাতে থাকে। প্রাদেশিক কমিটির নিষেধও কিন্তু গ্রামবাসীরা মানতে চাইল না। এই পর্যায়ে খিলাফৎ আন্দোলনের সংগঠকদের বর্ধিত কার্যকলাপের ফলে মুসলিম জনসাধারণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। মুর্শিদাবাদ ভিন্ন অন্যান্য অঞ্চল কম বেশী আলোড়িত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশী আন্দোলনমুখী ছিল রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম। মেদিনীপুরে আমরা আগেই দেখেছি শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড এবং চৌকিদারী ট্যাক্স এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেহারা। ত্রিপুরাতে কৃষিজীবী মুসলিম জনগোষ্ঠী স্থানীয় জমিদার এবং সুদখোর উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। রঙ্গপুরে প্রাক্তন বিপ্লবীদের (যাদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের চুক্তির কারণে তারা প্রকাশ্য জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ শুরু করেছিল) উদ্যোগের কারণে অত্যন্ত ঠাসবুনোট একটি সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল। চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখানে খাজনা বন্ধের আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। যার উপর অবশ্য এই সংগঠকদের বিশেষ প্রভাব ছিল না। চট্টগ্রামে সরকারি বনদপ্তর তছনছ, জঙ্গল লুঠ চলতে থাকে। চাঁদপুরের ঘটনার পর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আন্দোলন মূলতঃ শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এই সময়ে আন্দোলনরত মানুষের উপর কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এক সামাজিক বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে চৌরিচৌরার ঘটনায় আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতৃত্বকে এক অর্থে স্বস্তি দিয়েছিল।

৬.৩.৫.৬ : আন্দোলন পরবর্তী ঘটনা ও তার তাৎপর্য

তবে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে দাশ ও গান্ধীর যে দ্বন্দ্ব তা আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। ব্রিটেনের রাজপুত্রের আগমনের প্রাক্কালে চিন্তিত প্রশাসন যখন দাশ এর কাছে কিছু সমাধানসূত্র পাঠিয়েছেন—সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং শাসন সংস্কার, স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন, তখন দাশ এই প্রস্তাব গ্রহণে রাজি ছিলেন। এতে করে আন্দোলনের প্রাপ্তিযোগ ঘটত যা মানুষকে উৎসাহিত করত। কিন্তু সেই মুহূর্তে গান্ধী জেদ ধরে থাকায় এই দৌত্য ব্যর্থ হয়। গান্ধীর সাথে দাশ এর এই মত পার্থক্যের কারণ হল গান্ধী গোটা আন্দোলনটাই পরিচালনা করেছিলেন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে (moral consideration)। দাশ কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। গান্ধী যখন চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের কারণে আচমকা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে তখন তার প্রাপ্তি বস্তুতঃ শূন্য।

৬.৩.৫.৭ : চরিত্র

1921 সাল পর্যন্ত যে আন্দোলন তা মোটের উপর শহরকেন্দ্রিক ছিল। সরকারের দমনমূলক নীতির ফলে শহরে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসছিল কিন্তু গ্রামে আরো বেশী বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বের উদ্যোগে আন্দোলন শুরু হলেও 1922-এর গোড়ায় গণবিক্ষোভ ক্রমশঃই একটি শক্তিশালী যুগান্তের ধারণায় পুষ্ট কৃষক আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছিল। প্রথমে গ্রামের সচ্ছল ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিলেও (যার ফলে আন্দোলনের রাশ টানবার ক্ষমতা ছিল তাদের হাতে) এবং মোটামুটিভাবে আন্দোলনকে সামাজিক স্থিতির (social stability) চৌহদ্দির মধ্যে রাখলেও এই পর্যায়ে ক্রমশঃই তা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

আন্দোলন আচমকা প্রত্যাহৃত হলেও পরোক্ষভাবে দাশ এর একটি অভিপ্রায় পূরণ হয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দিয়ে আরো বেশী সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা পেতে চেয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে শহর ও গ্রামের জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের গণভিত্তি প্রসারিত হয়। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের সাংবিধানিক সংস্কারের দরুন নির্বাচক মণ্ডলীর সংখ্যা (electoral base) আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের এই প্রসারিত গণভিত্তি পরে তাই স্বরাজ পার্টির নির্বাচনে সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে।

৬.৩.৫.৮ : স্বরাজ পার্টি ঃ নির্বাচনী রাজনীতি, দল ও দলাদলি

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার দাশ রাজনৈতিক কারণেই মানতে পারেননি। অন্যদিকে গান্ধীজির কর্মপন্থা ও পদ্ধতি নিয়েই কংগ্রেসের নেতৃত্বস্থানীয় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ছিল—যেমন বাংলায় দাশ এবং তাঁর অনুগামীরা, পাঞ্জাবে লাজপত রাই, সংযুক্ত প্রদেশের (United Province) মতিলাল নেহেরু বা মহারাষ্ট্রের জয়াকার এবং তিলকের অনুগামীরা কংগ্রেস অনুসৃত নীতি পুরোদস্তুর মানতে পারেননি। দাশ যেমন মনে করতেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত। কাউন্সিলে নির্বাচিত হলে সেখানে অসহযোগ আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচিত সদস্যেরা প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করবেন নিজস্ব নীতি অনুযায়ী কাউন্সিলকে চালাতে (যা উপনিবেশিক সরকার কখনই করতে দেবে না) তখন বারবার মূলতুবী প্রস্তাব এনে সরকার পক্ষের আনীত প্রস্তাবকে আইন সভায় পরাজিত করে বাজেট পাশ করতে না দিয়ে সরকারের কাজকর্মকে ভন্ডুল করে দিতে হবে। কিন্তু দাশ এর প্রস্তাব কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতা যথা রাজগোপালচারীরা নেতৃত্বে কাউন্সিলে অংশগ্রহণের প্রস্তাব পরাজিত হল। তখন ১৯২২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে গান্ধীর বিরোধীরা স্বরাজ পার্টি গঠন করলেন।

৬.৩.৫.৯ : চিত্তরঞ্জন দাসকৃত বেঙ্গল প্যাক্ট

মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনে বাংলার কাউন্সিলের সদস্যপদগুলি সাধারণ পদ, মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত পদ এবং ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত পদগুলিতে বিভক্ত ছিল। এদের অনুপাত এমন ছিল যে মুসলিমদের সংরক্ষিত ৩৭টি পদের অধিকাংশের সমর্থন না পেলে কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া অসম্ভব ছিল। সাম্প্রদায়িকতা

সাধারণভাবে দুটি ধারায় চলতে থাকে—একটি স্তরে সংখ্যালঘু সুযোগ থেকে বঞ্চিত অংশের শিক্ষিত মানুষেরা সরকারি চাকুরী, সুযোগ সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, আর সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ সাম্প্রদায়িকতাকে এক বিস্ফোরক শক্তি দান করে। এইদুই স্তর কখনো আলাদা থাকে, কখনো হাত ধরাধরি করে চলতে থাকে। বাঙলার মুসলিম জনগণের শিক্ষিত অংশের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিতে দাশ 'Bengal Pact' অনুযায়ী প্রস্তাব দিলেন যে কংগ্রেস যখন প্রকৃত ক্ষমতা পাবে তখন তাঁরা মুসলিমদের জন্য সমস্ত সরকারিপদের 60% সংরক্ষণ করবে যতদি না পর্যন্ত মুসলিমরা সরকারি চাকুরীতে জনসংখ্যার অনুপাতে সঠিক প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে। ১৯২১ সালের পর থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ দূষিত হয়ে পড়ছিলো। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ স্তরের ধর্মীয় ভাবাবেগকে মর্যাদা দিতে দাশ স্বেচ্ছায় মসজিদের সামনে সঙ্গীত সহযোগে শোভাযাত্রা, ঈদে কুরবানী করবার অধিকার (এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাদপ্রতিম উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গোরক্ষণী সভার কার্যকলাপ চলছিল) ইত্যাদিতে সম্মতি দেন। এই কারণেই 1923-এর নির্বাচনে যে 47 জন স্বরাজ পার্টি প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন তার মধ্যে 21 জন মুসলিম সংরক্ষিত কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ এই প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম জনসমাজের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

৬.৩.৫.১০ : কাউন্সিলের অভ্যন্তরে অসহযোগ; চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্ব

স্বরাজ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও মন্ত্রিসভা গঠন করলেন না। একটি কার্যকরী মন্ত্রিসভা গঠন করবার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল বাংলার গভর্নর-এর উপরে। ফজলুল হক ও এ. কে. গজনভীর এই মন্ত্রিসভায় স্বরাজ দল ঠিক করল তারা সম্মিলিতভাবে দুটি বিষয়ে বাধা দেবেন। (১) মন্ত্রীদের মাইনে (২) বিভিন্ন খাতে সরকারের বাজেটে নির্ধারিত টাকার পরিমাণ।

স্বরাজ পার্টিব দাবি ছিল মন্ত্রীদের মাইনে হবে 1 টাকা। শেষপর্যন্ত এই প্রস্তাবের পক্ষে 63টি, বিপক্ষে 62 টি ভোট পড়ে এবং ফজলুল হক, গজনভী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। 1924 থেকে 27-এর মধ্যবর্তীকালীন সময়ে স্বরাজীরা কোন মন্ত্রীকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কাজ করতে পারেননি ফলে শেষপর্যন্ত সরকারকে 'বণ্টিত দপ্তরগুলি' (transferred subjects যে দপ্তরগুলির দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এক্তিয়ারভুক্ত হল।) নিজেদের হাতে ফেরত নিতে হয়। স্বরাজীদের দ্বিতীয় দাবিটি ছিল বাজেট সংক্রান্ত। বণ্টিত দপ্তরগুলির বিশেষতঃ জনস্বার্থ সংক্রান্ত যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যয় বরাদ্দ ছিল অত্যন্ত কম। Meston Award (সরকারের প্রাপ্ত আয় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বণ্টনের সূত্র) পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নে স্বরাজীদের সমালোচনা ছিল তীক্ষ্ণ। আরেকটি বিষয় নিয়ে সরকারপক্ষের সঙ্গে স্বরাজীদের দ্বন্দ্ব বেধেছিল। তা হল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন।

বাংলায় স্বরাজ পার্টির প্রাণকেন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। রাজনীতির এই পর্যায়ে তিনি একইসাথে বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই করছিলেন। একদিকে যেমন সরকারের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে তাঁকে লড়াই করতে হচ্ছিল তেমনি কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে গান্ধীবাদীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছিলেন তিনি। আবার স্বরাজ পার্টির অভ্যন্তরীণ দলাদলি—বল্লভভাই প্যাটেল ও জয়াকার গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব সামাল দিতে হচ্ছিল। এই অসম্ভব কাজকে তিনি সম্ভব করেছিলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের অসম্ভব উজ্জ্বল নেতৃত্ব তৈরি করবার মধ্য দিয়ে, যারা বাংলার রাজনীতিতে

পরবর্তী ৪০ বছর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁরা হলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (চট্টগ্রামের বিখ্যাত রেল-স্টিমার ধর্মঘটের নেতা, স্বরাজ পার্টির সম্পাদক এবং বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় দাশ এর সহকারী) বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, (মেদিনীপুর-এ বিখ্যাত Union Board বিরোধী আন্দোলনের নেতা) কিরণশঙ্কর রায় (ঢাকার নেতা) সুভাষচন্দ্র বসু (তরুণ IAS যিনি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন; কলকাতায় হরতালের নেতৃত্ব দেন এবং কর্পোরেশনে Chief Exective Officer হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন) হাজী আব্দুর রসীদ খান ইত্যাদি। শুধু উজ্জ্বল নেতৃত্বই নয় চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রখর রাজনৈতিক বাস্তববোধ থেকে কলকাতার শহুরে নেতৃত্ব এবং মফঃস্বল-এর নেতৃত্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য এনেছিলেন যা বাংলার রাজনীতিতে নতুন। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ আন্দোলনের প্রতিনিধি, শহুরে শিক্ষিত অংশের প্রতিনিধি, সন্ত্রাসবাদী, শ্রমিক নেতা, মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব, বড় শিল্পপতি সবাইকে এক ছাতার তলায় এনে একটি যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন তৈরির প্রতিভা দেখিয়েছিলেন দেশবন্ধু।

তবে বিরোধিতা, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ছিল উর্বর যাকে চিত্তরঞ্জনও চাপা দিতে পারেননি।

৬.৩.৫.১১ : কলকাতা কর্পোরেশন এবং স্বরাজ পার্টি

কাউন্সিলে প্রথমবার অংশগ্রহণ করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অনেক পরিশ্রম করে কলকাতা কর্পোরেশনের একটি নতুন আইন প্রণয়ন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কর্পোরেশনকে যথার্থই স্বায়ত্ত্বশাসনের উপযুক্ত করে তোলা। আইন প্রণয়ন করলেও সুরেন্দ্রনাথ কর্পোরেশন নির্বাচনে ধারে এবং ভারে, বয়সে অনেক ছোট বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে পরাজিত হন। কাউন্সিলের কাজ বানচাল করলেও স্বরাজ পার্টি কর্পোরশনে গঠন করলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ হন মেয়র। কর্পোরেশনকে প্রকৃত জনমুখী করতে এই পর্যায়ে স্বরাজ পার্টির অবদান অনস্বীকার্য। চিত্তরঞ্জন দাশ দায়িত্ব নেবার আগে কর্পোরেশনের অধীন স্কুল ছিল মাত্র 19টা; 1931 শে কর্পোরেশনের 225টি স্কুলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া হাসপাতালগুলিতে বিনাপয়সায় চিকিৎসার জন্য কর্পোরেশন অনুদান-এর পরিমাণ বাড়ায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য ডিসপেনসারীর সংখ্যাও বাড়ে। বস্তি অঞ্চলের সাফাই কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও সম্ভবপর হয়নি অর্থের অপ্রতুলতার কারণে। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য বন্ড ছাড়বার কিন্তু সরকার এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

কর্পোরেশনে দেশবন্ধু মেয়র হলে সুরাবাদী ডেপুটি মেয়র হন। সুভাষচন্দ্র বসু হলেন Chief Executive Officer (বস্তুতঃ এই পদে ওনার নিযুক্তির মধ্য দিয়ে দলাদলির সূত্রপাত)। তাঁর আমলে খালি থাকা 33টি পদের মধ্যে 25টিতেই মুসলমানদের নিয়োগ করা হয় (প্রায় 80%)। এই সময়ে কর্পোরেশনে ইউরোপীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছিল।

৬.৩.৫.১২ : স্বরাজ পার্টির সংকট

৬.৩.৫.১২.১ ঃ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

খিলাফৎ আন্দোলন-এর অবসান স্বরাজ পার্টি তথা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সামনে একটা সংকট উপস্থিত করেছিল। মুসলমান সমাজের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা এবং

কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা এই কলেজ বিশেষ প্রসার ঘটিয়েছিল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ এবং অন্যান্য অঞ্চলে স্থানীয় বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে মুসলিমরাই সংখ্যাগুরু হয়ে উঠেছিলেন, শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ওই সমস্ত এলাকায় ক্রমশঃই তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাচ্ছিলেন। ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থিত কলকাতায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা মুসলিমদের পক্ষে সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না, তাঁরা চাইছিলেন এইভাবে প্রান্তিক এলাকাগুলিতে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কেন্দ্রে চাপ বাড়াতে।

অন্যদিকে ধর্মীয় ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনার দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। একদিকে 'তবলিগ' ও 'তঞ্জিম' আর অন্যদিকে 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' সাম্প্রদায়িক উত্তাপ বাড়াচ্ছিল। কলকাতায় গোরক্ষণি সভার সভাপতি ছিলেন আশুতোষ মুখার্জী। হিন্দু দক্ষিণ পন্থা (Hindu Right)-এর গুরুত্ব বাড়ছিল। তারকেশ্বর মন্দিরে দুর্নীতিগ্রস্ত মোহন্তর বিরুদ্ধে স্বরাজ/কংগ্রেস পার্টির সত্যাগ্রহের সময় হিন্দু দক্ষিণ পন্থীরা তাই নিয়ে হৈ চৈ বাধান।

৬.৩.৫.১৩ : শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ব্যর্থতা

চিত্তরঞ্জন দাশ উপর্যুপুরি দুটি বছরে 'All India Trade Union Congress (AITUC)-র সভাপতি হন। কিন্তু পুঁজি ও শ্রমের সংশ্লেষ/সৌহার্দ (Indian synthesis of labour & capital) এর তত্ত্ব সেই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে একেবারেই আকর্ষণীয় ঠেকেনি। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে AITUC মধ্যেকার বামপন্থী অংশ মহেন্দ্রলাল সরকারের নেতৃত্বে সরব হয়। অন্যদিকে কৃষকশ্রেণীর উত্থান কংগ্রেস/স্বরাজ পার্টির মধ্যে বড় জোতের মালিক/জমিদারকে ভীত করে তুলেছিল। তাঁরা ধামাচাপা দিতে চাইলেও কৃষকচেতনার বিকাশ একভাবে সাম্প্রদায়িক চেতনাকেও পরিপুষ্ট করেছিল। Bengal Tenancy Act-এর সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে স্বরাজ পার্টির দ্বিধার মধ্যে এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট। একে কাজে লাগাচ্ছিলেন মুসলিম 'জোতদার'রা। কৃষকদের মধ্যে তাদের জাতীয়তাবাদ বিরোধী প্রচার এই কারণে আরো বিশ্বাসযোগ্যতা পায় এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাকেই পুষ্ট করে।

৬.৩.৫.১৪ : কাউন্সিলে সংকট

চিত্তরঞ্জন দাশ, কাউন্সিলের অভ্যন্তরে বাধা দান করবার ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করলেও গভর্নর তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলেন। পার্টির মধ্যে এই নীতি অনুসরণ করবার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। স্বাভাবিকভাবে ভিতরে বাইরে ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে চিত্তরঞ্জন একটি সমঝোতার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান। তিনি জানান যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, অদূর ভবিষ্যতে 'স্বরাজ' দানের সরকারি ঘোষণার শর্তে তিনি 'সরকারের সাথে সহযোগের জন্য প্রস্তুত।

তাঁর এই অকস্মাৎ পরিবর্তন তাঁর সমর্থক সহযোগীদের বিমূঢ় করে। বিশেষতঃ সন্ত্রাসবাদীরা তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জনের দুর্বলতার কথা উপলব্ধি করে সরকারও তাঁর প্রস্তাবে কোন সাড়া দিলেন না।

এই হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করেন 16 June, 1925 সালে।

৬.৩.৫.১৫ : এনেছিল সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ...

বাংলার রাজনীতি আক্ষরিক অর্থেই অন্যরকম ছিল। জমির মালিকানা সাম্প্রদায়িক বিভেদ তীক্ষ্ণ করতেই সাহায্য করেছিল (যেখানে জমিদাররা মূলতঃ বর্ণহিন্দু আর চাষী, ক্ষেতমজুরদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান)। অন্যদিকে বাংলায় দীর্ঘদিনের ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের কারণে শিক্ষিত অংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িক বিভেদকেই সূচিমুখ দিয়েছিল। এর পাশাপাশি কলকাতা এবং অন্যান্য এলাকার মধ্যে প্রতিযোগিতা দলাদলির কারণ। এত কিছুর বৈপরীত্য সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন দাশ যে সংগঠনে ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন সেটা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। ব্রুমফিল্ড বা গ্যালহার (Gallagher) তাঁর রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি বা সুবিধাবাদ-এর বাহবা দিয়েছেন কিন্তু তাঁর মূল অবদান ছিল জন আন্দোলনের এবং কাউন্সিলের রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্য আনা। তিনি জন আন্দোলনকে গান্ধীর বেঁধে দেওয়া গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাকে কাজে লাগিয়েছেন সরকারকে চাপে রেখে আরো বেশী বেশী সাংবিধানিক সুবিধা পেতে। মুসলিমদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর অবর্তমানে বাংলার রাজনীতিতে সংকট বাড়তে থাকে। কবির ভাষায়

এনেছিলে সাথে করে

মৃত্যুহীন প্রাণ

মরণে তাহাই তুমি

করে গেলে দান।

৬.৩.৫.১৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. Leonard A. Gordon, Bengal : The Nationalist Movement 1876-1940. (New York. 1974)

2. Rajat Kanta Ray, Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875-1927. (Oxford University, 1984)

3. Rajat Kanta Ray, Urban Roots of Indian Nationalism; Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta city Politics, 1875-1939 (Vikas, 1979)

4. John H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal (University of California, 1968)

৬.৩.৫.১৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। বাংলায় গান্ধীবাদী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কেমন ছিল? এই পরিস্থিতি আন্দোলনে কিরকম প্রভাব ফেলেছিল?

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ভারতীয় বণিককুলের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মাড়ওয়ারী বণিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩। নাগপুর কংগ্রেসকে কি চিত্তরঞ্জন দাশের 'বিজয়' বলা যায়? পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দাও।

৪। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্কের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ।

৫। 1923-1931-র মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে কলকাতা কেন্দ্রিকতা কিভাবে আঞ্চলিক রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছিল। তার বর্ণনা দাও।

৬। 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর মূল শর্তগুলি কি কি ছিল? বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে এর কি প্রভাব পড়েছিল?

৭। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা এবং কলকাতা কর্পোরেশনে 'স্বরাজ' পার্টির কার্যকলাপ বর্ণনা কর। স্বরাজ পার্টির কর্মনীতি (Tactirs) দ্বৈতশাসন (Dyarchy)-র বিরুদ্ধে কতটা কার্যকরী হয়েছিল।

৮। বাংলার রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৩

Phases of National Movement

একক-৬

Bengal Congress, Subhas Chandra Bose and Bose-Sengupta Split

বিন্যাস ক্রম

৬.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

৬.৩.৬.১ : গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক

৬.৩.৬.২ : সুভাষচন্দ্র বসু-যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দ্বন্দ্ব

৬.৩.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.৬.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

৬.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্কের বিষয়

(২) সুভাষচন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের কারণ।

৬.৩.৬.১ : গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক

গান্ধীর আদর্শ, তাঁর বহিরঙ্গের পোষাক থেকে শুরু করে গ্রামমুখী দৃষ্টিভঙ্গি শহুরে যান্ত্রিক জীবনের প্রতি তীব্র অনীহা সমস্তই ছিল নাগরিক বাঙালি জীবনাদর্শের থেকে শতসেজন দূর। তথাপি 'কবিগুরু' এবং 'মহাত্মা' ছিলেন একে অন্যের প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল। তাদের উভয়ের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মতের মিল ছিল ঃ উভয়েই রাজনৈতিক স্বরাজ লাভের আগে আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে আত্মশক্তি উদ্বোধনে বিশ্বাসী ছিলেন। দুজনেই 'গঠনমূলক কাজের' (constructive work) উপর জোর দিয়েছিলেন; বিশেষতঃ গ্রাম পুনর্গঠন উভয়েরই কর্মপন্থার একটি বিশিষ্ট দিক। আত্মনির্ভর, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল দুজনেরই লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ মানহারা মানবের কাজে গান্ধীর কার্যকলাপকে গুরুত্ব দিতেন, শ্রদ্ধা করতেন এবং কথিত আছে যে 'মহাত্মা' আখ্যায় রবীন্দ্রনাথই গান্ধীকে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অমিল কমও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্রষ্টা—যিনি স্বজন এর আনন্দ, সমন্বয়ের তাৎপর্যকে ধ্বংস কার্যের উপরে স্থান দিয়েছেন। আর গান্ধীজির পশ্চিমী সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ (যা

তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' এ সূত্রায়িত হয়েছে) রবীন্দ্রনাথ কখনই মানতে পারেননি। সমন্বয়ের মানে তাঁর কাছে এরকম

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার

সেথা হতে সব আনে উপহার...

দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে

যাবে না ফিরে

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'বয়কট' বা 'অসহযোগ'-এর রাজনীতির সাথে সহমত হতে পারেননি। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বা এই সময় লেখা দুটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর বিরোধিতাকে স্পষ্ট করেছেন। (The call of Truth, 1921 & 'The Cult of Charkha) চরকাকে ভারতীয় অর্থনীতির সমস্ত সমস্যা সমাধানে সর্বরোগহর দাওয়াই হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাঁর আপত্তি তিনি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ভয় ছিল এই অন্ধ পশ্চিম বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা শেষপর্যন্ত 'সমন্বয়'কে আঘাত করবে। রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনায় ব্যথিত গান্ধী এর উত্তরে Young India পত্রিকায় 1921 অক্টোবরে 'The Great Sentinel' প্রবন্ধে কবির সমালোচনার জবাব দিলেন। চরকার প্রবর্তনের কারণ ছিল এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি, তার কৃষি এবং শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটবে। কবি যে সরকারি উৎপাদনের কাজে যুক্ত নন সেদিকে পরোক্ষে তিনি চোখ ঠারলেন। তাঁর কথায় লক্ষ কোটি অভুক্ত ভারতীয়ের কাছে যে উচ্চ মানবিক আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী তার গুরুত্ব প্রাথমিক নয়। এই তিক্ত বিতর্কে উভয় মহামানবই কিছু কথা ভুলে গেলেন। গান্ধীজি ভুলে গেলেন গ্রাম পুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী অবদানের কথা আর রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গান্ধীর কার্যকলাপকে কেবলমাত্র চরকাকেন্দ্রিক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন তাও সত্যের অপলাপ।

৬.৩.৬.২ : সুভাষচন্দ্র বসু-যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দ্বন্দ্ব

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে উপদল এবং দলীয় কোন্দল দীর্ঘ দিন ধরেই চলেছে। আমরা তার কিছু ঘটনা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এই সমস্ত কোন্দলের ঘটনায় ব্যক্তিত্বের সংঘাত থাকলেও মোটের উপর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক কারণও ছিল। এই কোন্দলের নিট ফল কংগ্রেস ক্রমশঃই কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে উঠল, প্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলির সাথে যোগাযোগ ক্ষীণ হতে থাকল। কোন্দলের কারণে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিতে থাকল। তাই বসু-সেনগুপ্ত কোন্দল আর শুধুমাত্র কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব না থেকে মোটের উপর বাঙলার রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠল।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বা সুভাষচন্দ্র বসু উভয়ই ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি। দাশ যখন কলকাতার মেয়র হন তখন অল্প কিছুদিনের জন্য সুভাষ প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক (Chief Executive Officer) হন। সুভাষ বসুর CEO হিসাবে মনোনয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কুৎসিৎ চেহারা

প্রকট হয়। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও একই পদের প্রার্থী ছিলেন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল কলকাতার নেতৃত্বের এক অংশ যাদের পরবর্তীকালে 'পঞ্চ প্রধান' বলা হত। এরা শাসমলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা, জাত নিয়ে খোঁটা দেওয়া, কোন দুষ্কর্মই বাকি রাখেননি। (এঁদের মধ্যে থেকে একজন মন্তব্য করেন যে এবার কি তাহলে মেদিনীপুর থেকে 'কেওটে'র ছেলে বসে (কৈবর্ত্য-মাহিষ্য শাসমলকে হেয় করবার জন্য ব্যবহৃত বাছা বাছা বিশেষণের একটি) কলকাতায় রাজত্ব করবে?। এদের বিরোধিতার সামনে শাসমল হেরে যান। এই হেনস্তার ব্যাপারে দেশবন্ধুর কাছ থেকে সদুত্তর না পেয়ে তিনি কংগ্রেস প্রাদেশিক কমিটি ছেড়ে চলে আসেন। দেশবন্ধুর জীবদ্দশায় আর ওমুখো হননি। এতে করে প্রদেশের সঙ্গে কলকাতার অন্তর্লীন দ্বন্দ্বই প্রকাশ পেয়েছে।

দেশবন্ধুর প্রয়াণে তাঁর ত্রিমুকুট (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব, কলকাতার মেয়র এবং স্বরাজ পার্টির প্রধান) শূণ্য হয়ে গেল। সুভাষ বসু তখনও মান্দালয় জেলে বন্দী। এই অবস্থায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কংগ্রেস, ওয়ার্কিং কমিটির স্নেহধন্য হওয়ায় তিনটি পদই তাঁকে দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই তাঁকে 'পঞ্চ প্রধান'-এর (তুলসী গোস্বামী, শ্রীরামপুর এর বিখ্যাত জমিদার সন্তান, কংগ্রেসের তহবিল সংগ্রাহক, নলিনী রঞ্জন সরকার, হিন্দুস্তান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কর্ণধার ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, প্রবাদপ্রতিম ডাক্তার নির্মল চন্দ্র চন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র বোস (সুভাষ চন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা) বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল (কলকাতায় তাঁর বসতবাড়ি না থাকায় তাঁকে 'ফ্ল্যাট মেয়র' বলা হয়েছে) যতীন্দ্রমোহনও তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করলেন। পঞ্চ প্রধানের সাথে টক্কর দিতে তিনি কলকাতায় ভূতপূর্ব সন্ত্রাসবাদীদের উপর নির্ভর করতে শুরু করলেন কর্মী সংঘ।

কর্মী সংঘ সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক হলেও আপাততঃ সেনগুপ্তকে সমর্থন করতে রাজি ছিলেন। অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহনকে সরাতে পঞ্চপ্রধান শাসমলক ফিরিয়ে আনলেন। বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাধীন চেতা এবং তাঁর একটি নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মপন্থা ছিল। অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবেই হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির সমর্থক ছিলেন, সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কর্মী সংঘকে নিয়ে তাঁর চলতে অসুবিধা হচ্ছিল। বিশেষতঃ তিনি চিত্তরঞ্জন দাস কৃত বেঙ্গল প্যাক্টকে রক্ষা করতে চাইছিলেন। শাসমলও একই অভিমত পোষণ করায় উভয়ে সামরিকভাবে হলেও কাছাকাছি আসেন। কিন্তু কলকাতার মেয়র পদপ্রার্থী যতীন্দ্রনাথ দেখলেন কলকাতার মেয়র হতে গেলে তাঁর পক্ষে পঞ্চ প্রধান ও কর্মীসংঘের সঙ্গে বিরোধিতা কাম্য নয়। ফলে সেনগুপ্ত-শাসমল এর রাজনৈতিক সখ্য ভেঙ্গে যায়। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন যাতে শাসমল বিশ্রীভাবে পরাজিত হন। এরপরেই শাসমল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু জেল থেকে ফিরে এসে 'ত্রিমুকুটে'র প্রথম দুটি (প্রাদেশিক সভাপতি এবং মেয়র পদ) দাবি করলেন। শাসমল ছেড়ে চলে যাওয়ায় প্রাদেশিক সভাপতি পদ খালিই ছিল। কর্মী সংঘ প্রাথমিকভাবে সুভাষ বসুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল (তাঁর অবর্তমানে সেনগুপ্তকে তারা সাময়িকভাবে সমর্থন জানিয়েছিল)।

১৯২৮-এর নির্বাচনে সেনগুপ্ত স্বেচ্ছায় বসুকে মেয়র পদ ছেড়ে দেন কিন্তু সেই নির্বাচনে বসু হেরে যান। (দাশ-এর মৃত্যুর পর যেমন কলকাতা কেন্দ্রিকতার কারণে প্রদেশ হাতছাড়া হচ্ছিল তেমনি সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে মুসলিমদের সমর্থনেও ভাঁটা এসেছিল।

পরের বছর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মুসলিম পৌরপিতাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করলেন যাতে ঠিক হল কর্পোরেশনের নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিমদের 33 1/2% সংরক্ষ থাকবে, এছাড়া ডেপুটি মেয়র পদ মুসলিমরা পাবে এবং প্রতিটি Standing Committee তে 4টি করে সিট্ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাংলার হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বসু সেনগুপ্ত দ্বন্দ্বের কারণেই শেষপর্যন্ত এই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।

বসু-পঞ্চ প্রধান বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অধিকার পান। ফলে মনোনয়ন দেবার ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। এরফলে সেনগুপ্ত পাল্টা প্যানেল দিলেন। তবে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন প্রভাব নির্বাচনী ফলাফলে পড়ল না। বরং 85-র মধ্যে 44 আর (5টি অল্ডারম্যান পদের সব কটাতেই জয়ের ফলে কর্পোরেশনে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাবের ফলে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সমর্থন হারাতে হয়।

যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে মুসলিম পৌরপিতাদের সমঝোতার কারণে ৫টি অল্ডারম্যান পদেই প্রার্থী দিলেও সেনগুপ্ত ছাড়া আর কোন মুসলিম পৌরপিতা অল্ডারম্যান হতে পারলেন না। মুসলিমদেরকে ডেপুটি মেয়রের পদও দেওয়া হল না। ফলে দাশ এর সময় থেকে এই প্রথম মুসলিমরা কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে পারলেন না। অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিলেও বিজয়গর্বে অন্ধ কংগ্রেস স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলিতে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে রাজি হল না। প্রতিবাদে মুসলিম পৌরপিতারা স্ট্যান্ডিং কমিটি বয়কট করলেন।

কংগ্রেসের এহেন মানসিকতার বিরুদ্ধে তাঁরা টাউন হলে এক বিরাট সমাবেশও করলেন। আসলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে এই সমস্ত পদগুলি অনুগত ও বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করতেই শেষ হয়ে যায়। এইভাবে দলীয় কোন্দলের কারণে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিই শেষপর্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তখন সেনগুপ্ত-বোস উভয়েই আইন অমান্য আন্দোলনের (Civil Disobedience Movement) কারণে জেলে বন্দী। পঞ্চ প্রধান ঠিক করলেন তাঁরা সেনগুপ্তকে মেয়র করবেন এই শর্তে যে তিনি তিন মাসের মধ্যে জেল থেকে ছাড়া না পেলে নতুন মেয়র নিয়োগ করা হবে। পঞ্চ প্রধানের কাছে খবর ছিল যে যতীন্দ্রমোহন তিন মাসের মধ্যে ছাড়া পাবেন না এবং যখন খবরটা সত্য প্রমাণিত হল তখন এই শূণ্য পদে বিধান চন্দ্র রায় সুভাষ বসুর নাম প্রস্তাব করলেন। এইভাবে সুভাষ বসুর একটি দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত ইচ্ছাপূরণ হল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে উভয়পক্ষে যে কোন্দল হল তার প্রভাব হল সুদূরপ্রসারী। সেনগুপ্ত এর এক বছরের মধ্যে মারা গেলেন। সুভাষচন্দ্র বসুও রোগমুক্তির জন্য দীর্ঘদিনের জন্য ইউরোপে চলে গেলেন। ফলে দ্বন্দ্বের দুই প্রধান কুশী-লব কিছুদিনের মধ্যেই অন্তর্হিত হলেন। রয়ে গেল কলকাতা কেন্দ্রিক কোন্দলের রাজনীতির 'কংগ্রেসী কালচার' এর ট্রাডিশন।

৬.৩.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. Leonard A. Gordon, Bengal : The Nationalist Movement 1876-1940. (New Your, 1974)

2. Rajat Kanta Ray, Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875-1927. (Oxford University, 1984)

3. Rajat Kanta Ray, Urban Roots of Indian Nationalism; Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta city Politics, 1875-1939 (Vikas, 1979)

4. John H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal (University of California, 1968)

৬.৩.৬.১৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। সুভাষচন্দ্র বসু-যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দ্বন্দ্বের বর্ণনা দাও। কেন এই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়?

২। বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে 'বসু-সেনগুপ্ত' দ্বন্দ্বের ফলাফল কি?

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৪

Communal and Caste Politics

একক-৭

(a) Muslim League in Bengal

(ক) বাংলায় মুসলিম লীগ

(b) Fazlul Haque, Krishak Proja Party and Shyamaprasad - Haque Ministry

(খ) ফজলুল হক—কৃষক প্রজা পার্টি এবং শ্যামাপ্রসাদ—হক মন্ত্রিসভা

বিন্যাস ক্রম

৬.৪.৭.০ : উদ্দেশ্য

৬.৪.৭.১ : বাংলায় মুসলিম লীগ

৬.৪.৭.২ : ফজলুল হক ও কৃষক প্রজা পার্টি

৬.৪.৭.৩ : ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-৪১)

৬.৪.৭.৪ : শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা (১৯৪১-৪৩)

৬.৪.৭.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৪.৭.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৪.৭.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

(২) বাংলায় মুসলিম লীগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ এবং ফজলুল হক ও জিন্নার বিরোধের কারণ

(৩) ফজলুল হকের উত্থান এবং তার মন্ত্রিসভার কার্যাবলী

(৪) শ্যামাপ্রসাদ—হক মন্ত্রিসভা এবং এই মন্ত্রিসভার পতন

৬.৪.৭.১ : বাংলায় মুসলিম লীগ

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে সিমলা দৌত্য ও ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ স্থাপনের মধ্যে। এর পর থেকেই লীগ নিজেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলে দাবি করে এবং মুসলমান সম্প্রদায় প্রত্যক্ষভাবে এবং সাংগঠনিক পথে ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। মুসলিম লীগ গঠনের পথে সরকারের সক্রিয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে ইংরেজরা মুসলিম তোষণনীতি অনুসরণ করে আসছিল। লর্ড নর্থব্রুক আলিগড় কলেজকে দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ অবশ্য মুসলমান যুব সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং কোন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার বিরোধী ছিলেন। ইংরেজরা মুসলিম তোষণ নীতির পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিভেদের সুযোগ নিয়ে একদিকে যেমন মুসলমানদের খুশি করার নীতি গ্রহণ করেছিল অন্যদিকে তেমনই উভয়ের মধ্যকার বিরোধকে আরও উস্কানি দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জলকে আরও ঘোলা করতে চাইছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে যদি তিনি বঙ্গভঙ্গ করতেন, তাহলে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে বিহার ও উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের কাছে তিনি সাধু সাজলেন। খোলাখুলিভাবে তিনি বলেন যে, মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যই তাঁর এই আলাদা প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা। তিনি নাকি মুসলমানদর এমন এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, যা তারা পুরানো মুসলমান শাসকদের আমলের পর আর দেখেনি। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁকে হাত করার জন্য তিনি স্বল্প সুদে তাঁকে এক লক্ষ পাউণ্ড ধার দেন। বঙ্গভঙ্গের পিছনে কার্জনের কংগ্রেস ও বাঙালি বিদ্বেষের কার্যকরী ভূমিকা ছিল।

লর্ড কার্জনের তাৎক্ষণিক অভিলাষ অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ ও তার পরিপূরক স্বদেশি আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তীব্রতর করেছিল এবং বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সংগঠিত হয়। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটোলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার খোলাখুলিভাবেই মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান এবং ভারত সচিব মর্লেকে লেখা এক চিঠিতে বড়লাট মিন্টো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট আশাদাবী। লর্ড কার্জনের নীতি বাংলায় মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয়ী ও সাহসী করেছিল এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল। বস্তুতঃ বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশিকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের, বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয়। বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন করে মুসলমানরা। তাদের নেতৃত্ব দেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খান। অতিরিক্ত বাংলায় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। গড়ে উঠেছিল অসংখ্য সভা সমিতি। কিন্তু এদের নেতৃত্ব ছিল বাঙালি হিন্দুদের হাতে। অবশ্য মুসলমানরাও মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি অব ক্যালকাটা (১৮৬৩), ন্যাশন্যাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৭) ও স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য আঞ্জুমান গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এই সব সংগঠন জাতীয় প্রতিনিধিমূলক ছিল না। এদের কোন আদর্শ ও নির্দিষ্ট কর্মসূচীও ছিল না। এগুলির সংগঠক ছিল অভিজাত

মুসলমান সম্প্রদায় এবং সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক যা যোগাযোগ ছিল না। এই অবস্থায় মুসলমানরা একটি জাতীয় সংগঠনের কথা চিন্তা করে। ১৯০৬ সালে গঠিত মুসলিম লীগ তাদের এই অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করে। অর্থাৎ বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পিছনে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশি ছাড়া আরও একটি প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল। মর্লে তাঁর বাজেট ভাষণে কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের আভাস দেন। এর ফলে মুসলমানদের আশঙ্কা হয় যে, আইন সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নিযুক্ত হলে হিন্দুরাই বেশি সুযোগ পাবে। এই পরিস্থিতিতে আলিগড়ের মুসলমান নেতারা লর্ড মিন্টোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। একদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাটও মিন্টোকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন এই মুসলিম প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। লর্ড মিন্টো এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সিমলায় সাক্ষাৎ করেন। এই ঘটনাই সিমলা দৌত্য নামে পরিচিত। এর নেতৃত্ব দেন আগা খান। আগা খান চেয়েছিলেন মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুক এবং ব্রিটিশ সরকার যেন তাদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেন। যে ৩৫ জন প্রতিনিধি সিমলা দৌত্যে অংশ নেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত ভূস্বামী শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশার মানুষ। তাঁরা স্থানীয়, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিয়—সমস্ত কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, সামরিক ও বেসামরিক দপ্তরে অধিকসংখ্যক মুসলমান নিয়োগ, বিনা পরীক্ষায় উচ্চ পদে মুসলমানদের নিয়োগ ইত্যাদি দাবি করলেও বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। সরকার সেইসব দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন বলে আশ্বাস দেন। সিমলায় থাকাকালীন প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ একটি সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠন করার কথা চিন্তা করছিলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁ এই ব্যাপারের উদ্যোগী হন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত মহমেডান এডুকেশান্যাল কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনের শেষে নেতারা ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে মিলিত হন। নবাব ভিকার-উল-মূলক ছিলেন এই সভার সভাপতি। এইভাবে ১৯০৬ সালে ঢাকা শহরে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগের বিঘোষিত নীতি ছিল তিনটি—(১) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য; (২) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ ও (৩) অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সদ্ভাব। প্রথম দুটি লক্ষ্য স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। কিন্তু তৃতীয় লক্ষ্যের মধ্যে অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধিতা আছে। অন্যান্য সম্প্রদায়, অর্থাৎ প্রধানতঃ হিন্দুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে লীগের দ্বিতীয় লক্ষ্য ক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ লীগের জন্মই হয়েছিল হিন্দুদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার রেষারেষিকে কেন্দ্র করে। লীগের কংগ্রেস বিরোধিতা ছিল আপসহীন এবং লীগের দৃষ্টিতে কংগ্রেস ছিল হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে বলে যে দাবি করত, তার বিরোধিতা করেই লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ মুসলমানই লীগকে সমর্থন করেছিল।

লক্ষ্য করার বিষয় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশির প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হলেও সিমলা দৌত্যে ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি (নবাব নওয়াজ আলি চৌধুরি)। কলকাতা থেকে এসেছিলেন পাঁচ জন। তুলনায় লীগ প্রতিষ্ঠায় বাঙালির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সতর্ক আলিগড় গোষ্ঠী প্রথমে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের বিরোধী ছিল। কিন্তু বাংলার ঘটনা তাদের শেষ পর্যন্ত সায় দিতে বাধ্য করে। তবে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম হলেও ১৯৩৭ সালের আগে বাংলায় তার প্রভাব ছিল খুবই সীমিত। আলিগড়,

লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি উত্তর ভারতের শহরের খানদানি মুসলমানের মধ্যেই তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব কেন্দ্রীভূত ছিল। আসলে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত কৃষিজীবী মুসলমানের সঙ্গে লীগের কোন নাড়ির টান ছিল না। লীগের সদস্যপদের চাঁদার অঙ্ক এত বেশি ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এর সদস্য হওয়াও সহজসাধ্য ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের লীগের কোনো শাখা কার্যালয় পর্যন্ত ছিল না। লক্ষ্য করার বিষয় লীগ স্থাপনে বাঙালির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার সদর কার্যালয় ছিল প্রথমে আলিগড় ও পরে লক্ষ্ণৌতে। মুসলিম ক্রনিকল পরে দুঃখ করে লিখেছিল যে বাংলার মুসলমানদের কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি। যাই হোক লীগের প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের দরুণ হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তার ফল শুভ হয়নি এবং লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬), খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-২২) এবং Bengal Pact এর মাধ্যমে সেই সম্পর্কের উন্নয়নের সুযোগ এলেও শেষ পর্যন্ত তা ধোপে টেঁকেনি। বরং দিন দিন তার অধঃপতনই ঘটেছে।

লীগের আসল পরীক্ষা শুরু হয় ১৯৩৭ সালের নির্বাচন থেকে। এই নির্বাচনেই প্রথম লীগের জনপ্রিয়তা কতটুকু ছিল, তা বোঝার সুযোগ পাওয়া গেল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে। এই আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এই নিবন্ধে নেই। এই আইনে কেন্দ্রে এক ধরনের ''দ্বৈত শাসন'' প্রবর্তিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার গভর্নর জেনারেল ও মন্ত্রিসভার হাতে অর্পণ করা হয়। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উপর আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রিদের নিয়োগ করতেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে মন্ত্রিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন। মন্ত্রিরা অবশ্য তাঁদের কাজকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভার কাছে দায়ী থাকতেন। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্রিয় আইন সভার ক্ষমতার এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়। কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন কার্যকরী হলেও প্রদেশে তা হয়নি। প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসন নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রাদেশিক শাসনে মন্ত্রিরা আইন সভার কাছে দায়ি থাকতেন এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নরগণ কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা করলে আইনসভার সুপারিশ অগ্রাহ্য করে নিজের আইন তৈরি করতে পারতেন। তাছাড়া পুলিশ ও প্রশাসনের উপর তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকত। কেন্দ্রের মত প্রদেশেও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা ছিল, যদিও কোন কোন প্রদেশে আইন সভা ছিল এক কক্ষ বিশিষ্ট। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা শর্তাবলী কার্যকর হয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেস ও লীগ উভয়ই অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। বাংলায় ২৫০ টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে মাত্র ৬০ টি আসন। লীগের আসন সংখ্যা ছিল ৪০ টি। বাংলায় লীগ বিরোধী মুসলিম দলগুলির সাফল্য ছিল চমকপ্রদ। স্বতন্ত্র মুসলমান দল ৪১ টি আসনে জয়ী হয় ও ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি পেয়েছিল ৩৫ টি আসন। নির্বাচনের পর অবশ্য স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম লীগে যোগদান করে। নির্বাচনের পর লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি যৌথভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করায় লীগের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা স্বয়ং ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করায় লীগ লাভবান হয়। তিনি বাঙালী মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থেই লীগকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানান। এই সময় তিনি একইসঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির একটি অংশ ও মুসলিম লীগের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এদিকে সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতার অধিকারী সোহরাওয়ার্দি লীগের দ্রুত ক্ষমতাবৃদ্ধির দিকে নজর দেন এবং হক্ সমর্থক কৃষক

প্রজা পার্টির বহু নেতা ও কর্মী দলে দলে লীগে যোগদান করতে থাকে। বাংলার মুসলিম লীগের শ্রীবৃদ্ধির একটা কারণ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে লীগ বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও মন্ত্রীসভা গঠন করতে না পারায় সামগ্রিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায় বাংলার দিকেই তাকিয়ে থাকে। ১৯৪০ সালে লাহোর কংগ্রেসে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্বয়ং ফজলুল হক্। ফজলুল হকের দ্রুত উত্থান ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অবশ্যই জিন্নার মনঃপুত ছিল না। উভয়ের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র মতবিরোধ। বস্তুতঃ লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে হকের সম্পর্ক ভাল ছিল না। অনেকটা এই কারণেই হক লীগে যোগদান করলেও নিজস্ব কৃষক প্রজা পার্টির বিলোপ ঘটাননি। জিন্না-হকের মতবিরোধ বাঙালি ও অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতের সাক্ষ্য দেয়। তবু উভয়ে উভয়ের সহযোগিতা ও সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু লীগের পক্ষে এই বিরোধ যথেষ্ট ক্ষতিকারক ছিল। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে হক কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদ্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মুসলিম লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে এবং তা অত্যন্ত নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কলকাতায় হক্ বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দির আনুগত্য ছিল জিন্নার প্রতি। হক্ও ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। এদিকে বাংলার গভর্নর জিন্নার পক্ষকে সমর্থন করলেও লীগের মধ্যে কোন বিভাজন চাননি। এই অবস্থায় তিনি উভয় গোষ্ঠীর বিরোধ যাতে আপোষের মধ্যে মিটে যায়, তার জন্য তৎপর হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিরোধ মেটানো সম্ভবপর হয়নি এবং জিন্না ফজলুল হক্কে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন।

হক-জিন্না বিরোধ মুসলিম লীগকে দুর্বল করেছিল। লীগ থেকে হকের বহিষ্করণের ফলে লীগ সরকার থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়। হক যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন তার মাধ্যমে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। এর ফলে তিনি তাঁর আগের অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে যান। এমনকি তিনি তাঁর মন্ত্রীসভায় হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লীগের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় এবং সর্বোপরি পাকিস্তান পরিকল্পনা জনপ্রিয় হওয়ায় বাংলাতেও লীগের হারানো সমর্থনের অনেকাংশে পুনরুত্থান হয়। আইন সভায় লীগ ক্ষমতাচ্যুত হলেও তার বাইরে লীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন ও তমিজুদ্দিন খাঁর মত প্রভাবশালী লীগ নেতা বিভিন্ন জনসভায় হকের মুন্ডুপাত করতে থাকেন এবং তাঁকে মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতক বলে ধিকৃত করেন। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বাঙালি ও অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত করে সামগ্রিকভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষতি করেছেন এবং তার সংহতি নষ্ট করেছেন। বিশেষতঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্তি তীক্ষ্ণভাবে সমালোচিত হয়। মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলি (দৈনিক আজাদ, Star of India. Morning News ইত্যাদি) হকের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীকরণ শুরু হয়। জিন্না বাঙালি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনা এবং লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হলে তারাই উপকৃত হবে। সোহরাওয়ার্দীর দক্ষ সংগঠন ও প্রচারের ফলে লীগ হককে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলে। তাঁর জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে নাটোরে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তাঁর মনোনীত প্রার্থী লীগের প্রার্থীর কাছে বিপুল ভোটের (১০,৮৪৩) ব্যবধানে পরাজিত হয়। এমনকি মাত্র ৮৪০ ভোট পাওয়ায় তাঁর

জমানত বাজেয়াপ্ত হয়। এই অবস্থায় নিজের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে হক প্রগতিশীল মুসলিম লীগ নামে লীগের বিকল্প এক সংগঠন গড়তে উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। হক বিরোধী আন্দোলনে বাংলার গভর্নর জন হার্বর্টের সক্রিয় সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। তাঁর সঙ্গে হকের তীব্র মতবিরোধ ছিল। শেষপর্যন্ত হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ায় লীগ আবার সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়। নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ভারতের শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক প্রজা পার্টি অংশ নেয়। এই নির্বাচনে লীগের সাফল্য ছিল চমকপ্রদ। ২৪০ টি আসনের মধ্যে লীগ একাই দখল করে ১১৪টি আসন। মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১২১ টি। কংগ্রেস জয়লাভ করে ৮৬ টি আসনে এবং কৃষক প্রজা পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির আসন সংখ্যা ছিল ৩ টি করে। লীগের এই সাফল্যের কারণ ছিল সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিমের সাংগঠনিক দক্ষতা। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত লীগের চমকপ্রদ অভ্যুত্থান ও ক্ষমতাবৃদ্ধি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। এর একটি কারণ ১৯৩৭ সালে হক-লীগ মন্ত্রীসভা গঠন। মনে রাখা দরকার ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে লীগের ফল ছিল খুবই নৈরাশ্যজনক এবং লীগের পক্ষে ক্ষমতায় আসা কখনই সম্ভবপর হত না, যদি না কংগ্রেস যৌথভাবে হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে সরকার গড়তে অস্বীকৃত হত। জিন্না যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফজলুল হকের সাহায্য ছাড়া বাংলা দেশে লীগকে শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। তাই তিনি সাগ্রহে হকের সঙ্গে সরকার গঠনে স্বীকৃত হন। তারপর তিনি কৌশলে হককে মুসলিম লীগে যোগদান করাতে উদ্যোগী হন। অতঃপর তিনি হককে সারা ভারত মুসলিম লীগের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সদস্য করেন। পরে অবশ্য জিন্নার সঙ্গে হকের তীব্র মত বিরোধ হয়। আমরা আগেই দেখেছি জিন্না কিভাবে হককে কোণঠাসা করে দেন এবং হক মন্ত্রীসভা থেকে লীগ বহিষ্কৃত হলেও জনমানসে তার প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। সোহরাওয়ার্দীর যোগ্য নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক ক্ষমতা লীগের চমকপ্রদ উত্থানে সহায়ক হয়েছিল। অন্যদিকে লীগের প্রাদেশিক নেতৃত্ব ক্রমশঃ বাঙালিদের হাত থেকে অবাঙালিদের হাতে চলে যেতে থাকে। শহরের অবাঙালি মুসলমান, ব্যবসায়ী, জমিদার, মহাজন ও শিক্ষিত মুসলমানরাই ছিল লীগের প্রধান সমর্থক। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এরা পিছু হঠলেও তারপর থেকে তারা তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে তৎপর হয়। এরাই ফজলুল হকের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল এবং ক্রমশঃ তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

৬.৪.৭.২ : ফজলুল হক ও কৃষক প্রজা পার্টি

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসে ফজলুল হকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই ১৯১৩ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সদস্যপদ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন। বরিশালের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের স্নেহধন্য (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ফজলুল হক নিজেও ছিলেন বরিশাল জেলার সন্তান) এক একইসঙ্গে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে সলিমুল্লার মৃত্যুর পর তিনিই মুসলিম লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলেও হক হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের

উপর গুরুত্ব দিতেন। হক ছিলেন বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা একজন নেতা। গ্রাম বাংলার সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ির টান। কিভাবে বাংলার জমিদার ও মহাজন শ্রেণী কৃষকদের শোষণ করত, তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯১৫ সালে নিজ খেলা বরিশালেই তিনি মুসলমান ও নমশূদ্র কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এরপর তিনি তাঁর আন্দোন বাংলার অন্য জেলাতেও সম্প্রসারিত করেন। ১৯২৯ সালে তিনি 'নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি' গঠন করেন। তিনিই ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। ফজলুল হকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ রক্ষা করা। তাই সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি বাংলার কথা কখনও ভোলেনি। মুসলিম লীগে অবাঙালির প্রাধান্য লক্ষ্য করেই তিনি তাঁর নিজস্ব কৃষক প্রজা দলকে শক্তিশালী করতে সচেষ্টচ হন। মুসলিম লীগের কর্মসূচীও তাঁর মনঃপুত ছিল না। নিজস্ব পার্টির মাধ্যমে তিনি দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ধর্ম তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। বলা বাহুল্য জমিদার মহাজন শ্রেণী ও সরকার তাঁর এইসব নীতি মোটেই পছন্দ করেনি। অন্যদিকে কৃষক ও সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল হকের দিকেই। তবে কৃষক ও সাধারণ মানুষ তাঁর সঙ্গে থাকলেও তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন নীতি গৃহীত হলে ভারতের অনান্য অঞ্চলের মত বাংলাতেও নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হয়। স্বাভাবিক কারণেই জিন্না মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধির জন্য উৎসাহী ছিলেন। এই বিষয়ে হকের সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। হকও মুসলমানদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই বিষয়ে অনাগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর কাছে কৃষক প্রজা সমিতির স্বার্থ ছিল সবার আগে এবং লীগ যদি তা মেনে নেয়, তাহলে এই সহযোগিতা করতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। এই বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কলকাতায় যে আলোচনা হয়, তাতে কোন মতৈক্য না হওয়ায় কৃষক প্রজা সমিতির সদস্যরা সভা ত্যাগ করে চলে যান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের প্রশ্নে উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ছিল। কৃষক প্রজা সমিতি বিলোপের পক্ষে থাকলেও লীগ তার বিরুদ্ধাচরণ করে। এই অবস্থায় লীগের সঙ্গে হকের সমঝোতার কোন প্রশ্ন ছিল না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্যা কংগ্রেস নেতারাও কৃষকদের স্বার্থে কোন সংগঠন গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিল না। অন্যদিকে এই সময় বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বাঁকুড়ায় পাত্রসায়রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসলেও তার প্রভাব বিশেষ ছিল না। এক কথায় এই সময় বাংলা হকের কৃষক প্রজা পার্টিই কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ছিল। হকের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে ছিল। ১৯৩৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির একটি অংশ কৃষক প্রজা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময়ে জিন্না বাংলার বিভিন্ন স্থানে লীগের হয়ে প্রচার করেন। অন্যদিকে হকও চিরস্থায়ী ব্যবস্থার বিলোপ ও আমূল কৃষি সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। মূলতঃ এই প্রশ্নেই বরিশাল জেলার পটুয়াখালি কেন্দ্রে ফজলুল হকের সঙ্গে লীগের একজন প্রধান স্তম্ভ এবং ঢাকার নবাব বংশের প্রতিনিধি নাজিমুদ্দিনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নির্বাচনী এই যুদ্ধে নাজিমুদ্দিনের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। পটুয়াখালি ছিল নিজামুদ্দিনের জমিদারি এলাকা। তা সত্ত্বেও তাঁর এই পরাজয় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যাইহোক ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ৬০ টি, লীগ ৪০ টি, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫ টি, স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১ টি, স্বতন্ত্র তফসিলি সম্প্রদায় ২৩ টি, ইউরোপীয় ২৫ টি ও এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান ৪ টি আসন লাভ করে। স্বতন্ত্র মুসলমান

সদস্যদের অনেকে পরে লীগ অথবা কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেয়। ফলে শেষপর্যন্ত লীগের আসন সংখ্যা হয় ৬০ কৃষক প্রজা পার্টির ৫৮।

৬.৪.৭.৩ : ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-৪১)

১৪ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। ১৪ দফা কর্মসূচীর মধ্যে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, বাধ্যতামূলক বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলায় পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি প্রগতিশীল সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু হকের কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় একটি কোয়ালিশন বা মিলিজুলি সরকার ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না। তবে মুসলমানদের জন্য প্রায় অর্ধেক (২৫০ টির মধ্যে ১২১ টি) আসন সংরক্ষিত হওয়ায় তাদের দ্বারাই সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল ছিল। অন্যদিকে নিজামুদ্দিনের মত ডাকসাইটে মুসলিম লীগ নেতা এবং ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তানকে নির্বাচনী যুদ্ধে পরাজিত করায় ফজলুল হককেই যে সরকার গঠনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, তা এক প্রকার সুনিশ্চিত ছিল। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় চেয়েছিল ঐক্যের স্বার্থে গঠিত হোক হক্-লীগ সরকার। কিন্তু ফজলুল হকের চিন্তাধারা ছিন্ন ভিন্ন। অন্যদিকে বাংলার প্রগতিশীল মানুষ চেয়েছিল হক্-কংগ্রেস সরকার, কারণ তাদের দৃষ্টিতে এই নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পরাজয় ঘটেছিল প্রগতিশীলদেজর হাতে। হক চেয়েছিলেন কৃষি ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে। তাই তিনি কংগ্রেসের সঙ্গেই সরকার গঠনে আগ্রহী ছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি কীভাবে তার সঙ্গে লীগের মতবিরোধ নির্বাচনের আগে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তাঁর সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাদ সাধায় কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেসের এই হঠকারী সিদ্ধান্তে হক অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং এই দুঃখ তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি। হকের ডাকে সাড়া না দিয়ে কংগ্রেস এক মারাত্মক ভুল করেছিল বলেই মনে হয়, কারণ এর ফলে উল্লসিত লীগ বাংলায় সরকার গঠনের এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। লীগের নেতারা আর দেরি না করে হকের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনে তাদের সম্মতি ও সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। নিরুপায় হকের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হক-লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। বাংলার ইতিহাসে এই ঘটনার তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এর ফল শুভ হয়েছিল কি না, তা হয়ত তর্কের বিষয়। তবে বাংলার ইতিহাসে তা এক সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

কংগ্রেসের আপত্তির পরিণতিতে শেষপর্যন্ত যে লীগ-প্রজা কৃষক পার্টির যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়, তাতে ১১ জন মন্ত্রি ছিলেন। এঁরা হলেন ফজলুল হক (মুখ্যমন্ত্রি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়), খাজা নাজিমুদ্দিন (স্বরাষ্ট্র), খাজা হাবিবুল্লাহ (কৃষি ও শিল্প), সোহরাওয়ার্দি (বাণিজ্য ও শ্রম), সৈয়দ নওসের আলি (জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার), মোশারফ হোসেন (বিচার ও আইন), নলিনীরঞ্জন সরকার (অর্থ), বি. পি. সিংহরায় (রাজস্ব), প্রসন্নদেব রাইকত (শুল্ক ও বন), মুকুন্দবিহারী মল্লিক (সমবায়, ঋণ ও পল্লী দারিদ্র্য) এবং মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী (যোগাযোগ ও পূর্ত)। পাঁচজন হিন্দু মন্ত্রির মধ্যে তিনজন ছিলেন বর্ণ হিন্দু ও দুইজন তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। মন্দ্রিদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন জমিদার, একজন পুঁজিপতি ও চারজন আইনজীবী। লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি ছিল

দুই বিপরীত মেরুর পথিক এবং তাদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছিল বিস্তর। মন্ত্রিসভায় জমিদার শ্রেণীর প্রাধান্য থাকায় ফজলুল হকের প্রগতিশীল অনেক সংস্কারই মূলতুবী হ'য়ে যায়। অবশ্য স্বাধীনভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও হকের পক্ষে প্রস্তাবিত প্রগতিশীল সংস্কারগুলি কতখানি কার্যকর করা সম্ভব ছিল না, তা বলা দুস্কর; তিনি আদৌ বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কেবলমাত্র একজন সংস্কারবাদী নেতা।

মন্ত্রিসভা গঠনকে কেন্দ্র করে কৃষক প্রজা পার্টির অনেক সদস্যই ক্ষুব্ধ ছিলেন। মন্ত্রিসভায় লীগের সদস্য ছিল তিনজন (নাজিমুদ্দিন, হাবিবুল্লাহ ও সোহরাওয়ার্দি); কিন্তু কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য ছিল দুইজন (হক ও নওশের আলি)। মন্ত্রিপদ না পাওয়ায় কৃষক প্রজা পার্টির সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমদ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফজলুল হক জমিদারদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন বলেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বা সাধারণ মানুষের জন্য ''ডাল ভাতের'' কথা বলা হলেও বাস্তবে কিছুই করা হয়নি। এই অবস্থায় শামসুদ্দিনের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টির কয়েকজন সদস্য সরকারের সমালোচনা করলে হক সতের জন (১৭) সদস্যকে বহিষ্কৃত করেন। এইভাবে কৃষক প্রজা পার্টির ঐক্যে ফাটল ধরে এবং তা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন স্বয়ং হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

হক মন্ত্রিসভা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল বললে অন্যায় হবে। ১৯৩৮ সালে তিনি ফ্লাউড কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দানের বিনিময়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সুপারিশ করে। স্বাধীনতার আগে অবশ্য তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন (১৯৩৮), কৃষিখাতক আইন (১৯৩৮), মহাজনী আইন (১৯৪০) এবং বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগ বিধি বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক বন্টন বিধি তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রথম আইন বলে জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে যে সব অবৈধ অর্থ বা আবওয়াব আদায় করতেন, তা নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইনে কৃষকদের স্বার্থের দিকে নজর দেয়া হয়েছিল। মহাজনী আইনে সুদের হার বেঁধে দেয়া হয়। দুটি আইনেই জমিদার ও মহাজনদের অবৈধ অর্থ আদায় নিষিদ্ধ হয়। আর একটি আইনে সরকারি পদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। মজার কথা মন্ত্রিসভার সাফল্যগুলিকে মূলধন করে লীগ নিজ ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করতে সচেষ্ট হয়। আসলে মুসলমানরা যে একটি মন্ত্রিসভা গড়তে সক্ষম হয়েছে এবং নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য কিছু করতে পেরছে, এটাই ছিল অনগ্রসর মুসলিম সমাজের কাছে একটি বড় কৃতিত্ব। কিন্তু বিক্ষুব্ধ কৃষক প্রজা পার্টি নেতা শামসুদ্দিন কংগ্রেসের সঙ্গে রাত মিলিয়ে এই মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করলে মুসলিম সম্প্রদায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এর ফলে হক কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যান। তাঁর দু নৌকায় পা দিয়ে চলা নীতি, অর্থাৎ একইসঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সভাপতি পদ আঁকড়ে থাকা অনেকেই পছন্দ করেনি। তিনি দক্ষ সংগঠক ছিলেন না। ফলে তাঁর দল অনেকটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন দক্ষ সংগঠক এবং এই সুযোগে তিনি নিজ দলের শক্তিবৃদ্ধি করতে তৎপর হন। ফলে কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য ও কর্মীরা দলে দলে লীগে যোগদান করতে থাকে। এদিকে হক সর্বভারতীয় স্তরে লীগের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বং ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লীগের হয়ে প্রচার করতে থাকেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের তিনিই ছিলেন উত্থাপক। এইভাবে তিনিও লীগের হাত শক্ত করেন। ফলে জিন্নাও প্রাদেশিক ব্যাপারে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন।

লীগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির আঁতাত আসলে ছিল এক পারস্পরিক সুবিধাবাদের পরিণতি। হক লীগের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালেও তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল বাংলা। অবাঙালি প্রভাবিত কেন্দ্রীয় লীগের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হবার কথা নয়; হয়ওনি। ফলে জিন্নার সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ও বিরোধ দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানরা সরকারের সঙ্গে কোন অবস্থান গ্রহণ করবে, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব লীগের কয়েকটি দাবির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সুবিবেচনার শর্তে সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ফজলুল হক মনে করতেন শর্তহীন সমর্থনই ছিল মুসলিম স্বার্থের সহায়ক। এদিকে ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে হিন্দুরা নানাভাবে কারচুপি করে বিভিন্ন জেলায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশি করে দেখাতে চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করা হলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চুপচাপ থাকে। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে খুলনা ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এই উত্তেজক পরিস্থিতিতে জিন্না বাংলায় পাকিস্তান দিবস কর্মসূচী পালনের নির্দেশ দিলে হক তার বিরোধিতা করেন। হক হিন্দুদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। এই উদ্দেশ্য তিনি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। বলা বাহুল্য হকের এইসব কার্যকলাপ জিন্নার মনঃপুত ছিল না। হক-জিন্না বিরোধ চরমে ওঠে জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল গঠনের প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে। এই কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণকে যুক্ত করা এবং এতে জিন্নার অনুমতি ছাড়াই হকের নাম অন্তর্ভুক্ত করায় তিনি তাঁকে (হককে) পদত্যাগ করতে বলেন। প্রথমে হক এই নির্দেশ অমান্য করলেও শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল থেকেও পদত্যাগ করতে মনস্থ করেন। হকের এই নীতি ও সিদ্ধান্ত কলকাতার মুসলিম সম্প্রদায় পছন্দ করেনি। গোটা শহরে হক বিরোধী বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। হক-সোহরাওয়ার্দি বিরোধ প্রকাশ্যে উন্মোচিত হয়। সোহরাওয়ার্দি জিন্নার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন কনে এবং হকের বিরুদ্ধে কার্যতঃ জেহাদ ঘোষণা করেন। বঙ্গীয় আইনসভায় হকের বিরুদ্ধে ছটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। জিন্নার বিরুদ্ধে হক শেষপর্যন্ত কার্যতঃ কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ইংরেজ সরকার জিন্নাকে সুনজরে না দেখলেও মুসলিম লীগের ভাঙ্গন চায়নি, কারণ সরকার আশঙ্কা করে যে, এর ফলে হক হয়ত কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবেন। কাজেই গভর্নর স্যার হাবার্ট এই বিরোধে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসেন। ফলে লীগ হকের উপর আস্থা ব্যক্ত করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু এতে বিরোধ মেটেনি। আসলে জোড়াতালি দিয়ে এই বিরোধ মেটান সম্ভব ছিল না। হক একটি বিকল্প সরকার গঠনে উদ্যোগী হন। এদিকে ১লা ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে হক মন্ত্রীসভায় লীগের সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। তখন হক ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে একটি নতুন সরকার গঠন করার নীতি গ্রহণ করেন। পাল্টা আক্রমণ করে জিন্না তাঁকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। এইভাবে হকের প্রথম মন্ত্রীসভার (১৯৩৭-৪১) অবসান হয় (১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১)।

৬.৪.৭.৪ : শ্যামা-হক-মন্ত্রিসভা (১৯৪১-৪৩)

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে হক প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত। এই মন্ত্রিসভা গঠনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন জে.সি.গুপ্ত, শরৎচন্দ্র বসু, ফজলুল হক, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শামসুদ্দিন আহমেদ, হাসেম আলি খান, হেমচন্দ্র নস্কর ইত্যাদি নেতা। পাঁচমিশালী দল নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তবে কংগ্রেস এই মন্ত্রিসভায় যোগদান করেনি। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ছাড়া এই

মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ (লীগ পদত্যাগকারী); খান বাহাদুর আব্দুল করিম (স্বতন্ত্র), খান বাহাদুর হাসেম আলি খান (হকের কৃষক প্রজা পার্টি), শামসুদ্দিন আহমেদ (কৃষক প্রজা পার্টির এক অংশের নেতা), শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (হিন্দু মহাসভা), সন্তোষ কুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক), প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ফরওয়ার্ড ব্লক) এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মন (তফসিলি হিন্দু)। পাঁচমিশালী দল নিয়ে গঠিত এই মন্ত্রীসভা কতদিন স্থায়ী হবে, তা নিয়ে গোড়া থেকেই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এই মন্ত্রীসভার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু মহাসভার মত একটি সাম্প্রদায়িক দলের অন্তর্ভুক্তি। হকের পক্ষে এটি ছিল একটি অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ এবং এর ফলে মুসলিম সমাজে তাঁর ভাবমূর্তি বিপন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। হকের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে বাংলার রাজনীতিতে একটি নতুন ধারার সূচনা করা। সারা ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লাভ করেছিলেন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর (অর্থ) এবং তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্যই এই মন্ত্রীসভা শ্যামা-হক্ মন্ত্রীসভা নামে পরিচিত হয়।

১৯২৯ সালে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস আইন সভা বর্জন নীতি গ্রহণ করায় তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি নিজে আইনসভা বর্জন নীতির বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারায় তিনি ১৯৩৯ সালে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। ১৯৩৭-৪১ সালে গঠিত লীগ-হক মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন অন্যতম বিরোধী নেতা। লীগ-হক মন্ত্রিসভায় লীগের শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কংগ্রেস হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। তখন শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুমহাসভায় যোগদান করেন এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে হিন্দুদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। আইন সভাতেও তিনি হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার্থে সচেষ্ট হন। লীগ-হক্ মন্ত্রিসভার আমলে তিনি চাকরিক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রভৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তিনি একজন কট্টর হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবে পরিচিত। কাজেই এমন একজন মানুষকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে হক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। অনেক মুসলমানই এটা মেনে নিতে পারেননি। মনে রাখা ভাল লীগ-হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকার সময় লীগ এই সুযোগে তার শক্তি অনেক বৃদ্ধি করেছিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান পরিকল্পনা তাদের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। সর্বভারতীয় স্তরে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম সম্প্রদায় আরও বেশি সংঘবদ্ধ হয়েছিল। বাংলায় হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল।

এই রকম এক জটিল পরিস্থিতিতে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পথ অবশ্যই মসৃণ ছিল না। হকের একমাত্র মূলধন ছিল তাঁর নিজস্ব জনপ্রিয়তা। কিন্তু তাঁর অনুসৃত নীতি ও পথ মুসলিম সম্প্রদায় কত দূর সমর্থন করবে, গোড়া থেকেই তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। তাঁর নিজস্ব দল প্রজা কৃষক পার্টি অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছিল। দলছুট নেতা শামসুদ্দিন আহমদের অধীন প্রজা কৃষক পার্টির ভগ্নাংশের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সংগঠন গড়ে তোলার কোন ক্ষমতা বা যোগ্যতাও হকের ছিল না। অন্যদিকে ক্ষমতাচ্যুত লীগ হৃত জমি পুনরুদ্ধারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ধ্বংস নামিয়ে লীগ নেতারা চেয়েছিলেন মুসলিম জনগণের কাছে নিজেদের আরও বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। আইন সভা নয়, গণ সংযোগকেই তারা করতে চেয়েছিল নিজেদের শক্তির ভিত্তি ও উৎস। তাদের লক্ষ্য ছিল হককে একঘরে করা। সোহরাওয়ার্দি, নাজিমুদ্দিন ও তমিজুদ্দিন মত দক্ষ

নেতা ও সংগঠক সারা প্রদেশ চষে বেড়িয়ে অসংখ্য জনসভায় হকের মুন্ডুপাত করতে থাকেন; হককে বিশ্বাসঘাতক মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন বলেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। মন্ত্রিসভায় হিন্দুমহাসভার মাত্র একজন প্রতিনিধি থাকলেও এই মন্ত্রীসভাকে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা নামে চিহ্নিত করা হয়। মুসলিম লীগের মুখপাত্র স্টার অফ ইন্ডিয়া তো বটেই, লীগ সমর্থক দৈনিক আজাদ, মর্নিং স্টার প্রভৃতি পত্রিকাও হকের বিরুদ্ধে প্রচারে অবতীর্ণ হয়। স্বয়ং জিন্না হক বিরোধী প্রচারে অবতীর্ণ হন এবং পূর্ববঙ্গ সফর করেন। তিনি বাঙালি মুসলমানদের বোঝাতে সচেষ্ট হন যে তারা ভারতের মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না এবং লাহোর প্রস্তাবে বাংলার মুসলমানদেরই উপকৃত হবে। এইভাবে গণ সংযোগের মাধ্যমে লীগ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে অনেকাংশে সফল হয় এবং ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে নাটোরেরযে উপনির্বাচন হয় তাতে হকের মনোনীত প্রার্থী লীগের প্রার্থীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। লীগের প্রার্থী চেয়েছিলেন ১০,৪৮৩ টি ভোট। হকের মনোনীত প্রার্থী পান মাত্র ৮৪০ টি ভোট। তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

পায়ের তলায় মাটি পেতে হক উঠে পড়ে লাগেন। তিনি ''প্রগতিশীল মুসলিম লীগ'' নামে লীগের একটি পাল্টা সংগঠন গড়ে তুলতে সক্রিয় হন। ইসলামের স্বার্থ এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারও রক্ষিত হবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তিনিও পূর্ব বাংার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর এইসব প্রচেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। লীগের পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলার কাজ বেশি দূর এগোয়নি। আসলে বাংলার মুসলমানরা তখন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ফজলুল হকের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নীতি অবশ্যই কংগ্রেস, কৃষক প্রজা পার্টি ও হিন্দু মহাসভার মনঃপুত ছিল। হকের আদর্শ ছিল যেভাবে হোক বাংলার স্বার্থ রক্ষা করা এবং তার জন্যই তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি এমনকি স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল স্বাধীন সেই রাষ্ট্রের দুটি স্বায়ত্বশাসিত বিভাগ থাকবে। একটি হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ ও অপরটি মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ। কিন্তু শুধু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাই নয়, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও তাঁর বিপক্ষে ছিল। ১৯৪২ সালের ১০ই মে হিন্দুমহাসভা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ''পাকিস্তান বিরোধী দিবস'' পালন করেন। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় এতে গভীরভাবে আহত হয় এবং হিন্দুমহাসভার সঙ্গে সংস্রব রাখার জন্য তারা ফজলুল হককে দায়ী করে। সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ পদ সংরক্ষিত হ'লেও সেই অনুযায়ী মুসলমানদের নিয়োগ করা হয়নি বলেও হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। প্রতিকূল এই পরিস্থিতিতে এক জিন্নার সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই তিনি বাংলার স্বার্থ বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না।

বাংলার গভর্নর জন হার্বাট শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার সঙ্গে সহযোগিতা করা দূরের কথা, তার বিরোধিতা করায় হকের কাজ আরও কঠিন হ'য়ে পড়ে। এমনকি সরকারের অনেক গোপন তথ্য ও নথিও সোহরাওয়ার্দির হাতে পাচার হ'য়ে যেত। শ্যামাপ্রসাদ অভিযোগ করেন যে ক্লাইভ স্ট্রিটের প্রতি অনুগত আমলাতন্ত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। শ্যামাপ্রসাদ দাবি করেছিলেন জাপানিদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য বাঙালিদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। ব্রিটিশ সরকার এই পরামর্শ বাতিল করে দেয়। ''ভারত ছাড়ো'' আন্দোলন শুরু হবার পর তা কিভাবে মোকাবিলা করা হবে সে বিষয়ে হার্বাট হককে কিছু নির্দেশ দেন। হক তা নিয়ে মন্ত্রিসভায় আলোচনা করতে চাইলে গভর্নর অনুমতি দেননি। বরং গভর্নরের নির্দেশ না মানলে হকের পদত্যাগ করা উচিত

বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গেও গভর্নরের গুরুতর মতবিরোধ ছিল। গভর্নরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় শেষপর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪২ সালের ২০শে নভেম্বর তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এদিকে এক মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করলেও গভর্নর তা নাকচ করে দেন। আসলে গভর্নর চাইছিলেন মুসলিম লীগকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে। গভর্নরের এই অসহযোগিতার কথা হক ভাইসরয়কে লিখিতভাবে জানান। ভাইরসরয় লিনলিথগো তার সত্যতা পুরোপুরি অস্বীকার করতেও পারেননি। কিন্তু তাতে হক রক্ষা পাননি। শেষপর্যন্ত হকের সঙ্গে গভর্নরের বিরোধ এমন এক পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, মন্ত্রিসভায় ইউরোপীয় গোষ্ঠী সরকারকে সমর্থন না করে মুসলিম লীগের সহায়তায় শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৪৩ সালের ২৮শে মার্চ হার্বাট হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। স্বয়ং ভাইসরয় হার্বাটের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, যেভাবে হককে কার্যতঃ বরখাস্ত করা হয়েছিল, তা তিনি সমর্থন করেন না এবং এই ঘটনায় তিনি আদৌ সন্তুষ্ট নন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও যেভাবে অগণতান্ত্রিক পথে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো হ'য়েছিল, তা নিন্দা করার ভাষা নেই। এ কথা সত্য যে হক দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন এবং মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর উপর ঘোরতর অসন্তুষ্ট ছিল। মুসলিম লীগ গোড়া থেকে তার বিরুদ্ধতা করে যাচ্ছিল। চারদিকেই এই বিরোধিতার ফলে হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ভালভাবে কাজ করতে পারেনি এবং কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের নিদর্শন রাখতে পারেনি। তবু শেষপর্যন্ত এই সরকারের পতনের জন্য দায়ী ছিল গভর্নর হার্বাটের অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধ মনোভাব।

শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন বাংলার ইতিহাসে একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা শেষপর্যন্ত ভেঙ্গে যায় এবং বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। এরপর থেকেই মুসলিম লীগের শক্তি দ্রুততর গতিতে বাড়তে থাকে এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। হকের এই ব্যর্থতার জন্য তিনি নিজেও অনেকটা দায়ি ছিলেন। তাঁর কৃষক প্রজা পার্টির ভিত্তি ছিল খুব দুর্বল এবং জনগণের মধ্যে তার প্রভাব ছিল ক্ষীণ। তার উপর এই দল দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে যাওয়ায় তা আরও দুর্বল হ'য়ে পড়ে। অন্তর্দ্বন্দ্ব এর জীবনীশক্তি শুষে নেয়। কৃষক-প্রজা পার্টির এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মুসলিম লীগ। এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন স্বয়ং হক। দলকে শক্তিশালী করার জন্য যে সাংগঠনিক শক্তি ও দক্ষতার প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। অধিকাংশ সময় তিনি কলকাতায় কাটাতেন বলে দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতেন না। তাঁর প্রধান মূলধন ছিল তাঁর নিজস্ব জনপ্রিয়তা। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তায় যখন ঘাটতি পড়ল, তখন তাঁর পক্ষে দীর্ঘ দিন টিকে থাকা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

৬.৪.৭.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ইসলাম সিরাজুল (সম্পাদিত) বাংলা দেশের ইতিহাস—১ম খণ্ড

২। Chatterjee, Joya–*Bengal Divided*

৩। Banerjee S. – *Caste, Politics and The Raj Bengal.*

৪। Banerjee S. – *Caste, Protest and Identity in Colonial India : The Namasudras of Bengal (1872-1937)*

৫। Banerjee S.–(*ed.*) *Bengal : Rethinking History*

৬। Jalal Ayesha – *The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the DSemand for Pakistan.*

৭। Sen Shila – *Muslim Politics in Bengal (1937-47).*

৬.৪.৭.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

২। বাংলায় কিভাবে মুসলিম লীগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল? হক্-জিন্নার বিরোধের কারণ কি ছিল?

৩। বাংলার রাজনীতিতে ফজলুল হকের অভ্যুত্থান বর্ণনা কর। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর আলোকপাত কর।

৪। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের কি ফল হ'য়েছিল? হক মন্ত্রিসভার কার্যাবলী বিশ্লেষণ কর।

৫। শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা কিভাবে গঠিত হ'য়েছিল? এই মন্ত্রিসভার পতনের কারণ কি ছিল?

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৪

Communal and Caste Politics

একক-৮

Caste Politics and Scheduled Caste Organization

জাতিভিত্তিক রাজনীতি এবং তফসিলি সংগঠন

বিন্যাস ক্রম

৬.৪.৮.০ : উদ্দেশ্য

৬.৪.৮.১ : জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও তফসিলি সংগঠন

৬.৪.৮.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৪.৮.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৪.৮.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তহীনতা এবং এর কারণ—

(২) কিভাবে তারা এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়েছিল

(৩) বাংলায় জাতিভিত্তিক রাজনীতি এবং তফসিলি সংগঠন

(৪) বাংলায় নিম্নবর্গের মানুষ কিভাবে তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হয়েছিল

(৫) এই ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের প্রতিক্রিয়া

৬.৪.৮.১ : জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও তফসিলি সংগঠন

বিগত শতকের প্রথম দিকে বাংলার রাজনীতিতে জমিদার শ্রেণী ও তাদের সমিতিগুলির প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ। বস্তুতঃ কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জমিদার শ্রেণী ছিল তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দু-বছর টাকার যোগান দিয়েছিলেন নাটোর, ময়মনসিংহ, গৌরীপুর, নাড়াজোল, টাকি ও উত্তরপাড়ার জমিদার। কিন্তু ১৯২০র দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে পুরানো জমিদার শ্রেণীর গুরুত্ব ও প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে এবং কংগ্রেসের নেতৃত্ব চলে যায় 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর হাতে, যদিও উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই তাদের

প্রাধান্য ছিল ক্রমবর্ধমান। ভদ্রলোক বলতে বোঝায় মূলতঃ সেইসব মানুষকে, যারা শিক্ষাদীক্ষা বুদ্ধিসত্তায় অগ্রসর বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, আর্থিক দিক থেকে ভূমি-রাজস্ব, বিভিন্ন পেশা ও চাকুরীর উপর নির্ভরশীল এবং সমাজে যথেষ্ট মান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। উচ্চবর্ম ও শ্রেণীভুক্ত এইসব মানুষ আদর্শবাদী, নিজ শ্রেণী সম্পর্কে গর্বিত, সাধারণভাবে কায়িক শ্রমে অনিচ্ছুক, নিজ শ্রেণী সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন; অত্যন্ত সচেতন এবং নিজেদের উনিশ শতকের নবজাগরণের উত্তরাধিকার বলে মনে করত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দূরত্বের জন্যই তারা সাধারণ নিচু জাতের মানুষ বলে মনে করত না। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন এদেশে অশিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতদের কোন সমবেদনা নেই।

১৯৩০ এর দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৪০ এর দশকে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তারা সর্বভারতীয় রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে থাকে (যদিও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম) এবং ক্রমশঃ প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে অধিকতর আগ্রহী হ'য়ে পড়। এর একটি কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ত্বশাসন অধিকারের স্বীকৃতি ও নির্বাচনী রাজনীতি। আর একটি কারণ বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের দ্রুত অবনতি। পাকিস্তান (লাহোর) প্রস্তাব ও মুসলিম লীগের ক্রমিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার বাঙালি হিন্দুদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলায় যে কটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, আর কোনটিতেই কংগ্রেস যোগদান করেনি। ফলে অন্যান্য দল বা গোষ্ঠী থেকে হিন্দু মন্ত্রিদের নিযুক্ত করা হত। অর্থাৎ হিন্দুদের স্বার্থ তুলে ধরার মত কোন বন দল বা নেতার (ব্যতিক্রম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) অভাব ছিল। এই অবস্থায় হিন্দুরা এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। তারা উপলব্ধি করে যে, প্রাদেশিক রাজনীতিতে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিহত করতে হলে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ''বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা'' নিবন্ধে স্পষ্ট-ভাষায় লেখেন—''হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন...।'' হিন্দুর ঐক্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল জাতিভেদ প্রথা। হিন্দু সমাজে উঁচু জাতির (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি) মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন নিচু জাতির মানুষের সম্পর্ক ছিল ঘৃণা ও বিদ্বেষের; এমনকি অনেক সময় নিচু জাতির মানুষের স্পর্শেও উঁচু জাতির মানুষের জাত যেত। মনুষ্যত্বের এই চরম অবমাননা ও অমর্যাদা হিন্দুদের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল।

বাংলায় জাতিভেদ প্রথা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক ছিল। বাংলায় উচ্চবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণরা পড়লেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা পড়ত না, কারণ বাংলায় তাদের অস্তিত্ব ছিল না। বাংলায় ব্রাহ্মণের পরেই ছিল কায়স্থদের স্থান। কায়স্থদের পেশা ছিল মূলতঃ সরকারি কর্ম। তাদের কাজ ছিল কলম পেশা। এক কথায় তারা করণিকের কাজ করত। এরপর ছিল বৈদ্যদের স্থান। এদের পেশা ছিল চিকিৎসা। মর্যাদার বিচারে ব্রাহ্মণরা সবার আগে থাকলেও সংখ্যার বিচারে কায়স্থরা এগিয়ে ছিল। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কায়স্থেরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৭.২২ শতাংশ এবং ব্রাহ্মণেরা ৬.৭১ শতাংশ। অন্যদিকে বৈদ্যরা ছিল মাত্র ০.৫১ শতাংশ। মর্যাদার দিক থেকে তারা অবশ্য ছিল ব্রাহ্মণদের পরেই। উঁচু জাতির প্রত্যেকেই প্রায় সমানভাবে সরকারি চাকরি, বিভিন্ন পেশা ও জমিজমার মালিক ছিল। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি ছিল।

মোট ব্রাহ্মণের ২৪.১৮, বৈদ্যের ৫২.১৬ এবং কায়স্থের ৫৯.৪১ শতাংশ পূর্ববঙ্গে বাস করে। উচ্চবর্ণের মধ্যে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কম ছিল।

নিম্নবর্গের মধ্যে মাহিষ্য, রাজবংশী ও নমশূদ্ররা ছিল প্রধান। ১৯৩১ সালে বাংলায় এদের অনুপাত ছিল মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ১১.০৩, ৮.৩৮ এবং ৯.৭১ শতাংশ। এদের মধ্যে মাহিষ্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের প্রায় ৯০ শতাংশ বাস করত পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায়। অন্যদিকে নমশূদ্রদের শতকরা ৬৬.১১ বাস করত পূর্ববঙ্গে—ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ এবং ত্রিপুরায়। নমশূদ্ররা মূলতঃ কৃষিজীবী হলেও নৌকাচালনাতেও দক্ষ ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এদের চিরকাল ঘৃণা করেছে এবং অস্পৃশ্য বলে গ্রামের বাইরে এরা ভিন্ন পল্লীতে বসবাস করত। ইংরেজ আমলে এদের মধ্যে কিছুটা শিক্ষার বিস্তার হয়। হিন্দু সমাজের প্রতি বিরূপ ছিল বলে এরা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত ছিল। রাজবংশীরা ছিল উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৮৪.২৬ শতাংশ রাজধানী এখানে বসবাস করত। বাংলায় ৫০ টিরও বেশি তফসিলভুক্ত জাতি ছিল। মাহিষ্য, নমশূদ্র ও রাজবংশী ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিল বাগদী, বাউরি, চামার বা মুচি, ধোপা, ডোম, হাড়ি, কেওড়া, কৈবর্ত, মাল, শুঁড়ি, লোহার, কামার, কুমোর, গোয়ালা, সদগোপ, তাম্বুলি ইত্যাদি। লক্ষ্য করার বিষয় এই সব বিভিন্ন বর্ণের মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল। বংশ পরম্পরায় তারা তাদের নির্ধারিত কাজ করে যেত। এইভাবে বর্ণপ্রথার মাধ্যমে শ্রম বিভাজন সম্ভব হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণে বর্ণপ্রথা বাঙালি সমাজে এ ধরনের শ্রেণীভেদ করে দিয়েছিল। কিন্তু এই শ্রেণীভেদ দ্বন্দ্ব বা বিভেদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি; বরং এর ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা। তবে যে যার নিজস্ব পেশার মধ্যে আবদ্ধ থাকত বলে এই ব্যবস্থার কঠোরতাও আমাদের চোখে পড়ে। এর ফলে সামাজিক গতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হত। কিন্তু একটা ভারসাম্য রক্ষিত হত। বর্ণপ্রথার এই কঠোরতার উপর অবশ্য অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ অযৌক্তিক। বাঙালি হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেনি। আগেই বলেছি বাংলায় জাতিভেদ প্রথা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশি নমনীয় ছিল। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলায় বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোন সংঘাত বা গোঁড়ামি ছিল না। অর্থনৈতিক স্তরে একটা আরোপিত সহযোগিতা থাকলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে আঘাত ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণরা নিচু জাতের মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখত, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া ও মেলামেশা করত না। নিচু জাতের স্পর্শ বা তাদের হাতে জল খেলেও জাত যেত। হিন্দু সমাজকে তাই গোঁড়ামি মুক্ত সমাজ বলা চলে না। তবে উঁচু জাতের মানুষ নিচু জাতের সব মানুষকে সমান চোখে দেখত না। যেমন এক ধরনের মিশ্র বা বিশুদ্ধ শূদ্র শ্রেণী ছিল, যাদের বলা হত ''নবশাক''। এদের মধ্যে পড়ত সদ্‌গোপ, তেলি, তাম্বুলি বা তামলি। এরা 'জলচল' রূপেও পরিচিত ছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা তাদের ছোঁয়া জল পান করতে পারত এবং তাদের বাড়িতে পুরোহিতের কাজ করতে পারত।

সাধারণভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ নিজস্ব পেশার প্রতি অনুগত থাকলেও উচ্চ ও মধ্য বর্ণের মানুষ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে পুরাতন পেশা পরিত্যাগ করে অন্যান্য পেশা গ্রহণ করতে থাকে। আদমশুমারি থেকে এই পেশা পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহ্যগত এবং উচ্চতর উভয় পেশার ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে। ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্যগত পেশা ছিল পৌরোহিত্য ও শিক্ষকতা। ১৯৩১ সালে এই সব

পেশায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬.৫৭ শতাংশ। তারা অনেকে চামড়ার কারখানা, মদেক দোকান ও অন্যান্য ব্যবসায়ে অংশ নিতে থাকে। অর্থনৈতিক কারণেই তারা তাদের ঐতিহ্যগত পেশা পরিত্যাগ করে নতুন এইসব পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বৈদ্য ও কায়স্থদের অবস্থা অবশ্য এতটা খারাপ ছিল না। অন্যদিকে গোয়ালা, ধোপা, কামার, কুমোর প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষ আনুপাতিক হারে বেশি সংখ্যায় তাদের ঐতিহ্যগত পেশা আঁকড়ে থাকলেও তারাও অনেকে নতুন নতুন পেশা গ্রহণ করতে থাকে। কামার ও কুমোরদের মধ্যে অনেকেই পেশা হিসেবে শিল্পকে বেছে নেয়। লক্ষ্য করার বিষয় এদের মধ্যে উচ্চতর পেশা গ্রহণ করার প্রবণতা দিন দিন বাড়তে থাকে। আসলে ঔপনিবেশিক শাসনে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে বাঙালি হিন্দু সমাজে গতি সঞ্চার হয়েছিল এবং অনেকেই নিজ নিজ ঐতিহ্যগত পেশা পরিত্যাগ করে নতুন পেশার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।

নিচু জাতের মানুষ তাদের অবস্থার উন্নয়ন ও তার স্বীকৃতির জন্য যে আন্দোলন করত, তা অবশ্যই উঁচু জাতের মানুষের মনঃপুত হত না এবং তাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অস্বাভাবিক ছিল না। ১৮৭০ এর দশকে যখন একজন চন্ডাল গ্রামপ্রধানের বাড়িতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তখন বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের চন্ডালরা তাদের জাতিগত অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে নমশূদ্র উপাধি গ্রহণ করার জন্য লড়াই শুরু করেছিল। একইভাবে বিগত শতকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গের সম্পন্ন চাষী কৈবর্তরা মাহিষ্য হিসাবে তাদের স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করেছিল। প্রায় একইসময়ে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় ব্রাত্য কায়স্থের মর্যাদা দাবি করেছিল। জনসংখ্যা গণনা বা আদমশুমারির সময় অনেক নিচু জাতের মানুষ উচ্চতর মর্যাদা বা অবস্থান দাবি করে নিজেদের জাতে তোলার চেষ্টা করত। বলা বাহুল্য উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তা পছন্দ করত না এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করত। কখনও কখনও তা এমনকি সংঘাতের রূপ নিত। পূর্ববঙ্গের কায়স্থরা নমশূদ্রদের কায়স্থের স্তরে উন্নীত হবার প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছিল। নমশূদ্ররা তখন কায়স্থদের বয়কট করেছিল। গোয়ালারা বৈশ্যর মর্যাদা দাবি করায় সম্পন্ন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এমনকি তাদের কাছ থেকে দুধ না কিনে মুসলমানের বাড়ি থেকে তা কিনত।

১৯২০র দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনে উচ্চবর্ণের হিন্দুর সুর ক্রমশঃ নরম হতে থাকে। মুসলমান ও খৃষ্টানদের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য শুরু হয় হিন্দুসভা আন্দোলন। ১৯২৪ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও শুদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়। ১৯২৫ সালে কাশীশ্বর চক্রবর্তী নামে মালদার একজন কংগ্রেস নেতা ''সত্যম্ শিবম্'' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। তিনি সাঁওতালদের শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। নমশূদ্ররা যাতে মুন্সিগঞ্জের কালী মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করে, তার জন্য ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা সত্যাগ্রহ করেছিল। সত্যম্ শিবম্ রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রণী হয়। অতঃপর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণ্য চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ এই উপলব্ধি ও ধারণা স্পষ্ট হচ্ছিল যে, কেবলমাত্র ভদ্রলোক সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হলেই হবে না (ভদ্রলোকদের মধ্যেও অভিজাত ও গৃহস্থ এবং অন্যান্য নানা ভাগ ছিল), প্রয়োজন ছিল সার্বিক হিন্দু ঐক্য। ১৯৩০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস তফসিলি শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত ৩০ টি আসনের মধ্যে মাত্র ৭ টি আসনে জয়লাভ করে; অন্যদিকে উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষিত ৪৮ টি আসনের মধ্যে ৩৯ টি আসন দখল করেছিল। নির্বাচনের ফল প্রমাণ করেছিল

যে কংগ্রেস মূলতঃ একটি বর্ণহিন্দুর দল এবং এর সামাজিক ভিত্তি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই অবস্থায় ১৯৩০ এর দশকের মধ্য ভাগ থেকে হিন্দুসভা হিন্দু ঐক্যের প্রয়োজনে আদিবাসীদের হিন্দু নাম গ্রহণ করতে আহ্বান জানায় এবং পরবর্তী আদমশুমারির সময় নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে অনুরোধ করে। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে সাভারকর মুঙ্গেরের এক জনসভায় পাঁচ জন সাঁওতাল বালককে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করেন। ঐ বছরের শেষ দিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরার চাঁদপুরে সাহা সম্প্রদায়ের একটি গৌর নিতাই মন্দিরের দ্বার প্রত্যেক জাতের কাছে উন্মুক্ত করেন। মালদায় সাঁওতাল, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে কোন মুসলমান জোতদারের অধীনে কাজ না করে, তার জন্য হিন্দুসভা প্রচার চালায়। হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়। ১৯৩৯ সালে স্থাপিত হয় বঙ্গীয় হিন্দু সংহতি। ঐ বছর মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের কলকাতাস্থিত সদস্যরা হিন্দু জমিদারদের কাছে এই মর্মে আবেদন করে যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ এলাকার আদিবাসীদের হিন্দু হিসাবে স্বীকৃতির জন্য সচেষ্ট হন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মানুষ যাতে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখে, তার ব্যবস্থা করা হয়। এই অবস্থায় নিম্নবর্গের মানুষ যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয় এবং তারা এই আবেদনে সাড়া দেয়। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুরে এক মাহিষ্য সমাবেশে প্রত্যেক গ্রামে মন্দির নির্মীণ করার জন্য, সর্বজনীন পুজোর আয়োজন করার জন্য, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদির কর্মসূচী গৃহীত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাহিষ্যদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা আমরা জানি। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ হিন্দুর এই সংহতি ও ঐক্য মুসলমানদের বিরক্তির কারণ ছিল। ১৯৪১ সালের আদমশুমারির সময় তফসিলি সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজেদের কেবলমাত্র হিন্দু হিসাবে পরিচয় দিতে আগ্রহী হয়। এর ফলে এমনকি কোন কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ও সংঘর্ষ ঘটে। রাজশাহী, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সাঁওতালদের হিন্দু হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয় এবং শ্যামাপ্রসাদ স্বয়ং বাঁকুড়ায় এই বিষয়ে উদ্যোগ নেন। প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা সাঁওতালদের আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করার ওপর জোর দেয়। অভিযোগ ওঠে যে মুসলিম লীগের সদস্যরা এর জন্য সাঁওতালদের অর্থের দ্বারা বশীভূত করেছিল।

দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে নিম্নবর্গের মানুষ উচ্চতর বর্ণে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছিল। অন্যদিকে সার্বিক ঐক্যের স্বার্থে উচ্চবর্ণের হিন্দু এই প্রক্রিয়া মেনে নিলেও এর ফলে তাদের হৃদয় পরিবর্তন হয়নি। বস্তুতঃ হিন্দুসভা কখনই হিন্দু সমাজে কোন যুগান্তকারী পরিবর্তন মানতে রাজি ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দু বর্ণপ্রথার বিরোধিতা করেনি; বরং তারা বর্ণপ্রথা সমর্থন করে তা কঠোরভাবে মানার উপরই জোর দিয়েছিল। তারা কেবলমাত্র কয়েকটি আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিল। তারা জোর দিয়েছিল শুদ্ধি আন্দোলনের উপর। সাঁওতালদের হিন্দু সমাজে প্রবেশের অধিকার দেয়া হয়েছিল এই শর্তে যে, তারা শুয়োর বা মুরগির মাংস খাবে না। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে সারা বাংলায় সপ্তাহব্যাপী হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার উদ্দেশ্যে ছিল শুদ্ধি কর্মসূচীর মাধ্যমে নিম্নবর্গের হিন্দুকে হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। নিম্নবর্গের অনেক হিন্দু এই কর্মসূচী আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিল, কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরেই তা চাইছিল। যেমন ১৯২০র দশকের গোড়ায় রাজবংশী নেতা পঞ্চানন বর্মন 'ক্ষত্রিয় সভা' প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধ ও আচারবিধি গ্রহণের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের অনেকেই এই আন্দোলনে সাড়া দেয় এবং উপবীত ধারণ করে। নিম্নবর্গের হিন্দুরাও কিন্তু জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিল না। তারা শুধু

চেয়েছিল নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে বা জাতে উঠতে। স্বয়ং পঞ্চানন বর্মন অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন না। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের বিচ্ছেদ তাঁর পরিকল্পনা বহির্ভূত ছিল। যাইহোক নিম্নবর্গের মানুষ হিন্দুদের দুটি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ফেলে এবং এইভাবে উচ্চবর্মের হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বার্থের প্রতি তারা একাত্ম হয়। উচ্চবর্ণের মানুষও আগ্রহের সঙ্গে তা মেনে নেয়। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নিম্নবর্গের হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নমশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রায়ই সংঘর্ষ হত। সাঁওতালরাও এই ধরনের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪০ এর দশকে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে অবনতি ঘটিয়েছিল। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও দাঙ্গায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দু ও সাঁওতালদের ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, নমশূদ্র, রাজবংশী ও সাঁওতালরা নিজেরাই বহুদিন ধরে জাতে ওঠার চেষ্টা করেছিল এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে তারা উৎসাহিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের আইনের সুযোগ নিয়ে তারা ভদ্রলোকের রাজনীতিতে অংশ নিতে আগ্রহী ছিল। তাদের এই জাতে ওঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল হিন্দুসভা এবং আমরা দেখেছি কিভাবে শুদ্ধি আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে এক ফায়দা তুলেছিল কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা নয়। তফসিলিদের জন্য ৩০ টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে মাত্র ৭ টি আসনে সফল হলেও ১৯৪৬ সালে আসনসংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ২৪ টি।

আসলে ইংরেজ আমলে জাতিভিত্তিক আন্দোলনের গুরুত্বের জন্য উপনিবেশিক শাসন ও অনেকাংশে দায়ী ছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দিন দিন উপলব্ধি করছিল যে, ভারতে তারা দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে এবং জাতীয় আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। এই অবস্থায় তারা নিম্নবর্গের মানুষের সমর্থনের ভিত্তিতে তাদের পায়ের তলায় মাটি কিছুটা খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তারা নানাভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে অথবা দেশীয় মানুষের মধ্যে বর্তমান বিভেদের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের শাসনের স্থায়িত্ব বিধান করতে চেয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তারা সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছিল এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য ৩০ টি আসন সংরক্ষণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী নিম্নবর্গের মানুষকে তফসিলি জাতি বলে অভিহিত করা হয়। সরকারের উদ্দেশ্য যাইহোক এর ফলে নিম্নবর্গের মানুষ রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশের সুযোগ পায়, বাংলার রাজনীতিতে তারা ক্রমশঃ সক্রিয় হ'য়ে উঠতে থাকে এবং মন্ত্রিসভায় যোগদানের ফলে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়।

৬.৪.৮.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ইসলাম সিরাজুল (সম্পাদিত) বাংলা দেশের ইতিহাস—১ম খণ্ড

২। Chatterjee, Joya–*Bengal Divided*

৩। Banerjee S. – *Caste, Politics and The Raj Bengal.*

৪। Banerjee S. – *Caste, Protest and Identity in Colonial India : The Namasudras of Bengal (1872-1937)*

৫। Banerjee S.–(*ed.*) *Bengal : Rethinking History*

৬। Jalal Ayesha – *The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the DSemand for Pakistan.*

৭। Sen Shila – *Muslim Politics in Bengal (1937-47).*

৬.৪.৮.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার কারণ কি? কিভাবে তারা এই স সমস্যা সমাধানে তৎপর হ'য়েছিল?

২। বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা কতটা কঠোর ছিল?

৩। বাংলায় নিম্নবর্গের মানুষ কিভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে সচেষ্ট হ'য়েছিল? এই বিষয়ে উচ্চবর্ণের প্রতিক্রিয়া কি হ'য়েছিল?

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৫

Rural Politics

প্রজাস্বত্ব আইন এবং গ্রামীণ সমাজে শ্রেণীগত রাজনৈতিক জোট (জমিদার, জোতদার, কৃষক ও বর্গাদার)

একক-৯

বিন্যাস ক্রম

৬.৫.৯.০ : উদ্দেশ্য

৬.৫.৯.১ : প্রজাস্বত্ব আইন ও তার ক্রিয়াশীলতা

৬.৫.৯.২ : শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব ও জোট রাজনীতির উদ্ভব

৬.৫.৯.৩ : দেশ বিভাগের কালে গ্রামীণ স্তরে রাজনীতি

৬.৫.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৫.৯.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৫.৯.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রজাস্বত্ব আইন এবং তার ব্যাপক ক্রিয়াশীলতা

(২) শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব ও জোট রাজনীতির উদ্ভব

(৩) পূর্ববঙ্গে ভূমির উদ্বৃত্ত অংশের কর্তৃত্ব নিয়ে জমিদার ও প্রজার দ্বন্দ্ব

(৪) জমিদার - জোতদার বিরোধী প্রতিজোট এবং তেভাগা আন্দোলন

(৫) দেশ বিভাগোত্তর কালে গ্রামীণ স্তরে রাজনীতি

৬.৫.৯.১ : প্রজাস্বত্ব আইন ও তার ক্রিয়াশীলতা

বিংশ শতকের শুরু থেকেই মফস্বল বাংলা প্রাদেশিক রাজনীতির প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠে। যে সব ইস্যুগুলি প্রাদেশিক রাজনীতিতে প্রাধান্য পেতে থাকে সেগুলি মূলত উঠে এসেছিল ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থা-প্রসূত দ্বন্দ্ব থেকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় জমির মালিক ও রায়তি স্বত্বের মধ্যে একটি জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়। উনিশ

শতকের মাঝামাঝি কালের মধ্যেই জমির কৃষক এবং রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারের মধ্যে একটি বিশাল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। খাজনা আদায় বিশাল ও বেঢপ কাঠামোর গুরুভার বহন করা সত্ত্বেও কৃষকের মধ্যে একটা উদ্যোগী গোষ্ঠী এই সময় থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। সাধারণ রায়তদের তুলনায় এদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর অন্যরা জমিদার মহাজনের শোষণে জমি হারিয়ে বর্গাদার বা ভাগচাষিতে পরিণত হয়। এই সম্পন্ন রায়তরা গ্রামীণ কৃষি কাঠামোয় জোতদার হিসাবে পরিচিতি পায়। খাজনা সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এদের সাথে মূল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় জমিদারের সাথে। জমিদারের বর্ধিত খাজনা ও 'আবোয়াব' আদায়ের বিরুদ্ধে এরা সাধারণ কৃষকদের নিয়ে গড়ে তোলে যৌথ প্রতিরোধ। উদ্ভূত পরিস্থিতি ছিল মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির প্রতিকূল। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোর মধ্যে প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫) প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীকালে এই আইনের সংশোধনের (১৯২৮ ১৯৩৭) মাধ্যমে এই সম্পন্ন রায়তদের আইন অধিকার দেওয়া হ'ল জমিতে জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির উপায় নিয়ন্ত্রণ করে। তবে আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হল প্রকৃত ভূমিচাষি বা বর্গাদার। পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কিভাবে এইসব আইন তৈরিতে মালিকানা ও স্বত্বসম্পন্ন শ্রেণী স্বার্থের মধ্যে সমঝোতার প্রক্রিয়ায় স্বত্বহীন চাষি ও ভাগচাষির স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল। প্রতিক্রিয়া হিসাবে গড়ে উঠেছিল নতুন সমঝোতার প্রক্রিয়া। বর্তমান এককে সেটাই আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে কিভাবে তা প্রাদেশিক রাজনীতির চাপে জাতীয় রাজনীতির স্থানীয় ভিত্তিতে রূপান্তরিত হল।

বিগত শতকের শুরু থেকেই বিশ্ব বাজারের টানে ইক্ষু, পাটের মতন অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি এবং প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপক ক্রিয়াশীলতা রায়তদের মধ্যে ব্যবধান ত্বরান্বিত করে। জমিদার-মহাজনের পাওনা মেটাতে গিয়ে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের সাথে যুক্ত ছোট কৃষক পূর্বের তুলনায় আরো প্রান্তিক এবং পরে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। ফলে কৃষি সমাজের মধ্যে বিভাজন আরো গভীর হ'ল। তবে এই বিভাজন ও কৃষি সম্পর্কের ধরন প্রদেশের জেলাগুলিতে সর্বত্র এক ছিল না। বিংশ শতকের সূচনা থেকেই প্রজাস্বত্ব আইনের ক্রিয়াশীলতার ফলে জমিদার-প্রজা দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে জমি থেকে খাজনা আদয়ের পরিমাণ যত কমেছে জমিদারের আর্থিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব ততই খর্ব হয়েছে। তবে সুগত বসুর মতে জমিদারের এই পরিস্থিতি ১৯৩০ এর দশকের আগে সৃষ্টি হয়নি। যাই হোক সবচেয়ে সংকটে পড়েছিল ছোট জমিদারেরা। পরিস্থিতির চাপে জমির সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগ করে তাঁরা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেশায় যুক্ত হতে সচেষ্ট হয়। এই সব ছোট জমিদারদের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয় ১৯২৯-৩১ সালের মহামন্দাজনিত কারণে উদ্ভূত কৃষি সংকটের যুগে।

৬.৫.৯.২ : শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব ও জোট রাজনীতির উদ্ভব

আলোচ্য পরিস্থিতিতে কৃষির যে অবয়বটি গড়ে ওঠে এবং তাকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্বগুলি দেখা দিয়েছিল তা এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। (ক) ধনী কৃষক-মহাজন-ব্যবসায়ী শ্রেণী জমিদার শ্রেণীর এতদিনকার আধিপত্য অস্বীকার করতে থাকে। অন্যদিকে তারা কৃষকের উৎপন্নজাত দ্রব্যের উপর আরো কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়। (খ) ছোট কৃষকের উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার ফলে এক ক্রমবর্ধমান দরিদ্র কৃষক, ভাগচাষি ও শ্রমজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। (গ) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কৃষি ক্ষেত্রে শোষণের অর্থনৈতিক ভিত্তি বজায় রাখতে গিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাষ্ট্র কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উদ্ভূত শ্রেণীগত

সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। (ঘ) ধ্বংসোন্মুখ খাজনাভোগী শ্রেণীগুলির মধ্য থেকে উঠে আসা বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এক স্বতন্ত্র নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই সব দ্বন্দ্বগুলি থেকে গ্রামীণ সমাজে উদ্ভব ঘটে সমঝোতার রাজনীতি। প্রাদেশিক স্তরের রাজনৈতিক দলগুলি এই সমঝোতার রাজনীতিকে ব্যবহার করে স্থানীয় স্তরে তারা নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করে ১৯২০ এর দশক থেকে।

পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) প্রধান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হল ভূমির উদ্বৃত্ত অংশের উপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ে জমিদার ও প্রজার দ্বন্দ্ব। এই অঞ্চলের প্রজাস্বত্ব কাঠামোর বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে অনেক বেশি অনুপাতে জমি নগদ খাজনা দেয় এমন স্বত্ববান রায়তের হাতে ছিল। এখানে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে ছিল কম। এই সব স্বত্ববান রায়তরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তবে কৃষি কাঠামোয় উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদারদের সংখ্যা ছিল। প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারের ইচ্ছেমত খাজনা বৃদ্ধি বা আদায়ের সুযোগ ছিল সীমিত। এই আইন কিন্তু জমিদারের বে-আইনি আদায় বা 'আবোয়াব' বন্ধ করতে পারেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে খাজনার চেয়ে আবোয়াবের হার ছিল বেশি। ১৯২০ এর দশকের শেষের দিকে এই আবোয়াবর আদায়ের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে কয়েকটি জেলায় পড়ে উঠেছিল কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলন।

নগদ অর্থে খাজনা দেওয়ার সাথে জড়িত ছিল ঋণের প্রশ্নটিও। প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে পেশাদারী মহাজনের অস্তিত্ব ছিল খুবই কম। তাই মহাজনী কারবার, কৃষি পণ্যের বাণিজ্য এবং জমিদারতন্ত্র—তিনটি একই সূত্রে বাঁধা ছিল। এই জমিদার—মহাজনের শোধনের রূপটি পূর্ববঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আধিপত্য রূপেই দেখা হত। এই জমিদার-মহাজনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিশের দশকের শেষের দিক থেকে পূর্ববঙ্গে ধনী চাষি ও সাধারণ চাষিদের নিয়ে যে জোট গড়ে ওঠেছিল তা প্রজা আন্দোলন সংগঠিত রূপ লাভ করে। ত্রিশের দশকে এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের কৃষক এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। তবে পূর্ববঙ্গ জমিদার কৃষকের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিভাজন সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। তাই ১৯২৬-৩০ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বহু জেলায় সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে কৃষকের প্রতিরোধ আন্দোলন একাধিক দাঙ্গার সংগঠিত রূপ নিয়েছিল। এই পটভূমিকাতেই ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব বিলকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই বিলের উপর প্রাদেশক আইন সভার সদস্যদের ভোটদানের নমুনা থেকে জানা যায়, মুসলমান সদস্যরা বর্গাদার, প্রজা ও উপপ্রজাদের রায়তি অধিকারের পক্ষে জমিদারের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কংগ্রেস স্বরাজ্য দলভুক্ত সদস্যরা বর্গাকার, প্রজা ও উপপ্রজাদের বিপক্ষে জমিদারের পক্ষে ভোট দেন। স্বরাজ্য দলের সহায়তায় সরকার পক্ষ বিলটি পাশ করতে সক্ষম হয়। ফলে সাধারণ কৃষকরা কংগ্রেস দলের প্রাতি আস্থা হারায়। মুসলমান কৃষক, বর্গাদার—ভাগচাষিদের কাছে কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধনী চাষীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কৃষক - প্রজা দলের প্রতি পূর্ববঙ্গের মুসলমান ধনী চাষী ও বর্গাদার-ভাগচাষীদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এই অঞ্চলের সাধারণ হিন্দু কৃষকরাও এই রাজনৈতিক জোটের সামিল হয়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইন সভা নির্বাচনে মফস্বল নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে কংগ্রেস প্রার্থীরা ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির কাছে পরাজিত হয়। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টি ও শহরের মুসলমান মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত মুসলিম লীগের কোয়ালিশন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হলে পল্লীঅঞ্চলে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ফলে জমিদার বিরোধী প্রজা

আন্দোলন বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুণে ১৯৪০ এর দশকের প্রথমদিকে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশ বিভাগের পরে পূর্বপাকিস্তানে (বাংলাদেশ) পুরানো জমিদার-প্রজাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। পরিবর্তে ধনী চাষি মহাজন, ব্যবসায়ী শ্রেণী ও গরীব চাষি, কৃষি মজুরের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ছবিটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে।

কৃষি অর্থনীতির রূপান্তর ও প্রজাস্বত্ব আইনের ক্রিয়াশীলতার ফলে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি কাঠামোয় জোতদার-ধনী চাষীদের বাড়বাড়ন্ত আলোচ্য সময়কালে লক্ষ্য করা যায়। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার আলোচনা করতে গিয়ে আলোচ্য সময়কালে গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত খাজনাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্যের খর্ব এবং ধনী চাষিদের মধ্য থেকে উঠে আসা নতুন নেতৃত্বের উত্থান লক্ষ্য করেছেন। এই নতুন নেতৃত্ব দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামস্তরে জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক সম্প্রদায়ের বাকি অংশকে সংগঠিত করেছিল। (১) জমিদারদের তুলনায় নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। (২) কৃষকের উপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। গ্রামস্তরে তাদের প্রভাবকে তারা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসনের সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আরো পরে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর নির্বাচনকে কাজে লাগিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, এই নতুন নেতৃত্বের উত্থান ও বিস্তার ঔপনিবেশিক সরকারের কাম্য ছিল। রাজনীতিগতভাবে এদের মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকার এক অনুগত শ্রেণীর সন্ধান পেয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে যেখানে গণ আন্দোলন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল সেখানে এই নতুন নেতৃত্ব এক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। হয় তাদের কৃষক সম্প্রদায়ের বিশাল অংশের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রের আনুকূল্য প্রার্থনা করতে হয়, অথবা গণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের স্থানীয় আধিপত্যকে কাজে লাগাতে হয়। বিশেষ করে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার আরামবাগে তারা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছিল।

যাই হোক ১৯৩০ এর দশকের মাঝামাঝিকালে মহামন্দার অভিঘাতে কৃষকের মধ্যে পৃথকীকরণ আরো গভীর হ'ল। জোতদার-মহাজন ব্যবসায়ী এবং ঋণগ্রস্ত ছোট ও ভাগচাষিদের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটল। সৃষ্টি হল নতুন সমঝোতার ক্ষেত্র। এই সমঝোতায় মাঝারি চাষিরা শেষোক্ত শ্রেণীর সাথে যুক্ত হয়েছিল। কারণ জোতদার বা ধনী চাষিদের সাথে তাদের ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব। জমিদার-জোতদারের শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হল ভাগচাষি আন্দোলন। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসের গ্রামীণ সংগঠন গড়ে উঠেছিল জোতদার বা ধনী চাষীদের নেতৃত্বে। তাই গ্রামীণ স্তরে সাংগঠনিক ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে কংগ্রেস এই বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এদের বন্ধন যে রয়ে গিয়েছিল খাজনাভোগীদের স্বার্থের সাথে তা প্রমাণিত হয়েছিল ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী বিলের বিতর্কের সময়। ফলে কংগ্রেস গ্রাম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে মতন দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলেও ছোট কৃষক, বর্গাদার, ভাগচাষির সমর্থন হারায়। কিন্তু কংগ্রেসের বামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষকসভা ভাগচাষি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৪০ এর দশকের মাঝামাঝিকালে বাংলায় প্রায় উনিশটি জেলায় পড়ন্ত জমিদার, জোতদার, মহাজন ব্যবসায়ী জোটের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে ভাগচাষি আন্দোলন। তবে এর ঝটিকা কেন্দ্র ছিল সেই সব অঞ্চলে যেখানে ভাগচাষ ছিল কৃষি উৎপাদনের প্রধান ও বহুল প্রচলিত ঐতিহাসিক রূপ।

লক্ষ্য করা গেছে ১৯৩০ এর দশকের মাঝামাঝি কালে প্রদেশের মোট জমির ২৫% চাষ হ'তে ভাগচাষিদের দ্বারা। জমিদার জোতদারের জমি চাষ করে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা পেত। এর ওপর ছিল ভাগচাষীদের ওপর নানান জুলুম। জমিতে এদের কোন আইন স্বত্ব ছিল না। যদিও ক্লাউড কমিশনের (১৯৪০) প্রতিবেদনে এদের আইনি অধিকার দানের সুপারিশ ছিল; কিন্তু খাজনাভোগীদের চাপে তা কার্যকর হয়নি। উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগ ঘরে তোলার দাবিতে সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে গড়ে ওটে তেভাগা আন্দোলন। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের আবাদি অঞ্চলে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলাতে জমিদার ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

৬.৫.৯.৩ : দেশ বিভাগোত্তর কালে গ্রামীণ সমাজে জোট রাজনীতি

দেশ বিভাগের পরেও সাম্যবাদী নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলন গুলোতে ভাগচাষীদের অধিকারের প্রশ্নটি প্রাধান্য পেয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্টবেঙ্গল এস্টেট এ্যাকুজিশন এ্যাক্ট এবং ১৯৫৫ সালে ওয়েস্টবেঙ্গল ল্যাণ্ড রিফর্মেশন এ্যাক্ট চালু হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেসের আশ্রয়ে লালিত প্রাক্তন জমিদার, জোতদার—মহাজনদের মধ্যে গড়ে ওঠা পূর্বেকার সমঝোতা আরো সংঘবদ্ধ হয়। এদেরই কায়েমি স্বার্থের চাপে ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত উপরোক্ত আইনগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারল না। জমি যার লাঙল তার এই নীতি লাল ফিতের বাঁধনে আটকা পড়ে রইল। অন্যদিকে তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে কমুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাঝারি, ছোট কৃষক, বর্গাদার—ভাগচাষী ও ভূমিহীন খেত মজুরকে নিয়ে ১৯৩০ এর দশকে শেষের দিকে গড়ে ওঠা জোট এই সময় আরো সংগঠিত রূপ পায়। ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিকে কেন্দ্র করে তারা গড়ে তোলেন গণ আন্দোলন। ১৯৬০ এর দশকে সূচনাকালে সংগঠিত খাদ্য আন্দোলন ছিল ঐ গণ আন্দোলনেরই অন্য রূপ। ফলে গ্রামাঞ্চলে কমুনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে প্রাক্তন জমিদার, জোতদার, ধনী কৃষকের আশ্রয় স্থল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা যে দ্রুত হ্রাস পায় তার প্রমাণ মেলে দেশের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে (১৯৬২)।

৬.৫.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। Partha Chatterjee, Bengal–1920-1947

২। বদরুউদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক।

৩। Sugata Bose, Peasant Labour and Colonial Capital

৪। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও কৃষক প্রতিরোধ ১৯২০-১৯৪৭ অনুষ্টুপ, ভলিয়ুম ১৪, সংখ্যা ১, ১৯৮৪।

৫। Subhas Ch. Sen, ''Landed Middle class and their Politics in Hoogly, 1859-1914''. (Kolkata, 2003)

৬। অমলেন্দু দে, পুস্তক পর্যালোচনা, আনন্দবাজার, ২০-১২-৮৭।

৭। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাঙলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও কৃষক, প্রতিরোধ, ১৯২০-১৯৪৭, অনুস্টুপ, ভলিয়ুম ১৪, সংখ্যা ১, ১৯৮৪

৮। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, স্বরাজের পথে (কলকাতা, ১৯৯৪)।

৯। Sugata Bose, Peasant Labour and colonial capital, (Cambridge University Press, 1993)

৬.৫.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রজাস্বত্ব আইন কি করে বাংলার গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জোট ও প্রতিজোট গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল?

২। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার গ্রামীণ সমাজে প্রধান দ্বন্দ্বগুলি কি ছিল?

৩। ১৯৩০ এর দশকে কৃষি কাঠামোর ব্যাপক বিভাজন কি ভাবে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভাগচাষীর নেতৃত্বে জমিদার-জোতদার বিরোধী জোট গঠন করতে সাহায্য করেছিল? এই প্রতিজোট গঠনে কম্যুনিস্ট দলের ভূমিকা আলোচনা কর।

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৫

Rural Politics

বাঙলার গ্রামীণ সমাজে সাম্প্রদায়িকতা

একক-১০

বিন্যাস ক্রম

৬.৫.১০.০ : উদ্দেশ্য

৬.৫.১০.১ : ভূমিকা

৬.৫.১০.২ : গ্রামীণ সমাজে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশের নানা উৎস

৬.৫.১০.৩ : পৌরসভার রাজনীতি

৬.৫.১০.৪ : পৌর রাজনীতির চরিত্র

৬.৫.১০.৫ : ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতি

৬.৫.১০.৬ : ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন

৬.৫.১০.৭ : দেশ বিভাগের কালে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার উদ্ভব

৬.৫.১০.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৫.১০.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৫.১০.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) গ্রামীণ বাংলার সমাজে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশের উৎস

(২) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শ্রেণীচরিত্র

(৩) পৌর সভার রাজনীতির বিভিন্ন দিক

(৪) ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতি

(৫) ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন

(৬) দেশ বিভাগোত্তর কালে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার উদ্ভব

৬.৫.১০.১ : ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে বিভাজিত শক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল সাম্প্রদায়িকতা। বিগত শতকে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে অবিভক্ত বাঙলার গ্রামীণ সমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করেছে। পরিবর্তনসত্ত্বে বিশ্বাসী ঐতিহাসিককের মতে প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে যৌথ গ্রামীণ সমাজ হলে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি যুগ। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকের মধ্যে অনেকে হিন্দু জমিদার ও মুসলমান তালুকদার ও জোতদারের অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্বের মধ্যে গ্রামীণ সাম্প্রদায়িকতার বিকাশের উৎস খুঁজেছেন। পাশাপাশি রফিউদ্দীন আহমেদ এর সামাজিক মাত্রা বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, নিচুতলার মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত সমষ্টিগত স্বতন্ত্র চেতনাবোধ সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটল দাঙ্গায়। দাঙ্গার শ্রেণী চরিত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাতারা। তাঁদের মতে, প্রাদেশিক রাজনীতির সাথে সাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধন ঘটলে এটি তার শ্রেণী চরিত্র হারায়। ১৯৩০ এর দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে এটি প্রাদেশিক রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। পরিণতিতে দেশবিভাজন। বিভাগোত্তর কালেও দুই বঙ্গে এটি একটি জ্বলন্ত বিষয় হিসাবে বিবেচিত। উপরোক্ত ইতিহাস চর্চার আলোকে বর্তমান এককে বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোচনা করব।

৬.৫.১০.২ : গ্রামীণ সমাজে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশের নানা উৎস

১৮৭২ এর সেনসাসে প্রকাশ পায় বাংলার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান। অধিকাংশের বাস ছিল পূর্ববঙ্গে নিম্ন সমভূমির জেলাগুলিতে। তবে আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটেনি। ১৯১১ সালের সেনসাসে আছে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ খাজনাভোগী ও স্বত্বাধিকারী কৃষক এবং ভাগচাষি হ'ল মুসলমান। কৃষি কাঠামোতে ছিল হিন্দু-জমিদার-মহাজনদের প্রাধান্য। অধিকাংশ রায়তি কৃষকেরই কোন পাট্টা ছিল না। নিয়মিত খাজনা ছাড়াও তাদের দিতে হত জমিদারকে নানা বেআইন 'আদায়'। এটির সংগ্রহ নির্ভর করত জমিদারের বল প্রয়োগের উপর। খাজনার সাথে যুক্ত ছিল সুদের প্রশ্নটি। জমিদারের খাজনা মেটানোর জন্য মহাজনের কাছ থেকে কৃষককে ঋণ সংগ্রহ করতে হত। সুদ ছাড়াও 'ঈশ্বর বৃত্তির' মতন অতিরিক্ত আদায় মহাজন কৃষকের কাছ থেকে নিত। এতে কৃষিজীবী মানুষের উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ নিষ্কাশিত হয়ে যেত। প্রদেশে মহাজনী কারবার, কৃষিপণ্যের বাণিজ্য এবং জমিদারতন্ত্র এক সূত্রে বাঁধা ছিল। তাই মহাজনী ও বাণিজ্যিক শোষণকে জমিদারের শোষণের সাথে সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবেই দেখা হত। বিংশ শতকের সূচনাকাল থেকে প্রদেশের কৃষি অর্থনীতির সংকটের যুগে কৃষিকাঠামোর মধ্যকার বিভাজন আরো গভীর হ'ল এবং সম্পর্ক জটিল আকার নিল। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকের নেতৃত্বে সাধারণ কৃষক ও ভাগচাষির সংগঠিত প্রতিরোধ পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক রূপ পেল। ১৯২৬ সালের পাবনা এবং ১৯৩০ সালে কিশোরগঞ্জ দাঙ্গার কথা এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে কৃষক সমাজের এই প্রতিরোধ নিজস্ব সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যেই ঘটে। তাঁর মতে প্রাথমিক পর্বে এগুলি ছিল উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের শ্রেণীগত আন্দোলন।

প্রদেশের আধা শহর ও জেলা শহরগুলি ছিল কৃষকের সামন্ততান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক শোষণের আরো একটি কেন্দ্র। এগুলি ছিল মূলত হিন্দু জমিদার, ধনী চাষি, মহাজন, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী মধ্যবিত্তদের বাস। শহরের সম্পত্তির বেশির ভাগ অংশই ছিল হিন্দুদের। শহরের মাত্র ৪.১৪ শতাংশ মুসলমান ছিল শিক্ষিত। তাই সরকারি চাকুরি ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত পেশাভিত্তিক উপার্জনের সুযোগও ছিল এদের কম। তুলনায় অনগ্রসর মুসলমানদের মধ্য থেকে উঠে আসে এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। প্রখর ছিল এদের আত্মমর্যাদা ও আত্ম প্রতিষ্ঠার চেতনা। শিক্ষা, চাকুরি ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এদের সাথে হিন্দু খাজনাভোগী ও পেশাজীবী মধ্যবিত্তদের যে বিরোধ তা পূর্ববঙ্গের মফস্বল শহরগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম নিয়েছিল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ পেত হিন্দু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব যা মুসলমান ধর্ম ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে আঘাত করত। ১৯২৬ সালে ঢাকা শহরের দাঙ্গা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

রফিউদ্দীন আহমেদ দেখিয়েছেন যে সাম্প্রদায়িকতার একটা গণমাত্রা ছিল। তিনি বলেন, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকে মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ ধর্ম ও সামাজিক দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নিয়েছিল এক শক্তিশালী ইসলামিক সত্তা। শুরু হয়েছিল মুসলমান সমাজে এক সংস্কারবাদী আন্দোলন। মোল্লাদের মাধ্যমে তা সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই ইসলামিক সত্তা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত মুসলমান সমাজে এক সংহতি বোধ সৃষ্টি করে। নিচুতলার এই সংহতিবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে উদ্ভূত মুসলমান সমাজের মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেছিল। তারা ভাবতে শিখল এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতিগত সত্তা। এক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পাশাপাশি প্রতীক, মতবাদ, অতিকথার মাধ্যমে বৃহত্ত নিখিল মুসলিম সংস্কৃতির সাথে তারা নিজেদের চিন্তাভাবনার অভিযোজন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল।

অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন প্রসূত অর্থনৈতিক, সামাজিক অনিশ্চয়তা বোধ থেকে হিন্দুদের মধ্যে জন্ম নেয় ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের হিন্দু সাংস্কৃতিক ভাবধারা অবলম্বন করে। সংগঠিত পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে পৌঁছিয়ে যায়। আত্মপ্রকাশ ঘটল হিন্দু জাতীয়তাবাদের। জাতীয়তাবাদী রূপ প্রতীক, আদর্শ ও ভঙ্গী হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হল। নিম্নবর্গের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে তা আঘাত করে। পি. হার্ডি দেখিয়েছেন, নীচুতলার মুসলমানদের এই অস্ফুট বিক্ষোভ ওপরতলার রাজনীতির একটা প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

গ্রাম বাংলার স্থানীয় স্তরে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যাপক জাতীয় সংহতিবোধ রোধে রাষ্ট্র ছিল বদ্ধপরিকর। তাই সরকার ভাগ করো এবং শাসন করো নীতি প্রয়োগ করে হিন্দু মুসলমান বিভেদ জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাজন, ১৯০৯ এবং ১৯১৯ সালের আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর ব্যবস্থা, শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদের আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা হয়েছিল। এতে উদীয়মান শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাশা সৃষ্টি হয়। সরকারের এধরণের তোষণ নীতি হিন্দুদের মধ্যে আরো অনিশ্চয়তা বোধ সৃষ্টি করে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়েছিল।

মুসলমান রাজনৈতিক সত্তার বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান দিক চিহ্ন ছিল খিলাফৎ আন্দোলন। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ এই আন্দোলন ব্যাপক গনসমর্থন লাভ করে। মোল্লাদের মাধ্যমে এই আন্দোলন থেকে উঠে আসা তরুণ মুসলমান নেতারা স্থানীয় স্তরের মুসলমানদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৯২৫ সালের পর পূর্ববঙ্গের একাধিক জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিলে হিন্দু জমিদার-খাজনাভোগীদের প্রতিনিধি কংগ্রেস ও স্বরাজীদের বর্গাদার-ভাগচাষীদের অধিকারের বিরুদ্ধে ভোট দান জনিত পরিপ্রেক্ষিতে খিলাফৎ-অসহযোগের ব্যাপক কাঠামো ভেঙে যায়। ঔপনিবেশিক সরকার এই ভাঙন টিকিয়ে রাখতে যত্নবান হয়। অন্যদিকে, খিলাফৎ আন্দোলন উলেমাদের স্থানীয় স্তরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রচারের পৃথক মঞ্চ দিয়েছিল। তাদের প্রচার গ্রামীণ মুসলমানদের দ্বিজাতি তত্ত্ব গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি দেয়। এই সময়েই হিন্দু প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জিগির তুলে মুসলিম লিগের পুনরুত্থান ঘটে।

১৯৩০ এর দশকে দুটি বিষয় গ্রাম বাংলায় গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছিল। (১) মহামন্দা (১৯২৯-৩১), (২) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। মহামন্দার অভিঘাতে কৃষিতে যে সংকট নেমে এসেছিল তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দু জমিদার ও মহাজনেরা। তারা হারায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব। মুসলমান ধনী কৃষকদের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রজা আন্দোলন এই সময় আরো সংগঠিত হয় জমিদারের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষক প্রজা পার্টি (১৯৩৫)। মূল স্লোগান ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান। অত্যধিক খাজনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছিল এই দলের প্রধান কর্মসূচি। ১৯৩৫ সালের আইনে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচক মণ্ডলীর পরিধি আরো প্রসারিত হয়। প্রাদেশিক আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পল্লী অঞ্চলের আসনগুলি জয়লাভ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পল্লী অঞ্চলে ব্যর্থ হয়। পল্লী অঞ্চলে কৃষক পজা পার্টির এবং শহরাঞ্চলের মুসলিম লিগের নির্বাচনী সাফল্যের ফলে এই দুই দলের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা প্রদেশে গঠিত হয়। কোয়ালিশন সরকারের বাধ্যবাধকতার জন্য এই মন্ত্রীসভা জমিদারী প্রথা বিলোপে ব্যর্থ হলে কৃষক-প্রজা পার্টি পল্লী অঞ্চলে জনপ্রিয়তা হারায়। প্রজা আন্দোলনে ভাটা পড়ে। মুসলিম লিগের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ এর মার্চে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয় জাতীয় স্তরে। লিগের নেতারা গ্রামে গঞ্জে প্রচার করতে থাকে—পাকিস্তানই মুসলমানদের উন্নতির একমাত্র পথ। ইতিমধ্যে প্রজাস্বত্ব এবং গ্রামীণ ঋণ সংক্রান্ত কয়েকটি জনমুখী আইন এই সময় প্রবর্তিত হয়। গ্রামের সাধারণ মুসলমান চাষি অনুভব করতে থাকে পাকিস্তান ছাড়া তাদের মুক্তি নেই। চল্লিশের দশকে লিগ একক ভাবে ক্ষমতায় এলে পাকিস্তান আন্দোলনের জনপ্রিয়তা মুক্তি নেই। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান স্লোগান দিয়েই লিগ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৪টি আসনে জয়লাভ করে। শুধু প্রাদেশিক স্তরেই নয়, আঞ্চলিক স্তরেও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেতনা এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তত দিনে আরো প্রখর হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে।

অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া দানা বেঁধেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে। মুসলিম লিগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান আধিপত্যের আতঙ্ক ততই তীব্র হয়েছে। হিন্দু মহাসভা আওয়াজ তোলে মুসলমান শাসনে, শিক্ষা, সংস্কৃতির ইসলামীয়করণ হচ্ছে। এই সময় বঙ্গীর মধ্য শিক্ষা বিল এবং ১৯৪০ সালের আদমসুমারি নিয়ে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা গ্রামে ও শহরে গিয়ে সাম্প্রদায়িক

প্রচার চালাতে থাকে। ১৯৪১ সালে দাঙ্গাও ঘটে যায় ঢাকাতে। জাতীয় স্তরে হিন্দুত্ববাদী নেতারা আওয়াজ তোলেন এক শক্তিশালী হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন রাজনীতিতে আমদানী করতে হবে। এই সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে। এইভাবে দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়ে উঠে বাংলার জনসমাজ। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে উঠে। জমে থাকা হিংসা একটা বিরাট বিস্ফোরণ হয়ে ফেটে পড়ে ১৯৪৬ এ কলকাতায়। তারপর শুরু হয় নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ধারাবাহিক দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিণতি হল বাঙলার দ্বিতীয়বার বিভাজন।

ধারাবাহিক ও পরিবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাসী উভয় গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরাই মনে করেন ১৯৪০ এর দশকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের যে সংগঠিত ও রাজনৈতিক অবয়ব লক্ষ্য করা গেল তা স্বাধীনতার উত্তর কালেও উভয় বাঙলায় প্রবহমান ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তখনও চলমান ঘটনা। দলে দলে হিন্দু শরণার্থীরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। খুব কম সংখ্যক হিন্দুই সেখানে ছিল। স্বাভাবিক ভাবে সাম্প্রদায়িকতা সেখানেও একটি জ্বলন্ত বিষয়। দেশভাগের পর বাঙলা তথা ভারতে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লক্ষ্য করা গেছে। কাশ্মির ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক উত্তেজনা বা যুদ্ধ সৃষ্টি হলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে মাঝে অবনতি লক্ষ্য করা গেছে।

পৌরসভা ও ইউনিয়ন বোর্ড রাজনীতি

৬.৫.১০.৩ : পৌরসভার রাজনীতি

বিংশ শতকের স্থানীয় রাজনীতির প্রধান ক্ষেত্র হল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি। মহাবিদ্রোহের পরবর্তী দশকে ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে দুটি সমস্যা ছিল। (১) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে স্থানীয় স্তর পর্যন্ত রাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। (২) মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির দায়বদ্ধতার জন্য স্থানীয় স্তরে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। কিন্তু এজন্য যে পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন তা আর্থিক সংকটের অজুহাতে সরকার বরাদ্দ করতে অনাগ্রহী ছিল। উপায় হিসাবে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মাধ্যমে তৃণমূলস্তর থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে সেই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করে। এ নিয়ে চলে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। শেষে লর্ড রিপনের ১৮৮২ সালের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় পৌর আইন এবং ১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন আইন সৃষ্টি হয়। এই দুই আইনে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থাগুলি হয়ে উঠে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির রাজনীতির ক্ষেত্র। বর্তমান এককে, প্রথমে পৌর রাজনীতি এবং পরে ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতি বিশ্লেষণ করে দেখাব কিভাবে এগুলো ১৯এর দশক থেকে প্রাদেশিক রাজনীতির স্থানীয় ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল।

পৌর রাজনীতি : ১৮৮৪ সালে পৌর আইনে সবচেয়ে যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে তা হল পৌরসভার মোট সদস্যের ২/৩ অংশ সদস্যকে করদাতাদের নির্বাচিত করার অধিকার প্রদান। তবে প্রাদেশিক আমলাদের নেতিবাচক মনোভাবের জন্য ১৯২০ সালের পূর্বে সাঠিকভাবে প্রদেশে এই নির্বাচন বিধি চালু হতে পারেনি।

১৯৩২ সালের পৌর আইনে পৌর সভাগুলি আরো স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার পায়। এই আইনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ঘটে। (১) পৌর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন পৌর সদস্যদের দ্বারা। (২) সরকার মনোনীত সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ১/৪ অংশে আনা হয়। সর্ব নিম্ন হারে ধার্য কর প্রদানকারী পৌর নাগরিকও নির্বাচন অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। স্বায়ত্ব শাসনের পরিধি যত বৃদ্ধি পেয়েছে তত স্থানীয় খাজনাভোগী, ব্যবসায়ী, মহাজন ও পেশাজীবী মধ্যবিত্তদের কর্ম তৎপরতা যে এই পৌরসভাগুলিকে ঘিরে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার প্রমাণ মেলে তিন বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনের ফলাফলগুলিতে।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকেই বাংলা প্রদেশে কলকাতা কেন্দ্রিক নগরায়নের সম্প্রসারণ ঘটে। দেশি, বিদেশী, আমলা, ইউরোপীয় মিল মালিক, ম্যানেজার, ব্যবসায়ী, ভূ-স্বামী ও পেশাজীবি মধ্যবিত্তদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল কলকাতার লাগোয়া শিল্পাশ্রিত শহরগুলির ক্ষমতার উপরি কাঠামো। নীচু তলায় ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত, ক্ষুত্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ শ্রমজীবীদের বাস। স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ, বন্টন এবং শহর উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও চাপা উত্তেজনা চলত সেটাই শহর ইতিহাস চর্চায় পৌর রাজনীতি বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

শহরে প্রভাবশালী গোষ্ঠী সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তিন ধরনের গোষ্ঠীর কথা বলেছেন ঃ সংহত প্রভাবশালী গোষ্ঠী, অসংহত প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং নির্দিষ্ট আকারহীন গোষ্ঠী। এই তিন ধরনের গোষ্ঠী ছাড়াও রজত রায় আরও একটি গোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছিল শহরের শ্রমজীবি শ্রেণীকে নিয়ে। তবে ১৯২০-র দশকের পূর্ব পর্যন্ত চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে এরা পৌর রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কলকাতার লাগোয়া জেলা শহরগুলিতে বণিক সংস্থাগুলির বাণিজ্যিক সংগঠন ও এজেন্সী হাউসগুলি সাংগঠনিক দিক থেকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এদের লক্ষ্য ছিল শহরের ইউরোপীয় উদ্যোগপতিদের স্বার্থরক্ষা করা। চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী চটকল এলাকায় 'ইণ্ডিয়ান জুট মিল এ্যাসিয়েশন এদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এরা পৌর প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত। জেলা শহরবাসী বড় জমিদারদের সংগঠন ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোশিয়েশন। মাঝারি ও ছোট জমিদার, পেশাজীবিদের সংগঠন ছিল ভারত সভার স্থানীয় শাখাগুলি। এগুলি সবই ছিল প্রথম শ্রেণীভুক্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। দ্বিতীয় শ্রেণীর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে 'রেট পেয়ারস' ও 'পিপলস অ্যাসোসিয়েশন'। মূলত এগুলি ছিল সরকার কর্তৃক স্বীকৃত করদাতাদের প্রতিষ্ঠান। এর অধিকাংশ সদস্য ছিল পেশাজীবি মধ্যবিত্ত। সাধারণ করদাতাদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। পৌর সভা বা জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে করদাতাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে এরা আন্দোলন সংগঠিত করত। সমাবেশিত করত শহরের নীচু তলার মানুষদের। হুগলী ও নদীয়া জেলায় যথাক্রমে 'মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'মুসলিম রেট পেয়ারস অ্যাসোসিয়েশন' শহরবাসী মুসলিম করদাতাদের স্বার্থ রক্ষার মুখপাত্র ছিল। পরবর্তী কালে এই 'রেট পেয়ারস অ্যাসোসিয়েশন'গুলি প্রাদেশিক কংগ্রেসের শাখা সংগঠন হিসাবে কাজ করত। সব্যসাচী ভট্টাচার্য বর্ণিত তৃতীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীটির যেহেতু কোন প্রতিষ্ঠানিক সংগঠন ছিল না, এটি তাই কোন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১৯২০-এর দশক থেকে শ্রমিক শ্রেণী যে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে ভূমিকা পালন করতে থাকে তার প্রমাণ মেলে ১৯২৪ সালে বর্ধমানের পৌর নির্বাচনে। যাইহোক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের ছাঁচে প্রভাবশালী

গোষ্ঠীর সনাক্তকরণ কিন্তু প্রদেশের সব শহরগুলি ক্ষেত্রে করা যাবে না। পূর্ববঙ্গের জেলা শহরগুলির প্রভাবশালী গোষ্ঠী মূলতঃ গড়ে উঠেছিল জমিদার, খাজনা ভোগী ও পেশাজীবিদের নিয়ে। ১৯৩০-র দশকের পূর্বে মুসলমান প্রভাবশালী গোষ্ঠী পৌর রাজনীতি সম্পর্ক ছিল উদাসীন।

পৌর রাজনীতির একটা বড় ইস্যু ছিল জন সাধারণের উপর পৌরসভার চাপানো কর। বাড়ির উপর ও বিদ্যুৎ কর ইত্যাদির বিরুদ্ধে শহরবাসী তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি পৌরপরিত এবং কখনও কখনও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে প্রেরণ করত। আরও একটি ইস্যু ছিল নগরায়ণ সম্প্রসারণের ফলে শহরের জমির দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সমস্যা। হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণায় এই ইস্যুটি পৌর এলাকায় সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টির একটি বড় কারণ ছিল। একদিকে জমির দ্রুত অভাব ও অন্যদিকে জমির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এর দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জমি কেনা বেচার ক্ষেত্রে ঘোরতর সমস্যার মুখে পড়তে হত ঐ সব জেলার পৌরসভাগুলিকে। রয়াল কমিশন অন লেবার (১৯৩১) এ সম্পর্কে মন্তব্য এড়াতে পারেনি। তৃতীয় ইস্যুটি ছিল নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, ঘিঞ্জিপূর্ণ বস্তি এলাকা নির্মূল করা। এই সমস্যা নিয়ে বে-সরকারী জমির মালিক ও পৌরসভার মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত। পৌর রাজনীতিতে এটি বড় উত্তেজনার ইন্ধন জোগাত। নিজেদের স্বার্থে জমির মালিকরা শহর উন্নয়ন কাজে বাধা দিত। বস্তি উন্নয়ন কাজ এদের বাধার জন্য থমকে যেত। অন্যদিকে শহর পরিচ্ছন্ন রাখা ও বস্তি উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশী চাপ আসত ইউরোপীয় মিল মালিকদের কাছ থেকে। শিল্প পুঁজির বিকাশের স্বার্থে শহর উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বস্তি উন্নয়ন তাদের কাছে একান্ত প্রয়োজন ছিল। ঊনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে শ্রীরামপুর পৌরসভা এ কাজে ব্যর্থ হলে পাটকল মালিকেরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং প্রাদেশিক সরকারের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগও জানায়। পৃথক পৌরসভা গঠনেরও তারা দাবী জানিয়েছিল।

পৌর রাজনীতি কেবল শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা ধীরে ধীরে কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনীতির সাথেও যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৮৯১ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিল আইন ল্যাণ্ড হবার পর থেকেই জেলা বোর্ড ও পৌর বোর্ডগুলি হয়ে ওঠে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনী ক্ষেত্র। স্বাভাবিকভাবে এগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় স্তরের এইসব বোর্ডগুলি দখলের রাজনীতি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পায় ১৯৩০-এর দশকে। ১৯৩২ সালের পৌর আইনে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, পৌর বোর্ডের বার্ষিক আয়-ব্যয় বরাদ্দ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং সরকারী আর্থিক মজুরী পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বোর্ডের ওপর কর্তৃত্ব জাতীয় কংগ্রেস যে কীভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল তা ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, হাওড়া পৌর নির্বাচন প্রসঙ্গে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। ঢাকা জেলাতেও জেলা কংগ্রেসের অনুরূপ সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্য করার মতন ছিল। কারণ যারা পৌর বোর্ড দখল পাবে তাদের উপর ন্যস্ত হবে পৌর উন্নয়নের দায়িত্ব। শহরবাসীর আনুগত্য তারাই অর্জন করবে। বিধান মণ্ডলীর নির্বাচনে ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে এটি কাজ করবে। অন্যান্য বোর্ডগুলি দখলকে কেন্দ্র করে যে ধরনের উত্তেজনা এই সময় লক্ষ্য করা গেছে অনুরূপ লক্ষ্য করা যায় পৌর বোর্ড দখলকে কেন্দ্র করে মুসলমান অধ্যুষিত জেলা ও মহকুমা শহর গুলিতে হিন্দু মুসলমান জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে। শুধু পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান জেলার স্পর্শকাতর শহরগুলিতে যে পৌর নির্বাচনকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল তা সরকারী প্রতিবেদনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ১৯৪০-এর দশকে এই উত্তেজনা আরও চরমে ওঠে।

দেশ বিভাগোত্তর দশকে পৌর শাসন মূলত পরিচালিত হত ১৯৩২ সালের পৌর আইন অনুসারেই। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রাক্তন জমিদার, জোতদার এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন মধ্যবিত্তদের মধ্যে পৌর বোর্ড দখল এবং স্থানীয় উন্নয়ন প্রশ্নকে ঘিরে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত তা পৌর রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। শিল্পাশ্রিত পৌর সভাগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এই রাজনীতিকে আরও গতিশীল করে তোলে।

৬.৫.১০.৪ : পৌর রাজনীতির চরিত্র

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল পৌর রাজনীতির উপর নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মতে প্রদেশের পৌরসভাগুলি ছিল স্থানীয় ভদ্রলোকদের উচ্চাশা পূরনের প্রতিষ্ঠান। দলাদলি এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির স্থানীয় আখড়া হয়ে ওঠে এগুলি। এজন্য স্থানীয় উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হত। পৌর রাজনীতি হল মূলত সুবিধা ভোগীদের রাজনীতি। তবে দলাদলি যেমন ছিল তেমনি শহরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতাও ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে অযথা সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যে তারা যৌথ ভাবে প্রতিবাদী হত এমন উদাহরণও বিরল নয়। ১৯৩০-এর দশকের পূর্বে বাংলা প্রদেশে পৌর রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিবর্তে সম্প্রদায়গত সমঝোতার উদাহরণই বেশী চোখে পড়ে। সাংবিধানিক সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্র ধরে পৌর রাজনীতি যে ক্রমশ প্রাদেশিক রাজনীতির ভিত্তি হয়ে উঠেছিল, তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত। বিভাগোত্তর কালেও পৌর রাজনীতি এই ধারাবাহিকতা থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না।

ইউনিয়ন বোর্ড

৬.৫.১০.৫ : ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতি

বিংশ শতকের গ্রাম বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অপর একটি প্রধান স্থানীয় ভিত্তি হল ১৯১৯ সালে স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন বোর্ড। এটি হল ১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন আইনের সংশোধিত রূপ। উক্ত আইন অনুসারে পুরাতন চৌকিদারী ইউনিয়নগুলির প্রশাসন, উন্নয়ন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। স্থির হয় বোর্ড-এ নয়জন সদস্য থাকবে। এর মধ্যে ছয় জন হবেন করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত। বাকি সদস্যরা হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত। জনস্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাস্তা-ঘাট, সেতু নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং পানীয় জল সরবরাহ হল বোর্ডের কর্তব্য। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারও ছিল বোর্ডের অন্যতম কাজ। এইসব কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে কর বসাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারের হাতে। প্রয়োজনে সরকার এই বোর্ড ভেঙে দিতে পারত।

প্রথম বছরেই প্রতিটি জেলাতে স্থানীয় স্তরে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে দুটি কারণে গ্রামীণ রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক, করের হার দ্বিগুণ এবং দুই, ক্ষয়িষ্ণু পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম সমাজ পরিচালনার যে সাবেকী পদ্ধতি এতদিন টিকে ছিল তার উপর সরকারী হস্তক্ষেপ হওয়ার

আশঙ্কা। প্রথম আশঙ্কাটি যে অমূলক ছিল না তার প্রমাণ মেলে ১৯২২ সালের সরকারী প্রতিবেদনে। উল্লেখ আছে, গ্রামীণ সম্পদ সংগ্রহের নামে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি হয়ে উঠেছে নতুন নতুন কর সংগ্রহের মাধ্যমে। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে প্রকাশিত প্রতিটি সরকারী প্রতিবেদনে গ্রাম বাংলার জেলাগুলিতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্টার বিরুদ্ধে গ্রামীণ মানুষের ক্ষোভ ও বিরোধিতার উল্লেখ আছে। স্থানীয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্বে এই ক্ষোভ ক্রমশঃ গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী সংগঠিত রূপ নিয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলার আরামবাগে। এই দুটি জেলাতেই ঐতিহাসিক কারণে কৃষকের উপর খাজনা ও 'আবওয়াব' এর হার ছিল অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ কৃষক ও কারিগরদের দুর্গতির মুখে ঠেলে দেয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯২০ সালের মধ্যেই মেদিনীপুর ও আরামবাগে প্রাদেশিক কংগ্রেসের গ্রামীণ সংগঠন গড়ে ওঠে। এই দুই অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সাধারণ মানুষের সাথে সরকারের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৬.৫.১০.৬ : ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন

মেদিনীপুর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক আরোপিত বর্ধিত করের প্রশ্নটি। ১৯১৯ সালে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে কংগ্রেসী প্রচারের মুখ্য বিষয় ছিল স্থানীয় কর দ্বিগুণ হবার আশঙ্কা। কিন্তু মেদিনীপুরের সম্পন্ন কৃষকের কাছে শুধু করের প্রশ্নটি আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল না। আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক প্রশ্নটি যে মুখ্য বিষয় ছিল তা হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, বিংশ শতকের প্রথমদিকে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক পৃথকীকরণ, ধনী কৃষকদের মধ্যে কুলাক ধাঁচের ক্রিয়াকলাপের প্রসার এবং তাদের নেতৃত্বে কাঁথি ও তমলুকে ধনী কৃষকদের মধ্যে মাহিষ্য জাতির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে জোতদার মহাজন গোষ্ঠী এই অঞ্চলের গ্রাম সমাজে প্রকৃত আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯২১ সালে তাদের রাজনৈতিক সমস্যাটি ছিল গ্রাম সমাজের পরিচালন ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে তাই গোটা অভিযানটি সংগঠিত হয়েছিল দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে—বর্ধিত কর প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন এবং গ্রামাঞ্চলে সরকারী আমলাযন্ত্রের প্রসারের মাধ্যমে কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষয়িষ্ণু স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাকে বাধাদান।

পূর্ব মেদিনীপুরে এই সম্পন্ন কৃষক শ্রেমীর হাতেই ছিল স্থানীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব। স্বাভাবিকভাবে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন গণ আন্দোলন রূপ নিল। তারা ইউনিয়ন বোর্ডকে সরকারী নিপীড়নের প্রতীক করে তোলার চেষ্টা করে। যদিও প্রাদেশিক কংগ্রেস মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের সাথে অসহযোগ কর্মসূচী বর্জন করেছিল। তবে স্থানীয় মাহিষ্য জাতিভুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীরা এই আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। ইউনিয়ন বোর্ড যে বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিকর তা বীরেন্দ্রনাথ ও তার কর্মীরা জনসম্মুখে প্রচার চালান। সম্পন্ন মাহিষ্য রায়তদের মধ্য থেকে ওঠে আসা নতুন নেতৃত্ব এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলে আন্দোলনের গণ ভিত্তি গড়ে ওঠে। গ্রামীণ সমাজের সম্পন্ন হতে দরিদ্র

সকলে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। কাঁথি মহকুমা ছিল এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষ করে দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সরকারী মহলে ধারণা হল যে এই পরিস্থিতিতে ইউনিয়ন বোর্ড চালু রাখা অসম্ভব। সরকার বাধ্য হয়ে মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ এলাকা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নেয়। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ কৃষক যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তা তাদের জোতদার মহাজনদের শোষণ সম্পর্কে সচেতন করে এবং ভবিষ্যতে আরো সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে তাদের শক্তি যোগায়।

ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনের আরো একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল হুগলী জেলার আরামবাগ। কাঁথিতে ইউনিয়ন বোর্ডের বিরোদিতা করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমাল যেসব যুক্তি দিয়েছিলেন আরামবাগের কংগ্রেস নেতাদের যুক্তিও ছিল প্রায় একই রকম। ১৯২১ সালের মধ্যে হুগলীর আরামবাগ মহকুমায় কংগ্রেস সংগঠড় গড়ে ওঠে বহিরাগত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে। এখানকার স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা এসেছিল মাহিষ্য চাষী পরিবার থেকে। তারা প্রচার করতে লাগল যে ইউনিয়ন বোর্ড হল ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতীক, ইউনিয়ন বোর্ড বিরোদী আন্দোলন এখানে চলেছিল ১৯৩০-৩৩ সাল পর্যন্ত। যদিও কাঁথির মত, এই আন্দোলন এখানে ব্যাপক সফল হয়নি; কিন্তু আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এই মহকুমায় প্রায় অর্ধেক গ্রামে ইউনিয়ন কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। পুলিশি নির্যাতন নেমে এলে সংগঠিত হয় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতাই স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের জমিদারদের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধের মত বৃহত্তর আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে বল যুগিয়ে ছিল। শুধু মেদিনীপুর বা আরামবাগেই নয়, ১৯২৪ সাল হতে বাংলাদেশে যতগুলি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল তার প্রায় সবগুলিতেই শুরুটা হয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেই। যে সব অঞ্চলে আলোচ্য সময়ে ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলন বিশেষভাবে সংগঠিত হয়েছিল সেগুলি হল—চব্বিশ পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ এবং দিনাজপুর।

জয়া চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন কিভাবে সম্প্রদায়গত রোষেদাদ; ১৯৩২ এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও 'বেঙ্গল এগ্রিক্যালচ্যারাল ডেটরস এ্যাক্ট' প্রবর্তনের পর ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতির চরিত্রটাই বদলে গেল। এইসব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকদের মধ্যে ক্রমশ তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে সম্পন্ন বায়তদের মধ্যে থেকে ওঠে আসা মুসলমান মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যম হয়ে ওঠে এই গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি। জমি জরিপ বিভাগের আধিকারিক মিস্টার বেলের ১৯৩৯ সালে প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৯৩৫ সালে 'বেঙ্গল এগ্রিক্যালচ্যারাল ডেটরস্ এ্যাক্ট' অনুসারে গ্রাম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সালিশী বোর্ডগুলি ইউনিয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে এলে ধনী কৃষকরা এই বোর্ড দখলের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। জোতদারদের দ্বারা দখলিকৃত বোর্ডগুলির নিরপেক্ষতা ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে। হিন্দু খাজনা ভোগীদের স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এবং পল্লী অঞ্চলে বিধান মন্ডলের ভোটব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধিতার রাজনীতি পরিত্যাগ করে ১৯৩৭ সালে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। বোর্ড দখলের জন্য কংগ্রেস সাংগঠনিক তৎপরতা চালায়। পল্লী অঞ্চলে কংগ্রেস যে আনুগত্য বিভিন্ন কারণে হারিয়ে ছিল তার প্রমাণ মেলে ঐ নির্বাচনের জেলাওয়ারী নির্বাচনের ফলাফলে। এমনকি মেদিনীপুর জেলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে কংগ্রেসের

প্রাপ্ত ভোটের হার হ্রাস পায়। প্রাদেশিক স্তরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতিতে এই সময় প্রতিফলিত হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে ইউনিয়ন বোর্ডের দখল মুসলমান সদস্যদের হাতে এলে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডে মুসলমান সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার ছত্রতলে আশ্রিত হিন্দু খাজনা ভোগী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সামাজিক ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে ইউনিয়ন বোর্ড দখল নিয়ে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার স্রোত বইতে থাকে। ১৯৩৭ সালে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচন ঘিরে ত্রিপুরা, ময়মনসিং ও নোয়াখালিতে দাঙ্গা দেখা দেয়। ১৯৪০ এর দশকের প্রথম দিকে মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভার প্রচ্ছন্ন মদতে ইউনিয়ন বোর্ড দখল নিয়ে এই সময় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরো চরমে ওঠে।

৬.৫.১০.৭ : দেশ বিভাগোত্তর কালে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার উদ্ভব

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বলবন্ত রায় অশোক মেহেতার সুপারিশের ভিত্তিতে অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের মডেলে এখানে অঞ্চল পঞ্চায়েত গড়ে ওঠে স্থানীয় স্তরে। ইউনিয়ন বোর্ডের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। স্থানীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রাক্তন জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর কর্তৃত্ব এগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মাঝারি ও প্রান্তিক এবং ভূমিহীন কৃষক। কমিউনিস্টদের প্রতি এদের ছিল আনুগত্য।

৬.৫.১০.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(1) Partha Chatterjee, ‘‘Bengal 1920-1947’’ (Calcutta, 1984)

(2) বদরুদ্দীন উমর, ‘‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক’’। (কলকাতা, ১৯৮০)

(3) Joya Chatterjee, ‘‘Bengal Dividel, 1932-47’’ (Cambridge University Press, Paperback 1996)

(4) Rajat Roy, ‘‘Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure groups and conflict of interests in Calcutta city Politics, 1875-1927 (New, Delhi, 1979).

(5) Amal Das, ‘‘Urban Politics in an Industrial Area’’ (Calcutta, 1994)

(6) Subhas Ch. Sen, ‘‘Landed Middle class and their Politics in Hoogly, 1859-1914’’ (Kolkata, 2003)

(7) Suranjan Das, ‘‘Communal Riots in Bengal, 1905-1947’’ (Delhi, OUP 1991)

(8) Rafiuddin Ahmed, ‘‘The Bengal Mulsims 1871-1906’’ (Delhi, OUP, 1996, Paperback)

(9) সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের দিকে ঃ ছেচল্লিশের দাঙ্গা (উৎস মানুষ, কলকাতা ১৯৯২)

(10) অঞ্জন গোস্বামী, 'সাম্প্রদায়িকতা ও আধুনিক ইতিহাস চর্চা (১৮৮৫-১৯৪৭)' ঐতিহাসিক, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা।

(11) পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাঙলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও কৃষক, প্রতিরোধ, ১৯২০-১৯৪৭, অনুস্টুপ, ভলিয়ুম ১৪, সংখ্যা ১, ১৯৮৪

(12) হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, স্বরাজেরপথে (কলকাতা, ১৯৯৪)।

(13) Sugata Bose, Peasant Labour and colonial capital, (Cambridge Univesity Press, 1993)

(14) P. Hardy, The Musalmans of British India, Cambridge, 1972.

৬.৫.১০.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) Do you agree with the view that Municipal Politics in rural Bengal was a politics of the privileged class?

(১) তুমি কি একমত হবে যে গ্রাম বাঙলায় পৌর রাজনীতি ছিল শুধুই সুবিধাভোগী শ্রেণীর রাজনীতি?

(2) Write a critical note on the Union Board Movement in Sougth West Bengal. Why did it break down in late 1930s?

(২) দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনের উপর একটি পর্যালোচনা রাখ। এই আন্দোলন কেন ১৯৩০ এর দশকে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল?

(3) Trace the Development and evolution of rural communalism in Bengal in early decades of the 20th Century. Why was it regarded by the revisionist Historia a ''burning question'' is post colonial decade rural Bengal?

(৩) বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে গ্রামীণ সাম্প্রদায়িকতার যে বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা কর। সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকেরা কেন এটিকে উত্তর ঔপনিবেশিক দশকের একটি জ্বলন্ত সমস্যা বলে বিবেচিত করেছেন?

(4) What were the major factors leading to the emergence communalism an rural Bengal in early decades of the 20th century. How was it integrated with the communal politics in 1940s?

(৪) বিংশ শতকের প্রথম দিকে গ্রাম বাঙালীয় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের প্রধান কারণগুলি পরীক্ষা করা ১৯৪০ এর দশকে এটি কিভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হল?

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৬

Partition (1947) and Aftermath

World War II and Bengal towards partition

একক-১১

বিন্যাস ক্রম

৬.৬.১১.০ : উদ্দেশ্য

৬.৬.১১.১ : World War II and Bengal Towards Partition

৬.৬.১১.২ : United Bengal Movement

৬.৬.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৬.১১.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৬.১১.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারত-বাংলাদেশ বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বের পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট।

(২) অখণ্ড ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র বিষয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকার আলোচনা।

৬.৬.১১.১ : WOrld War II and Bengal Towards Partition

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় দুটি ঝোঁক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষকে যে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে তার রূপ যেমনই হোক না কেন—সে সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকরা ক্রমাগত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বার্থের প্রশ্নটি ক্রমাগত দানা বেঁধেছিল। শাসকদের উপলব্ধি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় সমর্থন লাভ ইংরেজ শাসকদের পক্ষ সহজ হয়নি। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি না পেয়ে এই সমর্থন দিতে কংগ্রেস সম্মত হয়নি। এই প্রশ্নে মতপার্থক্যের ফলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্পকালের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ দাবি করে মুসলমানদের প্রতি সুবিচারের প্রতিশ্রুতি। সেই দাবি রূপ নেয় লাহোর প্রস্তাবের। বলা যেতে পারে, ১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িকতা এক উগ্ররূপ ধারণ করে এবং শেষপর্যন্ত ভারত বিভাগের ট্রাজেডি নিয়ে আসে। হিন্দু মুসলিম বিভেদ আগেও ছিল। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ কিন্তু জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করেনি। দাবি ছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন, সংরক্ষণ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করার। এই দাবিগুলি ছিল

মূলতঃ উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবি। গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মুসলমান ধর্মে ও অনেক সময় জীবনযাত্রায় পৃথক হলেও সাধারণ হিন্দুর পাশে একসঙ্গে বসবাস করত। কিন্তু চল্লিশের দশকে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, হিংসা, ঘৃণা এবং যুক্তিহীন আবেগ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে ইন্ধন যোগায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য ও অবিচারের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং তাকেই মূলধন করে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। ব্যক্তিস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের চাপে জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ১৯৩৭ খ্রীঃ থেকে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মেই সাম্প্রদায়িকতার শক্তিগুলি জোরালো হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ খ্রীঃ নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক দলগুলির, বিশেষতঃ মুসলিম লীগের নৈরাজ্যজনক ফলাফল প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ইন্ধন যোগায়। স্বতন্ত্র নির্বাচনী ব্যবস্থায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে লীগ মাত্র ১০৯টি আসনে জয়লাভ করে এবং মুসলিম ভোটের মাত্র ৪.৮ শতাংশ ভোট পায়। এই ফলাফল মুসলমান সম্প্রদায়কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে। তারা বুঝেছিল যে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ গণমুখী আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৩৯ খ্রীঃ ১৮ই অক্টোবর লিন্‌লিথগো মুসলমানদের আশ্বস্ত করেন যে, তাদের মতামত ও স্বার্থের প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং তাদের সম্মতি ছাড়া কোন সাংবিধানিক পরিবর্তন গ্রহণ করা হবে না। ১৯৪০ খ্রীঃ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব তোলেন।

১৯৪০ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ লাহোরে সারা ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে ভারতের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কংগ্রেস-লীগ বিরোধ ক্রমান্বয়ে তীব্র হয়। উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও এই প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত; কারণ এই প্রস্তাবই ছিল পাকিস্তান দাবির মূল ভিত্তি। এই প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বদিকে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করা হয়। বলা হয়, এই অঞ্চলগুলি পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, শুল্ক প্রভৃতি বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে। এই হিসেবে বাংলাদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি লাহোর প্রস্তাবের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি বা পাকিস্তানের কথা এই প্রথম নয়, ১৯৩০ খ্রীঃ মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে স্যার মহম্মদ ইকবাল ভারতের মুসলমানদের জন্য পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলেন। একই সময়ে বিলেতে গোল টেবিল বৈঠক চলাকালীন চৌধুরী রহমত আলি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ স্থাপনের কথা বলেন। তাঁর মতে, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধুপ্রদেশ, তুখারিস্তান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ নিয়ে বঙ্গ-ই-ইসলাম এবং নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদ উসমানিস্তান। বলা যেতে পারে ফজলুল হকের 'পাকিস্তান প্রস্তাব' রহমত আলির প্রস্তাবের পরিবর্তিত রূপ। ফজলুল হক দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচার করেননি বা হিন্দু মুসলমানদের পৃথক সত্ত্বার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেননি। মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফজলুল হক উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতে মুসলমানদের অবস্থা দুর্বল। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও তাদের অবস্থা ভালো নয়, কারণ সেখানে তাঁরা 'effective majority' হলেও ততটা প্রভাবশালী নয়, অর্থাৎ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। যদি আট কোটি মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশ একটি

প্রদেশে থাকত তাহলে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু মুসলমানরা অসমানভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে আছে। তাই এই অবস্থার কোন সন্তোষজনক সমাধান না হলে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ও রক্ষাকবচ নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালি আর উদার স্বভাব ফজলুল হক উপলব্ধি করেন যে পাকিস্তান প্রস্তাব অবাস্তব এবং বাংলাদেশের তথা ভারতের স্বার্থবিরোধী। এই পরিস্থিতিতে ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্না তথা পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থকগণের বিরোধ ঘটে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪১ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারির সভায় প্রতি বছর ২৩শে মার্চ সমগ্র ভারতে পাকিস্তান দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৪১ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বাংলায় পাকিস্তান দিবসের কর্মসূচী পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক এই কর্মসূচীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তা বাতিলের নির্দেশ প্রদান করেন। অপরদিকে ১৯৪১ খ্রীঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত পাকিস্তান সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে মওলানা আকরম খাঁ পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর আপোসহীন মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, 'পাকিস্তান আমাদের লক্ষ্য স্থান। আসুন আমরা একতাবদ্ধ হইয়া ঐকান্তিকতা ও সাহসিকতার সহিত গন্তব্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য যাত্রা করি'। মওলানা আকরম খাঁ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান 'ক্রীড' কে পূর্ণ সমর্থন ও জিন্নার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং পাকিস্তানের আদর্শকে ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়। লীগের নীতি ও পাকিস্তান 'ক্রীড'কে (মূল নীতিকে) পল্লী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য সম্মেলনে মওলানা আকরম খাঁকে চেয়ারম্যান করে 'পাকিস্তান পল্লী প্রচার কমিটি' গঠন করা হয়। ইতিমধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে যোগদান সংক্রান্ত বিষয়ে মত পার্থক্যের কারণে জিন্না ও লীগের সঙ্গে ফজলুল হকের বিরোধ সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক স্বার্থে ফজলুল হকের মতো জনপ্রিয় নেতাকে লীগের প্রতি অনুগত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এ পরিস্থিতিতে মওলানা আকরম খাঁ জিন্না ও লীগের সঙ্গে ফজলুল হকের সমঝোতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলে তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় এবং ১৯৪১ খ্রীঃ নভেম্বরে হক—লীগ বিরোধের সাময়িক অবসান ঘটলেও অল্পদিনের মধ্যেই আবার ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ সময় হককে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার লীগ দলীয় মন্ত্রিগণ একযোগে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু ফজলুল হক হিন্দু মহাসভা ও লীগ বিরোধিতার সমন্বয়ে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করে মন্ত্রিসভা গঠন করলে মুসলিম লীগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্না ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। মুসলিম লীগর থেকে বহিষ্কার করার পেছনে জিন্নার রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল—মন্তব্য করে হক বলেন, 'Mr. Jinnah passed an order of expulsion on me without the slightest justification and his followers in Bengal, for personal and other reasons, are busy organizing the league in order to crush me politically. ফজলুল হক বাংলাদেশে মুসলিম লীগের প্রভাব হ্রাস করতে সচেষ্ট হন। তিনি ঘোষণা করেন, জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগের কোন নৈতিক অধিকার নেই রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করবার এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবার। এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেন, (ক) মুসলিম লীগের নেতৃত্ব এক স্বার্থপর স্বৈরতান্ত্রিক গ্রুপের করায়ত্ত, অবাধে মত প্রকাশের কোন অধিকার এই নেতৃত্ব স্বীকার করেন না। (খ) সমস্ত ক্ষমতাই একজনমাত্র ব্যক্তির অর্থাৎ জিন্নার করায়ত্ত। এক অসহিষ্ণু, স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির হাতে পড়ে লীগ সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছে। (গ) বর্তমানে

মুসলিম লীগে অ-ইসলামী (un-islamic) পরিবেশ বিদ্যমান। ইসলামের মূলনীতি সেখানে বর্জন করা হয়েছে। তাই লীগ নেতৃবৃন্দকে প্রকৃত মুসলমান বলা চলে না। এই দল মুসলমানদের সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে। এছাড়া মুসলমানদের রাজনৈতিক শ্রেণি বিন্যাস করে দেখান, 'Muslims outside the Muslim League belong to two classes; firstly, those who accept the League but who cannot join the League on account of the autocracy of Mr. Jinnath; scecondly those who are opposed to the very ideology of the League and cannot, therefore, conscientiously become members of the League and accept the leadership of Mr. Jinnah.'

ফজলুল হক ইসলামের মূলনীতি 'ইসলামিক ভাতৃত্ববোধকে' ভিত্তি করে Progressive Muslim League নামক একটি নতুন দল গঠন করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর মতে ইসলামের মূল নীতিকে ভিত্তি করে এই দল গঠিত হলেও অন্য সাম্প্রদায়ের অধিকারও এই দল রক্ষা করবে। মুসলমান ও অ-মুসলমানদের একতার মধ্যে দিয়েই ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব। ১৯৪২ খ্রীঃ ২০শে জুন কলকাতার টাউন হলে Hindu Muslim unity conference অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা সমিতি, লিবারেল ফেডারেশন ও প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ এই সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। ফজলুল হক পাকিস্তান দাবির অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারতের রূপ প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে সচেষ্ট ন। অপরদিকে ১৯৪২ খ্রীঃ ২১শে ফ্রেব্রুয়ারি নয়া দিল্লীতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ফজলুল হকের আচরণের সমালোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। জিন্নার পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশে লীগ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। জিন্না ফজলুল হক পরিচালিত মন্ত্রিসভা খারিজ করে লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম করার চেষ্টা করেন। বস্তুত লীগ এই সময় বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়। নানা কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হক মন্ত্রিসভা কৃতকার্য হয়নি। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফজলুল হকের পক্ষে 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগকে' বাংলাদেশে সংগঠিত করা সম্ভব হয়নি। ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাপে এক বছরের মধ্যে ফজলুল হকের সমর্থকরা দল ত্যাগ করে আইনসভায় মুসলিম লীগের পক্ষাবলম্বন করতে থাকে। তাছাড়া, এই সময় মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করায় অধিকতর অভিজ্ঞ, চতুর হিন্দু ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুর্বল মুসলিম উঠতি বণিক শ্রেণি পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। মুসলিম কর্মচারীরাও ভবিষ্যতে দ্রুত পদোন্নতির আশায় এ দাবি সমর্থন করে। এই অবস্থায় ১৯৪৩ খ্রীঃ গোড়ায় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং আইন সভায় ফজলুল হকের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে হক মন্ত্রিসভাকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফজলুল হক আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলাদেশের দুরবস্থা লাঘবের চেষ্টা করলেও ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে তাঁর পক্ষে এইসব গুরুতর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়নি। বাংলার গভর্নর, ইংরেজ অফিসাররা এবং উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসারেরা অর্থাৎ গোটা আমলাতন্ত্র বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অসহযোগিতা করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার ফজলুল হককে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। যে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও জনকল্যাণের আদর্শ সামনে রেখে ফজলুল হক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য গভর্নর, উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ একজোট হল। মুসলিম লীগের হক বিরোধী তৎপরতা মন্ত্রীসভার পতন ঘটাতে না পারলেও গভর্নর জন হার্বাট ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করেন।

এ. কে. ফজলুল হকের পদত্যাগের পর ১৯৪৩ খ্রীঃ ১৩ই এপ্রিল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বে ৭ জন মুসলমান, ৩ জন বর্ণহিন্দু এবং ৩ জন তফশিলী প্রতিনিধি নিয়ে বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। লীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় মওলানা আকরব খাঁ সন্তোষ প্রকাশ করে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় লেখেন, 'বিগত দেড় বছরের মুসলিম রাজনীতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে নামিজ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে'। তবে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে বাঙালির জীবনকে বিপর্যস্ত করে। বাঙালি মুসলমান এই সময়েই সম্পূর্ণভাবে বাঙালিত্ব ভুলে গিয়ে নিজেকে কেবলমাত্র মুসলমান বলেই পরিচয় দেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানেরা 'এক জাতি', অবাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের এই প্রচারে শিক্ষিত মুসলমানরা মেতে ওঠেন। এই সময়ে বাংলার মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে অবাঙালি মুসলমানদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। বাঙালির নিজস্বধারা থেকে বাঙালি মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তাঁরা পাকিস্তানের দাবিতে সোচ্চার হন। মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। মুসলমানরা লীগের প্রতি আকৃষ্ট হন। অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিও লীগের প্রভাব বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ১৯৪৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাস থেকে ১৯৪৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাস পর্যন্ত ফজলুল হক একটানা মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীঃ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বাংলাদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে এক বৃহৎ দলে পরিণত হয়। অন্যান্য প্রদেশেও লীগের ক্ষমতা প্রভুত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনেও লীগ সাফল্য লাভ করে। জিন্না ঘোষণা করেন, এই নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছে যে মুসলিম ভারত-পাকিস্তান দাবির স্বপক্ষে এবং লীগই মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন। কংগ্রেস কেবলমাত্র বর্ণ-হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রাদেশিক নির্বাচনের লীগের ব্যাপক বিজয়ের পর ১৯৪৬ খ্রীঃ ২রা এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি সর্বসম্মতিক্রমে হোশেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নেতা নির্বাচন করে। এর পর সোহরাওয়ার্দী সরকার গঠনের জন্য বাংলার তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর ফেডারিক বারোজের আমন্ত্রণ পেয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। শেষপর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী কয়েকজন অকংগ্রেসী হিন্দু ও স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই সময়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশভাগের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। ভারত বিভাগ অনিবার্য হাওয়ায় কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বিভক্ত করার দাবি করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এটলীর ভারতসংক্রান্ত ঘোষণায় ১৯৪৮ খ্রীঃ জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হলে বাংলার হিন্দু-মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলার শেষ গভর্নর ফেডারিক বারোজের সঙ্গে ২২শে ফেব্রুয়ারি সাক্ষাৎ করে দাবি করেন যে, ভারত বিভক্ত করা হলে বাংলাকেও বিভক্ত করতে হবে। কারণ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনী শ্যামাপ্রসাদের দাবি সমর্থন করেন। ফলে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। এভাবেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রকৃত মীমাংসা সম্ভব। বিভক্ত ভারতে বিভক্ত বাংলা স্বাভাবিক পরিণতি। অন্যদিকে মৌলানা আকরম খাঁ ও

নাজিমুদ্দিনের সমর্থকরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাইরে কোন স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ তাঁদের দাবি সমগ্র বাংলাদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা।

শেষপর্যন্ত ভারত বাংলাদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে পরিবেশে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়, তাতে ফজলুল হক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই একটি বিবৃতিতে ফজলুল হক বলেন, ''I am one of the very few Indians who condemn all that has happened in Indian politics during the last two years and I say publicly that I condermnthe cirumstances which have led to the unfortunate division of the province''.

৬.৬.১১.২ : United Bengal Movement

১৯৪৭ খ্রীঃ মার্চ মাস থেকেই কলকাতার সংবাদপত্র গুলিতে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ও বিপক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি ও সভাসমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে। এই পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নটি বিবেচনা ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির একটি বৈঠক আহ্বান করা হয় ৪ঠা এপ্রিল। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ। ১১ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দলভুক্ত ১১ জন প্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবি জানান। অন্যদিকে বাংলায় মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মতামত সংগঠিত করে এবং তা ব্যক্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে সুরাওয়ার্দী বলেন, 'I have always been in favour of a United Bengal and Greater Bengal. I am going to deal with this later on in a statement, when I hope to prove that partition for Bengal will be nothing else but suicidal for her people, whether Hindus or Muslims or scheduled castes'. পাকিস্তান রূপায়িত হলে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষে তাঁর নিজের সম্প্রদায় কিভাবে জর্জরিত হবে সে চিন্তায় জিন্নাও মুষড়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেননি যে তিনি ভুল করেছেন বা ভুল বুঝেছেন, যে ভুলের মাসুল সহস্র সহস্র নর-নারীকে দিতে হয়েছে বা হচ্ছে। তবে প্রকারান্তরে দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করেছিলেন সাতচল্লিশ সালের এগারই সেপ্টেম্বর তারিখে Pakistan Constituent Assembly উদ্বোধনে জিন্না করাচীতে যে ভাষণ দেন তাতেই ধরা পড়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর তাঁর শেষ বক্তব্যে। জিন্না আবেদন করেন—অতীতকে ভুলে যাও, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রত্যাহার করো, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ অস্বীকার করো এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন রাষ্ট্র গড়ো। তোমরা যে কোন ধর্মাবলম্বী হওনা কেন, তোমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থা যাই থাকুন না কেন, রাষ্ট্র পরিচালনে সে সবের কোন স্থান নেই।

'Sovereign Bengal' গঠনের প্রস্তাব গান্ধীজি বিবেচ্য মনে করেছিলেন, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তিনি তা রোধ করতে পারেননি। গান্ধীজির বক্তব্য অগ্রাহ্য করে দেশ বিভক্ত হল। মনের দুঃখে গান্ধীজি তাঁর মর্মকথা চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতায় জুড়ে রাখলেন ঃ I find myself all alone. Even the Sardar (Patel) and Jawaharalal (Nehru) think that my reading of the situtation is wrong and peace is to return if partition is agreed upon...they did not like my telling the Viceroy that even if there was to be partition it should not be through British intervention or under British rule...we may not feel the

full effect immediately but I can see clearly that the future of independence gained at this price is going to be dark. I pray that God may not keep me alive to witness it.

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে অখণ্ড ভারত ও পাকিস্তান দাবি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে গান্ধী এবং জিন্না নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাঙলা ও পাঞ্জাবকে অবিভক্ত রাখার চিন্তা করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং ভারত, বাঙলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত রাখার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পরিকল্পিত এবং দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে থাকায় শেষপর্যন্ত কোনো ধরনের বিভক্তিকেই আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তা না হলেও সেই পরিস্থিতিতে কলকাতায় শরৎ বসু এবং সুরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে বাঙলাকে অখণ্ড ও সার্বভৌম রাষ্ট্র করার আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরে অন্যান্য এলাকাতেও অখণ্ড সার্বভৌম বাঙলার পক্ষে মুসলিম লীগের কর্মীরা এবং স্থানীয় নেতারা অনেক সভা সমিতির ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে দৈনিক 'আজাদ' ও ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ইংরেজি দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইত্যাদিতে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য এবং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বক্তৃতা প্রকাশিত হতে থাকে। লণ্ডন থেকে ফিরে এসে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্রিটিশ প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের চূড়ান্ত সম্মতির জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২রা জুন, ১৯৪৭ খ্রীঃ দিল্লিতে ভাইসরয়ের বাসভবনে ভারতীয় নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে থাকেন জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন জিন্না, লিয়াকত আলী খান ও আবদুর রব নিশতার। শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন সর্দার বলদেব সিংহ। এই সম্মেলনে 'মাউন্টব্যাটেন রেয়াদাদ' নামে পরিচিত ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই গৃহীত পরিকল্পনায় অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে নাচক করে দিয়ে 'ভারতকে' এবং বাঙলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। ৩রা জুন প্রথমে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনাটি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেন। পরে জওহরলাল নেহেরু, জিন্না ও বলদেব সিং এই পরিকল্পনাটি সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। অবশ্য তাদের এই ঘোষণা চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হওয়া কংগ্রেস লীগের কাউন্সিলে সমর্থিত ও গৃহীত হওয়ার শর্তসাপেক্ষ ছিল। ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্যা ৯ই জুন সারা ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশনটি প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। দিল্লীতে ১৪ই জুন সারা ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ঘোষিত রোয়েদাদ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য যে, বাংলার মুসলিম লীগের মধ্যেই এইচ. এস. সুরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম পরিচালিত একটি গোষ্ঠী ১৯৪৭ খ্রীঃ মে মাস থেকে 'ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম বাংলার' প্রস্তাব দিতে শুরু করলে স্থানীয় অগ্রগণ্য কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুর সমর্থনও লাভ করেছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণে অধিকাংশ বাঙালি হিন্দুরা বিশ্বাস করেছিল যে এই পদক্ষেপের অর্থ হল বৃহত্তর পাকিস্তান সৃষ্টির কৌশল যার মধ্যে থাকবে অর্থনীতির দিক থেকে ধনী পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতা শহর। কিন্তু কার্যত এই প্রস্তাবের মৃত্যু ঘটে কারণ ১৯৪৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাস থেকে স্থানীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সুসংগঠিত অভিযান ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের অভিমত হল

বাংলা ভাগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে হিন্দুদের জন্য আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টি করতে হবে। আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল হিন্দু ভদ্রলোক যারা জয়া চ্যাটার্জীর ভাষায় ইতিমধ্যেই 'জাতীয় হিন্দু সত্তা' গঠন করেছিল এবং নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক উদ্যোগ গঠনের চেষ্টা করেছিল। এই আন্দোলনকে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্গের মানুষেরা, বিশেষ করে কিছু দলিতেরাও সমর্থন করেছিল এবং তারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, কেননা তাদের মনে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্থায়ী শাসনাধীন হওয়ার বাস্তবিক ভয় ছিল।

৬.৬.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Badruddin Umar : *Banga Bhanga O Sampradayik Rajniti.*

২। D. N. Banerjee : *East Pakistan, A Case Study in Muslim Politics.*

৩। Humayun Kabir : *Muslim Politics – 1906-47 and other Essays.*

৪। Kalipada Biswas : *Yukta Banglar Sesh Adhyaya.*

৫। Amalendu De : *Pakistan Prastab O Fazbul Huq.*

৬.৬.১১.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফজলুল হকের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২। অখণ্ড ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র বিষয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৬

Partition (1947) and Aftermath

Refugee Influx and its impact on Bengal Society, Economy and Polity

একক-১২

বিন্যাস ক্রম

৬.৬.১২.০ : উদ্দেশ্য

৬.৬.১২.১ : দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহতি পরে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমনের কারণ

৬.৬.১২.২ : শরণার্থী আগমনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারী উদ্যোগ

৬.৬.১২.৩ : পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমনের প্রভাব

৬.৬.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থ

৬.৬.১২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৬.১২.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন ও তার কারণ।

(২) উদ্বাস্তু আগমনের ফলে নানা সমস্যা।

(৩) সমস্যা সমাধানে নানা সরকারী উদ্যোগ

(৪) বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব।

৬.৬.১২.১ : দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমনের কারণ

১৯৫০ এর দশকের অন্তিমলগ্নে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল শরণার্থীদের আগমন এবং শরণার্থীজনিত সমস্যা। পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের সমস্ত রকমের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধনমুক্ত হয়ে। এই সমস্ত অসহায় মানুষের পশ্চিমবঙ্গে কোন অধিকার ছিল না, থাকতে বাধ্য হয়েছিল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিম্নস্তরের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সহায়কে সম্বল করে।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ভয়বাহ রূপ নেয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ক্রমাগত আগমন সমসাময়িক ইতিহাসের এক মর্মান্তজনক অধ্যায়। হিরন্ময় ব্যানার্জী 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমন এবং ১৯৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক এদের পুনর্বাসনের বর্ণনা দিয়েছেন। কান্তি পাকড়াসী (Kanti Pakrasi) 'The uprooted' গ্রন্থে উদ্বাস্তুদের ব্যাবহারিক জীবনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনিল সিনহা 'পশ্চিম বাংলার জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশ'-এ পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠা এই সমস্ত উপনিবেশ প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে এই migration বা অভিপ্রয়াণের সূচনা। দেশভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে হিন্দুদের আগমনের কারণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নয়, বরং এর বিশেষ কারণ ছিল মানসিক পীড়ন যা সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভোগ করতে হয়েছিল। মুসলমান প্রতিবেশীদের থেকে হিন্দু মেয়েদের রক্ষা করাও ছিল বড় সমস্যা। হিরন্ময় ব্যানার্জী তাঁর 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। স্বাধীনোত্তরকালে গোড়ার দিকে যারা এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে হিন্দু মেয়েদের অত্যাচারিত হতে হয়েছে বা হিন্দুদের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক বা হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘুদের কল্যাণ, তাদের সুরক্ষা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও এই প্রতিশ্রুতি ছিল ভিত্তিহীন। বাস্তবিকপক্ষে এরাও সংখ্যালঘু হিন্দুদের জমি এবং মেয়েদের প্রতি আসক্ত ছিল। এই অবস্থায় সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে, সম্পূর্ণ অসহায়তাকে সম্বল করে অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, যাদের বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু। পূর্ব পাকিস্তানের এরা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত। উল্লেখ করা যেতে পারে, গোড়ার দিকে যারা এদেশে এসেছিল, তাদের বেশীর ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপন্ন হওয়ার ফলেও এরা চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। একটি বৃহৎ সংখ্যক শরণার্থী, যারা ছিল দোকানদার, শিক্ষক—এরা অমৃতবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদককে জানিয়েছিল হিন্দুদের দোকানগুলিতে জিনিসপত্র ক্রয় বন্ধ হয়েছিল, হিন্দু শিক্ষকগণ ছাত্রদের দ্বারাও অপমানিত হয়েছিলেন। তাই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা তেমনভাবে না ঘটলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া, সামাজিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হওয়া, সর্বোপরি সন্ত্রাসজনিত আতঙ্ক স্বাধীনোত্তরকালে গোড়ার দিকে শরণার্থীদের আগমনের প্রাথমিক কারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় উৎপীড়ন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল বলা যেতে পারে। সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী পূর্ব পাকিস্তানের সরকারকে এজন্য দায়ী করে অভিমত পোষণ করেন যে, এই সরকার এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যার জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা ভারতে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে হিন্দু স্ত্রীলোকদের নিরাপত্তা ছিল না, এদের অপহরণ করা হত, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হত, মেয়েদের অন্য সম্প্রদায়ের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত, হিন্দুদের প্রতিনিয়ত অপমান এবং নানাভাবে উৎপীড়ন করা হত। এমনকি কংগ্রেস নেতা জীবন রতন ধরও এথেকে রেহাই পাননি। সংক্ষেপে, পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের পক্ষে সসম্মানে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাদের ধর্মীয় জীবন বিপন্ন হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সরকার

মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া তেমন কোন সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবন নিরাপদ থাকলেও হিন্দুদের তা ছিল না। হিন্দুরা আশা করতে পারেনি যে সরকার তাদের সুরক্ষা দিতে অক্ষম হবে। সামাজিক, ধর্মীয় অর্থনৈতিক জীবন উৎপীড়িত হওয়া ছাড়া ক্রমশ তাদের জীবনে সন্ত্রাস নেমে আসে। তাদের চোখের সামনে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা, জিনিসপত্র লুণ্ঠন করা অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং আত্মরক্ষার তাগিদে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

১৯৪৬ খ্রীঃ থেকে ১৯৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত অভিপ্রয়ানের বিবরণ ঃ

অঞ্চলসমূহ যেখানে অভিপ্রয়ান ঘটেছিল	যে বছরগুলিতে অভিপ্রয়ান ঘটেছিল, তার সংখ্যা (শতকরা)						অভিপ্রয়ানের মোট সংখ্যা
	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	
ভারত	২.৩	১৮.২	১৯.২	১২.৮	৪৬.০	১.৫	১০০.০ (২৫৪৯৩৯০)
পূর্বভারত	২.৩	১৭.৭	১৯.২	১২.৯	৪৬.৪	১.৫	১০০.০ (২৫২৩১১৫)
পশ্চিমবঙ্গ	২.১	১৮.৩	২০.২	১৩.২	৪৪.৭	১.৫	১০০.০ (২০৭৬৩৩৮)

Kanti B. Pakrasi, *The Uprooted : A sociological study of the Refugees of West Bengal, India, Calcutta,* 1971, P. 25.

৬.৬.১২.২ : শরণার্থী আগমনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারী উদ্যোগ

দেশভাগের অব্যবহিত পর শরণার্থীদের ক্রমাগত আগমনের সমস্যা সমাধানে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোন উদ্যোগ নেয়নি এই আশা নিয়ে যে এই সমস্যা তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে এরা আবার নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবে। জওহরলাল নেহেরুকে লেখা একটি প্রতিবেদনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ পি.সি. ঘোষ জানান, 'The refugees would go back to their homes as soon as the situation calmed down to a bit'. কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়ায়, শরণার্থীদের আগমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। দুর্দশাগ্রস্ত শরণার্থীদের জন্য সরকারি ত্রাণ শিবির খোলা হয়। এই সব আগত শরণার্থীদের বিষয়ে মন্ত্রী নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি ১৯৪৮ খ্রীঃ ১৩ই মার্চ সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে বলেন, 'although the Goverment did not want that the minoritites in East Bengal should leave their hearths and homes – the Govt's desire not to accept the influx of refugees as a permanent phenomenon, but the Government could not wish it away either. So it was moved to take some temporary measures so that the situation might not get out of hand, for the number of refugees had already exceeded a million.' নেহেরু শরণার্থীদের আগমনের কারণ, তাদের সমস্যা বিষয়ে অবগত ছিলেন। শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ৮ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে রাজ্য সরকারকে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল, Inter-Dominion Conference-এর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন। সম্মেলন আহুত হয়েছিল, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের বিষয়ে ১৯৪৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ভারত-পাকিস্তান চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

৬.৬.১২.৩ : পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমনের প্রভাব

ভারত-পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সাময়িকভাবে শরণার্থীদের আগমনে ভাটা পড়লেও আবার তা বৃদ্ধি পায়। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তাদের পক্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৫০ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে কলকাতায় খবর পৌঁছোয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে নমশুদ্রদের উপর মুসলমানরা অত্যাচার করছে। এর পরেই শরণার্থীদের আগমন বৃদ্ধি পায়। রাজশাহী, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশালে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫০ খ্রীঃ শরণার্থীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এত লোকের সুবন্দোবস্ত করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই সব শরণার্থীদের শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হবে যারা প্রকৃতপক্ষে সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সরকারি শিবিরগুলিতে একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। এরা হল সেই সব শরণার্থী যাদের আশ্রয় খোঁজার মত বা জীবিকা নির্বাহ করার মত সম্পদ বা ইচ্ছা ছিল না। শরণার্থীদের মধ্যে যাদের সম্পদ না থাকলেও ইচ্ছা ছিল, তারা সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নেয়নি। এরা পরিত্যক্ত কোন বাড়ীতে বা সামরিক ছাউনিতে আশ্রয় নিয়ে পতিত জমি অবৈধভাবে অধিকার করেছিল। ১৯৪৮ খ্রীঃ বড় সংখ্যক শরণার্থী শিয়ালদহ স্টেশনে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করার পর যোধপুর ছাউনি, মহীশুর হাউস, শাহাপুর, দুর্গাপুর, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, ধর্মতলায় অবৈধভাবে আশ্রয় নেয়। এরা সরকারি ত্রাণ পেতে চায়নি, তবে সরকার তাদের বসবাস করার সুযোগ থেকে যাতে বঞ্চিত না করে, সে ব্যাপারে সরারি আনুকূল্য লাভ করতে সচেষ্ট ছিল। জোরপূর্বক বা বেআইনিভাবে জমি অধিগ্রহণ করে কলোনি গড়ে তুলেছিল। সরকার যাতে উচ্ছেদ করতে না পারে, সেজন্য তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সংগঠন The United Central Refugee Council গড়ে তোলে। একথা ঠিক যে শরণার্থীরা এক অর্থে বিদেশি ছিল না। বাংলাভাষী এবং একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, একই সংস্কৃতির ধারক বাহক হওয়ায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। কিন্তু জোরপূর্বক অভিপ্রয়াণের ঘটনার প্রভাব সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনের উপর পড়েছিল। শরণার্থীরা খুব সহজে গ্রহণীয় হয়নি। যে পরিবার, যে সমাজের মধ্যে, যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাদের বসবাস ছিল, জীবিকা অর্জনের যে উপায় ছিল, তা হারিয়ে নতুন পরিবেশে মানসিক অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। নতুন পরিবেশে, নতুন করে সামাজিক সম্পর্ক, জীবিকার সন্ধান, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা বাধা বিপত্তির সন্ধান করতে হয়েছিল। আগত শরণার্থীরা শুধুমাত্র ভৌগোলিক দিক থেকে নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকার, রুচি, আচার, ব্যবহার, সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শরণার্থীরা জীবিকার সন্ধানে কায়িক শ্রমকে বেছে নেওয়ায় বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কায়িক শ্রমের প্রতি বাঙালিদের বিমুখতা এর ফলে অনেকটা দূর হয়েছিল। শরণার্থীরা বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি চালানো, হকারের কাজে, কুটির শিল্পে, ছোট ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কুটির শিল্পে তাদের সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এইভাবে

আর্থিক স্বয়ম্ভরতার পাশাপাশি সামাজিক দিক থেকে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে শরণার্থীরা সচেষ্ট হয়েছিল, যে কাজ সহজ ছিল না।

৬.৬.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Anil Sinha : *Jabardakhal udbastu upanibesh*

2. M. N. Basu : *'A study of the Refugees', Man in India, Vol. 31, No.1*

3. Hiranamony Banerjee : *Udvastu* ('উদ্বাস্তু')

4. Kanti Pakrasi : *The uprooted.*

5. Amitabha Gupta : *Purba Pakistan.*

৬.৬.১২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ১৯৫০-এর দশকের অন্তিমলগ্নে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমনের কারণ বিশ্লেষণ কর। শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সরকারের ভূমিকা কি ছিল?

২। পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৭

Left Politics in Bengal

একক-১৩

(a) Impact of the Balshevik Revolution (1917)

(b) The Communist Party and the Trade Union Movement

বিন্যাস ক্রম

৬.৭.১৩.০ : উদ্দেশ্য

৬.৭.১৩.১ : বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব (১৯১৭)

৬.৭.১৩.২ : কমিউনিস্ট পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

৬.৭.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৭.১৩.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৭.১৩.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থের প্রথম এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) বাংলার রাজনীতিতে বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব।

(২) বাংলায় কম্যুনিস্ট আদর্শের প্রসার ও কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন।

(৩) বাংলায় কম্যুনিস্ট দলের কার্যকলাপ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন।

(৪) বাংলায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ধর্মঘট ও প্রতিবাদ।

(৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরযুগে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ।

৬.৭.১৩.১ : বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব (১৯১৭)

'পৃথিবীর সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের ভিত্তিতে বিপ্লবী রাশিয়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে।...সারা পৃথিবী ও রাশিয়ার কাছে ভারতের শৃঙ্খলমুক্তির অপরিসীম তাৎপর্যের কথা মনে রেখে, আমরা পেট্রোগাডের শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েতের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন প্যারিস শান্তি

সম্মেলনের মঞ্চে ও তার বাইরেও নৃংশস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ও ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে সাহসের সঙ্গে সোচ্চার হন...'

১৯১৭ সালের নভেম্বরে বলশেভিকদের কাছে প্রেরিত ভারতীয় বিপ্লবীদের তারবার্তায় এমন কথাই লেখা হয়েছিল। স্টকহোমে অবস্থিত ভারতের জাতীয় কমিটির তরফে এই বার্তায় নাম ছিল বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। এই বার্তাই প্রমাণ করে ১৯১৭র বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবীরা।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার বামপন্থী বলশেভিক বিপ্লবের বিরাট সাফল্য এদেশে বামপন্থার বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বামপন্থীদের এই সাফল্য ছিল সাম্যবাদের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রেরও সাফল্য। রুশ বিপ্লবে সাধারণ শ্রমিক কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবল পরাক্রান্ত জার সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। এই ঘটনা সারা পৃথিবীর পরিবর্তনকামী মানুষের মতো এই বাংলার মানুষের মধ্যেও এক প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছিল। বাংলার মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে যদি রাশিয়ার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জার সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে পারেন তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় জনগণও তা করতে পারে। এর ফলে এমন এক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে যেখানে একদল মানুষ আর একদল মানুষকে শোষণ করবে না।

১৯১৯-এ বাংলার বিশিষ্ট চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল লেখেন, 'আজ জার্মান সমরবাদের পরাজয়ের পর, জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর সারা পৃথিবীতে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে, জনগণের শক্তি। এই শক্তি নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্পত্তিবানদের ও তথাকথিত উচ্চশ্রেণী গুলোর দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত না হয়ে স্বাধীনভাবে সুখে বাস করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'। কাজেই বলা যায়, রুশ বিপ্লবের সদর্থক দিক বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল।

বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) হওয়ার পর বিকাশ ঘটে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের। নেতৃত্ব দেয় বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতি ঃ যুগান্তর দল, অনুশীলন সমিতি। ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ এর মধ্যে বাংলায় সাতচল্লিশটি সশস্ত্র বিপ্লবী ঘটনা ঘটে। বিপ্লবী ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিপ্লবীদের সম্পাদনায় প্রকাশিত আত্মশক্তি, সারথি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকা বিপ্লবী ভাবধারার প্রসার ঘটায়। এই সময় প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পথের দাবী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন বিপ্লবী আন্দোলনের কথা তুলে ধরা হয় অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। পরবর্তীকালে কোন কোন বিপ্লবী সাম্যবাদী আদর্শ বা কমিউনিজম দ্বারা প্রভাবিত হন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বিপ্লবীদের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব সম্বন্ধে গোড়া থেকেই সচেতন ছিল। ১৯২১ এর জানুয়ারীতে ভারতের বলশেভিক কার্যকলাপের একটি গোপন প্রতিবেদনে (সেসিল কে. জানু ১৯২১) বলা হয়, ''....বাংলাদেশের রায়ত সভা একেবারে বলশেভিকপন্থী। ১৯১৯-এ অমৃতসরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এরা যে খসড়া প্রস্তাব দিয়েছিল, তাতে বলা হয় যে—(ক) সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষকদেরই

জমির মালিক বলে ঘোষণা করতে হবে। (খ) কৃষকরা কর দেবে কিন্তু খাজনা দেবে না। (গ) যেসব প্রদেশে জমিদারি প্রথা চালু আছে, সেসব প্রদেশে আইন করে কৃষকদেরই জমির মালিক করে দিতে হবে। (ঘ) কৃষকের ওপর কর ধার্য করার জন্য উৎপন্ন ফসলকেই তার আয়ের ভিত্তি বলে গণ্য করতে হবে....” ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্যকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে কৃষকদের এই দাবি-দাওয়ার পেছনে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব রয়েছে।

১৯২২ এর ১২ ডিসেম্বর লিখিত ব্রিটিশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোপন প্রতিবেদনে (নম্বর ১০৩/৩, ডিসে ১৯২২) আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, ‘‘আগামী বছর গুলিতে ভারতে বিশেষত বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। পুরোন বাঙালি বিপ্লববাদীদের গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট প্রচারকদের পদ্ধতি মিশ্রিত হয়ে এই আন্দোলন দেখা দেবে। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে এই আন্দোলন হলেও, জনসাধারণ একে মোটের ওপর জাতীয় চেতনার অগ্রগতি বলেই ধরে নিয়েছে। অতএব জনসাধারণের সমর্থন থেকে যদি এই আন্দোলনকে আমরা বিচ্ছিন্ন করতে চাই, তবে সুকৌশলে প্রচার ও প্রমাণ করতে হবে যে এই নতুন আন্দোলনের পিছনে বিদেশী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের টাকা আছে।....” কমিউনিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ শাসক তাই ‘কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের টাকার’ তত্ত্ব সামনে এনেছিল।

এদিকে বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবে ভারতের কমিউনিস্টরা সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। ১৯২০ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হল ‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি’। প্রবাসে ১৯২০ র ১৭ অক্টোবর যে পার্টি গড়ে উঠল তার সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মহম্মদ সফিক। তবে ভারতের মাটিতে এই পার্টির কোন অস্তিত্ব ছিল না। ১৯২১ এ, তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত এই পার্টি লুপ্ত হয়ে যায়। ১৯২৫ এ কানপুরে গড়ে ওঠে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে মুজফফর আহমদ, সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘটে, নিম্বকার, কে. এন. যোগলেকর প্রমুখ যোগ দেন এবং নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

অসুস্থ শরীরে কানপুর থেকে কলকাতায় ফিরে, বাংলায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন মুজফফর আমেদ। তিনি বাংলার সমস্ত সাম্যবাদীকে কমিউনিস্ট পতাকার নিচে সমবেত হওয়ার আবেদন জানান (লাঙ্গল, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ১৯২৬)। তিনি লেখেন, ‘বাংলায় যাঁরা কমিউনিস্ট আছেন, তাঁরা সমবেত হয়ে পার্টি গঠন করুন—এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি তাঁদের জানাচ্ছি।’

কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হওয়ার আগে থেকেই কমিউনিস্ট আদর্শের প্রসার ঘটছিল বাংলায়। বাংলার একটি প্রগতিশীল সাপ্তাহিক ‘বিজলী’ পত্রিকায় ১৯২১ এর ১৭ জুন সংখ্যায় ‘রুশ বিপ্লবের দান’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয় ঃ ‘প্রথমে বিপ্লবের সুফলের কথা বলতে গেলে রুশ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে হয়। জারের রাজত্বে বারো আনা প্রজা নিরক্ষর ছিল। এখন রাশিয়ায় লেখাপড়া শিখছে আপামর জনসাধারণ। এই নতুন সার্বজনীন বিদ্যমান বিপ্লবেরই ফল।’

অসুস্থ শরীরে কানপুর থেকে কলকাতায় ফিরে, বাংলায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন মুজফফর আমেদ। তিনি বাংলার সমস্ত সাম্যবাদীকে কমিউনিস্ট পতাকার নিচে সমবেত হওয়ার

আবেদন জানান (লাঙ্গল, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ১৯২৬)। তিনি লেখেন, 'বাংলায় যাঁরা কমিউনিস্ট আছেন, তাঁরা সমবেত হয়ে পার্টি গঠন করুন—এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি তাঁদের জানাচ্ছি।'

কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হওয়ার আগে থেকেই কমিউনিস্ট আদর্শের প্রসার ঘটেছিল বাংলায়। বাংলার একটি প্রগতিশীল সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় ১৯২১ এর ১৭ জুন সংখ্যায় 'রুশ বিপ্লবের দান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয় ঃ 'প্রথমে বিপ্লবের সুফলের কথা বলতে গেলে রুশ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে হয়। জারের রাজত্বে বারো আনা প্রজা নিরক্ষর ছিল। এখন রাশিয়ায় লেখাপড়া শিখছে আপামর জনসাধারণ। এই নতুন সার্বজনীন বিদ্যাদান বিপ্লবেরই ফল।'

পরের বছর ১৯২২ এর ২২ নভেম্বর 'আত্মশক্তি' নামে আর একটি প্রগতিশীল বাংলা সাপ্তাহিকে রুশ বিপ্লবের প্রশংসা করে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। 'অনন্তানন্দের পত্র' শিরোনামে 'অনন্তানন্দ' নামের আড়ালে এই চিঠিটা লিখেছিলেন বিশিষ্ট বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চিঠিতে তিনি লেখেন, ''দুঃখের চাপের পেটের জ্বালায় সাধারণ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা সর্বত্রই তারা বর্তমান শাসন কর্তাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে শাসনতন্ত্রটা অধিকার করবার চেষ্টা করছে। রাশিয়ার অপরাধ এই যে, সে কার্যটা তারা সকলের আগে করে ফেলেছে। তাই ইউরোপের মোড়লের দল চারিদিক থেকে চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। আর তাদের দেখাদেখি আমরাও সেই চিৎকারে যোগ দিয়েছি। বলশেভিজম বলে এটাকে উড়িয়ে দিলে এটার ওপর অবিচার করা হবে। এটা খাঁটি এদেশের আদর্শ। তোমরা ইংরেজের পুঁথি পড়ে যে স্বরাজের আদর্শ আমদানী করেছো, সেটা ইউরোপের পচা ডিমোক্র্যাসী। ইউরোপের অঙ্গ থেকেই তা খসে পড়তে আরম্ভ করেছে।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনও রাশিয়ায় যাননি। রুশ বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা তিনিও প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'সংহতি' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সংখ্যায় (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি লেখেন, 'দাসের দল ভেবেছিল যারা তাদের চালাচ্ছিল তারাই চালাক, অতএব কাঁধ পেতে দিতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেছে যে তারা না চালালে উপরওয়ালারাও অচল, তারা অত্যাবশ্যক—অতএব বর্তমান ঐশ্বর্য তাদেরই হাতে, এই আবিষ্কারের জোরে বর্তমান সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধঝাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। আর ওপরে যারা বসে আছে, তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে।'

বাংলায় বামপন্থী ভাবধারার এই বিকাশের খবর ব্রিটিশ গোয়েন্দারাও রাখছিল ১৯২৩ এর ১৭ মে লণ্ডনে ভারত সচিবের কাছে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিবের গোপন প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'সাধারণভাবে বলতে গেলে রুশ বিপ্লবের সপক্ষে ভারতে প্রচার হু হু করে বাড়ছে।'

বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবে শুধু যে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হল তাই নয়; অন্য গোষ্ঠী ও দলও গড়ে উঠতে লাগল। ১৯২৫ এর শেষের দিকে বাংলার বগুড়ায় নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মিলনীর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন প্রগতিপন্থী জাতীয়তাবাদীরা। এই সম্মেলন থেকে একটি নতুন রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করে; দলটি হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দল'। এই 'শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দল'—এর সভাপতি হল বিশিষ্ট সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সহ-সভাপতি হন অতুল চন্দ্র গুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক

হন হেমন্ত কুমার সরকার। দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র হয় 'লাঙ্গল' যার প্রধান পরিচালক হন কবি নজরুল ইসলাম। এই নতুন দলের কর্মসূচীতে লেখা হয় ঃ 'নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্যলাভই এই দলের উদ্দেশ্য-নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগই উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হইবে।'

যেটা লক্ষ্যনীয় তা হ'ল এই দলের লক্ষ্য হিসেবে শুধু দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই বলা হল না। পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সেই স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হল 'রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য'-কে, ঠিক হ'ল এই দলের প্রত্যেক সদস্যকে জাতীয় কংগ্রেসেরও সদস্য হতে হবে। বলা হল, এই দল শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য লড়বে এবং জাতীয় কার্যে নিযুক্ত অন্যান্য দলের সঙ্গে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করে চলবে।

দলের মুখপত্র হিসেবে 'লাঙ্গল' বামপন্থী বিপ্লবী ভাবধারা বিকাশে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে শুরু করল। লাঙ্গল-এর দ্বিতীয় সংখ্যাতে (১৯২৫-এর ২৩ ডিসেম্বর) প্রকাশিত হল নজরুলের লেখা; 'ওঠরে চাষী, জগৎবাসী, ধর কষে লাঙ্গল।' এর আগে প্রথম সংখ্যাতেই অবশ্য ছাপা হয় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী'; এই সংখ্যার পাঁচ হাজার কপি অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায়। 'লাঙ্গল' এর সঙ্গে যে কমিউনিস্ট ভাবধারার সম্পর্ক যথেষ্ট নিবিড় ছিল তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় দেবব্রত বসুর লেখা কার্ল মার্কস সম্বন্ধীয় নিবন্ধ, তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় নজরুলের 'সব্যসাচী'; চতুর্থ সংখ্যায় মুজফফর আমেদ লেখেন, 'ভারত কেন স্বাধীন নয়?' লাঙ্গল পত্রিকায় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯২৬ সালে 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল' এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগরে (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬)। এই সম্মেলনে সভাপতি এবং সম্পাদক পদে পুনর্বহাল থাকেন যথাক্রমে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং হেমন্তকুমার সরকার। সহ-সভাপতি হন অতুল চন্দ্র গুপ্ত এবং সামসুদ্দিন। সংগঠনে প্রবেশ করেন মুজফফর আমেদ এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সম্মেলনেই কমিউনিস্টদের প্রস্তাব অনুযায়ী, বহু তর্ক-বিতর্কের পরে, দলের নতুন নাম হয় 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'। এর কিছুদিনের মধ্যে দলের নামে আবার বদল হয়; এবার নাম হয় 'বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল'। অর্থাৎ মূল জোরটা পড়ে শ্রমিকের ওপর। দলের মুখপত্রের নাম বদলে হয় 'গণবাণী'; সম্পাদক হন মুজফফর আমেদ। আন্দোলনের ওপর কমিউনিস্ট প্রভাব বাড়তে থাকে। শ্রমিকশ্রেণীর ওপর এই গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

৬.৭.১৩.২ : কমিউনিস্ট পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতে শিল্পের বিকাশ ঘটার ফলে এদেশে শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান হয়। তবে এই সময়ে ধনতন্ত্রের অত্যন্ত সীমিত বিকাশ হওয়ায় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। স্বভাবতই এই অবস্থায় সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ভারতে ধনতন্ত্রের প্রথম বিকাশ ঘটেছিল তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে; বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে। স্বভাবতই এই তিনটি শহরে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। সেজন্য এই তিন

জায়গাতে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। যেহেতু এই পত্রটি বাংলার ইতিহাস সম্পর্কিত তাই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে বাংলার মধ্যেই।

ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা ঘটে ১৯২০ সালে। ১৯২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরের এম্পায়ার থিয়েটার হলে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (A.I.T.U.C) বা নিখিল ভারত শ্রমিক সংঘর প্রতিষ্ঠা হয়। এই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিন হন লালা লাজপত রায়। এই ঘটনার পর বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠতে থাকে। এই সময় বাংলার চটকলে মজুরদের ধর্মঘট পরিচালনার জন্য 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়।

বাংলায় এই সময় অনেক ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল। এই ধর্মঘটগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ বর্ধমানের কুলটিতে বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কসে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে দশ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট; ঘুসুরী, নিউ সেন্ট্রাল, গ্যাঞ্জেস, ফোর্ট উইলিয়াম এবং হাওড়ার জুট মিলগুলোর সাতাশ হাজার শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য দাবিতে ধর্মঘট; হাওড়ার প্যারী অ্যাণ্ড কোং এবং কলকাতায় গ্রাহাম অ্যাণ্ড কোম্পানিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট। এছাড়াও কলকাতায় রাজমিস্ত্রী, ট্যাক্সিচালক এবং রিক্সাচালকদের ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় অবস্থিত ভারত সরকারের ছাপাখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। শ্রমিকদের দাবি ছিল বেতন ও চাকুরির শর্তাবলীর আপত্তিকর সংশোধন বাতিল করা। ধর্মঘট কলকাতা থেকে দিল্লী ও সিমলার সরকারী ছাপাখানাতেও বিস্তার লাভ করে। ১৯২০ সালের শেষার্ধে শুধুমাত্র বাংলাতেই ১১৯টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধর্মঘটগুলোতে সামিল শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ২,১১,৪৭৮ জন।

এত ধর্মঘট সংঘটিত হলেও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন তখনও শুরু হয়নি। এই ধর্মঘটগুলো পরিচালনা করতে স্ট্রাইক কমিটি যেগুলো হ'ত অস্থায়ী ধরনের। আশু সংগ্রামের প্রয়োজনে এগুলো গঠিত হত, ফলে এদের স্থায়িত্ব থাকত না। তবে বাংলায় কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু ১৯২০-এর মধ্যে গঠিত হয়েছিল। তারা ১৯২০ তে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত A.I.T.U.C সম্মেলনে যোগও দিয়েছিল। বাংলা থেকে এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল ক্যালকাটা পোস্টার ক্লাব, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সীমেন্ত ইউনিয়ন, প্রেসমেনস্ ইউনিয়ন ইত্যাদি। এই সময়ে বাংলা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নও গড়ে উঠল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ বি.এন.রেলওয়ে ইউনিয়ন, লেবার ইউনিয়ন (১৯২০), অল ইণ্ডিয়া পোস্ট অ্যাণ্ড আর এম এস ইউনিয়ন (১৯২০), দি ইম্পোরিয়াল ব্যাঙ্ক স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (১৯২০), হাওড়া লেবার ইউনিয়ন (১৯২০), ই বি রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯২০), বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন (১৯২০)।

মনে রাখতে হবে তখনও এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়নি। কাজেই সেই সময়কার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা পালনের প্রশ্ন ওঠে না। তবে এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব অবশ্যই উপস্থিত ছিল। এই সময় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে একটা আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসেবেই বিবেচনা করত। সরকার মালিকের পক্ষেই কাজ করত। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এনকোয়ারি কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি এই মত প্রকাশ করে যে শ্রমিক-মালিক উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার অনুকূল পরিবেশ থাকলে এবং আলোচনার কোন পদ্ধতি চালু থাকলে বাংলার অনেক শ্রম সংক্রান্ত

বিরোধই গুরুতর আকার ধারণ করত না। গুরুতর হয়ে ওঠার আগেই সেই সমস্যার মীমাংসা করা যেত। এই কমিটি সুপারিশ করে, ইংলণ্ডের হুইটলি কমিটির অনুকরণে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিতে ওয়ার্কাস কমিটি গঠন করা হোক এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'কনসিলিয়েশন বোর্ড স্থাপন করা হোক। তবে শেষ অবধি অবশ্য এই সুপারিশ আদৌ কার্যকর হয়নি; 'ওয়ার্কাস কমিটি' বা 'কনসিলিয়েশন বোর্ড কোনটাই স্থাপিত হয়নি।

১৯২১-২২ এ বাংলার শ্রমিক আন্দোলন যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। একটি হিসেব থেকে জানা যায়, ১৯২১ এ ৩৬৯ টি ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে অধিকাংশ ধর্মঘট তার দাবি আদায় করতেও সমর্থ হয়েছিল। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্মঘট হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হ'ল চটকল, চা-বাগান এবং রেলপথ। আবার একটা ক্ষেত্রের ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে অন্য ক্ষেত্রর শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে, এমন নির্দেশও মেলে। যেমন এই সময়ে চা-বাগানের মজুরদের ধর্মঘটের সমর্থনে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিকরা সহমর্মী হয়ে ধর্মঘট পালন করেছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের শ্রমিকরা একটি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করেন। এই ধর্মঘটের ফলে ই. আই. রেল দেড় মাস ধরে অচল হয়ে যায়। ১৯২৫-২৬ সালে রেল লাইন ও রেলের কারখানায় দেশ জুড়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয়। এর মধ্যে বাংলার খড়গপুরের ধর্মঘট পালিত হয়েছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কারখানায়। খড়গপুরের ধর্মঘট অনেকদিন ধরে চলেছিল। রেল কর্তৃপক্ষ 'অক্সিলিয়ারী পুলিশ' বাহিনীর সাহায্যে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। ধর্মঘটীদের ওপর গুলি চালানো হয়। খড়গপুরের এই ধর্মঘটের জের চলেছিল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার চটকলগুলোতে আবার ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯২৫-২৬ সালের এই ধর্মঘটগুলো আগেকার ধর্মঘটের চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত ছিল। এই ধর্মঘটগুলো শ্রমিকশ্রেণীর উন্নত রাজনৈতিক চেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

১৯২০ র দশকের মাঝামাঝি এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল অত্যন্ত আলোড়নপূর্ণ। ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলস্রোত আবর্তিত হচ্ছিল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ মিলে গড়ে তোলেন স্বরাজ্য দল। পাশাপাশি এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা ঘটে। বেশ কয়েকটি বামপন্থী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রবাসে এবং দেশে ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাজকর্ম এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ, ব্রিটিশ শাসককে ভীত করে তোলে। ব্রিটিশ শাসক এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফফর আমেদ, শওকত উসমানি, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ও সংগঠককে ভারতে বলশেভিকবাদ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে; শুরু হয় 'কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯২৪)। বন্দী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ভারতে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ পরিচালনা করা এবং শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করার অভিযোগ আনা হয়। সরকার কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য এই ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করলেও এর ফল হল বিপরীত। উল্টে বামপন্থী গোষ্ঠীগুলো সংগঠিত হতে থাকে। এই মামলা এদেশে ভারতে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রসারেই সহায়তা করে। রজনী পাম দত্তের মতে, 'এটা হয়েছিল ভারতের রাজনৈতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম দীক্ষা'।

এরপর বাংলায় গড়ে ওঠে শ্রমিক কৃষক দল (ওয়ার্কাস অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি)। এই ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি প্রথম বাংলায় গড়ে উঠল ১৯২৫ সালের নভেম্বরে। অবশ্য 'বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল' নামটা

হয় ১৯২৬ সালে। পরে অন্য প্রদেশেও এইরকম দল গড়ে ওঠার পরে ১৯২৮ এর ডিসেম্বরে কলকাতায় এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে গঠিত হয় 'অল ইণ্ডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি'। এর সর্বভারতীয় সভাপতি এবং সম্পাদক হন যথাক্রমে পাঞ্জাবের সোহন সিং যোশ এবং বোম্বের আর. এস. নিম্বকর। বাংলার প্রাদেশিক পার্টির সম্পাদক আগের মতই থাকেন মুজফফর আমেদ। এই সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা এই ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির মধ্যে থেকেই শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী আন্দোলনেও ট্রেড ইউনিয়ন গুরুত্ব পাচ্ছিল। ১৯২৪ সালের মার্চে কলকাতায় যে A.I.T.U.C র চতুর্থ অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে জনসাধারণকে সক্রিয় হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্বে করেন চিত্তরঞ্জন দাশ সম্মেলন সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা নেন শ্রমিকনেত্রী সন্তোষ কুমারী গুপ্তা। এরপর ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি খড়গপুরে A.I.T.U.C-র একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভেতর দিয়ে একটি স্বাধীন শক্তি হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনকে যারা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাদের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। নবীনদের চেষ্টার ফলে A.I.T.U.C এই সময়ে ঘোষণা করে সাধারণ ধর্মঘট হল কংগ্রেসের অন্যতম নীতি।

তবে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব তখনও ছিল সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদীদের হাতে। কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ও কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেও শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব তখনও কমিউনিস্ট পার্টির হাতে আসেনি। সংস্কারপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্ম সীমিত ছিল সরকারের কাছে, আইন তৈরি করা এবং অনুসন্ধানের আবেদন, নিবেদন করার মধ্যে। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে ১৯২৭ সালে নাগপুরে A.I.T.U.C. যে নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল তা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত রাজনৈতিক কর্মসূচী থেকে মূলগতভাবে পৃথক ছিল। এখানে যে রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছিল তা হ'ল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে শ্রমিক-কৃষকের গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের সদস্যরা ভারতে আসেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করা এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ভারতের যোগ্যতা পর্যালোচনা করা। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮, যেদিন কমিশনের সদস্যরা বোম্বাইতে অবতরণ করেন, সেদিন কংগ্রেস সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। সাইমন কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে বয়কটের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে A.I.T.U.C। ওয়ার্কাস অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি ইস্তাহার প্রকাশ করে জানায়, রাজকীয় কমিশনের প্রতি তাদের কোন মোহ নেই। তারা মনে করে, জাতির মূল শক্তিকে সংগ্রামের ময়দানে সামিল করে সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকদের সক্রিয় সংগ্রামের দ্বারাই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। ৩ ফেব্রুয়ারি দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকরা ব্যাপক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সেদিন যে ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ মেলে সেই সময়কার বামপন্থী পত্রিকা 'ফরোয়ার্ড' এর প্রতিবেদনে। ঐদিনের ধর্মঘটের আগে তার প্রস্তুতি বিষয়ক প্রতিবেদনে লেখা

হয়, ''খড়দহ থেকে কাঁচরাপাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বুধবার যে শ্রমিক সমাবেশ হয়েছিল তাতে হরতালের আহ্বান বেশ সাড়া জাগায়। মৃণালকান্তি ঘোষ, কিশোরীলাল ঘোষ, হাকিম সর্দার রহমান, শিবনাথ ব্যানার্জী এবং বঙ্কিম মুখার্জী বহু শ্রমিকসভা সম্বোধন করেন এবং দোকানদারদের দোকান বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানান এবং শ্রমিকদের আহ্বান দেন হরতালের দিন কাজ থেকে বিরত হবার জন্য।...বজবজ থেকে কাশীপুর পর্যন্ত সমস্ত ট্রাফিক স্টাফ ধর্মঘটে সামিল হয়ে।...৩রা চিৎপুরের চটকলগুলি বন্ধ থাকবে।...ট্রাম চালানোর জন্যা ট্রামওয়ে কোম্পানি সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম কন্ডাক্টর ও ড্রাইভারদের ডিপোতে আটকে রাখছে... নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কাজে অনুপস্থিত হলে কর্মচারীদের সরাসরি বরখাস্ত করা হবে। কর্মচারীদের ভীত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হচ্ছে।''

শেষ অবধি সমস্ত ভয়কে অগ্রাহ্য করে ট্রাম শ্রমিকরা ধর্মঘটে যোগ দেন। কোম্পানি শ্রমিকদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। অনেক শ্রমিক বরখাস্তের সম্মুখীন হন। ট্রাম কোম্পানি বাঙালি এবং অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার মরিয়া চেষ্টাও করেছিল। বাংলায় ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ এর এই সাইমন কমিশন বিরোধী ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। কালো পতাকা নিয়ে, হাতে লাল ব্যাজ পরে এবং 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'আট ঘণ্টার কাজ', 'বাঁচবার মত বেতন' এবং 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' জাতীয় স্লোগান দিতে দিতে শ্রমিকদের এই মিছিলগুলো এক নতুন রাজনৈতিক ধারার উত্থানকে নির্দেশ করে।

১৯২৮ সালে লিলুয়ায় রেল শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। লিলুয়ার ধর্মঘটী শ্রমিকদের দৃঢ়তা তখনকার বিপ্লবী মনে কী গভীর রেখাপাত করেছিল তার পরিচয় মেলে ঐ সময়কার কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেনের লেখায় (বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, পৃষ্ঠা ২২) ঃ ''লিলুয়া শ্রমিক ধর্মঘট দেশকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দেয়। কলকাতা সেই প্রথম মিছিলের শহর হয়ে দাঁড়ায়। আগে পিছে সশস্ত্র পুলিশের ব্যূহের মধ্যে সহস্র সহস্র লিলুয়া শ্রমিকদের বিরাট মিছিল, হাজার হাজার হরতালি শ্রমিকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুধু শহরকেই কাঁপায়নি, আমাদের তরুণ মনকেও অনুপ্রাণিত করেছে।''

১৯২৮ এর ১০ জুলাই লিলুয়ার রেল ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। ছ'মাসের বেশি সময় ধরে চলা রেল শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ছিল যেমন ঐক্যবদ্ধ, তেমনই বিস্তৃত ও রক্তাক্ত। মোট ১৬,৩১৫ জন রেল শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন; লিলুয়ায় ১১,২৯৬ জন, হাওড়াতে ২০০৩ জন, আসানসোল ১৫৩০ জন, অণ্ডালে ৫৯৬ জন আর বাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এই ধর্মঘট শুধু যে কমিউনিস্টরা পরিচালনা করেছিল তা নয়। বরং বলা যায় বামপন্থী জাতীয়াতাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের যৌথ নেতৃত্বে এই আন্দোলন হয়েছিল। তবে লাল ঝাণ্ডা হাতে এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকরা 'মস্কোর চর' নামেই অভিহিত করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, 'ভারতের শিল্পাঞ্চলে যে মস্কোর প্রতিনিধিরা কাজ করছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের সমস্ত নেতারাই প্রকাশ্য কমিউনিস্ট। মস্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।'

কয়েক বছর পর, লিলুয়ার আন্দোলনের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা ধরণী গোস্বামী বলেন, লিলুয়া ধর্মঘটের আশু দাবিগুলি পূর্ণ হয়নি। সেই অর্থে ধর্মঘটটি ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শ্রমিকশ্রেণী যে

সচেতনতা ও সংগ্রামী সৌহার্য্য দেখিয়েছিল তার মূল্য অপরিসীম। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ফিলিপ স্প্র্যাট এর কণ্ঠেও শোনা গিয়েছিল একই সুর। তাঁর মন্তব্য ছিল ঃ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে লিলুয়ার ধর্মঘট ভয়ানক রকম হেরে গেঠে। বহু শত শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, বহু মাস হাজার হাজার শ্রমজীবী ধর্মঘটী পরিবার আধপেটা খেয়ে আছে, বহু শ্রমিকেরা মাথা ফেটেছে লাঠির আঘাতে। কিন্তু তা নিয়ে অশ্রুবর্ষণ বিপ্লবীর কাজ নয়। ইউনিয়নকে আবার মজবুত করতে হবে, হতাশার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। লিলুয়ার ধর্মঘটের মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্প্র্যাট, লেনিনের বক্তব্য স্মরণ করেছেন। লেনিন একবার বলেছিলেন যে বুর্জোয়াদের বিপ্লবের থেকে স্বতন্ত্র সর্বহারাদের বিপ্লব। তারা পরাজয়ের পর পরাজয়কে সিঁড়ির মত গেঁথে এগিয়ে চলে চূড়ান্ত জয়ের দিকে। লেনিনের এই কথা আমাদের চেতনাতে যেন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। স্প্র্যাটের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কিভাবে এইসময় বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করত।

১৯২৮ সালে বাংলায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল হাওড়ার বাউড়িয়ায়। সেখানকার ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিলে চলেছিল দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক ধর্মঘট। এখানে, ১৫,০০০ শ্রমিক দীর্ঘ ছ'মাস করে ধর্মঘট করেছিলেন। শেষ অবধি ব্রিটিশ মালিক প্রবল দমন-পীড়ন চালিয়ে ধর্মঘট ভেঙে দেয়। কংগ্রেস নেতা জহরলাল নেহরু ধর্মঘট চলার সময় বাউড়িয়ায় এসে ধর্মঘটের সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর কলকাতার পার্ক-সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করুক-এই দাবিতে শ্রমিকদের একটি বিরাট মিছিল সংগঠিত হয়েছিল। মুজফফর আমেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ কমিউনিস্ট এবং বামপন্থীদের নেতৃত্বে কলকাতা, হাওড়া এবং নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চল থেকে তিরিশ হাজারেরও বেশি শ্রমিকের এক বিশাল মিছিল কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পার্কসার্কাসে কংগ্রেসের অধিবেশন মণ্ডপের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। মিছিলের স্লোগান ছিল ঃ 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'শৃঙ্খল ছাড়া আমাদের হারাবার কিছু নেই', 'ভারতের স্বাধীন রিপাবলিক দীর্ঘজীবী হোক' ইত্যাদি, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের বাধাকে অতিক্রম করে শ্রমিকরা দল বেঁধে কংগ্রেস মণ্ডপে প্রবেশ করে সভা-সংগঠিত করেন। জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে এই সভা একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি হল ঃ 'সমস্ত শিল্পের শ্রমিক ও কৃষকদের এই সভা ঘোষণ করেছে যে আমরা শ্রমিক ও কৃষকরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না...জাতীয় কংগ্রেসের কাছে আমরা আহ্বান জানাই, এই লক্ষ্য সাধনের জন্য জাতীয় শক্তিসমূহকে সংগঠিত করা হোক্।'

১৯২৯ সালের জুলাই মাসে বাংলায় চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, কালী সেন, আব্দুল মোমিন, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, আব্দুল হালিম, অব্দুর রেজ্জাক খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই ধর্মঘট পরিচালনা করে। এটাই ছিল চটকল শ্রমিকদের প্রথম সংগঠিত সাধারণ ধর্মঘট। সাম্রাজ্যবাদীদের মালিকানাধীন বাংলার চটকলগুলোতে শ্রমিকদের উপর তৎকালীন শোষণ ও নির্যাতন সম্পর্কে 'গণবাণী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ 'ইউরোপীয় মালিকরা চটকল শ্রমিকদের উপর যে নির্যাতন চালাত তার খতিয়ান তৈরি করলে অতীতের ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারও তার তুলনায় ম্লান হয়ে যায়।'

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, কলকাতায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে শ্রমিকদের বিশাল মিছিল এবং বিভিন্ন জমি আন্দোলনে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে তোলে। তারা শ্রমিক আন্দোলন এবং ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট আন্দোলন দমন করবার জন্য ১৯২৯ সালে শ্রমিক নেতা এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। ১৯২৯ এর ২৯ মার্চ, ৩১ জন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলা থেকে গ্রেপ্তার হন মুজফফর আমেদ, কিশোরীলাল ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখার্জী, রাধারমণ মিত্র, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, শামসুল হুদা, শিবনাথ ব্যানার্জী। এই মামলা মানুষের মধ্যে আলোড়ন তোলে। বিচারে বিভিন্ন বন্দীর বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। তবে আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার সাজা কমাতেও বাধ্য হয়।

১৯৩০ এর দশকেও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৩১ সালের শেষদিকে কলকাতায় ও পাশ্ববর্তী হাওড়া জেলা সহ অন্যান্য জেলার শিল্পাঞ্চলের চটকলগুলোতে চটার লক্ষ শ্রমিক এক-ধর্মঘটে সামিল হন। এর নেতৃত্বে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল মোমিনসহ কমিউনিস্ট নেতারা। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ছিল ঃ বেঙ্গল জুট ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, ইস্টবেঙ্গল অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (প্রধান নেতা ঃ সোমনাথছ লাহিড়ী), ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (প্রধান নেতা ঃ মহম্মদ ইসমাইল), বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সিটি মোটর অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বেঙ্গল ম্যাচ ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মেটিয়াবুরুজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কেশোরাম কটন মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা মারফৎ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করতে না পেরে ১৯৩৪ এর ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমস্ত শাখা সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করে। এরপর ১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন বাংলা সরকার একটি গেজেড নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের তেরোটি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে। এরপর সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'বেআইনী' কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা গোপনে শ্রমিকদের সংগঠিক করে আন্দোলন ও ধর্মঘটের পথে টেনে আনার কাজ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৯-এর নভেম্বর এভং ১৯৩১-এর জুলাই মাসে A.I.T.U.C তে দু'বার ভাঙ্গন দেখা দেয়। এই সময় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। ফলে জিনিসের দাম বাড়ছিল, শ্রমিক ছাঁটাইও হচ্ছিল। এই অবস্থায় এদেশে অনেক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়ে যার মধ্যে প্রধান ছিল ১৯৩৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মে পর্যন্ত ৭৪ দিন ব্যাপী বাংলার চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট, এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন ২,২৫,০০০ জন শ্রমিক। এই সময় বাংলায় মোট ১৬৬ টি ধর্মঘট হয়েছিল। এতে মোট ৬০,৯০,৮৮৩ টি শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। ঐ সময় ভারতে যত ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল তার শতকরা ৬১.৭৪ ভাগই হয়েছিল বাংলায়, এই ধর্মঘটগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন বাংলার ৩,৬৫,৬৯৯ জন শ্রমিক। এইসব ধর্মঘটের দাবির মধ্যে ছিল ঃ ইউনিয়নের স্বীকৃতি, কাটা বেতন পুনরুদ্ধার, চাকুরির নিরাপত্তা অর্জন করা, শ্রমিকদের পুনর্বহাল করা এবং দমনপীড়ন বন্ধ করা। ধর্মঘটের সর্মথনে বাংলার মানুষ এগিয়ে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার অ্যালবার্ট হলে, এখনকার কলেজ

স্ট্রীট কফি হাউসে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এক জনসভার আয়োজন করে। সেখানে সরকারি দমননীতির নিন্দা করা হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এই ধর্মঘটের সমর্থনে, দমননীতির নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। বাংলার ছাত্ররা এই ধর্মঘটের সমর্থনে অর্থ সংগ্রহ করে। এই ধর্মঘট পরিচালনায় কমিউনিস্টরা বিশেষ যত্নবান ছিলেন, অকমিউনিস্টরাও ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সময়কার নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুজফফর আমেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শিবনাথ ব্যানার্জী, দয়ারাম বেরী, এম এ জাহান প্রমুখ।

এরপরেও একের পর এক শ্রমিক ধর্মঘট হতে থাকে। ১৯৩৯ এ হয় বাটার শ্রমিকদের ধর্মঘট; ১৯৩৯-৪০ এ হয় ঢাকা জেলার নারায়নগঞ্জের মিলের ধর্মঘট। ১৯৪০ সালে বাংলার বিভিন্ন চটকলে ধর্মঘট হয়; শ্রমিকদের দশ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি হয়। ১৯৪০-এর মে মাসে মহার্ঘভাতার দাবিতে কলকাতা কর্পোরেশনের কুড়ি হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেন। ১৯৪১ এ জুতো প্রস্তুতকারকরা ধর্মঘট করেন (যারা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় দু'হাজার)। ঐ বছরই ইলেকট্রিক স্টীল ওয়ার্কস-এর ১৬০০ শ্রমিক বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট করেন। ১৯৪২ সালে কলকাতায় প্রায় দু'হাজার ট্রামশ্রমিক মহার্ঘভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেন। এ ছাড়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহার্ঘভাতা এবং ন্যায্য দরে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার দাবিতে পোর্ট কমিশনার্সের ২০০০ শ্রমিক এবং কলকাতা করপোরেশনের ৮০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট। সামগ্রিকভাবে বলা যায়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত হাওড়া, কলকাতা, হুগলী এবং ২৪ পরগণার মহার্ঘভাতা এবং যুদ্ধভাতার দাবিতে বহু ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) শুরু হয়ে যায়। সারা বিশ্বের সঙ্গে এই বাংলাতেই এই সময় ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। শ্রমিক আন্দোলনের ওপর সরকারী দমনপীড়নও চলতে থাকে। পরে অবশ্য রাশিয়া, ফ্যাসিবাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় বিশ্বযুদ্ধ 'জনযুদ্ধ'-এ রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় (১৯৪২)।

বাংলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণবিদ্রোহেও শ্রমিক শ্রেণী বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই গণবিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ এর ২১ নভেম্বর। মুখ্য ভূমিকা নেন ছাত্ররা। আন্দোলনে গুলি চলে। শহীদ হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা রাত ধরে ধর্মতলা স্ট্রীটে চলে অবস্থান ধর্মঘট। এই ছাত্র সংগ্রামের সমর্থনে ২২ নভেম্বর শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। ট্রাম শ্রমিকদের মেসে ও বাসের ডিপোটে ধর্মঘট করাতে নেতৃত্ব দেন মহম্মদ ইসমাইল। মেটিয়াবুরুজের শ্রমিকরাও ধর্মঘট করেন। ঐদিন শ্রমিকরা মিছিল করে যান ধর্মতলা স্ট্রীটের দিকে। তাদের মুখে ছিল রণধ্বনি ঃ 'জয়হিন্দ' আর 'আংরেজ তুম ভারত ছোড়ো'। ঐ সময়কার ছাত্রনেতা এবং পরবর্তী কালের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণী থেকে জানা যায় ঃ 'নাড়ীতে নাড়ীতে সেদিন নতুীন অনুভূতি—স্বাধীনতা প্রায় আমাদের মুঠোর মধ্যে, আমাদের শক্তি ঃ সবদল, সব মানুষের সংগ্রামী ঐক্য। আমাদের এগোবার পথ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। পথ দেখাল কারা? কলকাতার ছাত্র নওজোয়ান শ্রমিকরা।'

এরপর ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী ক্যাপ্টেন রশিদ আলির বিচার শুরু হয়। তার প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘট হয়। ১২ ফেব্রুয়ার কলকাতায় পালিত হয় রশিদ আলি দিবস। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুই শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল এবং সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। ট্রাম, বাস ও রিক্সা শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট করেন। নৈহাটি থেকে বজবজ পর্যন্ত অঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হন।

এরপর দেশ জুড়ে শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়। ১১ জুলাই সারা ভারতে ধর্মঘট শুরু হয়। বাংলায় '৪৬ এর ২৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। শ্রমিকদের বিশাল সমাবেশ হয় ধর্মতলায় মনুমেন্টের তলায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা বক্তৃতা করেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে দেশজোড়া সংগ্রামের উত্তাল সময়ে শ্রমিকরা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। নিজেদের পেশাগত দাবি, স্বাধীনতার লড়াই, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আন্দোলনে শ্রমিকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আর শ্রমিকদের এই লড়াইতে সবসময়ই সঙ্গে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি যাদের প্রভাবে বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এক অনন্য মাত্রা লাভ করেছিল।

৬.৭.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঃ Communism and Bengal's Freedom Movement, Vol 2, New Delhi 1970.

২। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, কলকাতা, ২০০১।

৩। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঃ রুশ বিপ্লব ও ভারতের মুক্তি আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৯২।

৪। নরহরি কবিরাজ ঃ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, কলকাতা, ১৯৬২ (বর্ধিত সংস্করণ)।

৫। অমিতাভ রুদ্র ঃ অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ সূচনা পর্ব, কলকাতা, ১৯৯২।

৬। মুজফফর আমেদ ঃ আমার জীবন ও কমিউনিস্ট পার্টি, কলকাতা, ১৯৬৯।

৭। নির্বাণ বসু ঃ The Political Parties and the Labour Politics, 1937-47 with special reference to Bengal, Calcutta, 1992.

৮। অমল দাস ঃ Urban Poltics in an Industrial Area–A study of Municipal and Labour Politics in Howrah. 1850-1928, Calcutta, 1994.

৯। নির্বাণ বসু (সম্পাদিত) ঃ বাংলার শ্রমিকচর্চা সংক্রান্ত রচনাপঞ্জী, কলকাতা, তারিখ অনুল্লেখিত।

১০। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় - রাখী চট্টোপাধ্যায় ঃ বাংলার মুক্তি-সন্ধানী, কলকাতা, ২০০৫।

১১। দীপেশ চক্রবর্তী ঃ Rethinking Working Class History; Bengal, 1980-1940, Princeton, 1989.

১২। রণেন সেন ঃ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, ১৯৩০-৪৮, কলকাতা, ১৯৮১।

১৩। সুকোমল সেন ঃ The Working Class of India : History of Emergence and Movement, 1830-1970 Calcutta, 1977.

১৪। সুকোমল সেন ঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে বাংলার শ্রমিকশ্রেণী, কলকাতা, ১৯৯৭।

১৫। দীপকা বসু এবং অন্যান্য (সম্পাদিত) ঃ সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সাত দশক। কলকাতা, ১৯৯১।

৬.৭.১৩.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। বাংলার রাজনীতিতে বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) প্রভাবের একটি মূল্যায়ন কর।

২। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩। ১৯১৭ থেকে ১৯২৮ অবধি বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের মূল্যায়ন কর।

৪। তুমি কি মনে কর যে কমিউনিস্ট পার্টির অংশ গ্রহণ ছাড়া বাংলার শ্রমিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠত না?

৫। বামপন্থী ভাবধারা কিভাবে এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে স্বাধীনতার পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

পর্যায় গ্রন্থ-৭

Left Politics in Bengal

একক-১৪

বাঙলার তেভাগা কৃষক-আন্দোলন : নানা প্রেক্ষিত, প্রসঙ্গ ও মাত্রিকতা

Tebhaga Peasant Movement of Bengal : Various Perspectives and Dimensions

বিন্যাস ক্রম :

৬.৭.১৪.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

৬.৭.১৪.১ : ঔপনিবেশিক বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

৬.৭.১৪.২ : তেভাগা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক

৬.৭.১৪.৩ : তেভাগা সংগ্রামের পরিধি ও মাত্রা

৬.৭.১৪.৪ : তেভাগার সংগ্রাম ও নারী সমাজ থাকবে

৬.৭.১৪.৫ : তেভাগার সংগ্রাম ও আদিবাসী সমাজ

৬.৭.১৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৭.১৪.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৭.১৪.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পড়ে জানা যাবে :

(১) অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট।

(২) বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও ঐতিহাসিকদের তর্ক-বিতর্ক।

(৩) তেভাগা সংগ্রামের পরিধি ও মাত্রা।

(৪) তেভাগা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা।

(৫) তেভাগা আন্দোলনে আদিবাসী সমাজ।

৬.৭.১৪.১ : ঔপনিবেশিক বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

অবিভক্ত বাঙলায় ষাট লক্ষাধিক ভাগচাষী তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ আদায় করার জন্য জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে যে কৃষক-সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল সেই ঐতিহাসিক 'তেভাগা আন্দোল' প্রথম পর্যায়ে ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৭-এর মার্চ মাস—কমবেশি ছয় মাস (ফসল তোলার মরসুম) ধরে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙলার উনিশটি প্রধান জেলায়। একমাত্র বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলা বাদ দিয়ে অন্যান্য জেলাগুলিতেও পড়েছিল এর প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ঔপনিবেশিক যুগে সংগঠিত প্রথম তেভাগা সংগ্রামের কারণ ও পটভূমিকা। সাংগঠনিক বিস্তার আর ব্যাপকতায় এবং সুদৃঢ় রাজনৈতিক চেতনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এধরনের জঙ্গী ও শ্রেণী-সচেতন কৃষক-আন্দোলন ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ইতোপূর্বে কখনো সংগঠিত হয়নি। ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে অবিভক্ত বাঙলার 'তেভাগা আন্দোলনের' অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, ১৯৪৮-৪৯ সালে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তেভাগার দাবিতে কৃষক-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে, বিশেষ করে কাকদ্বীপ-সুন্দরবন অঞ্চলে এবং চরিত্রও তার সম্পূর্ণতঃ তেভাগাকেন্দ্রিক ছিল না।

ঔপনিবেশিক যুগে সংগঠিত প্রথম তেভাগা সংগ্রামের কারণ ও পটভূমিকা ছিল নানা প্রকার। সাংগঠনিক বিস্তার আর ব্যাপাকতায় এবং সুদৃঢ় রাজনৈতিক চেতনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এধরনের জঙ্গী ও শ্রেণী-সচেতন কৃষক-আন্দোলন ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ইতোপূর্বে কখনো সংগঠিত হয়নি। নিঃসন্দেহে বলা যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি। যদিও এর স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বকীয়তাকেও (autonomy) কোনক্রমে অস্বীকার করা চলে না। এই পর্যায়গ্রন্থ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ, অংশগ্রহণকারী কৃষকের মনস্তত্ব, আদিবাসী ও নারী সমাজের অবস্থান, জাতীয় কংগ্রেস-মুসলিম

লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আলোচনাসহ উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে বাঙলার কৃষকের এই গৌরবোজ্বল সংগ্রামের চালিকাশক্তি কী ছিল? কোন্ শক্তিতে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার ছোবল থেকে আন্দোলন আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল? নেতৃত্বের মেজাজ ও চরিত্র ছিল কেমন? কেন শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে একে সংযুক্ত করা গেল না? পরাজয়ের উৎস এবং অসমাপ্ত আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য কোথায়?

১৯৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষক-সভার নেতারা নিছক নির্বাচন জয়ের মতলবে কৃষক-রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেননি। তাঁরা কৃষক-সমাজের সত্যকার উন্নয়ন চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন কৃষক-রাজনীতির মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ে তুলতে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির প্রধান মিত্র এবং শক্তি রূপে কৃষকদের সংগঠিত করা সে-সময়ে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। এজন্যই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে কার্যকরী কৃষক-আন্দোলন সংগঠিত করা, তেভাগাকে একটি জঙ্গী কৃষক আন্দোলন রূপে বাঙলার সামন্ত-স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা।

বদরুদ্দীন উমর সঠিকভাবেই বলেছেন : তেভাগা আন্দোলনের অনেক ভুল-ত্রুটি থাকলেও এই আন্দোলনই আজ পর্যন্ত বাঙলার সংগঠিত কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। এই অভিমত কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আরো অনেক নেতা ও গবেষকেরও। এ বিষয়েও খুব বেশি দ্বিমত নেই যে, ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার কৃষক-আন্দোলন কৃষক সভার নেতৃত্বে একমুখীন গতিময়তা লাভ করতে পেরেছিল। বস্তুত, কৃষক সভা ছাড়া আর কোনো সংগঠনই সেভাবে শোষিত কৃষকদের প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠতে পারেনি।

আদ্রিয়েন ক্যুপার সহ অনেকেই মেনে নিয়েছেন যে, কংগ্রেস গ্রামের এলিট সামন্তশ্রেণীকে চটাতে চায়নি বলেই গরীব কৃষকদের আন্দোলনে যায়নি। কৃষক প্রজা পার্টিও একই কারণে ভাগচাষীদের সমর্থন যোগায়নি। কিন্তু ক্যুপার যখন বলেন যে, বাঙলার কৃষকেরা 'সংগঠিত রাজনীতির বাইরে ছিলো'—তখন তা সত্যের অপলাপ হয়। একথা ঠিক, ১৯৪৫-৪৭-এর পূর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ কৃষক সভার প্রধানতম কর্মসূচী হওয়া সত্ত্বেও তার ভিত্তিতে বাঙলা তথা ভারতের কোথাও কোনো ব্যাপক ও শক্তিশালী কৃষক-আন্দোলন গঠন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা, শ্রেণী-রাজনীতিতে তাদের সামিল করার কাজ কিন্তু বাঙলার মাটিতে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টিই শুরু করেছিল। স্থানীয় ভিত্তিতে আঞ্চলিক ইস্যুতে হলেও কৃষক সভার নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়েছিল ত্রিশের দশকে বেশ কয়েকটি আন্দোল। এরমধ্যে ১৯৩৭-৩৮ সালে ২৪ পরগণার 'খাস জমি আন্দোলন' এবং বর্ধমান জেলার 'ক্যানাল কর বিরোধী আন্দোলন' অন্যতম। দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণতাই সফল হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ থেকে একটি ইস্তাহারে কৃষক-জীবনের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা করে তাদের অভাব-অভিযোগগুলি

দূর করার জন্য সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। যে দাবিগুলির ভিত্তিতে আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত করতে কৃষকদের বলা হয় তা হলো :—১. খাজনার হার অর্ধেক কমানো; ২. নদীনালা সংস্কার করা; ৩. পাটের নিম্নতম দর যুদ্ধের সময় মন প্রতি ২০ টাকা ও অন্য সময়ে ১০ টাকা ধার্য করা; ৪. ধানের নিম্নতম দর ধার্য করা; ৫. খেতমজুরদের নিম্নতম মজুরীর হার বেঁধে দেওয়া; ৬. ভাগচাষীদের (বর্গাদার) জন্য জমিতে দখলীস্বত্ব দেওয়া ও ফসলের কমপক্ষে দশ আনা ভাগের অধিকার স্বীকার করা; ৭. জমিদারের আবোয়াব (বাজে আদায়) বে-আইনী করা; ৮. ঋণের সুদ মকুব করা; ৯. ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত করা ইত্যাদি।

এইসব দাবি দাওয়ারপ ভিত্তিতেই ১৯৩৯-৪০ সালে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে, বিশেষকরে জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুরে 'হাটতোলা-বিরোধী আন্দোল' এবং বিভিন্ন দাবিতে আধিয়ার (ফসলের অর্ধেক ভাগ পাওয়া ভাগচাষী বা বর্গাদার) আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। পুলিশী হামলা ও জোতদারের আক্রমণের ফলে আধিয়ারদের আন্দোলন সফল না হলেও ঐ একই সময়ে গড়ে ওটা ময়মনসিংহ জেলার হাজং এলাকায় 'টঙ্ক আন্দোলন' অনেক বেশি সফল হয়। সেখানে জমিতে কৃষকদের স্বত্ব ও টাকায় খাজনা দেবার অধিকার ইত্যাদি দাবি আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়। বস্তুতপক্ষে, ১৯৪৬-৪৭-এর তেভাগা সংগ্রামের একটি অনুশীলন ১৯৩৯-৪০-এর আধিয়ার আন্দোলনের মাধ্যমেই ঘটেছিল।

১৯২৯-৩০ সালের অর্থনৈতিক মহামন্দা বাঙলার কৃষকদের অবস্থা আরো শোচনীয় করে তোলে। ডঃ বিনয়ভূষণ চৌধুরি তাঁর এক গবেষণা নিবন্ধে (দি প্রসেস অব ডিপেজেন্টাইজেশন ইন বেঙ্গল এ্যাণ্ড বিহার : (১৮৮৫-১৯৪৭) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আলোচনা রয়েছে আরো অনেক গবেষক-বিশেষজ্ঞের। সুগত বসু ও পার্থ চ্যাটার্জী এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান করেছেন। এসব ক্ষেত্রে ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত বাঙলার কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক জমি হস্তান্তরের ফলে কৃষকদের ভূমিহীন ও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ১৯৪০-এর 'ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিশন (ফ্লাউড কমিশন)'-এর প্রাপ্ত তথ্য উদ্ধৃত করে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত 'রিপোর্ট অব দি কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস্ কমিটি'-র (পৃঃ ৪০) প্রতিবেদনে বলা হয় যে, গত মন্দার এক সুবিশাল অংশের জমি কৃষকদের হাত থেকে চলে গেছে জনসমষ্টির অ-কৃষক অংশের হাতে। বাঙলার দুটি প্রধান ফসল (একটি ভোজ্য, অপরটি বাণিজ্যিক) ধান ও পাটের মূল্য অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় থেকে দ্রুত হারে হ্রাস পেতে থাকে।

ডঃ পার্থ চ্যাটার্জীর মতে ঋণগ্রস্ত কৃষক নগদ অর্থের জন্য তার জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। ঋণের সুদ মেটানো এবং জমির খাজনা প্রদানের জন্য কৃষকের প্রয়োজন ছিল নগদ অর্থের। এর ফলে গ্রামের সুদখোর মহাজনেরা ফুলে ফেঁপে উঠতো। তাদের আর জমিলোলুপ জোতদারদের গ্রাসে কৃষকদের হাজার হাজার একর জমি চলে যেতে থাকে। রায়ত-প্রজা ক্রমে ভাগচাষী বা বর্গাদার এবং ভাগচাষী ক্রমশ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে

পরিণত হয়। দেখা যাচ্ছে, ১৯২৮ সালের 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট', ১৯৩২ সালের 'মানি লেণ্ডারস্ বিল' এবং ১৯৩৩ সালের 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেব্‌টস্ বিল, বাঙলার কৃষকদের কার্যতঃ কোনো সহায়তাই দেয়নি—তাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোচনীয় হয়ে উঠছিল। যদিও বাঙলার আনি সভায় জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থরক্ষাকারী হিন্দু সদস্যেরা এই বিলগুলির তীব্র বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসের ভূমিকাও এক্ষেত্রে ইতিবাচক ছিল না।

১৯৪০ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশন (ফ্লাউড কমিশন) ১৯৩৯-৪০-এর সার্ভে অনুযায়ী দেখিয়েছেন যে, মালিক চাষীর কাছ থেকে হস্তান্তরিত জমির একটি ক্ষুদ্র অংশই প্রকৃত ক্রেতা চাষ করতো, অধিকাংশই দিয়ে দেওয়া হতো ভাগ চাষে। মজুররা কম জমিই চাষ করতো। জোতদারদের কাছে বর্গাদারী ব্যবস্থাই তখনও পর্যন্ত আদর্শ স্থানীয় ছিল। কারণ, এক্ষেত্রে চাষের একটি পয়সাও ব্যয়ভার হিসেবে বহন না করে ঘরে বসে তারা অর্ধেক ফসল (আধিয়ার প্রথা অনুযায়ী) ভোগ করতে পারতো। এর উপর ছিল ঋণগ্রস্ত চাষীর কাছ থেকে সুদ ও নানারূপে আবওয়াব (বাজে আদায়)-এর মাধ্যমে বাকি ফসলের সিংহভাগ গ্রাস করার ব্যবস্থা। ফ্লাউড কমিশন তার রিপোর্টে লিখেছেন :

''বর্গাদারদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান সময়ের অন্যতম উদ্বেগজনক লক্ষণ এবং বংশানুক্রমিক রায়তরা কী পরিমাণে তাদের মর্যাদা হারাচ্ছে এবং নিম্নতর জীবনমানে পতিত হচ্ছে, এটা তারই একটি ইঙ্গিত।"

মালিক-চাষীদের ভাগচাষী বা বর্গাদারে পরিণত হওয়ার ব্যাপকতা যতটা চোখে পড়ার মতো ছিল ১৯৪০-এর ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে তা কিন্তু ধরা পড়েনি। এর প্রধান কারণ, ডঃ সুনীল সেনের মতে—বাঙলার জেলাগুলিতে বর্গাচাষের মাত্রা ও জমি সম্বন্ধে কোনো নথিপত্র রাখা হয়নি। তাছাড়া বর্গাদারদের হাতেও নিজেদের স্বত্ব প্রমাণ করার মতো কোনো প্রামাণ্য সাক্ষ্য নেই। যাইহোক ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বর্গাদারদের চাষ করা জমির শতকরা হিসাব ও বর্গাদার-পরিবারের সংখ্যা (১৯৪০ সালের র‍্যান্‌ডম্ সার্ভে অনুসারে) যা পাওয়া যায় তা বর্গাদাররা কোনো কোনো জেলার কতগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত; ফলে জেলার অঙ্কগুলি বিভিন্ন মহকুমা ও থানায় বর্গাচাষের পরিধির ইঙ্গিত বড় একটা বহন করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও ২৪-পরগণার কয়েকটি থানার গ্রামীণ জনসমষ্টির ৬০ শতাংশের বেশি ছিল বর্গাদার। ১৯৪৬-৪৭-এর বর্গাদার বিদ্রোহের (তেভাগা আন্দোলন) ঝটিকাকেন্দ্র ছিল এই থানাগুলি।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০) অনুযায়ী বাঙলার কৃষি-নির্ভর পরিবারের মোট সংখ্যা ৭৫ লক্ষ। এর মধ্যে ১ লক্ষ-র মতো জোতদার-জমিদার। বাঙলার সমস্ত জেলায় মোট ১৯,৫৯৯-টি পরিবারের মধ্যে র‍্যানডম্ সার্ভে করে ফ্লাউড কমিশন জমির পরিমাণ-সংক্রান্ত যে-তথ্য পেশ করেছিলেন (১৯৪০) তা মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য। এতে দেখানো হয়েছে, শতকরা কত পরিবারের কতটা জমি আছে :

০-২ একর	২-৩ একর	৩-৪ একর	৪-৫ একর	৫-১০ একর	১০ একের ঊর্ধ্বে
৪৬.০%	১১.২%	৯.৪%	৮.০%	১৭.০%	৮.৪%

এর মধ্যে একেবারেই বা প্রায় জমি নেই এমন ভূমিহীন কৃষি-মজুর অন্তত পক্ষে ৩০ শতাংশ, যারা ২ একরের মালিকানাপ্রাপ্ত, ৪৬ শতাংশ এর মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ, প্রকৃতঅর্থে মাত্র ১৬ শতাংশের ২ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে। অপরদিকে, কোন কোন জোতদার কয়েকটি জেলায় ৫ হাজার একর পর্যন্ত জমির মালিক ছিল। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ৫ একরের কম জমি আছে বা একেবারে নেই এমন কৃষকের সংখ্যা ১৯৪০ সালেই বাঙলায় ছিল ৭৫ শতাংশ। এক অর্থনীতিবিদের হিসাব অনুযায়ী ৫.৪ লোক সংখ্যার এক একটি কৃষক-পরিবারের ন্যূনতম ভরণপোষণের জন্য অন্তত্তপক্ষে ৫ একর জমি প্রয়োজন। অর্থাৎ ১৯৪০ সালেই গ্রামবাঙলার ৭৫ শতাংশ মানুষেটর টি'কে থাকাটাই কঠিন হয়ে উঠেছিল। তার উপর আসে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা রূপে পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মড়ক (১৯৪৩)। বলা দরকার যে অঞ্চলগুলি বিশেষভাবে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল সে জায়গায় কৃষক জনসমষ্টির প্রায় ৫ শতাংশই তাদের জমি পুরোপুরি বিক্রি করে দেন এবং ১১ শতাংশ করেন আংশিকভাবে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ক্রেতারা ছিল জোতদার ও সম্পন্ন চাষী তারা বেশির ভাগ জমিই দিয়ে দেয় ভাগচাষে। দুর্ভিক্ষের সময়ে জোতদাররা পরিণত হয় একাধারে বণিক আর মজুতদারে এবং তারা অত্যন্ত ধনীও হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের তিন বছর পরে বর্গাদারদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ফেটে পড়ে তেভাগা-সংগ্রামে।

৬.৭.১৪.২ : তেভাগা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক

৯৪৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে ফসল তোলার মরসুমে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে (দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা, রংপুরের নীলফামারী মহকুমা ও জলপাইগুড়ির দেবীগঞ্জ বোদা ও পচাগড়-তিনটি থানায়) প্রথম তেভাগা আন্দোলন সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই শুরু হয়। এক মাসের মধ্যেই (ডিসেম্বর '৪৬) তা দ্রুত ভাগচাষী-বর্গাদার ও টঙ্ক আন্দোলন রূপে ছড়িয়ে পড়ে মেদিনীপুর, খুলনা, ২৪ পরগণা, ময়মনসিংহসহ এগারোটি জেলায়। ১৯৪৭-এর জানুয়ারি থেকেই বাঙলার মোট উনিশটি জেলার ৬০ লক্ষ ভাগচাষী কোন-না-কোনভাবে তেভাগা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো—তেভাগা আন্দোলন, অর্থাৎ ভাগচাষীদের উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ অধিকারের দাবি ওই সময়েই কেন উঠলো এবং কারাই বা সে আন্দোলন গড়ে তুললো? গবেষক জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য এই আন্দোলনের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই অর্পণ করেছেন কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার উপর। তাঁর মতে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তেভাগা আন্দোলন শুরু হবার দু'মাস পূর্বেই (১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার' কাউন্সিল সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়) কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

ডঃ ভট্টচার্য-র মতে, তেভাগা আন্দোলন ছিল 'অ্যান অরগানাইজড রিভোল্ট বাই অ্যান অরগানাইজিং এজেন্সী।' ড. সুগত বসু তাঁর গবেষণা গ্রন্থে এই অভিমতকেই সমর্থন জানিয়েছেন। ড. ভট্টাচার্য এবং ড. বসু উভয়েরই মত হলো কৃষক সভা (বকলমে কমিউন্সিট পার্টি) এই আন্দোলন ভাগচাষীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল (যদিও সুগত বসু ১৯৪৬-৪৭-এর ভাগচাষী আন্দোলনকে আদৌ কোন বিরাট ও ব্যাপক কৃষক সংগ্রাম মনে করেন না)। আঁদ্রে বেতেই তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে আরও বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, তিনি মনে করেন কমিউনিস্টদের এজেন্ট রূপে কৃষক সভা এমন একটি আন্দোলন কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল যা কৃষি-সংক্রান্ত দাবি বা ভাগচাষীদের স্বার্থ রক্ষার অনুকূল ছিল না। দ্বিতীয়ত, কৃষক সভা আদৌ একটি কৃষক সংগঠন নয়। আঁদ্রে বেতেই-এর এই শেষ বক্তব্যটি একেবারেই গুরুত্বহীন। কৃষক সভার সাংগঠনিক কাঠামো, সম্মেলনের দলিলপত্র, ১৯৩৬ সালের জন্মকাল থেকে তার ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে এমন কেউই তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না।

একইভাবে জলপাইগুড়িতে ওঁরাও বর্গাদাররা নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মূসলমান জোতদারদের বিরুদ্ধে। দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, কুশমণ্ডি ইটাহার থানা এলাকায় ভুজুটুডুর নেতৃত্বে তীর ধনুকধারী সাঁওতাল স্বেচ্ছাসেব বাহিনী তেভাগা-আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। কোনো সাঁওতাল মাঝি বা গ্রামের মোড়লের নির্দেশের পরোয়া তারা করেনি। আদিবাসী গোষ্ঠী যে ভাগচাষী আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল তা তাদের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশেরই পরিচায়ক। ডঃ পার্থ চ্যাটার্জী তাই যথার্থভাবেই বলেছেন, কোন ঐতিহ্যগত বা গোষ্ঠীগত আনুগত্য (Primordial loyalty) বা বন্ধনের দ্বারা নয়, শ্রেণীস্বার্থই কৃষক সমাজকে তাদের দাবি আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফ্রনজ ফ্যাননের ধারণাও এই প্রসঙ্গে অস্বীকার করার উপায় নেই, "In the colonial countries Peasants alone are revolutionary, for they have nothing to lose and everything to gain."

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে ডঃ ভট্টাচার্য, ড. বসু ও বেতেই-র বক্তব্যসমূহ বাতিল করে দিয়ে বলেছেন কৃষক সভা হঠাৎ করে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভাগচাষীদের উস্‌কে দেয়নি। তার একটি অতীত সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে। গবেষকদের দেখা উচিত ১৯৪৬-৪৭ সালে কেন ভাগচাষী আন্দোলন বাঙলার এত ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

অধ্যাপক চৌধুরী স্পষ্টভাবেই জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য-র প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে, কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বা 'জনযুদ্ধ নীতি'-র ক্ষত ঢাকার জন্য তেভাগা আন্দোলনের ডাকা দিতে হয়েছিল, এই ধারণা সঠিক নয়। তাঁর মতে-যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৪৫-এর মে মাসে। তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৬-এর নভেম্বরে। সুতরাং এই দুই এর মধ্যে যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। জনযুদ্ধনীতি শহুরে মধ্যবিত্তদের একটি অংশকেই হয়ত কমিউনিস্টদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলো, কিন্তু কৃষকদের

থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। পিটার কাস্টার্স বলেছেন, তেভাগার দাবি আকাশ থেকে পড়েনি। এই আলোচনার পূর্বভাগে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে গোটা তিরিশের দশক জুড়ে বাংলার কৃষক, বিশেষত ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের দূরবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠছিল এবং কিভাবে ১৯৩৭-৩৮ থেকেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের প্রবণতা বাড়ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে উত্তরবঙ্গে বড় ধরনের আন্দোলন হয় কৃষকসভার নেতৃত্বে। ১৯৪০-এ ফ্লাউড কমিশনের (কমিশন কর্তৃক তেভাগা বন্দোবস্তের সুপারিশও আন্দোলনের পশ্চাতে প্রেরণা জুগিয়েছিল) কাছে কৃষক সভার পক্ষ থেকে শুধুমাত্র বর্গাদারদের ভূমিস্বত্ব প্রদানের জন্য মেমোরেন্ডামই দেওয়া হয় না, ১৯৪০ এর জুন মাসে প্রাদেশিক কৃষকসভার চতুর্থ সম্মেলনে (পাঁজিয়া, যশোহর) কৃষকদের আন্দোলনের নির্দেশ জানিয়ে জমিদারী ব্যবস্থা ও বর্গাপ্রথা তুলে দেওয়াসহ তেভাগার দাবিতে সংগ্রাম শুরু করতে বলা হয়। ১৯৪১ পর্যন্ত ময়মনসিংহ এবং অন্যত্র বিক্ষিপ্তভাবে কৃষকসভার নেতৃত্বে বর্গাদার-বিক্ষোভ চলেছিল। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অধ্যাপক চৌধুরী কিন্তু ভাগচাষী আন্দোলনের ডাক দিয়েও ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কৃষক-সভা কেন সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারেনি তার কারণ রূপে শুধুমাত্র 'জনযুদ্ধ নীতি'-কে চিহ্নিত করতে রাজী নন। তাঁর মতে—(১) রাজনৈতিক কার্যাবলী নিষিদ্ধকরণ, সরকারী দমননীতি এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং (২) ১৯৪৩ ও তৎপরবর্তীকালে মন্বন্তরজনিত ক্ষয়ক্ষতিই ব্যাপক ভিত্তিক কৃষক-আন্দোলন ঐসময় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ ছিল।

যাইহোক, অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এবিষয়ে একমত যে, (১) তেভাগা আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষকসভার দ্বারা ভাগচাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন কার্যক্রম নয়। (২) কৃষক সমস্যা-সংক্রান্ত বিষয় ও তার সমাধানই তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল। (৩) সম্পূর্ণত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন না হলেও তেভাগা সংগ্রাম শুরু করার পশ্চাতে কৃষক-সমাজের নিজেদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ চাপ (বিষয়টি পিটার কাস্টার্স দেখিয়েছেন) যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বরঞ্চ ড. সুনীল সেন, ভবানী সেন, অবনী লাহিড়ী, কৃষ্ণবিনোদ রায়, সুশীল সেন প্রমুখ তৎকালীন কৃষকসভার নেতারা স্বীকার করেছেন যে, আন্দোলন শুরু করা ও পরিচালনার প্রশ্নে নেতৃত্বের মধ্যেই কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বছিল। তাই বিনয়ভূষণ চৌধুরীর এই মত মেনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না—"The CPI decision was not based on any shrewd calculation of any specific gains as a political party from the Tebhaga struggle."

তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার প্রশ্নে অপর বিতর্কটি রয়েছে 'সাম্প্রদায়িকতা'র বিষয়কে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে আদ্রিয়েন ক্যুপার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম' নাকি কার্যত 'মুসলিম পলিটিকস'—এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ভাগচাষী, বর্গাদারদের শ্রেণীভিত্তি যাইহোক না কেন তারা মূলত পরিচালিত হয়েছিল 'সাম্প্রদায়িক' মনোভাবের দ্বারা। অর্থনৈতিক বা শ্রেণী স্বার্থে নয়, কৃষকরা ১৯৪৬-৪৭ এ পরিচালিত হয়েছে ধর্মীয় গোষ্ঠীরূপে। যেহেতু সেসময় বাঙলাদেশে মুসলমান ভাগচাষীরাই ছিল

সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং জমিদার-জোতদারদের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয়গোষ্ঠীর লোকসংখ্যাই ছিল বেশি—এই কারণে 'ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক' চেতনার দ্বারাই তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। হিন্দু জমিদার সাহা জোতদার—এই ধরনের ধ্বনিও মুসলমান ভাগচাষীদের আন্দোলনে নামতে প্ররোচিত করেছিল। অধ্যাপক ধনাগারেও তাঁর গবেষণায় ভাগচাষীদের এই গোষ্ঠীগত আনুগত্যের (Primordial loyalties) উপরেই অধিক জোর দিয়েছেন। তার মতে মুসলিম কৃষকেরা অধিক সংখ্যায় ক্রমশ লীগ রাজনীতি ও পাকিস্তান দাবির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল, ফলে কৃষকসভার পক্ষে কৃষকদের নিয়ে জোতদারদের বিরুদ্ধে শ্রেণী আন্দোলন গড়ে তুলতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

শ্রেণী চেতনার স্থলে 'সাম্প্রদায়িক চেতনার' কবলে বাঙলার কৃষক সমাজের চলে যাওয়ার ধারণাকে পিটার কাস্টার্স নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁর গবেষণায় তিনি বাঙলার দরিদ্র-কৃষক, ভাগচাষী বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের রাজনীতিকও শ্রেণী সচেতনতাকে এবং সেই প্রসঙ্গে কৃষক-সভার ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই স্বাকীর করেছেন। ১৯৪৬-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর সাম্প্রদায়িকতার আগুন যে গ্রাম বাঙলাকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি, কৃষক-সমাজের শ্রেণীচেতনাই তার কারণ বলে কাস্টার্স উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, তেভাগা-আন্দোলন গ্রাম বাঙলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে রুখে দিয়েছিল। প্রখ্যাত শিল্পী সোমনাথ হোড় তেভাগার দিনগুলিতে বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন। তার তেভাগার ডায়েরীতে তিনি বলেছেন, কৃষকসমাজের কাছে কংগ্লেস এবং লীগ উভয়েই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কংগ্রেসকে হিন্দু আধিয়াররা এবং লীগ-কে মুসলিম আধিয়াররা নিজেদের শত্রু বলেই মনে করতো।

অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী মুসলিম ভাগচাষীদের উপর মুসলিম লীগ-এর ব্যাপক প্রভাবের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। নানা তথ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, যেসব স্থানে কৃষকসভার সংগঠন দুর্বল কিংবা অনুপস্থিত সেখানেই কেবলমাত্র লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব সামান্যভাবে মুসলিম কৃষকদের প্রভাবিত করেছিল। অনেকস্থানে কংগ্রেস ও লীগের বামপন্থী কর্মীরাও কৃষকসভা এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে কাজ করেছিল। যদিও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই ভাবে তেভাগা আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়েছিল। বিশেষকরে কৃষকসভার বহু নেতা ও কর্মী সাক্ষ্য দিয়েছেন, কিভাবে মুসলিম লীগ মৌলানা-মৌলবীদের কাজে লাগিয়েছিল কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানোর জন্য। এমনকি কৃষকসভার সঙ্গে যুক্ত মুসলিম কর্মীদের ধর্মচ্যুত করার হুমকি দেওয়া হতো এবং তারা প্রকৃত মুসলমান নয় বলেও প্রচার করা হতো।

কিন্তু ধনাগারে কিংবা কুপারের 'গোষ্ঠীগত আনুগত্য' বা 'সাম্প্রদায়িক চেতনা'র দাবি একেবারেই টেকে না। তা যদি হতো তবে দিনাজপুরের রাজবংশী কৃষকেরা 'ক্ষত্রিয় সভার' নির্দেশ শিরোধার্য করে রাজবংশী জোতদারদের বিরুদ্ধে একটি আঙ্গুলও তুলতো না। স্মরণে রাখা উচিত, রাজবংশীদের অভিভাবক স্থায়ী 'ক্ষত্রিয় সভা'র (যারা জোতদারদের ক্রীড়নক ছিল) চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করেই ১৯৪৬-এর নির্বাচনে প্রধানত রাজবংশী কৃষকেরাই কমিউনিস্ট প্রার্থী রূপনারায়ণ রায়কে জয়ী করিয়েছিলেন। হয়তো এই কারণেই এশীয় দেশের বিপ্লবগুলিকে কৃষক সমাজই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিয়েছে ; উদাহরণ—চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া। রণজিৎ গুহ যে স্বয়ংক্রিয় কৃষক আন্দোলনের কথা বলেছেন, উত্তরবঙ্গের তেভাগা কৃষক সংগ্রামে তার কিছু উদাহরণ বিদ্যমান।

'সাম্প্রদায়িকতা'র প্রশ্নটিকে আর একরকমভাবে দেখেছেন ডঃ অশোক মজুমদার। তাঁর মতে, যেহেতু ভাগচাষীদের অধিকাংশই মুসলমান সেহেতু পথম দিকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থেই 'মুসলিম লীগ' তেভাগা-আন্দোলনের সমর্থন জুগিয়েছিল। কিন্তু যখন একটি শ্রেণী-আন্দোলন রূপে তেভাগার সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠলো তখনই লীগ সরকার আতঙ্কিক হয়ে 'বর্গাদার বিল ১৯৪৭' পাশ করে আন্দোলন দমনে কৌশল ও চরম পীড়নের আশ্রয় নিল। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির উপাদানরূপে তেভাগা আন্দোলনকে দেখে থাকে, তবে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শ্রেণী-চেতনার অস্ত্র রূপেই তেভাগাকে দেখেছিলেন কৃষক সভার নেতৃত্ব। কুণাল চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করেছেন। কৃষক সভার তৎকালীন সভাপতি কৃষ্ণবিনোদ রায়, দিনাজপুরের কৃষক নেতা ও পরবর্তীকালের অধ্যাপক সুনীল সেন এবং আরো অনেক প্রবীণ তেভাগা সংগঠকের মন্তব্য তুলে ধরে কুণাল দেখেয়েছেন যে, তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলার যে সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিয়েছিল তার কয়েকটি কারণের অন্যতম হলো কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গা ঠেকাতেও তেভাগাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। আর একজন গবেষক সত্যজিত দাশগুপ্ত গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের রিপোর্ট থেকে একই তথ্য তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী যথার্থভাবেই লিখেছিলেন,

''যদি কোনো একটি উপাদান উত্তরবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়া এড়াতে সাহায্য করে থাকে, তবে তা হল অশিক্ষিত আধিয়ার (ভাগচাষী)-দের এই লড়াই।'' ''বলাবাহুল্য শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, পূর্ববঙ্গেরহ অনেকস্থানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলিম কৃষকসমাজের যৌথ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, এর প্রমাণ ডিমলা থেকে নীলফামারির ঐতিহাসিক কৃষক মিছিল।

কুণাল চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের এমন কার্যকর অস্ত্র কেন কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৭-এর এপ্রিল থেকে আর একদফা দাঙ্গা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখান করলেন। যে তেভাগার লড়াই ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসের দাঙ্গার কালিমা অনেকখানি মুছে দিতে পেরেছিল বলে মনে করা হয়, তা কি পারতো না ১৯৪৭-এর নোয়াখালির তমসাকে হটিয়ে দিতে? কৃষ্ণবিনোদ রায় বলেছেন, তা সম্ভব ছিল না, কারণ এপ্রিল ১৯৪৭-এর দাঙ্গার ফলে মুসলিম কৃষকেরা সর্বত্র আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছিলেন। ফলে, নেতৃত্বকে তার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হয়েছিল। অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী এই মর্মান্তিক পরিণতি জন্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অপরিণামদর্শী নীতিকে (যেমন পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন) এবং কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদানের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন। কুণালও বলেছেন, উচ্চতম স্তরে নেতৃত্বই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই তেভাগা-আন্দোলন প্রত্যাহারের একমাত্র কারণ, এটা মনে করা বোধহয় ঠিক নয়। সরকারী দমননীতির সামনে তেভাগা-আন্দোলনকে আর এক-পা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য

প্রয়োজন ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণা। কৃষকসমাজ তার জন্য প্রস্তুত থাকলেও দ্বিধাগ্রস্ত পার্টি-নেতৃত্ব নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেননি। সুমিত সরকার আক্ষেপ করেছেন, কৃষকদের হাতে লাঠির বদলে রাইফেল তুলে দেওয়া যায় নি বলে। সে পরিস্থিতি তখন ছিল কিনা তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে।

৬.৭.১৪.৩ : তেভাগা সংগ্রামের পরিধি ও মাত্রা

এই বিষয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ নেই যে তেভাগা-আন্দোলনের সমস্যা ছিল কৃষক-সমাজের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত। মূলত এটি ছিল একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষক সভা না চাইলেও বাস্তব পরিস্থিতিই ভাগচাষীদের বাধ্য করতো অপর কোনো সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তুলতে। সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেও একে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যেত না। সেদিক থেকে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা বা 'অটোনমি' তেভাগা আন্দোলনের বরাবরই ছিল। কৃষকসভা বা কমিউনিস্টরা অনুঘটকের কাজ করেছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছিল, যদিও সেই ভূমিকা শেষ পর্যন্ত তারা ধরে রাখতে পারেনি। সেজন্য অবশ্য তাদের সাফল্যকে ছোট করা চলে না। কিন্তু জলপাইগুড়ির ওঁরাও বস্তি থেকে ময়মনসিংহের হাজং এলাকা, নীলফামারী থেকে কাকদ্বীপের নোনামাটি অঞ্চলে তেভাগা-সংগ্রামের প্রকৃত নায়ক ছিলেন নিঃসন্দেহে ভাগচাষীরা। আব্দুল্লাহ রসুল যদিও আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে, ক্ষেতমজুরদের দাবি-দাওয়া এই আন্দোলনের উপেক্ষিত হয়েছিল, তবুও তারাই কিন্তু ভাগচাষীদের লড়াইয়ের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিল, রক্ত ঝরিয়েছিল।

১৯৪৬-৪৭ সালের ঔপনিবেশিক বাঙলায় 'তেভাগা আন্দোলন' ছিল ভাগচাষীদের (কিংবা বর্গাদার বা আধিয়ার) নিজস্ব সংগ্রাম। কৃষক সভা সর্বদাই এই সংগ্রামে জোতদার-জমিদারদের নিম্নে অবস্থানকারী সকল পর্যায়ের কৃষকদেরই সামিল করতে চেয়েছিল। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা 'ল্যাণ্ড রেভ্যুনিউ কমিশন-এর চেয়ারম্যান স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড সাহেবের কাঝে যে স্মারকলিপি পেশ করে তাতে ভাগচাষীদের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ তুলে ধরলেও, তাদের জন্য নির্দিষ্ট আকারে কোনো দাবি পেশ করেনি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের বক্তব্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রসূত জমিদারী ব্যবস্থা উৎখাত সহ তেভাগা চালু করার দাবি হয়েছিল যার ফল সকল কৃষকই ভোগ করবে, এমন আশাই তার মধ্যে নিহিত ছিল। এই সময়পর্বে সামগ্রিকভাবে জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার চিন্তা কংগ্রেস-লীগ কেউই ভাবতে পারতো না। নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'কে ব্রিটিশরা বিলোপ ঘটাবে এ চিন্তাও ছিল বাতুলতা। ফ্লাউড কমিশন ভাগচাষীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখে তাদের জন্য রিলিফের কতা ভেবেছিলেন। এই কারণে ফ্লাউড কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত ছিল :

''আমাদের সুপারিশ হলো.....যেসব বর্গাদার লাঙল, গোরু-বলদ ও কৃষি-উপকরণ যোগায় তাদের প্রজা হিসাবে গণ্য করা হোক.....আমরা এও সুপারিশ করছি যে তাদের কাছে আইনসংগতভাবে আদায়যোগ্য ফসলের ভাগ অর্ধেকের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ করা হোক".....

ফ্লাউড কমিশন-এর রিপোর্টের সুযোগ নিতে কৃষক সভা এতটুকু দেরি করেনি। ১৯৪০-এ বর্ধমানের পাঁজিয়ার প্রাদেশিক সম্মেলনেই তারা তেভাগার দাবি তুললো, কোথাও কোথাও প্রচারও শুরু হয়ে গেল। তথাপি কেন ১৯৪৬-এর খুলনার মৌভোগ সম্মেলন পর্যন্ত তাদের প্রকৃত সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য (আনুষ্ঠানিকভাবে কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত হয় অবশ্য সেপ্টেম্বরে, সম্মেলনের পরে। নভেম্বর পর্যন্ত জেলায় জেলায় প্রস্তুতি চলে এবং তারপরেই আন্দোলন শুরু হয়ে যায়) অপেক্ষা করতে হয়েছিল সে বৃত্তান্ত পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

বাঙলার কৃষকসমাজ কৃষকসভার ওরকম বলিষ্ঠ একটি সিদ্ধান্তের জন্যই এতদিন যেন অপেক্ষা করছিল। কংগ্রেস, লীগ রাজনীতি, মন্ত্রীসভা, সাম্প্রদায়িকতা, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন, পাকিস্তান দাবি ইত্যাদি ঘটনা অপেক্ষা তাদের কাছে অনেক কাম্য ছিল ফসলের তিন ভাগের দুইভাগ আদায়। এতদিন ভাগচাষীদের নিজের রক্ত ঘাম মেশানো ফসেলর প্রায় সবটুকু (অর্ধেক পাওনা রূপে, বাকি অর্ধেকের অধিকাংশ নানা রূপ আবওয়াব, বাজে আদায়, খাজনা ও কর্জ মেটাতে) তুলে দিতে হতো জোতদারের গোলায়। ঘর-বাড়ি নেই, জমি নেই, স্ত্রী-পুত্র পরিবারসহ ঋণগ্রস্ত বাঙলার ভাগচাষীদের একটা বড় অংশ জোতদারের গোয়াল ঘরে রাত কাটাতো। পরের দিন ভোরে আবার জমিতে বেগার খাটতে যাওয়ার সময় দিন গুণতো। অন্নহীন-বিনিদ্র রাত্রির জন্য। কৃষক সভার প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় বাঙলার আধিয়ারদের সেই সময়কার পাশবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত হয়ে আছে।

অবিভক্ত বাঙলায় ভাগচাষী সংখ্যার সঙ্গে প্রত্যেক জেলাতেই ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা যোগ করলে তা কত ব্যাপক হতে পারে (মোট ৬০ লক্ষ) সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। বাঙলার ২১২টি বৃহৎ জমিদার-পরিবার ও ২০০০টি ছোট-বড় জমিদার-পরিবারসহ প্রায় এক লক্ষ জোতদার-পরিবার বাদ দিলে খুব অল্প কৃষিজীবীই তেভাগা-সংগ্রামের দাবিগুলির বাইরে ছিল। কিন্তু সকলকে একইসঙ্গে, সমবেত করা বা সর্বত্র একইসঙ্গে এই আন্দোলন শুরু করা সম্ভব হয়নি সাংগঠনিক কারণেই। সুগত বসু মনে করেন যে, ১৯৩৯-৪০ সালে উত্তরবঙ্গে জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই শুরু করেছিল সম্পন্ন আধিয়ার ও ছোট মালিক-চাষীরা। তেভাগা প্রসঙ্গে বসু-র বক্তব্য—সম্পন্ন আধিয়াররা যুদ্ধের ফলে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত সুযোগ নিতে চেয়েছিল বৃহৎ জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে। ডঃ বিনয়ভূষণ চৌধুরীর মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে, সম্পন্ন আধিয়ার ও জোতদারদের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও তেভাগা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সাধারণ ও প্রায়নিঃস্ব বর্গাদার বা ভাগচাষীরা। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক সভা প্রদত্ত একজন আধিয়ারের (যার দশ বিঘার বেশি জমি নেই) বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখলেই ডঃ চৌধুরীর বক্তব্যের সারবত্তা বোঝা যাবে :

দশ বিঘা জমির মোট আয় ৪৬১, আধিয়ারের অর্ধাংশে ২৩০।।০, **সংসার-ব্যয়** ৪৫৪।।০; **ঘাটতি** ২২৩।।০।

বাস্তবে কিন্তু ঐ ঘাটতি যেত অনেক বেড়ে। নিজেদের প্রাপ্য ফসলের মূল্যের সবটুকু বর্গাদার-আধিয়াররা ভোগ করতে পারতো না, কারণ এগারো রকমের আবওয়াব (যেমন—খলিয়ান-ঝাড়ানি, গদী০সেলামী, মাছ-খাওয়ানি, ছেলে-পড়ানি, করালী ইত্যাদি) বা বাজে আদায় এবং ঋণের সুদ দিতেই তাদের অনেকটা প্রাপ্য বেরিয়ে যেত। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের স্বার্থেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য। কৃষকসভার নেতৃত্বও এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা স্বীকার করেছেন। কোন কোন ব্রিটিশ আমলা আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ও তেভাগা-আন্দোলনে আদিবাসী এবং মুসলমান ভাগচাষীদের অংশ গ্রহণের ব্যাপকতা দেখে একে 'সাম্প্রদায়িক অর্থনীতিবাদ' রূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলেও—কার্যত তেভাগা ছিল বিকশিত শ্রেণীসংগ্রামেরই রূপ। এই আন্দোলন চলাকালে ব্রিটিশ-মুখপতর 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা প্রত্যক্ষদর্শীর যে-বিবরণ দিয়েছেন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য : 'বিগত শতকের পর শতক ধরে যে মূক ছিল সে মাঠ ভেঙে এগিয়ে চলেছে, প্রত্যেক কাঁধে রাইফেলের মতো করে ধরা লাঠি আর মিছিলের পুরোভাগে একটি লাল পতাকা-এ দেখে অনুপ্রাণিত হতে হয়। বাঁশ ঝাড়ের নৈঃশব্দের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধহাত কপালের কাছে তুল তারা যখন নিচু স্বরে 'ইনকিলাব, কমরেড: বলে পরস্পরকে সম্বোধন করে, তা শুনে কেমন ভয়-ভয় করে। (অনুদিত)"

সাহেবী কাগজের সাংবাদিকরা যা শুনে ভয় পেতেন, তা নিশ্চিত কৃষকদের সাহস জুগিয়েছে। রাইফেলের বিরুদ্ধে তাই তারা লাঠি নিয়েই লড়তে পেরেছে, প্রাণ দিয়েছে কাতারে কাতারে। ১৯৪৭-এর ৪ জানুয়ারি চিরির বনদোরে (দিনাজপুর) ক্ষেতমজুর সমিরুদ্দীন শেখ ও সাঁওতাল আধিয়ার শিবরাম মাঝির পুলিশের গুলিতে নিহত হবার পর থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ রসুল সাহেবের হিসাব মতো ৭৩ জন, নারী ও পুরুষ তেভাগা-আন্দোলনের শহীদ হয়েছিলেন। রসুল সাহেব এর একটি তালিকাও করে দিয়েছেন স্থান ও সময়কালসহ। তথাপি অনেককেই দেখি সরকারী তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ৫০ এর বেশি বলেন না যদিও মৃতের সংখ্যা রসুল সাহেবের হিসাব অপেক্ষা কিছু বেশিই ছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে অবিভক্ত বাঙলায় তেভাগা আন্দোলনের মতো সংগঠিত ও শ্রেণী-সচেতন কৃষক আন্দোলন ইতোপূর্বে ঘটেনি। আন্দোলনরত কৃষকদের (যার মধ্যে ক্ষেতমজুরও ছিল, আবার পেটি জোতদারও ছিল) সকলেই যে কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামী ছিল তা বলা বাতুলতামাত্র। বরঞ্চ, লীগের প্রভাবই এদের অনেকের মধ্যে ছিল অধিক। বহু কৃষক এক কাঁধে লীগের ও অন্য কাঁধে কৃষকসভার লাল ঝাণ্ডা নিয়েই আন্দোলনে নেমেছিল। ১৯৪৭-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির পুলিশী দমননীতির ফলে তাদের অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়। শুধুমাত্র দিনাজপুরেই ৪০ জন কৃষক নিহত, ১২০০ আহত এবং ১০ হাজার গ্রেপ্তার হয়। কমিউনিস্ট পার্টির এক্ষেত্রে যে-ভূমিকা ছিল তা সবটুকু তারা পালন করতে পারেনি। কংগ্রেস ও লীগতো করেইনি। বস্তুত, কংগ্রস, লীগ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র বলেই মনে করতো। ১৯৪৫-এর মে মাসে ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় বাঙলার শ্রমিক-কৃষককে নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ

করেছিল। কমিউনিস্টদের কাছে তেভাগা-আন্দোলন শুরুর দিকটা ছিল তাই রাজনৈতিকভাবে অনুকূল। মন্বন্তর-বিরোধী রিলিফ কার্যে ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রচারে ইতোমধ্যেই শহরের বহু শিক্ষিত কমিউনিস্ট যুবক-যুবতীর বাঙলার গ্রামেগঞ্জে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিশেষ করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা যে কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা তেভাগা-সংগ্রামে কৃষক রমণীদের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই বোঝা যায়। এদের বীরত্ব নিয়ে বহু লেখা ইদানীং প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

৬.৭.১৪.৪ : তেভাগার সংগ্রাম ও নারী সমাজ থাকবে

তেভাগা কৃষক আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন প্রধানত দু'জন গবেষক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুনীল সেন যিনি নিজে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার একজন নেতা রূপে দিনাজুপর জেলায় তেভাগা সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা গ্রন্থ দি ওয়ার্কিং উ্যমেন অ্যান্ড পপুলার মুভ্‌মেন্ট্ ইন বেঙ্গল (১৯৮৫)-এ কৃষক-রণীদের বিশেষতঃ রাজবংশী মহিলাদের সংগ্রাম ও সক্রিয়তার বিশ্লেষণী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং বিতর্কিত গ্রন্থটির রচয়িতা ড. পিটার কাস্টার্স যিনি তাঁর উম্যন ইন দি তেভাগা আপরাইজিং (১৯৮৭) গ্রন্থে তেভাগা সংগ্রামে কৃষক নারীদের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের নানাদিক তুলে ধরে এই সংগ্রামের সঙ্গে সমসাময়িককালে সংঘটিত অন্ধ্র-র তেলেঙ্গানা কৃষক সংগ্রাম এবং চীন সহ দক্ষিণ-পূর্ব এইশয়ার কৃষক সংগ্রামগুলিতে নারীসমাজের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে—তেভাগার নারীদের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা ও অবস্থানকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছেন (যদিও তিনি অবশ্য এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন)। কেন তেভাগা আন্দোলনে কৃষক রমণীরা বহুক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় অধিষ্ঠিত সে সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনায় ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে।

তেভাগা কৃষক আন্দোলনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমজীবী নারী-চেতনার জাগরণ এবং নারীশক্তির মুক্তি। বাংলা তথা ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে নারীদের বিশেষতঃ শ্রমজীবী নারীসমাজের এত ব্যাপক অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ অন্য কোন গণআন্দোলনে ঘটেনি। গ্রাম বাঙলার কৃষক-রমণী হাজার বছরের অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অবিচার ও কালিমার পঙ্ক থেকে এই আন্দোলনে উঠে এলো মহাশক্তিময়ী রূপ নিয়ে। তেভাগা কৃষক আন্দোলনে এদের তুলনাহীন সাহসিকতা, দীপ্ত আদর্শবোধ, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষমতা ও উন্নততর সাংস্কৃতিক চেতনা নতুন দীপ্তিতে ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। সাহিত্যিক সৌরি ঘটক লিখেছেন, ''শুধু যে তারা পুলিশ আর সৈন্যদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করল, বন্দুক কেড়ে নিল, লাঠি হাতে ধান পাহারা দিল, নির্ভয়ে বন্দুকের সামনে বুক পেতে প্রাণ দিল তাই নয়, তাদের সমগ্র অস্তিত্ব সমগ্র চেতনায় ঘটে গেল এক নিঃশব্দ বিপ্লব।"

৬.৭.১৪.৫ : তেভাগার সংগ্রাম ও আদিবাসী সমাজ

তেভাগা কৃষক-আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আদিবাসী ও উপজাতি সমাজভুক্ত কৃষক বা ভাগচাষীর ব্যাপক অংশগ্রহণ। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের 'প্রথম পর্যায়ে' বা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে 'দ্বিতীয় পর্যায়ে উভয়ক্ষেত্রেই আদিবাসী, জনজাতি এবং উপজাতীয় অংশভুক্ত ভাগচাষী বা ক্ষেতমজুররা অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তেভাগা কৃষক সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। কোথাও কোথাও এই অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অংশগ্রহণ ছিল সংগঠিত উদ্যোগের ফল। দুটি পর্যায়ের কৃষক সংগ্রামেই দেখা যায় যে মূলত বাংলার উত্তরাঞ্চলের এবং ময়মনসিংহ বা পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর কৃষকরা তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় তেভাগা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে সর্বত্রই জোতদার ও পুলিশ বাহিনীর অত্যাচার ও সশস্ত্র আক্রমণের সম্মুখে আদিবাসী রমণীবাহিনী সব থেকে জঙ্গী ও আগ্রহী ভূমিকা গ্রহণ করত। এর পরিচয় মেলে দিনাজপুরের, রংপুরের, যশোহর ও রাজশাহীসহ ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসে। আদিবাসী কৃষকদের, ভাগচাষী বা ক্ষেতমজুরদের মধ্যে সাঁওতাল জনজাতি ছিল সর্বাধিক এবং তেভাগা কৃষক সংগ্রামে এদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান দেখা যায়। দিনাজপুরে আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল এক লক্ষ আটত্রিশ হাজারের কিছু বেশি। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাঁওতাল। জলপাইগুড়িতে যেমন আদিবাসীদের সঙ্গে রাজবংশী ও পাহাড়িয়া মানুষদের সম্মিলিত সংগ্রাম দেখা যায়। দিনাজপুর জেলায় সেক্ষেত্রে সাঁওতাল জনজাতির একক ভূমিকাই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

তেভাগা কৃষক আন্দোলন কোন দেশকাল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। বাঙলা তথা ভারতবর্ষে নানা ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত্রতন্ত্র বিরোধী গণবিক্ষোভের উত্তরাধিকার বহন করেই বাঙলার এই অভূতপূর্ব কৃষক সংগ্রাম ব্যাপক একটি আন্দোলনের আকারে সংগঠিত হয়েছিল। অবশ্য শেষপর্যন্ত বাঙলার প্রায় ৬০ লক্ষ ভাগচাষীর এই সংগ্রামকে কাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায়নি। ইতোপূর্বে গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনে অসংখ্য কৃষক অংশ নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও অভূতপূর্ব সংখ্যায় কৃষকের অংশগ্রহণ ঘটেছিল। কিন্তু ওই তিনটি গণ-আন্দোলনের সঙ্গে তেভাগা কৃষক সংগ্রামের মূল দুটি পার্থক্য বাঙলার মাটিতে চোখে পড়ে। প্রথমতঃ তেভাগা সংগ্রাম ছিল সর্বতোভাবে কৃষিভিত্তিক ও গ্রামকেন্দ্রিক একটি কৃষক অভ্যুত্থান। বাঙলার যে সকল অঞ্চলে এই কৃষক সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসব এলাকায় বা জেলার গ্রামীণ ক্ষেত্রে তা ভীষণ আলোড়ন তোলে। পক্ষান্তরে অবিভক্ত বাঙলায় কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত অসহযোগ, আইন অমান্য বা ভারতছাড়ো আন্দোলনগুলিতে যদিও কৃষক সমাজের অংশগ্রহণ ঘটেছিল তথাপি তা ছিল প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। জেলা সদর বা মফঃস্বল শহরগুলিতে ঐ তিনটি আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভালোভাবে অনুভূত হলেও সাধারণত গ্রাম বা কৃষিজীবনে তা কদাচিৎ আলোড়ন তুলেছিল।

দ্বিতীয়তঃ তেভাগা কৃষক সংগ্রাম ছিল সাধারণ কৃষক জনগণের অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদিও এই আন্দোলন বা সংগ্রামে রাজনৈতিক আদর্শবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল ছিল না এমনটি বলা চলে না। ফসলের অধিকার নিয়ে জোতদার জমিদরাসহ সামগরিকভাবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এই কৃষক অথুত্থানে ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচীও সুস্পষ্ট ছিল যা বাঙলা তথা ভারতের অন্য কোনও গণ আন্দোলনে সেভাবে দেখা যায়নি। তেভাগা কৃষক সংগ্রামের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী যে ঘম-অথ্যুত্থানের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম সে গণঅভ্যুত্থানের সর্বভারতীয় ধারারই একটি গুরুত্বপূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে, অন্তত তার রাজনৈতিক তাৎপর্য তাই ছিল।

৬.৭.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আব্দুল্লাহ রসুল, কৃষকসভার ইতিহাস কলকাতা, ১৯৮৩

সুস্নাত দাশ, অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম : তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার; কলকাতা, ২০০০

Bhattacharya Dipankar, *Peasant Movements in Bengal and Bihar,* R.B.U. 1992.

Bose, Sugata, *Agrarian Bengal : 1919-47,* O.U.P. Cambridge, 1986.

Cooper, Adrienne, *Sharecropping and Sharecroppers' struggle in Bengal :* 1930-50, K.P.B. 1988.

Custers Peter, *Women in the Tebhaga uprising :* 1946-47, Calcutta, 1987.

Sen, Sunil, *Agrarian Struggle in Bengal :* 1946-47, P.P.H., Delhi, 1972.

— *Peasant Movements in India,* K.P. Bagchi, Calcutta, 1982.

— *The Working Women and Popular Movements in Bengal,* Calcutta, 1985.

Sarkar, Sumi, *Modern India : 1885-1947,* Memillan, Delhi. 1983.

Guha, R., *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* O.U.P., New Delhi, 1983.

Desai, A.R. (Ed), *Peasant Struggles in India,* O.U.P., Bombay, 1979.

Dhanagare, D.N., *Peasant Movements in India : 1920-1950,* OUP. Delhi, 1983.

Chatterji, Partha, *Bengal : The Land Question, 1920-1947,* Vol. I, KPB, 1984.

Majumdar, Asok, *Peasant Protest in India Polities,* New Delhi, 1993.

Tripti Chaudhuri, 'Women in Radical Movements in Bengal in the 1940s. The Story of Mahila Atma-raksha Samiti.' in Mandakranta Bose (ed). *Faces of the feminine in Ancient, Medieval and Modern India.* Oxford. 2000.

B.B. Chaudhuri : Agrarian Movements in Bengal and Bihar : 1919-39 **Desai, A.R.** (ed), *op.cit.* 1979.

'The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar. 1885-1947'. ***Indian Historical Review,*** Vol-2, No. 1 July, 1975.

Gnanabrata Bhattacharya, An Examination of Leadership Entry in Bengal peasant Revolts; Journal of Asian Studies : No. 4, August, 1978.

Andre Beteille, Studies in Agrarian Social Structure (O.U.P.), 1974, pp-184-85.

৬.৭.১৪.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) What was the socio-economic background of the Tebhaga Movement in colonial Bengal?

(2) How did different stratum of Bengal Peasantry participate in the struggle of the share croppers in the pre and post-colonial period of India? Elucidate the role of women in Tebhaga Movement.

(3) Do you find any Spontaneity and Autonomy in the Tebhaga Peasant Movement in 1946-47? How far did B.B. Chaudhuri differ from the perception of Adrienne Cooper on this debate?

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৮

অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কৃতি

একক-১৫

(ক) বাংলায় স্বদেশী উদ্যোগ

(খ) রেলওয়ে ও শিল্পের প্রসার

(গ) কৃষি-অর্থনীতির ধারা এবং দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩) অভিঘাত

বিন্যাস ক্রম :

৬.৮.১৫.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

৬.৮.১৫.১ : বাংলায় স্বদেশী উদ্যোগ

৬.৮.১৫.২ : রেলওয়ে এবং শিল্পের প্রসার

৬.৮.১৫.৩ : কৃষি-অর্থনীতির প্রবণতা ও দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩) অভিঘাত

৬.৮.১৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৮.১৫.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৮.১৫.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) বাংলায় স্বদেশী উদ্যোগ ও স্বদেশী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং তার পরিণতি।

(২) রেলওয়ে ও শিল্পের প্রসার—ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা।

(৩) ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির মূল প্রবণতাসমূহ।

(৪) বাংলায় ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের নানা কারণ এবং এর ফলাফল।

৬.৮.১৫.১ : বাংলায় স্বদেশী উদ্যোগ

পটভূমি :

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে অর্থনৈতিক স্বদেশীর যোগাযোগ নিবিড়। দাম বেশি এবং গুণগতমান নিকৃষ্ট হলেও বিদেশি জিনিসের তুলনায় স্বদেশীর ব্যবহার কাম্য এবং লাভের পরিমাণ

কম হলেও এদেশীয় বিত্তবান শ্রেণীর স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে এগিয়ে আসা উচিৎ—এই ধরনের চিন্তাভাবনাই বাংলায় ১৮৭০ খ্রীঃ নাগাদ শুরু হয়ে ১৯০৫-এর দিনগুলিতে চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছিল। নানা বিতর্ক সত্ত্বেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ১৯ শতকে বাংলায় চিরাচরিত হস্তশিল্পের অবনমন ঘটেছিল। উৎপাদনের কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রেও অবনমনের ছাপ ছিল স্পষ্ট, মার্কসীয় ধাঁচে উৎপাদক থেকে বণিক এবং পুঁজিপতি হয়ে ওঠার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা এদেশে সম্ভব ছিল না। এমনকি প্রাশিয়া, জাপান কিম্বা রাশিয়ার মতো রাষ্ট্র নির্দেশিত শিল্পায়নও ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ছিল অসম্ভব। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে রাষ্ট্র রেলওয়ে, সামরিক শিল্প এবং যোগাযোগের মতো কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে শিল্প গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিল। এসব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার আশীর্বাদ মূলত ইউরোপীয়দের উপরেই বর্ষিত হয়েছিল। রামদুলাল দে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্রদের মতো এদেশীয় বণিক ও উদ্যোগপতিদের অপসারিত করে বৃটিশ পুঁজি বাণিজ্য এবং অর্থব্যবস্থাকে করায়ত্ত করেছিল। পাট, চা এবং কয়লার মতো নতুন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলোও ছিল বিদেশি-'ম্যানেজিং এজেন্সী' (Managing Agency) গুলির নিয়ন্ত্রণে এদেশীয় পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বৎজন শিল্পোন্নত, সমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের সঙ্গে দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতের প্রতিতুলনায় উপলব্ধি করেছিল যে এই দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদতা বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের সচেতন প্রয়াসের ফসল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলেই ধ্বংস হয়েছে ভারতের সমৃদ্ধ হস্তশিল্প এবং ভারত পরিণত হয়েছে বৃটিশ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী ও বৃটিশ শিল্পদ্রব্যের এক বিরাট বাজারে। এই শোচনীয় অবস্থা থেকে উত্তরণের পন্থা হিসাবে চিরাচরিত শিল্পের যেটুকু অবশেষ রয়েছে তাকে রক্ষা করে আধুনিক শিল্পায়নে ঝাঁপিয়ে পড়াকেই একমাত্র বিবেচ্য মনে হয়েছিল।

১৮৭০'এর দশক থেকেই জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিতে শিল্পায়নকেই ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্রের প্রতিষেধক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিতেও অপেক্ষাকৃত নরমভাবে হলেও কারিগরী শিক্ষার প্রসার, শুল্ক বৈষম্যের অবসানের দাবি উঠেছিল। আত্মশক্তির বিকাশে স্বদেশী ও বয়কটের প্রসঙ্গও তুলেছিলেন কেউ কেউ। অবশিল্পায়ন, সম্পদ নিষ্কাশনের ধারণা দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্করের মতো মধ্যপন্থীদের প্রচেষ্টায় জনমানসে ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যপন্থীদের কাছে শিল্পায়ন ছিল ভারতের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের একটি পর্যায়মাত্র, কিন্তু ১৯০৫ নাগাদ 'স্বদেশী' ও তার সম্পূরক বয়কটের ধারণাকে ভারতের তৎকালীন সব সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসাবে ভেবে নেওয়া হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল 'বয়কট' স্বদেশী দ্রব্যের একটি নিশ্চিত 'বাজার' তৈরি করবে এবং এদেশীয় কারিগর, উদ্যোগপতি ও বণিক শ্রেণীর হাতে অধিক অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হবে যা স্বদেশী শিল্পক্ষেত্রে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বদেশী শিল্পক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে। সৃষ্টি হবে বহু নিয়োগ বা চাকরির সম্ভাবনা।

শিল্পায়নের সম্ভাব্য পথ নিয়ে মতানৈক্য ছিল। মধ্যপন্থীরা আস্থা রেখেছিলেন আধুনিক, বৃহদায়তন কারখানানির্ভর শিল্পায়নে। যদিও, পরবর্তীকালে পশ্চিমী শিল্পায়নের আদর্শকে আংশিকভাবে অস্বীকার করে আস্থা অর্পিত হয় হস্তচালিত তাঁত এবং চরকার মতো হস্তশিল্পের উপর। যদিও ভারতের মতো দেশে এই দু'ধরনের শিল্পক্ষেত্রেই উন্নয়ন ছিল জরুরী এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আসলে শিল্পায়নের পথ সম্পর্কিত এই মতানৈক্যের কারণ ছিল এই যে শিল্পায়নের সঙ্গে অর্থনীতি ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক ও ধনবৈষম্য, শ্রেণীবিরোধ, নৈতিক অবক্ষয় প্রভৃতি—এড়িয়ে এমন এক 'ভারতীয়' রাস্তার প্রয়োজন অনুভূত হল সেখানে চিরাচরিত মূল্যবোধগুলি

অক্ষুণ্ণ রেখেই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব হবে। সতীশচন্দ্র মুখার্জী প্রস্তাব দিলেন রেলওয়ে, খনি, রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রগুলিকে বাদ দিয়ে অন্য সব ক্ষেত্রে ছোট ব্যক্তি এবং পরিবারনির্ভর শিল্পক্ষেত্রগুলিকে প্রসারিত করা উচিত। কারণ এর ফলে পুঁজিবাদী শোষণ এবং শ্রমিক সংগঠনের বিপজ্জনক রাজনীতি উভয়েই প্রতিহত হবে। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে এই ধরনের চিন্তাপ্রবাহকে সহজেই ১৯ শতকের শেষভাগের হিন্দু পুনঃজাগরণবাদের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। "Rejection of the West out of nationalist motives, rather than a genuine awarness of the evils of emergent industrial Society or any downtrodden in general-such seems to have been a dominat feature of Swadeshieconomic thought."

সূচনা :

বাংলায় স্বদেশী উদ্যোগের সূচনাকাল হিসাবে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দকে ধরা যেতে পারে। এই বছরেই স্বদেশী আদর্শের প্রসারের উদ্দেশ্যে 'হিন্দুমেলা' শুরু হয়। ঐ একই বছরে হাওড়ায় কিশোরীলাল মুখার্জী 'শিবপুর আয়রণ ওয়ার্কস' এর প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও ১৯শ শতকের শেষ দশকের আগে বিক্ষিপ্ততা ও দ্বিধাগ্রস্ততা কাটিয়ে অর্থনৈতিক স্বদেশী প্রকৃত আন্দোলনে পরিণত হতে পারেনি। এক্ষেত্রে ১৯০৫ খ্রীঃ জলবিভাজিকার কাজ করলেও ১৮৯০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত সময়কালকে 'একটিমাত্র সময়কাল' হিসাবেই গণ্য করা উচিৎ।

১৮৯০-১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে স্বদেশী অর্থনৈতিক কার্যকলাপে পাঁচটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়— কারিগরী শিক্ষা ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা সংগঠিত করা; প্রদর্শনী, মেলা, দোকান ইত্যাদির মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করা; চিরাচরিত দেশীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা; আধুনিক প্রকৌশলনির্ভর নতুন শিল্প গড়ে তোলা; এবং স্বদেশী ব্যাঙ্ক; ইনসিওরেন্স বা বীমা সংস্থা, আন্তর্দেশীয় জাহাজ চলাচল প্রভৃতি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

কারিগরী শিক্ষার প্রসারের আন্দোলন শুরু হয় ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রমথনাথ বসু'র পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে এই পুস্তিকায় তিনি একটি পৃথক 'Science and Technological Institute' এবং একটি 'Society for the Development of Indian Indsutries' প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। কারিগরী শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians.' ইতিমধ্যে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের বিষয়টি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীতে পরিণত হয় এবং Bengal National College এবং Bengal Technical Institute সাগ্রহে কারিগরী শিক্ষাপ্রসারে এগিয়ে আসে।

হিন্দু মেলার ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ১৮৯৩ থেকে Industrial Association স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে থাকে। প্রদর্শনী ছাড়াও নিয়মিতভাবে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রীর জন্য ১৮৯১ খ্রীঃ থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশী ভাণ্ডার' অথবা সরলা ঘোষাল প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষীর ভাণ্ডার' উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ এর পরবর্তীকালে এধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হস্তশিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল, বিশেষত তাঁতশিল্প। ১৯০২ থেকেই E.B. Havell 'fly-shuttle' যুক্ত তাতকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছিলেন। National Fund-এর টাকায় ১৯০৫ এর ডিসেম্বরে একটি তাঁতশিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাও হয়েছিল।

আধুনিক শিল্পস্থাপনের প্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৯৩ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত 'Bengal Chemical and Pharmaceutical works' (প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়) Calcutta Pottery Works, বঙ্গলক্ষী কটন মিল, মোহিনী মিল, National Tannery, National Soap factory ইত্যাদি। ১৯০৭-০৮ খ্রীঃ থেকে স্বদেশী উদ্যোগ ব্যাঙ্ক, বীমা, আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের দিকে প্রসারিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় Bengal Natioanl Bank, Cooperative Hindustan, National Insurance, Eastern Life Insurance, Bengal Steam Navigation Company, The East Bengal River Steam Service-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি।

কৃষি ক্ষেত্রেও স্বদেশী উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত কৃষিতে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে দেওঘরে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। স্বদেশী সূতিবস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরবরাহের জন্য Indian Cotton Cultivation Company'র প্রচেষ্টায় সাঁওতাল পরগণার মালুটিতে তুলো চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পরিণতি :

স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের ব্যর্থতা একপ্রকার অবধারিতই ছিল। অধ্যাপক সুমিত সরকারের ভাষায় 'A sense of anticlimax is difficult to avoid in any Survey of swadeshi business achievements.' স্বদেশী শিল্প ভাবনার শুরুতে স্বদেশী শিল্পক্ষেত্রে জোয়ারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের নীট ফল ছিল ক্ষণজীবি কিছু ভোগ্যপন্ন উৎপাদনকারী সংস্থা, কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও কিছু বাণিজ্যিক এবং বীমা প্রতিষ্ঠান, পাট, চা, কয়লার মত শিল্পক্ষেত্রগুলিতে বৃটিশ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। আসলে এই ব্যর্থতা অবধারিতই ছিল। স্বদেশী শিল্পদ্যোগীদের পরিশ্রম, সততা ও আদর্শবোধের অভাব ছিল না এবং এর মাধ্যমেই রাসায়নিক, সিরামিক, চর্মশিল্প ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে শূন্য থেকে শুরু করেও সাফল্য এসেছিল। কারিগরী জ্ঞানের অভাবও প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারেনি। বয়কট আন্দোলন স্বল্প সময়ের জন্য হলেও স্বদেশী শিল্পকে সংরক্ষণ দিয়েছিল। কিন্তু লৌহ-ইস্পাত বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মতো ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। সরকারী বরাত ছাড়া এধরনের শিল্পদ্রব্য বাজারজাত করা সম্ভব ছিল না। সরকারী মনোভাব তত্ত্বগতভাবে 'স্বদেশী' বিরোধী না হলেও স্বদেশী উদ্যোগপতিরা এক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য বা পরামর্শ পায়নি বললেই চলে। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষণাদানের সরকারী নীতি অব্যাহত ছিল।

স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল মূলধনের অভাব। বাংলার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও জমিদারদের মধ্যে খুব অল্পকয়েকজনই স্বেচ্ছায় শিল্পস্থাপনে এগিয়ে এসেছিলেন। যেমন কাশিমবাজার, গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, ভাগ্যকুলের জমিদারেরা, ডাঃ নীলরতন সরকার অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর মতো মানুষেরা। এ যুগের সর্বাপেক্ষা সফল বাঙালী উদ্যোগপতি রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সাফল্যের মূলে অবশ্য অ্যাকুই, মার্টিন-এর মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগই মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বদেশী উদ্যোগের মূলধন এসেছিল বৃহৎ

পুঁজিপতিদের কাছ থেকে নয়, বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চয় থেকে এদেশীয় বণিকসম্প্রদায়ের কাছে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় ছিল আমদানী করা বিদেশি দ্রব্যের ব্যবসার সহজ লভ্যাংশ। জমিদার, ব্যবসায়ী ও দেশীয় বণিকদের একটি বৃহৎ অংশকে বোঝান সম্ভব হয়নি যে জমিদারী বিলাতী দ্রব্যের ব্যবসা অথবা মহাজনী ব্যবসার মতো শিল্পোদ্যোগও সমান লাভজনক হতে পারে। বৃটিশ এজেন্সী হাউসগুলির মতো সফলভাবে ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগের একীকরণ এদেশীয়রা করতে পারেনি। বস্তুতঃ ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য, পাইকারী বাণিজ্য ও পুঁজির বাজার এমন কঠোর ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল যে আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে এই বাধা অতিক্রম করে স্বদেশী উদ্যোগপতিদের প্রবেশ ছিল অসম্ভব। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে 'The well-entrenched foreign domination over the 'Commanding heights of Bengal's economy thus set severe limits to the realisation of patriotic dreams.

৬.৮.১৫.২ : রেলওয়ে এবং শিল্পের প্রসার

রেলওয়ে :

আধুনিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে রেলওয়ে/রেলপথ নির্মাণের ও প্রসারের সিদ্ধান্তকে ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বিরাট অবদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসীর রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্তের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সামরিক ও রাজনৈতিক। রেলপথের মাধ্যমে সীমান্ত অঞ্চলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর অবাধ চলাচল সাম্রাজ্যের সুরক্ষা জোরদার করবে বলে মনে করা হয়েছিল। অবশ্য রেলপথের মাধ্যমে ভারতীয় কাঁচামাল সংগ্রহ ও ভারতীয় বাজারের বিস্তার ঘটানোর বাণিজ্যিক কারণও ছিল। John M. Hurd-এর মতে রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্তের ফলে উপমহাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। পরিবহণ দ্রুত ও সহজলভ্য হয়েছিল, পরিবহণ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার ফলে লাভের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছিল। আঞ্চলিক বিশেষত্ব' তৈরি হয়েছিল। বাণিজ্য বেড়েছিল 'From a country of many segmented markets, separated from each other by the high costs of transport, India became a nation with its local centres linked by rail to each other and to the world. Railways by establishing these links, had an impact throughout the Indian economy'.

সামরিক কারণ ও বন্দর শহরগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও কাঁচামাল উৎপাদক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেও একাজের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষমতা ঔপনিবেশিক সরকারের ছিল না। এজন্য প্রয়োজনে ভারতীয় রাজস্ব থেকে ভর্তুকি দিয়ে ৫% (পাঁচ শতাংশ) লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতি (gurantee) দিয়ে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হ'ল। রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ব্রিটিশ কোম্পানীগুলিকে নিরানব্বই বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হল। ইজারা শেষ হবার পর রেলপথগুলি সরকারী হাতে যেতে পারত। এককথায় ব্রিটিশ কোম্পানীগুলি আটানব্বই বছর পর্যন্ত ৫% নিশ্চিত লভ্যাংশ এবং তারপরেও তাদের সমস্ত পুঁজি ফেরৎ পাবার আশ্বাস পেয়েছিল। এর ফলে ভারতে রেলওয়ে প্রকল্পগুলি হয়ে উঠেছিল 'an instance of private enterprise at public risk'। অতএব, ভারতীয় রেলপ্রকল্পগুলি যে বিপুল

পুঁজি আকর্ষণ করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। ১৮৫৮ খ্রীঃ থেকে ১৮৬৯ এর মধ্যে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমান ছিল ৭০,১১০,০০০ পাউণ্ড। ১৮৬০ এ ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ১৩৩৯ কি.মি.। ১৮৬৭ তে ১৯ টি ভারতীয় শহর রেলপথের দ্বারা যুক্ত হয়েছিল। ১৯২০ তে রেলপথের দৈর্ঘ্য বিস্তৃত হয়েছি ১,৫৬,৯৮০ কিমি পর্যন্ত।

ভারতে রেলপথ নির্মাণের নকশা থেকেই একথা স্পষ্ট যে ঔপনিবেশিক দেশের বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই বিচ্ছিন্ন ভারতীয় পশ্চাদভূমিকে বন্ধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এজন্যই রেলপথ নির্মাণে আভ্যন্তরীণ বাজারগুলিকে যুক্ত করার চেষ্টা না করে জোর দেওয়া হয়েছিল বন্দরগুলির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাজারের সংযুক্তির উপর। অর্থাৎ রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। রেলপথে পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক ব্যবস্থা ছিল বৈষম্যমূলক। বন্দর থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর এবং বন্দরমুখী কাঁচামালের ক্ষেত্রে শুল্ক ছিল কম। অথচ এর বিপরীত ব্যবস্থাই কাম্য ছিল। এই বৈষ্যমূলক শুল্ক ব্যবস্থাও ভারতে শিল্পস্থাপনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। যন্ত্রপাতি, রেললাইন, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে কয়লাও ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করার ফলে ব্যাপক রেলপথ নির্মাণের, 'Multiplier effect' ও ব্রিটিশ অর্থনীতিকেই সমৃদ্ধ করেছিল। প্রকৌশলের ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র নিম্নস্তরের প্রকৌশলের হাতবদল ঘটেছিল। উচ্চস্তরের প্রকৌশলগত জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞরা ইংল্যাণ্ড থেকে আসত। ফলতঃ কোন সত্যিকারের ভারতীয় প্রকৌশল গড়ে উঠতে পারেনি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিকাশী ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে রেলপথ নির্মাণের কাজ হয়েছিল। বাংলার ক্ষেত্রে রেলপথ প্রসারণের সঙ্গে ১৯ শতকে ম্যালেরিয়া মহামারীর যোগসূত্রটি ডঃ অরবিন্দ সামন্ত'র লেখায় স্পষ্ট।

রেলপথ নির্মাণে সরকারী 'গ্যারান্টি'র মাধ্যমে একদিকে বিপুল ভারতীয় সম্পদের নির্গমন ঘটেছিল, অন্যদিকে অনেক অপ্রয়োজনীয় ও অলাভজনক রেলপথ তৈরি হয়েছিল। ভারতের ব্রিটিশ সরকারও সামরিক সুবিধার্থে এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরাসরি রেলপথে বিনিয়োগ করেছিল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের একটি বড় অভিযোগ ছিল এই যে রেলপথ নির্মাণে বিনিয়োগের তুলনায় সেচব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিনিয়োগ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনেক ফলপ্রসূ হতে পারত। কিন্তু দ্রুত লভ্যাংশ আদায়ের মানসিকতা ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে সেচব্যবস্থার উন্নতির তুলনায় রেলপথ নির্মাণকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

আসলে ইউরোপের শিল্পায়নে রেলপথ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই ভূমিকা পালন করেনি। কৃষিক্ষেত্রে তুলনামূলক অগ্রগতি হলেও কৃষি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে ওঠেনি। তবুও ভারতে রেলপথ বিস্তারের সদর্থক দিকগুলিকে অস্বীকার করা উচিত হবে না। ১৯৪৬/৪৭'এ ভারতবর্ষের ৭৮% অঞ্চলে রেলপথের বিস্তার ঘটেছিল। সহায়ক রাস্তাঘাট এবং অনান্য যোগাযোগের উন্নতি ঘটেছিল। ফলতঃ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। মানুষ এবং পণ্য চলাচলের সহজ এবং সস্তা সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতীয় বাজারের বিচ্ছিন্নতা দূর করে তাকে সংহত করার ক্ষেত্রে রেলপথ নির্মাণেব গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভারতীয় সমাজের উপর, সংস্কৃতির উপর রেলপথের বিস্তারের প্রভাবও কিছু কম ছিল না। এক্ষেত্রে একথা মনে রাখা উচিৎ যে উপরোক্ত সদর্থক ফলগুলি উপনিবেশিক সরকারের ভাবনার পরিধির বাইরে ছিল এবং অবশ্যই কাম্য ছিল না।

অন্যান্য শিল্প :

ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের একটি প্রত্যক্ষ ফল হল ভারতের চিরাচরিত হস্তশিল্পের ধ্বংসাসাধন। এই 'অবশিল্পায়নে'র কারণ, প্রকৃতি এবং পরিধি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ১৮০৯ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হস্তশিল্পে নিযুক্ত মানুষের, বিশেষত কাটনি এবং তাঁতীদের, সংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল।

১৮১৩ খ্রীঃ থেকেই ভারতে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করে ভারতকে ব্যক্তিগত বৃটিশ পুঁজির বিনিয়োগের একটি লাভজনক ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হতে থাকে। সরকারীভাবে মুক্তবাণিজ্যের বা laissez-faire নীতির কথা বলা হলেও ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন মোটেই 'নৈশপ্রহরী'র ভূমিকা পালন করেনি। বরং ঔপনিবেশিক সরকার এমন কিছু 'বাজার সম্পর্ক রহিত' চাপসৃষ্টিকারীর ভূমিকা পালন করেছে যা শিল্পক্ষেত্র থেকে ব্রিটিশদের ভারতীয় প্রতিযোগীদের সরে যেতে বাধ্য করেছে। ভারতে মূলধনের বাজার ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলির কুক্ষিগত থাকার ফলে ইউরোপীয় উদ্যোগপতিরা ব্যাঙ্ক ও এজেন্সীহাউসগুলির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহজেই পুঁজির ইউরোপীয় উদ্যোগপতিরা ব্যাঙ্ক ও এজেন্সীহাউসগুলির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহজেই পুঁজির সংস্থান করতে পেরেছে। অন্যদিকে ভারতীয় উদ্যোগপতিদের নির্ভর করতে হয়েছিল, পরিবার, আত্মীয়স্বজন অথবা বর্ণগোষ্ঠীগুলির সাহায্যের উপর। বৃটিশ বণিক ও শিল্পপতিরা চেম্বারস অব কমার্স এবং ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসগুলির মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে দেশীয় পুঁজিপতিদের হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। ম্যানিজিং এজেন্সী হাউসগুলি নানা আইনী চুক্তিব্যবস্থার মাধ্যমে একইসঙ্গে অনেকগুলি সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। এদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব এবং বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব দেশীয় শিল্পোদ্যোগের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে প্রথম, মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্যন্ত ৬০টি এজেন্সী হাউস, পাট শিল্প, কয়লা শিল্প এবং চা শিল্পের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতের মোট শিল্প পুঁজির ৭৫% ছিল এদের হাতে।

অতএব, একথা বলা অসঙ্গত হবে না সে ভারতবর্ষে যেটুকু শিল্পায়ন হয়েছিল তা হয়েছিল প্রধানত ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগের মাধ্যমে যার লভ্যাংশ নিয়মিতভাবে 'নিষ্কাশিত' হত ভারতের বাইরে এবং এই প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির দায় ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এ ধরনের 'অর্থনৈতিক পক্ষপাতিত্বের' সবচেয়ে বড় নিদর্শন আসামের চা শিল্প, (যা ১৯৫০ পর্যন্ত ব্রিটিশ পুঁজির নিয়ন্ত্রণ ছিল), কয়লা শিল্প এবং পাট শিল্প। পাট শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সংগঠিত বৃটিশ পুঁজি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। যদিও ১৯২০'র দশক থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক মাড়োয়ারী সম্প্রদায় অংশীদারিত্ব ক্রয়, ঋণ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে ম্যানেজিং এজেন্সীগুলিতে প্রবেশ করে পূর্ব-ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে ব্রিটিশ মুষ্টি শিথিল করার চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৩০'এর দশকে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২-৪৫ খ্রীঃ মধ্যে তারা বড় ইউরোপীয় সংস্থাগুলিকে কিনে নিতে থাকে এবং ১৯৫০ নাগাদ পূর্বভারতের পুরোনো শিল্পক্ষেত্রগুলি মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়।

পশ্চিম ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন দেরীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক গুজরাটি বানিয়া, পার্শি, বোহ্‌রা বা ভাটিয়াদের মতো চিরাচরিত বণিক সম্প্রদায় তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যা এদেরকে শিল্পোৎপাদনে, বিশেষতঃ সুতীবস্ত্র উৎপাদনে, উৎসাহিত করেছিল। বম্বে, অহমদাবাদ, শোলাপুর ইত্যাদি অঞ্চল দেশীয় বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রহিসাবে গড়ে ওঠে। যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক এবং প্রকৌশলগত জ্ঞানের জন্য বিদেশি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলেও হয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প আভ্যন্তরীণ বাজারে তার একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বিদেশি বাজারে ল্যাঙ্কশায়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে টাটা আয়রন স্টীল কোম্পানী প্রথম মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালে সরকারী পৃষ্ঠপোষণা পেলেও ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সেরকম সরকারী আনুকূল্য পায়নি। তা স্বত্বেও ১৯৩৮-৩৯ Tisco 'র উৎপাদন ছিল গড়ে ৬,৮২,৫০০ টন যার ৬৬% ই ভারতে ব্যবহৃত হত। বস্ত্রশিল্প ও ইস্পাতশিল্প ছাড়াও দুই-বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে জাহাজ, কয়লা, চিনি, কাগজ, কাচ, দেশলাই, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি ঘটেছিল। এই উন্নতির মূলে ছিল বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় শিল্পে সরকারী সংরক্ষণের (protection) নীতি। কিন্তু এই শিল্পগুলির বিকাশের সম্ভাবনা কেবলমাত্র দেশীয় বাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ভারতীয় জনগণের নিঃসীম দারিদ্র সে বাজারকে স্থায়ীভাবে সঙ্কুচিত করে রেখেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে নিষ্কৃতি না মিললে ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের ও অর্থনৈতিক উন্নতির আশা ছিল সুদূর পরাহত।

৬.৮.১৫.৩ : কৃষি অর্থনীতির প্রবণতা ও দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩) অভিঘাত

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনে অর্থনীতির উন্নয়ন হয়েছিল কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিকমহলে বিতর্ক রয়েছে। তবে মতানৈক্য স্বত্বেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে অর্থনীতির অনন্য ক্ষেত্রের মতো কৃষিতেও ঔপনিবেশিক শাসনে কোন প্রকৃত উন্নতি হয়নি। কারণ উপনিবেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক দেশের (এ ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড) স্বার্থ অনুযায়ী। যেটুকু উন্নয়ন হয়েছিল স্থান ও কালের নিরিখে যেখানে তারতম্য ছিল বিস্তর এবং অর্থনীতির এই বদ্ধাবস্থা কাটানোর জন্য সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন বিনিয়োগ সরকারী অনীহা ছিল প্রবল।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ছিল জরুরী। কিন্তু সেচখাল নির্মাণে বৃটিশ সরকারের উদ্যোগ সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষে। এর মূল কারণ ছিল যে উপরোক্ত এলাকাগুলি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাইরে এবং সেচের উন্নতি ঘটিয়ে এই এলাকাগুলিতে ভূমিরাজস্বের হার বাড়ানোর সুযোগ ছিল। ১৯০০ থেকে ১৯৩৯'এর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ দু'গুণ বাড়লেও অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়ে ভারতে চাষযোগ্য জমির ১/৪ অংশ মাত্র সরকারী সেচব্যবস্থার আওতায় এসেছিল। সেচব্যবস্থার সুযোগ প্রসারিত না হওয়ার কারণ হিসাবে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কিম্বা আঞ্চলিক ক্ষমতাদ্বন্দ্ব ইত্যাদি নানা কারণে থাকলেও, মূল কারণ ছিল এই যে অনান্য ক্ষেত্রের মতো সেচব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রেও সরকারী বিনিয়োগের মাপকাঠি ছিল দ্রুত লভ্যাংশ আদায়। ফলতঃ দু-একটি ছোট অঞ্চলের আপাত সমৃদ্ধি হলেও সামগ্রিকভাবে সরকারী সেচব্যবস্থা

ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সেচকর অত্যন্ত বেশি হওয়ায় যেখানে যেখানে সরকারী সেচের সুযোগ পৌঁছেছিল সেখানেও কৃষকদের সম্পন্ন অংশই এই সুবিধা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ পাঞ্জাবের কথা বলা যেতে পারে সেখানে সেচব্যবস্থার প্রসারের কল্যাণে বর্ধিত উৎপাদনের কারণে অর্জিত সমৃদ্ধির সুফল ভোগ করেছিল অল্প কয়েকটি কৃষিজীবী বর্ণ এবং কিছু বড় এবং মাঝারী জমিদার। গরীব কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অবস্থার কোন পরিবর্তন আসেনি। সাধারণভাবে সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে কোথাও কোথাও কৃষি উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছিল এবং নতুন প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু সুফলগুলি ভোগ করেছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগী অংশ। এর ফলে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের প্রবণতাও বেড়েছিল, অন্ততপক্ষে দু-একটি অঞ্চলে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষি উৎপাদন বদ্ধাবস্থায় ছিল। বিশেষতঃ ১৯২০-১৯৪৭ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদরে হার ছিল অনেক কম। ফলতঃ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতে প্রায়-দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা প্রায়শই ঘটত।

কৃষির বাণিজ্যিকরণ এবং তজ্জনিত কারণে কৃষিজীবী সমাজের স্তরবিন্যাস, পুঁজির সঞ্চয় এবং বাজারমুখী উৎপাদনকে ঔপনিবেশিক শাসনে পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদনের দিকে অগ্রসরতার নমুনা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ভারতের মতো দেশে এই ধরনের প্রবণতাগুলি কৃষি সমাজের ভিতর থেকে উঠে আসেনি। এই ধরনের পরিবর্তনগুলি ছিল ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃক আরোপিত এবং সেজন্যই এর সুফলগুলিও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় কৃষিসমাজ ভোগ করতে অসমর্থ ছিল। উদাহরণ হিসাবে বাংলায় নীল চাষের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা মূলত 'remittance trade' এর প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল, বলে পুরোপুরি বাগিচা অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেনি এবং জবরদস্তিমূলক হয়ে উঠেছিল যার পরিণতি ১৮৫৯-৬০ 'এর নীল বিদ্রোহ। অনান্য ক্ষেত্রে চড়া ভূমিরাজস্বের দাবি, রাজস্ব নগদে মেটানোর নিয়ম এবং ঋণগ্রস্ততাই চাষীদের বাণিজ্যিক শস্য চাষে প্ররোচিত করেছিল। ব্যক্তিগত লাভের জন্য বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন ধনী কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওঠাপড়া এধরনের বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল। উদাহরণ হিসাবে পশ্চিম ভারতে তুলো চাষের কথা বলা যেতে পারে। আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় তুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দাক্ষিণাত্যের তুলো চাষীরা সাময়িক সমৃদ্ধির স্বাদ পেলেও অচিরেই (গৃহযুদ্ধ শেষে) ভারতীয় তুলোর চাহিদা কমে যাওয়ায় সঙ্কটের মুখে পড়ে, যার ফলশ্রুতি ১৮৭০'এর দশকের দুর্ভিক্ষ ও কৃষিবিদ্রোহ। পূর্ববঙ্গের পাটচাষীরা অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটাতে পাট চাষে উদ্যোগীহলেও পাটের বাজারের তেজীভাবের সুযোগ প্রাথমিক উৎপাদকেরা গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ পাটকল মালিক ও রপ্তানীকারকরা, যাদের অধিকাংশই ছিল বৃটিশ, ক্রেতা হিসাবে পাটের বাজারে এমন একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে কাঁচা পাটের মূল্য নিয়ে দরকষাকষির কোন সুযোগই পাট উৎপাদকদের ছিল না।

ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষির বাণিজ্যকীকরণের ফল হয়েছিল '....that the capitalists captured the most or all of the increase in value-added. The rich may have become richer. But that does not mean that the poor got poorer. For, total income has increased (Dr. Tirthankar Roy) কিন্তু যে পরিস্থিতিতে ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্রের অবস্থা থাকে অপরিবর্তনীয় তাকে উন্নয়ন বলা সঙ্গত কিনা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ একটি শক্তিশালী গ্রামীণ পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে এবং

কৃষি সমাজের অধিকাংশের দারিদ্র সুনিশ্চিত করেছে অথবা খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমিতে বাণিজ্যিক শষ্যের উৎপাদন খাদ্যশষ্যের অভাবজনিত দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছে—এ ধরনের দাবি করাও হয়তো সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত নয়। তবে সামগ্রিকভাবে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সুফল কৃষিজীবি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভোগ করতে পারেনি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন পরিকাঠামো এবং বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়ে, দেশীয় বিচ্ছিন্ন বাজারগুলিকে সংহত করে 'খাদ্য-নিরাপত্তা' জোরদার করেছিল যার ফলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা কমে এসেছিল—এ জাতীয় দাবি সে কতটা আসার ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে ১৯৪৩ 'এ বাংলার মন্বন্তর তার প্রমাণ।

১৯৪৩'এর মন্বন্তর :

অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে 'Direct British rule and begun with a famine in 1770; it was (now) drawing to a close with a comparable calamity : শুরু ও শেষের দুই মন্বন্তরের মধ্যেই ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের অগ্রগতির প্রকৃত রেখাচিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক ধ্বংসলীলা ভারতকে সেভাবে স্পর্শ না করলেও যুদ্ধজনিত অন্যান্য দুর্ভোগ লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফিতী, দুর্নীতি খাদ্যাভাব ও কালোবাজারী—ভারতীয় জনগণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অবশেষে এসেছিল ১৯৪৩'এর মহামন্বন্তর।

মেদিনীপুরের বিধ্বংসী সাইক্লোনের মতো দু'একটি প্রাকৃতিক কারণ থাকলেও ১৯৪৩'এর বাংলায় মহামন্বন্তর যে অবশ্যই 'মনুষ্যসৃষ্ট' (Man-made) ছিল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। মন্বন্তরের পূর্ববর্তী দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে চালের মাথাপিছু 'entitlement' (per capita entitlement of rice) ক্রমশ কমে আসছিল। ১৯৪৩'এ বিভিন্ন কারণে সংকট চরমে পৌঁছায়। খোলা বাজারে চাল বিক্রীর ব্যবস্থা যা বরাবরই ছিল নড়বড়ে এবং অনিয়ন্ত্রিত—সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে ফাটকাবাজি ও চালের মজুতদারী বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের কারণ বার্মা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। এধরনের ঘাটতি বাজারে যে কোন দায়িত্বশীল সরকারের প্রধান কর্তব্য ছিল আসন্ন অনাহারের বিপদ থেকে প্রজা সাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু যুদ্ধ ও সামরিক প্রয়োজনের অজুহাতে যেটুকু চাল বাজারে অবশিষ্ট ছিল তার বড় অংশ সরকার গুদামজাত করল। জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় গৃহীত 'denial policy' বাংলার গ্রামাঞ্চলের পরিবহণ পণ্য চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিল। বার্মা থেকে আগত ভারতীয় শরণার্থী স্রোত ঘটনাপ্রবাহকে আরও জটিল করে তুলেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ফাটকাবাজী, মজুতদারী রোধে অথবা দুর্ভিক্ষ-ত্রাণে সরকার কোন আগ্রহ দেখায়নি। পরবর্তীকালে গৃহীত সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থাও শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার মতো শহরগুলিকে মন্বন্তরের হাত থেকে রক্ষা করা। মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি বা হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটির ত্রাণকার্যের লক্ষও মূলত: ছিল শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত মানুষ। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের ত্রাণের কোন ব্যবস্থা হয়নি। ১৯৪৩'এর গ্রীষ্ম ও শরতে লক্ষ লক্ষ মানুষ 'ফ্যান দাও' ধ্বনিতে কলকাতার বাতাস বিষাদময় করে তুলল। কলকাতার রাজপথ থেকে গলি সর্বত্র কঙ্কালসার নরনারীর মৃতদেহ দর্শন নাগরিক অভ্যাসে পরিণত হল।

১৯৪৩'এর মন্বন্তর ঠিক কত মানুষের প্রাণ নিয়েছিল তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতে প্রায় তিরিশ লক্ষ (৩ মিলিয়ন) মানুষ মন্বন্তরে বলি হয়েছিল। পল গ্রীনোর মতে সংখ্যাটি ৩.৫ মিলিয়ন থেকে ৩.৮ মিলিয়ন। টম ডাইসন ও অরূপ মহারত্নের মতে মৃতের সংখ্যা ২.১ মিলিয়ন। সংখ্যা নিয়ে মতৈক্য না থাকলে এ বিষয়ে সবাই একমত যে এতবড় বিপর্যয় উপমহাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালে আসেনি। মন্বন্তরের তীব্রতা কমে এলেও ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত কারণে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও গুটি বসন্তের মতো মহামারীতে মৃতের সংখ্যাও কম ছিল না। ১৯৪৩'এর পরবর্তী বছরগুলিতে বাংলায় স্বাভাবিকের তুলনায় উচ্চ মৃত্যুহার উপরের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার তমলুক-কন্টাই-ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চল এবং ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা। বাংলার ক্ষুদ্র চাষীরা মারাত্মক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯৪৩-এই প্রায় ৬ লক্ষ চাষী তাদের জমি হারিয়েছিল। ২০% গবাদি পশু ধ্বংস হয়েছিল। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষিমজুর (agricultural labourer) সম্প্রদায়। শুধুমাত্র ফরিদপুর জেলার পাঁচটি গ্রামে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে একবছরেই (১৯৪৪) ৪০.৩% কৃষি মজুর কমেছে।

১৯৪৩ এর মন্বন্তরের একটি লক্ষণীয় বিষয় হল খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি, দুষ্প্রাপ্যতা, দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু কিন্তু কোন খাদ্যদাঙ্গার সৃষ্টি করেনি। শহরের মানুষের প্রতিক্রিয়াও ছিল মিশ্র। 'The City has mixed reaction to this invasion of death and disease. Indifference and sympathy, shock and revulsion–Calcutta expressed the whole range of feelings' হিংসা, লুঠতরাজের মতো ঘটনা না ঘটলেও মন্বন্তরের মতো ঘটনা বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর অবিশ্বাস ও ঘৃণার সম্পর্ক তৈরি করেছিল। পল গ্রীনোর মতে 'Violence..turned 'inward' and 'downward' destroying all conventional relationship of partronage and depedency.'

৬.৮.১৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (SUGGESTED READINGS)

1. Prof. Sumit Sarkar – Swadeshi movement in Bengal.
2. অধ্যাপক সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত।
3. অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশী থেকে পার্টিশন।
4. অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)।
5. Amartya Sen–Poverty and famines : An essay on entitlement and deprivation.
6. Paul R. Greenough–Prosperity and Misery in Modern Bengal : The Famine of 1943-1944.
7. Essay on Railways by John. M. Hurd in Dharma Kumar edited The Cambridge Economic History of India, Vol-II
8. Tirthankar Roy–The Economic History of India. 1857-1947.

৬.৮.১৫.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (ASSIGNMENT)

1. Discuss the background of the rise of 'economic Swadeshi' in Bengal. What were the main features of 'economic Swadeshi' in Bengal?

   (বাংলায় 'অর্থনৈতিক স্বদেশীর' ভাবনার পটভূমি আলোচনা কর। অর্থনৈতিক স্বদেশীর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী?)

2. Why Swadeshi enterprises in Bengal failed to achieve its goal?

   (বাংলায় স্বদেশী উদ্যোগ লক্ষ্য পূরণের ব্যর্থ হয়েছিল কেন?)

3. What were the motives of the colonial administration behind introduction of railways in India? Do you think that introduction of railways had a positive effect on Indian economy?

   (ভারতে রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? তুমি কি মনে কর ভারতের অর্থনীতির উপর রেলপথ নির্মাণের প্রতিক্রিয়া সদর্থক ছিল?)

4. What role was played by the colonial Government in industrialising India? Do you think that the British Governement palyed the role of a 'night-watchman'?

   (ভারতের শিল্পায়নে ঔপনিবেশিক সরকারের কী ভূমিকা ছিল? তুমি কি মনে কর যে বৃটিশ সরকার এক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'নৈশপ্রহরীর' ভূমিকা পালন করেছিল?)

5. Disucss the main trends of Indian agriculture during colonial reule.

   (ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির মূল প্রবণতাগুলি আলোচনা কর।)

6. Discuss the main causes of Bengal Famine of 1943 and its effects on agrarian economy of Bengal.

   (বাংলায় ১৯৪৩' এর মন্বন্তরের কারণগুলি এবং বাংলার কৃষি অর্থনীতির উপর এর ফলাফল আলোচনা কর)।

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৮

একক-১৬

(a) Decline of Indigenous Education

(দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন)

(b) Western Education, National Council of Education

(পাশ্চাত্য শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ)

(c) University Education and the Educated Bengalis

(বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়)

বিন্যাস ক্রম :

৬.৮.১৬.১ : উদ্দেশ্য

৬.৮.১৬.২ : পুরাতন দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ভাঙন

৬.৮.১৬.৩ : দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন

৬.৮.১৬.৪ : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬)

৬.৮.১৬.৫ : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

৬.৮.১৬.৬ : শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়

৬.৮.১৬.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.৮.১৬.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৮.১৬.১ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে জানা যাবে :

(১) বাংলায় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল।

(২) দেশীয় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্বরূপ কেমন ছিল।

(৩) দেশীয় শিক্ষার ভাঙন কিভাবে ও কেন হয়।

(৪) বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার কিভাবে হয়েছিল।

(৫) কারা কারা পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রহণী ভূমিকা নিয়েছিল।

(৬) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কিভাবে ও কখন গঠিত হয়।

(৭) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যাবলী কি ছিল।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বাংলাদেশে কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীদের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল এবং তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কতটা সমৃদ্ধ করেছিল।

কোন দেশের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করে ইংরেজরা ভারতীয় জনগণকে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্যের ব্যাপক ও গভীর সাফল্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে কোম্পানির সরকারের হস্তক্ষেপের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল শিক্ষা এবং বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন।

৬.৮.১৬.২ : পুরাতন দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ভাঙন (Decline of Indigenous Education)

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাংলায় এক সহজ ও স্বচ্ছন্দ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। F.W. Thomas তাঁর 'History and Prospects of British Education in India' গ্রন্থে লিখেছেন যে ''ভারতের ইংরেজরা প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন।'' ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে উইলিয়াম এ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণী পেশ করেন তা থেকে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক) দেশীয় শিক্ষা :

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল - 'পাঠশালা' ও 'মক্তব'। এইসব গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলি চেহারা সারা ভারতে প্রায় একইরকম ছিল। সাধারণত পাঠশালায় হিন্দু ছাত্ররা পড়াশুনা করত। আর মক্তবে পড়ত মুসলমান ছাত্ররা। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন বিচার বিভাগে বিশেষ সুবিধা পাবার জন্য কিছু হিন্দু ছাত্র মক্তবে পড়াশুনা করতে যেত। সাধারণভাবে ফারসী ভাষার বিদ্যালয়গুলিকে বলা হত মক্তব। আর ভারতীয় আধুনিক ভাষার বিদ্যালয়গুলিকে বলা হত পাঠশালা। মুসলিম মৌলবীরাই ছিলেন মক্তবের শিক্ষক। আর হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত হত 'পাঠশালা' গুলি। গ্রাম ও শহর সর্বত্রই মক্তব ও পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল ব্যাপক। মসজিদগুলি ছিল মক্তবী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। সেখানে নামাজের মন্ত্রপাঠ ও কোরাণ পাঠ শেখানো হত। এছাড়া রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির জন্য ফারসী ভাষা শেখানো হত। দরবারী ভাষা হিসাবে ফারসী ও উর্দু সকলকেই শিখতে হত। যেখানে এসব ভাষা শেখানোর গুরুত্ব দেওয়া হত। পাঠশালাগুলি গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানা বা আলাদা ঘরে বসতো। এইসব পাঠশালায় সাহিত্য, ব্যাকরণ, রামায়ণ,

মহাভারত ইত্যাদি পড়ানো হত। তাছাড়া হিসাবশাস্ত্র, জমি জরীপ, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতিও শেখানো হত। পাঠশালাগুলির খরচ বহন করতেন গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা। অনেকক্ষেত্রে গ্রামের মানুষেরা সবাই মিলে খরচ বহন করতেন। পাঠশালার শিক্ষকদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল। গ্রামের মানুষেরা তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন।

(খ) দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ :

(১) দেশীয় পাঠশালাগুলি ছিল জন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যা পরিচিতি ইত্যাদি শেখানো হত।

(২) যাঁরা এইসব পাঠশালায় পড়াতেন তাঁদের সাধারণ জ্ঞানের বেশি বিদ্যা ছিল না। শিক্ষকরা শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য কোন কৃত্তিব্যবসা গ্রহণ করতেন।

(৩) বিদ্যালয়গুলির সাজসরঞ্জাম ছিল খুবই সাধারণ মানের। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ঘর ছিল না। অনেক সময় ঠাকুর মন্দিরে বা গাছতলায় পড়ানো হত।

(৪) ছাপা বই ছিল না। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী ছিল না, ছাত্ররা শ্লেট-পেন্সিল ব্যবহার করত। সাধারণ শ্রুতলিপি, অংক ইত্যাদি শেখানো হত।

(৫) শিক্ষাদানের সময় ও দিন স্থানীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর নির্ভর করত। বিদ্যালয় ভর্তির কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না।

(গ) দেশীয় উচ্চশিক্ষা :

দেশীয় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি দুভাগে বিভক্ত ছিল : (১) হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হত 'টোল' বা চতুষ্পাঠী (২) আর মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলি নাম ছিল 'মাদ্রাসা'। সমগ্র ভারতে এই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ছড়িয়ে ছিল। এ্যাডামের হিসাব অনুযায়ী সে সময়ে বাংলা ও বিহারে টোলের সংখ্যা ছিল ১৮০০। শিক্ষকরা নিজেদের ঘরে টোল বা চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতেন। ঘর ছিল মাটির। অনেক ক্ষেত্রে টোলগুলি মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকত। টোল ছিল আবাসিক। শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্ররা ভিক্ষা করে খাদ্য সংগ্রহ করত। টোলের পণ্ডিতরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। অব্রাহ্মণ ছাত্ররা টোলে পড়ার সুযোগ পেত না। মেয়েরা টোলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। টোল সাধারণত ছিল ধরনের ছিল : (১) প্রথম ধরনের প্রতিষ্ঠানে শেখানো হত ব্যাকরণ, ছন্দ ও সাহিত্য (২) দ্বিতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে ন্যায়শাস্ত্র ও প্রাচীন কাব্য শেখানো হত (৩) আর তৃতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ তর্কশাস্ত্র পড়ানো হত। তবে তন্ত্রবিদ্যা ও জ্যোতিষ চর্চাও শেখানো হত। শিক্ষকদের পণ্ডিত্য ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর সমাজে সম্মানের পাত্র ছিলেন।

টোলের তুলনায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল অনেক কম। তবে শিক্ষার মান ছিল অনেক উন্নত। উচ্চতম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মৌলবীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলি এখানে শেখানো হত। সাধারণ আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। মাদ্রাসাগুলির পরিচালন ব্যবস্থা

টোলের তুলনায় অনেক নিম্নমানের ছিল। বাদশাহী ও নবাবী দরবারে উচ্চপদ লাভের জন্য অনেকেই মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যেত। এই উদ্দেশ্যে হিন্দু ছাত্ররাও মাদ্রাসায় ভর্তি হত। মৌলবীরা ধর্মীয় ও নৈতিক মান বজায় রাখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। শুধুমাত্র অর্থের জন্য তাঁরা শিক্ষকতা করতেন না। তাঁরা শিক্ষাকতাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে টোলগুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে পিতাপুত্র সম্পর্ক গড়ে উঠত। মাদ্রাসায় তা লক্ষ্য করা যেত না।

(ঘ) দেশীয় উচ্চশিক্ষার স্বরূপ :

(১) অধ্যাপক এ. আর. দেশাই সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশীয় উচ্চশিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষকতার দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। ব্রাহ্মণদেরই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ ছিল। হিন্দুরাষ্ট্রের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী অন্য জাতের লোকদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার বন্ধ ছিল।

(২) মেয়েরা, নিচু জাতের লোকেরা ও কৃষকরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেত না। তবে ব্যবসায়ীর ছেলেদের সুযোগ ছিল।

(৩) হিন্দু-সমাজের জাতিভিত্তিক কাঠামোর দিক লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করা হত। যেমন বয়স্ক ব্যক্তি, পিতামাতা, শিক্ষক ও রাজার প্রতি নিঃশর্ত বাধ্যতা শেখানো হত। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে প্রচলিত সামাজিক কাঠামো গ্রহণ ও স্বীকার করানো হত।

(৪) হিন্দুদের মতো মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা কোন গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে ছিল না। ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক প্রকৃতির জন্য যে-কোন মুসলমানই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতে পারত।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা যুক্তিভঙ্গী গড়ে উঠত না। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলমানে পরিণত করা নিজ নিজ ধর্ম ও সামাজিক কাঠামোর প্রতি হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীদের আনুগত্যপরায়ণ করে তোলা হত।

৬.৮.১৬.৩ : দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন

আশ্চর্যের বিষয় হল, যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বিচার ও সংস্কার করেছিল, ভারতের দেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যান্ডের মত ভারতের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তারা প্রাণসঞ্চার করার কোন চেষ্টাই করেনি। বরং তাকে অবহেলা ও সমালোচনা করে তার অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছিল। ভারতের প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তারা বর্তমান শিক্ষার সোপান তৈরি করেছিল।

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙনের অনেকগুলি কারণ ছিল—

প্রথমতঃ, দেশীয় শিক্ষার ভেতরেই অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। যেমন সেই শিক্ষাব্যবস্থায় নারী, হরিজন, শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের প্রবেশধিকার ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কোন উপযুক্ত শিক্ষা ছিল না। শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন এনেছিল। শিক্ষকদের পারিশ্রমিকও ছিল খুবই অল্প।

তৃতীয়তঃ, পাঠ্যক্রম ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। উপরন্তু তাদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল খুবই কঠোর।

চতুর্থতঃ, ব্রিটিশরা আসার পর সরকারী ক্ষেত্রে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার চালু হবার ফলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি হয়।

পঞ্চমতঃ, আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে দেশীয় বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়ী, বিত্তশালী ব্যক্তি ও দেশীয় রাজাদের আর্থিক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতিকেও দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙনের একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। বহু রাজনৈতিক আবর্তেও সেই ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়নি। ভারতে আধুনিক শিক্ষার কাঠামো এই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারত এবং তা হওয়া সম্ভব ও উচিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের মনে অন্য ভাবনা ছিল। তাই দেখা যায় জনগণের সঙ্গে সহজ সম্পর্কযুক্ত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটিয়ে ব্রিটিশরা নতুন শিক্ষা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জনগণের সঙ্গে শিক্ষার স্বাভাবিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এর ফলে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবহেলিত হতে থাকে ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা :

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী, মিশনারী ও সরকারী প্রচেষ্টার যৌথভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে যখন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজ শাসকরা উদাসীন ছিলেন, তখন ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন প্রাচ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁদের অন্যতম। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি। লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতের শিক্ষাজগতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল।

(ক) বেসরকারী উদ্যোগ : বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হয় বেসরকারী উদ্যোগে। রামনারায়ণ মিশ্র এর সূচনা করেন কলকাতায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে। কলকাতার ইউরোপীয়রা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। শেরবোর্ন জোড়াসাঁকোয় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম ইংরাজী শেখেন। মার্টিন বোল ছিলেন বিখ্যাত শীল পরিবারের ইংরাজী শিক্ষক। তিনি শীল পরিবারের উৎসাহে স্কুল খুলেছিলেন। ড্রামন্ড-এর 'ধর্মতলা একাডেমী'তে প্রথম পাঠ্যসূচী অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮১৭ সালে বেসরকারী উদ্যোগে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলার ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই কলেজের অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ডেভিড হেয়ার ও কলকাতার অন্যান বিশিষ্ট নাগরিকরা।

ডেভিড হেয়ার বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি ছিলেন 'কলকাতা কুল বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা। সোসাইটির কিছু সদস্য পরে প্রতিষ্ঠা করেন 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'। এর কার্যকলাপ মূলতঃ ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রসারেই সীমাবদ্ধ ছিল। ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন হেয়ার স্কুল। বেথুন প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়'। মাদাম লস্‌ন্‌ প্রতিষ্ঠা করেন 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। শিক্ষক তারাচাঁদ চক্রবর্তী রচনা করেন বাংলা-ইংরাজী অভিধান।

(খ) মিশনারী প্রচেষ্টা : পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরী বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের ধর্ম প্রচারক। ১৮১৮ সালে তিনি একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চুঁচুড়ায় লন্ডন মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে রবার্ট মে একটি ইংরাজী স্কুল খোলেন। দু-বছরের মধ্যে ঐ স্কুলের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫০ জন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ প্রতিষ্ঠা করেন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ্‌ ইনস্টিটিউশন'। ইউনিয়ন স্কুল ও গৌরমোহন আঢ্যর ওরিয়েন্টাল সেমিনারীও ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। মফঃস্বলে টাকী ও বীরভূম জেলাতে স্থানীয় জমিদাররা ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সরকারের দিক থেকে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে আগ্রহ না থাকলেও মিশনারী ও স্থানীয় শিক্ষাপ্রেমী মানুষ এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

(গ) সরকারী উদ্যোগ : ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে প্রথমদিকে সরকার নির্লিপ্ত থাকলেও ধীরে ধীরে তারা আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন। এর পিছনে অবশ্য ইংল্যান্ডের চার্লস গ্রান্ট ও উইলবার ফোর্স-এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁরা ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোম্পানির কাছে সুপারিশ করেন। ফলে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাক বরাদ্দ করার কথা বলা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হেস্টিংয়ের উদ্যোগে জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি সংস্কৃত কলেজের জন্য অর্থ বরাদ্দ রামমোহন রায় তাতে আপত্তি জানিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ঐ অর্থ ব্যয় করতে দাবী জানান। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। প্রিন্সেপ কোলব্রুক প্রমুখ ইউরোপীয় প্রাচ্যপন্থীগণ এদেশে প্রাচ্যশিক্ষা প্রসারের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যার প্রসারের জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করার দাবি জানান। কিন্তু রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড আর্মহার্স্টকে এক পত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করতে অনুরোধ জানান। জনশিক্ষা কমিটির কিছু সদস্য রামমোহনের মত পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন।

জনশিক্ষা কমিটির সভাপতিরূপে যোগ দেন লর্ড মেক্‌লে। তিনি ছিলেন ঘোর পাশ্চাত্যবাদী। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেন। এই সুপারিশ তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারী অনুদান ব্যয় করার কথা বলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে ঘোষণা করেন যে, এরপর থেকে সরকারী অনুদান ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। ইংরাজী শিক্ষার

বিস্তারে ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিং-এর এডুকেশনাল ডেসপ্যাচ্ ছিল এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই ডেসপ্যাচে বলা হয় সরকারী চাকরী করতে হলে ইংরাজী ভাষায় যারা লিখতে পড়তে জানে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই নীতি ঘোষণা করার পর ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারী উদ্যোগে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে যুক্তি ছিল এই যে, শিক্ষার স্রোত উচ্চতর শ্রেণী থেকে নিম্নতর শ্রেণীতে প্রবাহিত হবে। তবে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস উড ভারতে শিক্ষা বিষয়ক যে নির্দেশনামা পাঠান, তা সরকারী নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। এই নির্দেশনামায় ভারতীয়দের জন্য শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ভারত সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এইসব বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তার গতি তেমন দ্রুত ছিল না। ভারতীয়দের অনাগ্রহ ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পুরানো শিক্ষার মাধ্যম ভার্নাকুলার বা ভারতীয় ভাষা অবহেলিত হতে থাকে। সরকারী চাকরীতে ইংরাজীতে জ্ঞান আবশ্যিক করার ফলে একদিকে ইংরাজী শিক্ষার জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমনি সমাধি রচিত হল ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে পুরানো শিক্ষাব্যবস্থার।

৬.৮.১৬.৪ : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬) (National Council of Education 1906)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার পরিবেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়। এর আগে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ভারতীয়দের জাতীয় আশা-আকাঙ্খাকে উপেক্ষা করে তাঁর শিক্ষা-সংকোচন নীতি ঘোষণা করেন। এতে শিক্ষিত ভারতীয়রা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। এরপরই কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলন, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন এবং বিদেশী শিক্ষার পরিবর্ত স্বদেশী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। ''ডন সোসাইটির'' প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সোসাইটির পক্ষে স্যার আশুতোষ চৌধুরী বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনে'র অফিসে ১৯৫০ সালের ১৬ই নভেম্বর একটি বৈঠক করেন। সেখানে একটি প্রাদেশিক কমিটি তৈরি হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। তারকনাথ পালিত। সুবোধ মল্লিক, ব্রজেন শীল, বিপিন পাল, ভুপেন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার প্রমুখ মনীষীরা। প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৬ সালের ১৬ই মার্চ সতীশচন্দ্রের ডন সোসাইটি 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে' রূপান্তরিত হল। ১লা জুন পরিষদকে রেজেস্ট্রি করা হয়। তৈরী করা হল একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনা।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল : (১) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। তবে ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাখা হয় (২) বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কলা, সংস্কৃতি ও মানবিক বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করা হয় (৩) নীতি, ধর্ম ও শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় (৪) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়।

১৯০৬ সালের ১৪ই আগস্ট রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে কলকাতার 'টাউন হলে' এক বিরাট সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অনুমোদিত 'বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ ও স্কুল' স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়। ঐ সভায় উপস্থিত জনগণের সামনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ''প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সেজন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জাতীয় প্রথায় শিক্ষা দেওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।'' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছিলেন যে ''স্কুল কলেজের শিক্ষা আমাদের পরাস্ত করেছে। আমরা বিদেশী শিক্ষার তলায় চাপা পড়ে গেছি।'' তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষার নাগপাশ ছিন্ন করে শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হবার আশা প্রকাশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ হলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র হলেন অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ। কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা এই তিনটি শাখায় কলেজের পাঠক্রমকে ভাগ করা হয়। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, সতীশ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রমাধব মল্লিক, ক্ষীরোদপ্রধান বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন। এছাড়া বাইরে থেকে যাঁরা নিয়মিত বক্তৃতা দিতে আসতেন তাঁরা হলেন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অর্থনীতিতে পিয়ারীমোহন মুখার্জী, উপনিষদে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গণিতে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদার্থ বিদ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৯০৭ সালে এই বিদ্যায়তনের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০৭ জন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষধ বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। যেমন—(১) প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ পাঠশালা থেকেই হাতের কাজকে আবশ্যিক করা হয়। (২) মাধ্যমিক স্তর থেকে পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। (৩) বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা ও পঠন-পাঠয়নের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য সংস্কৃত, পালি, মারাঠী ও হিন্দি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। (৪) কলেজ স্তরে উচ্চতর বিজ্ঞানের পাঠক্রম রাখা হয়। (৫) কলেজের কারিগরি বিভাগে বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। (৬) প্রয়োগমূলক শিক্ষা হিসাবে কাঠের কাজ, লোহার কাজ ঢালাইয়ের কাজ, যন্ত্রপাতি চালনা ইত্যাদির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বহু ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠায়।

জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিষদের নেতাদের মতভেদ ছিল। তারকনাথ পালিত ও নীলরতন সরকার মনে করতেন ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করছে কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর। তাঁদের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ''কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি'' (Society for the promotion of Technical Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ এই সমিতির সভাপতি হন। ঐ বছরই সমিতি কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (Bengal Technical Institutue) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এখানে কারিগরী ও ফলিত বিজ্ঞান পড়ানো হত। কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য ১৯১০ সালে সমিতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে মিশে যায়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন কেবলমাত্র কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার বিভিন্ন

জেলায় পরিষদ অনুমোদিত জাতীয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার দশটি শহরে পরিষদের আর্থিক সহায়তায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরিষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশটি। এইসব বিদ্যালয় স্থাপনে স্থানীয় জনগণের উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা ছিল লক্ষ্যণীয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিলকের প্রচেষ্টায় বোম্বাইতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজেও কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলার পরিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা আধিবেশনে জাতীয় শিক্ষার সমর্থনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে পরিষদের আদর্শে দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও ক্রমশঃ সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৮ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইটি। কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতারা যাদবপুরে যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি স্থাপন করেছিলেন তা আজও সগৌরবে টিকে আছে। ১৯৫৬ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক পর্বের এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অবলুপ্তির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়।

প্রথমতঃ, যেহেতু এই শিক্ষা আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, সেজন্য সেই রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা আন্দোলনেও ভাঁটা পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আর্থ-সামাজিক চাপে মানুষ শিক্ষা আন্দোলন থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ, আন্দোলনের নেতাদের শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা ছিল অনেকটাই বিক্ষিপ্ত, জাতীয় শিক্ষার পরিপূর্ণ পরিকল্পনা রচনা করতে তাঁরা পারেননি। কোন বিকল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা কাঠামেমা তাঁরা উপস্থিত করতে পারেননি।

চতুর্থতঃ, আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে আদর্শগত মতবিরোধ ছিল তবে ব্যর্থ হলেও এই শিক্ষা আন্দোলন জনগণের মনে এক জাতীয় শিক্ষার চেতনা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সাধারণ মানুষ, দেশের নেতা ও কংগ্রেসের মধ্যে যে উৎসাহের সাধার হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়নি। পরবর্তীকালে নতুন পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন চলতে থাকে। সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী উঠতে থাকে। দেশের নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতীয় উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক গণশিক্ষার প্রয়োজন আছে।

১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উডের নির্দেশনামা অনুসারে ১৮৫৭ সালের প্রথম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই নির্দেশনামায় যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলির লক্ষ্য ছিল নিম্নতম অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চতম বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে সংহতি স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে ঐ নির্দেশনামায় প্রত্যেক জেলায় সরকারী বিদ্যালয়, কলেজ ও সমস্ত উচ্চশিক্ষাকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। ১৯০২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল ৭১টি কলেজ। কিন্তু লর্ড কার্জন ভাইসরয় হয়ে ভারতে এসে দেখেন শিক্ষার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। তিনি সরকারী নীতির

পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্যার টমাস র‍্যালের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিশন যেসব সুপারিশ করেছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ (ক) কলেজগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন করা।

র‍্যালে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কার্জন ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কঠোরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সিনেট ও সিন্ডিকেটের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সিনেটে পাশ হওয়া আইনকে বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হল সরকারকে। আসলে কার্জন ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কঠোরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিণত হয় সরকারী বিভাগে। এজন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা এই আইনের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছিলেন। তথাপি একথা স্বীকার করতে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা এনেছিল, উচ্চশিক্ষার মানকে উন্নত করেছিল, মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তন ঘটিয়েছিল।

উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ও তার সমস্যাগুলি পর্যালোচনার জন্য ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার আর একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাডলার। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ ছিলেন এই কমিশনের অন্যতম ভারতীয় সদস্য। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন। অর্থের অভাবে কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তবে এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়।

উচ্চশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সর্বজনবিদিত। এর রূপকার ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। লর্ড কার্জন যখন তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গ আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯০৬ সালে স্যার আশুতোষ সেই পদ গ্রহণ করেন। আশুতোষ তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতায় ও দৃঢ়তায় বিদেশী শাসকদের দূরভিসন্ধি ব্যর্থ করে কার্জন প্রবর্তিত আইনকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিলেন, তার গুরুত্ব পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষিত মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখেছিলেন তা হল :

(১) সারা দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের একত্রিত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব দেন। (২) বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার প্রভূত উন্নতি করেন। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের সাহায্যে তিনি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন করেন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সি. ভি. রমণ, পি. সি. মিত্র প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন। (৩) বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। (৫) গবেষণাপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। (৬) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন কলেজ স্থাপন করেন। (৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৩ সালের মধ্যে এগারোটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়।

৬.৮.১৬.৬ : শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়

উনিশ শতকের প্রথমে বাংলা তথা ভারতে শিক্ষিত মানুষদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক বিশাল শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা ও ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রধান কারণ ছিল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার জন্য মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যোগ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে গড়ে উঠেছিল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের উত্থান ও জাতীয় আন্দোলনে এই সম্প্রদায়ের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। ১৮৮০-এর দশকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫০,০০০। ১৯০৭ সালে তা ৫,০৫,০০০-তে পৌঁছায়।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে অনেক বৃত্তি লাভের সুযোগ আসে যেগুলির অস্তিত্ব প্রাক্-উপনিবেশিক আমলে ছিল না। তাঁরা আইনজীবী, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রমুখ হবার সুযোগ পান। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে আইন ব্যবস্থা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ বেশিরভাগ নিয়েছিলেন হিন্দুরা এবং বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। বাংলার কলেজ ছাত্রদের অধিকাংশই আসতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার থেকে। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকাও খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত বিদ্যাচর্চায় খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা নতুন ধরনের বৃত্তি ও চাকুরিতে প্রবেশ করার ফলে এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। তবে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশজ শিকড় ছিল সুদৃঢ়। দেশের ঐতিহ্যকে তারা ভোলেননি।

ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত এইসব শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা কিন্তু ঔপনিবেশিক নীতি, আদর্শ মতাদর্শের সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁর উপলব্ধি করতে পারেন যে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ধারণা বা যুক্তি এবং সাম্য ও আইনের শাসনের মিল খুব কমই আছে। শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা শিক্ষার মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে যা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সুসংবদ্ধ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমালোচনা শুরু করে। সংগঠিত জাতীয়তাবাদ এদের মাধ্যমেই বিকশিত হতে থাকে। এই শিক্ষিত বাঙালীরা ভারতীয়রাই প্রথম জাতীয় সচেতনতা অর্জন করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জনগণের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরাই অনেকাংশে ভারতীয় জনগণকে আধুনিক জাতিতে সংহত করেছিলেন। তাঁরাই ছিলেন রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, সংগঠক ও নেতা। শিক্ষামূলক ও প্রচারমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে তাঁরাই জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে স্বদেশিকতা ও স্বাধীনতার ধারণা এনে দিয়েছিলেন। তাঁরাই সৃষ্টি করেছিলেন সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য যার মধ্যে দিয়েই তাঁরা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বীজ বুনতে চেয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী আন্দোলনে এঁরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ বাঙালী ও ভারতীয় সংগ্রামশীল

নেতৃবৃন্দ সবাই ইংরাজী জানা বুদ্ধিজীবী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণী দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন গণভিত্তি পায়, তখন এই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবিরাই এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৬.৮.১৬.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। N. L. Basak–History of Vernacular Education in Bengal.

২। সুখময় সেনগুপ্ত—বাঙালী মনীষীর শিক্ষাচিন্তা ও সাধনা।

৩। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়—উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি।

৪। সমর কুমার মল্লিক—আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর।

৫। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশী থেকে পার্টিশান।

৬.৮.১৬.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলায় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনা কর।

২। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙন কিভাবে হয়েছিল? এর কারণ কি কি?

৩। বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা কিভাবে প্রসারলাভ করে? কারা এর উদ্যোক্তা ছিলেন?

৪। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের পটভূমি আলোচনা কর। এর উদ্দেশ্য কি ছিল? এর কার্যাবলী আলোচনা কর।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা কর।

ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্র পাঠযুক্ত (CBCS) স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম.এ. দ্বিতীয় সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ - ৭

National Movement and Emergence of Indian State
1858-1964

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত। প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

জুন ২০১৯
মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

SYLLABUS

SEMESTER- II

CC/Paper - VII

National Movement and Emergence of Indian State 1858-1964

[100 Marks]

BLOCK-1

Strategies of Imperial Control

Unit-1 : British Government and its control over Indian administration-central, provincial and district.

Unit-2 : a) Relations with Princely States.

b) Principles and policies Governing foreign relations.India and its Neighbours : i) Afghanistan and Central Asia. ii) Tibet. iii) Nepal. iv) Burma. v) Persia and the Persian Gulf.

BLOCK-2

Economy & Agriculture

Unit-3 : India in the- Imperialist World system : volume and composition of urban flow of capital; balance of payments and the drain and currency problems.

Unit-4 : Agrarian relation : regional diversities and their administration; social and economic origins of commercialization and its effects; nature and extent of stratification within the peasantry and landlords, tenants and the State. Agricultural output; levels and brands and natural and regional explanations.

BLOCK-3

Industry and Population

Unit-5 : Domestic and craft industry, rise of modern industry and capitalist class,, state and industrial growth and rise of the working class (formal and informal sectors).

Unit-6 : Trends in population and national income.

BLOCK-4

Society of Colonial India

Unit-7 : a) Social composition : ethnic groups-tribes (creation of new categories of'criminal tribes and castes') and class & community.

b) Colonial intervention and social change; reform movements; modern education; rise of middle classes and caste movements.

Unit-8 : a) Women : status; property rights; reform, legislation and political participation.

b) Tradition and Modernity.

BLOCK-5

National Movement

Unit-9 : Approaches to Indian Nationalism conceptual debates.

Unit-10 : Emergence of Organized Nationalism Trend till 1919.

BLOCK-6

Gandhian Movements and Left Movement

Unit-11 : Gandhian Movements-Nature, Programmes, Social Composition, Limitations and Challanges.

Unit-12 : Revolutionary and Left Movements, States g "Peoples" Movements.

BLOCK-7

Working of Congress Communal Politics and Subhas Chandra Bose

Unit-13 : a) Working of Congress and Non-Congress Provincial Ministries.

Unit-14 : a) Communal Politics and Partition. b) Subhas Chandra Bose and INA and Telengana.

BLOCK-8

Independent India

Unit-15 : a) Visions of New India. b) Integration of Princely States. c) Beginigs of Planned Economy. d) Foreign Policy-Non-alignement.

Unit-16 : a) Land Question and Industrial Policy. b) Education; Health Science and Technology. c) Women-Hindu Code Bill

Contents

Blocks	Titles	Pages
1	Strategies of Imperial Control	1-18
2	Economy & Agriculture	19-40
3	Industry and Population	41-66
4	Society of Colonial India	67-116
5	National Movement	117-174
6	Gandhian Movements and Left Movement	175-215
7	Working of Congress Communal Politics and Subhas Chandra Bose	216-253
8	Independent India	254-272

সপ্তম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-১

Strategies of Imperial Control

British Government and Its Control over Indian Administration-Central, Provinical and District

একক-১

বিন্যাস ক্রম :

৭.১.১.০ : উদ্দেশ্য

৭.১.১.১ : ভূমিকা—মহাবিদ্রোহের পরিণতি

৭.১.১.২ : ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

৭.১.১.৩ : ১৮৬১'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৭.১.১.৪ : ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৭.১.১.৫ : ইংরেজ সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন

৭.১.১.৬ : ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও নিয়ন্ত্রণনীতি

৭.১.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.১.১.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.১.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। মহাবিদ্রোহের পরিণতি বা ভবিষ্যৎ ফল

২। ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

৩। ১৮৬১ এবং ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

৪। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

৫। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের কৌশল

৭.১.১.১ : ভূমিকা — মহাবিদ্রোহের পরিণতি

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল মূলত একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। অর্থের বিনিময়ে পাওয়া ব্রিটিশ নৃপতির সনবদলে এই কোম্পানী ভারতে ও এশিয়ায় অন্যত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। এই বাণিজ্যের খাতিরেই কোম্পানী উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে জড়িয়ে পড়া এবং তা এতই লাভজনক হয় যে অধিগ্রহণ উত্তরোত্তর একটি বলিষ্ঠ নীতিতে পরিণত হয়। অথচ এর দ্বারা কোম্পানীর যে কেবল আর্থিক লাভই হয়েছিল তা নয়। ক্রমশঃ কোম্পানী নিজেই একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় যার অপ্রীতিকর প্রভাব কেবল ভারতের মানুষের ওপরেই নয় ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপরেও পড়তে থাকে। সার্বভৌমত্বের অধিকারী ব্রিটিশ রাষ্ট্র অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয় কোম্পানীকে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে ১৭৭৩এ আরম্ভ হয় কোম্পানীকে বশে আনার একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৮৫৮ য়।

১৭৭৩র রেগুলেটিং এ্যাক্ট ছিল কোম্পানীকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে আনার প্রথম ও দুর্বল এক প্রয়াশ সন্দেহ নেই তবে ভবিষ্যতের জন্য তা দিক-নির্দেশকারীও হয়েছিল। ঐ বছর কোলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা ভারতে নতুন এক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপও বটে। ১৭৮৪র পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট একদিকে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণের এক প্রচেষ্টা, অন্যদিকে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে পার্লামেন্টের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা কোম্পানীর ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণেরও এক প্রচেষ্টা। ১৬০০য় আরম্ভ হওয়া ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয় ১৮১৩র চার্টার এ্যাক্টের দ্বারা। ১৮৩৩এ চীনে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারও চলে যায় কোম্পানীর হাত থেকে। ১৮৫৩র চার্টার এ্যাক্ট ছিল একটি তাৎক্ষণিক ও অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ। ১৮৫৭র বিদ্রোহ কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসানকে ত্বরান্বিত করে। কোম্পানীর অপশাসনই বিদ্রোহের কারণ এমন প্রবল জনমত এই সময়ে ইংল্যান্ডে তৈরী হলে ক্ষমতার হস্তান্তর অতি সহজেই ঘটে যায়। ১৮৫৮র গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টের দ্বারা ভারতে প্রতিষ্ঠা হয় ব্রিটিশ নৃপতির নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও শাসন।

৭.১.১.২ : ১৮৫৮'র ভারতশাসন আইন

১৮৫৮'র গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষমতা বর্তায় পার্লামেন্টের ওপর। অতএব তৎক্ষণাৎ অবলুপ্তি ঘটে এতকাল যে দুটি সভা এই ক্ষমতা ভোগ করতে, অর্থাৎ কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ও পার্লামেন্টের বোর্ড অফ কন্ট্রোলের পরিবর্তে ব্রিটিশ নৃপতির নামে শাসন করার ক্ষমতা ন্যস্ত হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের ওপর। কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীও এরপর থেকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরিত হল সেক্রেটারী অফ স্টেট হলেন পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ সরকারের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী। তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য গঠিত হল ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইন্ডিয়া কাউন্সিল নামে একটি পরামর্শদাতাদের পরিষদ। অবশ্য এই পরিষদের সুপারিশ অবজ্ঞা করে পৃথক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকল সেক্রেটারী অফ

স্টেটের। তবে অর্থবিষয়ক তাঁর কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাদের অনুমোদনকে একটি অবশ্য শর্ত হিসাবে রাখা হল। সাধারণত ভারতে শাসনকাজে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরই পরিষদে স্থান হত। এঁদের না জানিয়ে গভর্ণর জেনারেলের সাথে যে কোন গোপন তথ্যের আদানপ্রদানের ক্ষমতা থাকল সেক্রেটারী অফ স্টেটের। ভারত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়-আইন, রেল, রাজস্ব, আয়ব্যয় ইত্যাদি-তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পরই অনুমোদন দিতেন। ভারতে রচিত বিভিন্ন আইনবিধি পার্লামেন্টে দাখিল করার দায়িত্ব ছিল তাঁর, এবং নিয়মিত কিছুকাল অন্তর পার্লামেন্টকে ভারতের খবরাখবর জানানোরও।

এরপর থেকে কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল হলেন গভর্ণর জেনারেল এ্যান্ড ভাইসরয়, অর্থাৎ এর দ্বারা স্পষ্ট করা হল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ নৃপতির প্রতিনিধি। ভারতে প্রত্যক্ষ শাসনভার বর্তালো তাঁর ওপর। অবশ্য যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদনসাপেক্ষ, সেহেতু নীতি অবলম্বন ও সম্পাদনে ভাইসরয় হয়ে পড়লেন পার্লামেন্টের অধীনস্ত। তাঁর সহায়তার জন্য গঠিত হল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নামে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ। এই পরামর্শদাতাদের পরিষদের সদস্যরা সাধারণত ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরাই হতেন।

১৮৫৮'র এই আইনের সাথে সাথে জারী হল কুইন্স প্রোকলামেশন বা মহারাণীর ঘোষণাপত্র। এর দ্বারা দেশীয় শাসকদের আশ্বাস দেওয়া হল যে কোম্পানীর সাথে তাঁদের যাবতীয় চুক্তি-সন্ধি মহারাণী সম্মানের সাথে পালন করবেন এবং তাঁদের যাবতীয় অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে। বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মহারাণী হস্তক্ষেপ করবেন না এমন আশ্বাসও দেওয়া হল। ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না, কেবল উপযুক্ত শিক্ষাগত ও অনুরূপ যোগ্যতাই ভারত সরকারের কাছে আমল পাবে, এই ঘোষনাপত্রের দ্বারা তা ভারতীয় প্রজাদের জানানো হল।

যদিও এটাই স্বাভাবিক, তবুও উল্লেখ করতেই হয় যে ১৮৫৮'র আইন ও মহারাণীর ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতীয়দের জীবনে কোন পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে, ইংরেজদের তেমন কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। অতএব বজায় থাকল স্থিতাবস্থা মাত্র। মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় সমাজের একাংশ বহুদিন যাবৎ নানা অভাব-অভিযোগ জানিয়ে আসছিল পার্লামেন্টের কাছে, যেগুলি আগের মত এখনও উপেক্ষিত হল। প্রতিনিধিত্বমূলক কোন শাসনব্যবস্থার জন্ম তো হলই না, বরং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সেক্রেটারী অফ স্টেটের হাতে চলে যাওয়ায় প্রশাসনের সংবেদনশীলতা আরও দূর-অস্ত হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, তাঁর কার্যালয়ের ব্যয়ভার যথারীতি বর্তালো ভারতীয় প্রজার ওপর। বিলিতি সমাজের যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বহুদিন যাবৎ কোম্পানীর বিশেষ অধিকারের অবলুপ্তির জন্য দাবী জানিয়ে আসছিল, কেবল তাদেরই প্রত্যাশা পুরণ হল ১৮৫৮ য়।

৭.১.১.৩ : ১৮৬১'র ভারতীয় পরিষদ আইন

১৮৬১র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্টের দ্বারা একদিকে যেমন গভর্ণর-জেনারেলের মাধ্যমে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করা হল তেমনই অন্যদিকে ১৮৩৩ ও ১৮৫৩র চার্টার এ্যাক্ট দুটিতে শাসনতন্ত্রে যে অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক দেখা গেছিল তা কিছুদূর কমানোর চেষ্টা হল। এই আইনের

দ্বারা গভর্ণর-জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠনে পরিবর্তন আসে। তৈরী হল শাসনকাজের তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বিভাগ। সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টনের দায়িত্ব থাকল গভর্ণর-জেনারেলের। সদস্যরা সাধারণ বিষয়গুলি নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে চালাবার অধিকারী হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশ-অনুমোদনকে অপরিহার্য মানা হল।

এই আইনসংস্কারের প্রণেতা স্যার চার্লস উড পার্লামেন্টের ধাঁচে সম্পূর্ণ পৃথক একটি আইন পরিষদ পছন্দ না করায় গভর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদেই আইন প্রণয়নের জন্য দ্বিতীয় একটি বিভাগ তৈরী হল। নির্দিষ্ট করা হল তিন ধরণের সদস্যঃ 'সাধারণ সদস্য' (বাংলার সৈন্যাধ্যক্ষ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরদের মত 'অ-সাধারণ' সদস্য সহ), পাঞ্জাব ও বাংলার লেফটেনন্ট গভর্ণনেরা এবং 'অতিরিক্ত' সদস্য, (গভর্ণর-জেনারেল দ্বারা মনোনীত)। এই বিভাগের আইন রচনার ক্ষমতা হল ব্যাপক। ইংরেজ-শাসিত ভারতের সকল মানুষের জন্য তো বটেই, এমনকি দেশীয় রাজ্যে বসবাসকারী ভারত সরকারের কর্মচারীদের জন্যও আইন তৈরী করার ক্ষমতা হল এই বিভাগের। অথচ এরই সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ আরোপিত হল। যেমন, পার্লামেন্ট দ্বারা ভারতের জন্য রচিত কোন আইন পরিমার্জনাকারী অথবা ইংল্যান্ডের সংবিধান সংশোধনকারী কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা এই বিভাগের থাকল না। অর্থাৎ, এই পরিষদকে স্পষ্টভাবে পার্লামেন্টের অধীনস্ত একটি সভায় পরিণত করা হল। এই ব্যবস্থাও জারী হল যে গভর্ণর-জেনারেলের, এবং সেক্রেটারী অফ স্টেটেরও, অনুমোদন ছাড়া আইন পরিষদের কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হতে পারবে না। তাছাড়া গভর্ণর-জেনারেলকে ক্ষমতা দেওয়া হল প্রয়োজনে, পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে, ছয় মাসের জন্য বিশেষ আইন জারী করার।

অন্যদিকে, নির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞা সহ বোম্বাই ও মাদ্রাজে এবং লেফটেনন্ট-গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলিতেও আইন পরিষদের ব্যবস্থা হয় এই বছর। সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ও 'অতিরিক্ত' এই তিন ধরণের সদস্য নিয়ে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদগুলির আইন রচনা বিভাগ তৈরী হল। তবে ফৌজদারী আইন, মূদ্রাব্যবস্থা, বিদেশনীতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রস্তাবের ক্ষমতা দেওয়া হল না এই বিভাগকে। পার্লামেন্টের অনুমোদন অবশ্য শর্ত থাকল, যেমন থাকল এই শর্তও যে এই বিভাগের রচিত যে কোন আইন গভর্ণর-জেনারেল নাকচ করে দিতে পারেন।

যথারীতি নতুন এই আইনে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থাই থাকল না। কেবল এই সিদ্ধান্তই থাকল যে গভর্ণর-জেনারেল তাঁর ইচ্ছামত দেশীয় শাসকদের তাঁর আইন বিভাগে অতিরিক্ত সদস্যপদে মনোনীত করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে, নতুন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গভর্ণর-জেনারেলের মাধ্যমে পার্লামেন্টের আজ্ঞানির্বাহী সভায় পরিণত করাই ছিল একমাত্র অভিপ্রায়। এই কারণেই বেসরকারী অপেক্ষা সরকারী সদস্য সংখ্যা বেশী রাখা হয়, অর্থাৎ যাতে এইসব সভায় সরকারের মতেরই প্রতিফলন হয়। আবার এই কারণেই গভর্ণর-জেনারেল, সেক্রেটারী অফ স্টেট ও পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করার অধিকার দেওয়া হল আইন পরিষদের সদস্যদের। অর্থাৎ ১৮৬১র সংস্কারের দ্বারা বিকেন্দ্রীকরণও সামান্যই হয়েছিল।

৭.১.১.৪ : ১৮৯২'র ভারতীয় পরিষদ আইন

১৮৯২র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্টের দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদগুলির আইনরচনা বিভাগের সদসসংখ্যা আরেক দফা বাড়ানো হয় এবং সদস্যদের ক্ষমতাতেও পরিবর্তন আনা হয়। গভর্ণর-জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা হয় সর্বনিম্ন দশ থেকে সর্বোচ্চ ষোল, এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন পরিষদ দুটির ক্ষেত্রে আট-কুড়ি। সমান অনুপাতে বাড়ল বেসরকারী সদস্যপদও। সদস্যদের নতুন অধিকার দেওয়া হল সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনা করার ও প্রশ্ন তোলার। তবে এ নিয়ে কোন সংশোধনের ক্ষমতা তাদের থাকল না। জনস্বার্থ বিষয়ক প্রশ্ন তোলার ও উত্তর পাওয়ার অধিকারও সদস্যরা পেলেন, তবে তাঁদের তোলা প্রশ্ন বাতিল করার ক্ষমতা থাকল এই পরিষদের প্রধানের। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির ক্ষেত্রে একই নিয়ম বলবৎ হল।

এই আইনে প্রথম সদস্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম রচিত হয়। ব্যবস্থা হল এই যে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির বেসরকারী সদস্যরা এবং কোলকাতার বণিকসভা, আইনজীবি পরিষদ প্রভৃতি সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের জন্য পাঁচজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন। তেমনই স্নাতকগোষ্ঠী, পুরসভা, বৃহৎ জমিদার বণিকেরা প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির জন্য মোট চারজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন, এই নিয়ম হল।

বস্তুতপক্ষে, এই 'নির্বাচন' সুপারিশ মাত্র। কারণ প্রেরিত তালিকা থেকে বেছে নিয়ে মনোনয়নের ক্ষমতাটা গভর্ণর-জেনারেলেরই হাতে রেখে দেওয়া হল। অতএব এটা স্বাভাবিক যে আইন পরিষদগুলির 'নির্বাচিত' সদস্যরা অন্যদের মত সরকারী নীতিই অনুসরণ করে চলবে। এই সংস্কারের দ্বারা ভারতীয়রা তাই প্রকৃত কোন অধিকার পেল না। কারণ যে ভারতীয়রা নতুন নিয়মে আইন পরিষদে স্থান পেলেন তাদেরকে কোন অর্থেই দেশবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি বলা চলে না। সরকারের ব্যাখ্যা ছিল ভারতের মত বৃহৎ ও অনুন্নত দেশে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা চালানো বাতুলতা মাত্র। নতুন বিধির দ্বারা আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন ধরণের অগ্রনী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট, এই ছিল সরকারের মত। অন্যদিকে, আইন পরিষদের সদস্যদের নতুন অধিকার প্রকৃতপক্ষে কোন অধিকারই নয়। কারণ সরকারের নীতি নির্দ্ধারণ অথবা নীতি পরিমার্জনার কোন ক্ষমতা তাঁরা পেলেন না। আসলে তাঁদের আলোচনা প্রশ্ন তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল নিতান্তই এই কারণে যাতে পরবর্তীকালে সরকার পক্ষকে আয়ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিরুদ্ধ-সমালোচনার সম্মুখীন না হতে হয়।

বলা যেতে পারে যে নীতিগ্রহণ ও নীতিসম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার এযাবৎকাল যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল, তাতে কিছুদূর ভাটা পড়ল। কারণ এরপর থেকে সরকারকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হত। বস্তুতপক্ষে, দাদাভাই নৌরজীর মত ভারতীয় সদস্যরা নতুন এই যে অধিকার পেলেন, তার যথাযথ ব্যবহার করার সুযোগটা পুর্নমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন। অথচ এটুকুর দ্বারা ভারতীয়দের প্রত্যাশা কোনভাবেইপূরণ হয়নি। ১৮৮৫ থেকে প্রতি বছর জাতীয় কংগ্রেস, এমনকি তার আগেও বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজনৈতিক সংগঠন, ইংরেজ সরকারের কাছে সীমিতভাবে হলেও স্বাধিকার দাবী করে আসছিল। ১৮৯২র সংস্কার তাই ভারতীয়দের প্রতি বিদেশী শাসকের মনোভাব স্পষ্ট করে দিল। এর প্রভাব পড়ে তাদের রাজনীতির ওপর; জাতীয় সংগ্রামকে আবেদন-নিবেদনের পথ থেকে বিক্ষোভমূলক পথে চালনা করার কারণটা ভারতীয়দের জুগিয়ে দেয় ইংরেজরাই।

৭.১.১.৫ : ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

১৮৫৭র বিদ্রোহের পর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনগুলো এসেছিল, তার অন্যতম প্রধান ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন। এই কাজটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে করেছিল ইংরেজরা। এর তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সৈন্যদের ভবিষ্যত বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা, তবে এছাড়াও অন্য তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করেছিল।

প্রথমত, সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় ইউরোপীয়দের আধিপত্য সুনিশ্চিত করা হয়। ১৮৫৭ অবধি কোম্পানীর বাহিনীতে ছিল প্রায় দুই লক্ষ পনেরো হাজার ভারতীয় সৈন্য অথচ মাত্র চল্লিশ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য। তাই এরপর ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যদের আনুপাতিক হার বাংলায় ১ ঃ ২ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে ২ ঃ ৫ স্থির করা হল। তাছাড়া, সাম্রাজ্যের সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে উপমহাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কেবল ইউরোপীয়দেরই মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এই সময়। একই কারণে সৈন্যবাহিনীর গোলন্দাজ শাখাটিকে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলা হল। এই কারণেই, ২০ শতকের নতুন শাখাগুলি, যেমন ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রাগার ডিভিসনগুলি, প্রথম থেকেই ইউরোপীয়দের কুক্ষিগত হল। আবার, আগের মত এখনও ভারতীয়দের উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত রাখা হল; যেমন, ১৯১৪তেও একজন ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে সুবাহদারের ওপরে ওঠা সম্ভব হত না।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে ইংরেজরা বিভেদনীতি অবলম্বন করে। সৈন্যদের জাতি-ধর্ম-বাসস্থান ইত্যাদি পার্থক্যগুলিকে মাথায় রেখে এমনটা করা হয়। যেমন, এক একটি রেজিমেন্টে বিভিন্ন ধরণের সৈন্যকে প্রায় সমান সমান সংখ্যায় রাখা হয় এবং তাদের আপনাপন জাতি-ধর্ম-অঞ্চলের প্রতি সহজাত আনুগত্যকে এমনভাবে সমর্থন ও গুরুত্ব দেওয়া আরম্ভ হল যাতে তাদের পক্ষে একত্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরও গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ নিল ইংরেজরা ভারতীয়দের ‘সামরিক’/‘অসামরিক’ দুটি ভাগে ভাগ করে। অযোধ্যা, বিহার, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের সৈন্যরা, যারা ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাহায্য করেছিল অথচ যারা ১৮৫৭র বিদ্রোহে প্রধান অংশ নিয়েছিল, তাদের ‘অসামরিক’ বলে চিহ্নিত করে সৈন্যবাহিনী থেকে দূরে রাখা হল। অন্যদিকে যে শিখ, পাঠান, গুর্খারা বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল, তাদের অনুগত্যকে নিশ্চিত করতে ও অন্য ভারতীয়দের থেকে পৃথক রাখতে, তাদের ‘সামরিক’ আখ্যায় ভূষিত করা হল।

কালক্রমে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এক অত্যন্ত ব্যয়বহুল বাহিনীতে পরিণত হয়। যেমন, ১৯০৪এ সরকারের আয়ের প্রায় ৫২ এর ওপরেই ব্যয় হয়েছিল। এর কারণ, এর দ্বারা ইংরেজেদের নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হত। আসলে, ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, ভারত তার মধ্যমণি ছিল এমন বলা অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে রুশ, ফরাসী ও জার্মান আক্রমণ থেকে এই উপনিবেশিটকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন ছিল। আবার এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের বাণিজ্যিক বন্দোবস্তগুলিকে সচল রাখারও প্রয়োজন ছিল।

তেমনই, এই দুটি মহাদেশের নতুন নতুন অঞ্চল অধিগ্রহণেরও প্রয়োজন হত মাঝে মাঝে। প্রধানত এই কয়েকটি কারণে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীটি ইংরেজদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ, সম্পূর্ণভাবে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত এমন এক বাহিনীর প্রতিপালনের ব্যয়ভারটি বহন করতে হত ভারতবাসীকেই। তবে উল্লেখ্য যে সৈন্যদের ভারতীয় জীবন থেকে পৃথক রাখার ইংরেজদের উদ্যোগটি ব্যর্থই হয়। কারণ, বিভিন্ন সময় সৈন্যরা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

৭.১.১.৬ : ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও নিয়ন্ত্রণ নীতি

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপশাসনের দরুন অতি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সাম্রাজ্যটি চলে যেতে বসেছিল বলে পার্লামেন্ট এখানে ব্রিটিশ নৃপতির প্রত্যক্ষ ও নিরঙ্কুশ শাসনের প্রবর্তন করে। উদ্দেশ্য ছিল, কার্যকরী বিভিন্ন নীতি-পদক্ষেপের দ্বারা এ থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করা। এটা করতেই পার্লামেন্ট ভারতের শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলে। উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারত ছিল ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। বিশেষত এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে সাম্রাজ্যের যে বিশাল অংশটি ছিল, তা ভারত থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। শক্তিশালী এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার পেছনে এটা ছিল অন্যতম এক যুক্তি। অথচ সাম্রাজ্যের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক স্বার্থ। ভারতকে ইংল্যান্ডের শিল্প অর্থনীতির সহায়ক হিসাবে ভাবতেই পছন্দ করে ইংরেজরা। প্রয়োজন ছিল ভারতকে খাদ্যশস্য-কাঁচামাল যোগানকারী এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়কারী একটি অঞ্চল হিসাবে ধরে রাখা। বস্তুতপক্ষে, পৃথিবী জুড়ে ইংরেজদের যে বাণিজ্য চলত ভারত ছাড়া তার ভারসাম্য নিজেদের অনুকূলে রাখাই অসম্ভব ছিল। তাই একদিকে যেমন গড়ে তোলা হল পূর্ণনিয়ন্ত্রিত এক সৈন্যবাহিনী অন্যদিকে তেমনই নজর দেওয়া হল আমলা নিয়ন্ত্রিত এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে যাতে ভারতীয়দের অংশগ্রহণই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

অথচ প্রয়োজন ছিল অন্যায্য এই উপনিবেশিক ব্যবস্থাকেই ভারতবাসীর কাছে গ্রহণীয় করা। অতএব প্রথমেই এই প্রচার করা যে যেহেতু বহুবিভক্ত ভারতীয়রা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুপযোগী এবং যেহেতু তারা নিতান্তই অনগ্রসর, সেহেতু তাদের প্রতাপশালী, শান্তিপ্রদানকারী, উন্নয়নকামী, আলোকপ্রাপ্ত ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। একই কারণবশত ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখা হল নাগরিকত্বের অধিকার থেকে এবং তাদের পরিণত করা হল নিছক এক প্রজাবর্গে। প্রয়োজন ছিল এমন ব্যবস্থার সমর্থনকারী কিছু গোষ্ঠীর লালন-পালনও। এমন এক গোষ্ঠী ইংরেজরা খুঁজে পেল ১৮৫৭র বিদ্রোহে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণকারী, জনসমর্থনপুষ্ট সাবেকী অভিজাতদের মধ্যে। নতুন আমলে তাই নানাভাবে তাদের তুষ্ট রাখাটা একটা প্রধান কাজ হয়ে দাড়ায় ইংরেজদের। অন্যদিকে, সংখ্যায় ও শিক্ষা-সচেতনায় দ্রুত বাড়তে থাকা মধ্যবিত্তরেও অবজ্ঞা করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে। তাই নতুন আমলে শাসনব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণের অধিকারকেও উত্তরোত্তর মেনে নিতে হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য বড়লাট রিপনের উদ্যোগে গৃহীত ১৮৮২র স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন (লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট) যার দ্বারা ভারতবাসী স্থানীয় প্রশাসনে অন্তত কিছুদূর অংশ নেওয়ার অধিকার পেয়েছিল।

৭.১.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(ক) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পলাশী থেকে পার্টিশান (২০০৪)।

(খ) সুগত বসু ও আয়েষা জালাল ঃ মর্ডার্ন সাউথ এশিয়া (১৯৯৯)।

(গ) সুমিত সরকার ঃ আধুনিক ভারত (১৯৮৯৬)।

(ঘ) রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসী এ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস ১ম ভাগ (১৯৭০)।

(ঙ) এস. গোপাল ঃ ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া (১৯৬৫)।

(চ) টি. আর. মেটকাফ ঃ দ্য আফটারম্যাথ অফ দ্য রিভোল্ট (১৯৬৫)।

(ছ) অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এ কন্সটিট্যুশনাল হিস্টরী অফ ইন্ডিয়া (১৯৭১)।

৭.১.১.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(ক) ১৮৮৫র গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এবং কুইন্স প্রোক্লামেশনের (মহারাণীর ঘোষণাপত্রের) দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্রে কি পরিবর্তন এসেছিল? ১৮৬১ ও ১৮৯২র কাউন্সিল এ্যাক্ট দুটির দ্বারা ইংরেজরা কি অর্জন করে?

(খ) ১৮৫৭ পরবর্তী আমলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে কি পরিবর্তন এসেছিল? এর পেছনে ইংরেজদের কি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল?

একক-২

Relations with Princely States ; India and Its Neighbours.

বিন্যাস ক্রম :

৭.১.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.১.২.১ : রাজন্যবর্গ শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক

৭.১.২.২ : সহায়ক গ্রন্থ

৭.১.২.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.১.২.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

১। রাজন্যবর্গ শাষিত দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক।

৭.১.২.১ : রাজন্যবর্গ শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরেজ সম্পর্ক

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা বিভিন্ন সময় অধিকৃত ও প্রত্যক্ষভাবে শাসিত অঞ্চলগুলি এবং নেপাল, ভূটান, বার্মা ইত্যাদি বিদেশী রাজ্যগুলি ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল প্রায় সাতশ স্বশাসিত দেশীয় রাজ্য। বিভিন্ন সময় নানা চুক্তি-সন্ধির দ্বারা কোম্পানীর সাথে এগুলির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এইসব রাজ্যের বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন অস্তিত্বের কারণ এগুলিকে অধিগ্রহণ করার মধ্যে কোন সুবিধা দেখেনি ইংরেজরা। তাছাড়া দেশীয় শাসকেরা কোম্পানীর কাছে সম্পূর্ণভাবে বশ্যত স্বীকারও করে বসেছিল। নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ইংরেজরা কোন কোন রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিয়েছিল, আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রতিনিধির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রভাব বজায় রেখে চলেছিল।

ইংরেজ নীতি ও তার প্রয়োগ

১৮৫৭র বিদ্রোহের পর কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হলেও, ১৮৫৮র গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টে এই ঘোষণা করা হয় যে কোম্পানীর সাথে দেশীয় রাজ্যগুলির যাবতীয় চুক্তি-সন্ধি কোন পরিবর্তন ছাড়াই আগের মত বলবৎ থাকবে। তবে এটা স্পষ্ট করা হয় যে ভবিষ্যতে সম্পর্কটা ব্রিটিশ নৃপতির সাথেই চলবে; অবশ্য কাজের সুবিধার কারণে আদান প্রদানটা চলবে গভর্ণর জেনারেল ও সেক্রেটারী অফ স্টেটের মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে এর দ্বারা প্রচলিত পরিস্থিতিতে কোন রদবদল না এলেও আসলে দেশীয় রাজ্যগুলির ইংরেজদের সম্পর্কে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায় ঠিক এভাবেই। কারণ আগে এই রাজ্যগুলি কোম্পানীর মিত্র বলে

পরিগণিত হত অথচ এখন দেশীয় শাসকেরা পর্যবসিত হলেন ইংল্যান্ডেশ্বরীর সামন্তে। এইভাবে তিনি ভারতে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর প্রশ্নাতীত ও সর্বোচ্চ আধিপত্য। তবে বড়লাট ডালহৌসীর স্বত্ত্ববিলোপ নীতি বাতিল করে দেশীয় শাসকদের উত্তরাধিকারের তাগিদে দত্তক নেওয়ার অধিকার মেনে নেওয়ার মধ্যে ইংরেজরা এই সময় যথেষ্ট নমনীয়তা ও বিচক্ষণতারও পরিচয় দেয়। নতুন এই সম্পর্ক অটুট করতে শাসকদের সনদ প্রদান করা হয় যার শর্ত ছিল দুটি, ব্রিটিশ নৃপতির প্রতি তাঁদের আনুগত্য স্বীকার এবং তাঁরদ্বারা পূর্বের যাবতীয় চুক্তির মান্যতাদান। নতুন আমলে ভারতীয় শাসকদের সম্মানিত করতে উপাধিপ্রদানের নতুন রীতির সূচনা হয় এই সময়। ১৮৬১ তে প্রচলন হয় 'অর্ডার অফ্ দ্য স্টার অফ ইন্ডিয়া' উপাধির। পরবর্তীকালে অন্যান্য উপাধিরও প্রবর্তন হয়, যেমন হায়দ্রাবাদের নিজাম 'হিজ এক্সলটেড হাইনেস' উপাধির দ্বারা সম্বোধিত হন।

১৮৭৬এ পার্লামেন্ট ব্রিটিশ নৃপতিকে অতিরিক্ত উপাধি গ্রহণের অধিকার দিতে 'রয়েল টাইটেলস বিল' নামে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। সন্দেহ নেই উদ্দেশ্য ছিল এর দ্বারা রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করার পথটি প্রশস্ত করা। অতীতে এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা হলেও, ভারতীয় মননে মুঘল সম্রাটের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমতা লক্ষ্য করে ইংরেজরা তা করা থেকে বিরত থেকেছিল। এবারও এক্ষুনি তক্ষুনি রানীর নতুন উপাধি জনসমক্ষে ঘোষিত হয়নি, যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডিসরেলি বক্তৃতায় তাঁকে 'এমেপ্রস অফ ইন্ডিয়া' বলে সম্বোধন করে বসেন। অবশেষে ১৮৭৭র দিল্লীর দরবারে বড়লাট লীটন মহারানীর নতুন উপাধিটি প্রকাশ করেন। এর পেছনে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল ঃ ইংল্যান্ডেশ্বরীর সাথে তাঁর ভারতীয় প্রজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা, দেশীয় শাসকেরা যে তাঁর অধস্তন তা স্পষ্ট করা, এবং গোটা বিষয়টিকে একটি সুনির্দিষ্ট রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপ দেওয়া। ১৯০৩এ দিল্লীর দ্বিতীয় দরবারে সপ্তম এডোয়ার্ডকে 'কিং এম্পারার' বলে ঘোষণা করা হয়।

পরিবর্তিত নীতি প্রয়োগে তারা কতটা আন্তরিক সম্ভবত তা প্রমাণ করতেই ইংরেজরা অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে দেশীয় শাসকদের তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেয়। ১৮৯৫এ গাড়োয়ালের পুনর্বাসন হয়। যদিও সদ্য প্রয়াত শাসক কোন বৈধ উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। আবার, গোয়ালিয়রের দুর্গটি, যা ইংরেজরা ১৮৫৮য় দখল করেছিল, তা সিন্ধেকে ১৮৮৬ তে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ রাজ্য মহীশূরের ক্ষেত্রে, ১৮৬৮ তে প্রয়াত মহারাজার দত্তকপুত্রে ১৮৮১ তে সাবালকত্ব লাভ করলে, তাঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। অবশ্য এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী নতুন মহারাজার দ্বারা চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপের অধিকারটি শর্ত হিসাবে রেখে দেওয়া হয়।

১৮৫৭র আগে দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে ইংরেজদের চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে ইংরেজরা সে সব রাজ্যে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানী অবশ্য একাধিকবার অন্য আচরণ করে, যা শর্তভঙ্গের পর্যায়েই পড়ে। অথচ ১৮৫৮র পর এমন হস্তক্ষেপকে ব্রিটিশ নৃপতির স্বাভাবিক অধিকার বলে দাবী করা হল। ঘোষণা হল যে প্রসাসনিক অপব্যবস্থাকে যখনই ইংরেজ সরকার উপমহাদেশের কোন অংশে বিশৃঙ্খলতা ও অশান্তির কারণ বলে মনে করবে, তৎক্ষণাৎ সেখানকার শাসককে দোষী সাব্যস্ত করে দন্ডিত করতে পারে, এমনকি উৎখাতও। বস্তুতপক্ষে, ১৮৫৮ পরবর্তীকালে এমন ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছিল। যেমন, ১৮৬৫ তে মধ্য ভারতের

জাবেয়া রাজ্যের শাসককে একজন তস্করের অঙ্গচ্ছেদ করার অপরাধে অর্থদন্ড করা হয় এবং তাঁর প্রাপ্য সাময়িক অভিবাদনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আবার, ১৮৬৭ তে রাজস্থানের টঙ্কের রাজাকে খুনের অভিযোগে গদিচ্যুত করা হয়, যদিও এর দরুন তাঁর পুত্রের উত্তরাধিকার খর্ব হয়নি। অন্যদিকে, ১৮৭০এ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে রাজস্থানেরই আরেক রাজ্য আলোয়ারের রাজাকে উৎখাত করে এই রাজাকে রাজপ্রতিনিধির অধীনে নিয়ে আসা হয়। আবার, ১৮৯২এ পাশবিক শাস্তিদানের অভিযোগে বালুচিস্তানের কালাত রাজ্যের শাসককে গদিচ্যুত করে শাসনভার অর্পণ করা হয় তাঁর পুত্রকে।

তবে এসবের তুলনায় উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ রাজ্য বরোদার বিরুদ্ধে ইংরেজরা যে ব্যবস্থা নেয় তা অনেক বেশী চাঞ্চল্যকর হয়েছিল। এই রাজ্যের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য যে কমিশন গঠন হয় তা ১৮৭৪এ গুরুতর অপশাসনের অভিযোগ আনলে ভারত সরকার শাসক মলহার রাও গায়কোয়াড়কে এক বছরের মধ্যে সংস্কার আনতে নির্দেশ দেয় এবং অন্যথায় তাঁকে পদচ্যুত করার হুমকিও দেয়। ভীত গায়কোয়াড় এমন পরিস্থিতি এড়াতে দাদা ভাই নৌরাজীকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। অথচ কিছুদিনের মধ্যে রাজার সাথে মতপার্থক্যের কারণে নৌরজী পদত্যাগ করেন এবং তার ফলে সংকট দেখা দেয়। কারই ইতিমধ্যে রাজ্যে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি কর্নেল ফেয়ার অভিযোগ করে বসেছিলেন যে বিষ প্রয়োগের দ্বারা তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। বোম্বাই পুলিশ এই ঘটনায় রাজার ভূমিকার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছে বলে দাবী করে। অথচ বিচারের জন্য কোলকাতার প্রধান বিচারপতি সহ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নতুন যে কমিশন নিযুক্ত হয় তা মতপার্থক্যের কারণে রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। গোটা বিষয়টি এমন ফলাও করে বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রচারিত হয় যে সেক্রেটারী অফ স্টেট, তক্ষুনি গায়কোয়াড়কে গদিচ্যুত করা মূর্খামি হবে মনে করে তা করা থেকে বিরত থাকেন। শেষ অবধি অবশ্য রাজাকে বরখাস্ত করে ও তাঁর আপন পুত্রের বৈধ দাবী অস্বীকার করে, তাঁর পূর্বসূরীর এক দত্তকপুত্রকে সরকার বরোদার শাসক হিসেবে নিয়োগ করে। কারণ হিসাবে অত্যাচারী শাসকের কবল থেকে নিপীড়িত ভারতীয় প্রজাকে মুক্ত করার ইংরেজদের নৈতিক দায়িত্বকে দর্শানো হয়।

সমান অবিচার করা হয় মণিপুর ও কাশ্মীরের প্রতিও। সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য মণিপুরে কোনরকম চুক্তি সন্ধি ছাড়াই ভারত, সরকার আপন আধিপত্য আরোপ করে বসে। ১৮৯০এ একটি প্রাসাদ বিদ্রোহের দরুন ঐ অঞ্চলে রীতিমত এক রাজনৈতিক সংকট তৈরী হয়। স্থানীয়দের দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বে পাঁচজন বিশিষ্ট ইংরেজ কর্মচারীর হত্যা হলে ভারত সরকার এই ঘটনাকে সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সামিল ঘোষণা করে তৎক্ষণাৎ রাজকুমার টিকেন্দ্রজিৎকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। অবশ্য রাজ্যটি অধিকার করা থেকে সরকার শেষ অবধি বিরতই থাকে। অন্যদিকে, ১৮৫৬এ অমৃতসরের চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা কাশ্মীরকে স্বাধীন ও মিত্র রাজ্য বলে মেনে নিয়েছিল। অথচ উত্তরোত্তর মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারকে বিপজ্জনক মনে করাতে ইংরেজ সরকার আপন স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ১৯ শতকের শেষপাদে সেখানে নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করে। অথচ অপশাসন ও উপর্যুপরি কয়েকবার দুর্ভিক্ষের কারণে পরিস্থিতির অবনতি হয়ে চলে এবং ইংরেজদের চূড়ান্ত হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করে তোলে। মহারাজার কার্যকলাপের মধ্যে তারা অতঃপর তাদের শত্রু রাশিয়ার সাথে তাঁর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পায়, যার অবধারিত ফল ১৮৮৯এ তাঁকে বলপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়। কাশ্মীর রাজ্য ইংরেজ প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হয়ে পড়ে।

উপসংহার

কোম্পানী বরাবরই দেশীয় শাসকদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত, যে কারণে তাঁদের দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ও পদানত রাখাই হয়েছিল কোম্পানীর নীতি। অথচ ১৮৫৭র বিদ্রোহে তাঁদের নেতৃত্বসুলভ ভূমিকা ও তাঁদের প্রতি ভারতীয়দের আনগত্য ও সমর্থন লক্ষ্য করে এরপর ইংরেজরা তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। নব্যশিক্ষিতরা ইংরেজ শাসনের বাধ্য সমর্থক; অতএব ভবিষ্যতে বিপদ এলে তা সমাজের সাবেকী অংশ থেকেই আসর সম্ভাবনা এই আশঙ্কায় ঐ সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের অর্থাৎ রাজন্য-অভিজাত বর্গকে তুষ্ট রাখার নতুন নীতি অবলম্বন করে ইংরেজরা। ১৮৫৮য় তাই পুরোন অধিগ্রহণের নীতি পরিত্যক্ত হয়, শাসকদের সহযোগিতা আহ্বান করা হয়, এবং তাঁদের আশ্বস্ত করা হয় যে ব্রিটিশ নৃপতির প্রতি অনুগত থাকলে ভবিষ্যতে ইংরেজরা তাঁদের কোন ক্ষতি করবে না। অনেকেরই রাজ্য-এলাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, স্থানীয় প্রশাসনে অনেকেরই স্থান নয়, এবং খানিকটা মুঘলরীতির আদলে নতুন এক সম্মান প্রদর্শনবিধির দ্বারা তাঁদের তুষ্ট রাখার চেষ্টা হয়। এমন নয় যে তাঁদের ওপর আরোপিত যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নেওয়া হয়। বরং তাঁদের সচেতন করে দেওয়া হয় যে ভারত সরকারের মাধ্যমে ছাড়া কোন বিদেশী শক্তির সাথে মিত্রতা করার চেষ্টা তাঁদের পক্ষে হানিকর হবে। আবার, অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ইংরেজদের পছন্দসই না হলে তা পরিণাম কি হত তার উদাহরণ ওপরে দেওয়া হয়েছে।

তবে এসব সত্ত্বেও ১৮৫৮র পর দেশীয় শাসকেরা মোটের ওপর ইংরেজ শাসনের একটি সমর্থক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। এতদূর, যে বিভিন্ন সময় তাঁরা তাঁদের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ভারত সরকারের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, যেমন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৮৫ তে এবং ১৮৯৩ তে আফ্রিকায়। ইংরেজদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই বাহিনীগুলি কার্যত তাই ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনীরই অংশ হয়ে পড়ে। পুরস্কার হিসাবে সরকার নানা সময় শাসকদের শাসনব্যবস্থায় স্থান দেয়। বড়লাট লিটন, কার্জন ও মিন্টো তো তাঁদের নিয়ে পরামর্শসভা তৈরী করেন অথবা তার জন্য পার্লামেন্টের কাছে সুপারিশ করেন। সব সময় যে এসব কার্যকর হয়ে ছিল তা নয় এবং সম্পর্কও যে সব সময় মধুর ছিল তাও নয়, তবে এসব থেকে ঝোঁকটা কোনদিকে ছিল তা বেশ বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে, এই পারস্পরিক নির্ভরতার মনোভাবের কারণেই সবশেষে ১৯২১এ দেশীয় শাসকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় ‘চেম্বার অফ প্রিন্সেস’।

Foreign Relations : India and its neighbours

বিন্যাস ক্রম

৭.১.৩.০ : উদ্দেশ্য

৭.১.৩.১ : ইংরেজ ও বৈদেশিক সম্পর্ক

৭.১.৩.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.১.৩.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.১.৩.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ইংরেজ ও প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

৭.১.৩.১ : ইংরেজ ও বৈদেশিক সম্পর্ক

ভারতে ইংরেজ সরকারের বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হয়ে রাশিয়ার ভারত আক্রমণের একটা আশঙ্কা তৈরী করেছিল। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে চলেছিল ভারতে ইংরজেদের সাম্রাজ্য। অতএব, এই সাম্রাজ্যের সুরক্ষা-সম্প্রসারণ দুইয়েরই প্রয়োজন ছিল। ১৯ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ও তার পর ভারত সরকারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয় যে একদিকে সীমান্তে অবস্থিত বিভিন্ন দুর্বল রাজ্যগুলি অধিকার না করে সেগুলিকে দমন করে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে 'বাফার' বা নিরাপত্তাব্যুহ অঞ্চল হিসাবে তৈরী রাখা ছিল ইংরেজদের কাজ। অন্যদিকে, যেখানে অর্থনৈতিক তাগিদটা বড় হয়ে উঠেছে সেখানে এই প্রয়োজন মেটাতে তারা ধাপে ধাপে আগ্রাসন নীতি অবলম্বন করেছে। ভারত ছিল ইংল্যান্ডের বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি। এটা মাথায় রাখলে ভারত সরকারের বিদেশ নীতির বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী প্রয়োগের প্রচেষ্টাকেও একটা ছকে ফেলা যেতে পারে।

আফগানিস্থান

মূলতঃ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত হওয়ার দরুন আফগানিস্তান ইঙ্গ-রুশ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বলি হয়েছিল। ইংরেজদের সাথে আফগানদের সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ১৮৩০র দশকে। এই সময় ঘরে ও বাইরে শত্রু দুই-ই শাসক দোস্ত মহাম্মদকে ব্যস্ত করে তুলেছিল। ইংরেজ শক্তিতে তাঁরা বিশ্বাস তাঁকে রুশ মিত্রতাকে প্রত্যাখ্যান করে ভারত সরকারের সাথে সন্ধি করতে আগ্রহী করে। অন্যদিকে

ইংরেজরা যেমন আফগানিস্তানে রুশ প্রভাব চায়নি ঠিক তেমনই চায়নি আফগানিস্তানকে শক্তিশালী দেখতে। বড়লাট অকল্যান্ড তাই দোস্ত মহম্মদকে কেবল অধীনতামূলক মৈত্রীর প্রস্তাব দেন যা ইংরেজদের পুতুলে পরিণত হতে অনাগ্রহী আফগান শাসক প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রুদ্ধ অকল্যান্ড তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিত সিং ও বিতাড়িত প্রাক্তন আফগান শাসক শাহ সুজার সাথে চুক্তি করে, একটি সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্যে শাহ সুজাকে আফগানিস্তানের তখ্‌তে অধিষ্ঠিত করলেন। ইংরেজদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি কারণ আফগানরা নতুন শাসককে গ্রহণ ত করলই না, বরং প্রতিনিয়ত বিদ্রোহের দ্বারা তাঁকে ও ইংরেজ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। শেষ অবধি ১৮৪২এ ইংরেজরা দোস্ত মহম্মদকে তাঁর শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর এই দুই পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্কই বজায় থাকে, যেহেতু ভারত সরকার এই সময় হস্তক্ষেপ বর্জন করার নীতি অনুসরণ করে চলে। বিনিময়ে দোস্ত মহম্মদ ১৮৫৭র বিদ্রোহীদের আশ্রয় না দিয়ে ও রাশিয়াকে প্রতিহত করতে ইংরেজদের সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অথচ ১৮৭০র দশক থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলে আফগানিস্তানের প্রতি বারত সরকারের নীতিতে আরেকবার পরিবর্তন আসে। মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্কে লোভ ও রুশ আক্রমণভীতি আরেকবার ইংরেজদের মধ্যে আফগানিস্তানকে একটি অধীনস্ত দেশে পরিণত করার কারণ যোগায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দেশের বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করায়ত্ত করে ফেলা। ঐ সময়কার আফগান শাসক শের আলিও রুশ আগ্রাসনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং বিপদ এড়াতে তিনি ভারত সরকারকে মিত্রতার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই ধরনের সমান-সমানে আদান প্রদানে ইংরেজরা ছিল অনভ্যস্ত। ভারত সরকার তাই পাল্টা প্রস্তাব করে কাবুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য একটি বাহিনী মোতায়েন রাখার এবং আফগানিস্তানের বিদেশনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকারের উপর। স্বভাবতই শের আলি এমন চুক্তিকে অপমানজনক বলে প্রত্যাখ্যান করেন। সাথে সাথে তিনি চিহ্নিত হয়ে যান ইংরেজদের শত্রু ও রাশিয়ার মিত্র হিসাবে। তৎকালীন বড়লাট লিটন তাঁর পূর্বসুরী অকল্যান্ডের নীতি অনুসরণ করে ১৮৭৮এ আফগানিস্তান আক্রমণ করে বসেন। দ্বিতীয় এই আফগান যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয় সহজেই। পরের বছর তাই শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁ তাদের সাথে গান্ডামাকের চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এর দ্বারা ইংরেজরা ঐ দেশের সীমান্তবর্তী কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করে, কাবুলে বসায় নিজেদের প্রতিনিধিকে এবং আফগানিস্তানের বিদেশনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভ করে। অথচ ইংরেজদের এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ আগের মত এবারও জাতীয় সত্ত্বার অপমান সহ্য না করতে পেরে দেশপ্রেমী আফগানরা এক অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা ইংরেজ প্রতিনিধি ও তার দলবলকে হত্যা করে বসে। অবশ্য প্রতি আক্রমণের দ্বারা ইংরেজ বাহিনী পুনরায় কাবুল দখল করতে পারে।

আফগান-নীতিতে আরেকবার পরিবর্তন আসে ১৮৮০ তে যখন লিটনের জায়গায় রিপন গভর্ণর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হলেন। নতুন বড়লাট শক্তিশালী এক প্রতিবেশী রাজাকে মিত্র হিসাবে পাওয়ার জন্য হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে ফিরতে চান। তাই তিনি দোস্ত মহম্মদের এক দৌহিত্র আব্দুর রহমানকে শাসক বলে মেনে নেন, তাঁর বার্ষিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন, কাবুলে ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার দাবী প্রত্যাহার করেন, এবং বিদেশী আক্রমণ হলে আফগানদের তৎক্ষণাৎ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে আব্দুর রহমান নিজের বিদেশনীতির ওপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নেন; কেবল অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁর আধিপত্য বজায় থাকল।

অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে এই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। যুদ্ধে ইংল্যান্ডের তুরস্ক আক্রমণ বিশ্ব জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজদের সম্পর্কে বৈরী মনোভাবের জন্ম দেয়। অন্যদিকে, রুশ বিপ্লব ও জারতন্ত্রের পতন সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক বাতাবরণেরও জন্ম দেয়। জারদের পতন আফগানদের মধ্যে রুশ আক্রমণের আশঙ্কা কমতে সাহায্য করলে তারা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে চায়। ১৯১৯এ আব্দুর রহমানের উত্তরসূরী হাবিবুল্লার হত্যার পর তাঁর পুত্র ও নতুন আমীর আমানুল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শান্তিস্থাপন হয় অবশেষে ১৯২১এ যখন ইংরেজরা আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়।

বর্মা

বর্মায় ইংরেজদের আবির্ভাব হয় ১৭৫৩য় যে বছর কোম্পানী সমুদ্রকূলবর্তী শহর নেগরাইসে একটি বসতি গড়ার উদ্যোগ নেয়। এর মাত্র পাঁচ বছরের মাথায়, ইংরেজরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে এমন যথার্থ সন্দেহে বর্মার রাজা আলঙ্গপায়া ওখানকার প্রতিটি ইংরেজকে হত্যা করেন। এর পর প্রায় কুড়ি বছর কোন ঘটনা ঘটেনি। অথচ বর্মীদের মধ্যে রীতিমত এক আগ্রাসী মনোভাব তৈরী হয় ১৯ শতকের প্রথম ভাগে। আপাতদৃষ্টিতে আরকানী বিদ্রোহীদের দমন করতে তাই বর্মীরাজ ১৮২৩-২৪এ অসম ও মণিপুর দখল করেন এবং চট্টগ্রাম আক্রমণ করতে উদ্যত হন। এই তিনটি অঞ্চলই তাদের অধিকৃত এই কারণে সেগুলি মুক্ত করতে কোম্পানী ১৮২৫এ নিজের বাহিনী পাঠাল। অতএব প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের সুচনা হয়ে যায়। যুদ্ধে বর্মীদের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং ১৮২৬র ইয়ান্দাবোর চুক্তি অনুযায়ী রাজা বোডপায়া ইংরেজদের যাবতীয় দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধের দরুন কোম্পানী বর্মার অধিকাংশ সমুদরকূলবর্তী অঞ্চলই অধিকার করে বসে এবং বর্মীরাজের হাতে থাকে কেবল মধ্য ও উত্তর বর্মা।

দুই পক্ষের মধ্যে আরেকবার সম্পর্কের অবনতি হয় ১৯ শতকের দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে। ইতিমধ্যে বিশেষত চিন এবং সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। জাহাজ সারাইয়ের জন্য বর্মী কাঠ ও ঐ অঞ্চলে বাসকারী ইংরেজদের জন্য বর্মী চালের, এবং প্রয়োজন হয়েছিল বর্মীদের মধ্যে বিলিতি পণ্যর বিক্রী বাড়ানোর। অতঃপর দুই ইংরেজ নাবিকের ওপর রেঙ্গুনের গভর্ণরের অত্যাচারের অজুহাতে বড়লাট ডালহৌসী একটা হেস্তনেস্ত করতে চান। বর্মীরা প্রথমদিকে নমনীয় মনোভাব দেখালেও, উত্তরোত্তর ইংরেজদের দাবীগুলি অন্যায্যভাবে বাড়তে থাকলে, তারাও অনড় হয়ে ওঠে। অতএব ১৮৫২য় বাধে দ্বিতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ। একই সময় রাজা মিন্ডন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাঁর পক্ষে ইংরেজদের যথাযথ মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। দ্রুত রেঙ্গুন, ব্যাসেন, পেগু, প্রোম ইত্যাদি শহরগুলি ইংরেজদের দখলে চলে আসে; কোন রকম সন্ধি ছাড়াই তখনকার মত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ বাধে ১৮৮৫ তে। অথচ এমন নয় যে অন্তর্বর্তী সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ছিল। কারণ ইংরেজরা ক্রমাগত উত্তর বর্মা ও ঐ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে চীনদেশে ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। ১৮৬২ তে তারা বর্মীদের একপ্রকার বাধ্যইকরে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে। এই চুক্তি অনুযায়ী তারা বর্মার যেকোন অঞ্চলে বসতিস্থাপন করার ও ইরাবতী নদী ধরে চীনে জাহাজ নিয়ে যাওয়ার অধিকার পায়। তবে যেহেতু কার্পাস, গম ও হাতির দাঁতের মত লাভজনক পণ্যবাণিজ্যে বর্মীরাজের একচেটিয়া অধিকারটি বজায়

থেকে যায়, সেহেতু এমন চুক্তিতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই ১৮৮২ তে রাজা থিবকে বাধ্য করা হয় এই অধিকারটুকুও ছাড়তে। ইংরেজরা অবশ্য এতেও থেমে থাকে না; অবশিষ্ট উত্তর বর্মারও অধিগ্রহণের পরিকল্পনা তারা চালিয়ে যায়। আসলে বর্মার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া চূড়ান্ত বাণিজ্যিক লাভ সম্ভব ছিল না। আবার ইংরেজরে এই সময়কার আশঙ্কা ছিল যে তাদের আগেই আমেরিকান ও ফরাসীরা এই সুযোগটা নিয়ে বসবে। তাদের এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না, কারণই প্রকৃতই ফরাসীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতায় উত্তরোত্তর আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে আরম্ভ করেছিল। ১৮৩০র দশক থেকেই তারা ভিয়েতনামে বসতি গড়ে তুলেছিল এবং সেখান থেকে পশ্চিম দিকে তাইল্যান্ড ও বর্মার প্রতি নজর দিতে আরম্ভ করেছিল। অন্যদিকে ইংরেজদের দুর্বার গতিকে প্রতিহত করতে বর্মীরাজও ফরাসীদের প্রতি উৎসাহজনক আচরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৭৩এ রাজা মিন্ডনের একটি প্রতিনিধিদল ফ্রান্স গিয়েছিল এই উদ্দেশ্যেই। তখনকার মত বা ব্যর্থ হলেও, ১৮৮৫ তে নতুন রাজা কিন্তু এ বিষয়ে সফল হন।

অতএব ইংরেজদের জন্য উত্তর বর্মা অধিকার করা এবার আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অতএব যুদ্ধঘোষণার জন্য আরেকবার একটি অজুহাতের প্রয়োজন হয়, ও তা সহজেই পাওয়া যায়। বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানী, যা কিনা সেগুনকাঠের জন্য বর্মার জঙ্গলে ইজারা নিয়েছিল, সেই কোম্পানী চুক্তির অতিরিক্ত কাঠ সংগ্রহ করেছে বর্মা সরকার এই সময় এমন অভিযোগ তোলে। সুযোগ উপস্থিত মনে করে ভারত সরকার ঐ কোম্পানীর পক্ষ নেয়, এবং দাবী জানায় বর্মীরাজ যেন তাঁর বিদেশনীতি ইংরেজদের নির্দেশমত চালান। বলা বাহুল্য কোন স্বাধীন নৃপতির পক্ষে এমন দাবী মেনে নেওয়া অসম্ভব, অকল্পনীয় ও অপমানের সামিল। রাজা থিব ইংরেজদের এই অন্যায্য দাবী তৎক্ষণাৎ খারিজ করে দেন। অতঃপর ১৮৮৫র ১৩ই নভেম্বর ভারত সরকারের একটি বিশাল বাহিনী বর্মা আক্রমণ করে। এর সামাল দেওয়া বর্মীরাজের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল; এমনিতেই তিনি প্রজাদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয়হীন ছিলেন এবং দেশে চলছিল গৃহযুদ্ধের মত অরাজক পরিস্থিতি। ৮ শে নভেম্বরের মধ্যেই রাজা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং বর্মা হয়ে পড়ে ভারতীয় সাম্রাজ্যের একটি অঙ্গরাজ্য।

অথচ বর্মার জনসাধারণ এটা মেনে নেয়নি এবং তাদের প্রতিরোধ দমন করতে ইংরেজদের বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর এখানে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। বিলিতিদ্রব্য বর্জনকারী, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের এই আন্দোলন ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮ বর্মাকে স্বাধীনতা এনে দেয়।

নেপাল

বস্তুতপক্ষে প্রথম যে বিদেশী রাজ্যের সাথে ইংরেজদের বিবাদ বাধে তা হল নেপাল এবং তার কারণ আংশিক রাজনৈতিক ও আংশিক বাণিজ্যিক। ১৭৬৭ তে কোম্পানীর কোলকাতা কাউন্সিল, পাটনা থেকে নেপাল উপত্যকা আক্রমণের নির্দেশ দেয়। আসলে ইতিমধ্যে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ'র নেতৃত্বে গুর্খারা পাটনা সংলগ্ন নেপালের অংশটি অধিকার করে বসেছিল; তাদের লক্ষ্য ছিল সমগ্র রাজ্যেই ক্ষমতা অর্জন করা। ঐ অঞ্চলে তাদের গতিবিধি ইংরেজদের বাণিজ্যে অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল বলেই যুদ্ধ বাধল। তবে ইংরেজদের এই সময়কার আক্রমণ গুর্খারা সহজেই প্রতিহত করে। এরপর তারা নেপালের মল্লরাজাদের পরাজিত করে দেশের শাসনক্ষমতা অর্জন করে। শুধু তাই নয়, একটি শক্তিশালী বাহিনীর সাহায্যে তারা পশ্চিমে শতদ্রু নদী অবধি নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবয়। ১৭৯২এ কোম্পানী নেপালরাজ্যের সাথে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করে, এবং এর একটি শর্ত অনুসারে নেপাল দরবারে ইংরেজদের এক প্রতিনিধির স্থান হয়।

কিন্তু দক্ষিণ দিশায় গুর্খাদের অগ্রগতি আরেকবার তাদেরকে ইংরেজদের মুখোমুখি করে বিশেষত ১৮০১র পর যে বছর কোম্পানী অধিকার করে গোরক্ষপুর। ইতিমধ্যে বড়লাট ওয়েলেসলী তাঁর আগ্রাসী অধীনতামূলক মৈত্রী নীতির দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানীকে অন্যতম প্রধান এক শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। তখনকার মত ইংরেজরা নেপালের প্রতি তেমনভাবে দৃষ্টি না দিয়ে থাকলেও ঐ বছর অক্টোবর মাসে কোম্পানীর চুক্তির প্রস্তাবে নেপালরাজ সম্মতি দিতে বাধ্য হন। নেপাল দরবারে আরেকবার যে প্রতিনিধি বসল, তাঁর প্রতি কোম্পানীর নির্দেশ ছিল রাজ্যের অর্থনীতি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করার, বিশেষত, সেখানকার মূল্যবান কাঠ ও তিব্বতী সোনা সম্পর্কে। তবে রাজার শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবের দরুন ১৮০৩ এই ইংরেজ প্রতিনিধিকে নেপাল ছাড়তে হয়।

১৮১৪র অক্টোবর মাসে দুই দেশের সীমান্ত পুলিশের সংঘর্ষের ফলে সংকট তৈরী হয়। বড়লাট লর্ড হেস্টিংস তৎক্ষণাৎ নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অক্টরলোনী সহ চারজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে একটি বিশাল বাহিনী প্রায় ১১০০ কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে আক্রমণ হানে। অথচ ইংরেজরা গুর্খাদের প্রতিহত ক্ষমতার প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে পারেনি। যুদ্ধ চলে প্রায় এক বছরেরও বেশী সময় ধরে। অবশেষে ১৮১৬ ডিসেম্বর মাসে সগৌলির চুক্তির দ্বারা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। নেপালরাজ পশ্চিম হিমালয়ে অধিকৃত পর্বতাঞ্চল এবং গাড়োয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চল দুটি কোম্পানীকে সমর্পন করেন এবং আবারও ইংরেজ প্রতিনিধিকে তাঁর দরবারে স্থান দিতে স্বীকৃত হন।

পরবর্তীকালে এই দুই পক্ষের মধ্যে কখনও বিরোধ বাধেনি। কারণ তরাইয়ের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ইংরেজদের অধিকারে এলে নেপাল নিয়ে তাদের মধ্যে আর কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। দক্ষ গুর্খা সৈনিকরা ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফলে এই দুই পক্ষের সম্পর্ক দৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তিব্বত

ভারতীয় উপমহাদেশের ঠিক উত্তরে হিমালয় পর্বতের অপরদিকে তিব্বতের অবস্থিতি সেখানে ইংরেজদের হস্তক্ষেপের রাজনৈতিক কারণ যোগায়। ঐ দেশের প্রভূত খনিজ সম্পদ অতিরিক্ত অর্থনৈতিক কারণ। বহু শতাব্দী ধরে তিব্বত ছিল বৌদ্ধ ধর্মীয় অভিজাত গোষ্ঠী লামাদের দ্বারা শাসিত, যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের প্রভাবকে বলবৎ করতে তিব্বতীদের যাবতীয় বিদেশীপ্রভাবমুক্ত করে রাখা। ১৭ শতকের প্রারম্ভে অবশ্য তাঁরা চৈনিক সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হন। ভারতের সাথে তিব্বতের সামান্যই যোগাযোগ ছিল, মূলত সীমিত কিছু বাণিজ্য ও তীর্থের জন্য। ১৯ শতকে চৈনিক রাজপরিবারে মাঞ্চুদের অবনতি দেখা দিলে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলি বাণিজ্যিক তাগিদে চীনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যস্ত হয়। এই সময় তিব্বতের ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে এলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ দেশগুলি তিব্বতকেও নিজেদের প্রভাবের আওতায় নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়।

ইংরেজরা বরবারই তিব্বতের সাথে বাণিজ্য চালাতে আগ্রহী ছিল; সাম্রাজ্যের উত্তরদিকে সীমান্ত সুরক্ষিত করাও তাদের প্রয়োজন ছিল। অথচ তাদের এই চেষ্টা সম্পর্কে তিব্বতীরা বরাবরই উদাসীন থেকেছে। কিন্তু ১৯ শতকের শেষদিকে একই দিশায় রাশিয়ার দৃষ্টিপাত ভারত সরকারের পক্ষে অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব

বড়লাট কার্জন, অন্যতম প্রধান এক সাম্রাজ্যবাদী শাসক, এ বিষয়ে তৎপর হলেন। ১৯০৪র মার্চ মাসে তিনি তিব্বতে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এর বিরুদ্ধে তিব্বতীরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিলেও আধুনিক অস্ত্রের অধিকারী ইংরেজ সৈন্যদের সফল মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ইংরেজ বাহিনী রাজধানী লাসায় পৌঁছে যায়; উল্লেখ্য এই অভিযানে একবারও রুশ সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়নি ইংরেজদের। ইংরেজদের দাবী অনুসারে তিব্বতীরা ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়; ইংরেজদের দখলে আসে চুম্বি উপত্যকা এবং গেয়ানতসেতে একটি ইংরেজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার আশ্বাস দেন বড়লাট কার্জন। তিব্বতীরাও প্রতিশ্রুতি দেয় ভবিষ্যতে অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে তিব্বতে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার।

এর দরুন তিব্বতে রাশিয়ার অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় সন্দেহ নেই, তবে দুর্বল হয়ে পড়লেও তিব্বতের ওপর চীনের বৈধ অধিকার বজায় থেকে যায়। শেষ অবধি ইংরেজরা তিব্বতে বিশেষ কিছুই লাভ করতে পারেনি। কারণ এর কিছুকালের মধ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে যে সন্ধি হয় (১৯০৭), সেই সন্ধি অনুযায়ী তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে ভবিষ্যতে দুপক্ষই তিব্বত থেকে দূরে থাকবে এবং কোনরকম সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টায় চীনের মধ্যস্থতাকে আবশ্যক বলে মানবে।

৭.১.৩.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(ক) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পলাশী থেকে পার্টিশান (২০০৪)।

(খ) সুগত বসু ও আয়েষা জালাল ঃ মর্ডার্ন সাউথ এশিয়া (১৯৯৯)।

(গ) সুমিত সরকার ঃ আধুনিক ভারত (১৯৯৬)।

(ঘ) রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসী এ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস ১ম ভাগ (১৯৭০)।

(ঙ) এস. গোপাল ঃ ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া (১৯৬৫)।

(চ) টি. আর. মেটকাফ ঃ দ্য আফটারম্যাথ অফ দ্য রিভোল্ট (১৯৬৫)।

(ছ) অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এ কন্সটিট্যুশনাল হিস্টরী অফ ইন্ডিয়া (১৯৭১)।

৭.১.৩.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(ক) ভারতে ইংরেজ বিদেশনীতির দুটি নির্ধারণকারী কারণ কি ছিল? আফগানিস্তান, বর্মা ও তিব্বতের প্রতি ইংরেজদের আচরণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখসহ তা বোঝাও

(খ) ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে ইংরেজ সরকারের উদ্বেগের কি কারণ ছিল? এই প্রসঙ্গে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক-৩

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় ভারত

সম্পদের নির্গমন এবং ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

বিন্যাস ক্রম :

৭.২.৩.০ : উদ্দেশ্য

৭.২.৩.১ : সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা বলতে বোঝায়

৭.২.৩.২ : সাম্রাজ্যবাদ ব্যাখ্যার বিভিন্ন ঘরানা

৭.২.৩.৩ : বৃটিশ সওদাগরদের প্রাধান্য বিস্তার

৭.২.৩.৪ : ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারত

৭.২.৩.৫ : পুঁজির প্রবাহ

৭.২.৩.৬ : বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব ও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন

৭.২.৩.৬.১ : লেনদেন হিসাব ও সম্পদ নির্গমন

৭.২.৩.৬.২ : সম্পদ নির্গমনের ধারা

৭.২.৩.৬.৩ : নির্গমনের হিসাব

৭.২.৩.৬.৪ : নির্গমন তত্ত্বের সমালোচনা

৭.২.৩.৬.৫ : নির্গমনের ফলাফল

৭.২.৩.৭ : ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৭.২.৩.৭.১ : প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে মুদ্রানীতি

৭.২.৩.৭.২ : রৌপ্যমানের প্রবর্তন

৭.২.৩.৭.৩ : রূপোর দাম হ্রাস ও মুদ্রানীতি নিয়ে বিতর্ক

৭.২.৩.৭.৪ : স্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা

৭.২.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.২.৩.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

১। সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে ও বিভিন্ন ঘরানায় সাম্রাজ্যবাদ

২। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় ভারত

৩। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে সম্পদের নির্গমন

৪। ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৭.২.৩.১ : সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা বলতে বোঝায়

যে বিশ্বব্যবস্থায় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বলে পশ্চাদপদ অনগ্রসর দেশগুলোকে নিজেদের তাবেদে রেখে তাদের ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখে তাকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা বলে। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে পশ্চাদপদ দেশগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করে শুধু সে দেশগুলোকে শাসন করে না, সে দেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা জুড়ে বৃটেনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারত বৃটেনের অধীনে এক উপনিবেশে পরিণত হয়।

পলাশীযুদ্ধের পরবর্তী কালে বিশেষ করে ১৮১৩ সালে চার্টার আইনের নবীকরণের পর থেকে পরাজিত ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির অধীনে একটা উপগ্রহ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা হয়। বিশ্বপুঁজিবাদের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতে এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়। উদ্দেশ্য হল, যেন সে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনকে সেবা করতে পারে। ভারত তার নিজের বাজার বৃটিশ পণ্যের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আর সে বৃটেনকে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য জোগান দেওয়া শুরু করে। ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটাতে বাধ্য হয়। নিজের দেশের শিল্প ধ্বংস হয়। ভারত থেকে অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি হয়। নীট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বজায় থাকা সত্ত্বেও প্রতিদানে সে তার প্রাপ্য পায় না। একে দাদাভাই নওরোজী নির্গমন বলেন। অর্থাৎ ঔপনিবেশিকরণের মাধ্যমে অবশিল্পায়ন ঘটানো হয়, ভারতে কৃষিতে বিশেষীকরণ করতে বাধ্য করা হয় আর ভারত থেকে সম্পদের নির্গমন ঘটে যাকে দেহের রক্তক্ষরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ভারত পুঁজিস্বল্প দেশে পরিণত হয়।

এই অংশে আমাদের পাঠে আমরা বৃটেনের অধীনে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় ঔপনিবেশিকরণের মাধ্যমে ভারতের অর্থনীতিকে যে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলা হয় তা নিয়ে আলোচনা করব। আরও দেখব যে আধুনিক শিল্পের পত্তন ঘটানো হয় কিন্তু শিল্পায়নের কাজ ততদুরই অগ্রসর হতে পারে যতদূর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় থাকে। এই প্রসঙ্গে অঙ্কার ল্যাংগে বলেন, ''অনুন্নত দেশগুলো হয়ে দাঁড়ায় একপেশেভাবে কাঁচামাল এবং খাদ্য

রপ্তানিকারির অর্থনীতি। এইসব দেশে বিদেশি পুঁজির দৌলতে যে মুনাফা হত তার সেখানে পুনর্বিনিয়োগ ঘটত না, পাঠিয়ে দেওয়া হত সেই সব দেশে যেখান থেকে পুঁজি আসত।"

৭.২.৩.২ : সাম্রাজ্যবাদ ব্যাখার বিভিন্ন ঘরানা

ভারতে দুশো বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যে অর্থনীতির বিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তার সঠিক প্রেক্ষিত তুলে ধরা দরকার। এর জন্য প্রথমেই আমরা যে বিভিন্ন ঘরানায় সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করা হয় তা সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি।

ইংলন্ডের লেবার একজন বুদ্ধিজীবী জন হব্সন্ Imperialism নামক বইতে (১৯০২) যে সাম্রাজ্যবাদের ধারণার ব্যাখ্যা দেন তাতে বলা হয় উন্নতি পুঁজিবাদি দেশে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ের বন্টনে বৈষম্য গড়ে সংখ্যায় বেশি হলেও শ্রমজীবী মানুষের আয় কম হয় আর উচ্চবিত্তদের আয় বেশি অথচ উচ্চবিত্তরা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে তার ওপর খুব বেশি অনুপাতে ভোগ করে না। উন্নত দেশে ধনী ব্যক্তিদের এই স্বল্পভোগ সমস্যা পণ্য উৎপাদনের সমস্যা তৈরি করে, দেশে পণ্যের বাজার না পাওয়ায় তাদের নজর দিতে হয় অন্যদেশে যেখানে বাজার পায়। অনগ্রসর দেশগুলোতে বাজার দখলের লড়াই শুরু হয়। ভোগস্বল্পতা এবং সঙ্গে সঞ্চয় প্রাচুর্য্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে উপনিবেশ গড়তে হয় কারণ দেশের বাজার সীমাবদ্ধ থাকায় সেখানে বিনিয়োগের সুযোগও সংকুচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিলফর ডিং (১৯১০), লুকমেবুর্গ (১৯১৩) এবং বলশেভিক রূপকার লেনিনের (১৯১৬) বই তিনটি প্রকাশিত হয়। এদের নাম যথাক্রমে Finance Imperialism, Accumulation of Capital এবং Imperialism–The Highest Stage of Capitalism. উল্লেখযোগ্য যে এই তিনজনই সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারাজীবন সংগ্রাম করেন। এঁদের ঘরানা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের উৎস নিহিত থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই। একে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোর চূড়ান্ত পরিণতি বলে মনে করা হয়। এই ঘরানা অনুযায়ী ইউরোপের অতিরিক্ত পুঁজি উপনিবেশে বিনিয়োগ করার তাগিদ দেখা যায়। তাছাড়া নিজেদের পণ্য বিক্রি করার তাগিদেই উপনিবেশ সৃষ্টি করা দরকার হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে পুঁজিকে কেন্দ্র করে স্বার্থের সংঘাত দেখা যায়। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার লগ্নী পুঁজির আগ্রাসী চরিত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংযুক্তিকরণ ও সংবন্ধনে সাহায্য করে। দুনিয়া ব্যাপী একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বের তাগিদ প্রতিফলিত হয় এই ঘরানার সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বে।

দাদাভাই নওরোজির মত ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্রা ঔপনিবেশিক দেশের মানুষদের দারিদ্র্য, দেশের শিল্পের ধ্বংসসাধন (অবশিল্পায়ন) সম্পদ নির্গমন প্রভৃতি অর্থনৈতিক দৈন্যদশার প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা তাঁদের ব্যাখ্যায় পশ্চাদপদ দেশের অনগ্রসরতা এবং দেশের মানুষের দারিদ্র্যের মত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরেন। রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কের দিকটায় এঁরা যেমন আগ্রহী ছিলেন না। বরং ইরেজদের শাসন ভারতের মত দেশে যে অনেক সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে সেটাই তাঁরা স্বীকার করেন।

জর্জ চেস্‌লি, রিচার্ড ষ্ট্রেচি এবং পরবর্তীকালে থিরডর মরিসন, ভেরা এনস্টি, পর্সিভল গ্রিভিয়সের মত ইংরেজ বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসকরা মনে করেন যে পশ্চাদপদ দেশের স্বার্থেই ঐতিহাসিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর জন্য তারা ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে এক 'জাড্যের' কথা বলেন। স্বনির্ভর বিচ্ছিন্ন ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে উন্নয়নের উদ্দীপনাটি ছিল খুব দুর্বল। উদ্যোক্তা সম্প্রদায়ের অনুপস্থিতিতে এই ধরনের অর্থনীতি পুঁজিবাদের যাদুর স্পর্শ পায়নি। এদের মতে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় অনন্তকাল ধরে গতিহীনতা বা অচলায়তন সৃষ্টি হয়। সুতরাং উন্নতির তাপ ভেতর থেকে সৃষ্টি হত না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় এই তাপ সৃষ্টি করে দেশকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছে, ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, উন্নত প্রশাসন চালু হয়েছে। সিলির মত ঐতিহাসিকরা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন যে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন একটা ঘটনাচক্র। বৃটিশরা বাণিজ্য করতে এসে ক্ষমতার বিড়ম্বনায় জড়িয়ে গেছে। কেইন্‌সের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা দেখাবার চেষ্টা করেন যে ভারত থেকে বৃটেনের যত সম্পদ নির্গমিত হয়েছে তার থেকে বিপরীত মুখি নির্গমন ঘটেছে বেশি।

৭.২.৩.৩ : বৃটিশ সওদাগরদের প্রাধান্য বিস্তার

ভারতে বৃটিশ শাসনের পত্তন তাদের দীর্ঘদিনের লড়াই-এর ফসল। প্রাক্‌শিল্প বিপ্লব কালে প্রথমে বৃটিশ সওদাগররা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই-এর লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে তাদের দেশে শিল্প বিপ্লব আগে ঘটার সুযোগ নিয়ে বৃটিশরা ভারতে পুঁজিবাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারতে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় নৌপথে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ নিয়ে বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। বাণিজ্য প্রাধান্যের কাছে ভারতে শাসকবর্গ নতি স্বীকার করে। চুক্তি অনুযায়ী আকবর বাদশাহেরও পর্তুগীজ বেনিয়াদের অনুমতি ছাড়া নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে বাণিজ্য করার ক্ষমতা ছিল না। ১৫৪৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী সমুদ্রপথে ভারতসহ সব সওদাগরদের পর্তুগীজের রাজার অনুমতি নিয়ে বাণিজ্য করতে হত। এক বছর ধরে পর্তুগীজদের অধীনে ভারতের সওদাগররাও ব্যবসা করে। পর্তুগীজ বেনিয়া ও ভারতের সওদাগরদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধন সৃষ্টি হয়। পর্তুগীজরাই বাণিজ্যে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে থাকে।

পরবর্তীকালে ফ্রান্স, ওলন্দাজ ও ইংরেজরাও ভারতে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ইংরেজ ঐতিহাসিক হল্ডেন ফারবার দেখান যে ১৬৪১ সালে পর্তুগীজদের হটিয়ে ওলন্দাজরা নিষ্ঠুর পথ গ্রহণ করে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রথমে ওলন্দাজ এবং পরে ইংরেজরা গুজরাটসহ সমস্ত ভারতীয় বণিকদের তাদের অনুগত থাকতে বাধ্য করে।

৭.২.৩.৪ : ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ায় ভারত

১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। এরপর ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী গ্রহণের পর ইংরেজরা ভারতে রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা

পায়। সেই রাজস্বের সাহায্যেই নিজেদের ব্যবসা চালু রাখে। অর্থাৎ মাছের তেলে মাছ ভাজার নীতি চালু হয়। আর এই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ বিদেশে পাচার হত। অর্থাৎ শুরু হয় সম্পদ চালান থাকে দাদাভাই নওরোজি পরবর্তীকালে নির্গমন (drain) বলে উল্লেখ করেন। ভারত দিনে দিনে পুঁজিস্বল্প দেশে পরিণত হয় আর ভারতের পুঁজিতে বৃটেনে পুঁজিগঠনের কাজ ত্বরান্বিত হয়।

ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ রাজতন্ত্রের শাসন চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতকে কৃষিতে বিশেষায়ন ঘটাতে বাধ্য করা হয়। ভারতের হস্ত ও কুটির শিল্প যা মোঘল আমলের শেষে স্বর্ণযুগে পৌঁছেছিল তার ওপর নেমে আসে অপঘাত। ১৮১৩ সালে চার্টার আইন বলবৎ হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু করেন বৃটেন থেকে উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে আসা হয়। ভারতের হস্ত ও কুটির শিল্পের ওপর নানা ধরনের কর চাপানো হয়। ভারতে বৃটিশ পণ্য খুব সামান্য বা বিনাশুল্কে প্রবেশ করে। ভারত থেকে অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানির ব্যবস্থা হয়। রিকার্ডোর আপেক্ষিক ব্যয়ের নীতির ওপর ভিত্তি করে অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু হয়। উল্লেখযোগ্য যে সাম্রাজ্যবাদীদের এই অবাধ নীতি শুধু তাদের স্বার্থেই অবাধ ছিল। ভারত নিজের ইচ্ছেমত অবাধে তৃতীয় কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারত না। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে এই অসম নীতি চালু থাকে। ঔপনিবেশিকরনের কাজ সম্পূর্ণ হয় ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে। রেলপথ যে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে তা বৃটিশদের একতরফা ব্যবসায় সুবিধা করে দেয়। রেলপথে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও কাঁচামাল যেমন ইংলন্ডে রপ্তানি হয় তেমনি সেখানকার শিল্পদ্রব্য ভারতে অবাধে আসে রেলপথে। আর দেখা যায় যে রেলের মাশুলে একতরফা ভাবে বৃটিশদের আমদানি করা দ্রব্য এবং রপ্তানি দ্রব্য সুবিধা পায়। ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় দ্রব্যের আভ্যন্তরীন লেনদেনে সেই সুযোগ পাওয়া যায় না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের মাধ্যমে যে উপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ার সুত্রপাত করে তা শিল্পবিপ্লবের পর বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে পরিণতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ নীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপযোগিতাবাদী দর্শন ভারতের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতে ধ্রুপদী অর্থনীতি প্রয়োগের তাগিদ অনুভব করে বৃটিশ প্রশাসন। ভারতের বুদ্ধিজীবীরাও ধ্রুপদী অর্থনীতির দর্শনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। নতুন শতকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডে বেনিয়া পুঁজির জায়গা দখল করে শিল্পপুঁজি। ভারতকে শুধু ব্যবসার মৃগয়া ক্ষেত্র হিসাবে পণ্যের উপর দখলদারী নয়, বাজারের ওপর দখলদারীও হয়ে দাঁড়ায় সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য। ভারতের ওপর বৃটেনের এই সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ঃ

‘‘সম্প্রতি বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে। সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে.....। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নতুন কাণ্ড ঘটিয়াছে। তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব। এত বড় প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। ইউরোপের এই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।’’

৭.২.৩.৫ : পুঁজির প্রবাহ

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়নের জন্য দরকার পুঁজির। একটা স্বাধীন দেশে এই পুঁজি আসে দেশের অভ্যন্তর থেকে, যাকে দেশীয় পুঁজি বলা হয়। ভারতে হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প এবং কৃষি থেকে এই পুঁজি প্রবাহের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভাবনা লোপ পায়। প্রয়োজন হয় বিদেশী পুঁজির। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদেশী পুঁজির প্রবাহ ঘটে।

ভারতে কৃষি ও বাণিজ্য থেকে খুব মন্থর গতিতে হলেও সীমিত পুঁজির বিকাশ ঘটে। বাংলা দেশের গন্ধ বণিক, সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়, দক্ষিণ ভারতের ঢেট্টী সম্প্রদায়, তামিল-মুসলিম সম্প্রদায়, কেরালায় মোপলা নামে এক বেনিয়া মুসলমান গোষ্ঠী, কোঙ্কোন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, গুজরাটী বোনিয়া ও পার্সী সম্প্রদায় এবং রাজস্থান প্রদেশের মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটায়। পরবর্তীকালে এরাই পর্তুগাল, ব্রিটেন, ওলন্দাজদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিভিন্ন শিল্পে পুঁজি গঠনে সাহায্য করে। চা, পাট, কফি প্রভৃতি শিল্পে এরা ইংরেজদের সঙ্গে আংশিক ভাবে হলেও পুঁজি বিনিয়োগ করে। ব্রিটিশ আমলে গুজরাটী, পার্সী ও অন্যান্য সম্প্রদায় বস্ত্রশিল্প ও লৌহ ইস্পাত শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশীয় পুঁজির একটা ভূমিকা থাকলেও পরবর্তীকালে বৃহদায়তন শিল্পে ইংরেজদের একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম হয়। কলকাতা কোর্টের একটা হিসেবে দেখা যায় ১৮০৫-১৮২৬ সালের মধ্যে মোট জাহাজের টনেজে ভারতীয় বণিকদের ভাতা ছিল মাত্র ৫%—১০%। ১৯৩০ সালে দেখা যায় যে মাত্র ৬টি ইংরেজ এজেন্সি মোট রেজিষ্ট্রিকৃত জাহাজের টনেজের ৬৫% মালিক হয়ে দাঁড়ায়।

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলশিল্প সহ, পাট, চা, কফি প্রভৃতি শিল্পে ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে। কিন্তু দেখা যায় ভারতের মত উপনিবেশে ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ছিল সীমিত। সারা পৃথিবীতে যত ব্রিটিশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে তার মধ্যে এশিয়ায় ছিল ১৪%। এর মধ্যে ব্রিটিশদের উপনিবেশে তার প্রবাহ ছিল ৪০%। লেলাণ্ড জেংকস্ ভারতের ব্রিটিশ পুঁজির যে অনুপ্রবেশ ঘটে তার একটা হিসাব দেন। তাঁর হিসাবে দেখা যায় ১৮৫৪-১৮৫৯ সালের মধ্যে যখন ভারতে রেল লাইন পাতার কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে তখন ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড এর বিনিয়োগ ঘটে। এর প্রায় অর্ধেক বিনিয়োজিত হয় রেলে। একটা অপরিচিত সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ভারতে ৪৭০ মিলিয়ন পাউন্ডের অনুপ্রবেশ ঘটে। জর্জ পাইসের একটা হিসাবে দেখানো হয় যে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ১৯১০ সাল পর্যন্ত ৩৬৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে। ১৯১১ সালে এম.এফ. হার্ডওয়ার্ডের হিসাবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫০ মিলিয়ন পাউন্ড।

পাইস তাঁর গবেষণায় দেখান যে, যে সব ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছে সেই সব ক্ষেত্রগুলির সাথে ভারতের অর্থনীতির তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রায় অর্ধেক পুঁজি এসেছিল ভারতে ঋণ হিসাবে। চা-বাগিচা ইত্যাদিতে ৭ শতাংশ পুঁজির প্রবাহ ঘটে। কয়লা ও পেট্রোলের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে মাত্র ২ শতাংশ বিনিয়োগ ঘটে। বয়ন শিল্পে বিনিয়োগ ঘটেনি।

উপরোক্ত হিসাবে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ গেছে। ভারতে ব্রিটিশদের অর্জিত আয় যা বিদেশীদের মালিকানাধীন কোম্পানীতে বিনিয়োজিত নয় তা ধরা হয়নি। ব্যক্তিগত স্তরে ইংরেজেদর কোম্পানীর শেয়ারে যে টাকা খেটেছে তা ধরা হয়নি। সুতরাং ওপরে যে হিসেব দেওয়া হয় তার থেকে বেশি বিদেশী পুঁজির প্রবাহ ঘটে। তাও এই পুঁজি যাৎসামান্য, আমেরিকা বা কানাডায় ইংরেজরা যে পুঁজি খাটিয়েছে তার তুলনায় খুবই কম।

৭.২.৩.৬ : বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব ও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন (Balance of Payments and Drain of Wealth)

৭.২.৩.৬.১ ঃ লেনদেন হিসাব ও সম্পদ নির্গমন

দুটি দেশের মধ্যে অসখ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদ্রব্যের লেনদেন হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে এই লেনদেন থেকে দুটি দেশের মধ্যে দেনা ও পাওনার উদ্ভব ঘটে। দুটি খাতে এই দেনা ও পাওনার হিসাব রাখা হয়—একটা চল চলতি খাতে আরেকটা হল মূলধন খাতে। কোনো দেশে কোন বছরে চলতি খাতে উদ্বৃত্তের বা ঘাটতির উদ্ভব ঘটলে বিদেশী মুদ্রা, সোনা এবং ঋণের মাধ্যমে এই ঘাটতি মেটানো হয়। ফলে সামগ্রিক লেনদেন সব সময় সমতায় বিরাজ করে। চলতি খাতকে আবার দৃশ্য আমদানি রপ্তানি এবং অদৃশ্য আমদানি রপ্তানি খাতে ভাগ করে দেনা পাওনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া চলতি খাতে থাকে একতরফা হস্তান্তরিত দ্রব্য ও সেবা। যেমন উপহার দ্রব্য।

ভারতে বৃটিশ আমলে যে লেনদেন হত তাতে বাণিজ্য খাতে (ভৌতিক দ্রব্য) উদ্বৃত্ত বজায় থাকত। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত থেকে ভারত কোন প্রতিদান পেত না। বিভিন্ন ভাবে অদৃশ্য খাতে (যেমন বিদেশীদের শাসনখরচ বা তাদের দেশে তাদের খরচ যাকে ঘরোয়া খরচ বা (Home Charge) বলে বিদেশিদের পাওনা দেখিয়ে এবং প্রয়োজনে মূলধন খাতে দায় সৃষ্টি করে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পাওনা অস্বীকার করা হত। একে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন বলেন। বিভিন্ন উৎস ধরে ভারতের বৃটিশদের প্রতি এই দায়ের উদ্ভব ঘটানো হত। এমন কি বৃটিশরা অন্য কোথাও যুদ্ধ করলেও তার খরচকে ভারতের দায় বলে চাপানো হত।

আমরা ভারত থেকে এই সম্পদ নির্গমন ও তার প্রভাবের ওপর আলোচনা করব।

৭.২.৩.৬.২ ঃ সম্পদ নির্গমনের পর্যায় ও ধারা

দাদাভাই নরওরোজীর মত উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্‌রা দুশো বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বে ঔপনিবেশিক ভারত থেকে যে সম্পদের নির্গমন ঘটানো হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। দাদাভাই নওরোজীর Poverty and Un-British Rule in India. ডিগ্‌রির Prosperous British India এবং রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History of India নামক বইগুলো প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলোতে নির্গমন তত্ত্বের ওরর বিশদ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে ভারতে অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের জন্য দায়ী ছিল বিবেকহীন এই নিষ্ঠুর অব্যাহত নির্গমন। কর্নওয়ালিশ, শোর প্রমুখ ইংরেজ কর্তাব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবীরাও এই নির্গমনের ঘটনার নিন্দা

করেন। তবে থিওডোর মরিসনের মত ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা সম্পদ নির্গমনের ঘটনা স্বীকার করলেও এরা সবটাই অনুৎপাদনশীল এবং ভারতের স্বার্থ বিরোধী তা মনে করেন না।

পলাশীযুদ্ধের পর এক নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি সমাজের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো তার মোটা অংশ উপঢৌকন হিসাবে বৃটেনে পাঠানো হতো। এই রাজস্ব থেকে প্রশাসনিক খরচ বাদ দিয়ে যা থাকে তাকে 'মুনাফা' বলে চিহ্নিত করে একে বৈধতা দান করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই রাজস্বের টাকা থেকে ব্যবসা শুরু করে। তাদের লাভের বড় অংশে বৃটেনে চালান হতো, ভারতে তার পুনর্বিনিয়োগ ঘটত না। ইংরেজ বেনিয়ারা ভারত থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের টাকায় পণ্য কিনে তা রপ্তানি করত। এর থেকে মুনাফা হত। অর্থাৎ ভারতে আদায়ীকৃত রাজস্বই মুনাফার উৎস ছিল। ব্যবসায়ের জন্য যে দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হত তার প্রতিদান ভারত পেত না। প্রথম পর্যায়ের এই সম্পদ চালানকে নির্গমন বলে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া ভারতে কর্মরত ইংরেজরা তাদের আয় বিদেশে পাঠাতো। এখানে কর্মরত অবস্থায় যে দক্ষতা তৈরী হত তা ছিল ভারতে সৃষ্ট মূলধন। দেশের লোক প্রশাসনে থাকলে এই সৃষ্ট মানবিক মূলধন পরের প্রজন্মের কাজে লাগত। কিন্তু ইংরেজরাই প্রধানত প্রশাসনের কাজে থাকত এবং তারা অবসরের পর দেশে ফিরে যেত। এক্ষেত্রে যে মানবিক মূলধনের নির্গমন ঘটত তাকে নওরোজি নৈতিক নির্গমন বলেন। নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের অর্থনীতিতে যে দুর্যোগ দেখা যায় তাকে প্রণালী দশা বা 'করদশা' বলে।

১৮১৩ সাল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এই পর্যায় চলে। পিটের ভারত আইন অনুযায়ী ভারতে বৃটিশ শিল্পগোষ্ঠীর শাসনের সূত্রপাত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়া স্বার্থের জায়গা নিতে শুরু করে শিল্পপুঁজির স্বার্থ। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সরে আসে পণ্যের ওপর দখল থেকে বাজার দখলের ওপর।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আনুষ্ঠানিক পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবাধ বাণিজ্য নীতি বৃটিশ পণ্যের যেমন অবাধ প্রবেশের সুযোগ করে দেয় তেমনি ভারত থেকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের প্রবাহ বাড়ে। একই সঙ্গে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতে সস্তা বৃটিশ পণ্য বিশেষ করে সুতী পণ্যের বিক্রি বাড়ে। তবে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি মার খায়। ফলে সরকারের রাজস্ব কমে। এছাড়া বৃটিশরা ভারতে যে বিশাল বাজারের আশা করেছিল তাও পায় না। কারণ ভারতে ক্রয়ক্ষমতা কম থাকায় পণ্যের চাহিদা ছিল সীমিত। ভারতে আর্থিক মন্দার দরুন কর রাজস্ব ভীষণভাবে কমে যায়। কর রাজস্ব কমে যাওয়ায় আফিম করের ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা বাড়ে। আফিম কর বিস্তারের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হয়। দাদনব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে কৃষককে আফিমের চাষে বাধ্য করা হয়। আফিমের বাজার বাড়াবার জন্য চীনের জনগণের ওপর আফিমের নেশা চাপিয়ে দেওয়াই ছিল বৃটিশ নীতি। আর এর থেকে প্রাপ্য বিশাল পরিমাণ করাই হল 'প্রণামী'র বড় উৎস যা নির্গমন হিসাবে চালান হত বৃটেনে। ভারতে এই অবস্থাকে 'আফিম দশা' বলা হয়। নির্গমনকে অব্যাহত রাখাল এই 'আফিম দশা'।

ভারতের ওপর শিল্প পুঁজির প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে অবশিল্পায়ন ঘটে। ভারত যে পর্যায়ে প্রবেশ করে তাকে বাণিজ্যদশা বলা হয়। ভারতের বাজার বিদেশের কবলে চলে যায়। ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটায় বলে মনে করা হয়। ভারত থেকে খাদ্য ও কাঁচামালের রপ্তানি বাড়ে। ভারত বিদেশ থেকে শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে।

রপ্তানি মূল্য আমদানি মূল্য থেকে বেশি হওয়ায় রপ্তানি উদ্বৃতচত বাবদ ভারতের পাওনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই পাওনা রয়ে যায় অদেয়। এর বিনিময় অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা বস্তুগত কোন প্রতিদান ভারত পায় না। এই অদেয় প্রাপ্যকেই জাতীয়তাবাদী নেতারা সম্পদ নিঃসরণ বা নির্গমন বলেন। বাণিজ্য উদ্বৃত্তের ফলে ভারতে সোনার আমদানি বাড়ে। দাদাভাই-এর হিসাব ধরলে দেখা যায় ১৮০১-১৮৬৩ সালের মধ্যে ভারতে নিট সোনার আমদানির পরিমাণ ছিল ২৩.৪৩৫ কোটি পাউন্ড। এই সময় আমদানির পরিমাণ খুব কম ছিল। ১৮৬৪ সালের পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ভারতে রপ্তানি উদ্বৃত্ত বাড়িয়ে সোনার আমদানি বাড়তে সাহায্য করে। কিন্তু সোনার এই আমদানিতে ভারতে সোনার (ও রূপার) মজুত বাড়তে পারেনি। একই সঙ্গে ভারতে মুদ্রার প্রচলন বাড়ে ২৮.৬ কোটি পাউন্ড। অর্থাৎ, সোনার আমদানি ভারতে মূলধন সঞ্চয় ঘটিয়েছে তা বলা যায় না। বরং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অদেয় থেকে যাওয়ার সম্পদ নির্গমন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে।

ভারত থেকে যে সম্পদের নির্গমন ঘটতো তার অন্তর্ভুক্ত ছিল এখানে যে ইংরেজ প্রশাসক, কর্মচারী, সামরিক বাহিনী, রেলের কর্মচারীদের বেতন, সঞ্চয় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা তাদের দেশে পাঠানো হত। এই প্রেক্ষিতে দাদাভাই-এর মত জাতীয়তাবাদী নেতারা দাবী করতেন যে ভারতে ভারতবাসীদের উপরোক্ত সব ক্ষেত্রে নিয়োগ করা দরকার। তাহলে দেশের টাকা দেশেই থাকে। এখানে যেমন কর্মসংস্থান ঘটে তেমনি সঞ্চিত সম্পদ দেশের পুঁজি হিসাবে কাজ করতে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতে সম্পদ নির্গমনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল ঘরোয়া খরচ বা Home Charge. ভারতের সঙ্গে যুক্ত ইংল্যান্ডে বসবাসকারী সামরিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের খরচ, সেখান থেকে যে সব দ্রব্য ভারতে পাঠানো হত তার দাম, ইংল্যান্ডে অবস্থিত সেক্রেটারি অব স্টেট্ এর প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সব কিছুই ঘরোয়া খরচ বলে বিবেচিত হয়। এগুলো ভারতের লেনদেন হিসাবে দেনার তালিকায় দেখানো হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর এই খরচ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। যে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হত তার সঙ্গে এই দেনা দেখিয়ে ভারতের পাওনা অদেয় রেখে দেওয়া হত। উল্লেখযোগ্য যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত যত বেশি হয় তত ঘরোয়া খরচ বেশি দেখিয়ে অদেয় রেখে দেওয়া হয়। ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বেশি হলে সম্পদ নির্গমন বাড়ত। অর্থাৎ ভারতের ন্যায্য পাওনা অস্বীকার করার এ এক যন্ত্র। ঘরোয়া খরচের যাদুমন্ত্রে ভারতের পাওনা হারিয়ে যেত।

৭.২.৩.৬.৩ ঃ নির্গমনের হিসাব

আমরা দেখলাম যে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সমপরিমাণ প্রতিদান না থাকায় ভারতের প্রাপ্য যা অদেয় থেকে যায় তাকে নির্গমন বলা হয়। বাণিজ্য লেনদেনের হিসাব থেকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নির্ধারণ করতে পারলে নির্গমনের হিসাব পাওয়া যায়। অনেকে একে একে সরলিকৃত হিসাব বলে মনে করেন যা বাণিজ্য লেনদেনের বিভিন্ন হিসাবের জটিলতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না। দাদাভাই নওরোজি আবার এই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সঙ্গে রপ্তানি থেকে প্রাপ্য মুনাফাকে সম্পদ নির্গমন বলে বিবেচনা করেন। সমালোচনার উত্তরে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ইংরেজদের আমদানি ও রপ্তানি মূল্যের মধ্যে একটা গরমিল আছে। সেটা ধরলে নির্গমনের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এই গরমিলটা হল এই যে ভারতের রপ্তানি পণ্যের দাম রপ্তানিকারক দেশের বন্দর

দামে ধরা হয়। ফলে আমদানি করা দ্রব্যের দাম বেশি করে দেখানো হয় আর রপ্তানি করা দ্রব্যের দাম বেশি করে দেখানো হয়। দাদাভাই নির্গমনের যে হিসাব দেন তা নিচের সারণীতে দেখানো হল ঃ

ভারত থেকে নির্গমনের হিসাব

সময়কাল	বাৎসরিক গড় (পাউন্ড)
১৮৩৫-৩৯	৫,৩৪৭,০০০
১৮৪০-'৪৪	৫,৯৩০,০০০
১৮৪৫-'৪৯	৭,৭৫০,০০০
১৮৫০-'৫৪	৭,৪৫৮,০০০
১৮৬০-'৬৪	১৭,৩০০,০০০
১৮৬৫-'৬৯	২৪,৬০০,০০০
১৮৭০-'৭২	২৭,৪০০,০০০

ওপরের হিসাবের মধ্যে রেল কোম্পানীকে দেওয়া গ্যারেন্টি বাবদ সুদও ধরা হয়েছে। অনেকে রেলের জন্যা দেয় সুদকে নির্গমন বলে মানতে চান না কারণ রেল ভারত সম্পদ সৃষ্টি করে। এর জন্য খুব কম হারে সুদ ধার্য হয় যা যে কোন দেশকে বিনিয়োগের স্বার্থে দিতে হয়। ১৮৮৩-৯৩-এর মধ্যে দশ বছরে নির্গমন ছিল ৩৫৯ কোটি টাকা। এর থেকে রেলের জন্য ঋণের ওপরে সুদের অংশ বাদ দিলে তা দাঁড়ায় ২৮৮ কোটি টাকা বলে দাদাভাই দেখান। ওপরের আলোচনায় দেখা যায় যে পরিমাপের পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলেও ভারত থেকে সম্পদের যে নির্গমন ঘটত তা সত্যি। পরের দিকে ঘরোয়া খরচ বা হোমচার্জের খুব বৃদ্ধি ঘটে। ১৮৬১-৬২ সাল থেকে ১৮৭৪-৭৫ সালের মধ্যে ঘরোয়া খরচ ছিল ১০.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯১০-১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.৬ মিলিয়ন পাউন্ড।

৭.২.৩.৬.৪ ঃ নির্গমন তত্ত্বের সমালোচনা

দেখা যায় যে ইংরেজে সমালোচকরাও ভারত থেকে সম্পদ নির্গমনের ঘটনা স্বীকার করেন। তবে এই নির্গমন অনৈতিক এবং সবটাই বেশি স্বার্থ সিদ্ধি করেছে তা মনে করেন না থিওডোর মরিসনের মত ইংরেজ সমালোচকরা। এল.সি.এ. নোল্‌স্ বা ভেরা এন্‌স্টে-ও মরিসনকে সমর্থন করেন। মরিসন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঋণের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে ভারতের মত পশ্চাদপদ দেশকে আধুনিক করতে বিনিয়োগের দরকার হয়। এই বিনিয়োগ আসে ঋণ থেকে। একে অনুৎপাদনশীল ঋণ আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে উন্নত করতে, ভারতকে একটা 'উন্নত সরকার' উপহার দিতে ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এটা রাজনৈতিক অর্থে খরচ হলেও ভারতের স্বার্থই রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং, একে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলে বাতিল

করা যায় না। তবে ভেরা এন্‌স্টে এই রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ আরও কমানো দরকার ছিল বলে মনে করেন। মরিসন মনে করেন যে ভারত বৃটেন থেকে কম সুদে ঋণ পেয়েছে। এটা বরং বৃটেনের দিক থেকে ভারতের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। জে. এম. কেইন্‌স আরও একধাপ এগিয়ে বলেন যে ভারত থেকে সম্পদের নির্গমনতো ঘটেইনি বরং বৃটেন থেকে ভারতে নির্গমন ঘটেছে যাকে তিনি বিপরীতমুখী নির্গমন বলেন।

সমালোচকদের মতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্‌রা আবেগের তাড়নায় নির্গমন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। একে অনেকটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে।

৭.২.৩.৬.৫ ঃ নির্গমনের ফলাফল

ভারতের অর্থনীতির ওপর সম্পদ নির্গমনের এক বিরূপ প্রক্রিয়া কাজ করত যা অর্থনীতির উদ্দীপককে কাজ করতে দিত না। এই সম্পদ নির্গমন একদিকে দেশের পুঁজিগঠনের কাজকে প্রতিহত করে অনুন্নোয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখত অন্যদিকে নির্গমন ভারতের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য তীব্রতর করে চাহিদার অভাব ঘটাতো। চাহিদার অভাবে অর্থনীতির উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে যেত। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ভারতের অর্থনীতির ওপর সম্পদের এই বিরূপ প্রভাবের ওপর আলোকপাত করেন। দাদাভাই নওরোজি ও রমেশ দত্তের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করতেন যে ভারতের দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের কারণ ছিল সম্পদ নির্গমন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইংল্যান্ড থেকে বিদেশে যদি এই নির্গমন ঘটত তবে ইংল্যান্ড ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হত যা ইংল্যান্ডবাসীকে ত্রাস করত। তিনি তাঁর বই-এর মুখবন্ধে বলেন যে নির্গমিত এই সম্পদ ইংল্যান্ডের মাটিতে যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিল তাতে ইংল্যান্ডের মাটি উর্বর হয়ে উঠেছিল। আর শুষে নিয়েছিল ভারতের মাটির আর্দ্রতা। ভারতকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। প্রকৃত সম্পদের নির্গমন তিনভাবে ভারতের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করত।

প্রথমতঃ রপ্তানির উচ্চ হার বজায় রাখার জন্য জোর করে বাণিজ্যিকীকরণ ঘটানো হয়। কৃষককে বাণিজ্য শস্য উৎপাদনে বাধ্য করা হয়। এর সুফল পেত বিদেশী ব্যবসায়ী ও দেশি দালালরা। কৃষকরা দাম পেত না। তাছাড়া নগদ শস্য বাড়াবার তাগিদে জোয়ার ও বাজরার মত নিকৃষ্ট খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে। এই শস্য ভোগ করত গরিব মানুষরা। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত।

দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি বৃদ্ধির চাপে দেশের অভ্যন্তরে ফসলের দাম খুব বেড়ে যায়। অকৃষি পণ্যের তুলনায় কৃষি পণ্যের দাম বেশি হারে বাড়ে।

তৃতীয়তঃ নির্গমনের তাগিদে রপ্তানির সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে দেশীয় অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত বন্টনের ধরন এবং উদ্বৃত্ত কাজে লাগানোর ধরনে পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনগুলি ঘটে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রপ্তানিজাত শস্য উৎপাদন করা বা জোর করে উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার ফলে। শুধু উৎপাদন নয় বিপনীকরনের ধাঁচেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেশি ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায় বহির্বাণিজ্যের কর্তৃত্ব। দেশীয় ব্যবসায়ীরা কোনরকমে বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে টিকে থাকে। দাদন ব্যবস্থা আগেই চালু ছিল। তা আরও ব্যাপকতা ধারণ করে। গরীব ও প্রান্তিক কৃষকরা আরও ঋণপুঁজির জালে জড়িয়ে যায়। তারা

ফসলের দাম পায় না। দেশে ফসলের ধরনে যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি আয় বন্টনে পরিবর্তন আসে। কৃষিতে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে যে আয় বৃদ্ধি ঘটে তা বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে বেশী আসে। নির্গমনের তাগিদে যা ঘটে তা আবার নির্গমনকে সাহায্য করে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে স্থায়িত্ব দিতে নির্গমন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

নির্গমনের ফলে ভারতের অর্থনীতির ওপর যে ভয়াবহ প্রভাব দেখা যায় তার চিত্র ফুটে ওঠে ইংরেজ বুদ্ধিজীবী মন্টগোমারি মার্টিনের ১৮৩৮ সালের লেখায় যেখানে তিনি বলেন ঃ

''অর্ধেক শতাব্দী ধরে আমরা বছরে বিশ থেকে ত্রিশ, কখনো বা চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড ভারতবর্ষ থেকে নিকাশ করে নিয়ে চলেছি। অর্থ গ্রেট বৃটেনে পাঠানো হয়েছে ব্যবসায়িক ফাটকাবাজির ঘাটতি মেটাবার জন্য, ঋণ সুদ দেবার জন্য, 'হোম এস্টাব্লিশমেন্ট' রাখার জন্য এবং যাঁরা হিন্দুস্থানে কাটিয়েছে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ ইংল্যান্ডের মাটিতে লগ্নীর জন্য। ভারতবর্ষের মত একটি সুদৃঢ় দেশ থেকে বছরে ত্রিশ বা চল্লিশ লক্ষ পাউন্ডের নিরন্তর নিকাশ যা কোনদিনই ফেরৎ যায়না—তার কুফল পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিতে সম্ভব বলে মনে করি না।"

৪.২.৩.৭ : ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রা সমস্যা

৭.২.৩.৭.১ ঃ প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে মুদ্রানীতি

মোঘল আমলে দ্বি-ধাতু মুদ্রানীতি চালু ছিল। স্বর্ণমুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রার একই সঙ্গে প্রচলন ছিল। এছাড়া স্বাধীন রাজ্য বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যার যার শীলমোহর ব্যবহার করে নিজেদের মুদ্রা চালু রাখত। দেখা যায় যে বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন তাদের মধ্যেকার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখতে পারতো না। এর ফলে মুদ্রার কেনাবেচা ঘটতো। তৈরি হয়েছিল মুদ্রার এক ফাটকা বাজার। বিনিময় হারের ওঠানামার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন হারে মুদ্রা কেনাবেচা হত। ফাটকা কারবারিরা বিনিময় হারকে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করে কেনাবেচা থেকে লাভ করতো। একে টাকা ব্যবহারের জুয়াখেলা বলা হয়।

৭.২.৩.৭.২ ঃ রৌপ্যমানের প্রবর্তন

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮০৬ সালে দ্বি-ধাতু নীতি বর্জন করে রৌপ্য মুদ্রাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে ঘোষণা করে। বিভিন্ন মানের ও ওজনের রৌপ্য মুদ্রা চালু থাকায় বিনিময় হার ওঠানামার সমস্যা মেটেনা এবং তা দূর করার জন্য ১৮৩৫ সালে একই গুণমানের মুদ্রা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। টাঁকশালে ১৮০ গ্রেন অর্থাৎ বারোভাগের এগারো ভাগ রুপো থাকবে বলে স্থির হয়। স্বর্ণমুদ্রা তৈরি বন্ধ করা হয় তবে সরকারি কোষাগারে বেশ কিছুদিন স্বর্ণমুদ্রা চালু রাখা হয়। কেউ স্বর্ণমুদ্রা জমা দিলে তাকে রৌপ্যমুদ্রায় দাম মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল নতুন স্বর্ণমুদ্রা তৈরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আইনত সঙ্গত মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণমুদ্রা আর চালু থাকে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে সোনার দাম কমে। ভারতের রপ্তানি ও আমদানি ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ফলে মুদ্রার প্রচলন বাড়তে হয়। বহির্বাণিজ্যে যুক্ত ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়ে। এই অবস্থায় তিনটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আসে। প্রথমত,

আবার দ্বি-ধাতু ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়। রৌপ্যমুদ্রা চালু করে পাশাপাশি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে স্বর্ণমুদ্রা চালু করার প্রস্তাব আসে। দ্বিতীয়ত, কাগজি মুদ্রার প্রচলন করে তার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সরকারের হাতে রাখার কথা বলা হয়। তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যবস্থার আরও প্রসার ঘটিয়ে ধাতুমুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার অভাব দূর করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বড়লাটের কার্যনির্বাহক পর্ষদের সদস্য মি. চার্লস উইলসন আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতিতে কাগজি মুদ্রা পদ্ধতি চালু করার অনুমোদন দেন। তাঁর মৃত্যু ঘটায় স্যামুয়েল ইয়ং এই অনুমোদন কার্যকরী করেন। ইংল্যান্ডে তৎকালীন চলতি ব্যবস্থার অনুকরণে ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত মজুতবিহীন নোট প্রচলন ব্যবস্থা চালু হয়। সমমাত্রার রূপো বা সোনা মজুত রেখে এর বেশি নোট ছাপানো অনুমোদিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনমনীয় ব্যবস্থা হওয়ায় প্রয়োজনে মুদ্রার প্রচলন বাড়ানো যেত না। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য নোহং এর উত্তরাধিকারী চার্লস্ ট্রাভেলিয়ন ইংল্যান্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় তৈরি স্বর্ণমুদ্রাকে ভারতে বিহিত মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। এর বিনিময় হার ১পাঃ ১০টাঃ স্থির হয়। তৎকালীন ভারতের সচিব এই সুপারিশ নাকচ করে দেন। অবশ্য সরকারের দায় মেটাতে এই মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করা হয়। যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা মজুত থাকে তার সমমূল্যের কাগজি মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থা স্বীকার করা হয়। রুপোর দাম কমে গেলে চলতি বিনিময় হারে সোনার বিনিময় হার কমে।

১৮৬৬ সালে ম্যানসফিল্ড কমিশন স্বর্ণমুদ্রার মান বাড়াতে সুপারিশ করায় তা বাড়িয়ে ১০.৫০ টাকা (১ পাউন্ডের বিনিময়ে) করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর বাজারে রূপোর দাম কম থাকায় এই বিনিময় হার বাস্তবে ধরে রাখা যাবে না এই ভয়ে শেষ পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রা বর্জন করা হয়। আবার একধাতু ব্যবস্থা চালু হয়।

৭.২.৩.৭.৩ ঃ রূপোর দাম হ্রাস ও মুদ্রানীতি নিয়ে বিতর্ক

আন্তর্জাতিক বাজারে রূপোর দাম হ্রাস পাওয়ায় স্বর্ণমানের স্টার্লিং এর তুলনায় রূপোভিত্তিক টাকার দাম কমতে থাকে। ১৮৭২ সালের রূপোর টাকার দাম ছিল ১ শিলিং ১০.৭ পেন্স। ১৮৯৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১ শিলিং ২.৫ পেন্স। ভারতে টাকার অবমূল্যায়ন রোধ করার জন্য ইংরেজরা উদ্যোগী হয়। টাকার মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়াবার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা আন্দোলন শুরু করেন। এই বিতর্কটি তুলে ধরতে হলে মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাসের সম্ভাব্যা প্রভাবটি আগে আলোচনা করে নিতে হয়।

রুপোর টাকার দাম কমে গেলে ভারতকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘরোয়া খরচের দায় মেটাতে বেশি পরিমাণ স্টার্লিং পাঠাতে হত কারণ স্বর্ণমূল্যের স্টারলিং পেতে ভারতকে বেশি রূপোর টাকা দিতে হত। ১৮৯৪-৯৫ সালে ভারতকে ঘরোয়া খরচ বাবদ দিতে হয়েছিল ২৮.৯ কোটি টাকা। ১৮৭২-৭৩ সালের বিনিময় হারে সমপরিমাণ ঘরোয়া খরচের দাম ছিল ১৬.৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতকে বেশি স্টারলিং পাঠাতে হয় সমপরিমাণ দায় মেটাতে। এর ফলে ভারতের রাজকোষ শূন্য হতে থাকে। এর থেকে রেহাই পাবার জন্য ভারত সরকারকে কর বাড়াতে হত। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর জনরোষের ভয়ে সরকার তা করতে পারেনি। সে টাকার দাম বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতারা খরচ কমিয়ে ঘরোয়া খরচের দায়

মেটাবার জন্য চাপ দেয়। তাঁরা দেখান যে টাকার দাম বাড়িয়ে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা মানে চোরাপথে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা। কারণ টার দাম বাড়লে সাধারণ মানুষকে একই পরিমাণ কর দিতে বলা মানে তাকে বেশি কর দিতে বাধ্য করা। কারণ যে ১০০ টাকা সে কর দিত এখন তার দাম বেশি, সে সেই টাকায় বেশি দ্রব্য পায়। দাদাভাই নওরোজি দেখান যে টাকশাল বন্ধ করে দিয়ে তখনকার সোনার মূল্যে ১১ পেঃ টাকাকে ১৬ পেন্সে নিয়ে যাওয়া মানে গোপনে ভারতীয় করদাতাকে আরও প্রায় ৪৫ শতাংশ নতুন কর দিতে বাধ্য করা যদিও আপাতদৃষ্টিতে করের হার বাড়ে না। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা দেখানোর চেষ্টা করেন কিভাবে বৃটিশ শাসকদের এই অপচেষ্টা তাদের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করত ঃ

(ক) ইংরেজরা কোন অবস্থাতেই এমন নীতির সুপারিশ করত না যাতে নির্গমনের পরিমাণ কমে। সেই জন্য তারা ঘরোয়া খরচ কমানোর পথে যেতে রাজি ছিল না।

(খ) সরকারি কর্মচারীরা ছিল ইংরেজ। তাদের মাইনের টাকা তারা সোনায় দেশে পাঠাতে। রূপোর দাম কমে যাওয়া সমপরিমাণ রূপোর টাকায় কম পরিমাণ সোনা পাওয়া। তারা কম সোনা পাঠাতে পারত। এটা ইংরেজ সরকার মেনে নিত না। টাকার দাম বাড়িয়ে তারা ইংরেজদের এই লোকসান পূরণের চেষ্টা করে। তাতে ভারতীয়দের ক্ষতি হলেও তাদের কিছু এসে যেত না।

(গ) দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে ইংরেজরা লাভবান হত। টাকার দাম বাড়লে আমদানিজাত দ্রব্যের দাম কমে। ভারতীয় দ্রব্যের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা করতে সুবিধা হত।

(ঘ) টাকার দাম কমলে আমদানি পণ্যের দাম বাড়ে। ফলে দেশিয় পণ্য সুবিধা পায়। এটা ইংরেজদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

অনেকে মনে করেন যে টাকার বিনিময় মূল্য কমলে বিদেশের বাজারে ভারতের রপ্তানিদ্রব্যের দাম কমে। ফলে ভারত লাভবান হত। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা উদাসীন ছিলেন বলে সমালোচনা করা হয়। বাস্তবে তা নয়। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা সবসময়ই বলেছেন যে রপ্তানি ভারতে ব্যবসায় কর্তৃক করত ইংরেজরা। তাতে সেটা বিদেশে চালান হত। তাছাড়া ভারতে রপ্তানিদ্রব্যের চাহিদা ছিল অস্থিতিস্থাপক। তাই দাম কমলেও চাহিদা তেমন বাড়ত না। এই দুটি কারণে জাতীয়তাবাদী নেতারা টাকার দাম হ্রাসের অসুবিধার ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেননি।

১৯১৩ সালে চেম্বারলিন কমিটি গঠিত হয় যার সদস্য ছিলেন জে. এম. কেইন্‌স। ভারতের স্বর্ণবিনিময় ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয় না কারণ এর ফলে রূপোর টাকা তৈরি করতে গেলে ভারত সরকারের লোকসান হত। ১৯১৯ সালে টাকার বিনিময়মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ২ শিলিং ৪ পেন্স।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ভারতের মুদ্রার বাজারে এক সংকট দেখা যায়। ভারতে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা কমে। এছাড়া যুদ্ধের খরচ মেটাতে ইংল্যান্ড থেকে টাকা পাঠানোর দরকার হয়। ইংল্যান্ডে স্বর্ণ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইংল্যান্ড ভারতের প্রাপ্য সোনা পাঠায়। ভারতে স্বল্প রূপোর যোগানের মুখে টাকা তৈরির জন্য

রূপোর চাহিদা বাড়ে। যুদ্ধের বাজারে ভারতে টাকার বিনিময় মূল্য কমে। কাউন্সির বিলের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলে।

যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে মে মাসে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে রূপোর দাম চড়ে দাঁড়ায় পাউন্ড প্রতি ৫৮ পেন্স। ডলারের তুলনায় স্টার্লিং এর দাম কমায় তা রূপোর দাম বৃদ্ধির আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। রূপোর এই দাম বৃদ্ধির ফলে টাকার বাহ্যিক মূল্য (face value) তার ধাতু মূল্যে নীচে নেমে যায়। হিল্টন কমিশন মনে করে যে ভারতের মুদ্রার বিনিময় হার ১ টাকা = ১ শিলিং ৬ পেন্সে স্থির থাকা উচিত। স্বর্ণপিণ্ড মান সম্পর্কে নীতিগত বিরোধিতা না থাকলেও ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একে ১ টাকা = ১ শিলিং ৪ পেন্সে স্থির রাখার পক্ষে মত দেন। শিল্পপতি পুরষোত্তম দাস ঠাকুরের মতে প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই বিনিময় হার একটা প্রবণতা হিসবে দেখা যায়।

১ টাকায় ১ শিলিং ৬ পেন্সে বিনিয়োগ হার নির্ধারিত হওয়ায় বৃটেনের তুলনায় ভারতের সোনার দাম কম থাকে। এর ফলে সোনা দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা দেখা যাবে বলে মনে করা হয়। সোনার এই চালান ভারতবাসীর পক্ষে শুভ নয় বলে জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন। সাধারণ মানুষ অভাবে পড়ে সোনা বিক্রি করে কম দামে। এই সোনা বিক্রি হয়ে বিদেশে চলে গেলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংকোচন ঘটে। আর এর সুবিধা চালান হয় বিদেশে।

৭.২.৩.৭.৪ ঃ স্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা

১৯৩১ সালে বৃটেন স্বর্ণমান বর্জন করলে ভারতেও নতুন নীতি অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া মন্দাকালীন অর্থনীতিতে স্বর্ণমুদ্রামান কার্যকরী নয় বলে প্রমাণ হয়। সরকার সরাসরি টাকার সঙ্গে স্টার্লিং এর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। বিনিময় হার ১ টাকায় ১ শিঃ ৬ পেঃ স্থির রাখা হয়। ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা আবার পুনরায় বিশুদ্ধ স্টার্লিং বিনিময়ের রূপ পায়। এই ব্যবস্থাতেও বিনিময় হার বেশি থাকায় ভারতের বাজারে সোনার দাম বৃটিশ বাজারের তুলনায় কমে যায়। ফলে সোনার নির্গমন ঘটে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে দেশের মজুত সোনার থেকে প্রায় ৩০৬ কোটি আউন্স পর্যন্ত স্বর্ণ নিঃশেষিত হয়। স্বর্ণ রপ্তানির মূল্য ৩০০ কোটি টাকা ছড়িয়ে যায়। ভারত থেকে সোনার এই বাণিজ্যিক প্রবাহ ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার পতন ঘটায় বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে স্টার্লিং মজুতের ভিত্তিতে প্রচলিত টাকার যোগান বাড়ে, ১৯৩৮-৩৯ সালে টাকার যোগান ২১০.৬৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৪৮-৪৯ সালে হয় ১২৫৩.৮৬ কোটি টাকা। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। ১৯৩৯ সালের ভিত্তিতে ১৯৪৩ সালে দাম সূচক দাঁড়ায় ২২০.১। ১৯৫০ সালে তা বেড়ে হয় ৩৯৫.৬।

৪.২.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রনেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিশার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিসার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agricultrue at backwandness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Datta

(১২) Essays on Commercialisation of India Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Eric Stokes, Oxford University Press.

৪.২.৩.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ইংরেজ আমলে ভারতের অর্থনীতি কিভাবে বিশ্বাসাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীভূত হয় তা আলোচনা কর।

(২) ভারতের শিল্পায়নে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা আলোচনা কর।

(৩) সম্পদের নির্গমন বলতে কি বোঝায়? সম্পদ নির্গমন তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও ধারাটি আলোচনা কর।

(৪) সম্পদ নির্গমনের প্রভাব আলোচনা কর।

(৫) উপনিবেশিক ভারতে মুদ্রাসমস্যার প্রকৃতি আলোচনা কর।

একক-৪

ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি অর্থনীতি

বিন্যাস ক্রম :

৭.২.৪.০ : উদ্দেশ্য

৭.২.৪.১ : ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন

৭.২.৪.২ : বাজারমুখিতা ও কৃষি

৭.২.৪.৩ : রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষির সংযুক্তি

৭.২.৪.৪ : উৎপাদন বৃদ্ধির ধারন

৭.২.৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.২.৪.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.২.৪.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ও ধরন;

২। বাজারমুখিতা ও কৃষি

৩। বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষির সংযুক্তি

৭.২.৪.১ : ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন

আমরা জানি যে কৃষি জমিতে দুধরনের ফসল উৎপাদিত হয়—খাদ্যশস্য ও নগদ শস্য বা বাণিজ্য শস্য। ধান, গম, বাজরা প্রভৃতি হল খাদ্য শস্য। আর পাট, তুলো, তৈলবীজ, নীল, পাট প্রভৃতি হল নগদ শস্য। প্রধানত খাদ্যশস্য প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য উৎপাদিত হয় আর নগদ শস্য বা বাণিজ্য শস্য কাঁচামাল হিসাবে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে একটা পশ্চাদপদ দেশে এই ধরনের সরলীকরণ সম্ভব। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি প্রকৃতি নির্ভরতা ত্যাগ করে জ্ঞাননির্ভর হয়। বাজার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সব শস্যই বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। সুতরাং উপরোক্ত বিভাজীকরণ তখন তার প্রযোজ্য হয় না। তবে ভারতের কৃষিতে আধুনিকীকরণ না ঘটায় আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদন এবং তার ধরন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার আলোচনা উপরোক্ত বিভাজন দিয়ে শুরু করতে পারি। বৃটিশ ভারতে কৃষক উৎপাদন করত প্রধানত নিজের পরিবারের ভরণপোষণের তাগিদে। বাজারের জন্য সামান্য যা উৎপাদন করত তা কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে

কাঁচামাল হিসাবে কাজে লাগত। খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্তের একটা অংশের রাজস্ব হিসাবে নিষ্কাশন ঘটত যার সাহায্যে অকৃষি সম্প্রদায়ের ভরণপোষণ চলত। ইরফান হাবিবের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন যে মোঘল আমলেই ভারতের অচলায়তন অবস্থা ভাঙ্গতে শুরু করেছিল। বাজার অভিমুখে উৎপাদন শহরের সঙ্গে গ্রামের সংযোগ ঘটায়। ভারতে পুঁজিবাদ বিকাশের একটা শর্ত তৈরি হতে থাকে। মোঘল আমল থেকেই ইউরোপিয় বেনিয়াদের সংস্পর্শে এসে ভারতের কৃষি উৎপাদন এবং তাকে ঘিরে ব্যবসায় যে পরিবর্তন আসতে থাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে তা ত্বরান্বিত হয়। ভারত বিশ্বপুঁজিবাদের অংশ হয়। কিন্তু একই সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না। নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের মুখে ভারত কৃষিতে বিশেষীকরণ ঘটায়। একই সঙ্গে দেশের শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিদেশের পণ্যের বাজার হিসাবে গড়ে ওঠে ভারতের অর্থনীতি। ভারত কৃষি থেকে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করতে থাকে। শুধু আভ্যন্তরীণ বাজার নয়, বিশ্ববাজারে ভারত হয়ে দাঁড়ায় কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী।

৭.২.৪.২ : বাজারমুখিতা ও কৃষি

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে আমরা শুধু কৃষি দ্রব্যের পণ্যরূপ ধারণ বা নগদ লাভের আশায় বাজার বিক্রয় বুঝি না। কৃষকের স্বেচ্ছায় বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তি, কৃষিপণ্যের সঙ্গে জমির বাজারের সম্প্রসারণ এবং এদের সঙ্গে সংগতি রেখে কৃষি সমাজের স্তরবিন্যাসে পরিবর্তনকে বুঝি। এই সবকিছুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কে এক গুণগত পরিবর্তন আসে। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে বিকাশের দুয়ার খুলে যায়। বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ধরনের পরিবর্তন আসে। অর্থাৎ কৃষি সমাজে এক কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায়।

কোন অর্থনীতিতে বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করে বাণিজ্যিকীকরণ আত্মপ্রকাশ করতে পারে যেখানে বাজারে সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি কৃষকের স্বেচ্ছাধীন। এই প্রক্রিয়ায় রাজস্ব আদায় বা মহাজনের ঋণের দায়ে কৃষক শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হয় না। বাজার দামের সুযোগ এবং তার ফলে বাড়তি আয় কৃষক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। কৃষকের দরকষাকষির ক্ষমতা থাকে। এর ফলে পুঁজিগঠনের হার বাড়ে। লাভের পুনর্বিনিয়োগ কৃষি উন্নয়নে সহায়ক হয়।

অপর দিকে রাজস্ব দেওয়ার দায়ে বা ঋণ মেটাবার বাধ্যবাধকতার জন্য কৃষক বাজারের শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হতে পারে। অভাবের তাড়নায় তাকে ভোগের অংশও বিক্রি করে দিতে হয় যাকে অভাবি বিক্রয় বলে। পরে ঋণ করে হলেও তাকে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বেশি দামে শস্য কিনতে হয়। বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেচ বাহ্যিক চাপে, কৃষকের ইচ্ছেয় নয়। একে বলপূর্বক বাণিজ্যকীকরণ বলে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণের সুবিধা কৃষক পায় না। ব্যবসায়ী ও মহাজন এই প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ব করে। একটা উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদীশক্তি এবং দেশের ব্যবসায়ী ও মহাজনের মধ্যে একটা অশুভ জোটবদ্ধ তার সৃষ্টি হয়। এরাই বাণিজ্যকীকরণের প্রক্রিয়া কৃষকের ওপর চাপিয়ে দেয়। অমিত ভাদুড়ী দেখান যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ও বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণের বিভিন্ন মাত্রায় সংযুক্তি ঘটে। উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের এই দুটি পদ্ধতিকে বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রিত হতে দেখা যায়। উভয়ের আপেক্ষিক শক্তির ওপর নির্ভর করে উদ্বৃত্ত হরণকারী বিভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক বলে। ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে দেখা যায় বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে প্রধানত বাহ্যিক শক্তি বলে। তাই একে মূলতঃ বলপূর্বক

বাণিজ্যকীকরণ বলে চলে।

৭.২.৪.৩ : রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতে কৃষিক সংযুক্তি

অবাধে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানির পক্ষে বৌদ্ধিক যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে ডেভিড রিকার্ডোর আপেক্ষিক সুবিধা এবং অবাধ বাণিজ্যনীতির সাহায্যে। এর পেছনে যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছিল সেটা ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা বলেন না। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দিয়ে উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য ইংরেজ শিল্পপতিদের বিদেশ থেকে খাদ্য ও কাঁচামাল অবাধে আমদানি করা যেমন দরকার ছিল তেমনি দরকার ছিল ভারতের বাজারকে তাদের শিল্পপণ্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করা। এর জন্য ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি অপরিহার্য ছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ভারতে রেলশিল্প পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

শুধু আন্তর্জাতিক স্তরে কৃষির বিশেষীকরণ ঘটে তা নয়। দেশের অভ্যন্তরেও যে অঞ্চল যে শস্য উৎপাদনে বেশি নিপুণ সেই অঞ্চল সেই পণ্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটায়। দেশের পক্ষে আঞ্চলিক এই বিশেষীকরণ কাম্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকা একটা দেশ নিজের উন্নয়নের কাজে এই বিশেষীকরণকে কাজে লাগাতে পারে না। আঞ্চলিক এই বিশেষীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে সাহায্য করে। ভারতে এক একটা অঞ্চল তাদের সুবিধামত কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করা। যেমন দক্ষিণ ভারতে আগ্নেয় শিলাজাত কালোমাটির অঞ্চল লম্বাআঁশযুক্ত তুলোচাষের উপযোগী। ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের জন্য এই ধরনের তুলো আসত দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। ১৮৬০ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বাঁধায় ইংরেজরা বাধ্য হয় ভারত থেকে তুলো আমদানি করতে। ভারতে তুলোর চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। দক্ষিণে কৃষকরা এতদিন অল্প পরিমাণ তুলো উৎপাদন করত। তার সঙ্গে খাদ্যশস্যও কিছু উৎপাদন করত। তুলোর চাহিদা এবং তার সঙ্গে দাম বাড়ায় তারা তুলো উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটায়। এর ফলে তারা খাদ্য শস্য বাজার থেকে কোনো অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ে। বাজারের সম্প্রসারণ ঘটে। কৃষকরা বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন শুরু করে। বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। রপ্তানি ও বাণিজ্যিকীকরণ এই ভাবে কৃষি উৎপাদনে বিশেষীকরণ ঘটিয়ে অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা পরাধীন দেশে রপ্তানি উদ্বৃত্ত বজায় রেখে সম্পদের নির্গমন ঘটানো হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত সুবিধা বিদেশে চালান হয়। ধনী কৃষকরা সুবিধা পেলেও আমরা দেখব যে গরীব ও প্রান্তিক কৃষকরা এতে সুবিধা পায় না।

৭.২.৪.৪ : উৎপাদন বৃদ্ধির ধরন

আমরা বিভিন্ন শস্য ধরে উৎপাদন, চাষের এলাকাও একর প্রতি উৎপাদনের গতিপথ আলোচনা করতে পারি। দেখা যায় যে খাদ্যশস্যের তুলনায় নগদ শস্যের আওতায় চাষের এলাকা আপেক্ষিকভাবে বেড়েছে। নীল, আফিম, তৈলবীজ, পাট প্রভৃতি ছাড়াও গমের ক্ষেত্রেও চাষ এলাকা বেড়েছে। লক্ষ্যনীয় যে দক্ষিণভারতে ১৮৬০ সালের পর তুলাচাষের ক্ষেত্রে যে স্ফীতি দেখা যায় তার ফলে ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে তা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ে। একই সময়ে ধান উৎপাদনের এলাকা কমেছে। এছাড়া গম উৎপাদনের এলাকাও যথেষ্ট বেড়েছে। পাট

চাষের এলাকাতেও উর্দ্ধগতি দেখা যায়। তবে জোয়ারের মত নিকৃষ্ট শস্যের উৎপাদন এলাকা কমেছে। এর সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে উৎপাদনও কমেছে। বাজরা ও জোয়ারের উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে। জোয়ারের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক। লক্ষ্যণীয় যে তুলোর ক্ষেত্রে একর প্রতি উৎপাদন কমেছে। ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে তুলোর উৎপাদন বেড়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়েছে সেসব ক্ষেত্রে তা ঘটেছে চাষের এলাকা বৃদ্ধির দরুন। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তা ঘটেনি। অর্থাৎ প্রযুক্তির সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক পাওয়া যায় না। চাষ এলাকা বাড়ায় উৎপাদনের হার বেড়েছে।

নিচের সারণিতে আমাদের এই পর্যবেক্ষণটি তুলে ধরা হল ঃ

কয়েকটি ফসলের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হারের প্রবণতা ঃ

উৎপাদন, চাষের এলাকা, একর প্রতি উৎপাদন (শতকরা বার্ষিক হার)

	১৮৯১-১৯০১	**১৮৯৬-১৯০৬**	**১৯০১-১৯১১**	**১৯০৬-১৯১৬**
উৎপাদন				
চাল	০.৩৭	-০.৩৭	০.৪৯	১.১২
গম	১.৬৩	২.৩৫	২.০৩	১.৫৬
জোয়ার	১.৪৮	০.১৭	০.৪২	১.০৯
বাজরা	২.৪৭	১.৯৬	১.৭৪	০.৬৪
ভুট্টা	২.২০	১.৩১	১.০৫	১.৬৩
তুলা	২.১৭	৪.৮৫	২.৯৪	১.৪৩
পাট	২.৬১	৪.০৩	১.০৭	০.৮১
চাষের এলাকা				
চাল	-০.২১	-০.৩৬	০.৩১	০.৩৮
গম	-০.২৬	২.২৯	০.৬০	০.৮৮
জোয়ার	০.৭০	-০.১৭	-০.৭৬	-০.১৭
বাজরা	১.৮২	১.৯৪	১.৫২	-০.১৮
	১৮৯১-১৯০১	**১৮৯৬-১৯০৬**	**১৯০১-১৯১১**	**১৯০৬-১৯১৬**

ভুট্টা	১.৭২	০.৭৩	০.১৩	০.১০
তুলা	-০.৩৩	৪.২৫	৩.১১	০.৫৭
পাট	-০.৫৫	৫.৪৯	২.১৬	-১.৮৫
একর প্রতি উৎপাদন				
চাল	০.৫২	০.০৭	০.২১	০.৭৪
গম	২.৫৩	০.৩৪	১.৩৫	০.৭৬
জোয়ার	০.৮০	০.১৬	০.৪১	১.১৭
বাজরা	০.৭৮	-০.২৬	০.২২	০.৬৪
ভুট্টা	০.৪৬	০.৬৩	০.৯১	-১.৫২
তুলা	২.৪৪	০.৮৭	-০.৩৫	০.৯৫
পাটি	৩.২২	-১.০৫	-১.৪০	২.৬১

* ভোগের দিক থেকে নিকৃষ্ট দানাশস্য

দ্রষ্টব্য ঃ G. Blyn, Agriculural Trends, pp. 327-29.

৭.২.৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি—রণেশ রায়

২। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি—সব্যসাচী ভট্টাচার্য

৩। Essays on Commercialization of Indian Agricultrue–K. N. Raj (Ed.)

৪। Cambridge Economic History–Vol. II

৫। George Blyn–1891-1946 Agricultural Trend in India

৬। Amit Bhaduri–A study in Agriculture at backwardness under semi-feudalism (1973) Economic Journal, Vol. 83.

৭.২.৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ভারতে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের স্বরূপটি ব্যাখ্যা কর।

২। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধরন আলোচনা কর।

৩। রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে কৃষির সংযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

INDUSTRY AND POPULATION

ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্প অর্থনীতি

একক-৫

বিন্যাস ক্রম

৭.৩.৫.০ : উদ্দেশ্য

৭.৩.৫.১ : প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতির বুনিয়াদ—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্পের উদ্ভব

৭.৩.৫.২. : কুটির ও হস্তশিল্পের ধ্বংস-সাধন

৭.৩.৫.৩ : অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

৭.৩.৫.৪ : ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

- ৭.৩.৫.৪.১ : পাটশিল্প
- ৭.৩.৫.৪.২ : রেল শিল্প
- ৭.৩.৫.৪.৩ : বস্ত্র শিল্প
- ৭.৩.৫.৪.৪ : চা শিল্প
- ৭.৩.৫.৪.৫ : চিনি শিল্প
- ৭.৩.৫.৪.৬ : লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

৭.৩.৫.৫ : পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

৭.৩.৫.৬ : ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব

৭.৩.৫.৭ : ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন ও রাষ্ট্র

৭.৩.৫.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৩.৫.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৩.৫.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতি—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্প

(২) ভারতে কুটির ও হস্তশিল্পের ধ্বংসসাধন

(৩) অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

(৫) পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

(৬) ভারতে শিল্পায়নের সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব

৭.৩.৫.১ : প্রাক্ ব্রিটিশ অর্থনীতির বুনিয়াদ—গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্পের উদ্ভব

মোঘল ভারতে কৃষির পাশাপাশি গ্রামীণ কুটির ও হস্ত শিল্পের উদ্ভব ঘটে। কৃষকরা যা উৎপাদন করতো তার একটা অংশ তাদের জীবিকায় সাহায্য করতো। জমিদারদের দেয় খাজনা ছাড়াও একটা বড় অংশ যেত সরাসরি রাজদরবারে। রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সেবা বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের রক্ষণাবেক্ষণে উদ্বৃত্তের একটা অংশ খরচ হতো, আর একটা অংশ উন্নয়নের কাজে লাগাতো। গ্রামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে জোগান আসতো কৃষকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এছাড়া শহরে যে কারখানা শিল্প গড়ে উঠতো তা শহরের বিত্তশালী মানুষ ও রাজা-বাদশাদের ভোগে কাজে লাগতো। উদ্বৃত্তের একটা অংশ শিল্পে নিয়োজিত শিক্ষানবিশদের কাজে লাগানো হত। এই ধরনের শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা আসতো ভূ-স্বামী ও কেন্দ্রীয় শাসনে অধিষ্ঠিত রাজা-বাদশাদের কাছ থেকে। ভারতে গড়ে উঠেছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কৃষিকর্মীদের পরিপূরক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতো যখন কৃষি কাজ বন্ধ থাকতো অর্থাৎ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প মৌসুমী বেকারের বিরুদ্ধে কৃষিকর্মীদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতো। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠা সমাজকে অনেকে 'এশিয়াটিক' সমাজ বলেন। একে 'প্রাচ্য দেশীয় স্বৈরাচারী' (Oriental Despotism) ব্যবস্থাও বলা হয়।

৭.৩.৫.২ : কুটির ও হস্তশিল্পের ধ্বংস সাধন

ভারতে ঔপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে গেলে দেশকে কৃষিতে বিশেষায়ণ ঘটানো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন করা একটা সাম্রাজ্যবাদী বাধ্যবাধকতা বলে বিবেচনা করা হয়। সেই অনুযায়ী দেশের শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, শুল্কনীতি, পরিবর্তন করা দরকার হয়। আবার একই সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে দেশ থেকে কৃষিপণ্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া এবং বিদেশ (বৃটেন) থেকে শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভারতে নিয়ে আসার পথ সুগম করতে হয়। দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে সঙ্গে কাজ হারিয়ে বিভিন্ন শহরাঞ্চল থেকে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামমুখী হয়। গ্রামে শ্রমজীবী মানুষের এই পশ্চাদ্‌মুখী স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে বিনগরীকরণ (বা গ্রামিণীকরণ) বলা হয়। অর্থনৈতিক এই কাঠামো পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া ভারতের ইতিহাসে অবশিল্পায়ন নামে পরিচিত। অর্থাৎ ''অবশিল্পায়ন বলতে আমরা প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে নেহাৎ পুরানো ক্ষয়িষ্ণু শিল্পগুলির পতন বুঝি না। অবশিল্পায়ন বলতে বুঝি শিল্পায়নের বিপরীত প্রক্রিয়া যা দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন আনে যে সেই দেশে উন্নয়নের নিজস্ব উপাদানগুলি ক্রিয়া করতে পারে না।''

৭.৩.৫.৩ : অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়া

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতে বৃটিশ নীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়া স্বার্থের জায়গায় বৃটিশ শিল্পপুঁজির স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইংল্যান্ডে তখন বেনিয়া পুঁজির জায়গায় দখল নিচ্ছে শিল্পপুঁজি। ভারতে শুধু বেনিয়া স্বার্থ বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদ সন্তুষ্ট থাকে না। নতুন শতকের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে নেহাত ভারতে পণ্যের উপর দখলদারি নয় বাজারের ওপর দখলদারিরও দরকার হয় বৃটিশ শিল্পের স্বার্থে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর থেকে ভারতের শিল্পজাত পণ্যের বাজার মন্দীভূত হতে থাকে। ১৭৯৪ সালে কোম্পানি ভারতের ছিট কাপড়ের ওপর ৪.৭৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৮১০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২.৫৫ মিলিয়ন টাকা। শিল্পবিপ্লব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপণ্য নয়, ব্রিটিশ পণ্যের জন্য ভারতের বাজার দখল প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বাজার দখলের দুটো উদ্দেশ্য ছিল—বৃটেনের পণ্য অবাধে ভারতে বাজার করে নেওয়া এবং তাদের শিল্পের প্রয়োজনে ভারত থেকে কাঁচামাল ও খাদ্য নিয়ে যাওয়া। ১৮১৩ সালে চার্টার আইনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বেনিয়া অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৮৪৮ সালে ব্রিটেনে শস্য আইন তুলে দেওয়া হয়। রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় নীতির যুক্তি দেখিয়ে ভারতে কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী হিসাবে বিশেষীকরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়।

ভারতের সঙ্গে বৃটেনের আমদানি রপ্তানির ধরনটায় বিপরীতমুখী এক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারত বৃটিশ পণ্যের, বিশেষ করে, সুতি পণ্যের আমদানি শুরু করে। আর ভারত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানিতে বিশেষীকরণ ঘটায়। বিদেশ থেকে পাকানো ও কাটানো সুতোর আমদানি খুব বেড়ে যায়। বৃটেন থেকে ভারতে সুতি বস্ত্রের রপ্তানি ১৮১৫ সালে ছিল ০.৪০ মিলিয়ন গজ। ১৮৯৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০.০৫ মিলিয়ন গজ। পাকানো সুতো ১৮১৪ থেকে ১৮২৮ সালে ৮ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয় ৪.৫৬ মিলিয়ন পাউন্ড। এবং ১৮৩৯ সালে তা আরও বেড়ে হয় ১০.৮১ মিলিয়ন পাউন্ড। অপরদিকে ভারত থেকে কাপড় রপ্তানিতে এক ভয়াবহ মন্দা দেখা যায়। ১৮৪৯ সালে ভারত থেকে রপ্তানিকৃত তুলোদ্রব্য, পাকানো ও কাটানো সুতোর মূল্য মাত্র ০.৬৯ মিলিয়ন পাউন্ডে নেমে আসে। ভারতে কাপড় ব্যবহারে বৃটিশ রপ্তানিকৃত অনুপাতের হার ১৮৬০ সালে তিনগুন বেড়ে হয় মোট ব্যবহৃত পরিমাণের ২৭ শতাংশের বেশি।

ভারতের তাঁতিরা টিকে থাকার স্বার্থে আমদানি করা সস্তা পাকানো ও কাটানো সুতো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতে সুতি কাটানো শিল্প মন্দার কবলে পড়ে। এর সর্বপ্রথম আঘাত আসে তাঁতশিল্পের ওপর। মনে করা হয় যে বৃটেনের আধুনিক কারখানায় তৈরি কাপড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারত পেরে ওঠে না। এর কারণ বৃহদায়তন উৎপাদনে খরচের সুবিধা। কিন্তু এই যুক্তি অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকও অস্বীকার করেন। বয়নশিল্প ধ্বংসের জন্য এইচ. এইচ. উইলসন সরাসরি ইংরেজ সরকারের নীতির সমালোচনা করে বলেন,—

....''বলা চলে যে ভারতে যে তুলো ও রেশমপণ্য উৎপাদিত হতো তা বৃটেনের বাজারে এতদিন পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে দামে উৎপাদি হতো তার থেকে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ কম দামে বিক্রি করা যেত। এর ফলে

ইংল্যান্ডের পণ্যকে সংরক্ষিত করতে গিয়ে আমদানিকৃত ভারতীয় পণ্যের ওপর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শুল্ক বসাতে হয় বা অন্য কোন প্রত্যয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হয়। এটা না করলে পেইল্‌সি বা ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে যেত। বাষ্প ইঞ্জিনের ব্যবহারও একে বাঁচাতে পারত না। ভারতের উৎপাদককে বলি দিয়েই এটা করা হল। ভারত স্বাধীন থাকলে এর প্রতিশোধ নিতে পারত পাল্টা ভারতে বৃটিশ পণ্যের ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্কনীতি গ্রহণ করে।"

ইংরেজদের ভারতের বাজার জয় করার স্বপ্ন সার্থক হয় রেলপথ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৫০ সালের পর থেকে ভারতে বৃটিশ পণ্যের রপ্তানি বাড়তে থাকে। ১৮৪৬-৫৫ সালের মধ্যে বৃটেনের বহির্বিশ্বে রপ্তানির ৯.১৫ শতাংশ রপ্তানি হত ভারতে। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫-র মধ্যে এই অনুপাত বেড়ে হয় ১২.৬ শতাংশ। ১৮৪৯ সালে ভারতে কাপড় ও সুতো রপ্তানির অংশ ছিল সমজাতিয় সমগ্র বৃটিশ রপ্তানির ১১.৭ শতাংশ। ১৮৭৫ সালে তা বেড়ে হয় ২৭ শতাংশ। রেলপথ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ দ্রব্যের অবাধ আমদানি সম্পর্কে ইরফান হাবিবের মন্তব্য ঃ

''আমদানির এই নির্বিচার হননে অপরিসীম দুর্দশায় মুখ থুবড়ে পড়া ছাড়া প্রাচীন হস্তশিল্প আর কিছুই করতে পারে না।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যেই ভারতের বেশিরভাগ দেশীয় শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। দেশীয় শিল্পের এই ধ্বংসসাধনকে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা ভারতের অসহনীয় দারিদ্র্যের ও বেকারির অন্যতম কারণ বলে মনে করেন অবশিল্পায়ন যে হারে বেড়েছে দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সেই হারে বেড়েছে। অবশিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শহরে নিয়োগ হারিয়ে মানুষ গ্রামে ফিরে আসে। একে ভারতের ইতিহাসে 'গ্রামিণীকরণ' বা বিপরীতে ''অবনগরীকরণ" বলা হয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কৃষি প্রকৃতি নির্ভর হওয়ার কুটির ও হস্তশিল্প বেকারত্বের মুখে গরিবমানুষের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করতো। অবশিল্পায়ন মানুষের এই ভরসার জায়গাটা ধ্বংস করে।

সমালোচকদের চোখে অবশিল্পায়ন ঃ

অনেকেই ভারতের অবশিল্পায়ন তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। এঁদের মতে, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের মুখে সনাতনী প্রযুক্তিতে গড়ে ওঠা হস্ত ও কুটির শিল্প ধ্বংস হওয়াটা একটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌দের অনেকের মতে ব্রিটিশরা ভারতে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে অবশিল্পায়নের ক্ষতি পুষিয়ে যায় বলে দাবী বলা হয়। যেমন মরিস্ ডেভিড মরিস্ বলেন যে, বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয় এবং একই সঙ্গে জনসংখ্যা বাড়লে যে বাড়তি বাজার সৃষ্টি হয় তা বিদেশি এবং দেশি উভয় শিল্পকেই সমর্থন দিতে পারে। তিনি আরও দেখান যে ভারতে সুতো আমদানিতে সুতো কাটার শিল্প মার খায়। কিন্তু সস্তা সুতো ব্যবহার করে দেশি কাপড় শিল্প সমৃদ্ধির সুযোগ পায়। ড্যানিয়েল থর্নার বলেন যে, ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে অবশিল্পায়নের কিছু প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে তা আর দেখা যায় না। তৃতীয় এক গোষ্ঠী বলেন যে, ভারতে অবশিল্পায়ন ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ বৃহদায়তন শিল্প যে খরচের সুবিধা ভোগ করতো, কুটির-হস্তশিল্প তা করতো না। সুতরাং ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব ভারতে পড়লে গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের এই ধারাকে অস্বীকার করা যায় না। ধ্রুপদী অর্থনীতির অনুগামী রিচার্ড করডন, জন ব্রাইট প্রমুখ ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা মনে করি যে স্বাধীন দেশে সেটা প্রগতির ফল বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ অবশিল্পায়ন ভারতে বৃটিশ স্বার্থসিদ্ধ করে। ভারতের মানুষের যে শিল্পমানস এবং শ্রমিকের যে দক্ষতা তা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয় অবশিল্পায়ন। ভারতে অবশিল্পায়ন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়, এ হল বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা ঘটনা।

৭.৩.৫.৪ : ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলপথ, চট, পাট, চা, কাপড় এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্প আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প হিসাবে বিকাশ লাভ করে। এর মধ্যে কয়েকটির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা চলে।

৭.৩.৫.৪.১ : পাট শিল্প

ভারতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে হস্তচালিত শিল্প হিসাবে পাটশিল্প চালু ছিল। আধুনিক পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে রিষড়ায় ইংরেজ উদ্যোক্তা জর্জ অকল্যান্ডের উদ্যোগে। ইতিমধ্যে স্কটল্যান্ডের ডান্ডি শহরে ১৮৩৮ সাল নাগাদ পাট শিল্পের অভিষেক ঘটে। ভারতেও পাট শিল্প বিকাশে উদ্যোগ নেয় স্কটল্যান্ডের শিল্পপতিরা।

১৮৫৫ সালে প্রথম চালু হলেও বাষ্পশক্তির সাহায্যে পাটবোনার শিল্প ১৮৫৯ সালে কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে মাত্র পাঁচটি পাটকল স্থাপিত হয়। ১৮৭০ সালের আন্তর্জাতিক বাজারে পাটিজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব বেড়ে যাওয়ায় ভারতে পাট শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। ১৮৭৩ সালে পাটকলে তাঁতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২৫০। ১৯০০ সালে এর সংখ্যা বেড়ে হয় ১৫০০০ এর বেশি। ১৯০০ থেকে ১৯০৩ এর মধ্যে এর সংখ্যা ১৩৫ শতাংশ বাড়ে। ভারতে কাঁচামাল প্রচুর থাকায় এবং শ্রম সস্তা হওয়ায় বিদেশের বাজারে ভারতে পাটশিল্প ডান্ডি থেকে এগিয়ে যায়। ১৮৮০ সালে ভারত ২১.৩১ মিলিয়ন মূল্যের পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে। ১৮৮৯ সালে এই মূল্য বেড়ে হয় ২৫.৭১ মিলিয়ন টাকা। ভারতের পাটশিল্পে ১৮৭৯-৮০ সালে নিয়োজিত ছিল ২৬.৮২৬। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ২,৯৮,৯৬৭। কার্যত ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রথমে রেল, পাট ও চা ও পরে লৌহ-ইস্পাত কারখানায়।

৭.৩.৫.৪.২ : রেল শিল্প

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলশিল্পের নেহাৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা বলে ভাবলে ভুল হবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ইতিহাসে রেলশিল্পের পত্তন হল সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণতা। কার্যত রেল শিল্পের মাধ্যমে

একদিকে ভারতের বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সাফল্য অর্জন করে, অপরদিকে ভারত থেকে বৃটেনে সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্য রপ্তানির পথ সুগম হয়। ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে নির্গমনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পুরণে রেল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া ভারতে সামরিক বাহিনীর গতিশীলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজদের শাসনব্যবস্থাকে আরও নিপুণ করে তোলে রেল ব্যবস্থা।

রেলশিল্প বিদেশী উদ্যোগে ভারতে স্থাপিত হয়। এর জন্য যে বিপুল ঋণ গ্রহণ করতে হয় তার ওপর ন্যুনতম সুদ ধার্য করা হয়। এটি ভারতবাসিকে শোধ দিতে হত। মনে রাখা দরকার যে ভারতে রেলশিল্প একটি শিল্পহিসাবে সামগ্রিকতায় ভারতে আসেনি। কেবল লাইন পাতার কাজটাই হয়েছে ভারতে। লাইন, ইঞ্জিন, বগি সবই আমদানি হয়েছে ভারতে। তাই এর বিস্তৃত প্রভাব ভারতে দেখা যায়নি, তা চালান হয়েছে বৃটেনে। ১৮৫৩ সাল নাগাদ ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয়। ১৮৫৪-১৮৬০ সালের মধ্যে ১২টি রেলকোম্পানি গড়ে ওঠে। ভারতে রেল শিল্পে বেসরকারী উদ্যোগের সঙ্গে তৎকালীন ভারত সরকারও উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৭.৩.৫.৪.৩ : বস্ত্র শিল্প

ভারতে বস্ত্রশিল্পের আবির্ভাবকে দেশীয় উদ্যোগে সর্বপ্রথম আধুনিক শিল্পের প্রবর্তন বলে মনে করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও তা সবসময় হয় না। তাছাড়া ঔপনিবেশিক দেশে পুঁজির প্রবাহ অবাধ হয় না। সেখানে দেশি পুঁজি জায়গা খোঁজে। তাছাড়া বিদেশি শিল্পগোষ্ঠীদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে। এর সঙ্গে স্থানীয় ও ভৌগোলিক কিছু উপাদান যুক্ত হয়ে কোন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে যা দেশীয় পুঁজি প্রবেশকে সাহায্য করে। এই সব কিছু সুযোগ পেয়ে ভারতে সুতিশিল্প উনবিংশ শতাব্দী শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। ভারত স্বাধীন থাকলে এই শিল্পের সংযোগ প্রভাব আরও তীব্র হতে পারত। রেল ও সুতিশিল্প শিল্পায়নে নেতৃত্ব দিতে পারলে ভারতের শিল্পায়ন সম্পূর্ণতা লাভ করত। ভারতকে আর কৃষিনির্ভর পশ্চাদপদ দেশ হিসাবে থাকতে হত না।

পার্সি ব্যবসায়ী কওয়াসজী নানাভাই দাভার নেতৃত্বে ভারতে ১৮৫১ সালে অধুনা মুম্বাই শহরে সূতিবস্ত্র শিল্পের সার্থক রূপায়ণ ঘটে। অনেকে একে দেশের বাণিজ্য পুঁজি থেকে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরের ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন। বস্ত্রশিল্পের বিকাশকে ভারতের অর্থনৈতিক জগতে শিল্পপুঁজিতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ বলে চিহ্নিত করা হয়। অনেকের মতে একে পুরোপুরি দেশীয় পুঁজির সাফল্য বলতে পারি না কারণ শিল্পের বিকাশের জন্য যে প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি দরকার তা আনা হয়েছিল বৃটেন থেকে। বৃটেনের বস্ত্রশিল্পের মালিকরা এই শিল্পের বিকাশে আপত্তি করেনি যদিও কাপড় শিল্পের পক্ষ থেকে একে সুনজরে দেখেনি। তাছাড়া পার্সি সম্প্রদায়ভুক্ত নানাভাই দাভার বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ ঘটে ইংরেজদের প্রভুত্ব ব্যবসা থেকে এবং ম্যানেজিং এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে নানাভাই-এর প্রচেষ্টায় দুজন ইংরেজও অংশগ্রহণ করেছিল।

১৮৫৪ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বস্ত্রশিল্প খুব মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। ১৮৭৫ সাল অবধি মাত্র ৪৮টি সুতিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মুম্বাইতে। ১৮৮২ সালে ভারতে সুতিকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২।

৭.৩.৫.৪.৪ : চা শিল্প

বৃটিশ উদ্যোগ ও পুঁজির সাহায্যে ভারতে যে কটি শিল্প গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে চা বাগিচা শিল্প অন্যতম। ১৮৩৩ সালে চার্টার আইন বৃটিশ পুঁজিপতিদের জমির মালিকানা অধিকার পেতে সাহায্য করে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৃটেনে চা এর চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া বৃটেনের পুঁজিপতিরাও চিনের সঙ্গে ভারতকে চিনি সরবরাহকারী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছিল। বৃটিশ পুঁজিতে এই শিল্প গড়ে উঠলে তার থেকে প্রচুর লাভের সুযোগ থাকায় ভারতে ইংরেজদের উদ্যোগে যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চা বাগিচা শিল্প গড়ে ওঠে। চা উৎপাদনে সুদক্ষ ইউরোপিয় দক্ষ পরিচালকদের নিয়োগ করা হয়। ভারতে সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে সস্তায় চা শিল্প গড়ে ওঠে। চা প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। দক্ষিণে নীলগিরি পাহাড় অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গে ডুয়ার্স ও দার্জিলিং এবং আসামে চা বাগিচা শিল্প গড়ে ওঠে।

১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৯৮১-৯২ সালের মধ্যে ভারত থেকে বৃটেনে চায়ের রপ্তানির পরিমাণ ২৪.২৮৭.৪৮৮ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয় ১১১,১৬৮,৮৯৫ পাউন্ড। ১৮৮৬-৯০ এর মধ্যে বছরে গড়ে ৩২২,৭০০ একর জমিতে চা-এর আবাদ হত। স্বাধীনোত্তর ভারতের চা ছিল এক অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। চা-বাগিচা শিল্প কর্মসংস্থানের একটা অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। উল্লেখযোগ্য যে ৩০-এর দশক থেকেই পাট-এর সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগিচা শিল্পের মালিকানাও ইউরোপিয়দের হাত থেকে ভারতীয়দের হতে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

৭.৩.৫.৪.৫ : চিনি শিল্প

প্রাচীনকাল থেকেই দেশীয় প্রযুক্তিতে আখ থেকে চিনি উৎপাদনের রীতি চালু ছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াকরণের এই পদ্ধতির সাহায্যে ততটা বিশুদ্ধ ও মসৃণ চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হত না। আধুনিক কারখানায় চিনি উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজন হয় আধুনিক চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠার। ইউরোপের উন্নত প্রযুক্তিতে চিনি কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বড় মাপের উদ্যোগ ও বেশি পরিমাণ মূলধনের দরকার হয়। এশিয়া জুড়ে চিনির চাহিদা খুব বেশি থাকায় ভারতে চিনি উৎপাদন লাভজনক বলে বিবেচিত হত। তাছাড়া চিনির কাঁচামাল আখ উৎপাদন ভারত ছিল অগ্রহণী। কিন্তু ভারতে সাবেকি প্রযুক্তিতে চিনি উৎপাদনে খরচ বেশি হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হত না। অথচ উপযুক্ত উদ্যোগ ও বড় মাপের পুঁজির অভাবে ভারত প্রয়োজনীয় সংখ্যায় আধুনিক চিনি কারখানা গড়ে তুলতে পারেনি। সেইজন্যই ভারত ১৮৬৩ সালে চিনি বড় আমদানিকারী দেশ ছিল। মরিসাসে বৃটিশ শিল্পপতিদের মালিকানায় আধুনিক চিনি শিল্প গড়ে উঠেছিল। সেখান থেকেই ভারতে বিট চিনির যোগান আসত। এই আমদানিতে মরিসাসে বৃটিশ মালিকরা শুল্কের সুবিধা পেত। জার্মান ও অস্ট্রেলিয়া থেকে চিনি রপ্তানি কমাবার জন্য তাদের চিনি ভারতে রপ্তানির ওপর বেশি হারে শুল্ক ধার্য করা হয় ১৯০২ সালে। অর্থাৎ ১৮৭০ দশকে যে অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু ছিল তা আর অবাধ থাকে না। সংরক্ষণের দরকার হয় মরিসাসে বৃটিশ প্রভুদের স্বার্থে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রাসেলে ১৯০১-০২ সালে আন্তর্জাতিক চিনি সম্মেলনের চাপে ভারত সরকার চিনির ওপর শুল্ক প্রাচীর তুলে নেয় ১৯০৪ সালে। জাভা ভারতের চিনির বাজার দখল করে। ১৯৩১ সালে আবার প্রায় ২৫ শতাংশ হারে চিনির ওপর সারচার্জ বসালে ভারতে চিনির আমদানি কমে যায়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরিবেশে বৃটেন পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই সময়কাল থেকে ভারতে চিনি শিল্প বেড়ে ওঠে। চিনি উৎপাদনে ভারত আত্মনির্ভর হয়। ভারত থেকে চিনি রপ্তানি সম্ভব হয়ে ওঠে।

৭.৩.৫.৪.৬ : লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

অর্থনীতির ইতিহাসে দেখা যায় শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতে যেখানে খুব দ্রুত হারে রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটে সেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ শিল্পায়নে জোয়ার আনতে পারত। কিন্তু ভারতে তা ঘটেনি কারণ সময়মত এই শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ জড়িত না থাকায় তৎকালীন বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

প্রাথমিক পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে লোহা ঢালাই শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা ব্যহত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী জোসেয়া মার্শাল হিথ্ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও সে প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি। হিথ্ এর মৃত্যুর পর ইস্ট ইন্ডিয়া আয়রন কোম্পানি মার্শাল হিথ্‌এর প্রস্তাবিত প্রোটোনভ আয়রন ওয়ার্কস নামে কোম্পানিটি ১৮৫৩ সালে অধিগ্রহণ করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কার্যতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আধুনিক শিল্প হিসাবে আবির্ভূত হয় ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পার্সী সম্প্রদায়ভুক্ত স্যার জামশেদজী টাটা। দক্ষিণ বিহারে তৎকালীন সাক্‌চি শহরে (অধুনা জামশেদপুর) এর অভিষেক ঘটে ১৯৮ সালে। জামশেদপুরই আজ ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পীঠস্থান বলে পরিচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল কাঁচা লোহা উৎপাদন করলেও ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম হতে বেশি সময় লাগে না। ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে এই কোম্পানি রেললাইন উৎপাদন করলে রেলশিল্প ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। একেই অর্থনীতিতে সংযোগ প্রভাব বা Linkage effect বলা হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রবর্তন ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভবিষ্যত গড়তে সাহায্য করে।

অমিয় বাগচী, তার 'ভারতে আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন' নামক গ্রন্থে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির উল্লেখ করেন।

৭.৩.৫.৫ : পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

ভারতে বৃটিশ শাসনের অনেক আগে থেকেই বাণিজ্যিক পুঁজির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই দেশীয় বণিকরা পর্তুগীজ বেনিয়াদের অধীনে সমুদ্রপারের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। একশ বছর ধরে ভারতের বাণিজ্যের ওপর কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ বেনিয়া ও ভারতের বণিকদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ফ্রান্স, ডাচ ও ইংরেজদের সঙ্গে এবং তাদের অধীনে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবসা করে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিপত্য স্থাপিত হলে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেশের অভ্যন্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্যে সাহায্য করতে আরম্ভ করে। বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোপুরি ইংরেজদের হাতে যায়। এই সময়কাল ধরে ভারতে বাণিজ্য পুঁজি গড়ে ওঠে।

বাণিজ্য পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটলেও পুঁজিবাদীদের স্বাধীন উদ্যোগে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। ১৮৫০ সালের পর বৃটিশ পুঁজির উদ্যোগে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজশক্তি কখনও ভারতকে শিল্পোন্নত অর্থনীতি হিসাবে দেখতে চায়নি। ভারতকে নিজেদের স্বার্থেই কৃষি অর্থনীতি হিসাবে রেখে দিতে চায়। এরই মধ্যে তাদের উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত শিল্পোন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দেশীয়

পুঁজিপতিরা এতে অংশগ্রহণ করলেও তারা কখনও নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে না। সম্পদ নির্গমন, অবাধ অর্থনীতি, সরকারের শিল্পনীতি এবং সর্বোপরি বিনিয়োগের এবং তার সঙ্গে শিল্পায়নের গতি ও অভিমুখ, বিচার করলেই আমরা ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে পারি।

পশ্চিমী দেশের মতো ভারতে অর্থনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে আধুনিক শিল্পের পত্তন ঘটেনি। সাধারণত তিনটি স্তর ধরে শিল্প পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। ক্ষুদে পণ্য উৎপাদনের স্তর, পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনের স্তর এবং কারখানা ভিত্তিক উৎপাদনের স্তর। অনেকেই মনে করেন যে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারত অনেকটা স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষুদে পণ্য উৎপাদনের স্তর থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন স্তরে পৌঁছলেও ঔপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়া ভারতকে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় আধুনিক কারখানা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে দেয়নি। অবশিল্পায়ন ও তার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের নির্গমন স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বিপথগামী করে। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় দেশি স্বাধীনচেতা শিল্পোদ্যোগের বিকাশ বজায় থাকতে পারেনি। অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় শিল্পজগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য বিদেশি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। বিদেশি উদ্যোগের সঙ্গে দেশীয় যে নির্ভরশীল পুঁজি যুক্ত তাকে অনেকে পরগাছা পুঁজি বা মুৎসুদ্দি পুঁজি বলেন। শাসকদেশের মহানগরী (Metropolis) থেকে ভারতের শহরে কারখানা শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অর্থনীতির বিবর্তন প্রক্রিয়া নয়। বুকাননের মত অর্থনীতিবিদ্‌রা একে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া (imparation rather than evolution) বলেন। বিদেশের কারখানার শিকড় এখানে প্রতিস্থাপন করা হয়। যেমন রেললাইন পাতা হয় কিন্তু রেললাইন, ইঞ্জিন, রেলবগি, কলকব্জার মত শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বৃটেন থেকে আসে। অর্থাৎ শিল্প হিসেবে নয় বরং সেবা বিভাগ হিসাবে রেলশিল্প গড়ে ওঠে। পুঁজির সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকেও বৃটিশ অর্থনীতির উপাঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এর ফলে কোন শিল্প সম্প্রসারণের বিস্তৃত প্রভাব বিদেশে চলন হয়। রেলশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্প তেমন গড়ে উঠতে পারে না। মনে করা যেতে পারে যে, ভারতে ইতিমধ্যে দীর্ঘ তিনশত বছর ধরে যে মুৎসুদ্দি পুঁজি গড়ে উঠেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্যে যারা নিজেদের ভাগ্য তৈরি করেছে তাদের সঙ্গে বৃটিশ পুঁজির সংবন্ধনের সাহায্যেই ভারতের শিল্পায়নের সূত্রপাত হয়। ভারতে স্বাধীন পুঁজিপতি যে ছিল না তা নয়। কিন্তু শিল্পায়নে তারা কোন নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফলে নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ঘটে যা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছে। আর দেশি পুঁজির একটা অংশ স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক ছিল এরা। এমনকি কেউ কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। ফার্মেসিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মেসিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, বেঙ্গল ল্যাম্প প্রভৃতি শিল্প দেশীয় পুঁজিপতিদের পুঁজিতে বিকাশলাভ করে। এরা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতো তা দেশীয় প্রযুক্তি ছিল। নিজেদের গবেষণালবদ্ধ পদ্ধতিতে এরা উৎপাদন করত। এই ধরনের পুঁজি বিদেশি পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাধেনি। তবে এদের তেমন প্রতিপত্তি ছিল না। ফরাসি অর্থনীতিবিদ আঁদ্রে গুন্ডের ফ্রাঙ্ক মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে সাম্রাজ্যবাদ যখন সংকটে পড়েছে তখন দেশীয় শিল্প তার সুযোগ নিয়েছে। এটাও সত্য যে বিভিন্ন সময় কোন গাঁটছড়া পুঁজিপতিও এই স্বাধীন পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে লড়াইএ যোগ দিয়েছে। অনেক সময়ই দেশি পুঁজির সঙ্গে সংঘাত সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়েছে। দেশি ও বিদেশি পুঁজির মধ্যে বিভাজন করাটা সম্ভব হলেও স্বাধীন ও পরগাছা পুঁজির মধ্যে বিভাজনটা অনেক সময়ই অস্পষ্ট।

স্বাধীন দেশীয় পুঁজি ও বিদেশি পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্বটা প্রধান হলেও বিদেশি ও মুৎসুদ্দি পুঁজির মধ্যে ঐক্যটাই ছিল প্রধান। অনেকে বিদেশি পুঁজি এবং দেশি পুঁজির মধ্যে বিভাজনটাকে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভাজনের কারণ বলে মনে করেন। এদের মতে বিদেশি পুঁজির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সংগঠিত আধুনিক শিল্প আর দেশি পুঁজি গড়ে তোলে অসংগঠিত শিল্প। কিন্তু এই বিভাজন ঠিক নয়। অনেক সময়ই দেশি পুঁজি সংগঠিত শিল্পে বিনিয়োজিত হয়। দেশি পুঁজিপতির নেতৃত্বে সংগঠিত শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন ভারতে বস্ত্র শিল্প নেতৃত্ব দিয়েছিল দেশি পুঁজিপতি। বিদেশি উদ্যোগ এই বিভাগে নেয়নি।

রেলপথ, চটশিল্প, পাটশিল্প এবং চা ও বরারের মত বাগিচা শিল্প ভারতে বিদেশি উদ্যোগ ও পুঁজিতে গড়ে ওঠে। তবে পরের দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন দেশীয় পুঁজি এই সব শিল্পে যথেষ্ট বিনিয়োগ করে। বিভিন্ন যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানিতে দেশীয় মালিকানা বৃদ্ধি পায়।

১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা যায়। বৃটেন অর্থনীতি থেকেই এই মন্দার সূচনা হয়। এই সময়কাল থেকে বিভিন্ন দেশে বৃটিশ কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে চটকল, চা, রবার প্রভৃতি শিল্পের মালিকানা বৃটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে আসার প্রবণতা দেখা যায়। এই সব শিল্প থেকে ইংরেজদের পশ্চাদপসারণের দুটি কারণ আছে বলে অনেকে মনে করেন। একটা ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই সময়কালে ভারতে জাতীয়তাবাদের জোয়ার আসে। বিদেশি পুঁজির জায়গায় দেশীয় পুঁজি জায়গা করে নেয়। আরেকটা ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হয় যে এই সময়ে বৃটিশরা বুঝতে পারছিল যে সাবেকি শিল্পের তেমন ভবিষ্যত নেই। তাছাড়া তারা ভারতের ওপর বেশিদিন খবরদারি করতে পারবে না। এই অবস্থায় তারা মালিকানা ছেড়ে দিয়ে ভারত থেকে পুঁজি তুলে নিতে শুরু করে। নতুন ধরনের শিল্পের ওপর বিনিয়োগের ঝোঁক পড়ে। তামাক, বাদামতেল, ঔষধ, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি উঠতি শিল্পে পুঁজির স্থানান্তর ঘটে। এছাড়া পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য বহুজাতিক সংস্থা গড়ে তুলতে শুরু করে। সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কর্তৃত্ব না করে পরোক্ষভাবে পুঁজি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্য দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু হয় যাকে বলে নয়া-সাম্রাজ্যবাদ। স্বাধীনতার আগে থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। মনে করা হয় যে আপাতদৃষ্টিতে যাকে বিদেশি শিল্পের বিরুদ্ধ দেশীয় শিল্পের উত্থান বলে মনে করা হত তা কার্যত এক ধরনের পরোক্ষ কর্তৃত্ব এটা হয় সাম্রাজ্যবাদের নতুন কৌশলে। একে ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের জয় বলা যায় না।

কোন দেশে বিদেশি পুঁজির কর্তৃত্ব শুধু বিদেশি পুঁজির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। নেহাৎ পরিমাণগত বিষয় হলে বলা চলে না যে ভারতে বিদেশি পুঁজির কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছিল কারণ পরিসংখ্যান বলে যে ভারতে আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় বিদেশি পুঁজির পরিমাণ ছিল কম। অমিয় বাগচীর মত অর্থনীতিবিদরা দেখান যে অর্থনীতির গঠন ও কাঠামোই ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশি পুঁজির প্রাধান্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে ইংরেজ ব্যবসায়ী কম দামে কাঁচামাল কেনে। শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে ব্যবসাকে নিজেদের কুক্ষিগত রাখে। বণিক সমিতিগুলো সামাজিক ভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রাজনীতিবিদ্, ইংরেজ শাসকদের প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করে। বেতন কমিয়ে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, পণ্যের দাম বাড়িয়ে ব্যবসাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে

রাখে। ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রণে রেখে চা, কয়লা, পাট প্রভৃতি শিল্পে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন কয়েকটা এজেন্সি বিভিন্ন শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখত। চা শিল্পে ৬১ শতাংশ, কয়লার ৪৬ শতাংশ এবং পাটশিল্পে ৫৫ শতাংশ কোম্পানিকে এরা নিয়ন্ত্রণ করত। বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্প সুদে লগ্নির সুবিধা দেওয়া হত। বহির্বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকত জাহাজ কোম্পানিগুলোয় একচেটিয়া ইংরেজদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উল্লেখযোগ্যা যে পূর্ব ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ বেশি বজায় ছিল। পশ্চিম ভারতে বিদেশি পুঁজি এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করত না। তাদের স্বার্থী মুৎসুদ্দি পুঁজিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের এই একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ বেশি বজায় ছিল। উল্লেখযোগ্য যে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ভারতে বিদেশিদের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে বোঝাপড়া এবং অন্যদিকে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সওদাগরশ্রেণী বেড়ে উঠেছে। বিদেশি পুঁজির উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত যে শিল্পায়ন ঘটে তাতে অংশগ্রহণের মধ্যে দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্য পুঁজি শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। ভারতে পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের ভূমিকা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের অর্থনীতিতে এঁরাই হয়ে দাঁড়ায় গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৩.৫.৬ : ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রেলপথ স্থাপনের সাথে সাথে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক কারখানা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। ইতিমধ্যে ভারতে হস্ত ও কুটির শিল্পের ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আধুনিক কারখানা শিল্পে মালিক শ্রমিকের মধ্যে যে পুঁজিবাদী সম্পর্ক দেখা দেয় সেখানে শ্রমিকরা শ্রম সময় বিক্রি করে তাদের জীবিকা অর্জন করে। পুঁজিবাদের নিয়মে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শ্রমিকশ্রেণীরা উদ্ভব ঘটে। এই শ্রমিকরা শুধু যে মালিকানাহীন এক সর্বস্বান্ত শ্রেণী তা-ই নয়, তারা তাদেরই উৎপাদিত পণ্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই শ্রমিক শ্রেণীকেই কার্ল মার্কস সর্বহারা শ্রেণী বলে আখ্যা দেন। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ জুড়ে শিল্পবিপ্লবের সময়কালে আধুনিক কারখানা শিল্পের আবির্ভাব ঘটে। এর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবহয়। একই সঙ্গে সমাজের সর্বক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জগতে যে মৌলিক পরিবর্তন আসে তা শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবকে এক নতুন মাত্রা দেয়। শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে নয় গুণগত দিক দিয়েও শ্রমিক মালিক সম্পর্কে এক মৌল পরিবর্তন ঘটে। উভয়ের মধ্যে যে বিমুর্ত্ত মালিকানা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা সমাজকে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীতে ভাগ করে দেয়। কিন্তু ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে নিয়ন্ত্রিত যে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে তা শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটালেও সংখ্যা ও গুণগত দিক দিয়ে সমাজকে শ্রমিক শ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত করতে পারেনি। আমরা দেখি যে কৃষি ও শিল্পবিভাগের মধ্যে কৃষির প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। সামন্তবাদের পশ্চাৎপদ সংস্কৃতি শ্রমজীবী মানুষকেও আচ্ছন্ন করে রাখে। অর্থনীতিতে কাঠামোগত এক অচলায়তন অবস্থাকে বৃহদায়তন শিল্পের বিচ্ছিন্ন এবং নিয়ন্ত্রিত বিকাশ অটুট রাখতে সাহায্য করে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তার ওপর আলোকপাত করব।

দ্রুতহারে রেলপথে বিকাশসত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। রেলের ওপর বিনিয়োগ সবথেকে বেশি হলেও রেলে সেই অনুপাতে নিয়োগ ঘটতে পারেনি। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ জে. এম. হার্ড The Cambridge Economic History of India, Vol-II গ্রন্থে স্বীকার করেন যে ভারতে রেল শিল্প অর্থনীতিতে সংযোগ প্রভাব বা বিস্তৃতি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি কারণ ইঞ্জিন থেকে আরম্ভ করে যন্ত্রপাতিসহ বগি পর্যন্ত আমদানি করা হত বৃটেন থেকে। শুধু রেললাইন পাতার জন্য অদক্ষ শ্রমিকের ব্যবহার হত। কিছু সারাই করার কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৮ সাল নাগাদ ১১ লক্ষ শ্রমিক এই ওয়ার্কশপগুলিতে নিযুক্ত হয়। ড্রাইভার ও গার্ড হিসেবেও কিছু শ্রমিকের নিয়োগ ঘটে। পরবর্তীকালে এই রেলশিল্পে সবচেয়ে সংহত ও শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে দেখা যায় এই বিভাগে পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সংহতি লাভ করে।

রেল ছাড়াও বস্ত্রশিল্প, চটকল, কয়লাখনি এবং বাগিচা শিল্পে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। নিচের সারণিতে দেখানো হল বিভিন্ন শিল্পে ১৯০০-১৯০১ সাল থেকে ১৯৪৬-৪৭-এর মধ্যে কিভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে।

ভারতে বিভিন্ন পণ্যশিল্পে নিয়োগের হার (শতকরা)

১৯০০-০১ থেকে ১৯৪৬-৪৭

সময়	সুতিশিল্প (১)	পাট শিল্প (২)	কাগজ (৩)	সিমেন্ট (৪)	পশম (৫)	লৌহ ও স্টীল (৬)	দেশলাই (৭)	মোট (১-৭) (৮)	অন্যান্য পণ্যশিল্প (৯)	মোট পণ্যশিল্প (১০)	মোট পণ্যশিল্প (হাজারে) (১১)
১৯০০-০১	৩২.১	২০.৬	০.৯	—	০.৫	—	—	৫৪.১	৪৫.৯	১০০	৫৩৯
১৯১৩-১৪	২৮.৩	২৩.৫	০.৫	—	০.৪	০.৯	—	৫৩.৬	৪৬.৪	১০০	৯১৮
১৯১৮-১৯	২৬.৬	২৫.১	০.৫	০.২	০.৪	১.৫	—	৫৪.৩	৪৫.৭	১০০	১,১০১
১৯২৩-২৪	২৬.৪	২৪.৪	০.৪	০.৪	০.৭	১.৬	—	৫৩.৯	৪৬.১	১০০	১,৩৫০
১৯২৮-২৯	২৩.৮	২৩.৬	০.৪	০.৫	০.৬	১.৩	১.১	৫১.৩	৪৮.৭	১০০	১,৪৫৭
১৯৩৩-৩৪	২৮.৩	১৮.৯	০.৫	০.৫	০.৬	১.২	১.৩	৫১.৩	৪৮.৭	১০০	১,৩৬০
১৯৩৮-৩৯	২৩.৪	১৫.৯	০.৫	০.৭	০.৬	১.১	০.৯	৪৩.৫	৫৬.৫	১০০	১,৮৫৪
১৯৪৬-৪৭	১৮.৪	১১.৪	০.৪	১.০	০.৭	০.৪	০.৭	৩৪.২	৬৫.৪	১০০	২,৬৫৪

উৎস ঃ কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিষ্ট্রি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৩

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় যে আলোচিত পঞ্চাশ বছরে বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিক সংখ্যার আনুপাতিক হার তেমনি বাড়েনি। তবে মোট শ্রমিক সংখ্যা নেহাত কম নয় বলে মরিস্ ডি মরিস্ তাঁর 'The growth of Large Scale Industry to 1947' নামক লেখায় মনে করেন। তিনি ইউরোপীয় দেশের সাথে তুলনা করে এই মন্তব্য করেন। তাছাড়া কয়েকটি প্রদেশে কারখানা শ্রমিক নিয়োগ কেন্দ্রীভূত বলে দেখা যায়। ওপরের সারণি ধরে আরও বলা যায় যে বস্ত্র ও পাটশিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ পুরনো শিল্পগুলিতে শ্রমিক নিয়োগের হার সাম্রাজ্যবাদ

শাসনের শেষের দিকে কমতে থাকে। নতুন শিল্পগুলি এই শিল্পগুলির মতো শ্রমিক নিয়োগে সক্ষম ছিল না। মোট কারখানা শিল্পে নিয়োগের শতাংশ হিসাবে সারণিতে তালিকাভুক্ত সাতটি শিল্পে নিয়োগের অনুপাত শেষের দিকে কমে বলে দেখা যায়।

আমরা এই সময়কালে মোট-শ্রমিকের অংশ হিসাবে মহিলা ও শিশু শ্রমিকের বিষয়টি উত্থাপিত করতে পারি। দেখা যায় কারখানা শিল্পে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মহিলা ও শিশু শ্রমের অনুপাত কম। নিচের সারণিতে সেটা দেখা যায়।

কারখানা শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের দৈনিক শ্রমিকের অনুপাত (১৮৯২-১৯৪৬ সাল)

সময়	পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
১৮৯২	৮০.২	১৩.৮	৬.০	১০০
১৯১৩	৭৮.৭	১৫.৩	৬.০	১০০
১৯২৮	৮০.০	১৬.৬	৩.৪	১০০
১৯৩৯	৮৫.৬	১৩.৯	০.৫	১০০
১৯৪৬	৮৭.৮	১১.৮	০.৪	১০০

উৎস ঃ কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিষ্ট্রি পৃঃ ৬৪৫

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় যে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মহিলা শ্রমিকের অনুপাত সামান্য হারে হলেও বাড়ে। ১৯২৮ সালের পর তা কমতে থাকে। শিশু শ্রমের নিয়োগের শতকরা হার কমতে থাকে। সামগ্রিক হিসাবে দেখা যায় যে ছবিটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমন বদলায়নি।

সনাতনী অর্থনীতিতে শিল্পায়নকে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সমার্থক বলে বিবেচনা করা হত। পশ্চিমী দেশেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকশোষণের যে নগ্ন চেহারাটা দেখা যেত তা ঔপনিবেশিক ভারতে আরও বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হয়। পুরুষ, মহিলা, শিশু সবধরনের শ্রমজীবী মানুষই অভাবনীয় এক নিষ্ঠুর শোষণের শিকার ছিল। শ্রমিকদের দিনে ১৫ থেকে ১৬ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ করতে হত। কাজের মধ্যে বিরতি থাকার কোন প্রথা ছিল না। ১৮৮৫ সালের শ্রম কমিশন মন্তব্য করেন যে ভারতের কারখানায় সারাবছরে গড়ে ১৫ দিনের ছুটি পাওয়া যেত। ইংল্যান্ডে সেই সময় শ্রমিকরা শনি রবিবার মিলে সারা বছরে ৮৮ দিন ছুটি পেত। ১৮৯১ সালের কারখানা আইনে ৭-১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৯ ঘন্টা শ্রম সময় ঠিক হয়। মহিলাদের জন্য ১১ ঘন্টা বেধে দেওয়া হয় কিন্তু এই আইনও কারখানাগুলোতে মানা হত না।

রেল শিল্প, চা বাগিচা বা পাটশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা যে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে কাজ করত তা পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবীদেরও পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক সংঘ গঠন এবং তাদের আন্দোলন সাধারণ

মানুষের সহানুভূতি পেতে থাকে। সারা ভারতে শ্রমিকশ্রেণী একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বর্ণিত বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশার সঙ্গে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশার মিল তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে ভারতে পশ্চিমী ধরনের শিল্পপুঁজির বিকাশ ঘটলে, ''দেশি বা বিদেশি যে পুঁজিপতিশ্রেণীনীতির উদ্ভব ঘটবে যাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বুদ্ধিতে শ্রমজীবী জনসাধারণের সাচ্ছন্দ সম্ভব নয়।'' শ্রমজীবী মানুষ এক পশুর জীবন যাপন করবে যারা হয়ে দাঁড়াবে, ''আত্মসম্মান খোয়ানো, মালিকদের দ্বারা তাড়িত, অসহায় মানুষ যন্ত্রে।''

আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অসংগঠিত বিভাগে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের কথা বলে নেওয়া দরকার। উল্লেখযোগ্য যে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের নিয়ন্ত্রিত বিকাশ ঘটে। কিন্তু অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন তেমনি হয়নি। কৃষি থেকে শিল্পে স্থানান্তরের পশ্চিমী ধারণা ভারতে ধরা পড়ে না। এই অবস্থায় কৃষি বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে ব্যাপক শ্রমের স্থানান্তর ঘটে না। বরং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে যে গ্রামীণীকরণ বা অবনগরীকরণ ঘটে তাতে শহরে নিযুক্ত হস্তশিল্পে নিয়োগ হারিয়ে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামমুখী হয়। কৃষিতে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। শহরে আধুনিক শিল্পের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মত কিছু সহশিল্প গড়ে ওঠে। এই সহশিল্পগুলি ছিল অসংগঠিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। যেমন—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গানদীর পশ্চিম ধারে হাওড়া জেলার বা কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে।

আমরা অসংগঠিত বিভাগ বলতে কৃষি, সাবেকি হস্ত কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বুঝি। এই ধরনের উৎপাদন সংগঠন ব্যক্তি মালিকানায় সীমিত পুঁজিতে গড়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্যোগ দেখা যায়। এই বিভাগ আধুনিক যৌথমূলধনী কারবারের মত সংগঠিত নয় বলে এদের অসংগঠিত শিল্প বলা হয়। গ্রামে কুটির শিল্পগুলো ছিল কৃষির পরিপূরক। অনেকক্ষেত্রে পরিবারের শ্রমেই এগুলো পরিচালিত হত। কৃষিতে মৌসুমী রেখাবৃত্তের সময় এই শিল্প মানুষের জীবিকায় সাহায্য করত। বৃটিশ আমলে কুটির ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার ওপর বিশ্বাসযোগ্য তেমন পরিসংখ্যা পাওয়া যায় না। তবে অবশিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর মত শহরগুলোতে যেভাবে জনসংখ্যা কমেছে তা ধরে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। শহরে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা যেমন কমেছে গ্রামে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা তেমনই বেড়েছে। একে অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণীকরণ বা অবনগরায়নের ফল বলা যায়। তৎকালীন উত্তর প্রদেশের এগুলো ছিল মৌসুমী বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৮৬৯ সালে লক্ষ্ণৌতে মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৮৪,৭৭৯ জন। ১৯১১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২,৫৯,৭৯৮ জন। মনে করা হয় যে, ১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই শহরটি ইংরেজ রাজতন্ত্রের অধীনে নিয়ে আসার পর অবনগরায়ন আরও বেশি হারে শুরু হয়। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষ গ্রামে আশ্রয় পায়। আমরা ধরে নিতে পারি যে শহরে বিকল্প নিয়োগের সুযোগ না থাকায় গ্রামে এই শ্রমজীবী মানুষ ঐ জীবিকার জন্য আশ্রয় খোঁজে। উনা, রায়বেরিলি, শহরগুলোকেও একই দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। একই সঙ্গে দেখা যায় কলকাতা ও হাওড়ার জনসংখ্যার স্ফীতি ঘটে। এই সময়কালে রেল ও অন্যান্য শিল্পে নিয়োগের সুযোগ থাকায় শ্রমজীবী মানুষের স্থানান্তর ঘটে এই সব এলাকায়। একই সঙ্গে আধুনিক শিল্পের সহযোগী ক্ষুদ্র শিল্পে গড়ে উঠতে থাকায় এই সব অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়ে।

আমরা আমাদের আলোচনায় আধুনিক শিল্পের প্রবর্তনের সঙ্গে শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের দিকটা যেমন আলোচনা করলাম তেমনি অসংগঠিত শিল্পে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিভাবে শ্রমজীবী মানুষের গঠনে পরিবর্তন এসেছে তার একটা রূপরেখা তুলে ধরলাম। সাধারণ ধরনটা অনুমান করা গেলেও তার পরিসংখ্যানের অভাবে এই পরিবর্তনের ধরনের খুঁটিনাটির বিষয়টি অনেকটাই অধরা রয়ে গেল।

৭.৩.৫.৭ : ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন ও রাষ্ট্র

বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তাত্ত্বিক সমর্থকরা খোলা বাজারের অর্থনীতির দর্শনের ভিত্তিতে অবাধ অর্থনীতি (Laissez Faire) চালু রাখার পক্ষে মত দেন। ঔপনিবেশিক ভারতেও ইংরেজ সরকার অবাধ অর্থনীতির প্রবর্তন করেন যাতে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে পণ্যের লেনদেনে তেমন বাধা না থাকে বিনা শুল্কে বৃটেনে উৎপাদিত পণ্য ভারতে প্রবেশের পথ এবং ভারত থেকে কৃষিপণ্য সে দেশে প্রবেশের পথ অবাধ করে দেওয়ার নীতিই প্রতিফলিত হয় ঔপনিবেশিক ভারতে গৃহীত শিল্পনীতিতে ঔপনিবেশিক ভারতে বৃটিশ অনুসৃত নীতিকে যতটা অবাধ বলা হয় কার্যত তা ততটা অবাধ ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের স্বার্থ যেখানে বজায় থাকত সেখানে বৃটিশ নীতি অবাধ ছিল। কিন্তু যেখানে দরকার সে সেখানে সংরক্ষণের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। রাজস্বের খাতিরে বৃটিশ পণ্যের ওপর শুল্ক বসালে ভারতের দ্রব্যের ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্ক বসানো হয়েছে।

রেলের মত পরিকাঠামো শিল্পে বেসরকারী পুঁজি যথেষ্ট না হওয়ায় সরকার প্রত্যক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৮৬৭ এবং ১৮৬৯ সালে ভাইসরয় লর্ড লরেন্স সরকারের সচিবকে রেল প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের নির্দ্দেশ দেন। ১৮৭০-৭১ সালে রেল পরিবহন শিল্পে সরকারি ঋণ অর্থ ব্যবহৃত হয়। নতুন গ্যারান্টি ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের এক সমন্বয় ঘটে। ভারতের শুল্কনীতি কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা আমরা আলোচনা করতে পারি। বাজেট ঘাটতি মেটাবার জন্য সরকারকে কিভাবে শুল্কনীতি পরিবর্তন করতে হয় তা দেখা যেতে পারে।

রেলপথ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সরকার এক 'বাণিজ্য দশায়' পৌঁছায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়কে বাণিজ্য দশা বলা হয়। অনেকে মনে করেন যে শিল্পায়নের এই পর্যায়ে ভারত আধুনিক যুগে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়। রেলপথের সাথে পাট, চা, রবার প্রভৃতি শিল্পের বিকাশ ঘটে। পরে বয়ন ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আত্মপ্রকাশ করে। যদিও ভাবা হয়েছিল যে রেলশিল্প ভারতে শিল্পায়নের অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। বরং একদিকে অবশিল্পায়ন আর অন্যদিকে সমপদ নির্গমনে সাহায্য করেছে রেলপথ, আর সরকার হয়েছে এর সাথী।

চা শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায়ে সরকার সরাসরি উৎসাহ দেখায়। পরে সরকার তা বিদেশি বেসরকারি উদ্যোক্তার কাছে বিক্রি করে। অর্থাৎ চা শিল্প বিকাশেও বাজার অর্থনীতি তথা অবাধ উদ্যোগের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয়েছিল তা বলা যায় না।

দেখা যায় যে পূর্ব ভারতে রেল, চা বা পাট শিল্পে সরকারি সাহায্য দরকার হয়। কিন্তু বয়নশিল্প বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকাশে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া যায় না। পরের দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলালে

সরকার কিছুটা নমনীয় হতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন সময়ে সরকারের শুল্কনীতি আলোচনা করলে এই সত্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৯৪ সালে সরকারের বাজেটে ৩.৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা যায়। উপায় না থাকায় ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে নতুন শুল্ক আইন চালু হয়। কাপড় ও সুতো ছাড়া সবরকমের আমদানি দ্রব্যের ওপর ৫% হারে শুল্ক বসানো হয়। বৃটেনে কাপড় শিল্পের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। বাধ্য হয়ে সরকার ৫% হারে সুতো বস্ত্র ও সুতোর ওপর আমদানি করা বসায়, কিন্তু বৃটিশ বস্ত্র শিল্প গোষ্ঠীর চাপে ভারতে সুতো ও সুতীবস্ত্রের উপর ৫% হারে শুল্ক বসানো হয়। ইতিহাসে একে সমতুল্য শুল্কনীতি বলে।

বিভিন্ন কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকারকে বৈষম্যমূলক শিল্পনীতির পরিবর্তন করতে হয়। এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যুদ্ধের সময় বৃটিশরা ভারতে পণ্যের যোগান দিতে না পারায় জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাজার দখল করতে চেষ্টা করে। তাদের ঠেকাবার জন্য ভারতের শিল্পপতিদের সুযোগ দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে গণ আন্দোলনের ভয়ে সরকার কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৬ সালে শিল্প কমিশন গঠিত হয়। তারা শিল্প প্রসারের জন্য 'উৎসাহমূলক হস্তক্ষেপ নীতি' গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। ১৯১৮ সালে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টেও ভারতের জন্য একটি সংগতিপূর্ণ শিল্পনীতি অনুসরণ করার কথা বলা হয়। সরকার সংরক্ষণ নীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না।

ভারতে শিল্পোন্নতির জন্য বৃটিশদের কোনো সুষ্ঠ শিল্পনীতি ছিল না। অবাধ বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাস করলেও তারা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে চলত, যা তাদের স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের থেকে একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অপরদিকে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তারা কিছুটা হলেও নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম যে নীতিগত ভাবে অবাধ অর্থনীতির সমর্থক হলেও ভারতে রাষ্ট্রের নীতি ততটা অবাধ ছিল না। সেই পর্যন্তই এই নীতি অবাধ ছিল যতক্ষণ তা বৃটিশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা গেছে। ভারতের বস্ত্র বা চিনি শিল্পের প্রয়োজনে সময়মত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা হয়নি। রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে বা জার্মানের মত প্রতিযোগী দেশকে আটকাবার জন্য কখনও কখনও শুল্ক প্রাচীর তুলেছে। তখন ভারতের কিছুটা সুবিধা হয়েছে ঠিকই কিন্তু বলা চলে না যে ভারতের শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে সরকার কোন ধারাবাহিক নীতি গ্রহণ করেছে।

৭.৩.৫.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রণেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিসার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি

অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিসার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agricultrue at backwardness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Data

(১২) Essays on Commercialisation of Indian Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Erie Stokes, Oxford University Press.

৭.৩.৫.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) অবশিল্পায়ন কাকে বলে? বৃটিশ আমলে অবশিল্পায়নের ফলাফল আলোচনা কর।

(২) বৃটিশ ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

(৩) ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

(৪) শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

INDUSTRY AND POPULATION

Trends in Population and National Income

ঔপনিবেশিক ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও জাতীয় আয়

একক-৬

বিন্যাস ক্রম

৭.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

৭.৩.৬.১ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন

৭.৩.৬.২ : জাতীয় আয় পরিবর্তনের প্রবণতা

৭.৩.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৩.৬.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও জনসংখ্যার গঠন;

২। ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রবণতা ও ধরন;

৭.৩.৬.১ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন

ঔপনিবেশিক ভারতে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও অর্থনীতির হতশ্রী অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু, জনসংখ্যার গঠনকাঠামো প্রভৃতিকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করতেন জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা। আজও কোন অর্থনীতির মান উন্নয়ন সূচক হিসাবে জনসংখ্যায় এই বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরা হয়। একটা ধারণা চালু ছিল যে দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি অর্থনীতির উন্নয়নের সূচক। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু বাড়ে, সমাজে মহিলা-পুরুষের অনুপাত মহিলাদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে, বয়সের গঠন অনুযায়ী মধ্যবয়স্ক কর্মক্ষম মানুষের আপেক্ষিক অনুপাত বেশি হয় তবে বুঝতে হয় দেশটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। ঔপনিবেশিক ভারতে যেখানে সাধারণ মানুষের আয়ের হিসাব, তার খরচের বিবরণ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান তেমন পাওয়া যেত না সেখানে জনসংখ্যা এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তার গঠন প্রণালিকে অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষণ হিসাবে তুলে ধরা হত। আর ভারতে

জনগণনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অন্যান্য পশ্চাদপদ দেশের তুলনায় ভারতে আগের থেকে এবং অনেক বিস্তারিত ভাবে যেখানে পাওয়ার সুবিধা ছিল সেখানে পরিসংখ্যানের উপরোক্ত বিভিন্ন দিকগুলো ধরে উন্নয়ন বা অনুন্নয়নের ঝোঁকটা তুলে ধরা যায়। অন্তত একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে ওঠে যাকে একেবারে আন্দাজি হিসাব বলা চলে না।

ইংরেজরা ভারতের বৃটিশ রাজত্বের যতই গুণগান করুক না কেন, শিল্পায়নের যত চমকপ্রদ ছবিই আঁকুক না কেন দেশের আর্থিক দুরবস্থার কারণে বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি লেগেই থাকত। শিশুমৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি, প্রত্যাশিত বয়সকাল ছিল ২৩ থেকে ২৫ এর মধ্যে, মহিলাদের অনুপাত পুরুষদের থেকে কম, পরনির্ভরতার সূচক ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরে আমরা অর্থনীতির ইতিহাসে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার গঠনকাঠামো পরিবর্তনের গুরুত্ব তুলে ধরব।

নিচের সারণিতে ১৮৬৭ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ঝোঁকটা তুলে ধরা হল ঃ

অবিভক্ত ভারতে জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি

সময়কাল সংখ্যা (কোটি)	সরকারি হিসাবে বৃদ্ধির হার (বার্ষিক)	গড় বাৎসরিক হার (কোটি)	ডেভিসের সংখ্যা বৃদ্ধির হার (বার্ষিক)	সংশোধিত গড় বাৎসরিক
১৮৬৭-৭২	২০.৩৪	—	২৫.৫২	—
১৮৮১	২৫.০২	২.০৭	২৫.৭৪	০.০৯
১৮৯১	২৭.৯৬	১.১১	২৮.২১	০.৯২
১৯০১	২৮.৩৯	০.১৫	২৮.৫৩	০.১১
১৯১১	৩৯.০৩	০.৬৫	৩০.৩০	০.৬০
১৯২১	৩০.৫৭	০.০৯	৩০.৫৭	০.০৯
১৯৩১	৩৩.৮২	১.০১	৩৩.৮২	১.০১
১৯৪১	৩৮.৯০	১.৪০	৩৮.৯০	১.৪০

উৎস : কিসলি ডেভিসের ‘পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান (১৯৫১)

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯২১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম। বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার একের নিচে। সরকারি হিসাবে ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালে বার্ষিক বৃদ্ধির গড় হার একের বেশি হলেও কিংসলি ডেভিসের হিসাবে তা একের থেকে অনেক নিচে। দুটি হিসাবে ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার একের থেকে বেশি বলে দেখা যায়। জনগণনার সরকারি হিসাব থেকে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের

হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৭১-৮১ সালের মধ্যে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ২৪.৬ বছর। পরের লোকগণনার হিসাবে এটা কমে হয় ২৩.৮ বছর। বেসরকারি হিসাবে প্রত্যাশিত আয়ু আরও কম বলে দেখা যায়।

আমরা অঞ্চল ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার পাই তা নিচের সারণি থেকে পেতে পারি

শতাংশ হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার

সময়কাল	পূর্ব	পশ্চিম	মধ্য	উত্তর	দক্ষিণ	সর্বভারতীয়
১৮৬৭/৮২-১৯২১	০.৫২	০.১৪	০.৪৭	০.৪৭	০.১৯	০.৩৭
১৯২১-১৯৪১	১.৩৭	১.৩০	১.২৯	১.২৫	০.৯২	১.২২

উৎস ঃ লীলা বিসারিষা ও প্রবীণ বিসারিয়া, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিষ্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ১৯৮৩

দুটি সময়কালেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম। ১৮৭০ এবং ১৮৯০ সালে এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বা মহামারি দেখা না যাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্য অঞ্চল থেকে বেশি হয়। লক্ষণীয় যে ১৯২১-১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সব অঞ্চলেই বাড়ে। এই সময়কালে যোগাযোগের উন্নতি, টিকা ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে মৃত্যু হার কমে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ে। এছাড়া ১৯০৮ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে ভারতে তেমন বড় দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা যায়নি। ১৯২১ সালের পর স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সরকারি নীতি এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।

আমরা বিভিন্ন সময়ে শিশু, কর্মক্ষম বয়সী এবং বৃদ্ধদের ধরে শতকরা হিসাবে জনসংখ্যার গঠন বিচার করি তবে নিচের সারণিটি পাই। কর্মক্ষম মানুষের বয়সের নীচে এবং ওপরে থাকা মানুষরা কর্মক্ষমদের ওপর নির্ভরশীল। তাই নির্ভরশীলতার মাত্রা বলতে প্রতি ১০০ জন কর্মক্ষম মানুষের ওপর কতজন নির্ভর করে তাকে বোঝায়। অর্থাৎ শতাংশ হিসাবে নির্ভরশীলতায় সূচককে প্রকাশ করা হয় ()। ওপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে ৩-১৪ বছর বয়সী ব্যক্তি ১৮৮১-১৯৪১ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৩৮.৫ শতাংশ। ৬০ বছরের অধিক বৃদ্ধের সংখ্যা ৫.৫ শতাংশের কাছাকাছি। আর ১৫-৫৯ বয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ। শিশু মৃত্যুর হার বেশি হলে তুলনামূলক ভাবে শিশু ও কিশোরের সংখ্যা বেশি হয়। সারণিতে তাই দেখা যাচ্ছে। প্রথম ১৪ বছরের গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩৮.৫ শতাংশ এবং এর ওপরের ৪৫ বছরের গোষ্ঠী সংখ্যা ৫৬ শতাংশ হওয়া মানে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোরের সংখ্যা কর্মক্ষম যুবকদের তুলনা বেশি হওয়া। আর আয়ুষ্কাল খুব কম হওয়ায় বৃদ্ধদের শতকরা অনুপাত কম হওয়াই স্বাভাবিক নির্ভরশীলতার সূচক থেকে এটা সহজেই ধরা পড়ে। নির্ভরশীলতার সূচক ৭৫-৮০ হওয়া মানে খুবই বেশি। উন্নত দেশে বিপরীত চিত্র দেখা যায়। মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু বেশি হওয়ায় উৎপাদনশীল মানুষের সংখ্যা বেশি হয়। পরনির্ভরশীলতার সূচক কম হয়। পরনির্ভরশীলতার উচ্চ সূচক ঔপনিবেশিক দেশের অনুন্নয়নের লক্ষণ।

এবার আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে পুরুষ-মহিলার অনুপাত ধরে দেশের অর্থনীতির অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করব। নিচের সারণিতে এই বিষয়টা তুলে ধরা হল।

পুরুষ-মহিলার অনুপাত

(প্রতি হাজার মহিলাপ্রতি পুরুষের সংখ্যা)

অঞ্চল	১৮৮১	১৯০১	১৯২১	১৯৪১
পূর্ব	৯৯৫	১.০০৫	১.০৩১	১.০৮০
পশ্চিম	১,০৬৭	১.০৫৮	১.০৮৬	১.০৯৮
মধ্য	১,০৪০	১,০১৯	১,০২৯	১,০৩২
উত্তর	১,১৫	১,১০২	১,১৩৫	১,১২৫
দক্ষিণ	৯৯৮	৯৮২	৯৮৫	৯৯৮

উৎস : লীলা বিসারিয়া ও ডি. কুমার, কেম্বিজ ইকনমিক হিষ্ট্রি, Vol-II

সারণি অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে দক্ষিণ ভারতে এবং পূর্বভারতে ১৮৮১ সাল ছাড়া সর্বসময়েই ১০০০ মহিলার প্রতি ১০০০ এর বেশি পুরুষ দেখা যেত ঔপনিবেশিক ভারতে। তাছাড়া সর্বত্রই এই অনুপাত বৃদ্ধির একটা সাধারণ ঝোঁক ধরা পড়ে। উল্লেখযোগ্য যে জৈবিক কারণে পুরুষের জন্মহার থেকে মহিলা জন্মহার বেশি। আর আর্থসামাজিক কারণে ভ্রূণ হত্যা, বা প্রসূতি কালে মৃত্যুর হার পশ্চাদপদ দেশে বেশি থাকে। সুতরাং বলা যায় যে জৈবিক কারণে এই অনুপাত ১ এর কম থাকা উচিত হলে আর্থসামাজিক কারণ অকালে মহিলা মৃত্যুর হার বেশি বলে এই অনুপাত ভারতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ১ এর থেকে বেশি অর্থাৎ প্রতি এক হাজার মহিলা পিছু পুরুষের সংখ্যা একহাজার থেকে বেশি। অনেকে যুক্তি দেখান যে জনগণনায় মহিলাদের সঠিক সংখ্যা ধরা পড়ে না। পর্দানসীন থাকায় সব মহিলাকে গণনার মধ্যে ধরা যায় না। এটা সত্যি বলে ধরে নিলে বলা যায় যে বিংশ শতাব্দীতে যখন পর্দানসীন মহিলার সংখ্যা কমেছে তখন সংখ্যা বৈষম্য কমা উচিত ছিল। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে এই বৈষম্য বেড়েছে সুতরাং এই সমালোচনা টেকে না। সারণি ধরে দেখলাম যে দক্ষিণ ভারতে পুরুষ-মহিলা অনুপাত একের কম। দক্ষিণ ভারতে মহিলাদের সম্পত্তি অধিকার সামাজিক মর্যাদা বেশি বলে এটা শক্তি। আবার উত্তর ভারতে কন্যা হত্যা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল। সেখানকার আর্থসামাজিক কাঠামোর জন্য পুরুষদের অনুপাতে মহিলা সংখ্যা কম। সবশেষে আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে শ্রমশক্তি বন্টনের ধরনটি নিয়ে আলোচনা করব। ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাথমিক বিভাগ, মাধ্যমিক বিভাগ ও সেবা বিভাগে শ্রমশক্তি কিভাবে বন্টিত ছিল তা নিচের সারণিতে ধরা পড়ে।

বিভিন্ন বিভাগে শ্রমশক্তির বন্টন (শতাংশ)

	১৮৮১	১৯১১	১৯৫১
প্রাথমিক	৭২.৪	৭৩.৮	৭৩.২
মাধ্যমিক	১১.২	১০.৬	১০.৯
সেবা	১৬.৪	১৫.৫	১৫.৮

উৎস ঃ জে. কৃষ্ণমূর্তি, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিষ্ট্রি, Vol-II

শ্রমশক্তির উপরোক্ত বন্টনের ধরনটি পশ্চাদপদ দেশে দেখা যায়। একে অনুন্নয়নের ধরন বলা হয়। অর্থাৎ অনুন্নত দেশ কৃষিপ্রধান হয় যেখানে জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ কৃষিজীবী। দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হলে দেখা যায় শিল্প ও সেবাবিভাগে শ্রমশক্তির শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এটা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

আমরা আমাদের আলোচনায় ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ধরন আলোচনা করে এই ধরন বিভিন্ন দিক দিয়ে কিভাবে একটা দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা দেখলাম।

৭.৩.৬.২ : জাতীয় আয় পরিবর্তনের প্রবণতা

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল মাথাপিছু আয়। মাথাপিছু আয় জানতে গেলে জনসংখ্যা সম্পর্কে যেমন সঠিক তথ্য দরকার তেমনি দেশের জাতীয় আয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দরকার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া গেলেও জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব দেখা যায়। এর মধ্যে ইংরেজ চিন্তাবিদ্‌রা ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নের সদর্থক দিকটি যেমন তুলে ধরার চেষ্টা করেন তেমনি দাদাভাই নওরোজির মত জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা ইংরেজ আমলে দেশের এবং দেশবাসীর হতশ্রী অবস্থাটা তুলে ধরার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় ও মাথাপিছু খরচের হিসাব তুলে ধরেন। ১৮৮১ সালে লর্ড ক্রামার একটা সরকারি হিসাব প্রকাশ করেন যাতে বলা হয় যে তখন ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ২৭ টাকা। সংখ্যাতাত্ত্বিক অ্যাটকিসসন্ এর হিসাবে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৯.৫ টাকা দাদাভাই নওরোজি দেখান যে ১৮৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৩৪০ কোটি টাকা আর মাথাপিছু আয় ছিল ২০ টাকা। তবে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগত ত্রুটি বা সঠিক তথ্য সংগ্রহের বাস্তব অসুবিধা থাকায় উপরোক্ত তথ্যগুলো তেমন গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করেন।

জাতীয় আয় সম্পর্কে দাদাভাই নওরোজির হিসাব কেবল মাথাপিছু আয়ের ওপর আলোকপাত করে না। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষের পুষ্টির দিকটির ওপরও গুরুত্ব দেন। বর্তমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য পরিমাপেও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে দাদাভাই তার ব্যাখ্যায় ভৌতিক উৎপাদনকে আয়ের প্রকৃত উৎস বলে মনে করতেন। ব্যবসা, পরিবহন, প্রশাসন প্রভৃতিকে এর মধ্যে তেমনি।

শিবসুব্রামনিয়নের সংগ্রহ করা তথ্যকে গ্রহণযোগ্য বলে বিভিন্ন গবেষণার কাজ হয়। প্রতি পাঁচবছরের গড় আয়ের ভিত্তিতে নিচের সারণিটি পাওয়া যায় যা থেকে জাতীয় আয় সম্পর্কে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে পারি ঃ

ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয় (১৯০০-৪৭)

সময়কাল	গড় বার্ষিক জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ৫ বছরের গড় (টাকায়)
১৯০০/০১-১৯০৪/০৫	১৫০২	৫২.২
১৯০৫/০৬-১৯০৯/১০	১৫৭৫	৫৩.০
১৯১০/১১-১৯১৪/১৫	১৭৩০	৫৬.৫
১৯১৫/১৬-১৯১৯/২০	১৭৬০	৫৭.৩
১৯২০/২১-১৯২৪/২৫	১৮৪৪	৫৯.১
১৯২৫/২৬-১৯২৯/৩০	২০৪৪	৬২.৭
১৯৩০/৩১-১৯৩৪/৩৫	২১৩১	৬১.৬
১৯৩৫/৩৬-১৯৩৯/৪০	২২৫০	৬০.৬
১৯৪০/৪১-১৯৪৪/৪৫	২৪৪১	৫৬.৬
১৯৪২/৪৩-১৯৪৬/৪৭	২৫২৪	৬২.৩

উৎস ঃ এস শিবসুব্রামনিয়ম National income of India, 1900-01 to 1947

নির্মল কুমার চন্দ্র long term stagnation in the Indian Economy 1900-75, Economic and Political Weekly; Vol-22 Annual number, 1982

ওপরের সারণি অণুসরণ করে বলা যায় যে, ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প হারে হলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯২০-২১ সাল থেকে মাথাপিছু আয় কখনও খুব কম হারে বেড়েছে আবার কখনও কমেছে। অর্থাৎ সামগ্রিক সময়কাল ধরে উন্নয়নের হার খুবই মন্থর। আমরা দেখেছি ১৯২০-২১ সালে জন্মহার তেমন বাড়েনি। এরই প্রতিফলন ঘটেছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রবণতায়। আবার ১৯২১ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে। এটাই প্রতিফলিত হচ্ছে খুব মন্থর গতিতে; কখনও কখনও বৃদ্ধি এবং কখনও কখনও হ্রাসে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মুখে ২০-২২ বছরে দীর্ঘকালীন মাথাপিছু আয় ৬২ টাকার কাছাকাছি স্থির থেকেছে। অর্থাৎ অর্থনীতিও স্থবিরতা লাভ করেছে। বিভিন্ন বছরের আয়কে তুলনাযোগ্য করার জন্য উপরোক্ত পরিসংখ্যান পরিমাপ করা হয়েছে। ১৯৩৮-৩৯ কে ভিত্তি বছর ধরে।

১৯৪৮-এ জাতীয় আয় বিশ্লেষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় আয়ের অবদানটি ব্যাখ্যা করা। প্রধানত কৃষি, শিল্প ও সেবাবিভাগে অর্থনীতিকে ভাগ করলে দেখা যায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প

এবং সেবাবিভাগের অবদান বাড়ে কিন্তু কৃষির অবদান কমে। উপরোক্ত তিনটি বিভাগের মধ্যেকার আন্তসম্পর্ককে অর্থনীতির কাঠামো বলা হয়। শিল্প ও সেবাবিভাগের অবদান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। উন্নত অবস্থায় একটা কৃষি অর্থনীতিকে শিল্প অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। এরই সঙ্গে কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জ্ঞাননির্ভর উৎপাদনে পরিণত হয়। অর্থাৎ কৃষি নিজেই শিল্পে রূপান্তরিত হয়।

যা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা থেকে বলা যায় যে ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ভারতে কৃষির অবদান বাড়েনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান মোটামুটি ১০০০ কোটি টাকার নিচে স্থির ছিল। পরের পঁচিশ বছরে কখনও ১০০০ কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গেছে, কখনও কমেছে। প্রকৃতি নির্ভর থাকায় কৃষি অবদানের স্বল্পকালীন ওঠানামা দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘকালে একটা স্থবিরতার লক্ষণ দেখা যায়, ১৯৩৫ সালের পর কৃষির অবদান একশ কোটি টাকার মত ছিল। জাতীয় আয় শিল্পের অবদান খুব স্বল্পহারে হলেও বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শিল্পবিভাগের অবদান ছিল ২০০ কোটি টাকা। বিশের দশকের পর তা বেড়ে হয় তিনশ কোটি টাকা। চল্লিশের দশকে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান চারশ কোটি টাকার বেশি হয়।

শতাংশ হিসেবে ১৯০০-৪৬ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে কৃষির আয় বৃদ্ধির হার ছিল ০.৪২ শতাংশর শিল্পক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির হার ১.৮২ শতাংশ এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে ছিল ২.২২ শতাংশ। কার্যত এই সময়কালে জাতীয় আয়ে যে বৃদ্ধি ঘটে-তা প্রধানত তৃতীয় বিভাগের বৃদ্ধির ফল। আমরা নিচের সারণিতে ১৯০০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের অবদানের ওপর আলোকপাত করতে পারি ঃ

জাতীয় আয়ে বিভিন্ন বিভাগের অবদান (শতাংশ হিসাবে)

সময়কাল	প্রাথমিক বিভাগ	মাধ্যমিক বিভাগ	সেবাবিভাগ
১৯০০/০১-১৯০৪/০৫	৬৩.৬	১২.৭	২৩.৭
১৯০৫/০৬-১৯০৯/১০	৬১.৭	১৩.৫	২৪.৮
১৯১০/১১-১৯১৪/১৫	৬০.১	১৩.৯	২৬.০
১৯১৫/১৬-১৯১৯/২০	৫৯.৬	১৩.৭	২৬.৭
১৯২০/২১-১৯২৪/২৫	৫৭.৪	১৩.৪	২৯.২
১৯২৫/২৬-১৯২৯/৩০	৫২.১	১৪.৯	৩৩.০
১৯৩০/৩১-১৯৩৪/৩৫	৫১.৪	১৫.৮	৩২.৮
১৯৩৫/৩৬-১৯৩৯/৪০	৪৯.৯	১৬.৪	৩৩.৭
১৯৪০/৪১-১৯৪৪/৪৫	৪৭.৬	১৬.৭	৩৫.৭

ওপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান খুব স্বল্পহারে কমেছে। শিল্পের অবদানও খুব সামান্য হারে বেড়েছে। তুলনামূলকভাবে তৃতীয় বিভাগ বা সেরা বিভাগের অবদান বেশি হারে বাড়ে। দাদাভাই নওরোজির মত অনেকেই মনে করেন যে তৃতীয় বা সেবা বিভাগের ভৌতদ্রব্য উৎপাদিত হয় না। বরং এক্ষেত্রে হস্তান্তর আয় ঘটে। সুতরাং একে জাতীয় আয় বলে মনে করা যায় না। ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগে লেনদেন বেড়ে যায়। এটাই প্রভাবিত হয় এই বিভাগীয় আয়ে।

ওপরের আলোচনায় আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় আয় হ্রাসবৃদ্ধি এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের অবদানের কথা বললাম। মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব। এই গড় হিসাব জাতীয় আয়ের বন্টনের দিকটা উপেক্ষা করে। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বন্টনের ওপরও নির্ভর করে যার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

৭.৩.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রণেশ রায়, প্রগ্রেসিভ পাব্লিসার্স

(২) ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিপান চন্দ্র, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৩) ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইরফান হাবিব, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি

অনুবাদ—

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাব্লিসার্স

(৫) ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, অমিয় কুমার বাগচি, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোঃ

(৬) Amit Bhaduri, A Study in Agricultrue at backwardness under semi feudalism, Economic Journal, Vol 83 1973

(৭) George Blyn, Agricultural Trend in India 1891-1946

(৮) Essays on colonialism, Bipan Chandra, New Delhi, 1999

(৯) The Indian Bourgeoisie, S. Ghosh

(১০) Poverty and Un-British rule in India, Dadabhai Naoroji

(১১) Economic History of India, R. C. Data

(১২) Essays on Commercialisation of Indian Agriculture, K.N. Raj (Ed)

(১৩) Cambridge Economic History, Vol-II

(১৪) Accumulation of Capital, Rosa Luxemberg.

(১৫) Imperialism the highest stage of Capitalism, V.I. Lenin.

(১৬) Sunanda Sen, colonies and the Empire, Orient Longman.

(১৭) The English Utilitarians and India, Erie Stokes, Oxford University Press.

৭.৩.৬.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ঔপনিবেশিক ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ধরনটি আলোচনা কর।

(২) ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় আয়ের বন্টনের ধরনটির সাহায্যে দেখাও ভারত কেন দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারেনি।

পর্যায় গ্রন্থ-৪

Society In Colonial India

সমাজ ঃ উপজাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়

একক-৭

বিন্যাস ক্রম

৭.৪.৭.০ : উদ্দেশ্য

৭.৪.৭.১ : ভূমিকা

৭.৪.৭.২ : ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আদিবাসী—উপজাতি জনসমাজ

৭.৪.৭.৩ : ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন

৭.৪.৭.৪ : নিম্নবর্ণের নানা আন্দোলন

৭.৪.৭.৫ : ঔপনিবেশিক ভারতে নানা শ্রেণীর বিকাশ

৭.৪.৭.৬ : উপসংহার

৭.৪.৭.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.৭.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৪.৭.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতীয় আদিবাসী—উপজাতিদের সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ।

(২) ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন।

(৩) নিম্নবর্ণের আন্দোলনসমূহ এবং ভারতীয় বর্ণ আন্দোলন নানা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

(৪) ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিকাশ।

৭.৪.৭.১ : ভূমিকা

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গ ভারতীয় সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক নানা টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল মূলতঃ

দমনমূলক ও নিপীড়িন মূলক। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজের উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, ভূমি রাজস্ব ও অরণ্য সম্পদ এবং খনিজ দ্রব্য আত্মসাৎ করা ও ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি সুনিশ্চিত করা। এক কথায় বলতে গেলে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক, সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা, ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা ও ভারতে বৃটিশ পণ্য বিক্রি করা। প্রাক বৃটিশ বা মুঘল আমলে ভারতীয় সমাজ এই জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক দমন পীড়নের সাথে পরিচিত ছিল না। বস্তুত ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতীয় সমাজ নানা ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতীয় সমাজের এক এক অংশের উপর ঔপনিবেশিকতার অভিঘাত এক এক ভাবে পড়েছিল। এর কারণ ছিল ভারতীয় সমাজ ছিল বহুত্ববাদী সমাজ বা Plural society। অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে আদিবাসী উপজাতি সত্ত্বা, বর্ণ ও শ্রেণীর অবস্থার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে বোঝাই আমাদের এই পাঠের লক্ষ্য।

৭.৪.৭.২ : ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আদিবাসী—উপজাতি জনসমাজ

মুঘল আমলে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে আদিবাসী-উপজাতি জনজাতিদের দূরত্ব ছিল। মুঘল রাষ্ট্র যদিও অরণ্য সম্পদ আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল, তবে তার মাত্রা কখনও বৃটিশদের মতন হয়নি। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ বৃটিশ রাষ্ট্র ছিল ঔপনিবেশিক চরিত্রের বৃটিশ রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ ও নীতি প্রণয়নের পিছনে কাজ করত একধরনের উপযোগবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী, রাষ্ট্র দর্শন। এই দর্শনে মনে করা হত ভারতীয় সমাজ সভ্যতাহীন ও অনুন্নত। এর পরিবর্তন জরুরী। ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রভাবে ইংল্যান্ডে তথা ইউরোপে এই জাতীয় উচ্চবর্গীয় মানসিকতার জন্ম হয়। ভারতে বৃটিশদের বিভিন্ন নীতি গ্রহণের পিছনে এই মানসিকতা ও দর্শন কাজ করেছিল। উপজাতি আদিবাসীদের সামাজিক ও কৌম জীবনে হস্তক্ষেপ করা বৃটিশ সরকার ন্যায্য বলে মনে করতো। যেমন উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ময়মনসিংহের পারো উপজাতিদের উপর ইংরাজ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৮২২-১৮৬৯ এর মধ্যে নানান ধরনের আইন প্রণয়ন ও সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই তথাকথিত 'অসভ্য' পারো উপজাতিকে সুসভ্য রাষ্ট্র কাঠামোর অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র উপজাতি জনজাতি ও তাদের বহুবিধ অভ্যাস ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং স্বতন্ত্রিয়তাকে বৃটিশ রাষ্ট্রকাঠামোর অঙ্গীভূত না করা পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের অস্বস্তি ছিল।

এই 'অস্বস্তি' থেকে জন্ম নেয় 'ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব' ও জনগণনা ব্যবস্থা। জনগণনা বা 'Census' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Bernanrd S. Chon মন্তব্য করেছেন, 'The history of the Indian census must be seen in the total context of the efforts of the British colonial government to collect systematic information about many aspects of Indian society and economy.' Census বা জনগণনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের প্রতিটি অংশকে চিহ্নিত করা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার করে। তথ্য জানা থাকলে শাসন করার সুবিধা হয়।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আর্থিক নীতির ফলেও উপজাতি জনজাতিদের জীবনে পরিবর্তন আসে। অরণ্য আইন বা Forest Acts গুলির মাধ্যমে সরকার উপজাতি আদিবাসী জনজাতিরা

অরণ্যের সম্পদের উপর দীর্ঘদিন ধরে যে অধিকার গুলি ভোগ করে আসছিল এবং অরণ্যের সঙ্গে তাদের যে আত্মিক সম্পর্কে যে (যে আত্মিক সম্পর্ককে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা সম্ভব নয়) তাকে ভেঙে দিতে অগ্রহণী ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে উপজাতি আদিবাসীদের চিরাচরিত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। বহিরাগত বর্ণহিন্দুদের আগমন এবং মাড়োয়ারী মহাজনদের উপস্থিতি উপজাতি আদিবাসীদের জীবনের ছন্দকে বিপন্ন করে তোলে। বৃটিশ সরকার সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারে বিশ্বাস করত। সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা উপজাতি জনজাতি সমাজে ছিল না। তারা সম্পত্তির কৌম মালিকানায় বিশ্বাস করত। কিন্তু বৃটিশ সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধারণা আদিবাসী উপজাতি সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আদিবাসী উপজাতিদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। Sumit Sarkar এর ভাষায়, 'British legal conceptions of absoute private property eroded traditions of joint ownership (like the khuntkatti tenure in Chote Nagpur) and sharpended tensions within tribal society.' মুঘল আমলে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে আদিবাসী উপজাতিদের এই জাতীয় দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপস্থিতি ও কার্যকলাপও বহুক্ষেত্রে উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এক কথায় বলতে গেলে নানা ভাবে আদিবাসী উপজাতি সমাজে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব জন্ম নিতে থাকে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও তার সহযোগী ভারতীয় শক্তিসমূহর কার্যকলাপের ফলে উপজাতি আদিবাসী সমাজে যে বিপুল ক্ষোভের জন্ম হয়েছিল তার প্রকাশ ঘটে একাধিক রক্তাক্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। এই বিদ্রোহগুলির পিছনে কাজ করত tribal idenity বা উপজাতি সমাজের নিজস্ব সংহতি বোধ। এই বিদ্রোহগুলি লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, ঔপনিবেশিক মতাদর্শ ও ঔপনিবেশিক শাসনের উচ্ছেদ সাধন করা।

ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে আদিবাসী অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী

ভারতীয় জনসমাজ ও বিশেষত উপজাতিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার একাধিক উপজাতি আদিবাসী গোষ্ঠীকে অপরাধপ্রবণ (বা criminal tribe) বলে চিহ্নিত করে। ব্রিটিশ শাসকদের মনে হয়েছিল অপরাধ বা crime কিছু কিছু উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর বংশগত জীবিকা। ব্রিটিশ সরকারী দলিলে লেখা হয়, 'crime is their trade and they are born to it and must commit it.' এই গোষ্ঠীগুলিকে সরকার 'criminal tribe' বলে চিহ্নিত করে। এই তথাকথিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৮৭১ সালে সরকার 'Criminal Tribes Act of 1871' প্রণয়ন করে। ১৮৩০ এর দশকে W.H. Sleeman যখন ঠগীদের নির্মূল করার অভিযান চালান তখন তিনিও এই অপরাধী উপজাতির ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত অপরাধী উপজাতি বা criminal tirbal-এর ধারণা ঔপনিবেশিকতাবাদ সৃষ্ট 'rule of law' এর আইনী কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৭ মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকার নিম্নবর্ণের ভ্রাম্যমান উপজাতিগুলিকে দমন করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ১৮৬৭ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ইন্সপেক্টর জেনারেল তার প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন 'It must be remembered, in dealing with the wandering predatory tribes of India, that the fraternities are of such ancient cretion, their numbers so vast, the country over which their depredations spread so vast, their organization so complete, and

their evil of such formidable dimensions, that nothing but special legislation will suffice for their suppression and conversion' অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা বা 'special legislation' ছাড়া এই ভ্রাম্যমান উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে আইনী কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এই চিন্তার ফলশ্রুতি ছিল ১৮৭১ সালের 'Crimial Tribes Act' এর প্রণয়ন। ১৮৭১ এর এই আইনে চারটি উপজাতিগোষ্ঠীকে অপরাধী উপজাতি বা 'criminal tribe' বলে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে যাতে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যায় তার ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়। সরকার এই চিহ্নিত করা অপরাধী উপজাতিগুলির সদস্যদের নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করে। তাদের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা এলাকার বাইরে গেলে তাদের আটক করার কথাও এই আইনে বলা হয়।

Thomas R. Metcalf এর গবেষণা থেকে দেখা যায় সরকারের এই প্রচেষ্টা কিন্তু সমালোচনার উর্দ্ধে ছিল না। যেমন পাঞ্জাব চিফ কোর্টের বিচারকরা বলেন একমাত্র তখনই কারুর নাম নথিভুক্ত করা যায় যদি সে কোন অপরাধ করে। এই যুক্তিও দেওয়া হয় এর ফলে নির্দোষও অকারণে শাস্তি পাবে। শুধু তাই নয় এর ফলে পুলিশের হাতে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে যার অপব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা তৈরী হবে। কিন্তু সরকার এই সমালোচনায় খুব বেশি কর্ণপাত করেনি। স্বাধীনতার পর এই কুখ্যাত ঔপনিবেশিক আইনের অবসান ঘটান হয়।

৭.৪.৭.৩ : ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় হিন্দু সমাজে পেশাগুলি ছিল মূলতঃ বংশানুক্রমিক। বর্ণব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস বংশগত রূপ ধারণ করেছিল। হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলি এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিল। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণ 'স্বতন্ত্র এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক কতগুলি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সমাজে স্বতঃগুণ ছিল পরিত্রতম এবং যেহেতু ব্রাহ্মণরা ছিল স্বতঃগুণের অধিকারী তাই তারা ছিল সমাজের সবচেয়ে উপরের বর্ণ। ব্রাহ্মণরা ছাড়া কায়স্থ ও বৈদ্যরাও সমাজের উপরতলার বা উচ্চবর্ণ চিহ্নিত ছিল। নিম্নবর্ণের মানুষদের কোন গুণ নেই বলে ধরা হত। স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের সমাজে social mobitlity বা সামাজিক গতিশীলতা অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয়দিকেই কম বা সীমাবদ্ধ। প্রাক-ঔপনিবেশিক কালপর্বে এই বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের আদৌ কোন পরিবর্তন হয়নি তা কিন্তু নয়। নানান ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সীমাবদ্ধ আকারে হলেও চলছিল। কিন্তু কখনই তা বর্ণব্যবস্থার মূল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আনেনি। ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর ও ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো প্রবর্তিত হওয়ার পর বর্ণব্যবস্থায় কতকগুলি পরিবর্তন আগে, আগের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয় কিন্তু বর্ণব্যবস্থার বিলুপ্তি কিন্তু আদৌ হয়নি। বরং বর্ণ ব্যবস্থা নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয় ও নিজের অবস্থাকের যথাসাধ্য সুদৃঢ় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়।

ঔপনিবেশিক আমলে নানা কারণে চিরাচরিত ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন আসে। গ্রামীণ কৃষি কাঠামোতে মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতির প্রবর্তন ও জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা চিরাচরিত বর্ণ নির্ভর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে কিছুটা হলেও দুর্বল করেছিল। ব্রিটিশ আমলে এক নতুন ধরনের নাগরিক অর্থনীতি জন্ম নেয় যার ভিত্তি

কখনই বর্ণ ছিল না। এই নতুন ধরনের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল ইংরাজী ভাষা জানার মতন পেশাদারী শিক্ষা তথা দক্ষতা। ইংরাজী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয় colonial clerks বা ঔপনিবেশিক কেরানী কুলের। এটা সত্যি যে ইংরাজী শিক্ষার উপর কায়স্থ বা বৈদ্যদের মতন উঁচু বর্ণগুলির অধিপত্য ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে ইংরাজী শিক্ষা কখনই বর্ণভিত্তিক ছিল না। এক কথায় বলতে গেলে, একদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে কতকগুলি নতুন ঔপনিবেশিক বৃত্তির জন্ম অষ্টাদশ শতকের বর্ণভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছিল এবং social mobility বা সামাজিক গতিশীলতার জন্ম দিয়েছিল। বর্ণভিত্তিক পেশার পরিবর্তে যোগ্যতা ভিত্তিক পেশা উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে বর্ণব্যবস্থার রূপান্তর প্রসঙ্গে হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকাকালীন দেশীয় শিল্পগুলির ধ্বংস ও কৃষি ব্যবস্থার অবনতি চিরায়ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ছিল, যা বস্তুত পারস্পরিক নিরাপত্তাবোধের জন্ম দিত এবং বর্ণনির্ভর সমাজ কাঠামোতে প্রত্যেকের অবস্থান নির্দেশ করত। ঔপনিবেশিক আমলে তা প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ফলে কারিগর, তাঁতিরা তাদের চিরাচরিত পেশাগুলি থেকে বিচ্যুত হয়ে কৃষি ক্ষেত্রে ভীড় করতে লাগল। অনেকক্ষেত্রে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব নীতির চাপে কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরের শিল্প অর্থনীতিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। শহরের শ্রমিক মহল্লা বা বস্তিগুলির সঙ্গে গ্রামের জীবনবোধের কোন সম্পর্ক ছিল না। ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার ভাঙনে এই গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থাৎ জাতিভেদপ্রথা, পবিত্রতা, অপবিত্রতা প্রভৃতি বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ধারণাগুলি নতুন ধরনের সামাজিক কাঠামোতে অপ্রসাঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। নিম্নবর্ণের মানুষরাও এই পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য বহুক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হওয়ার ও আন্দোলনমুখী হওয়ার জন্য সংঘটিত হতে লাগল। এটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক সুবিধা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মতন উঁচু বর্ণের মানুষরা আত্মসাৎ করেছিল, নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীগুলিও কিন্তু পিছিয়ে থাকতে যে রাজী ছিল না তা উনিশ বা বিশ শতকে সংগঠিত নিম্নবর্ণের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির আন্দোলন থেকে স্পষ্ট। সামাজিক মর্যাদা ও সরকারী আনুকুল্য লাভের লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত আন্দোলনগুলি একদিকে পরিবর্তিত বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে, অন্যদিকে আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারকে 'Divide and Rule Policy' প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এও মনে রাখা দরকার এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে উচ্চবর্ণগুলির দায়িত্ব কিছু কম ছিল না।

৭.৪.৭.৪ : নিম্নবর্ণের নানা আন্দোলন

উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতের সংগঠিত নিম্নবর্ণের আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮.৭২ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে সংগঠিত নমঃশূদ্র আন্দোলন। এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও জটিলতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। নমঃশূদ্ররা মূলতঃ পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মন সিংহ, যশোর এবং খুলনা জেলায় থাকত। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের অবস্থান ছিল সমাজের একদম নিচের দিকে, সাধারণভাবে এদের চণ্ডাল বলে অভিহিত করা হত। নানা ধরনের সামাজিক অবিচারের ফলে নমঃশূদ্রদের

সঙ্গে উচ্চবর্ণের দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। ১৮৭২.৭৩ সালে ফরিদপুর বাখরগঞ্জ অঞ্চলে প্রথম নমঃশূদ্র আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এই আন্দোলন সাফল্য পায়নি। এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় সতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের। এই নতুন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ছিলেন শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর। এই সতুয়া ধর্মসম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১২ সালে গঠিত হয় Bengal Namasudra Association.

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাজন গড়ে ওঠে। উপরের স্তরটি ছিল সম্ভ্রান্ত অংশের; নিচের স্তরটি ছিল মূলতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের। যাইহোক নমঃশূদ্রদের আন্দোলনের ফলে সরকার ১৯১১ সালের জনগণনায় চণ্ডাল শব্দটির পরিবর্তে নমশূদ্র শব্দটি ব্যবহার করে। তারা উপরের বর্ণগুলির নানান সামাজিক সাংস্কৃতিক সাম্মানিক চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীতে পৃথক সুযোগ দাবী করতে থাকে। ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে তাদের কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নমঃশূদ্রদের কোন প্রতিনিধি না থাকায় তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্বন্ধে নমঃশূদ্ররা সন্দিহান ছিল ও সবসময়ে দূরত্ব বজায় রাখত। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল নমঃশূদ্ররা যেখানে ব্রিটিশ শাসনকে প্রাক-ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় উন্নততর বলে মনে করত, সেখানে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। এর থেকে বোঝা যায় কেন নমঃশূদ্ররা স্বদেশী আন্দোলন থেকে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়া আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছে।

নমঃশূদ্র আন্দোলনের তলার দিকে ছিল কৃষক। এরা উচ্চবর্ণের জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তি চাইত। এর জন্য কখন তারা জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ নিয়েছে, কখনও নমশূদ্র কৃষকরা মুসলিম কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উচ্চবর্ণের জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আবার নিজেদের সম্প্রদায়ের সংহতি বজায় রাখার জন্য মুসলিমদের সঙ্গে তারা তীব্র সংঘাতে গেছে, যেমন যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে হয়েছিল ১৯১১, ১৯২৩-২৫ এবং ১৯৩৮ সালে।

১৯৩০ এর দশক থেকে নমঃশূদ্র নেতৃত্ব সাংবিধানিক রাজনীতিতে বেশি করে জড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বিপরীত প্রক্রিয়া রূপে কৃষকদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি এই সময়ে পূর্ববঙ্গের মুসলিম ও নমশূদ্র কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্র আন্দোলন বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মুলস্রোতের সমান্তরাল ধারা রূপে বহমান ছিল। ১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদের মৃত্যুর পর এবং সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বসুর প্রচেষ্টায় নমঃশূদ্র নেতৃত্বের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব কমে আসে। অন্যদিকে ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা খুলনা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় কৃষকদের (যাদের অধিকাংশই নমঃশূদ্র) সংগঠিত করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয় ১৯৪২ সালে জুন মাসে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে এবং জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর থেকে। এর ফলে হিসেবে ১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনে ফরিদপুর, খুলনা, যশোর প্রভৃতি জেলায় নমঃশূদ্র কৃষকরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে। নমঃশূদ্র আন্দোলনের উপরতলার নেতারা কিন্তু নমঃশূদ্র

কৃষকদের এই 'শ্রেণী' ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক ভাবেই সিদ্ধান্তে এসেছেন নমঃশূদ্র আন্দোলনে একটি বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা উপসংহার টানতে পারি এই বলে যে কর্ণগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয় ছাপিয়ে নমঃশূদ্র আন্দোলনে শ্রেণীগত পরিচয় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বর্ণভিত্তিক এই আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণীগতসত্ত্বা নানা টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র কৃষকদের চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে উপরতলার নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বৃত্তের থাকতে উৎসাহিত হয়। শ্রেণীগত সত্ত্বার উন্মেষ ও কৃষক আন্দোলনের বিকাশ নিশ্চিতভাবেই সমকালীন যুগ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করে। মহারাষ্ট্রের উপর গেইল ওমভেট্ এর গবেষণা থেকে দেখা যায় মহারাষ্ট্রের বর্ণ আন্দোলনেও দুটি সুস্পষ্ট ধারা ছিল। প্রথম ধারাটি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল এবং নিম্নবর্ণের স্বচ্ছল অংশটির দ্বারা পরিচালিত। এই রক্ষণশীল অংশটি ব্রিটিশ সরকারের নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাস করত এবং ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের পর 'Non-Brahman Association' নামক একটি রক্ষণশীল ও ব্রিটিশ অনুগত রাজনৈতিক দল গঠন করে। অপর অংশটি ছিল অনেক বেশি চরমপন্থী ও আন্দোলনমুখী। এই র‍্যাডিকাল অংশটি 'Satyasodhak Samaj' গঠন করে। এরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত ছিল। এদের দৃষ্টিতে সমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত-একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজন সমাজ যারা নানাভাবে শোষিত, অন্যদিকে মূলসংখ্যক শেঠজি ভাটজি অর্থাৎ বণিক ও ব্রাহ্মণ যারা শোষণ করে। ১৯৩০-এর দশকের শেষ থেকে মহারাষ্ট্রের বর্ণ আন্দোলন গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পশ্চিম ভারতে কুনবি ও মারাঠী ছিল অব্রাহ্মণ বর্ণ আন্দোলনের ভিত্তি, দক্ষিণ ভারতে এই ভিত্তি ছিল ভেল্লাল ও দ্রাবিড় সত্ত্বা। Bernard Cohn-এর পূর্ব যুক্ত প্রদেশের উপর গবেষণা থেকে দেখা যায় চামরার (মূলতঃ প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেত মজুর) শিবনারায়ণ গোষ্ঠীর ধর্মীয় নীতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন আচার পালন করতে থাকে। আবার কেরালায় ইজাভা নামক নিম্নবর্ণীয় মানুষরা বিংশশতকের গোড়া থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে থাকে। তাদের অন্যতম দাবী ছিল মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ। সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ তামিলনাড়ুর নাদার, উত্তর তামিলাড়ুর পাল্লি, মহারাষ্ট্রের মাহার প্রভৃতি বর্ণগোষ্ঠীগুলির মধ্যে। ১৯৩০ বিশেষত ১৯৪০-এর দশক থেকে দেখা যায় নিম্ন বর্ণের র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনের একটি বড়ো অংশ বামপন্থী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যেমন সহজানন্দ প্রথমে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ও পরে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। সাতরার সত্যশোধক আন্দোলনের অন্যতম নেতা নানা পাতিল মহারাষ্ট্রের অন্যতম কমিউনিষ্ট নেতা হন। প্রথমদিককার তামিল কমিউনিষ্ট যেমন সিঙ্গারাভেলু ও পি. জীবনানধন ১৯৩০-এর দশকে বর্ণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের বর্ণ ব্যবস্থা ও তার পরিবর্তন সম্বন্ধে যে আলোচনা এখানে কারা হোল তার থেকে দু একটি সিদ্ধান্ত সাধারণ ভাবে আমরা টানতে পারি। প্রথমতঃ ভারতীয় বর্ণগুলির, বিশেষত নিম্ন বর্ণগুলির, অবস্থা আদৌ অনড়, অচল, পরিবর্তনহীন ছিল না। একদিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাব, অন্যদিকে নিজেদের প্রতিবাদী স্বত্ত্বার বিকাশ ও চেতনার ক্রমউন্মীলন বর্ণের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্কি উভয় অবস্থাকে পাল্টে দিয়েছিল। অন্যভাবে বললে প্রতি মুহূর্তে বর্ণ ভিত্তিক ক্ষমতা সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছিল, নিম্নবর্ণগুলি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে লড়াই করেছিল তা উঁচু বর্ণ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষমতা সম্পর্ককে পাল্টে দিচ্ছিল। এই অর্থে অর্থাৎ ক্ষমতা সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীগুলি

এবং ঔপনিবেশি রাষ্ট্রও নিজেদের পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। অর্থাৎ এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী লড়াই যা নানা চড়াই উতরাই এর মধ্য দিয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ('জাতি ও নিম্নবর্ণের চেতনা') শ্রমজীবী মানুষরা তাদের 'সাধারণ বোধের' মধ্যে, সাংস্কৃতিক মাধ্যমে, প্রতিনিয়তই এমন এক সম্প্রদায়রে রূপগুলিকে খুঁজে চলেছে। রাজনীতির কাজ হল জনগণের ভিতরের এই কাজগুলিকে, গুণগুলিকে বিকশিত করা। বাইরে থেকে কোন 'বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে' আমদানী করা নয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরের গুণগুলির বিকাশের মধ্য দিয়েই প্রতিরোধের রাজনীতি তার নিজস্ব ভাষা তৈরী করে নেয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর এই বক্তব্য ও যুক্তি থেকে বোঝা যায় না কেন বিংশ শতাব্দীর ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ভারতে নিম্নবর্ণের আন্দোলনে ধীরে ধীরে শ্রেণী চেতনার বিকাশ ও বামপন্থী মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করলো। বস্তুত এটি শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সাধারণ বোধের বিকাশের প্রশ্ন নয়, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণভাবে এই প্রশ্নটি যুক্ত বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মতাদর্শের যথার্থার উপর। বামপন্থী মতাদর্শ ইউরোপের থেকে নেওয়া 'বৈজ্ঞানিক চিন্তা' কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, বরং যেটা গুরুত্বপূর্ণ, বামপন্থী চিন্তা ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকের ভারতীয় নিম্নবর্ণের আন্দোলনগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা। ভারতীয় নিম্নবর্ণের বিভিন্ন আন্দোলনের তথ্যগত বিশ্লেষণ দেখায় যে বর্ণ আন্দোলনের মধ্য থেকেই শ্রেণীবোধ জেগে উঠেছিল, যার পিছনে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলনের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং বামপন্থী মতাদর্শ এখানে বাইরে থেকে নেওয়া কোন বিষয় নয়, বরং তা বর্ণগুলির বস্তুগত অবস্থান ও তাঁর রূপান্তরের প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল। আর ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল বলেই বর্ণ আন্দোলনের মধ্য থেকে শ্রেণী চেতনার বিকাশ কিয়দংশে হলেও সফল হয়েছিল।

৭.৪.৭.৫ : ঔপনিবেশিক ভারতে নানা শ্রেণীর বিকাশ

ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রেণীর বিকাশও এই প্রেক্ষিতে আলোচনা করা যেতে পারে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রেণী মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। যেমন দাস সমাজে মুখ্য শ্রেণী দুটি—দাস মালিক ও দাস। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস। ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্প মালিক বা পুঁজিপতি ও শিল্প শ্রমিক।

পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর ভাঙনের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হয় এবং রবার্ট ব্রেনারের ভাষ্য অনুযায়ী এই উৎক্রমণ বা transition-এ শ্রেণী সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মেলেনা। এর পিছনে দুটি মুখ্য কারণ ছিল। প্রথমত ভারতীয় সমাজ বর্ণনির্ভর সমাজকাঠামো, যা পশ্চিম ইউরোপে ছিল না। দ্বিতীয়ত, মুঘল আমলের ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারা অষ্টাদশ শতকে ঔপনিবেশিকতার দ্বারা মৌলিকভাবে প্রভাবিত হয়; যা পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে হয়নি। ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে মুঘল আমলে বিদ্যমান ভারতীয় কৃষি কাঠামো ও ভূমি সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়, খুব সীমিতভাবে হলেও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয এবং বন্দরকেন্দ্রিক কানবি পাতিদার, মাদ্রাজে রেড্ডি, মহারাষ্ট্রের সামওয়াদ মালি প্রমুখরা এই জাতীয় ধনী কৃষকদের উদাহরণ। আমাদের এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক ভূমি রাজস্ব নীতির কল্যাণে কৃষি সমাজে

নতুন ধরনের শ্রেণী বিকাশ ও শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি সমাজের আভ্যন্তরীণ মেরুকরণ বা polarisation বৃদ্ধি পেয়েছিল অতি দ্রুত হারে যার অর্থ ছিল একাধিক গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে অল্পসংখ্যক কৃষকের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি।

ব্রিটিশ আমলে যে নতুন ধরনের শহর অর্থনীতির বিকাশ ঘটে, সেখানে অন্তত তিনটি নতুন শ্রেণীর বিকাশ ঘটে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত। এরা ভারতের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী। বর্ণগত গতিশীলতা কম থাকায় প্রথম দিককার ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা। ঐতিহাসিক বি. বি. মিশ্রর মতে ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ। পক্ষান্তরে ক্রিস্টোফার বেইলির গবেষণা থেকে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকেই উত্তরভারতের শহরগুলিতে আমলা শ্রেণী, বণিক প্রভৃতিরা বসতি স্থাপন করে একটি সুসংবদ্ধ শ্রেণীরূপে বিকাশের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এরাই কালক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে বিকশিত হয়। এই অর্থে অষ্টাদশ শতক ও উনিশ শতকের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই, প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরণ একটি নিরন্তর ধারাবাহিকতার ইতিহাস। বেইলি তাঁর এলাহাবাদের উপর গবেষণায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 'এলাহাবাদের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উকিল ও অন্য বৃত্তিভোগী স্বদেশী নেতারা আসলে শেঠিয়া শ্রেণীর অনুগৃহীত মুখপাত্র মাত্র।' এখানে জাতপাত বা ভাষার ঐক্যের চেয়ে পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীতের সম্পর্ক অনেক বেশি জোরদার। ডি. এ. ওয়াশব্রুক তাঁর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উপর গবেষণায় একই ধরনের পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীত সম্পর্ক দেখতে পেয়েছেন।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ ও ভূমিকা সম্পর্কে এই ভাষ্যকে নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কখনই অষ্টাদশ শতকের হিন্দু আমল বা জেন্ট্রি নয়। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত একই সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে তীব্রতম সমালোচনা করেছেন। এর পিছনে কাজ করেছিল একদিকে দেশীয় ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলকে আত্মস্থ করা।

১৮৮৭ সালে ভারত ইংরাজী শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ২৯৮,০০০। ১৯০৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০৫,০০০ জন। শুধু বাংলা নয়, ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ও প্রচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের কল্যাণে যে নতুন বৃত্তিগুলির জন্ম হয়েছিল সেগুলি এই ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণী করায়ত্ত করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় ছিল নিরন্তরভাবে তার চারপাশকে প্রশ্ন করা—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তিন ধরনের ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রশ্ন করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই প্রচেষ্টার পিছনে কাজ করেছিল নিরন্তর আত্মসমালোচনা ও দেশ ও কাল সম্পর্কে একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ মানে নিছক ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার নয়, বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি। কোলকাতা, বোম্বাই, পুনা, মাদ্রাজ সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার ও সংগঠন নির্মাণে এগিয়ে আসে। এমনকি ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সমালোচনা বা economic critique এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই উপস্থিত করেছিল। বস্তুত ১৮৬০ সালের পর থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয় শ্রেণী ইংরাজ

শাসন সম্পর্কে আশা হারিয়ে ফেলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এই শ্রেণীর থেকে জন্ম নেয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদ দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দুটি নতুন শ্রেণী জন্ম নেয়। একটি হল পুঁজিপতি শ্রেণী, অন্যটি শ্রমিক শ্রেণী। তীর্থঙ্কর রায় ভারতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়াকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) ১৮৫০ ১৯১৪, (২) ১৯১৪-১৯২০, (৩) ১৯২০-১৯৩৯, (৪) ১৯৩৯-৪৭। এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দয়ে আধুনিক ভারতে শিল্পপতি ও শ্রমিক—উভয় শ্রেণী জন্ম নেয়। প্রথম দিককার শিল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বস্ত্রশিল্প, পরবর্তীকালে পাট ও এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় শিল্পপতিরা সাধারণভাবে মাড়োয়ারী, গুজরাটি ও চেট্টিয়ার গোষ্ঠীর মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিল। সাধারণ ব্রিটিশ কোম্পানী বা ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দি বা দলিল বা এজেন্ট রূপে এরা কাজ করে পুঁজি সংগ্রহ করে। এই পুঁজি পরে শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একাধিক নতুন ভারতীয় শিল্পপতি গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ আমলের উল্লেখযোগ্য ভারতীয় শিল্পপতি গোষ্ঠী হল টাটা, বিড়লা, সিংহানিয়া, শ্রীরাম, মফতলাল, গোয়েঙ্কা প্রমুখ।

শিল্পপতি শ্রেণীর বিকাশের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশও উনিশ-বিংশ শতকের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম বড়ো বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক উৎস ছিল। ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব নীতি ও অবশিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জনসমাজের একটি বড়ো অংশ ভূমিচ্যুত হয়ে জীবিকার খোঁজে শহরে শিল্পশ্রমিক রূপে কাজ নেয়। এর ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির নানা উপাদান শহরের শ্রমিক মহল্লাগুলিতে আসে। শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে শ্রমিকদের আদৌ কোন বেতনবৃদ্ধি হয়নি। পরবর্তীকালে ১৮৯০-৯৫ সালে খাদ্যদ্রব্যের যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল মজুরী সেই হারে বাড়েনি। শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে সর্দারদের উপস্থিতি শ্রমিক শোষণকে আরো তীব্র করে তুলেছিল। বাগিচা বা খনি শ্রমিকদের অবস্থাও খুব করুণ ছিল। ১৯৩১ সালে রয়াল কমিশন অফ লেবার মন্তব্য করেছিলেন যে ১৯০৮ সালে ফ্যাক্টরি কমিশনের তদন্ত চলার সময়, অধিকাংশ বস্ত্রকলে শ্রমিকদের দিয়ে প্রায় ১৫ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করান হত। অন্যান্য শিল্পগুলিতেও একই অবস্থা ছিল। নারী ও শিশু শ্রমিকদের দিয়ে নির্মম ভাবে কাজ করান হত। কিন্তু তাদের মজুরী ছিল পুরুষ শ্রমিকদের থেকে অনেক কম। এই অসহনীয় পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তনের জন্য ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্ট প্রণীত হয়। এই আইনে ৭ বছরের নিচে শিশুদের কারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ৭ থেকে ১২ বছর বয়স্ক শিশুদের দৈনিক ৯ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারিত হয়।

এই আইন কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থা পাল্টাতে পারেনি। ১৯০৮ সালের ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় শিশুদের উপর শোষণ একই রকম নির্মম ভাবে অব্যাহত। এমনকি ১৯৩১ সালের রয়াল কমিশন অন লেবর ইন ইণ্ডিয়ার প্রতিবেদনে দেখা যায় শ্রমিকদের অবস্থার আদৌ কোন উন্নতি হয়নি। বোম্বাই-এর বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাইনে ছিল গড় মাসিক ৩৭ টাকা। অদক্ষ শ্রমিকদের গড় মাসিক মাহিনা ছিল ২০ টাকা, নারী শ্রমিকদের মাসিক গড় মাহিনা ছিল ১৭ টাকা। শ্রমিকদের বাসস্থান ছিল এককথায় অতীব জঘন্য। কোন সামাজিক নিরাপত্তা শ্রমিকদের ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্রুত সংগঠিত প্রতিবাদ জানাতে সচেষ্ট হয়। আহমেদাবাদ, বোম্বাই, শোলাপুর, জামশেদপুর, কলকাতা, নাগপুর, মাদ্রাজ,

কোয়েম্বাটোর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা বারবার ধর্মঘট করে। এই প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ ১৯২০ সালে গঠিত হয় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC)। AITUC-এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায়। মতিলাল নেহেরু ও বিঠলভাই প্যাটেল এর মঞ্চে ছিলেন। সাধারণভাবে ধরা যায় শ্রমিক সংগঠন গঠিত হওয়ার অর্থ শ্রমিক শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি।

সাম্প্রতিককালে কিছু গবেষণায় ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর 'শ্রেণী চেতনা'র বিষয়টিকে নানাভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে। যেমন দীপেশ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন বাংলার পাট শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীর থেকেও সম্প্রদায়ের বোধ ও চেতনা অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। প্রাক ধনতান্ত্রিক গ্রামীণ জীবনের নানা উপাদান শ্রমিকদের জীবনে দেখতে পাওয়া যায় যা শ্রেণী চেতনার বিকাশের সামনে প্রতিবন্ধকরূপে ছিল। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর 'শ্রেণী' রূপে বিকশিত হওয়ার ইতিহাস পাঠের সময় এই টানাপোড়েন মাথায় রাখা দরকার।

৭.৪.৭.৬ : উপসংহার

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের বিকাশ অত্যন্ত জটিল ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সম্প্রদায়, বর্ণ ও শ্রেণীর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। উনিশ ও বিংশ শতকে ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে মৌলিক বদল এসেছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সব সময়ে স্বাধীনভাবে হয়নি। ঔপনিবেশিক শক্তি নানা ভাবে এহ প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করেছে নিজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। আধুনিক ভারতের ইতিহাস পড়ার সময় এই জটিলতাকে মাথায় রাখা দরকার। আরো মনে রাখা দরকার এই জটিল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী রাজনৈতিক ভাষ্যের জন্ম দিয়েছে। এই রাজনৈতিক ভাষ্য বিশ্লেষণও এই রকম জরুরী।

৭.৪.৭.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Sekhar Bandyopadhyaya : From Plassey to Partition.

2. Sumit Sarkar : Modern India

3. Bipan Chandra : Essays in Colonialism

4. Sekhar Bandyopadhyay : Caste, Politics and the Raj

5. Sekhar Bandy opadhyay : Caste, Protest and Identity in Colonial India

6. Susan Bayly : Caste, Society and Politics in India

7. Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital

8. Partha Chatterjee : Bengal, The Land Question

9. Dipesh Chakraborty : Rethinking Working Class History.

10. Tirthankar Roy : The Economic History of India

11. সুকোমল সেন ঃ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

৭.৪.৭.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় উপজাতি আদিবাসীদের সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২। নমঃশূদ্র আন্দোলন আলোচনা করে দেখাও যে ভারতীয় বর্ণ আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি কি কি ছিল?

৩। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষি কাঠামোতে শ্রেণীর বিকাশ কিভাবে হয়েছিল?

৪। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ছিল?

৫। উনিশ ও বিংশ শতকের শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে ভারতে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের বিভিন্ন দিক আলোচনা করো।

SOCIETY IN COLONIAL INDIA

ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)

সমাজ গঠন ঃ উপজাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়

Colonial Intervention and Social Change

বিন্যাস ক্রম

৭.৪.৭.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.৪.৭.২.১ : ভূমিকা—ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও সমাজ পরিবর্তন

৭.৪.৭.২.২ : সমাজ সংস্কার

৭.৪.৭.২.৩ : আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

৭.৪.৭.২.৪ : মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

৭.৪.৭.২.৫ : বর্ণ আন্দোলন

৭.৪.৭.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.৭.২.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৪.৭.২.১ : ভূমিকা—ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও সমাজ পরিবর্তন

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জন করে। উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর এর সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এই রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার যে শুধুমাত্র পরবর্তীকালের ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, ভারতীয় সমাজ কাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতিকেও তা মৌলিক ভঅবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই সামগ্রিক প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াকে আমরা 'ঔপনিবেশিকরণ' বা colonization বলে অভিহিত করতে পারি। ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আধুনিক (ইংরাজী) শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে যা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর দীর্ঘমেয়াদী ছাপ ফেলে। সংস্কার আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান দিকসমূহ যা ব্যাখ্যা না করলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর

পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বোঝা যাবে না। এই আলোচনায় আমাদের মূল লক্ষ্য এই জটিল ক্রিয়া-সমাজ কাঠামোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বোঝা যাবে না। এই আলোচনায় আমাদের মূল লক্ষ্য এই জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুধাবন করা। চারটি পৃথক বিষয়-সংস্কার আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ এবং বর্ণ আন্দোলন—সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর প্রতিক্রিয়ার নিরিখে।

৭.৪.৭.২.২ : সমাজ সংস্কার

উনিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। বস্তুত এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল বহুলাংশে আধুনিক চেতনার প্রকাশ। আবার একই সঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল অতীত ঐতিহ্যের যুগোপযোগী পুর্নচর্চা ও পুনরুদ্ধার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, ''তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।'' (চারিত্রপূজা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মূল্যায়ন থেকে স্পষ্ট ইংরাজী শিক্ষা ও প্রাচীন দেশজ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সুষম মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গঠিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও হিন্দু ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে রামমোহন ও পরবর্তীকালের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা সচেতন ছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী (orientalist) পণ্ডিতদের প্রাচ্য বিষয়ক ধারণা বা প্রাচ্য প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব তারা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ভাবনা সেই ছকে গড়ে তুলেছিলেন এডওয়ার্ড সেডের (Edward Said) এই উক্তি মানা যায় না। এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করার জন্য রামমোহন প্রমুখকে প্রাচ্যবাদীদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। বারাণসী, পুণা, মাদ্রাজ, কেরল প্রমুখ স্থানে সংস্কৃ পঠনপাঠনের ধারা অব্যাহত ছিল।

অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ যে ভাবে শাস্ত্র চর্চা করতেন তা মধ্যযুগের শাস্ত্র-চর্চা থেকে পৃথক ছিল। নিছক ব্যক্তিগত মোক্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে রামমোহন প্রমুখরা শাস্ত্রচর্চা করেননি। তাঁরা ধ্রুপদী সংস্কৃতির সাহায্যে জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে সনাতন প্রথাবদ্ধ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ একদিকে চিরায়ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার যথাযথ আত্তীকরণ—এই দুই ধারার প্রতিফলন ঘটে উনিশ শতকের ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ আইন বা Hindu Windows' Remarriage Act ঔপনিবেশিক সরকার প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এই আইন

প্রণীত হলেও হিন্দু সামাজিক বাস্তবতার কারণে তা খুব বেশী জনপ্রিয় হয়নি। লুসি ক্যারোল (Lucy Carroll)-এই মতে এই আইন মূলতঃ রক্ষণশীল চরিত্রের; কারণ এই আইনে ঠিক হয় যে পুনর্বিবাহকারী বিধবা নারী পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। অশোক সেন এই ব্যর্থতাকে অনিবার্য বলে অভিহিত করেছেন, কারণ বিধবা বিবাহের জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক সম্পত্তির, যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার পূর্বে ভূপালের শুবজি বাপু (Subaji Bapu) এবং পুনার একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে সওয়াল করেন। ১৮৩৫ সালের আগস্ট 'The Bombay Darpan' নামক সাপ্তাহিক কাগজে শুবজি বাপুর চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক K.N. Panikkar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''Bapu saw window marriage as a part of the general emancipation of women and hence emphasized the importance of female education.'' (K.N. Panikkar : ''Culture and Ideology'' Hegemony.)

বিধবা বিবাহ আইনের সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। পুরুষের বহু বিবাহ ও হিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করেন। সমকালীন নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (নাট্যকার ঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন-র রচনা) নাটকে বর্ণহিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করে। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৫ সালে প্রগতিশীল হিন্দুদের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকার যাতে বহুবিবাহ প্রথা রদ করে। সমাজের রক্ষণশীল অংশও সরকারের কাছে এই আইন প্রণয়ন না করার জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করে। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। যে ভিক্টোরিয়া উদারনীতিবাদী আদর্শের প্রভাবে ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষিত হিন্দু ভারতীয়দের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে উৎসাহ দিত, তা ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে যায় এবং উদীয়মান রক্ষণশীল মতাদর্শ ১৮৫৭-৫৮-এর পর থেকে ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতার প্রতি ব্রিটিশ নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Thomas R. Metcalf এই ঘটনাকে 'Complete non-interferenec in the traditional structure of Indian society' বলে অভিহিত করেছেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের এই নীতি পরিবর্তন ও মতাদর্শগত রূপান্তর সত্ত্বেও ১৮৬০ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সহবাস সম্মতি আইন বা Age of Consent Act সরকার প্রণয়ন করেন। এর ফলে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় দশ। ১৮৯১ সালে মহিলাদের ন্যূনতম বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হয়। এই সময় কিন্তু সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে তীব্র প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। এই প্রতিবাদের পিছনে কাজ করেছিল এক ধরনের রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী চেতনা যার প্রাণপুরুষ ছিলেন মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক। তিলক মনে করতেন ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়ম-বিধি পরিবর্তন করার অধিকার শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই রয়েছে। Charles Heimasth দেখিয়েছেন, সরকার শোষিত সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছিল জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রকরণ। এর পিছনে কাজ করছিল ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে প্রশ্নহীন শ্রদ্ধার মনোভাব। এই রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশ ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিঃসন্দেহে বৈধতা দান করেছিল। এর ফলে সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কার নীতির

বিরোধিতার মধ্যে থেকে জন্ম নেয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন। ঊনিশ শতকের শেষ লগ্নে জন্ম নেওয়া হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন এক চড়া ধর্মীয় অনুষঙ্গের জন্ম দেয় যা ছিল সমকালীন জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। ভীরাসালিঙ্গম পান্টুলু (Veerasalingam Pantulu) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ভীরাসালিঙ্গম 'Rajamundri Social Reform Assocaiton' গঠন করেন। ১৮৮১ সালে প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানটি হয় রাজামুন্দ্রী শহরে। এরপর কে.এন. নটরাজন ১৮৯০ সালে গঠন করেন Indian Social Reformer। ১৮৯১ সালে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে আরো গতি সঞ্চার করার জন্য রাজামুন্দ্রী শহরে সংস্কারপন্থীরা 'Window Remarriage Association' গঠন করেন। পরের বছর মাদ্রাজে 'Hindu Social Reformer Assocation' গঠন করা হয়। এই সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন যে খুব প্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছে তা বলা যাবে না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নির্দিষ্ট বা সংঘটিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধির বিরুদ্ধে এই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংস্কার প্রচেষ্টা সাফল্য না পাওয়াই স্বাভাবিক।

বিপান চন্দ্রের মতন বাম-জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুধুমাত্র সাময়িক সাফল্য বা ব্যর্থতা দিয়ে বিচার করা সঠিক নয়। বস্তুত এই আন্দোলনগুলি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধিতার প্রাথমিক সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত ভিত্তি। একদিকে দেশজ ঐতিহ্যের শ্রদ্ধান্বিত পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল—এই দুই এর মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের আত্মপরিচয়ের ভাষা তৈরী করেছিলেন। ঐতিহাসিক K.N. Panikar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "It was not just an attempt at religious revival and glorification, but an intellectual inquiry into the part, embracing almost every field a social, cultural and politial endeavour."

ঔপনিবেশিক সরকারের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ সরকারী উদ্যোগে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে) ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এক ভিন্ন মাত্রার ধর্মীয় আন্দোলন বাংলায় শুরু হয় যাকে আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের প্রথম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই আন্দোলন নিছক ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছিল না। অর্থাৎ সরকারী আনুকূল্যে কয়েকটি ধর্মীয় বিধি বা নিয়ম পরিবর্তনের কথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কল্পনা করেননি। তাঁদের দুজনের লক্ষ্য ছিল অনেক ব্যাপক উদার ও মহান—তা হল মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্বের পূর্ণ-বিকাশ ঘটানো। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এই আন্দোলনের লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় সর্বজনীন, ফলতঃ বেদান্ত ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। রামকৃষ্ণকথিত 'যত মত তত পথ' ছিল এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি। এই চিন্তা নিছক অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানোর সচেতন প্রয়াস নয়, বরং মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার মৌলিক প্রচেষ্টা। তৃতীয়তঃ, আত্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধির প্রয়াসকে সাধকের ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বৃহত্তর সাংগঠনিক রূপদান করা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্যতম মহৎ বৈশিষ্ট্য। এই সাংগঠনিক প্রচেষ্টারই প্রকাশ ছিল রামকৃষ্ণ মিশন।

শুধু মাত্র শুষ্ক তর্ক আলোচনায় নয়, বা ঔপনিবেশিক সরকারের উপর নির্ভর করে আইন প্রবর্তনের মধ্য

দিয়ে সমাজ সংস্কার করা নয়—বরং প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তঃস্থ ব্রহ্মের (বা মনুষ্যত্বের) পূর্ণ-বিকাশের মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য। সর্বোপরি এই যাত্রা কোন একক নিঃসঙ্গ পথিকের অনির্দিষ্ট যাত্রা নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সুসংগঠিত ও সমষ্টিবদ্ধ, ভাবগত ও চৈতন্যগত আন্দোলন যা বস্তুত এক অপূর্ব মানবিক অনুভূতি, বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। এই অর্থে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনকে হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলনের চেনা ছকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবার পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্তি প্রসূত আধুনিকতার প্রভাবশালী কাঠামোর মাধ্যমেও এই আন্দোলনকে চেনা যাবে না। এই আন্দোলন মুখ্যত বৈদান্তিক চেতনার বিশুদ্ধ প্রকাশ ও প্রসার।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যেও নানা টানাপোড়েন শুরু হয়। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্কারপন্থী মনোভাব পুরাতনপন্থী গোঁড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ১৮৬২ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হওয়ার পর সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে আরো ব্যাপকতর করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সংস্কার প্রচেষ্টা মুখ্যতঃ আধুনিকতা প্রসূত, যেমন জাতিভেদ বর্জন, বিধবা বিবাহ প্রচার, অসবর্ণ বিবাহ উদ্যোগ, পর্দাপ্রথার অবলুপ্তি, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি। Meredith Borthwick-এর মতে, কেশব ও তার অনুগামীরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের চেয়ে সমাজ সংস্কারে বেশী আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও তার অনুগামীরা সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে সনাতন হিন্দু সমাজের বিধিগুলিকে আঘাত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। উপবীত ধারনের ন্যায্যতাকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে পুরাতনপন্থীদের বিরোধ চরমে ওঠে এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৮৬৬ সালে কেশব ও তাঁর অনুগামীরা 'ভারতী ব্রহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতনপন্থী ব্রাহ্মরা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'আদি ব্রাহ্মসমাজে' সংগঠিত হয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। এই জাতীয় বিভাজন প্রক্রিয়া শিক্ষিত ভারতীয়দের আত্মপরিচয় খোঁজার প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে উপস্থিত করে। এই দ্বন্দ্ব যতখানি না আদর্শগত, তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মপরিচয়ের সংকট। বরং একটু অন্যভাবে বললে কোন জাতীয় আদর্শগত প্রশ্নের অনুশীলন করলে এই আত্মপরিচয়ের সংকট এড়ানো যেত তা ব্রাহ্ম আন্দোলনে সুস্পষ্ট আকার নেয়নি।

১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহারাষ্ট্রে যান। তার প্রভাবে ১৮৬৭ সালে বোম্বেতে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সমাজের ভিত্তি ছিল একেশ্বরবাদ, জাতিভেদ বিরোধিতা ও সমাজসংস্কার। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন আত্মারাম পান্ডুরঙ। সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। প্রার্থনা সমাজের নেতৃত্বস্থানীয়রা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার প্রার্থনা সমাজ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজের মতন অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ চায়নি। সংস্কার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও রানাডে প্রমুখরা ধীরে এগোনোর পক্ষপাতী ছিল সামাজিক কাঠামোকে বৈপ্লবিক ভাবে পাল্টানোর কোন পদক্ষেপ প্রার্থনা সমাজ নিতে চায়নি। প্রার্থনা সমাজের শাখা সুরাট, আহমেদাবাদ, করাচী, সাতারা, কোলাপুর প্রমুখ শহরে খোলা হয়।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। ১৮৭৫ খ্রীঃ তিনি আজ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। উপনিষদে যে একেশ্বরবাদের ধারণা পাওয়া যায় তার উৎস বেদ বলে তিনি মনে করতেন। হিন্দু ধর্মের পুর্ণ শোধন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তিনি হিন্দু

সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথাগুলিকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন বেদের ব্যাখ্যায় দয়ানন্দ শুধু যে ম্যাকসমুলারকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি তা নয়, তিনি সায়নভাষ্যকেও বহু ক্ষেত্রে স্বীকার করেননি। ঋকবেদ বাদ দিয়ে আর সবই তার কাছে বর্জনীয়, এমনকি বেদান্তও। শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে অহিন্দুদের হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করার প্রয়াস শুরু হয়। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে তীব্র প্রচার শুরু করেন। অস্পৃশ্যতা ও বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি জনমত সংগঠিত করার চেষ্টায় ব্রতী হন। দয়ানন্দের ঋকবেদে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস সাধারণ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অথবা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী কারোর কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। বস্তুত পূর্ব ভারতে দয়ানন্দের প্রভাব অল্পই ছিল। কিন্তু উত্তর ভারত বিশেষত পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যসমাজ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। ক্ষত্রি, অরোরা, আগরওয়াল প্রমুখ চিরাচরিত বণিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দয়ানন্দ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। লালা হনস রাজ, লালা লাজপত রায়, লালা মুনসীরাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) প্রমুখ অগ্রণী আর্যসমাজীরা এই বণিক গোষ্ঠী বা বর্ণের সদস্য ছিলেন। পাঞ্জাবের অন্তত চারটি অঞ্চল তাদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলগুলি হল পেশওয়ার, রওয়ালপিন্ডি, মুলতান, রোহটক-হিসার এবং জলন্ধর। মুখ্যতঃ এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি আর্যসমাজ ও দয়ানন্দের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ১৯০০ খ্রীঃ থেকে দয়ানন্দ শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন যাকে সুমিত সরকার সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া বা 'Sanskritizing Process' বলে অভিহিত করেছেন। ১৮৯১ তে আর্যসমাজের সদস্যসংখ্যা ছিল ৪০,০০০, ১৯০১-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯২,০০০।

বিপানচন্দ্রের মতন ঐতিহাসিক মনে করেন হিন্দু সংস্কারপন্থীরা পাশ্চাত্যকরণের (Westernization) চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী ছিলেন আধুনিকীকরণে (modernization)। তিনি স্পষ্টতই মন্তব্য করেছেন, ''...the reformers were aiming at modernization rather than westernization. A blind initation of western cultural norms was never an integral part of reform''। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ সংস্কারকদের লক্ষ্য ছিল না। সুমিত সরকার পক্ষান্তরে সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু পরিচয় (Hindu Identity) খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলনের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধারণা অনেক বেশী আগ্রাসী ছিল। তিনি মন্তব্য করেছেন এই পার্থক্যটি 'was of degree rather than kind'। উপসংহারে আমরা এইটুকু সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে যে ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল একাধিক সীমাবদ্ধঝতা থাকা সত্ত্বেও দেশজ সংস্কৃতির শিকড় খুঁজে পেতে তা সদর্থক ভূমিকা পালন করে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে গেলে, ''The Indian modernisation project, therefore, always felt a compulsion to construct a modernity that would be located within Indian cultural space''। এই শিকড় সন্ধানী আত্মপরিচয় পর্ব না থাকলে পরবর্তীকালের ভারতীয় জাতিয়তাবাদের বিকাশ আদৌ কতখানি হত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

৭.৪.৭.২.৩ : আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে আধুনিক (বা পাশ্চাত্য) শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা ১৮১৩ সালে চার্টর আইনের মাধ্যমে। এই আইনে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা সরকার ঘোষণা করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। এরপর সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগেই শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হয়। ১৮৩৫ সালে

General Committee of Public Instruction' এর সভাপতি টমাস বাবিংটন মেকলের প্রচেষ্টায় সরকার ইংরজী শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়। উইলিয়াম অ্যাডাম ও চার্লস উড উভয়েরই শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে কিন্তু দেশীয় ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের কথাও এই প্রতিবেদনগুলিতে বলা হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঔপনিবেশিক শাসকরা মনে করত যে ভারতীয় উচ্চবর্গীয় শ্রেণীগুলির জন্য যেমন বিশিষ্ট ধরনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ ভারতীয়দের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সরকার। সাম্রাজ্যের স্বার্থেই শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিমাণে গণপ্রসার উচিত বলে সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী মনে করতো।

উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার ১৮৫৭ সালে কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে গঠন করা হয়। Charles Wood-এর প্রতিবেদনে যে তিনটি মূল বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় তার একটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। অন্য দুটি ছিল একটি পৃথক শিক্ষা দপ্তর স্থাপন করা ও সরকারী গ্রান্ট-ইন-এইড এর ব্যবস্থা করা। ১৮৫৮ সালে ভারতীয় সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরকারি ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ার পর ইংল্যান্ডের ভারত সচিব (Secretary of State for India) উডের শিক্ষা প্রতিবেদনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেন।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ বৃদ্ধির যে লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থাকা উচিত নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেই মান বা উৎকর্ষতা কিন্তু ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অচিরেই পরীক্ষা নেওয়ার যন্ত্রে রপান্তরিত হয়। নারী, তপশীলি ও উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার কাজও চূড়ান্ত অবহেলিত হয়। কলেজ শিক্ষার প্রসার ঘটলেও শিক্ষার মান ছিল নিম্নগামী। ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। লর্ড রিপন এই প্রেক্ষাপটে স্যার উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন (১৮৮২ খ্রীঃ)। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করে, ''The University degree has become an accepted object of ambition, a passport ot distinction in public services and in the learned professions.''। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। বিদ্যালয় স্তরের এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গ্রহণ করতো, যাদের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে অতি সামান্য ধারণাই ছিল। এই বাস্তব ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) ইংরাজী নির্ভর উচ্চশিক্ষা ও মাতৃভাষা নির্ভর জনশিক্ষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছি তা দূর করার চেষ্টা করে। কমিশনের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, ''It is desirable that the whole population of India should be literate.'' কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্য এই বিশেষ বরাদ্দ খরচ করার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সুপারিশগুলি খুব বেশী কার্যকরী হয়নি। যেমন বর্ণ নির্ভর ভারতীয় সমাজে নিম্ন বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো কঠিন ছিল। কারণ নিম্নবর্ণভুক্ত ছেলেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণভুক্ত ছেলেদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারতো না। ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীও এই বৈষম্য দূর করতে খুব বেশী আগ্রহী ছিল না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''This exclusion happened with the active support of the colonial bureaucracy, succumbing in the name of practicality to the pressures of the conservative sections

of the Indian elite, many of whom had by now become grass-roots level functionaries of the emprie. British education policy thus endorsed and supported differentiation in Indian society." B.T. McCully-র হিসাব অনুযায়ী ১৮৮৫ সালে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয় সংখ্যা ছিল ৫৫,০০০। ১৮৮১-৮২ সালে যেখানে মোট ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল ১৫ মিলিয়ন, সেখানে মাত্র ২ মিলিয়ন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। শিক্ষার এই অসম বিকাশ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল।

ঊনিশ শতকের প্রবর্তিত ও প্রসারিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন প্রয়োগিক বিদ্যার জনপ্রিয়তা না পাওয়া। শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত বিদ্যাচর্চায় খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। প্রচলিত শিক্ষা বা বিদ্যাচর্চার অভ্যাস থেকে বাঙালী বা ভারতীয়রা অন্য ধরনের কোন অনুশীলন করতে চায়নি। আবার এটিও সত্য যে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রাই কিন্তু ঔপনিবেশিক নীতি ও মতাদর্শকে প্রশ্ন করেছে। শিক্ষিত ভারতীয়রা ক্রমশঃ এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে যে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ধারণা বা যুক্তি, সাম্য বা আইনের শাসনের সাদৃশ্য সামান্যই। ফলে ঔপনিবেশিক শাসকরা যে ধরনের আধিপত্যমূলক প্রক্রিয়ার সহায়ক রূপে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা বাস্তবে খুব বেশী কার্যকরী হয়নি। সুতরাং ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিবর্তনের মধ্যে নানা টানাপোড়েন ছিল। ইংল্যান্ডে শিক্ষার মাধ্যমে যে ধরনের নৈতিকতার শিক্ষাও দেওয়া হত ভারতে তা কখনই সম্ভব ছিল না। বরং শিক্ষিত ভারতীয়রাই শিক্ষার মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেন হয়ে ওঠে যা দীর্ঘমেয়াদীভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল।

৭.৪.৭.২.৪ : মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

ঊনিশ শতকের বিশেষত ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস-এর অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বা মুঘল আমলে ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অর্থে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পূর্ণ অর্থে ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়া থেকে জাত। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্যা গবেষণা হল বি.বি. মিশ্রর 'The Indian Middle Classess : Their Growth in Modern Times'। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক যেমন ক্রিস্টোফার বেইলি মনে করেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার আগেই অষ্টাদশ শতকে কৃষি সমাজ ও উচ্চবর্গীয় এলিটদের মধ্যে মধ্যবর্তী সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এরা সরকারী আমলা শ্রেণীর ভদ্রলোক বা বণিক গোষ্ঠী হতে পারে যারা পরবর্তীকালের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ প্রসারণের সুযোগে নিজেদের শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত অবস্থান সুদৃঢ় করে। ইংরাজী শিক্ষা, সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক পেশার পূর্ণ সুবিধা এই নবউত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম আত্মসাৎ করে।

আবার শুধুমাত্র সরকারী চাকুরী বা মুৎসুদ্দি/বেনিয়াবৃত্তি নয়, পূর্ব ভারতে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সুযোগে ভূমির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্ক দৃঢ় হয়। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভূমি বন্দোবস্ত

ও ঔপনিবেশিক চাকুরী এই দুই-এর সুবিধা মধ্যবিত্তরা পায়, নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান সবল করে এবং ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোকে এক ধরনের বৈধতা দান করে। J.R. McLane-এর হিসেব থেকে দেখা যায় উনিশ শতরে শেষে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৮৮০-এর দশকের শুরুতে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫০,০০০। ১৯০৭ সালে তা পৌঁছয় ৫০৫,০০০ তে। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের প্রসারও সমভাবে ঘটতে থাকে। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও ঔপনিবশিককতার কল্যাণে একাধিক নতুন বৃত্তির জন্ম হয় যেগুলির সমভাবে ঘটতে থাকে। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও ঔপনিবেশিকতার কল্যাণে একাধিক নতুন বৃত্তির জন্ম হয় যেগুলির অস্তিত্ব প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে ছিল না। যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আইন ব্যবসা দ্রুত জনপ্রিয় হয়। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, ১৮৫৮-৮১ এর মধ্যে বাংলায় ১৭১২ জন স্নাতকের মধ্যে আইন ব্যবসা দ্রুত জনপ্রিয় হয়। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, ১৮৫৮-৮১ এর মধ্যে বাংলায় ১৭১২ জন স্নাতকের মধ্যে ৪৬৬ জন আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শিক্ষা প্রসারের মধ্যেও কিন্তু সামাজিক বৈষম্য ছিল। ১৮৮৩-৮৪ সালে বার্ষিক আয় ২০০ টাকার কম এমন পরিবার থেকে আগত ছাত্রের সংখ্যা বাংলাদেশের কলেজের ৯ শতাংশের কম। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা সমাজের নিচের তলার শ্রেণীগুলিকে খুব অল্পই স্পর্শ করেছিল। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ছাড়াও, আঞ্চলিক বৈষম্যও ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল কলকাতা, বোম্বে বা মাদ্রাজের মতন ব্রিটিশ প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিতে। ১৮৮৬-৮৭ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাদ্রাজে শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা ১৮,৩৯০, বাংলায় ১৬,৬৩৯, বোম্বেতে ৭,১৯৬ জন, সেখানে যুক্তপ্রদেশে ৩,২০০, পাঞ্জাবে ১৯৪৪, সেন্ট্রাল প্রভিন্সে ৬০৮ ও আসামে ২৭৪ জন। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষাও একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ও কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যও ছিল। হিন্দুরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ও মুসলিমরা পিছিয়ে পড়ে। এমনকি হিন্দু নিম্নবর্ণের মানুষরা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেননি। ১৮৮৩-৮৪ সালে বাংলায় কলেজ ছাত্রদের ৮৪.৭ শতাংশই আসত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার থেকে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মধ্যবিত্তদের সামাজিক গঠনে এই আর্থিক, ধর্মীয় বা বর্ণগত বৈষম্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেহারা আমরা দেখতে পাই তা প্রধানত ইংরাজী শিক্ষিত বর্ণহিন্দু (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য) শ্রেণীদের নিয়ে গঠিত; নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ এই সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল না বললেই চলে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বরূপ সম্পর্কে এক ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্রিস্টোফার বেইলি ও ডেভিড ওয়াশব্রুকের মতন কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা। বেইলির মতে এলাহাবাদের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আইনজীবী ও অন্যান্য বৃত্তিভোগীরা দেশীয় শেঠ, ব্যাঙ্কার, জমিদার প্রভৃতি প্রভাবশালী শ্রেণীগুলির অনুগৃহীত। এই সম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীতের সম্পর্ক মাত্র। ডেভিড ওয়াশব্রুক মাদ্রাজের ক্ষেত্রে ও ক্রিস্টিন ডবিন বোম্বাই-এর ক্ষেত্রে এই একই ধরনের পৃষ্ঠপোষক অনুগৃহীতের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। এই জাতীয় আদর্শ বর্জিত স্বার্থ-নির্ভর নেমিয়ারিস্ট ইতিহাস ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া কঠিন। তপন রায়চৌধুরী এই জাতীয় ব্যাখ্যাকে 'animal politics' এর সাথে তুলনা করেছেন। স্বদেশে প্রেমের কোন উপাদান

বা জাতীয়তাবাদের কোন মহৎ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায় কেম্ব্রিজগোষ্ঠীর কাছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা নিতান্তই অনুজ্জ্বল বলে মনে হয়েছে। নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরাও মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে সন্দিহান। তাদের লেখায় মধ্যবিত্তরা দেশজ এলিটদের অংশ এবং এলিট বা সাবল্টার্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্বই ভারতীয় ইতিহাসের মৌলিক চালিকাশক্তি। এই ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। এর ফলে এটা ভোলা সহজ হয় যে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বদেশিকতকা ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ মেয়াদী সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত (প্রাথমিক পর্যায়ে) ও রাজনৈতিক (উচ্চতর পর্যায়ে) সংগ্রাম গড়ে তোলে। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী তার গর্বিত গঠন সত্ত্বেও একদিকে যেমন তার আত্মসত্ত্বা খুঁজে পাওয়ার জন্য ছেদহীন ভাবে সচেষ্ট ছিল, অন্যদিকে তেমনি অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে যাকে আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ধাপ বলে অভিহিত করতে পারি।

স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও পড়েছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। এটি ছিল মূলতঃ জমিদার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। প্রথম সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব। জন ম্যাকসুয়ারের হিসেব অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮৫ ভাগ ধনী, ৬৮ ভাগ হয় জমিদার নয় ব্যবসায়ী। বর্ণগত ভাবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল পঞ্চাশ টাকা যা দেওয়া মধ্যবিত্তদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রসারের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে এবং নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান লীগ ও ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যবিত্তশ্রেণী নির্ভরতা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্ডিয়ান লীগের কর্মকতর্কাদের ৬৮ শতাংশ মধ্যবিত্ত, ৩৮ শতাংশ আইনজীবি, ১৪ শতাংশ ছোট বা মাঝারি জমিদার, শিক্ষক, কর্মচারী প্রমুখ। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, প্রথমতঃ এর সদস্যরা অনেকেই পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সদস্যরা অনেকেই গোঁড়া হিন্দু নয়, খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম ঘেঁষা। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ইন্ডিয়ান লীগের তুলনায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অনেক বেশী মধ্যবিত্ত নির্ভর। নেতৃত্ব স্থানীয়দের শতকরা ৩৩ ভাগ ছিল শিক্ষক ও শতকরা ৩৫ ভাগ ছিল আইনজীবী। ধর্মীয় ভাবে ব্রাহ্মণদের প্রভাব অনেক বেশী ছিল। আবার শিক্ষাগত বিচারে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, ''...শিক্ষা, বৃত্তি, মানসিকাত এঁদের মধ্যে অনেক বেশী সংহতি দিয়েছিল।''

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সম্ভবত প্রথম মধ্যবিত্ত সংগঠন যারা কৃষকদের সম্পর্কে সংগঠিত মতামত জানায়। ১৮৮৪ সালে প্রজাসত্ত্ব আইনের খসড়ার বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদ জানায়। কলকাতার বাইরেও এরা সাংগঠনিক বিস্তার লাভ করে। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৫-এর মধ্যে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখা দশ থেকে আশীতে দাঁড়ায়। লর্ড লীটনের আমলে নানা দমনমূলক নীতি যেমন অস্ত্র আইন, দেশীয় সংবাদপত্র আইন প্রভৃতির কারণে ভারতীয় রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করে।

বোম্বাই শহরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংগঠন ছিল দাদাভাই নৌরজি প্রতিষ্ঠিত (১৮৬৬) ইস্ট ইন্ডিয়া

অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৬৯ সালে বোম্বাই শহরে এর শাখা খোলা হয়। এই সময়ে বোম্বাই শহরের প্রভাবশালী সংগঠন ছিল বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন। বোম্বাই শহরের প্রভাবশালী বণিক ও শেঠিয়ারা এর নেতৃত্বে ছিল। অচিরেই পৌর কর প্রভৃতি নিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে শেঠিয়াদের বিরোধ শুরু হয়। বোম্বাই পৌরসভাতেও শেঠিয়াদের প্রাধান্য ছিল। এরা সম্পত্তি কর দিতে চাইত না। অন্তত ১৮৮২ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে ভোটাধিকার না থাকায় বণিক-শেঠিয়া প্রমুখ সম্পত্তিবান শ্রেণী, নিজ শ্রেণী স্বার্থ অনুসারে পৌর নীতি রচনা করত। বোম্বাই শহরের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপন শ্রেণী স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ হয়। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় বোম্বে প্রেসিডেন্সী ইউনিয়ন। অনিল শীল বোম্বে প্রেসিডেন্সী ইউনিয়নের কার্যকলাপে খুব বেশী সক্রিয়তা দেখতে পাননি। এমনকি বোম্বাই শহরের বাইরে এদের কোন শাখা স্থাপনের নজিরও দেখতে পাওয়া যায় না। তুলনামূলকভাবে পুণাকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক চেতনার সংগঠিত প্রকাশ অনেক তীব্র ছিল। অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন ১৮৭৯ সালেই রিচার্ড টেম্পল পুণার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তার সংগঠিত প্রকাশ পুণা শহরে যে মাত্রায় পৌঁছেছিল তা মহারাষ্ট্রে বিরল। এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পুণার ঐতিহ্যবাহী চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা। বাংলায় যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা ইংরাজী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন, মহারাষ্ট্রে তা করে চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা। ইংরাজী শিক্ষার জোরে সরকারী চাকুরীর সিংহভাগ এরা করায়ত্ত করে। সরকারী চাকুরী ছাড়াও আইন, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা প্রভৃতি পেশাতেও চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েন। পেশওয়াদের প্রাক-ঔপনিবেশিক মারাঠা স্বাদেশিকতার প্রভাবও উনিশ শতকের চিৎপাবন ব্রাহ্মণজের উপরে পড়েছিল।

একদিকে দেশজ স্বাদেশিকতা, অন্যদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব—এই দুই এর মধ্য থেকে জন্ম নেয় পুণা সার্বজনিক সভা (১৮৬৭)। পুণা সার্বজনিক সভার নেতাদের মধ্যে অগ্রহণ্য ছিলেন নাটু ভ্রাতৃদ্বয়। গোপালহরি দেশমুখ, জি.ভি. দোশী এবং সর্বোপরি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। এই সভার কার্যকলাপের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একদিকে যেমন স্বাদেশিকতার প্রসার ঘটানো, অন্যদিকে তেমনি কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা। ১৮৭২ ও ১৮৭৬-৭৭ ও মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা দিলে সভার সদস্যরা ত্রাণ কার্যে নামে। শুধু তাই নয়, কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার কারণ খতিয়ে দেখার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই দিক থেকে দেখতে গেলে পুণা সার্বজনিক সভা তার শ্রেণী গণ্ডিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, স্বভাবতই যা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুবাদে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ও নতুন ধরনের বৃত্তির ও চাকুরী সৃষ্টি হয়; এই প্রক্রিয়া থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গর্ভ থেকে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও এই উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণীর দুটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুদৃঢ় দেশজ শিকড় ছিল। দেশের ঐতিহ্যকে এরা ভোলেননি। দ্বিতীয়তঃ ঔপনিবেশিক শাসন ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রথম সুসংবদ্ধ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমালোচনা উপস্থিত করে। এই প্রক্রিয়ার সাংগঠনিক ফল ছিল ১৮৮৫-র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রতিষ্ঠা।

৭.৪.৭.২.৫ : বর্ণ আন্দোলন

ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটি একটি বর্ণ ভিত্তিক সমাজ। অর্থাৎ সমাজ একাধিক বর্ণে বিভক্ত ও সমাজে এক একটি বর্ণের অবস্থান এক-এক ধরনের। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতিরা উচ্চবর্ণের। উচ্চ বর্ণের মানুষরা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে। এমনকি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হলে সমাজের অগ্রহণী অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যরাই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা, সরকারী চাকুরী প্রভৃতি আত্মসাৎ করে। নিম্নবর্ণের মানুষরা ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বৈষম্য পুরোপুরি বিদ্যমান থাকে।

ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বৈষম্য সত্ত্বেও এই সমাজ কিন্তু অনড়, অচল, গতিহীন নয়। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক M.N. Srinivas লক্ষ্য করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নিচের তলার শ্রেণীগুলি সমাজের উপর তলায় উঠে এসেছে এবং মধ্য বা উচ্চবর্ণের সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে। এই প্রক্রিয়াকে M.N. Srinivas সংস্কৃতায়ন বা 'Sanskritization' বলে অভিহিত করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা বর্ণব্যবস্থাকে ধ্বংস না করে তাকে নতুন জীবন দান করে। ১৯০১ সালের জনগণনা থেকে ঠিক হয় ভারতীয় সমাজে প্রতিটি বর্ণের অবস্থানকে লিপিবদ্ধ করা হবে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতে নানা ধরনের বর্ণ-ভিত্তিক সংগঠন বা caste association গঠিত হতে শুরু হয়। এর থেকে বোঝা যায় বর্ণ সংহতি নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। এই উদীয়মান বর্ণ সংগঠনগুলির লক্ষ্য ছিল তাদের বর্ণের মানুষের জন্য সরকারী চাকুরী, শিক্ষা, নির্বাচনী সংস্কার প্রভৃতি আদায় করা। শিক্ষা, চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য সংরক্ষণ চালু করার প্রয়াস এই প্রক্রিয়া থেকে জাত। নিম্নশ্রেণীর মানুষরা অনুধাবন করেছিল সংরক্ষণ চালু না হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

১৮৭৩ সালে মহারাষ্ট্রে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন জটিরাও ফুলে। গঠিত হয় সত্যশোধক সমাজ (১৮৭৩)। ফুলে মনে করতেন ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণেই শুদ্র প্রমুখদের কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার নেই। সুতরাং শুদ্রদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব শুধুমাত্র ব্রাহ্মণবাদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। জটিরাও ফুলে প্রথমে পুণা সার্বজনিক সভা ও পরে কংগ্রেস বয়কট করার কথা বলেন। নিম্নবর্ণের কৃষকদের সঙ্গেও তাঁর আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। Gail omvedt এর গবেষণা থেকে দেখা যায় সত্যশোধক আন্দোলনের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা ছিল। একদিকে ছিল উচ্চবর্ণ নির্ভর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী, অন্যদিকে ছিল গণনির্ভর র‍্যাডিকালিজম। এই আন্দোলনে একদিকে ছিল মারাঠাদের জন্য 'ক্ষত্রিয়ত্ব' খুঁজে বার করা, কোলাপুরের মহারাজার উপর নির্ভরশীলতা এবং ১৯১৯ সালের পর থেকে কংগ্রেস বিরোধিতা। এইগুলি সবই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ। অন্যদিকে ছিল গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে বর্ণ আন্দোলনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, ইংরাজীর পরিবর্তে মারাঠা ভাষার ব্যবহার এবং উচ্চবর্ণের সুবিধা আদায় করার থেকে অনেক বেশী বর্ণ ব্যবস্থাকেই আক্রমণ করা। এই দ্বিতীয় ধারাটি ছিল অনেক বেশী Popular বা গণচরিত্রের। এমনকি ১৯১৯-২১ পর্যন্ত সাতারাতে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তার পিছনেও নিম্নবর্গীয় বর্ণচেতনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের গণভিত্তি প্রসারের ক্ষেত্রে এই নিম্নবর্গীয় আন্দোলন সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে ভেল্লা ও দ্রাবিড় আত্মপরিচয়কে কেন্দ্র করে নিম্নবর্ণের মানুষরা সংঘবদ্ধ হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ব্রাহ্মণরা ছিল জনসংখ্যার ৩.২ শতাংশ, অথচ ১৮৭০ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা স্নাতক হন তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছিল ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে তামিল ভেল্লা, তেলেগু রেড্ডি ও কাম্মা ও মালয়লী নায়াররা। শিক্ষার উপর আধিপত্য থাকার সুবাদে সরকারী চাকুরী উপরও ব্রাহ্মণদের বিপুল আধিপত্য ছিল। সরকারী চাকুরীর ৪২ শতাংশ ছিল ব্রাহ্মণদের দখলে। তামিল ভেল্লা সম্প্রদায় এই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও তামিল ভাষা। উত্তর ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির থেকে দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও তামিল ভাষাকে পৃথক সত্ত্বা, প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য প্রদান করার চেষ্টা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেন রেভারেন্ড Robert Caldwell ও G.E. Pope-এর মতন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। এই প্রক্রিয়াকে জোরদার করে আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্ব। সামগ্রিক ফল হিসেবে জন্ম নেয় তামিল ভাষা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্ফূরণ যাকে 'empowering discourse' বলে অভিহিত করা যায়। এর মূল লক্ষ্য ছিল একটি অ-ব্রাহ্মণ পরিচয় বা non-brahman identity গড়ে তোলা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটে Justice Party গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৯১৬ সালে অ-ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক দল রূপে Justice Party গঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই দল কংগ্রেসকে ব্রাহ্মণ্যবাদী বলে চিহ্নিত করে। রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এবং অব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক নির্বাচনী সংরক্ষণ দাবী করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা এই দাবীকে সমর্থন করে ও ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারে এই দাবী মেনে নেওয়া হয়। ১৯২০ সালের নির্বাচনে Justice Party নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৯৮টি আসনের মধ্যে ৬৩টি জয় লাভ করে। এরপর থেকে Justice Party-র অবক্ষয় শুরু হয় কারণ নিম্নবর্গীয় মানুষের থেকে Justice Party ক্রমশঃ দুরে সরে যায়। ১৯২৬ সালের নির্বাচনে Justice Party-র পতন ঘটে, M.C. Rajah-এর নেতৃত্বে নিম্নবর্ণের মানুষরা Justice Party পারিত্যাগ করে। গান্ধীবাদী আন্দোলন (আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো) দক্ষিণ ভারতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে।

দেশের অন্যান্য প্রান্তেও নিম্নবর্ণের মানুষরা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। ১৮৭২ সাল থেকে বাংলায় নমঃশুদ্র আন্দোলন অন্যতম যা পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে social protest movement বা সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন বলে চিহ্নিত করছেন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মাহার সম্প্রদায়ের ডঃ বি. আর. আমবেদকর নিম্নবর্ণের মানুষদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাবীতে বিপুল ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে। আমবেদকর ১৯২৭ সালে ডিসেম্বরে মনুস্মৃতিকে আগুনে দাহ করেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে দলিতদের জন্য কোন উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। দলিতদের উন্নতির জন্য প্রয়োজন রাজনীতি ও শিক্ষায় দলিতদের বেশী করে অংশগ্রহণ। এই বস্তুত নিছক ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দলিত আত্মসত্ত্বার পঠাত্ত্বর।

কংগ্রেসের পক্ষে এই 'দলিত জাগরণ'কে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে যে প্রস্তাব নেওয়া হয় তাতে অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা বলা হয়। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনগত ভাবে সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্যদের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। এর ফলে দলিত আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

বিরূপ থেকে যায়। ১৯৪৫ সালে আমবেদকর দলিতদের পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় (separate political identity) দাবী করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে কংগ্রেসের যে গণভিত্তি ছিল দলিত সংগঠনগুলির তা ছিল না। এমনকি ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে জাতীয় কংগ্রেস দলিতদের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করে। আমবেদকরের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি একে 'crisis of representation' বলে অভিহিত করেন ও গণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু সংগঠনের অভাবে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্রুত স্তিমিত হয়ে পড়ে।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে দলিত আন্দোলন ও নিম্নবর্ণের মানুষের চেতনার প্রকাশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পৃথক দলিত চেতনার প্রকাশ নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামো ও চিন্তা চেতনাকে উৎপাটিত করা গান্ধীর নেতৃতাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছিল না। পৃথক দলিত চেতনা ও বর্ণ আন্দোলন জাতীয়তাবাদের অপুর্ণঙ্গতার নিদর্শন মাত্র। আবার এটাও সত্যি যে দলিত চেতনা জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের মতন গণভিত্তি বা mass base অর্জন করতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় নেওয়ার চেষ্টা করতো। ইতিহাসের গতি কখনও যে একমুখী হয় না, বরং তা অজস্র চড়াই-উতরাই-এর মধ্য দিয়ে যায় তার নিদর্শন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও বর্ণ আন্দোলনের টানাপোড়েন। বস্তুতঃ বর্ণ আন্দোলন জাতির বহুস্তরের সচেতন অস্তিত্বকে তুলে ধরে।

৭.৪.৭.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Smit Sarkar : Modern India 1885-1947.

২। Bipan Chandra : India's Stuggle For Independence.

৩। Sekhar Bandyopadhyay : From Plassey to Partition.

৪। অমলের ত্রিপাঠী ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭।

৫। Suman Bagly : Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age.

৭.৪.৭.২.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। তুমি কি মনে করো যে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ভারতের চিরাচরিত সমাজ পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল?

২। উনিশ শতকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

৩। ঔপনিবেশিক শিক্ষা নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৪। ঊনিশ শতক ও বিংশ শতকের ভারতে বর্ণ আন্দোলনের বিকাশ কি ভাবে হয়েছিল? বর্ণ আন্দোলন কি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতাকে প্রকট করেছিল?

SOCIETY IN COLONIAL INDIA

ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)

একক-৮

ভারতের ইতিহাসে নারী

অবস্থা, সম্পত্তির অধিকার, সংস্কারমূলক আইন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

বিন্যাস ক্রম

৭.৪.৮.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.৪.৮.২.১ : ভূমিকা

৭.৪.৮.২.২ : নারীদের অবস্থা

৭.৪.৮.২.৩ : নারী শিক্ষাব্যবস্থা

৭.৪.৮.২.৪ : নারী সংগঠন

৭.৪.৮.২.৫ : নারীদের আইনী অধিকার ও সংস্কারমূলক আইন সমূহ

৭.৪.৮.১.৬ : ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় নারীর ভূমিকা

৭.৪.৮.১.৭ : উপসংহার

৭.৪.৮.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.৮.১.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৪.৮.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা

(২) নারীজাতির শিক্ষাব্যবস্থা

(৩) নারীজাতির নিজস্ব সংগঠন

(৪) নারীদের আইনী অধিকার

(৫) ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় নারীর ভূমিকা

(৬) ভারতীয় নারারী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা

৭.৪.৮.১.১ : ভূমিকা

ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে নারীর অবস্থাকে প্রান্তিক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সামজ কাঠামোতে নারীর আইনী অধিকার ছিল না বললেই চলে। আইনী কাঠামোর বাইরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুরুষতন্ত্রের প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত। দু একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে পুরুষদের অবস্থান ছিল মেয়েদের তুলনায় উঁচুতে।

ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ইংরেজী শিক্ষার সূচনা, rule of law বা আইনের শাসনের ধারণা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ— এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে সীমাবদ্ধ আকারে হলেও কিছু পরিবর্তন শুরু হয়। প্রথম পরিবর্তন আসে বর্ণ ব্যবস্থায় সচলতা সৃষ্টির মধ্যে। দ্বিতীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে নারীদের অবস্থার ক্ষেত্রে। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নারীদের অবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা উপস্থিত করা।

৭.৪.৮.১.২ : নারীদের অবস্থা

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে নারীরা ছিল সমাজের প্রান্তিক শক্তি। প্রথমতঃ ইতিহাস চর্চাতেও নারীদের অবস্থার উল্লেখ খুব বেশি থাকত না। ভারতী রায় মন্তব্য করেছেন, ''women have long been pushed to the seams of history. The marginalization of women, both in mainstream history and in society, has been a political act.'' এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন জানিয়ে বলা যায় নারীদের প্রান্তিকতা কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়াও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঔপনিবেশিক ভারতে নারী প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করবো।

ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার এবং আধুনিকতার ধারণা আসার পর থেকে নারী প্রশ্ন ভারতীয় চিন্তায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নারী প্রশ্ন কিভাবে 'আধুনিকতার' ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার আগে আমাদের নারীর প্রান্তিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা দরকার। ভারতীয় সমাজ মুখ্যত পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ সমাজে পুরুষদের অবস্থান, মর্যাদা ও অধিকার নারীদের তুলনায় উঁচুতে। সনাতন ভারতীয় সমাজে নারী তাই সম্পূর্ণ অর্থে অধিকারশূন্য। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তার উদাহরণ খুব কম। রাজনৈতিক জীবনে নারীদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। স্বাধীনতার আগে কংগ্রেসের সভাপতি পদে তিনজন মাত্র মহিলা আসীন হয়েছেন—প্রথমজন অ্যানি বেসান্ত (১৯১৭), দ্বিতীয়জন সরোজিনী নাইডু (১৯২৫), তৃতীয়জন নেলী সেনগুপ্ত। এই রাজনৈতিক প্রান্তিকতা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রেও পরিব্যপ্ত ছিল। পরিবারের কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও সচরাচর মহিলাদের মতামত নেওয়া হত না। সম্পত্তির অধিকার মেয়েদের ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে নাবালিকা অবস্থায় মেয়েদের বিবাহ না হলে জাতিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে সতী প্রথার প্রচলন ছিল। পুরুষরা একাধিক বিবাহ করতে পারতো। শিক্ষার অধিকার শুধুমাত্র পুরুষদের ছিল, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা

বিস্তারের কোন সংগঠিত উদ্যোগ প্রাক-ঔপনিবেশিক সনাতন ভারতীয় সমাজে দেখতে পাওয়া যায় না। এক কথায় বলতে গেলে নারীরা বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণের হিন্দু নারীরা এক অস্বাভাবিক প্রান্তিক অবস্থায় দিনযাপন করতে বাধ্য হত। নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে মেয়েদের অবস্থা অনেকটাই অন্যরকম ইতিবাচক ছিল। অর্থনৈতিক কারণেই নিম্নবর্ণের মেয়েরা 'বাইরের' কাজে অংশগ্রহণ করত। উচ্চবর্ণের মেয়েদের মতন তাদের 'ঘরে' আটকে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার ফলে যখন তথাকথিত নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে লাগলো তখন কিন্তু এদের মধ্যেও উচ্চবর্ণের রক্ষণশীলতার ছোঁয়া লাগতে শুরু করে। বস্তুত এগুলি ছিল নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বারা উচ্চবর্ণের মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক সাংস্কৃতিক আচার আচরণকে অনুকরণ করা মাত্র। নিম্নবর্ণের মানুষদের মনে হত মেয়েদের প্রান্তিকতায় রাখতে পারলে বোধহয় উচ্চবর্ণের মতন সামাজিক মর্যাদা লাভ করা সম্ভব। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় নারীদের অবস্থার পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনে আধুনিকতার ভূমিকা আদৌ কোন একমাত্রিক ও জটিলতাহীন প্রক্রিয়া ছিল না। নারী প্রশ্ন ও নারীর সমতায়নকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা' বা 'colonial modernity' র প্রেক্ষিতে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কোন বুর্জোয়া রূপান্তর উনিশ শতকে ঘটেনি। বরং ঔপনিবেশিকতাবাদের মাধ্যমে এক ধরনের সীমাবদ্ধ আধুনিকতা বাংলা, তথা ভারতবর্ষে আসে। ফলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক নানা উপাদান যেমন বর্ণগত, লিঙ্গগত প্রভৃতি বৈষম্য ভারতীয় সমাজে টিকে ছিল। অর্থাৎ উনিশ শতকের ভারতবর্ষে আধুনিকতার বিস্তার ছিল বহুলাংশে খণ্ডিত ও খর্বিত। এই খণ্ডিত, খর্বির ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মধ্য দিয়েই নারী প্রশ্ন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে উঠে আসে।

তাত্ত্বিকভাবে চিরাচরিত ভারতীয় শাস্ত্র বা ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে নারীদের অবস্থা সুনির্দিষ্ট। Geraline Forbes-এর ভাষায়, "Indian texts essentialized women as devoted and self sacrificing, yet occasionally rebellious and dangerous. Texts on religion, law, politics and education carried different pronouncements for men depending on caste, class, age and religious sect. In contrast, women's differences were overshadowed by their biological characteristics and the subordinate, supportive role they were destined to play". অর্থাৎ নারীর ভূমিকা অধীনস্ত—সহযোগীর, ভারতীয় সমাজে কখনো কখনো নারীর ভূমিকাকে গৌরবান্বিত করে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম মাত্রা। সাধারণভাবে সমাজে নারীর ভূমিকা অবদমিত।

উনিশ শতকে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ আধুনিক ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নারীদের মধ্যে শিক্ষায় বিস্তার ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করার জন্য উচ্চবর্ণের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীরা প্রথম এগিয়ে আসে। এই সংস্কারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ রোধ, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য সংশোধিত ভূমিকা গ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজে এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে খাজা আলতাফ হুসেন হালি এবং শেষ মহম্মদ আবদুল্লা। এরা দুজনেই মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন। পশ্চিম ভারতে মেয়েদের উন্নতির জন্য এগিয়ে আসেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, বেহরামজী মালাবারী, ধুন্দু কেশব

প্রমুখরা। দক্ষিণ ভারতে আর, ভেঙ্কট রত্নম নাইডু দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। ভীরাসালিঙ্কম লন্টুলু বিবাহ সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হন।

সুমিত সরকার এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে ''সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত'' বলে অভিহিত করেছেন, কারণ মেয়েরা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সমান সহযোগী শক্তি হিসেবে ছিল না। সংস্কার প্রক্রিয়া যেন উপর থেকে পুরুষরা মেয়েদের উপর আরোপ করেছিল। এই সমালোচনার যথার্থ স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় ১৯ শতকের ভারতীয় নারীর পরিবর্তন কিন্তু এই সীমাবদ্ধ প্রক্রিয়া থেকেই শুরু হয়েছিল।

৭.৪.৮.১.৩ : নারী শিক্ষাব্যবস্থা

নারী শিক্ষার প্রসার ছিল ১৯ শতকের নারীর সাাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রথমে সোপান ১৯ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে Calcutta School Society নারী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ১৮১৯ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা Calcutta Fermale Juvenile Society গঠন করে। এরপর Church Missionary Society নারী শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসে। এদের লক্ষ্য ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। কিন্তু প্রথম দিকে এই প্রয়াস খুব বেশি সাফল্য পায়নি। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ ভারতে Church Missionary Society সাফল্য অর্জন করে। বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসেন গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল সদস্য বেথুন। তার উদ্যোগে ১৮৪৯ সালে তৈরী হয় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই স্কুলের সেক্রেটারি। ১৮৬৩ সালে এই স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩; এর মধ্যে তিন চতুর্থাংশই ছিল নিম্নবর্ণের। এর থেকে স্পষ্ট যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তখন পর্যন্ত নারী শিক্ষা প্রসারে তাদের রক্ষণশীলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

স্যার চার্লস উডের পেশ করা প্রতিবেদনেও (১৮৫৪) নারী শিক্ষার বিস্তারে জোর দেওয়া হয়। শিক্ষিত সংস্কারমুখী ভারতীয়রাও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নারী শিক্ষার বিস্তারে তুলনামূলকভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে অগ্রহণী ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে শিক্ষিত ব্রাহ্মরা নারী শিক্ষা বিস্তারে সংগঠিত ভূমিকা নেয়। ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু ভারতে প্রথম মহিলা হিসেবে বি. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন।

দক্ষিণ ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি বেসান্ত মনে করতেন শুধুমাত্র নারী শিক্ষার বিস্তারই যথেষ্ট নয়। বরং পাশ্টাত্য শিক্ষাদর্শের জায়গায় দরকার সঠিক ভারতীয় মননশীলতার উজ্জীবন। উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দের নেতৃত্বে আর্য সমাজ নারী শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়। ১৮৯০ সালে নারী শিক্ষার জন্য আর্যকন্যা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের রিপোর্টে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য একাধিক পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়। যেমন উদার গ্রান্ট-ইন-এড এর ব্যবস্থা করা ও যোগ্য মেয়েদের জন্য বৃত্তি পুরস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। পশ্চিম ভারতে বম্বে ও পুনাতে পণ্ডিত্য সরস্বতীর উদ্যোগে গঠিত হয় সারদা সদন (১৮৮৯) এবং ডি. কে. কার্ভের উদ্যোগে পুনাতে বিধবাদের জন্য বিদ্যালয় (১৮৯৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। রমাবাই সরস্বতীর লেখা 'The High

Caste Hindu Woman' প্রায় দশ হাজার কপি বিক্রি হয়। ১৮৯৭ সালে পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টির নাম ছিল মুক্তি।

রমাবাই এর চিন্তার দুটি লক্ষ্যণীয়। এক বর্ণ প্রথাকে তিনি হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড় ত্রুটি বলে মনে করতেন। বর্ণপ্রথা হিন্দু সমাজের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের পথে মারাত্মক বাধা। দ্বিতীয়ত, রমাবাবই শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে পাঠক্রমের কথা ভেবেছিলেন তাতে একদিকের যেমন শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ছিল অন্যদিকে তেমনি মুদ্রণবিদ্যা, কাঠের কাজ, সেলাই প্রভৃতি প্রয়োগিক বিদ্যাও শেখানো হত।

১৮৯৩ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় মহাকালী পাঠশালা, এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাণী তপস্বিনী। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষিত করা যাতে হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণ হয়। মহাকালী পাঠশালায় সহ শিক্ষার প্রথাও অনুমোদন করা হয়নি। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার ও দেশজ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ছিল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ছিল সনাতন হিন্দু সমাজের অনুসারী। অচিরেই কোলকাতার হিন্দু ভদ্রসমাজে মহাকালী পাঠশালা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। ১৯১১ সালে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল উর্দু রোকেয়া রচিত তিনটি প্রবন্ধ—অর্ধাঙ্গিনী, গৃহ এবং বোরখা—থেকে মেয়েদের সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার প্রকাশ ঘটে। 'সুগৃহিনী' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন একমাত্র শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়েই মেয়েদের অবস্থা পাল্টাতে পারে। বেগম রোকেয়ার বিদ্যালয়ে প্রচলিত বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হত।

দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের জন্য শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসেন সিস্টার শুভলক্ষ্মী (১৮৮৬-১৯৬৯)। শুভলক্ষ্মী প্রথম হিন্দু বিধবা হিসেবে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯১১)। ১৯১২ সালে সরকার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। নতুন বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সরকার ঠিক করে দেয়। এই প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ ১৯১৪ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় কুইন মেরী কলেজ। শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য মাদ্রাজে ১৯২২ সালে লেডি উইলিংডন ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রথম অধ্যক্ষা ছিলেন শুভলক্ষ্মী। বাল্যবিবাহের মতন কুপ্রথার বিরুদ্ধেও শুভলক্ষ্মী বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে উনিশ শতক এক অর্থে মেয়েদের শিক্ষা লাভের অধিকার অর্জনের শতক। শিক্ষার অধিকার আর ছেলেদের একচেটিয়া অধিকার হিসেবে রইল না। মেয়েরা আপন প্রচেষ্টায় তাদের স্বাধিকার অর্জন করে। বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং সর্বোপরি এমনভাবে পাঠক্রম তৈরী করে যাতে মেয়েদের বাস্তব জীবনে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। মেয়েদের আত্মপরিচয় অর্জনের এই প্রক্রিয়া দুটি ধাপে হয়। প্রথম ধাপ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, ভারতীয় শিক্ষিত পুরুষসমাজ নারী শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসে। দ্বিতীয় ধাপে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে মেয়েরাই শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসে। ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক ইতিহাসে

এই উত্তরণ প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নারী সংগঠনের বিস্তার ও নারীদের বিভিন্ন আইনী অধিকার অর্জনের লড়াই। উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় ভারতীয় নারীরা তাদের পৃথক সামাজিক সাংস্কৃতিক সত্ত্বা অর্জন করেছে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে। বিংশ শতকের সূচনায়, Geraldine Forbes এর ভাষায়, "Indian women were full participants in the redefinition of their futures".

৭.৪.৮.১.৪ : নারী সংগঠন

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং এক্ষেত্রে মেয়েদের স্বউদ্যোগের স্বাভাবিক পরিণাম ছিল মহিলা সংগঠন বা women organization এর বিকাশ। শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে মেয়েরা পারিবারিক গণ্ডী অতিক্রম করে এবং স্বকর্তৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে ব্রতী হয়। ভারতীয় নারীদের শিক্ষিত ও অগ্রণী অংশ উপলব্ধি করে মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী করতে না পারলে একদিকে যেমন মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না অন্যদিকে তেমনি মেয়েদের মতামত প্রকাশের কোনো জায়গা থাকবে না।

মেয়েদের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজে প্রথম এগিয়ে আসে কোলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও বোম্বেতে প্রার্থনা সমাজ। প্রার্থনা সমাজের প্রাণপুরুষ রাণাডে পণ্ডিতা রমাবাইকে আর্য মহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। রাণাডের স্ত্রীও এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর উল্লেখযোগ্য সংগঠন হিসেবে ভারত মহিলা পরিষদের কথা বলা যায়। ভারত মহিলা পরিষদের প্রথম সভানেত্রী ছিলেন লেডি ভালচন্দ্র; প্রথম সভায় অন্তত ২০০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এই সভায় রমাবাই রাণাডে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও সমানভাবে সমস্ত কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। পার্সি সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়েদের মধ্যে তৈরী হয় স্ত্রী জারোষ্টি মণ্ডল (Parsee Women's Circle) এর প্রথম সভাপতি ছিলেন Miss Serenmai M. Cursetjee। এই প্রক্রিয়ার ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় নারীদের জন্য একাধিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে সরলাদেবী চৌধুরাণী ভারতীয় নারীদের জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন তৈরীর কথা বলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে ভারতীয় নারীদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন দরকার। তাঁর নিজস্ব সংগঠন ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রথম সভা ১৯১০ খ্রীঃ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। সরলাদেবীর সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন শহর যেমন লাহোর, দিল্লী, করাচী, অমৃতসর, কানপুর প্রভৃতি শহরে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল জাতি, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে মেয়েদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা এবং মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। পুরুষ প্রভাবিত সংগঠনের বাইরে গিয়ে মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন নির্মাণ ও চেতনা বৃদ্ধির কথা প্রথম সরলাদেবীই এত জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেন। ভারত স্ত্রী মণ্ডল অনুধাবন করে যে মেয়েদের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক পাল্টে গিয়েছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সবচেয়ে জরুরী কাজ। নারী শিক্ষার বিস্তার ছাড়া পুরুষ শাসিত সমাজের রক্ষণশীলতা থেকে মেয়েদের মুকি পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে একাদিক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল গণ জাতীয়তাবাদ বা mass nationalism-এর

বিকাশ। এই একই সময়ে নারী আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। এই পর্বে অন্তত তিনটি সর্বভারতীয় নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইগুলি হল Women's Indian Association (WIA), National Council of Women in India (NCWI) এবং All-India Women's Conference (AIWC)। Women's Indian Association-এ ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় মহিলারাই সদস্য হতে পারতেন। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন এ্যানি বেসান্ত। সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন Margarate Cousins, Dorothy Jinarajadase, Malati Patwardhan, Ammu Swaminathan প্রমুখরা। WIA ধর্ম, বর্ণ, এবং সংস্কৃতি নির্বিশেষে নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করত। চারটি মূল জায়গার উপর জোর দেওয়া হত—ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, এবং সমাজসেবা। শিক্ষার প্রসারেও এই সংগঠন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ১৯১৭ সালে WIA ভারতসচিব মন্টেগুকে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়ার আর্জি জানায়। এই সংগঠনটি 'স্ত্রী ধর্ম' নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশ করত যেখানে মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে নানান তথ্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হত।

National Council of Women in India (NCWI) ছিল বিংশ শতকের অন্যতম প্রধান সর্বভারতীয় মহিলা সংগরঠন। ১৯২৫ সালে 'International Council of Women' এর জাতীয় শাখা হিসেবে NCWI প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার দোরাব টাটার স্ত্রী মেহরিবাই টাটা প্রচেষ্টায় বিশেষ উদ্যোগী হন। লেডি টাটা মনে করতেন পর্দাপ্রথা, বর্ণপ্রথা ও শিক্ষার অভাব মেয়েদের পিছিয়ে থাকা ও সামাজিক পরিবর্তনহীনতার সবচেয়ে বড়ো কারণ। NCWI এর বার্ষিক চাঁদা ছিল ১৫ টাকা, ফলে সাধারণ মহিলাদের পাশে এর সদস্য হওয়া সম্ভব ছিল না। জেরালডিন ফোর্বসের মতে এই সংগঠনটি বহুলাংসে রক্ষণশীল চরিত্রের ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও NCWI-র কোন যোগাযোগ ছিল না।

ভারতীয় নারীদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন ছিল All India Women's Conference বা AIWC। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে পুনা শহরে এই সংগঠনটি প্রথম মিলিত হয়। AIWC-এর প্রথম সমাবেশে ৮৭ জন স্থানীয় সদস্য, ৫৮ জন প্রতিনিধি এবং ২০০০ জন পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্রাগলির রাণীসাহেব এবং প্রথম সভাপতি হন বরোদার মহারাণী চিমনবাই সাহেব গাইকোয়াড। মহারাণী চিমনবাই মনে করতেন পর্দা প্রথা ও বাল্য বিবাহ মেয়েদের পিছিয়ে পড়ার অন্যমত কারণ। প্রথম সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যা ছিল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। এই সম্মেলনে থেকে দুটো জিনিস বেরিয়ে আসে। একদিকে যেমন মেয়েদের মধ্যে পেশাদারি শিক্ষার প্রসারে কথা বলা হয় অন্যদিকে তেমনি মেয়েদের মধ্যে 'নারী ধর্মের' উপযোগী শিক্ষার প্রসারের কথাও বলা হয়। AIWC মনে করত গ্রামীণ ভারতে নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার পুরুষদের মতই ছিল। এই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা দরকার। ১৯২৮ সালের সম্মেলনে AIWC এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে সামাজিক কুপ্রথা দূর করতে না পারলে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে মেয়েদের সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন AIWC র মূল এ্যাজেণ্ডায় পরিণত হয়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলেও এই সংগঠন তাতে অংশগ্রহণ করেনি এবং রাজনীতি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু এই সময় থেকেই সংগঠনের প্রসার ঘটতে থাকে। নারী শ্রম, গ্রামোন্নয়ন, দেশজ শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে AIWC চিন্তাভাবনা শুরু করে এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে।

১৯৩০-এর দশকের শেষ ও ১৯৪০ এর দশকের শুরুতে AIWC-এর সামনে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। অমৃত কাউর AIWC-এর রাজনীতিকরণের উপর জোরালো সওয়াল করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটি ভোজে খারিজ হয়ে যায়। AIWC মেয়েদের অধিকার সুনির্দিষ্ট করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মহিলা বিলের পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু মুসলিম সমাজে এই বিল জনপ্রিয় হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ১৯৪০-এর দশকে AIWC মহিলাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪১ সালে 'রশ্মি' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা AIWC প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সালে এর স্থায়ী কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭.৪.৮.১.৫ : নারীদের আইনী অধিকার ও সংস্কারমূলক আইন সমূহ

ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে একাধিক নারী সংগঠন তৈরী হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের আইনী অধিকার প্রথম মহিলা ছিল না বললেই হয়। বস্তুত দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় নারীরা কিছু পরিমাণে হলেও আইনী অধিকার অর্জন করে। মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার না থাকায় তারা ঔপনিবেশিক পর্ব প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাতে অংশগ্রহণ করতে পারছিল না। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় মেয়েদের অবহেলিত-অবদমিত অবস্থা আইনী অধিকার না থাকার মধ্য দিয়ে বেশি করে পরিস্ফুট হয়। ১৯৩৪ সালে AIWC সরকারের কাছে একটি কমিশন নিয়োগের আবেদন জানায়। বলা হয় এই কমিশনের লক্ষ্য হবে মেয়েদের আইনী অধিকার কিভাবে সুনিশ্চিত করা যায় তা খতিয়ে দেখা। তিনটি ক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়া হয়—উত্তরাধিকার, বিবাহ ও শিশুর অভিভাবকত্ব। AIWC মনে করত প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরী করা উচিত। AIWC-র লিগাল সেক্রেটারী রেণুকা রায় বলেন সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেয়েদের জন্য আইন তৈরী করা প্রয়োজন। রেণুকা রায়ের মতে এমন আইন প্রয়োজন যাতে মেয়েদের পারিবারিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং মেয়েরা পুরুষদের সাথে সমানভাবে সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৩০-র দশকে ঔপনিবেশিক সরকার মেয়েদের জন্য আইন করার কথা ভাবে ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রণীত হয় 'Hindu Woman's Right to Property Bill', বাল্যবিবাহ নিরোধক আইনটিতে কিছু পরিবর্তন সংশোধন আনা হয়। অসবর্ণ বিবাহকে আইনী সিদ্ধতা দান করা হয়। এছাড়াও সরকার কর্তৃক 'Hindu Women's Right to Divorce Act', 'The Muslim Personal Law Bill', 'The Prevention of Polygamy Bill' এবং 'Muslim Women's Right to Divorce Bill' প্রণয়ন করা হয়। এই প্রসঙ্গে মাথায় রাখা দরকার যে ভারতীয় নারীদের বিভিন্ন সংগঠনগুলি কিন্তু সব সময়তেই মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছে। কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে কোন আইনী সুরক্ষাই খুব বেশি কার্যকরী হতে পারে না। Geraldine Forbes মন্তব্য করেছেন, 'There reform minded women were not satisfied with piecemeal acts; they wanted comprehensive legislation accompanied by social and economic change.'

গান্ধী মনে করতেন শিক্ষিত মেয়েদের গ্রামে অনেক বেশি সময় কাটানো উচিত। কারণ ভারতীয় নারীদের প্রকৃত অবস্থাকে জানতে গেলে গ্রামে যাওয়া প্রয়োজন। জওহরলাল নেহরু ভারতীয় নারীদের বিভিন্ন প্রগতিশীল দাবীকে সমর্থন করলেও এই দাবীগুলি আদায় করার জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি বর্জনীয় বলে মনে করতেন।

এই অবস্থায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে স্যার বি. এন. রাউকে সভাপতি করে মেয়েদের আইনী ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক এই কমিটি খতিয়ে দেখবে বলে ঠিক হয়। মহিলা সংগঠনগুলি এর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানালে ঠিক হয় সাধারণ ভাবে নারীদের সম্পত্তির অধিকার খতিয়ে দেখা হবে। মহিলা সমিতিগুলি এই কমিটিতে নারী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলে। কিন্তু এই আবেদন গ্রাহ্য করা হয়নি। মেয়েদের ভোটাধিকার-এর অধিকার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলি Rau Committee-র কাছে পাঠায়। ১৯৪১ সালে Rau Committee-র চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে নারীদের আইনী অধিকার সুরক্ষিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৪১ সালের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। কংগ্রেস সংসদ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। একই সময়ে কংগ্রেস National Planning Committee গঠন করে। এর অঙ্গ হিসেবে একটিজ মহিলা উপসমিতি গঠন করা হয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে এই উপসমিতিকে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। কংগ্রেসের মহিলা নেতৃবৃন্দ যেমন সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং অমৃত কাউর মেয়েদের জন্য আরো বেশি করে আইনী সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। ১৯৪২ সালে সরকার দুটি খসড়া বিল প্রকাশ করে। কিছু পরিবর্তন পরিমার্জনের পর ১৯৪৩ সালে বিবাহও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দুটি বিল চূড়ান্ত হয়। ১৯৪৪ সালে সরকার একটি নতুন কমিটি তৈরী করে। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু আইনী-বিধি প্রস্তুত করা।

এই আইনী সংস্কার প্রক্রিয়া থেকে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষিত ভারতীয় মেয়েরা নিঃসন্দেহে ভারতীয় মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে ছিল। এই আন্দোলনের ফলে ঔপনিবেশিক সরকার মেয়েদের আইনী বিধি সুরক্ষিত করার জন্য একাধিক আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু সমাজের গভীরে এই আইন বিধিগুলি কতখানি প্রভাব ফেলতে পেরেছিল তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় সমাজ কাঠামো মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও আদৌ কোন মৌলিক পরিবর্তনে রাজী ছিল না। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ছিল খন্ডিত ও সীমাবদ্ধ। ফলে ঔপনিবেশিক সরকার প্রণীত আইনী সংস্কারের প্রক্রিয়া কিছু আপাত পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিল মাত্র। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নারী আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল জটিল ও বহুমাত্রিক। Rosalind O'Hanlon-এর মতে মেয়েদের অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উভয়েই রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর ভাষায়, 'broad degree of consensus'. Geraldine Forbes এই প্রক্রিয়াকে 'social feminist ideolgy-র কাঠামোর মধ্যে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই কাঠামোতে মেয়েদের 'public role' বা 'বাইরের ভূমিকা' কে কিছু পরিমাণে স্বীকার করে নেওয়া হলেও নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিক শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিভাজনকে বাস্তবতা বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একদিকে যেমন নারী আন্দোলনকে স্বীকার করছিল অন্যদিকে তেমনি নারী আন্দোলনকে ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী কাঠামোর মধ্যে আত্মস্থ করেও নিতে সচেষ্ট ছিল।

৭.৪.৮.১.৬ : ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় নারীর ভূমিকা

ভারতীয় নারী ও রাজনীতির প্রশ্নে একথা সাধারণভাবে স্বীকার্য যে ১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ (১৯১৮) হওয়ার পর শুধুমাত্র ভারতীয় রাজনীতি নয়, অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। যুদ্ধের ফলে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বেকার সমস্যা। পুরোনো রক্ষণশীল সামাজিক কাঠামোতে এই তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ভাঙন ধরে। এই একই সময়ে রাজনৈতিক ভাবে গান্ধীর উত্থান ঘটে এবং এই প্রথম ভারতে গণ জাতীয়তাবাদ বা mass nationalism-এর বিকাশ ঘটে।

১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সংঘটিত করার জন্য গান্ধী সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নারীদের প্রতি আহ্বান জানান। গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন (রাওলাট, অসহযোগ বা আইন অমান্য) ভারতীয় মহিলারা বিপুলভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে ১৯০৫ এর স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই মেয়েরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে এসেছে। গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে আগমনের পর এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়।

গান্ধী মনে করতেন প্রতিটি ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনে মেয়েদের নিজস্ব জায়গা আছে; অস্তিত্ব আছে এবং মেয়েরা বলিষ্ঠ ভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেই ভারতীয় মেয়েরা তাদের উপর ন্যস্ত রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুচেতা কৃপালিনী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'Gandhi's personality was much that it inspired confidence not only in women but in guardians of women, their husbands, fathers and brothers'.

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ভারতীয় নারীরা সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে এগিয়ে আসে। রাজনীতি সচেতন মেয়েরা একাধিক সভায় অংশগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ নামক একটি স্বাধীন নারী সমিতি গঠিত হয়। কংগ্রেসের জেলা কমিটিগুলিতে মেয়েরা এগিয়ে আসে। বাংলায় উর্মিলা দেবী (চিত্তরঞ্জন দাসের ভগ্নী) মেয়েদের দেশের কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস ভারতে এলে বোম্বেতে অন্তত এক হাজার জন ভারতীয় মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। বাংলায় বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী প্রমুখর নেতৃত্বে বাঙালী মেয়েরা বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলনে এগিয়ে আসে। গান্ধী Young India তে প্রকাশিত একটি লেখায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের বাংলার মেয়েদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আহ্বান জানান। গান্ধীর আহ্বান সংক্রান্ত পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের প্রান্তিক অংশের মহিলাদের কাছেও পৌঁছায়। পূর্ব গোদাবরী জেলায় দুর্গাবাই এর নেতৃত্বে দেবদাসী মহিলারা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলনের জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করে এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গান্ধী ভারতীয় মেয়েদের একদিকে বিদেশী পণ্য বর্জন করার কথা বলেন, অন্য দিকে চরকা কাটা, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি গঠনমূলক কর্মসুচী গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। গান্ধী মনে করতেন ভারতীয় নারীদের আদর্শ হচ্ছে সীতা। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হলে গান্ধী মেয়েদের

সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। গান্ধী নিজেও এই সময় সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে গ্রামোন্নয়নের মতন সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২০-র দশকের শেষ থেকে ভারতীয় রাজনীতি পুনরায় অশান্ত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশ ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯২৯ সালের গোড়অ থেকেই গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো শুরু হয়। সরকার কঠোর ভাবে দমননীতি আন্দোলনকারীদের উপর প্রয়োগ করে। তীব্র সরকারী দমননীতি সত্ত্বেও ভারতীয় মেয়েরা ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসে। গেরালডিন ফোর্বস দেখেছেন ১৯২০-এর দশকের সঙ্গে ১৯৩০-এর দশক তুলনা করলে দেখা যায় পরিমাণগত ও গুণঘত উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় মহিলাদের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। এই অগ্রগতি মহারাষ্ট্রে, বিশেষত বোম্বে শহরে, বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সুশৃংখল ও সুসংগঠিত ভাবে মেয়েরা গান্ধী প্রদর্শিত পথে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ স্বরাজকে তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। এই সময় দেশ সেবিকা সংঘ নামক আরো একটি মহিলা সংগঠন জন্ম নেয়। ১৯৩০ সালের মে মাসে সরোজিনী নাইডু সরকার বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় গ্রেপ্তার হন। ২১ শে মে পুনরায় তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং সরকার তাকে এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

বাংলার মেয়েরা দ্রুত ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এগিয়ে আসে। ১৯২৮ সালে তৈরী হয় মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ, এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লতিকা ঘোষ। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বাঙালী মেয়েরা তীব্র বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘের মতন মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘও স্বরাজকে তাদের আদর্শ বলে গ্রহণ করে। এই সংগঠনটি বিশ্বাস করতো শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে না পারলে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হবে না। মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের আদর্শবোধের মধ্যে চরমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ধর্মীয় অনুভূতি একই সঙ্গে ছিল। ১৯২৯ সালে বাংলায় গঠিত হয় নারী সত্যাগ্রহ সমিতি। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন উর্মিলা দেবী। এদের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের ভাবাদর্শ ও আন্দোলনকে সাধারণ মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বোম্বের মতন বাংলাতেও মেয়েরা সরকার বিরোধী অবস্থান, ধর্না ও আইন অমান্য আন্দোলনে এগিয়ে আসে। গান্ধী পরিচালিত অহিংস আন্দোলনের বাইরেও বাঙালী মেয়েদের রাজনীতিকরণের ঘটনা বাংলায় ঘটেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব পড়ে বীণা দাস ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দারের উপর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বীণা দাস বাংলার গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বীণা দাস সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান ছিলেন, যে পরিবারে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব পড়ার কথা নয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন চট্টগ্রামের স্কুল শিক্ষিকা। এই উদাহরণগুলি সাধারণভাবে মেয়েদের চেতনা পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ।

১৯৩১ সালে বাংলার শিক্ষিত সচেতন মেয়েরা অনুধাবন করে মেয়েজের জন্য পৃথক কংগ্রেস দরকার। ঐ বছরের মে মাসে শান্তি দাস জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির কাছে দশজন করে মহিলা প্রতিনিধি পাঠাতে অনুরোধ করে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মূল ভাষণ দেন সরলা দেবী চৌধুরানী। তিনি তাঁর ভাষণে শৈশব থেকে পরিবারের মধ্যে মেয়েদের উপর যে বঞ্চনা করা হয়—যার কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা—তার দীর্ঘ বিবরণ তুলে ধরেন। মেয়েদের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেলে ও মেয়েরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও তা

তাদের ক্ষমতায়নকে কতখানি সাহায্য করবে তা নিয়ে সরলাদেবী সন্দেহ প্রকাশ করেন। গেরালডিন ফোর্বস স্বীকার করেছেন মাদ্রাজে মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা কম ছিল। কোলকাতা বা বোম্বেতে মেয়েরা যেভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা মাদ্রাজে দেখতে পাওয়া যায় নি। উত্তরভারতে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহরে মেয়েরা কংগ্রেস পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

১৯২০ ও ৩০-এর দশকে ভারতীয় মহিলাদের সক্রিয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামে নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ অগ্রগতি। এই অগ্রগতি একদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ অন্যদিকে পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা ভারতীয় নারীরা আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদও এই প্রথম শক্ত চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে। যে উন্নয়নকামী দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলে ব্রিটিশরা তাদের শাসনকে ন্যায্যতা দান করত ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ সেই ন্যায্যতাকেই প্রশ্ন করে। গেরলিডিন ফোর্বসের ভাষায়, ''The role of women in the noncooperation movement of the 1920s and the civil disobedience movement of the 1930s called into questions Britain's civilizng mission in India...The involvemet of women in the nationalist struggle severely challenged the notion that the Britain were the legitimate rulers at India, and at the same time lent full support to the congress as the rightful heirs to political power.'' ভারতীয় নারীদের জাতীয়তাবাদী প্রকরণে ব্রিটিশ শক্তিকে রাবণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। একই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে স্বরাজের শাসনতান্ত্রিকতায় ভারতীয় নারীদের সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

১৮৫৮'র গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষমতা বর্তায় পার্লামেন্টের ওপর। অতএব তৎক্ষণাৎ অবলুপ্তি ঘটে এতকাল যে দুটি সভা এই ক্ষমতা ভোগ করতে, অর্থাৎ কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ও পার্লামেন্টের বোর্ড অফ কন্ট্রোলের পরিবর্তে ব্রিটিশ নৃপতির নামে শাসন করার ক্ষমতা ন্যস্ত হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের ওপর। কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীও এরপর থেকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরিত হল সেক্রেটারী অফ স্টেট হলেন পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ সরকারের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী। তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য গঠিত হল ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইন্ডিয়া কাউন্সিল নামে একটি পরামর্শদাতাদের পরিষদ। অবশ্য এই পরিষদের সুপারিশ অবজ্ঞা করে পৃথক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকল সেক্রেটারী অফ স্টেটের। তবে অর্থবিষয়ক তাঁর কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাদের অনুমোদনকে একটি অবশ্য শর্ত হিসাবে রাখা হল। সাধারণত ভারতে শাসনকাজে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরই পরিষদে স্থান হত। এঁদের না জানিয়ে গভর্ণর জেনারেলের সাথে যে কোন গোপন তথ্যের আদানপ্রদানের ক্ষমতা থাকল সেক্রেটারী অফ স্টেটের। ভারত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়-আইন, রেল, রাজস্ব, আয়ব্যয় ইত্যাদি-তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পরই অনুমোদন দিতেন। ভারতে রচিত বিভিন্ন আইনবিধি পার্লামেন্টে দাখিল করার দায়িত্ব ছিল তাঁর, এবং নিয়মিত কিছুকাল অন্তর পার্লামেন্টকে ভারতের খবরাখবর জানানোরও।

এরপর থেকে কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল হলেন গভর্ণর জেনারেল এ্যান্ড ভাইসরয়, অর্থাৎ এর দ্বারা স্পষ্ট করা হল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ নৃপতির প্রতিনিধি। ভারতে প্রত্যক্ষ শাসনভার বর্তালো তাঁর ওপর।

অবশ্য যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদনসাপেক্ষ, সেহেতু নীতি অবলম্বন ও সম্পাদনে ভাইসরয় হয়ে পড়লেন পার্লামেন্টের অধীনস্ত। তাঁর সহায়তার জন্য গঠিত হল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নামে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ। এই পরামর্শদাতাদের পরিষদের সদস্যরা সাধারণত ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরাই হতেন।

১৮৫৮'র এই আইনের সাথে সাথে জারী হল কুইন্স প্রোকলামেশন বা মহারাণীর ঘোষণাপত্র। এর দ্বারা দেশীয় শাসকদের আশ্বাস দেওয়া হল যে কোম্পানীর সাথে তাঁদের যাবতীয় চুক্তি-সন্ধি মহারাণী সম্মানের সাথে পালন করবেন এবং তাঁদের যাবতীয় অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে। বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মহারাণী হস্তক্ষেপ করবেন না এমন আশ্বাসও দেওয়া হল। ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না, কেবল উপযুক্ত শিক্ষাগত ও অনুরূপ যোগ্যতাই ভারত সরকারের কাছে আমল পাবে, এই ঘোষনাপত্রের দ্বারা তা ভারতীয় প্রজাদের জানানো হল।

যদিও এটাই স্বাভাবিক, তবুও উল্লেখ করতেই হয় যে ১৮৫৮'র আইন ও মহারাণীর ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতীয়দের জীবনে কোন পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে, ইংরেজদের তেমন কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। অতএব বজায় থাকল স্থিতাবস্থা মাত্র। মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় সমাজের একাংশ বহুদিন যাবৎ নানা অভাব-অভিযোগ জানিয়ে আসছিল পার্লামেন্টের কাছে, যেগুলি আগের মত এখনও উপেক্ষিত হল। প্রতিনিধিত্বমূলক কোন শাসনব্যবস্থার জন্ম তো হলই না, বরং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সেক্রেটারী অফ স্টেটের হাতে চলে যাওয়ায় প্রশাসনের সংবেদনশীলতা আরও দূর-অস্ত হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, তাঁর কার্যালয়ের ব্যয়ভার যথারীতি বর্তালো ভারতীয় প্রজার ওপর। বিলিতি সমাজের যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বহুদিন যাবৎ কোম্পানীর বিশেষ অধিকারের অবলুপ্তির জন্য দাবী জানিয়ে আসছিল, কেবল তাদেরই প্রত্যাশা পুরণ হল ১৮৫৮ য়।

তেলেঙ্গানা আন্দোলনে অসাধারণ সক্রিয় ভূমিকা ধারণ করে মেয়েদের প্রতিবাদী রাজনীতি। সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মেয়েদের প্রতিবাদী রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, একই সঙ্গে অর্থনীতি অতিরিক্ত শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আন্দোলন বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে। এককথায় বলতে গেলে, মেয়েরা। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, অন্যদিকে তেমনি তারা পুরুষতান্ত্রিক বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানায়। কৃষক রমণীদের তীব্র সংগ্রাম ছাড়া তেলেঙ্গানা আন্দোলনের এই বিশাল ব্যাপ্তি ও আদর্শগত উত্তরণ ঘটতে পারতো না।

৭.৪.৮.১.৭ : উপসংহার

উনিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। বস্তুত এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল বহুলাংশে আধুনিক চেতনার প্রকাশ। আবার একই সঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল অতীত ঐতিহ্যের যুগোপযোগী পুর্নচর্চা ও পুনরুদ্ধার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, ''তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ

মর্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।" (চারিত্রপূজা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মূল্যায়ন থেকে স্পষ্ট ইংরাজী শিক্ষা ও প্রাচীন দেশজ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সুষম মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে ঊনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গঠিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও হিন্দু ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে রামমোহন ও পরবর্তীকালের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা সচেতন ছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী (orientalist) পণ্ডিতদের প্রাচ্য বিষয়ক ধারণা বা প্রাচ্য প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব তারা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ভাবনা সেই ছকে গড়ে তুলেছিলেন এডওয়ার্ড সেডের (Edward Said) এই উক্তি মানা যায় না। এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করার জন্য রামমোহন প্রমুখকে প্রাচ্যবাদীদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। বারাণসী, পুণা, মাদ্রাজ, কেরল প্রমুখ স্থানে সংস্কৃ পঠনপাঠনের ধারা অব্যাহত ছিল।

অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ যে ভাবে শাস্ত্র চর্চা করতেন তা মধ্যযুগের শাস্ত্র-চর্চা থেকে পৃথক ছিল। নিছক ব্যক্তিগত মোক্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে রামমোহন প্রমুখরা শাস্ত্রচর্চা করেননি। তাঁরা ধ্রুপদী সংস্কৃতির সাহায্যে জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে সনাতন প্রথাবদ্ধ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ একদিকে চিরায়ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার যথাযথ আত্তীকরণ—এই দুই ধারার প্রতিফলন ঘটে ঊনিশ শতকের ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনে।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ আইন বা Hindu Windows' Remarriage Act ঔপনিবেশিক সরকার প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এই আইন প্রণীত হলেও হিন্দু সামাজিক বাস্তবতার কারণে তা খুব বেশী জনপ্রিয় হয়নি। লুসি ক্যারোল (Lucy Carroll)-এই মতে এই আইন মূলতঃ রক্ষণশীল চরিত্রের; কারণ এই আইনে ঠিক হয় যে পুনর্বিবাহকারী বিধবা নারী পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। অশোক সেন এই ব্যর্থতাকে অনিবার্য বলে অভিহিত করেছেন, কারণ বিধবা বিবাহের জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক সম্পত্তির, যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার পূর্বে ভূপালের শুবজি বাপু (Subaji Bapu) এবং পুনার একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে সওয়াল করেন। ১৮৩৫ সালের আগস্ট 'The Bombay Darpan' নামক সাপ্তাহিক কাগজে শুবজি বাপুর চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক K.N. Panikkar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "Bapu saw window marriage as a part of the general emancipation of women and hence emphasized the importance of female education." (K.N. Panikkar : "Culture and Ideology" Hegemony.)

বিধবা বিবাহ আইনের সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। পুরুষের বহু বিবাহ ও হিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করেন। সমকালীন নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (নাট্যকার ঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন-র রচনা) নাটকে বর্ণহিন্দু সমাজের কৌলিন্য

প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করে। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৫ সালে প্রগতিশীল হিন্দুদের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকার যাতে বহুবিবাহ প্রথা রদ করে। সমাজের রক্ষণশীল অংশও সরকারের কাছে এই আইন প্রণয়ন না করার জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করে। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। যে ভিক্টোরিয়া উদারনীতিবাদী আদর্শের প্রভাবে ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষিত হিন্দু ভারতীয়দের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে উৎসাহ দিত, তা ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে যায় এবং উদীয়মান রক্ষণশীল মতাদর্শ ১৮৫৭-৫৮-এর পর থেকে ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতার প্রতি ব্রিটিশ নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Thomas R. Metcalf এই ঘটনাকে 'Complete non-interferenec in the traditional structure of Indian society' বলে অভিহিত করেছেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের এই নীতি পরিবর্তন ও মতাদর্শগত রূপান্তর সত্ত্বেও ১৮৬০ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সহবাস সম্মতি আইন বা Age of Consent Act সরকার প্রণয়ন করেন। এর ফলে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় দশ। ১৮৯১ সালে মহিলাদের ন্যূনতম বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হয়। এই সময় কিন্তু সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে তীব্র প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। এই প্রতিবাদের পিছনে কাজ করেছিল এক ধরনের রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী চেতনা যার প্রাণপুরুষ ছিলেন মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক। তিলক মনে করতেন ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়ম-বিধি পরিবর্তন করার অধিকার শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই রয়েছে। Charles Heimasth দেখিয়েছেন, সরকার শোষিত সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছিল জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রকরণ। এর পিছনে কাজ করছিল ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে প্রশ্নহীন শ্রদ্ধার মনোভাব। এই রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশ ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিঃসন্দেহে বৈধতা দান করেছিল। এর ফলে সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কার নীতির বিরোধিতার মধ্যে থেকে জন্ম নেয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন। ঊনিশ শতকের শেষ লগ্নে জন্ম নেওয়া হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন এক চড়া ধর্মীয় অনুষঙ্গের জন্ম দেয় যা ছিল সমকালীন জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। ভীরাসালিঙ্গম পান্টুলু (Veerasalingam Pantulu) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ভীরাসালিঙ্গম 'Rajamundri Social Reform Assocaiton' গঠন করেন। ১৮৮১ সালে প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানটি হয় রাজামুন্দ্রী শহরে। এরপর কে.এন. নটরাজন ১৮৯০ সালে গঠন করেন Indian Social Reformer। ১৮৯১ সালে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে আরো গতি সঞ্চার করার জন্য রাজামুন্দ্রী শহরে সংস্কারপন্থীরা 'Window Remarriage Association' গঠন করেন। পরের বছর মাদ্রাজে 'Hindu Social Reformer Assocation' গঠন করা হয়। এই সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন যে খুব প্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছে তা বলা যাবে না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নির্দিষ্ট বা সংঘটিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধির বিরুদ্ধে এই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংস্কার প্রচেষ্টা সাফল্য না পাওয়াই স্বাভাবিক।

বিপান চন্দ্রের মতন বাম-জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন

শুধুমাত্র সাময়িক সাফল্য বা ব্যর্থতা দিয়ে বিচার করা সঠিক নয়। বস্তুত এই আন্দোলনগুলি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধিতার প্রাথমিক সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত ভিত্তি। একদিকে দেশজ ঐতিহ্যের শ্রদ্ধান্বিত পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল—এই দুই এর মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের আত্মপরিচয়ের ভাষা তৈরী করেছিলেন। ঐতিহাসিক K.N. Panikar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "It was not just an attempt at religious revival and glorification, but an intellectual inquiry into the part, embracing almost every field a social, cultural and politial endeavour."

ঔপনিবেশিক সরকারের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ সরকারী উদ্যোগে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে) ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এক ভিন্ন মাত্রার ধর্মীয় আন্দোলন বাংলায় শুরু হয় যাকে আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের প্রথম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই আন্দোলন নিছক ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছিল না। অর্থাৎ সরকারী আনুকূল্যে কয়েকটি ধর্মীয় বিধি বা নিয়ম পরিবর্তনের কথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কল্পনা করেননি। তাঁদের দুজনের লক্ষ্য ছিল অনেক ব্যাপক উদার ও মহান—তা হল মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্বের পূর্ণ-বিকাশ ঘটানো। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এই আন্দোলনের লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় সর্বজনীন, ফলতঃ বেদান্ত ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। রামকৃষ্ণকথিত 'যত মত তত পথ' ছিল এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি। এই চিন্তা নিছক অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানোর সচেতন প্রয়াস নয়, বরং মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার মৌলিক প্রচেষ্টা। তৃতীয়তঃ, আত্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধির প্রয়াসকে সাধকের ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বৃহত্তর সাংগঠনিক রূপদান করা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্যতম মহৎ বৈশিষ্ট্য। এই সাংগঠনিক প্রচেষ্টারই প্রকাশ ছিল রামকৃষ্ণ মিশন।

শুধু মাত্র শুষ্ক তর্ক আলোচনায় নয়, বা ঔপনিবেশিক সরকারের উপর নির্ভর করে আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার করা নয়—বরং প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তঃস্থ ব্রহ্মের (বা মনুষ্যত্বের) পূর্ণ-বিকাশের মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য। সর্বোপরি এই যাত্রা কোন একক নিঃসঙ্গ পথিকের অনির্দিষ্ট যাত্রা নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সুসংগঠিত ও সমষ্টিবদ্ধ, ভাবগত ও চৈতন্যগত আন্দোলন যা বস্তুত এক অপূর্ব মানবিক অনুভূতি, বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। এই অর্থে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনকে হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলনের চেনা ছকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবার পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্তি প্রসূত আধুনিকতার প্রভাবশালী কাঠামোর মাধ্যমেও এই আন্দোলনকে চেনা যাবে না। এই আন্দোলন মুখ্যত বৈদান্তিক চেতনার বিশুদ্ধ প্রকাশ ও প্রসার।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যেও নানা টানাপোড়েন শুরু হয়। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্কারপন্থী মনোভাব পুরাতনপন্থী গোঁড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ১৮৬২ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হওয়ার পর সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে আরো ব্যাপকতর করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সংস্কার প্রচেষ্টা মুখ্যতঃ আধুনিকতা প্রসূত, যেমন জাতিভেদ বর্জন, বিধবা বিবাহ প্রচার, অসবর্ণ বিবাহ উদ্যোগ, পর্দাপ্রথার অবলুপ্তি, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি। Meredith Borthwick-এর মতে, কেশব ও তার অনুগামীরা ব্রাহ্ম ধর্ম

প্রচারের চেয়ে সমাজ সংস্কারে বেশী আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও তার অনুগামীরা সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে সনাতন হিন্দু সমাজের বিধিগুলিকে আঘাত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। উপবীত ধারনের ন্যায্যতাকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে পুরাতনপন্থীদের বিরোধ চরমে ওঠে এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৮৬৬ সালে কেশব ও তাঁর অনুগামীরা 'ভারতী ব্রহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতনপন্থী ব্রাহ্মরা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'আদি ব্রাহ্মসমাজে' সংগঠিত হয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। এই জাতীয় বিভাজন প্রক্রিয়া শিক্ষিত ভারতীয়দের আত্মপরিচয় খোঁজার প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে উপস্থিত করে। এই দ্বন্দ্ব যতখানি না আদর্শগত, তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মপরিচয়ের সংকট। বরং একটু অন্যভাবে বললে কোন জাতীয় আদর্শগত প্রশ্নের অনুশীলন করলে এই আত্মপরিচয়ের সংকট এড়ানো যেত তা ব্রাহ্ম আন্দোলনে সুস্পষ্ট আকার নেয়নি।

১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহারাষ্ট্রে যান। তার প্রভাবে ১৮৬৭ সালে বোম্বেতে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সমাজের ভিত্তি ছিল একেশ্বরবাদ, জাতিভেদ বিরোধিতা ও সমাজসংস্কার। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন আত্মারাম পান্ডুরঙ। সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। প্রার্থনা সমাজের নেতৃত্বস্থানীয়রা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার প্রার্থনা সমাজ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজের মতন অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ চায়নি। সংস্কার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও রানাডে প্রমুখরা ধীরে এগোনোর পক্ষপাতী ছিল সামাজিক কাঠামোকে বৈপ্লবিক ভাবে পাল্টানোর কোন পদক্ষেপ প্রার্থনা সমাজ নিতে চায়নি। প্রার্থনা সমাজের শাখা সুরাট, আহমেদাবাদ, করাচী, সাতারা, কোলাপুর প্রমুখ শহরে খোলা হয়।

৭.৪.৮.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Geraldine Forbes : Women in Modern India

(2) Kaplana Dasgupta : Women on the Indian Scene

(3) Neera Desai : Women in Modern India

(4) B. R. Nanda (ed) : Indian Women From Purdah to Modernity.

(5) Kumkum Sangari & Seduesh Vaid (ed) : Recasting Women : Essays in Colonial History.

(6) Sumit Sarkar : Modern India

(7) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পলাশী থেকে পার্টিশান।

৭.৪.৮.১.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) উনিশ শতকের সূচনায় ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল?

(২) তুমি কি মনে কর যে মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন নির্মাণ ভারতীয় মেয়েদের আত্মচেতনা বিকাশের মৌলিক ধাপ?

(৩) ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় মেয়েদের ভূমিকা আলোচনা করো।

(৪) বামপন্থী আন্দোলন কিভাবে ভারতীয় নারীর স্বকর্তৃত্ব অর্জনের প্রভাবিত করেছিল তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তা আলোচনা করো।

SOCIETY IN COLONIAL INDIA

ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)

ভারতের ইতিহাসে নারী

ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

বিন্যাস ক্রম

৭.৪.৮.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.৪.৮.২.১ : সূচনা

৭.৪.৮.২.২ : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা বলতে কি বোঝায়?

৭.৪.৮.২.৩ : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা—এর জটিলতা ও বহুমাত্রিকতা

৭.৪.৮.২.৪ : উপসংহার

৭.৪.৮.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.৮.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৪.৮.২.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠে পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঐতিহ্য ও আধুনিকতা বলতে কি বোঝায়?

(২) ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ।

(৩) এর নানা জটিলতা ও বহুমাত্রিকতা।

(৪) ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন

৭.৪.৮.২.১ : সূচনা

ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার টানাপোড়েকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই অর্থে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ-এর মাধ্যমে উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জটিলতাকে যেমন বোঝা যায়, তেমনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়।

৭.৪.৮.২.২ : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা বলতে কি বোঝায়?

'ঐতিহ্য' বলতে সাধারণভাবে বোঝায় দেশঝ পরম্পরাগত ধারা, বিশ্বাস, অনুভূতি, ধর্মীয় বোধ, সাংস্কৃতিক চেতনা প্রভৃতি যাকে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের অস্তিত্বের অংশ বলে মনে করে। আধুনিকতাকে সাধারণভাবে ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তি (Enlightement) ও যুক্তিবোধের সঙ্গে এক করে দেখা হয়, যার সূচনা ১৪-১৫ শতকের ইউরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গে। আধুনিকতা মূলত একধরনের দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে যা ঐতিহ্যকে নানাভাবে প্রশ্ন করে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা পরস্পর বিপরীত অবস্থানে থাকে। অন্যভাবে বললে ঐতিহ্যের ভাঙনের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার বিকাশ ঘটে।

৭.৪.৮.২.৩ : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা—এর জটিলতা ও বহুমাত্রিকতা

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এই সরল দ্বন্দ্ব এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। ভারতীয় ইতিহাসে এই দ্বন্দ্ব অনেক জটিল ও বহুমাত্রিক। দুটি মুখ্য কারণের জন্য এই জটিলতা ও বহুমাত্রিকতার সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথমতঃ উনিশ শতকের শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে দেশজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব মৌলিকভাবে ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে যে আধুনিকতা ভারতে এসেছিল তা পূর্ণ অর্থে ইউরোপীয় আধুনিকতা নয়, এই আধুনিকতা ঔপনিবেশিকতাবাদের ছাঁকনিতে শোধিত হওয়া আধুনিকতা। এই আধুনিকতা ঔপনিবেশিক শাসনতান্ত্রিক ও মতাদর্শগত প্রভুত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত ও খর্বিত। সুতরাং একদিকে শিক্ষিত ভারতবাসীর সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেশজ শিকড়, অন্যদিকে খণ্ডিত, খর্বিত ঔপনিবেশিকতাবাদের দ্বারা শোধিত আধুনিকতার প্রভাব—এই দুই এর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক পর্বে শিক্ষিত ভারতীয় শ্রেণীর মননশীলতার বিকাশ ঘটেছে।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—বাংলার নবজাগরণের যারা প্রাণপুরুষ তাদের প্রত্যেকেরই দেশজ ঐতিহ্যের শিকড় অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। রামমোহন রায় সংস্কৃত, ফার্সি ও আরবী জানতেন। ভারতীয় চিন্তা ও দর্শনে তাঁর সুগভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। জওহরলাল নেহেরু তাঁর 'ভারত সন্ধানে' (The Discovery of India) গ্রন্থে রামমোহন রায় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ''....তাঁর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমাবেশ ঘটেছিল, ইংরেজরা এদেশে আসার পর নানা বিষয়ে তাদের উৎকর্ষের পরিচয় পেয়ে কোথায় তাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি তা জানার জন্য তিনি ঔৎসুক্য অনুভব করেন। তাঁর মন ছিল নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ব্যগ্র।'' এই যুক্তিবোধ ও নবচেতনা ঠিক ইউরোপীয় ঘরণার আধুনিকতা নয়, আবার মধ্যযুগের শাস্ত্র চর্চা বা নব্যন্যায় চর্চা নয়। রামমোহন রায়, বঙ্কিম চন্দ্র, বিবেকানন্দ ও অন্যান্যরা কখনও সমাজ বহির্ভূত শাস্ত্রচর্চা করেননি। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার। যে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই দেশের মানুষের মধ্যে বলসঞ্চার হয়। ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিকতাবাদের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আত্মস্বত্ত্বা খুঁজে পাওয়ার সংগ্রাম। রামমোহন ও

বিবেকানন্দ জোর দেন বেদান্তচর্চার উপর। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে ঐতিহ্যের সন্ধান করেন মহাভারত ও গীতার মধ্যে, অন্যদিকে আত্মহত্যা জাগরণের জন্য স্বদেশের ইতিহাস চর্চায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য শিক্ষিত জনের কাছে আবেদন জানান। তাঁর মনে হয়েছিল স্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস ছাড়া স্বাদেশিকতা জন্ম নিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সুদীপ্ত কবিরাজের মত প্রণিধানযোগ্য। সুদীপ্ত কবিরাজ তাঁর 'The Unhappy Consciousness' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ''The Europeans' history of India arranged the events and trajectories in universal history in such a way that Indian subjection to Europe-Britain appeared as a necessity of the historical world. Historical novels and historical treatises by Indian intellectuals sought ways of saying that this was false, by showing the constructedness of this narration, denying its positivist semblnce of objectivity, and asserting the contingency at the heart of historical process. Whether a battle took place ona particular day a matter of empirial evidence, but whether this showed European superiority was a matter of construction and narrativization'' বাঙালী তথা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস চর্চা তথা ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রমাণিত করার তাগিদ ছিল ভারতীয়রা কোন অংশেই ইউরোপীয়দের তুলনায় হীন বা ন্যূন নয়। আত্মিক শক্তির বিকাশ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমতায়নের সঙ্গে এই প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল।

অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন উনিশ শতকের ভারতীয়দের এই ঐতিহ্যের অনুসন্ধান কিন্তু একমাত্রিক ছিল না। বেদান্তের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন রামমোহন ও বিবেকানন্দ। দয়ানন্দ গ্রহণ করেছিলেন বেদকে। বঙ্কিমচন্দ্র বেছে নিলেন মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে ঐতিহ্যেরও রকমফের আছে। তা অনড়, অচল, পরিবর্তনহীন ও একমাত্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। রামমোহন রায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিমূর্ত একেশ্বরবাদই একমাত্র ধারণা বা হিন্দু, ইসলাম সর্বত্র স্বীকৃত। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'বেদান্ত প্রতিপাদিত সত্য ধর্ম'। এর মূল লক্ষ্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা যার ভিত্তি হবে আনন্দ ও চিত্তশুদ্ধি। রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ 'যত মত তত পথ'-এর উদার অসাম্প্রদায়িক মননশীলতার বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলেন। এইটিই ভারতের শাশ্বত বাণী যা ভিন্ন চিন্তাকে শ্রদ্ধা সহকারে আত্মস্থ করে, অবমাননা করে না। রামমোহন রায়ের হাত ধরে যে তুলনামূলক ধর্মবিচারের সূচনা ভারতবর্ষে হয়েছিল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা এক অতি উন্নতস্তরে উপনীত হয়। ঐতিহ্যের প্রকৃত চর্চা ও সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া এই উন্নত ভাবাদর্শ সৃষ্টি সম্ভব ছিল না।

ঐতিহ্যের বিস্তার আরো নানাভাবে ঘটেছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যখন যথাক্রমে সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও বিধবা বিবাহ চালুর দাবীতে লড়াই করেছিল, তারা কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র থেকেই তাঁদের বক্তব্যের যথার্থ্য প্রমাণ করেন। এই ক্ষেত্রে তাঁরা পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক আদর্শ ও যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। শুধু পদ্ধতিগত কারণে তাঁরা এটি করেছিলেন তা নয়, আদর্শগতভাবেই তাঁরা ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ অংশের অংশীদার ছিলেন। ঐতিহ্যের বিস্তার ভিন্নপথে ঘটলো বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে। ধর্মীয় শাস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে বহুবিবাহের কুপ্রথা দূর করার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এমনকি আইন প্রণয়নেরও তিনি পক্ষে ছিলেন না। তাঁর ভাষায়, ''আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।'' বিদেশী

সরকারের দ্বারা প্রণীত আইনের দ্বারা সনাতন ভারতীয় সমাজের যুগোপযোগী পরিবর্তনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় রাজা রাধাকান্ত দেবও দেশীয় সমাজের সংস্কার প্রক্রিয়া চালানো জন্য বিদেশী শাসকদের দ্বারা কৃত আইনের পক্ষপাতি ছিলেন না।

পার্থ চ্যাটার্জীর মতে এই আপাত সংস্কার বিরোধী বক্তব্য আসলে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে difference বা পার্থক্য রচনার প্রয়াস। সামাজিক সাংস্কৃতিক কুপ্রথা নির্মুল করার তাগিদ দেশীয় সমাজের অভ্যন্তর থেকে আসা উচিত বাইরে থেকে আইন করে তা করা সম্ভব বা উচিত নয় বলে বঙ্কিম প্রমুখরা মনে করতেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা সেখানে অর্বাচীন, এই জাতীয় একটি মনোভাব এদের মধ্যে দৃঢ় ছিল।

ঐতিহ্যের বিস্তার এবং আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র গীতা, মহাভারত ও ভাগবতের উপর জোর দিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সকল সামাজিক সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না, কারণ তা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ কারণ তাতে ভক্তি নেই। বঙ্কিমের মতে মানুষের অন্যতম অনুশীলন বৃত্তি হওয়া উচিত ভক্তি। তাঁর ভাষায় ''ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।'' ভক্তির খোঁজ তিনি পেলেন গীতায়, ভাগবতে। কৃষ্ণ তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন আদর্শ পুরুষ রূপে, যার মধ্যে সকল বৃত্তির পূর্ণাঙ্গ স্ফূরণ ঘটেছে। সংসার ত্যাগ করে নয়, বরং সংসারের সকল দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েই অনুশীলন বৃত্তির মধ্য দিয়ে আদর্শ পুরুষের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব। চিরাচরিত সমাজকে বাদ দিয়ে তিনি ভক্তি বা অনুশীলন তত্ত্বের কথা ভাবেননি। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি বলেছেন, ''সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণ-পোষণ, এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।'' অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, ''তাঁর বিচারে সংস্কার মাত্রই অশুভ নয়। কিন্তু নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার উন্মেষের আগে সেগুলি প্রবর্তিত হলে তাদের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। এই উন্মীলন সম্ভব হয় ধর্মতত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি থেকে।''

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ও ঔপনিবেশিক মতাদর্শের প্রেক্ষিতে এই জাতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর মধ্য দিয়ে দেশীয় সমাজের সংহতি এবং দেশজ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার অনেক বেশি বাস্তবোচিত ভঙ্গীতে হয়। ব্রাহ্মধর্মের

৭.৪.৮.২.৪ : উপসংহার

উনিশ শতকের প্রথমে বাংলা তথা ভারতে শিক্ষিত মানুষদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক বিশাল শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা ও ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রধান কারণ ছিল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার জন্য মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যোগ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে গড়ে উঠেছিল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের উত্থান ও জাতীয় আন্দোলনে

এই সম্প্রদায়ের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। ১৮৮০-এর দশকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫০,০০০। ১৯০৭ সালে তা ৫,০৫,০০০-তে পৌঁছায়।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে অনেক বৃত্তি লাভের সুযোগ আসে যেগুলির অস্তিত্ব প্রাক্-উপনিবেশিক আমলে ছিল না। তাঁরা আইনজীবী, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রমুখ হবার সুযোগ পান। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে আইন ব্যবস্থা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ বেশিরভাগ নিয়েছিলেন হিন্দুরা এবং বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। বাংলার কলেজ ছাত্রদের অধিকাংশই আসতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার থেকে। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকাও খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত বিদ্যাচর্চায় খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা নতুন ধরনের বৃত্তি ও চাকুরিতে প্রবেশ করার ফলে এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। তবে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশজ শিকড় ছিল সুদৃঢ়। দেশের ঐতিহ্যকে তারা ভোলেননি।

ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত এইসব শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা কিন্তু ঔপনিবেশিক নীতি, আদর্শ মতাদর্শের সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁর উপলব্ধি করতে পারেন যে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ধারণা বা যুক্তি এবং সাম্য ও আইনের শাসনের মিল খুব কমই আছে। শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়রা শিক্ষার মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে যা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সুসংবদ্ধ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমালোচনা শুরু করে। সংগঠিত জাতীয়তাবাদ এদের মাধ্যমেই বিকশিত হতে থাকে। এই শিক্ষিত বাঙালীরা ভারতীয়রাই প্রথম জাতীয় সচেতনতা অর্জন করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জনগণের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরাই অনেকাংশে ভারতীয় জনগণকে আধুনিক জাতিতে সংহত করেছিলেন। তাঁরাই ছিলেন রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, সংগঠক ও নেতা। শিক্ষামূলক ও প্রচারমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে তাঁরাই জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে স্বদেশিকতা ও স্বাধীনতার ধারণা এনে দিয়েছিলেন। তাঁরাই সৃষ্টি করেছিলেন সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য যার মধ্যে দিয়েই তাঁরা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বীজ বুনতে চেয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী আন্দোলনে এঁরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ বাঙালী ও ভারতীয় সংগ্রামশীল নেতৃবৃন্দ সবাই ইংরাজী জানা বুদ্ধিজীবী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণী দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন গণভিত্তি পায়, তখন এই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবিরাই এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৭.৪.৮.২.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। K. N. Panikkar : Culture, Ideology, Hegemony.

২। S. Bandhyopadhyay : From Plassey to Partition.

৩। Sumit Sarkar : Modern India

৪। Sugata Bose and A. Jalal : Modern South Asia.

৫। অমলেশ ত্রিপাঠী ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

৬। অমলেশ ত্রিপাঠী ঃ ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি।

৭। বিনয় ঘোষ ঃ বাংলার বিদ্বৎসমাজ।

৭.৪.৮.২.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। উনিশ শতকের ভারতবর্ষে ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আলোচনা কর।

২। ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিকতার স্বরূপকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৩। ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ কিভাবে হয়েছিল? ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সম্পর্ক উনিশ ও বিশ শতকে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

একক - ৯

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

Approaches to Indian Nationalism

গঠন (Structure) :

৭.৫.৯.১.০ : উদ্দেশ্য

৭.৫.৯.১.১ : সূচনা

৭.৫.৯.১.২ : সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

৭.৫.৯.১.৩ : কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি

৭.৫.৯.১.৪ : জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

৭.৫.৯.১.৫ : মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

৭.৫.৯.১.৬ : নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি

৭.৫.৯.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৫.৯.১.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৫.৯.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি

(২) সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ধরন ও সীমাবদ্ধতা

(৩) কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকগোষ্ঠীর মতাদর্শ ও দুর্বলতা

(৪) জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ

(৫) মার্কসবাদী ও নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চা

৭.৫.৯.১.১ : সূচনা

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা বিচার করতে গিয়ে ভারতীয় ও বিদেশী ঐতিহাসিকগণ নানা ধরনের মতামত প্রকাশ করেছেন। মতামতের এই বিভিন্নতা থেকে নানা ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর (Schools of historians) মতাদর্শগত পার্থক্য বেশ ভালভাবে ধরা পড়েছে।

৭.৫.৯.১.২ : সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ (Imperialist school of historians) ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের মনগড়া দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। তারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী ধারার গুরুত্বকে অনুধাবন করার কোন চেষ্টা করেননি, বরং এই সংগ্রামকে কখনও কোনভাবেই সমর্থন করেননি এবং ভাল চোখে দেখেননি। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ বহুকাল ধরে তাদের নানা রচনার মাধ্যমে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের নানা উপকারে এসেছিল এবং ইংরেজরা এদেশবাসীর জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এই উদ্যোগের ফলেই এদেশে উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-কানুন, শৃঙ্খলা নানা প্রতিষ্ঠান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসনের সূচনার ফলেই ভারত মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছিল। ব্রিটিশদের সদর্থক ভূমিকার ফলে এদেশে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসারলাভ করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যান ধারণার প্রসারের ফলে ভারতীয়রা এর সংস্পর্শে এসে নিজেদের জীবন ও চিন্তাকে উন্নত করতে পেরেছিল। ব্রিটিশদের প্রয়াসের ফলেই এদেশে আধুনিক শিল্পব্যবস্থা, রেল, প্রযুক্তি ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার শুধু প্রসারই ঘটেনি, তা অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠী মনে করেন যে ভারতীয়দের মধ্যে যেটুকু জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হয়েছিল তাও ব্রিটিশ শাসনের সদর্থক পরিণাম বলা যেতে পারে। ভারতের অখন্ডতা, ঐক্যবোধ, প্রশাসনিক একতা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকেই উদ্ভূত বলে এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর ধারণা। এর পূর্বে ভারতবর্ষ ছিল 'a mere geographical expression' যে ভারতীয় অর্থনীতি ব্রিটিশদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ব্রিটিশদের নিরলস প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ বিশ্বের বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক

গড়ে তুলতে সক্ষম হল। উদার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবাদর্শ ইংরেজরাই ভারতীয়দের শিক্ষা দিয়েছিল এবং সেই পথে হাঁটার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজ সংস্কার, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ইত্যাদি যা কিছু ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে হয়েছিল তা সবই ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে ধার করা। এমন কি প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশরাই ভারতীয়দের করে দিয়েছিল এবং প্রশাসনেও ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণ কেন ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম শুরু করেছিলো এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলো তার কারণ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর বোধগম্য হয়নি। এই নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ধারাটি পাওয়া যায় লর্ড ডাফরিন, লর্ড কার্জন এবং লর্ড মিন্টো প্রভৃতি বড়লাটদের বিভিন্ন বিবৃতিতে, রাওলাট কমিটি রিপোর্ট, মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ইত্যাদির মধ্যে। এই সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় Valentine Chirol, Varney Lovett রচিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলি থেকে। এছাড়াও Percival Spear এবং Reginald Coupland তাঁদের রচনার মাধ্যমে এই সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারাকে সদর্পে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে গেছেন।

আমেরিকান ঐতিহাসিক T.Mc cully তাঁর 'English Education and the origins of Indian Nationalism' (New York, 1940) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রসারের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, ইংরেজী শিক্ষার সূত্র ধরেই ভারতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। ব্রিটিশ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতবর্ষে একটা শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে ভারতে জাতীয়তাবাদের কোন ধারণা বা অস্তিত্ব ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে Mccully নানা যুক্তিসহ তাঁর তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসতত্ত্ব নিঃসন্দেহে একপেশে ও অতিরঞ্জিত। এই মতাদর্শের ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষে 'mass articulation of nationalism'কে বুঝতে এবং তার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে এরা জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনকে এবং এর জঙ্গী চরিত্রকে তাদের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই মতাদর্শের ঐতিহাসিকরা শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে 'সুবিধার রাজনীতির' প্রেক্ষাপটে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তারা সবসময়ই এই শ্রেণীকে সুবিধাবাদী স্বার্থপর, উচ্চাকাঙ্খী, নানারকম পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার অভিলাষী বলে বর্ণনা করেছেন যা সঠিক নয়। এর ফলে এই শ্রেণীর আদর্শ ও ভাল গুণগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সবশেষে বলা যায়, এই মতাদর্শের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর অনেকের ইতিহাস রচনাকালে জাত্যভিমান ও জাতিগত শ্রেষ্ঠতার ধারণা থাকার ফলে এশিয়াবাসীদের ইউরোপীয়দের অধীনস্থ প্রজা হিসেবেই তারা সবসময়ে মনে করেছে এবং সেভাবেই তাদের বিচার করেছে। এর ফলে এদের সকলের বক্তব্য একপেশে এবং আংশিকভাবে সত্য।

৭.৫.৯.১.৩ : কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি

অধুনা অন্য এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। এই গোষ্ঠী Cambridge School of historians নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকবৃন্দ সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় White man's burden এর মহিমা উচ্চগ্রামে কীর্তিত না হলেও বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের উপর তাঁদের লেখাগুলিতে ও বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস এখন অঞ্চল বা প্রদেশ ছাড়িয়ে প্রতি গ্রামে গঞ্জে প্রসারিত। ১৯৫৩ সালে গ্যালাহার (J. Gallagher) এবং রবিনসন (Robinson) এই মতবাদের

প্রতিষ্ঠা করেন 'The Imperialism of Free Trade' নামক গ্রন্থে। ১৯৬১ সালে 'Africa and the Victorians' গ্রন্থে আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ঐ দশকেই এদের প্রেরণায় অনিল শীল এবং পরে এদের কিছু শিষ্য আধুনিক ভারতের ক্ষেত্রে নানা গবেষণা চালিয়ে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করলেন। এর ফলে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'Locality, Province and Nation' নামক গ্রন্থে পূর্বের মতামত কিছুটা সংশোধিত ও পরিমার্জিত হল। ১৯৭৪ সালের ফোর্ড বক্তৃতাবলীতে ও ১৯৮১ সালের 'Nationalism and the crisis of Empire 1919-1922' প্রবন্ধে গ্যালাহারের ব্যাখ্যা পূর্ণতা লাভ করল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, এই সব প্রচেষ্টায় প্রচারিত উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদের বস্তুনিষ্ঠ, নির্মোহ বিশ্লেষণ হলেও, তার প্রেক্ষাপটে ঠান্ডা লড়াই (Cold War) এর মনস্তত্ত্ব কাজ করছিল। এক দিকে হবসন-লেনিন প্রবর্তিত সাম্রাজ্যবাদের মার্কসীয় ব্যাখ্যা খন্ডন করার চেষ্টা এবং অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা থেকেই কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর ইতিহাস রচনার বাসনা জেগেছিল বলে মনে করা হয়। এই নানা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা অনুসরণ করেছিলেন আচার্য লুই নেমিয়ারের পদ্ধতি। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী নেমিয়ারের ইতিহাসতত্ত্বের ও ধ্যানধারণার উত্তরাধিকারীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন।

অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নেমিয়ার (Namier) কোন মহৎ আদর্শের দিক তো দেখেনইনি, বরং তিনি দেখেছিলেন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত ছোট বড় গোষ্ঠীর স্বার্থদ্বন্দ্ব। তিনি পৃষ্ঠপোষক ও অনুগৃহীতের সম্পর্কের আলোকে (Patron-Client relationship) ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসের বিচার করেন। পরে সমসাময়িক পূর্ব ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাকালে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি তাকে যুক্তিবোধবর্জিত আবেগপ্রবণ ও নৈরাজ্যপ্রসূত বলে মনে করেছিলেন। এক্ষেত্রে ফ্রয়েডের অযৌক্তিকতার ভাবাদর্শ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর স্বদেশ ত্যাগের ও ইংলন্ডে পুনর্বাসনের ঘটনা। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদকে দায়ী করেছিলেন। অন্যদিকে যে ইংলন্ডে তিনি বসবাস করতে এলেন সেখানে উদারতন্ত্রের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে শুরু হয়েছে এলিয়টের 'পোড়োজমির' যুগ। এই মর্মান্তিক পরিবেশে নেমিয়ারের ইতিহাসচর্চা স্বাভাবিক কারণেই এলিটপন্থী, রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবিরোধী রূপ নিল। আর তার উত্তরসাধক কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী সাম্রাজ্যের অবসান ও ঠান্ডা লড়াই এর মনস্তত্ত্বে নেমিয়ারকে আদর্শ হিসেবে বরণ করে নিলেন।

কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গ্যালাহার, অনিল শীল, জনসন এবং বেকার। এরপর এঁদের শিষ্যরা এই মতাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যান নানা গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। গ্যালাহার, জনসন ও শীল সম্পাদিত 'Locality, Province and Nation'এ জোর দেওয়া হল বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের ওপর। তাঁদের মতে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ঐক্য খোঁজার চেষ্টাকে তাঁরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন এবং রোমান্টিকতা ও অজ্ঞতার নামান্তর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বরং ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য প্রথম থেকেই ব্রিটিশ এবং অন্য ইউরোপীয় বণিকদের চোখে পড়েছিল। আরও দেখেছিল, সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা নিয়ে সর্বত্র ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। এখানকার মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেতে হলে এদের একাংশকে পক্ষে নিতে হবে, এবং অপর অংশের বিরাগভাজন হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এই সহযোগিতা ও বিরোধ বারবার লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় স্তরে সহযোগিতার নীতি ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। তেমনি স্থানীয় বিরোধিতা প্রথমে আঞ্চলিক ও পরে জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়েছিল। কোনরকম উদ্দেশ্য, সাধারণ লক্ষ্য বা আদর্শবাদ এ ক্ষেত্রে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। বাংলায় কৃষ্ণদাস পাল ও সুরেন ব্যানার্জীর দল, পাঞ্জাবে মহাত্মা ও কলেজ দল, মহারাষ্ট্রে ডেকান সোসাইটি ও পুণা সার্বজনিক সভার নেতৃত্ব নিয়ে তিলক ও গোখলের দল যে কলহে

লিপ্ত হয়েছিল তাই প্রসারিত হয়েছে কংগ্রেসের সভামন্ডপে। ক্ষমতা রক্ষা ও ক্ষমতা দখলের জন্য এক অঞ্চলের গোষ্ঠী অন্য অঞ্চলের সমধর্মী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ দখলের চেষ্টা করেছে। এর ফলে শেষ অবধি কংগ্রেস একটা 'নড়বড়ে কোয়ালিশনে' থেকে গেছে। তাই ভারতীয় গৌরবময় সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাস সীমাবদ্ধ থেকেছে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র জয়-পরাজয়, ক্রমাগত দলবদলের ও নতুন চক্র গঠনের মধ্যে। কোন আদর্শবাদ বা লক্ষ্য এই সংগ্রামের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের এই সব মতামতের উপর লুই নেমিয়ারের ছায়া পড়েছে। কারণ অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ রাজনীতির সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নেমিয়ারও কোন মহৎ আদর্শবাদের সন্ধান পাননি।

কেম্ব্রিজ গোষ্ঠী স্বীকার করেছে যে সাম্রাজ্যের স্বার্থে এবং ব্রিটিশ শক্তির যে দুর্বলতা ছিল তা পূরণ করার জন্যই তাদের ভারতীয় সহযোগীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। এত বড় সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে অর্থবল, অস্ত্রবল, লোকবল, এমন কি শেষের দিকে মনোবল দরকার ছিল, তা ব্রিটিশ শক্তির ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রদেশে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরাজদের প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ক্ষমতাবান গোষ্ঠী সুবিধা পাওয়ার জন্য রাজনীতি শুরু করে। এই রাজনীতি শুরু হয় পোষ্য ও পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। এইভাবে ভারতীয় রাজনীতি গড়ে উঠতে লাগল পোষ্য ও পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে বড় বড় নেতার আবির্ভাব ঘটল যারা স্থানীয় ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য দালালের ভূমিকা পালন করল। এই ভাবে গোটা ভারতে ইংরেজ শাসন চলাকালীন রাজনৈতিক দালাল তৈরি হল। তাই ভারতীয় রাজনীতির কোন পটভূমিকা নেই, শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত হয়েছে। আর কংগ্রেস সভামঞ্চে ঘটেছে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিরোধের পুনরভিনয়। ইংরেজ শাসন যতদিন ছিল পরোক্ষ, স্থানীয় সহায় সম্পদ বন্টনে তা প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনি, ততদিন কোন প্রতিরোধ বা অসন্তোষ দেখা যায়নি। কিন্তু যখন আঞ্চলিক স্বার্থে হস্তক্ষেপ শুরু হল তখনই প্রতিরোধ এল। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা প্রভৃতি সুযোগ দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তা কোনক্রমে ঠেকিয়ে রাখা গেল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ ও শাসন সংস্কার থেকে যে পতনের শুরু হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও ক্ষমতা হস্তান্তরে তার অবসান ঘটল। ভারত জোড়া অসংখ্য দাবার ছকে জয়-পরাজয়ের ভারসাম্য না রাখতে পেরে ইংরেজকে বিদায় নিতে হল। তাই গ্যালাহারের ভাষায় বলা যায়, পিকউইক ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ এই দুই 'খড়ের পুতুলের লড়াইকে' কে প্রকৃত সংগ্রাম বলবে? ভারতের জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অবজ্ঞা এখানে সুস্পষ্ট। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের লড়াই একটা বড় ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। ....."it was nothing more than a battle between the two men of straws". এই কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'Nation in making' ধারণাকে অস্বীকার করেছেন এবং ভারতের অখন্ডতা নস্যাৎ করে দিয়ে জাতপাত ভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক বিচ্ছিন্ন, খন্ড রাজনীতিকেই মুখ্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং জাতীয়তাবাদকে নিছক একটা আবরণ বলে গন্য করেছেন। ভারত বলতে তাঁরা বুঝেছেন জাতপাত, ধর্ম, জনগোষ্ঠী ও স্বার্থ নিয়ে গড়ে উঠা এক দেশ। এদের মতে সমাজের উচ্চকোটির সংকীর্ণ স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই বা তাদের অধীনস্থ গোষ্ঠী ও তার স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই জাতীয় আন্দোলনকে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম জনগণের আন্দোলন ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানের আদর্শকে তাঁরা অবান্তর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ইতিহাসে পোষ্য-পৃষ্ঠপোষকের সম্পর্ককে একমাত্র বড় করে দেখানো হয়েছে। তাই এই সম্পর্ককে বড় করে দেখাতে গিয়ে বেইলি (C.A. Bayly) ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এলাহাবাদের উপর রচিত গ্রন্থটির সমাপ্তি টেনেছেন। এলাহাবাদের ক্ষেত্রে বেইলি, দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে ওয়াশব্রুক, (D.A. Washbrook), বোম্বাই এর নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের ক্ষেত্রে

গর্ডন জনসন (Gordon Johnson) এবং যুক্ত প্রদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রে রবিনসন (F. Robinson) প্রভৃতি তাঁদের গ্রন্থে বলবার চেষ্টা করেছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশে পৃষ্ঠপোষাক-পোষ্য সম্পর্কের ভিত্তিতেই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো প্রাদেশিক, এমন কি জাতীয় মঞ্চে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

তবে কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণের বেতার যন্ত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য একেবারেই ধরা পড়েনি। তাঁরা তাদের মনগড়া ইতিহাস লিখেছেন যা একপেশে এবং অর্ধসত্য। ঐতিহাসিক S. Gopal এই গোষ্ঠীর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে শোভনতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং নিঃস্বার্থ দায়বদ্ধতা ছিল সে কথা এই ঘরানা একেবারেই ভুলে গেছে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী এঁদের মতামতকে খন্ডন করে বলেছেন যে, এই ঘরানা যখন দেশব্যাপী জরিমানা, পিটুনি কর, সম্পত্তি ক্রোক, লাঠি ও গুলি চালনা, পুলিশ হাজতে অকথ্য অত্যাচার, নির্জন কারাবাস, ফাঁসির মঞ্চে জীবনদান সব ভুলে গিয়ে অসংখ্য জ্ঞাত ও ততোধিক অজ্ঞাত নর-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আত্মবলিদানকে অগ্রাহ্য করেন, তখন মনে হয় এ ধরনের বিশ্লেষণে কোথায় একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, নেতারা ভাবী মন্ত্রিত্ব বা ব্যবসার সুবিধা বা ভালো চাকুরির লোভে দুঃখবরণ করেছেন, জনগণও নিশ্চয় তা করেননি। বারদোলি, মেদিনীপুরের কৃষক, বোম্বাই এর শ্রমিক, অন্ধ্রের আদিবাসী, সীমান্ত প্রদেশের খুদাই খিদমদগার সবাই হয় কোন মন্ত্র বা স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই অধ্যাপক ত্রিপাঠী আক্ষেপের সুরে বলেছেনঃ 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।' তাই অধ্যাপক ত্রিপাঠী যুক্তিসহকারে নেতাদের প্রতি তাঁদের নানা অভিযোগ খন্ডন করেছেন। অধ্যাপক বিপান চন্দ্রও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিম্নবর্গ, মধ্যবিত্ত, নারী সমাজের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ভুলভ্রান্তি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

৭.৫.৯.১.৪ : জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগোষ্ঠীও তাদের মতাদর্শ উপস্থাপিত করেছেন। এই জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার ধারাটি ঔপনিবেশিক যুগে যে সব ঐতিহাসিকদের লেখায় তুলে ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— লালা লাজপৎ রায়, দাদাভাই নৌরজী, পট্টভি সীতারামাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, জওহরলাল নেহেরু, সি.এফ. অ্যান্ড্রুজ ও গিরিশ মুখার্জীর মত লেখক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন তারাচাঁদ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বি.আর নন্দ, বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, এস. গোপাল, অমলেশ ত্রিপাঠী, বিমান বিহারী মজুমদার ও আরও অনেকে। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় ইংরেজ শাসনের শোষণ, অত্যাচার এবং কুফলগুলি তুলে ধরা হয়েছে। দাদাভাই নৌরজী থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মূল কথা হল- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কারণ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। এই সব ঐতিহাসিকেরা বেশ কিছু ব্যাপারে একমত না হলেও মোটামুটি একটি ব্যাপারে একমত যে, ইংরেজদের এদেশে আসার পূর্ব থেকেই ভারতীয়দের জাতীয় চেতনা ও স্বদেশী ঐতিহ্য ছিল। এ সমস্ত ঐতিহাসিকরা গুরুত্ব দেন ভারতবাসীর সংস্কৃতিগত ঐক্যের উপর। এই সংস্কৃতিগত ঐক্যের জন্যই এ দেশের মানুষ নিজেদের একটা দেশের, একটা জাতির সদস্য হিসেবে গণ্য করত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'A nation in making' বা জাতিরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার উপর তাঁরা জোর দিয়েছেন। এঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জনগণের সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই সংগ্রাম কোনও বিশেষ শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত হয়নি। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ দেখাতে চেয়েছেন যে, ঔপনিবেশিকতার নানাবিধ কুফল, শোষণ ও অপশাসনের ফলে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ হয়েছিল এবং তা সারা ভারতে ছড়িয়ে

পড়েছিল। জাতীয়তাবাদ যতই প্রবল হতে থাকল ভারতের জাতীয় সত্তা ততই স্পষ্ট হতে থাকল। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিস্কার ভাবেই উপলব্ধি করেছিল যে ব্রিটিশ শাসনে তাদের নানা আশা আকাঙ্খা পূরণ হবে না এবং তাদের হতাশা থেকে জন্ম নিয়েছিল দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাই তখন পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাল। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ভারতীয় নেতাদের নেতৃত্ব ও কৃতিত্বকে বড় করে তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের আদর্শ ও দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাদের মতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ক্রমে ক্রমে এক গণ- আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এর কারণ ব্রিটিশ অপশাসনে শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী ও অন্যান্য নানা নিম্নবর্গীয় মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর হতাশা, আশা-আকাঙ্খার সংযোগ ঘটায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সব শ্রেণীর মানুষ হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তবই এই আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, জাতীয়তাবাদের ইডিওলজি (আদর্শবাদ) ভারতে একটা বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদ ইতালি, জার্মানী, আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদের মতই প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক রূপ নিয়েছিল। কিন্তু সেই সংস্কৃতি ছিল high culture. তার পেছনে ছিল প্রথমে বেদান্ত, পরে মহাভারত ও ভাগবত, শেষে বেদ। পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভারতীয় চিন্তানায়করা বার্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল্য দিতে শিখেছিলেন। ম্যাৎসিনি থেকে শিখলেন তারা দেশপ্রেম। জার্মান রোমান্টিকদের অনুসরণ করে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য থেকে ভারতীয় সত্তার আদি ও অবিকৃত রূপটি খুঁজে পেতে চেষ্টা করলেন। এদেশের চিন্তানায়করা ব্রিটিশ ধ্যানধারণার অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে নিজেদের ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চাইলেন। নরমপন্থীরা প্রধানতঃ ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করলেন, চরমপন্থীরা সব ব্রিটিশ ধারণাকেই নস্যাৎ করে দিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গবেষণায় কৃতিত্ব দেখালেও জাতীয়তাবাদের আদর্শগত ধর্মীয় ভিত্তিভূমির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যার ফলে অন্যান্য বিষয়গুলি অনেক লঘু হয়ে পড়েছে।

অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন যে, ইতিহাস রচনার একটি প্রবণতা হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে জাতীয়তাবাদী লেখাপত্র সাধারণভাবে পর্যাপ্ত নয় বললেও কম বলা হয়। ১৯৫০ এর দশক অবধি ভারতীয় পন্ডিতরা এ-রকম বিষয় থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতেন। বরং পরিবর্তে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় রাজপুত বা মারাঠা আন্দোলনের নিরাপদ বিষয়ে লেখালেখি করে তাঁদের দেশপ্রেম ব্যক্ত করতে চাইতেন। সময়ে সময়ে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক বিকৃতিও খুবই স্পষ্ট ও বড় হয়ে উঠত। যেমন, স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিখ্যাত বই ''History of Freedom Movement'' (3vols) এর প্রতিটি খন্ডেই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু নিয়ে রীতিমতো ভজনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজাতি পরিমার্গকে খোলাখুলি মেনে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, আধুনিক ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যায়, তাঁরা, এমন কি দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্তের প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের অনুসন্ধানের ফলাফলকেও নিজেদের রচনার অঙ্গীভূত করতে চাননি। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে যে শ্রেণী সংঘাত ও বর্ণ বৈষম্যের দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ও জাতপাত সম্বন্ধে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে যে সব দ্বন্দ্ব রয়েছে তা গুরুত্ব না দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে গেছেন বা লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অথচ, বর্ণবিভেদ, শ্রেণীবিভেদ, জাতপাতের দ্বন্দ্ব তো ভারতীয় সমাজের মধ্যে ছিলই। এইসব তথ্যকে উপেক্ষা করলে ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের ও জাতীয় আন্দোলনের অনেক প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে যাবে। এই সব অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রায় সর্বদাই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী দল লড়াই করেছে, একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং একে অপরকে আক্রমণ পর্যন্ত করেছে। এইসব নানা সামাজিক টানাপোড়েনকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ যথার্থ প্রেক্ষাপটে তুলে ধরে বিচার করেননি। এর ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক বিষয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের নজর এড়িয়ে গেছে।

৭.৫.৯.১.৫ : মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের মার্কসীয় ভাষ্যটির প্রচলন করেছিলেন রজনী পাম দত্ত তাঁর 'India Today' গ্রন্থে। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান মানবেন্দ্রনাথ রায়, এ.আর. দেশাই, ই.এম.এস নাম্বুদ্রিপাদ, সুপ্রকাশ রায় প্রমুখ। এই ঘরানার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে রুশ মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের যেমন— Levkovsky, Goldberg, V.I. Pavlov-র মত সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণীগত বিষয়টি এবং শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তারা বলতে চেয়েছেন যে ঔপনিবেশিক যুগে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব ও বাজার অর্থনীতির প্রসারের প্রেক্ষাপটে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিচার করতে হবে। তাঁদের বিচারে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থবিজড়িত দ্বন্দ্ব অথবা শ্রেণী সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে চলেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম, আর অন্যদিকে চলেছে শ্রেণী সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্ব দিয়েছিল, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই বুর্জোয়ারা অবশ্য নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্যই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। অতত্রব বুর্জোয়া ভূমিকার কথা মেনে নিলেও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকগণ মুক্তিযুদ্ধের সর্বভারতীয় চরিত্র বিচার করেননি। রজনীপাম দত্ত তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি আধুনিক শিল্পের বিকাশের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এ.আর. দেশাই তাঁর 'Social Background of Indian Nationalism' গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে, ব্রিটিশ যুগে আধুনিক শিল্পের বিকাশের ফলে আধুনিক বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই আধুনিক বুর্জোয়ারা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে বিসর্জন দিয়েছেন অনেক সময়ে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে। সোভিয়েত ঐতিহাসিক Pavlov দেখিয়েছেন যে বিশ শতকে দেশীয় বুর্জোয়ারা এদেশীয় বাজার দখলের জন্য এখানকার বাজার থেকে বিদেশীদের বিতাড়নের লক্ষ্যে স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

তবে পুরোনো মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার পরিমার্জিত ও সংশোধিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এস.এন. মুখার্জী, সুমিত সরকার, বিপান চন্দ্র প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ। বিপানচন্দ্র পূর্বতন মার্কসবাদী ঘরানার সমালোচনা করে এই অভিযোগ করেছেন যে অনেক মার্কসবাদী লেখকই আমজনতাকে আন্দোলনে টেনে আনার রণনীতি, কর্মসূচী, মতাদর্শ, পরিসর নিয়ে মুক্তি সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল কতটা দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো হয়েছিল যে সব দিক নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা সঠিকভাবে চালান নি। 'India's Struggle for Independence' গ্রন্থে বিপানচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা বলতে চেয়েছেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হল প্রধানতঃ ভারতীয় জনগণের স্বার্থ ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব। ভারতীয় নেতৃত্ব প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা এবং অনুন্নত অবস্থা । এর কারণেই ঊনিশ

শতকে তাঁরাই প্রথম উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক দোষগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের অভিন্ন স্বার্থগুলি বুঝে নিয়ে জাতীয় নেতারা ক্রমশ একটি সুস্পষ্ট উপনিবেশ বিরোধী মতাদর্শ তৈরি করতে পেরেছিলেন যার উপর ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। জাতীয় নেতারা মনে করতেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও কাজ হল ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ লড়াই এর মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করা। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে দেখা হয়েছিল একাধারে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে ওঠার বা জাতিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার ফসল এবং এই প্রক্রিয়ার এক সক্রিয় শক্তি হিসেবে। সুমিত সরকারের মতে, গোড়ার দিকের মার্কসবাদী ঘরানা শ্রেণী বিশ্লেষণের প্রয়োগে কখনও কখনও খানিকটা যান্ত্রিক। তিনি তাঁর 'Modern India' গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে যে দুটি স্তর চিহ্নিত করেছেন তা হলো, শিরোমণিতান্ত্রিক এবং লোকায়ত। তার মতে, এই লোকায়ত দিকটি বারবারই উপেক্ষিত থেকে গেছে। এমন কি গোড়ার দিকের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরাও এই লোকায়ত বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই সুমিত সরকার 'তলা থেকে ইতিহাস' (History from below) লেখার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীগণ মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার সমালোচনা করে বলেছেন যে মার্কসবাদীরা নিম্নবর্গের পৃথক অস্তিত্বের কথা মেনে নিলেও এদের কর্মপদ্ধতিকে তাঁরা দেখেছেন কেবলমাত্র একটি শ্রেণীসংগ্রাম (Class struggle) হিসেবে। কিন্তু নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চাকারীরা মনে করেন, ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষক চেতনার পরিবর্তনের সমস্যা ও জটিলতা কোনও ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধারণা বা সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

৭.৫.৯.১.৬ : নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধরনের গবেষণার এবং আকর্ষণীয় আলোচনার সৃষ্টি করেছেন 'সাবল্টার্ন' (Subaltern) বা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীগণ। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ জাতীয়তাবাদী এবং মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের এবং তাদের পূর্ববর্তী সব ইতিহাসতত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করে তা বর্জন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে পূর্বের সব ইতিহাসতত্ত্ব 'আচ্ছাদিত' এবং অস্পষ্ট, পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। পূর্বের সব ইতিহাসচর্চার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারিগণ শুধু এক নতুন দিক নির্দেশই করেননি, সেই সঙ্গে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র এবং উজ্জ্বল ধারার সৃষ্টি করেছেন। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে আমাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর ও গভীরতর করেছে। অবশ্য এর মধ্যে অনেক অপূর্ণতাও থেকে গেছে।

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক রণজিৎ গুহ ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'Subaltern Studies' এর প্রথম খন্ড প্রকাশনার মাধ্যমে। এই প্রথম খন্ডের শুরুতেই ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক গুহ বলেন, 'The historiography of Indian Nationalism has for a long time been dominated by elitism-Colonialist elitism and bourgeois nationalist elitism''. সাবলটার্ন স্টাডিজের বিভিন্ন খন্ডে এই মতাদর্শই ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁদের মতে, ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে যে মূল সংঘাত দেখা গিয়েছিল তার এক মেরুতে অবস্থান করেছিল যথাক্রমে দেশী-বিদেশী elite শ্রেণী এবং উচ্চবর্গ শ্রেণী। একেবারে অন্য মেরুতে ছিল নিম্নবর্গ বা 'Subaltern' শ্রেণী। এই চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হলেন-রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, শহিদ আমিন, দীপেশ চক্রবর্ত্তী, ডেভিড আর্নল্ড, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের গবেষণায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চায় যে উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বারবার পাওয়া যায় তার বিরোধিতা করে নিম্নবর্গের

প্রকৃত ভূমিকা তুলে ধরার একটা ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না এবং ভারতীয় জনগণ কখনই উচ্চবর্গের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেননি। বরং নিম্নবর্গই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করেছিল এবং সেই সঙ্গে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল দেশী-বিদেশী এলিট (Elite) শ্রেণীর বিরুদ্ধে। এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠী মনে করে যে কেম্ব্রিজ ও জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি তে কেবলমাত্র গুরুত্ব পেয়েছে উচ্চবর্গের ইতিহাস ও তাদের নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। নিম্নবর্গের মানুষরা সেখানে ব্রাত্য উপেক্ষার পাত্র এবং উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা চালিত। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার সমালোচনা করে এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠী এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ আমজনতার প্রতিবাদী আন্দোলনকে কেবলমাত্র ঔপনিবেশিকতা ও ভারতীয় জনগণের সংঘাতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিশ্লেষণ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাদের কাছে সমস্ত প্রতিবাদী আন্দোলনই উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন বলে মনে হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সব আন্দোলন হয়েছে সেগুলোকেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এর বাইরেও যে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন হয়েছে সেগুলোকে জাতীয় কংগ্রেসের মূল স্রোতের টানে ক্ষুদ্র খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে দেখেছেন। অন্যদিকে মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার সমালোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন যে, মার্কসবাদীরা নিম্নবর্গের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলেও তাদের সব কর্মপদ্ধতিকে যান্ত্রিক মার্কসবাদী শ্রেণীসংগ্রাম (Class struggle) হিসেবে দেখেছেন এবং শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন, ভারতবর্ষের মত কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষক চৈতন্যের পরিবর্তনের নানা সমস্যা ও জটিলতা কোনও ঐতিহাসিক অনিবার্যতা বা তাত্ত্বিক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা একেবারেই সঠিক হবে না।

এই মতাদর্শের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা রণজিৎ গুহ ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় সুদীর্ঘকাল ধরে বিদেশী উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে এসেছে। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় এই উভয় ধরনের উচ্চবর্গীয় আধিপত্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। রণজিৎ গুহের মতে, সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম হল উচ্চবর্গের কার্যকলাপের ফসল। এই দুটি ইতিহাসের কোনটিতেই নিম্নবর্গের স্বকীয় রাজনীতি, তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, তাদের আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য বা জনগণের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রকৃত অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে কিছুই আলোকপাত করা হয়নি।

তাই রণজিৎ গুহ তাঁর বিখ্যাত 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India' গ্রন্থে এবং তাঁর অনুগামী গবেষকরা যেমন-ডেভিড হার্ডিম্যান, ডেভিড আর্নল্ড, শাহিদ আমিন, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, পার্থ চ্যাটার্জী, দীপেশ চক্রবর্ত্তী, গৌমত ভদ্র প্রমুখরা তাঁদের নানা রচনায় নিম্নবর্গের প্রতিরোধ আন্দোলন, রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দিক নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে অযোধ্যায় কৃষক বিদ্রোহে (১৯১৯-২২) কৃষকদের প্রাথমিক সুযোগ্য নেতৃত্বের কথা, ডেভিড হার্ডিম্যান গুজরাটের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের কথা এবং এইসব আন্দোলনের নিজস্ব চরিত্র ও গতির ইতিহাস লিখেছেন। গোরখপুরের কৃষক আন্দোলন অবশেষে কিভাবে একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন শাহিদ আমিন তাঁর 'Sugar Cane and Sugar in Gorokhpur' গ্রন্থে। এছাড়া গৌতম ভদ্রের 'মুঘলযুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ' এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'Bengal 1920-1947: The Land Question নিম্নবর্গের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রের কথাই জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে।

'সাবলটার্ন' ঐতিহাসিকগণ ইতালির বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির লেখা থেকে তাঁদের Subaltern চেতনার ও ইতিহাসচর্চার প্রেরণা ও উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। গ্রামশির বিখ্যাত 'Prison

Notebooks' -এ এই শব্দটির ('Subaltern') ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু এটা বলা দরকার যে গ্রামশির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তিনি 'সাবলটার্ন' শব্দটি 'প্রেলেতারিয়েট' এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রণজিৎ গুহ ও তাঁর অনুগামীরা এই 'Subaltern' তত্ত্বের ধারণাটিকে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সূত্ররূপে গ্রহণ করে যত্রতত্র একে নির্বিচারে ব্যবহার করে চলেছেন। এর ফলে তাঁদের বিচার ধারার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ঘরানার সাদৃশ্য রয়ে গেছে। কেম্ব্রিজ গোষ্ঠী ও সাবলটার্ন গোষ্ঠীর বক্তব্যের মধ্যে বহু মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সাবলটার্ন ঐতিহাসিকগোষ্ঠীর রচনায় নিম্নবর্গের শুধু জয়গান করা হয়েছে। উচ্চবর্গের বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত প্রচেষ্টা, কার্যকলাপ, অবদানের গুরুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে এবং এদের সম্পর্কে নেতিবাচক মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বামপন্থী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেনঃ..... 'This (Subaltern) approach is characterised by a generally 'ahistorical' glorification of all forms of popular militancy and consciousness.....'' সাবলটার্ন স্টাডিজ এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মেটালিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক এর প্রবন্ধে। ১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য', এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কিভাবে নির্মাণ করা যায়, সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। হাজার আওয়াজের ভিতর থেকে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আলাদা করে বের করে আনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইতিহাসের দলিলে যে কণ্ঠস্বরই শোনা যাক না কেন, তা নিম্নবর্গের নয়, অন্যের নির্মাণ। গায়ত্রী স্পিভ্যাক আরও বললেন, এই নির্মাণের সামাজিক পদ্ধতিগুলো কী, কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তা তৈরী হয়, কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায়, সে সব প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মোটামুটিভাবে এই সমালোচনার পর থেকে সাবলটার্ন ইতিহাসচর্চায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম-ষষ্ঠ খন্ড থেকে সাবলটার্ন স্টাডিজ-এ প্রকাশিত গবেষণায় নতুন ঝোঁক এবং পুরোনো আদিকল্পের বা মডেলের সংশোধন, পরিবর্তন বা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এখন থেকে স্পষ্টই স্বীকার করে নেওয়া হল যে, নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ। আগের সঙ্গে নতুন পর্বের চিন্তা-ভাবনার পার্থক্য হল এই যে, ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, এই অতি সরল ধারণাটি এখন পরিত্যাগ করা হল। আশির দশকের শেষে এসে দেখা গেল নতুন এক ব্যাখ্যায় 'আধিপত্য' বলতে কেবলই বোঝানো হচ্ছে এক সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আবহকে। নিম্নবর্গ সেখানে নানা ধরনের গ্রস্ত সাংস্কৃতিক ভুবন। আগেকার সমাজ-অর্থনৈতিক আলোচনা থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছেন নব্যপন্থীরা। এখন দেখা যাচ্ছে, 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এর কোনও নির্দিষ্ট' বিষয়গত সীমারেখা থাকছে না। সব বিষয় নিয়েই সেখানে লেখা শুরু হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীগণ নিজেরা উচ্চবর্গভুক্ত এবং তাঁদের রচিত ইতিহাসের প্রায় সবটাই এসেছে উচ্চবর্গীয় ইতিহাসের উৎসসমূহ থেকে। নূতন উৎস তাঁরা খুঁজে পান নি। তাই নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় তথ্যের সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর এ প্রসঙ্গে মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁর ভাষায়, সীমিত তথ্যে নিম্নবর্গের ইতিহাসকারেরা বিশাল সৌধ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। সুতরাং, সে স্বপ্ন সব সময় বাস্তবের খুব কাছাকাছি এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, সাবলটার্ন ইতিহাসচর্চা 'নিম্নবর্গকে'

ইতিহাসের গৌরবময় পৃষ্ঠায় টেনে তুলে নিয়ে এসেছে। 'History from below' তাঁদের রচনায় শুধু যে গুরুত্ব পেয়েছে তা নয়, নিম্নবর্গই সেই ইতিহাসের নায়ক, তাঁরা একটা ব্যাপার স্পষ্ট করেছেন—স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যবিত্তই একমাত্র নায়ক নয়।

৭.৫.৯.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) Ranajit Guha (ed) 'Subaltern Studies' (all Volumes)

(২) Sumit Sarkar–Modern India 1885-1947

(৩) Amales Tripathi– স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(৪) Bipan Chandra–(a) Modern India (ed) (b) India's struggle for Independence.

(৫) Rajani Palme Dutt–India Today

(৬) Gautam Bhadra & Partha Chattopadhyay– নিম্নবর্গের ইতিহাস (e.d)

(৭) A.R. Desai–Social Background of Indian Nationalism

(৮) Bruce T. Mccully–English Education and the origins of Indian Nationalism'

৭.৫.৯.১.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর মতাদর্শের মূল্যায়ন কর।

(২) সাম্রাজ্যবাদী ও কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন।

(৩) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসবাদী ইতিহাসকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির বিচার কর। এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন কি লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

(৪) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের ইতিহাসচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। এই ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা কি?

(৫) 'সাবলটার্ন' ইতিহাসচর্চার উদ্ভব কেন এবং কিভাবে হল? এক্ষেত্রে গ্রামশির অবদান আলোচনা কর।

(৬) 'সাবলটার্ন' ইতিহাসচর্চার গুণাগুণ বিচার কর। এই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বর্তমানে কি কি পরিবর্তন ও সংশোধন লক্ষ্য করা যায়?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি (১৮৮৫)

Origin of Indian National Congress 1885

গঠন (Structure) :

৭.৫.৯.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.৫.৯.২.১ : সুচনা

৭.৫.৯.২.২ : কংগ্রেসের জন্ম নিয়ে নানা ঐতিহাসিক বিতর্ক—বিতর্কের আলোচনা ও মন্তব্য

৭.৫.৯.২.৩ : উপসংহার

৭.৫.৯.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৫.৯.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৫.৯.২.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) কংগ্রেসের জন্মবৃত্তান্ত

(২) জন্ম নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিতর্ক

(৩) বিতর্কের নানা দিক

(৪) সিদ্ধান্ত বা নিরপেক্ষ মতামত

৭.৫.৯.২.১ : সুচনা

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক রয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায় পট্টভি সীতারামায়ার লেখা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে এবং ওয়েণ্ডারবার্নের লেখা হিউমের জীবনী গ্রন্থ থেকে।

৭.৫.৯.২.২ : কংগ্রেসের জন্ম নিয়ে নানা ঐতিহাসিক বিতর্ক

কারো কারো মতে, থিওজফিস্টরা (Theosophists) জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে কর্নেল অলকট, ১৮৮৩ তে রঘুনাথ রাও, ১৮৮৯ তে নরেন্দ্রনাথ সেন দাবি করেন যে থিওজফিস্টরাই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৫ তে অ্যানি বেসান্ট এই মত সমর্থন করেছিলেন। অন্যদিকে আবার কেউ কেউ অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমকে কংগ্রেসের স্রষ্টা ও জনক বলে অভিহিত করেছেন। এই দলে আছেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সভাপতি ওয়েণ্ডারবার্ন, কংগ্রেসের সরকারী ঐতিহাসিক পট্টভি সীতারামায়া এবং কংগ্রেসের কঠিনতম সমালোচক মার্কসবাদী ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী নানা সাক্ষ্যপ্রমাণাদির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত অমূলক প্রমাণ করেছিলেন। পরে অনিল শীল ও বৃটন মার্টিন অধ্যাপক ত্রিপাঠীর বক্তব্য মেনে নিয়েছেন।

ওয়েণ্ডারবার্নের ভাষায়, লিটনের আমলের শেষদিকে সরকারের অন্যতম সচিব হিউমের হাতে এমন সব কাগজপত্র আসে যাতে তাঁর বিশ্বাস হয় যে ভারতে গণবিদ্রোহ আসন্ন। এটা দানা বাঁধলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্ব দেবে। বিদ্রোহের ফল মঙ্গলজনক হবে না মনে করে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং বিশেষ করে যুবকদের মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চান। ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে তিনি তাদের দেশপ্রেম ও ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করেন। একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল প্রাদেশিক সমিতিগুলি রাজনীতি করুক, সর্বভারতীয় সম্মেলন করবে সামাজিক সমস্যা বিচার। যেখানে প্রাদেশিক ছোটলাট সভাপতিত্ব করবেন এবং ভারতীয় নেতা ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্যই কংগ্রেসের মত এক Safety Valve তৈরী করতে হিউম উদ্যোগী হন। তাঁর ভাষায় ''A Safety Valve for the escape of great and growing forces...urgently needed''। এই সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ডাফরিন। ডাফরিনের নির্দেশেই তিনি কংগ্রেস

এর মতো একটি সংগঠন গড়ার কথা চিন্তা করেন এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। নেতৃবর্গ এবং ডাফরিনের এরকম সংগঠন গড়ার যুক্তি ও প্রস্তাব সমর্থন করে তা কার্যকরী করতে এগিয়ে যান হিউম। তবে ডাফরিনের নির্দেশ সংক্রান্ত ব্যাপারটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য সে ব্যাপারে তথ্যের অভাব রয়েছে। কারণ হিউম সম্পর্কে ডাফরিনের মনোভাব থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাফরিন হিউমকে একজন পূর্বতন সরকারী কর্মচারীর বেশি মর্যাদা দেননি এবং হিউম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল যে হিউম ''seemed to have got a bee in his bonnet''। আসলে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ''Introduction to Indian Politics'' (১৮৯৮) গ্রন্থে হিউমের সঙ্গে কংগ্রেসের মতো সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে ডাফরিনের আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হিউম বলেছিলেন যে, প্রতি বছর ভারতীয় নেতারা সামাজিক সংস্কার নিয়ে একটি বৈঠকে মিলিত হবে এবং হিউমকে ভাইসরয় পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই সভাগুলিতে রাজনৈতিক সমস্যাবলী আলোচিত হলে সরকার পূর্বেই পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে। তিনি তা সত্ত্বেও ডাফরিন এ ধরনের সমাজ সংস্কার সভার কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে যা দরকার তা হল সরকারী নীতির দায়িত্ববান সমালোচনা তাকে আরও ভাল করার প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক। এ ধরনের সভায় প্রাদেশিক লাটের উপস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়াবে। হিউম নিজের ও ডাফরিনের প্রস্তাব ভারতীয় নেতাদের সামনে উপস্থিত করলেন— কোনটা কার না জানিয়ে। তাঁরা ডাফরিনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ঠিক হল ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর (১৮৮৫) পুণায় বসবে সেই সর্বভারতীয় সম্মেলন। হিউম তার নাম দিয়েছিলেন Indian National Union। মাদ্রাজ ও কলকাতা ঘুরে জনমত সংগ্রহ করে হিউম বিলেতে গেলেন লিবারেল নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। পুণায় কলেরা দেখা দেওয়ায় শেষ মুহূর্তে সম্মেলনের স্থান সরিয়ে নেওয়া হল বোম্বাই শহরে। সেই সম্মেলনের নাম বদলে রাখা হল Indian National Congress । কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এভাবে ঘটেনি। বাঙ্গালী নেতৃত্বের, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা এতে ছোট করে দেখানো হয়েছে। বাঙ্গালী নেতৃত্বের, বিশেষতর সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা, এতে ছোট করে দেখানো হয়েছে। হিউমের মনে সর্বভারতীয় সম্মেলনের কথা উঠবার আগেই সুরেন্দ্রনাথ তা ভেবেছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে মে তাঁর পত্রিকা 'Bengalee'-তে আমরা প্রথম National Congress কথাটি পাই। এর উদ্দেশ্য হবে 'to prepare the way for concerted action in reference no political matters among the different political badies scattered throughout the country'.প্রথম কংগ্রেসের (১৮৮৫) দুই বছর পূর্বে তাঁর জাতীয় কনফারেন্সের প্রথম (কলকাতা) অধিবেশনকে জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া বলা চলে। আর ভারতীয় নেতারা কোনকালেই ডাফরিন বা আমলাদের সঙ্গে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, 'হিউমের নানা স্বকপোল কল্পিত উক্তি ও তার ওয়েণ্ডারবার্ন উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভাষ্য ইতিহাস বলে চলছে। তার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে রজনী পাম দত্তও ভুল করেছেন।'

তবে হিউম সম্পর্কে ডাফরিনের মন্তব্য 'Seems to have got a bee in his bonnet' (মনে হয় তাঁর মাথায় ছিট রয়েছে) সমীচীন হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতীয়দের জন্য কিছু করার চিন্তা তাঁর মনে ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের বেড়াজালে আটকে পড়ে তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হয়। সব সময় তিনি গণ বিদ্রোহের দুঃস্বপ্ন দেখতেন। অবশ্যই ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুভাবে তিনি অবিচল ছিলেন। এজন্য তাঁকে আমলাদের বিরাগভাজন হতে হয়। লীটন তাঁকে উত্তর প্রদেশে বদলি করলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। রিপনের স্বায়ত্বশাসন প্রস্তাব (১৮ই মে ১৮৮২) তাঁকে আবার সক্রিয় রাজনীতির দিকে টেনে আনল। রিপন হিউমের অভিজ্ঞতা ও ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য কাজে লাগাতে চাইলেন। হিউম তদানীন্তন পরিস্থিতি কাজে

লাগিয়ে রিপনের বিশ্বাসভাজন হয়ে গেলেন এবং জনমতকে কিছুটা খুশি করার জন্য রিপন তাঁর স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রস্তাবটিকে পেশ করলেন। এভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ইলবার্ট বিল নিয়ে যে বিক্ষোভ ছিল তা রিপন কিছুটা প্রশমিত করলেন। এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এবং সরকারী অনুগ্রহ লাভ করে হিউম একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন। ভারতীয়দের তীব্র ব্রিটিশ বিদ্বেষে প্রলেপ দেওয়ার জন্য তিনি একটা 'Safety Valve' এর আস্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে যে সব অভাব-অভিযোগ আছে সেগুলি শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে সরকারের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ দূর করা হলে গণবিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকবে না।

ডঃ অনিল শীলের মতে, হিউম কংগ্রেসকে একটি 'Safety Valve' হিসাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ভারতীয় জনমতের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের পূর্বাভাস পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এস.আর. মেহরোত্রা কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে হিউম ছিলেন ভারতীয় ভারতীয়দের বিশেষ বন্ধু। ভারতীয়দের প্রতি দুর্বলতা এবং সরকারী সমালোচনার জন্য তাকে চাকুরি থেকে অবসর নিতে হয়েছিল। ঠিক একই মত পোষণ করেছেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি হিউমের লেখা সরকারী নানা চিঠি — পত্রের উল্লেখ করেছেন।

বিপানচন্দ্র, বরুণ দে, অমলেশ ত্রিপাঠী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ অবশ্য কংগ্রেসের উৎপত্তিতে হিউমের অবদানের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, জাতীয় কংগ্রেস কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা হিসাবে হিউমের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের আলোচনার বিষয়টি পুরোপুরি ঠিক নয়। এই ব্যাপারে হিউমের ভূমিকা ও উদ্দেশ্যের একটা সীমিত আভাস পাওয়া গেলেও একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় নেতারা কেন এত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার ব্যাখ্যা মেলে না। বরং ভারতীয় নেতৃত্ব নূতন সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যার মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করা যাবে। এইসব নেতারা দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং বিদেশী সরকারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা তাই ভেবেছিলেন যে হিউমের মতো একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর সাহায্য পাওয়া গেলে তাদের কার্যকলাপ নিয়ে সরকারী মহলে সন্দেহ দেখা, দেবে না। তাই যদি বলা যায় যে হিউমের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে 'Safety Valve' রূপে ব্যবহার করা তাহলে একথা বলতে হয় যে কংগ্রেস নেতারা হিউমকে 'hightening Conductor' রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রজনীপাম দত্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে হিউম, ডাফরিন ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এক গভীরতর ষড়যন্ত্রের (Conspiracy theory) উল্লেখ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্বল্প—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এর আংশিক সমর্থন এসেছে এস.আর. মেহরোত্রার (S.R. Mehrotra) 'The Emergence of the Indian National Congress'' পুস্তকে। তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি রিপনকে লেখা হিউমের ১৩ জানুয়ারী, ১৮৮৯ এর চিঠি। মেহরোত্রার মতে হিউম এ ব্যাপারে ডাফরিনের মত চেয়েছিলেন এবং বোম্বাই এর ছোটলাট লর্ড রিএ (Reay)-র সভাপতিত্বের প্রস্তাব ছাড়া অন্য ব্যাপারে সম্মতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক ত্রিপাঠী এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ডাফরিন কোনও দিন এরকম প্রতিষ্ঠান তো চানইনি, পরেও তাকে সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ডাফরিন যদি কংগ্রেসের মত কোন প্রতিষ্ঠান হোক চাইতেন তাহলে ১৮৮২-র ৩০ শে নভেম্বর সেন্ট অ্যানড্রুজ ডে ডিনার বক্তৃতায় তাকে 'অনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি' বলে উপহাস করতেন না। অর্থাৎ ডাফরিন সম্বন্ধে অনেক মনগড়া কথা হিউম বলতেন, উমেশ

চন্দ্রদের কাছেও বলেছেন। তারই ওপর ভিত্তি করে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের জন্মকাহিনী লেখেন এবং সীতারামায়া, রজনীপাম দত্ত সবাই তা বিশ্বাস করে বসেন। আসলে অধ্যাপক ত্রিপাঠী মনে করেন, হিউম নিজের ধারণা অন্যের ওপর চাপাতে চেয়েছিলেন। হয়তো বা ডাফরিনের প্রশ্রয় আছে বলে তিনি ভারতীয়দের বিশ্বাসভাজন হতে চেয়েছিলেন।

এইসব নানা কারণেই হিউমের Safety Valve তত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ত্রিপাঠী, বিপান চন্দ্র, বরুণ দে প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এই তত্বের অসারতা প্রমাণ করেছেন। এমন কি ওয়েণ্ডারবার্নের সাত খণ্ডের সরকারী গোপন নথির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তুলেছেন। অতএব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে হিউম বর্ণিত আসন্ন বিদ্রোহের কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে হিউমকে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক' আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। তাঁর ভারত প্রীতি, সাংগঠনিক প্রতিভা, উদারতন্ত্রী মনোভাব ও বড়লাটদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের কথা মনে রেখেও বলা যেতে পারে যে, তিন প্রেসিডেন্সিতে, বিশেষ করে বাংলায় রাজনৈতিক চেতনা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এবং রিপনের শাসন সংস্কারের ফলে আশায় এবং ইলবার্ট বিলের পরাজয়ের ফলে হতাশায় যেভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল তাতে হিউম ছাড়াই কোন না কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হোতো। হয়তো তার কেন্দ্র হতো কলকাতা, আর কর্তা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তৈরিতে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে তা আধুনিক ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী স্বীকার করে নিয়েছেন। পট্টভি সীতারামায়া ১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারের মধ্যে যে কংগ্রেসের উৎস সন্ধান করেছেন সেই দরবার সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল সুরেন্দ্রনাথকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ওয়েণ্ডারবার্ন বা সীতারামায়া কারো লেখাতেই সুরেন্দ্রনাথের কোন উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, হিউম নিজেও কংগ্রের বোম্বাই গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমন কি 'Indian National Union' সম্পর্কে কথা বলতে কলকাতায় এসেও তিনি অন্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু আনন্দমোহন বসু বা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেননি। হিউমের বোম্বাই গোষ্ঠীর প্রতি প্রীতি এবং বোম্বাই গোষ্ঠীর মাদ্রাজ গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং কলকাতার নেতৃবৃন্দের প্রতি বীতরাগ নানা ঘটনায় সুস্পষ্ট। ডঃ ত্রিপাঠী মনে করেন যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যানি বেসান্ত, প্রমুখ সমকালীন লেখকদের ভাষ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। আসলে হিউমের আগেই সর্বভারতীয় সম্মেলনের কথা ভেবেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত National Conference এর মধ্যে তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়েছিল। অনিল শীল এই সম্মেলনকে আদৌ প্রতিনিধিত্বমূলক মনে না করলেও অধ্যাপক ত্রিপাঠীর মতে এই ধরনের সম্মেলন আহ্বান করাটাই ছিল বড় কথা। এই সমাবেশে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার সঙ্গে দু বছর পরে আহুত কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির সাদৃশ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই কারণেই অধ্যাপক ত্রিপাঠী ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনকে 'জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া' বলে উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও কংগ্রেস ছিল তাঁর মানস সন্তান।

৭.৫.৯.২.৩ : উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে কৃতিত্ব দেওয়া উচিত নয়। আবার জাতীয় কংগ্রেস সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দান তা মনে করা একেবারে ভুল হবে। হিউমের 'Safety Valve' তত্ত্ব জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের মূল কারণ সে কথাও বলা ঠিক হবে না। আসলে কংগ্রেসের জন্মের প্রেক্ষাপট দীর্ঘদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর ভারতীয় জনগণ ক্রমশঃই সচেতন হয়ে উঠেছিলন।

ভারতের রাজনীতি সচেতন সমাজ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্যে একটি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন। দেশপ্রেমিক ও কঠোর সে সময়কার ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের প্রাথমিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে সফল করলে এবং ব্রিটিশ সরকারের রোষানল থেকে সংগঠনটিকে রক্ষা করার জন্যই তারা হিউমের সাহায্য নিয়েছিলেন। ভারতের জনগণের বিক্ষোভ যেভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল ও জাতীয়তাবাদ যেভাবে প্রসারিত হচ্ছিল তাতে হিউমের মত কোন ব্যক্তিবিশেষ ছাড়াই অনিবার্য পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটত। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, ".....It (the Congress) was the culmination of process of political awakening that had its begining in the 1860s and 1870s and took a major leaph forward in the late 1870s and erly 1880s."

৭.৫.৯.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) অমলেশ ত্রিপাঠী— স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(২) সুমিত সরকার— আধুনিক ভারত।

(৩) সমর মল্লিক—আধুনিক ভারতের রূপান্তর।

(৪) R.P. Dutta—India Today

(৫) Mehrotra, S.R.— The Emergence of Indian National Congress

৭.৫.৯.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) হিউমকে কি 'জাতীয় কংগ্রেসের জনক' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে?

(২) জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পেছনে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতামতের মূল্যায়ন কর।

(৩) জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম নিয়ে যে ঐতিহাসিক তর্ক-বিতর্ক রয়েছে তা পর্যালোচনা কর।

(৪) জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পেছনে 'Safety Valve' তত্ত্ব কতখানি প্রযোজ্য?

(৫) জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তা কি তুমি মনে কর?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫
NATIONAL MOVEMENT

নরমপন্থী কংগ্রেসের রাজনীতি
Moderate Congress Politics

গঠন (Structure) :

৭.৫.৯.৩.০ : উদ্দেশ্য

৭.৫.৯.৩.১ : সুচনা

৭.৫.৯.৩.২ : কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কার্যকলাপ

৭.৫.৯.৩.৩ : নরমপন্থী আন্দোলনের অবদান

৭.৫.৯.৩.৪ : নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা

৭.৫.৯.৩.৫ : নরমপন্থীদের সামাজিক চরিত্র

৭.৫.৯.৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৫.৯.৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৫.৯.৩.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নরমপন্থী কংগ্রেসের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

(২) নরমপন্থী আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা

(৩) নরমপন্থীদের সামাজিক ভিত্তি

৭.৫.৯.৩.১ : সুচনা

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি যাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল তাঁরা সাধারণভাবে ইতিহাসে নরমপন্থী বা Moderate রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। নরমপন্থী নেতৃবর্গ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং সরকারের প্রচলিত আইনকানুন ও বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে শাসন সংস্কারমূলক আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। এরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকার বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করে শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভারতীয় জনসাধারণের নানা দাবী দাওয়া ধীরে ধীরে আদায়ের ব্যাপারে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। সভাসমিতি, প্রচারমূলক বক্তৃতা বা আবেদন পত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের বিভিন্ন দাবী-দাওয়াগুলিকে সরকারের নজরে এনে কিছু পরিমাণে সুযোগ সুবিধা আদায় করাই ছিল এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকারের সমালোচনাতে এইসব নরমপন্থী নেতৃবর্গ অসাধারণ নমনীয়তার পরিচয় দিতেন এবং তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর দুর্দশার কারণ সম্পর্কে জানতে পারলেই তা মোচন করার কাজে অগ্রসর হবেন।

৭.৫.৯.৩.২ : কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কার্যকলাপ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। অনেকটাই স্ব-নিযুক্ত ৭২ জন প্রতিনিধি চাঁদা দিয়ে সেখানে যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থী পর্বের প্রথম কুড়ি বছর জুড়ে লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি মোটামুটি একই রকম ছিল। প্রতি বছর শেষে তিন দিনের কংগ্রেস মিলিত হতো। তা হয়ে উঠেছিল এক বিরাট সামাজিক উপলক্ষ্য তথা রাজনৈতিক সমাবেশ। সভাপতির দীর্ঘ অভিভাষণ ও বিস্তর বক্তৃতা এবং প্রায় তা সর্বদাই ইংরেজীতে শোনা হতো ও হাততালি পড়ত। আর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক-এই তিনটি মুখ্য বিষয়ে প্রায় একই ধাঁচের প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সভা শেষ হত। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে নয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমটিতে ভারতীয় প্রশাসন পর্যালোচনার জন্য এক রাজকীয় কমিশন গঠনের দাবি করা হয়। দ্বিতীয়টিতে ভারত সচিবের কাউন্সিল বিলোপের দাবি করা হয়। তৃতীয়টিতে বর্তমান আইনসভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যায় এবং পাঞ্জাবে আইনসভা প্রবর্তন ও সরকারী কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার দাবি জানানো হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে ছিল ভারতে ও ইংল্যান্ডে একই সময়ে আই.সি.এস পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থীদের বয়ঃসীমা বৃদ্ধির দাবি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রস্তাবে সামরিক ব্যয় হ্রাস চাওয়া হল। সপ্তমটিতে জানানো হয় উত্তর ব্রহ্ম অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অষ্টম প্রস্তাবে বলা হল কংগ্রেসের আলোচ্য প্রস্তাবগুলি যেন বিভিন্ন জনসভায় আলোচিত ও গৃহীত হবার পর প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভার মাধ্যমে পাঠানো হয়। শেষ প্রস্তাবে পরবর্তী অধিবেশনের স্থান ও কাল ঘোষণা করা হয়। কেউই এই সব প্রস্তাবকে বৈপ্লবিক আখ্যা দেবেনা।

বস্তুত দুদশক ধরে নরমপন্থী নেতারা এ ধরনের প্রস্তাবে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ও জনগণের কাছে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদন জানিয়ে যান।

প্রথম কুড়ি বছর (১৮৮৫-১৯০৫) কংগ্রেসে যে সব সমস্যা আলোচিত হয়েছে এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রথম পর্বের কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি ও চরিত্র ছিল নেহাৎই নরমপন্থী। এই যুগের নেতারা রাজভক্তি প্রদর্শনে সবসময়ই তৎপর ছিলেন। তারা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও ব্রিটিশ শাসকদের সুবিচারের উপর তাদের অত্যন্ত আস্থা ছিল। শাসনসংস্কারের ব্যাপারে ১৮৮৫, ১৮৯৩ ও ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সর্ব্বোচ্চ আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সম্প্রসারণ, তাদের অন্তত অর্ধেক সদস্যের, নির্বাচন এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে আইন পরিষদ প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রাষ্টাব্দে দাবী তোলা হয় বড়লাটের শাসন পরিষদে দুজন ভারতীয় এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের ছোটলাটের শাসন পরিষদে একজন করে ভারতীয় সদস্য নিতে হবে। কিন্তু ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার অনুযায়ী যে সব বিধি চালু হয় তাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সভ্যসংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি করা হলেও গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথা একেবারেই চালু হয়নি বরং প্রায় সব অগণতান্ত্রিক প্রথাই চালু থাকল। কংগ্রেসের শাসন সংস্কার বিষয়ক নানা প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দাবি ছিল প্রশাসনিক সংস্কার। প্রশাসনের উচ্চপদে ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় নিয়োগের দাবি জানানো হয়। অর্থনৈতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে এই দাবি উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যয়সাপেক্ষ হবে অন্যদিকে তেমনি অনেক কম বেতন দিয়ে এদেশের অর্থ এদেশেই ব্যয় করা হবে। অন্যদিকে ইংরেজদের বেতনের প্রায় সবটাই চলে যেত ইংলন্ডে এবং ভারতের অর্থ ঐ দেশে খরচ হত। কিন্তু আর্থিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি দেখানো সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার নরমপন্থীদের প্রশাসনিক সংস্কারের নানা দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

সামরিক ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করার জন্য অধিক পরিমাণে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১,০০০ নতুন ইংরেজ সৈন্য নিযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়। ভারতীদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা আধুনিক কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার অভাবের জন্য ইংরেজ সরকারের শাসননীতিকেই দায়ি করা হয়। নরমপন্থীদের অভিমত হল, ভারতের দারিদ্র্য মোচনের জন্য দেশে আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তাদের অভিযোগ ছিল, ব্রিটিশ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি ভারতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে আনা হয়েছে। এতে দেশের সম্পদের নির্গমন হয়েছে, দেশজ শিল্প ধ্বংস হয়েছে, ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপে জনগণের দারিদ্র্য চরমে উঠেছে। দাদাভাই নৌরজী, গোখলে প্রমুখ ভারতীয় নেতৃত্ব নানা পরিসংখ্যান দিয়ে প্রশাসনিক ব্যয়ের মাত্রা, সম্পদ নিষ্কাশনের পরিমাণ, জাতীয় ঋণের পরিমাণ তুলে ধরেন।

প্রতিকারস্বরূপ নরমপন্থীদের দাবি ছিল ঃ (১) কর ভার হ্রাস করতে হবে; (২) ভারতকে শিল্পায়িত করতে হবে (৩) অবাধ বাণিজ্য নীতি বর্জন করতে হবে। কংগ্রেস রাজস্বের উচ্চহার, ত্রিশশালা বন্দোবস্ত, রাজস্ব আদায়ের কঠোর পদ্ধতির প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেস কৃষি ও কৃষকের উন্নতি দাবি করে। এইসঙ্গে কৃষির উন্নতির সঙ্গে কুটির শিল্পও সংযুক্ত করে। আধুনিক কৃৎকৌশলে প্রশিক্ষণের দাবি জানানো হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি বৎসর কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে শিল্প প্রদর্শনী বসত।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আইনজীবী ছিলেন বলে স্বভাবতই আইন ও বিচার বিষয়ক সমস্যা কংগ্রেসের আলোচ্য ছিল। কংগ্রেস প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ দাবি করে।

৭.৫.৯.৩.৩ : নরমপন্থী আন্দোলনের অবদান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা হয় যে প্রথম যুগের কংগ্রেসের অবদান নেহাৎই কম ছিল না একথা মনে করা ভুল হবে। প্রথম কুড়ি বছরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে নানা গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও আইনজনিত দাবী-দাওয়া উত্থাপিত হয়েছিল। এই সব তাহাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া অপূর্ণ থেকে গেলেও ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। জন্মের সূচনা থেকেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আর্থিক অভাব, অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের চরম শোষণ ও নিদারুণ অসহযোগিতা ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কংগ্রেস সক্রিয় গণ-আন্দোলনের পথ বা সরকারের সঙ্গে বিরোধিতার পথ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং আবেদনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পথ বেছে নেয়। এই কারণেই এস.আর. মেহরোত্র কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দকে 'বাস্তববাদী' বলে অভিহিত করেছেন। রজনীপাম দত্ত নরমপন্থী নেতাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটা মনে করা ভুল হবে যে প্রথম-যুগের কংগ্রেস নেতারা প্রতিক্রিয়াশীল, জাতীয়তাবিরোধী ও বিদেশী শোষকদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন। বরং তাঁরাই ছিলেন ঐ সময়ের ভারতীয় সমাজের সর্বাধিক প্রগতিশীল শক্তির প্রতিনিধি। প্রথম পর্বের কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজ সরকারের শোষণ ও অসহযোগিতা ছাড়াও ভারতীয়দের একাংশের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ দেশের জমিদার ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী কংগ্রেসের অনেক দাবি-দাওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। সামন্তশ্রেণী ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্রিটিশ রাজশক্তির অনুগত সমর্থক। এই সব নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল আইন অনুসারে ফিরোজশাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের এক এক অঞ্চলে হওয়ার ফলে কংগ্রেস জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। নরমপন্থী নেতারা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ ভুলে লবণ কর, দেশে বিদেশে ভারতীয় কুলিদের উপর দুর্ব্যবহার। অরণ্য আইনে দরিদ্র শ্রেণীর অসুবিধা ইত্যাদি প্রস্তাবও তুলে ধরেছিল। কৃষক শ্রেণীর দারিদ্র্য ও দুর্দশার কথা, ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের কথা তারা বারবার ইংরেজ সরকারের কাছে তুলে ধরেছে। কংগ্রেসের মঞ্চেও কাউন্সিল কক্ষে নরমপন্থীরা যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের দিক তুলে ধরেছিলেন তা শুধু চরমপন্থী নয়, গান্ধীবাদীদের চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে রূপান্তরিত হয়। তাঁরা একটি সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীও উদ্ভাবন করে যান। প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। করের বোঝা বৃদ্ধি, ভারতীয় কুটিরশিল্পের অবনতি, দুর্ভিক্ষ, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, কর্মের অভাব, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য ভারতবাসীর মনে ব্যাপক বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। রাজনৈতিক দাবি দাওয়ার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক অসন্তোষের কথা তুলে ধরেন। ভারতের দারিদ্র্য ও সম্পদ নির্গমনের প্রসঙ্গে দাদাভাই যে অর্থনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত করেন তা সংবাদপত্র, বক্তৃতা, সভা-সমিতির মাধ্যমে জনমত তৈরি করতে সাহায্য করে এবং ভারতীয়দের মধ্যে অর্থনৈতিক সচেতনতা সঞ্চার করে। অতএব এইসব নানা দিক দিয়ে বিচার করলে প্রথম পর্বের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের যে একটি সদর্থক ভূমিকা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

৭.৫.৯.৩.৪ : নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবৃন্দের অবদান নিয়ে অনেকেই কটাক্ষ করেছেন। চরমপন্থীরা একে 'ভিক্ষুকের রাজনীতি' বলে ব্যঙ্গ করার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'জয়

রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো, ইহাই তাহাদের পলিটিকস্।' অশ্বিনী দত্ত কংগ্রেসকে 'তিন দিনের তামাশা' আখ্যা দিয়েছিলেন, লালা লাজপৎ রায় নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা প্রসঙ্গে বলেন, 'The Congress under the Moderates lacked essentials of a national movement' অনেক নরমপন্থী আন্দোলনকে নিছকই 'আবেদন নিবেদনের' রাজনীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তারা কংগ্রেসের প্রতিটি বাৎসরিক অধিবেশনে কতকগুলি আবেদন ও নিবেদনমূলক প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করতেন যা সরকার উপেক্ষা করতেন। কংগ্রেসের দাবি আদায়ে ব্যর্থতা ও নরমপন্থী মনোভাব জনগণের মধ্যে হতাশার সঞ্চার করেছিল এবং এই কারণেই অনেকে তাদের নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেন।

প্রথম পর্বের কংগ্রেসী নেতাদের অবদান স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতে হয় যে তাদের সাফল্য ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এর পেছনে তাদের দুর্বলতাগুলি দায়ী ছিল। প্রথমতঃ কংগ্রেসী সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথা অস্বীকার করা যায় না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সংবিধান রচিত হলেও তা কার্যে রূপান্তরিত হয়নি। ১৯০৬ খ্রীর কলকাতা অধিবেশন পর্যন্ত বোম্বাই গোষ্ঠীর ফিরোজ শাহ মেহতা ও দীনশা ওয়াচার কঠিন হস্তে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ও মাদ্রাজের আনন্দ চার্লুর সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁরা আপন প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ কংগ্রেসে মেহতার আপত্তিতে পিছিয়ে যায় নতুন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব। জে. আর. ম্যাকলেন এর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য, ইংরেজী শিক্ষা ও সম্পদ গর্বের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কে ভীতিও লক্ষ্য করেছেন। বস্তুত তখনকার রাজনীতি ছিল শক্তিমান ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তিলক ও গোখেলকে কেন্দ্র করে পুনায় দুটি পৃথক গোষ্ঠী গড়ে উঠে। ঠিক তেমনি আলাদা বৃত্ত বোম্বাইতে মেহতা-ওয়াচাকে ঘিরে, বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন বসুকে কেন্দ্র করে, গড়ে ওঠে। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস যে একটি সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ সংগঠন- এই বোধের উন্মেষ ঘটতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছিল।

দ্বিতীয় দুর্বলতা মুসলিমদের কংগ্রেস বর্জন। প্রথম যুগের নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষতা অতীব প্রশংসার্হ। বদরুদ্দিন তায়েবজির অন্‌জুমান গঠনে ও আইন পরিষদে রহমৎউল্লা সায়ানির নির্বাচনে হিন্দু ও পার্শীরা প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু তাদের সর্বৈব চেষ্টা মুসলিম সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের পতাকাতলে আনতে পারেনি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলিম রাজনীতিকে ব্রিটিশ সহযোগীর ভূমিকায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করলেন। তাঁর মুখ থেকেই নিঃসৃত হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের সুস্পষ্ট উল্লেখ। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এলাহাবাদ কংগ্রেসে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ২২২ হলেও ছোটলাট কলভিনের ভাষায়, কোন সম্ভ্রান্ত বা সম্পন্ন মুসলিম এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তায়েবজি যখন স্যার সৈয়দ আহমেদকে কংগ্রেসের ভেতর থেকে মুসলিম স্বার্থরক্ষা করতে আহ্বান জানলেন তখন সৈয়দ আহমেদ বলেন, সৈয়দ তার উত্তরে (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮) লিখলেন, "এই অন্যায়ভাবে নামিত জাতীয় কংগ্রেস কেবল আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতকে এক জাতি মনে করে এমন যে কোন ধরনের কংগ্রেসে আমার আপত্তি রয়েছে।" কংগ্রেসের প্রতিটি প্রস্তাবই মুসলিমদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতেন তিনি, এমন কি কংগ্রেস প্রভাব ক্ষুন্ন করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চরও পাঠিয়েছিলেন।

নরমপন্থীদের তৃতীয় দুর্বলতা ছিল ঔপনিবেশিক শোষণ বিষয়ে সজাগ হলেও চরম দারিদ্র্যে নিপীড়িত, জাতপাতের জটিল সংস্কারে আবদ্ধ, অশিক্ষায় অন্ধ জনসাধারণ সম্বন্ধে তাঁরা কোনো সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করতে পারেননি। কৃষকদের সমস্যা সমাধান রানাডের পথে হত না। রমেশচন্দ্র দত্তের কল্পনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয় সংস্কারের বেশি এগোয়নি। একই সঙ্গে বড় জমিদার ও দখলদারী রায়তকে খুশি রাখতে তাঁরা চেয়েছিলেন-ইংরেজদের মতই। শুধু তিক্ত ভেষজকে কৃষি ব্যাঙ্ক, কুটির শিল্প ইত্যাদি মধুর অনুপান দিয়ে গ্রহনীয় করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। পার্থ চ্যাটার্জী 'Bengal 1920-

1947 The Land Question' গ্রন্থে দেখিয়াছেন এই দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, অক্ষমতা বাংলার কংগ্রেসকে কত দুর্বল করেছিল এবং শেষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জালে জড়িয়ে ফেলেছিল। কি ভাবে যে রানাডে ইংরেজদের কাছে— দেশী শিল্পের সংরক্ষণ আশা করতেন তা বোঝা শক্ত। পরাধীন ভারত বিসমার্কের জার্মানীর মত শুল্ক নীতি নিতে পারে না এ কথা তিলক মুহূর্তেই বুঝেছিলেন। তাই বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ শেষ পর্যন্ত স্বরাজের দাবিতে পরিণত হয়।

১৮৮৫-১৯০৫ এর মধ্যে তোলা সব কিছু দাবি যখন নাকচ হল বা অতি খন্ডিতাকারে গৃহীত হল তখন নরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পড়ল। তার ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ উদারতন্ত্রে দুর্মর বিশ্বাস। কিন্তু কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি ও ভারতীয় পার্লামেন্টারী কমিটি শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইংলন্ডের জনচিত্তে সাড়া জাগাতে পারেননি। এর একটা বড় কারণ ভারতের জনচিত্তে কংগ্রেসের মূল। ১৮৯৯ সালের আগে কংগ্রেসের কোন গঠনতন্ত্র রচিত হয়নি। বিচিত্র ধরনের স্থানীয় দল থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হত। অনেক সময় প্রতিনিধিরা স্বনির্বাচিত হতেন। স্থানীয় কমিটি হয় নেই, না হয় অস্থায়ী। যেখানে বাৎসরিক অধিবেশন বসার কথা সেখানকার কমিটিই আয়োজন করত। কোন নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় উপস্থিতির হার ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। ১৮৯৬ থেকে কমতে কমতে ১৯০২-এ তা দাঁড়ালো মাত্র ৪৭১-এ। তিলক বারবার নতুন গঠনতন্ত্র দাবি করেছিলেন। ১৯০০ সালের ১৮ নভেম্বর কার্জন ভারত সচিব হ্যামিলটনকে লেখেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস ভেঙ্গে পড়ছে এবং ভারতে থাকাকালীন আমার উচ্চাকাঙ্খা হবে তার শান্তিপূর্ণ মরণে সাহায্য করো।'

বাংলায় স্বদেশী অন্দোলনের সময় নরমপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠী এই স্বদেশী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ অরবিন্দ নরমপন্থীদের হাত থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ শাসক শ্রেণী সম্পর্কে নরমপন্থীদের উচ্চ ধারণা সে যুগের নেতাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি করেছিল। তাই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের মধ্যে থেকেই তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিল।

৭.৫.৯.৩.৫ : নরমপন্থীদের সামাজিক চরিত্র

পুরোনো মার্কসীয় দৃষ্টিতে কংগ্রেস বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠান। আধুনিক কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকগণ জাতীয় কংগ্রেসকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'Fragmented Elite'দের সংগঠন বলেছেন। জে.আর. ম্যাকলেন মনে করেন যে এটি ছিল বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের সংগঠন। তবে কংগ্রেসের মধ্যে যে বহুবিধ স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণে তাদের মধ্যে ঘন ঘন নেতৃত্ব বদল হয়েছে। অনীল শীল, জুডিথ ব্রাউন ও জে. এম. ব্রুমফিল্ড মনে করেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়রা ছিল কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক। ব্রুমফিল্ড ভদ্রলোক-অভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করে কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করে বলেছেন 'They had virtually no institutional context with the lower orders...they were in points to make it clear that though they lived with people, they were not of them.''

কলকাতা ও বোম্বাই এর উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণই ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের সংগঠক। ব্যক্তিগত জীবনে কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতারা ইংরেজ ভাবাপন্ন এবং নিজের নিজের পেশার ক্ষেত্রে খুবই সাফল্যমণ্ডিত। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের অর্ধেক ছিলেন আইনজীবী এবং পরবর্তী কংগ্রেসের কয়েকটি

বাৎসরিক অধিবেশনে এদের সংখ্যা ছিল মোট প্রতিনিধিদের এক-তৃতীয়াংশ। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষাব্রতী। এসব বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফিরোজশাহ্ মেহতা, বদরুদ্দিন তায়েবজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। এরা সকলেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ দাদাভাই নওরোজীর প্রভাবাধীনে আসেন, রানাডে, জি.ভি. যোশী, কে.টি. তেলাং, আনন্দ চারলু, সুব্রহ্মানিয়া আয়ার প্রভৃতি সকলেই ছিলেন বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত।

তাছাড়া কংগ্রেসের প্রথম পর্বে কয়েকজন খ্যাতনামা সরকারী কর্মচারীও যোগদান করেন। এরা হলেন রানাডে ও রমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথম চারটি অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস ছিল শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্তদের ব্যাপার এবং অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়া হত ইংরেজী ভাষায়।

সাম্প্রতিককালে জে.আর. ম্যাকলেন মনে করেন যে পাশ্চাত্যপন্থী চাকুরিজীবী শিক্ষিত ব্যক্তিরা, যারা ধর্মীয় ও সামাজিক দিক দিয়ে নিম্নতর শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল তারাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছিল। প্রথম দিকে কৃষক সম্প্রদায়কে কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার কোন কর্মসূচী কংগ্রেসের ছিল না। হিউম-এর প্রস্তাবিত কংগ্রেসের নির্বাচকমন্ডলী (electoral college) গঠনের পরিকল্পনায় কৃষকশ্রেণীর কোন উল্লেখ ছিল না। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পরিক্রমার সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রতি নিম্নশ্রেণীর কোনরকম উৎসাহ লক্ষ্য করেননি। কংগ্রেসের নরমপন্থী শ্রেণী নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ছিল সার্থক এবং ব্যক্তিগত নেতৃত্বদানের ইচ্ছা থেকেই তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। সমাজের নিম্নতর শ্রেণীতে যে জাতীয় চেতনা ছিল এই শ্রেণী তার অংশীদার ছিলেন না। তাই ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা যা ছিল, ৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৯০ এর শেষের দিকে তা কমে আসে। ম্যাকলেন মনে করেন যে এই আইনজীবি, ডাক্তার, সাংবাদিক ভারতীয়গণ রাজনীতির ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য চেয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রাথমিক দাবী-দাওয়াগুলি এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করবে এতে অবাক হওয়ার মতো কোন কারণ থাকতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেস Cambridge ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত করেছে ঠিকই। তবে বিপানচন্দ্র ও সুমিত সরকারের মতানুযায়ী এটি জাতীয় স্বার্থ ও সংরক্ষণে তৎপর হয়েছিল। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী স্বার্থ ও সংস্কারের মধ্যে কংগ্রেস সমন্বয় সাধন করেছে। কোন শ্রেণীকে এক্ষেত্রে বর্জন করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে প্রথমযুগের কংগ্রেস শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও সম্পদভোগীদের প্রভাবাধীন থাকার ফলে তাদের পক্ষে বৈপ্লবিক কর্মসূচী বা গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রথমযুগের কংগ্রেসের তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রধান মৌলিক দুর্বলতা ছিল তাদের সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি। তাদের আন্দোলন শহরের আধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

৭.৫.৯.৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(২) সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত।

(৩) বিপান চন্দ্র—আধুনিক ভারত।

(৪) J. H. Broomfield - Elite Conflict in a Plural Society: 20th Centrury Bengal

৭.৫.৯.৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী আলোচনা কর।

(২) কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের সামাজিক ভিত্তি কিরকম ছিল?

(৩) নরমপন্থী কংগ্রেসের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণ কর।

(৪) নরমপন্থী কংগ্রেসের কার্যাবলীর মূল্যায়ন কর।

(৫) কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবর্গ কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কি চিন্তাভাবনা করেছিল?

(৬) কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলন কি উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

চরমপন্থী মতবাদের উদ্ভব

গঠন (Structure) :

৭.৫.৯.৪.০ : উদ্দেশ্য

৭.৫.৯.৪.১ : সূচনা

৭.৫.৯.৪.২ : নরমপন্থী কংগ্রেসের ব্যর্থতা

৭.৫.৯.৪.৩ : গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

৭.৫.৯.৪.৪ : অর্থনৈতিক কারণ

৭.৫.৯.৪.৫ : চরমপন্থার ভাবগত কারণ

৭.৫.৯.৪.৫.১ : বঙ্কিমচন্দ্র

৭.৫.৯.৪.৫.২ : বিবেকানন্দ

৭.৫.৯.৪.৫.৩ : স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

৭.৫.৯.৪.৬ : লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

৭.৫.৯.৪.৭ : বৈদেশিক ঘটনাসমূহের প্রভাব

৭.৫.৯.৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৫.৯.৪.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৫.৯.৪.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতবর্ষে চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

(২) নরমপন্থী কংগ্রেসের দুর্বলতা

(৩) অর্থনৈতিক কারণ

(৪) চরমপন্থার ভাবগত কারণ

(৫) রাজনৈতিক কারণ — লর্ড কার্জনের দায়িত্ব

(৬) বৈদেশিক ঘটনাসমূহের প্রভাব

৭.৫.৯.৪.১ : সূচনা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এর নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল তাঁরা ইতিহাসে 'নরমপন্থী' নামে অভিহিত। এই নরমপন্থীদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরের ইতিহাস প্রধানতঃ নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদন নিবেদনের রাজনীতি হিসেবেই চিহ্নিত। এই রাজনীতির প্রতিবাদে যে সংগ্রামমুখি আন্দোলন গড়ে উঠল তা সাধারণভাবে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী চিন্তাধারার প্রতিবাদ ঊনিশ শতকের শেষে দুই দশক ধরেই শোনা যাচ্ছিল। এই প্রতিবাদের পেছনে নানাবিধ কারণ ছিল।

৭.৫.৯.৪.২ : নরমপন্থী কংগ্রেসের ব্যর্থতা

নরমপন্থী নেতাদের সাবধানী নীতি এবং ভারতীয় জাতির আত্মশক্তির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের দয়া দাক্ষিণ্যের ও সদিচ্ছার উপর অধিক আস্থা স্থাপনের ফলে কংগ্রেসের এক শ্রেণীর মধ্যে বিপুল হতাশা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির (Political mendicancy) কঠোর সমালোচনা করে তারা বিকল্প চরমপন্থা গ্রহণের দাবি জানাতেন। বক্তৃতার বদলে কর্মের মাধ্যমে তাঁরা জাতীয়তাবাদের বিকাশ চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য আদর্শ, ভাবধারা, শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে চরমপন্থী মতবাদের সমর্থক গোষ্ঠী এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বৃটিশ ভাবধারা ও আদর্শকে প্রতিহত করে অনুকরণ প্রিয় নরমপন্থী রাজনীতির পরিবর্তে কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠী ভারতের নিজস্ব ধারা ও আদর্শে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের প্রথম পর্বে আন্দোলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে লালা লাজপৎ রায় বলেছিলেন যে, কংগ্রেসী আন্দোলনে জনগণ অংশীদার ছিল না, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সময়োপযোগী রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস ছিল না এবং আত্মত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। অরবিন্দ ঘোষ ও বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ বর্জিত আবেদন-নিবেদনের নীতি ও ভিক্ষামূলক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন সম্পর্কে কটাক্ষ করে তিলক মন্তব্য করেছিলেন, 'We will not achieve any success in our labours, if we crock once a year like frog'

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের দুর্বল আন্দোলনের ফলে তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি ব্রিটিশ সরকার চরম উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন এবং প্রথম কুড়ি বছরে কংগ্রেসের নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক দাবি আদায়ে চরম ব্যর্থতা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পথ প্রস্তুত করেছিল। সরকারের এই চরম ঔদাসীন্য কংগ্রেসের যুবশক্তিকে প্রচন্ড বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে কঠোর পন্থা ও কর্মসূচী ছাড়া ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দাবিদাওয়া আদায় করা সম্ভব নয়।

৫.১.৪.৩ : গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর মতে, (Cambridge School of historians) চরমপন্থী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মূলে ছিল জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব। ১৮৯০ এর দশকে কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীগত বিরোধ ভালভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিচালনায় 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সঙ্গে মোতিলাল ঘোষ কর্তৃক পরিচালিত অমৃতবাজার গোষ্ঠীর বিরোধ, পাঞ্জাবে হরকিষণলাল ও লালা লাজপৎ রায়ের বিরোধ, মাদ্রাজে নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধ, ডেকান শিক্ষা-সমিতি নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে তিলকের সঙ্গে আগরকার ও গোখেলের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, কংগ্রেস দখলের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং চরমপন্থী গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এটা বলা সঠিক হবে না। কারণ নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শগত ও কর্মসূচীগত পার্থক্য বজায় ছিল। এই পার্থক্যই তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল।

৭.৫.৯.৪.৪ : অর্থনৈতিক কারণ

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মূলে অর্থনৈতিক কারণ বিশেষভাবে দায়ী ছিল। ঊনিশ শতকের শেষ পর্বে ব্রিটেনের ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সময়ে ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের একচেটিয়া প্রাধান্য জার্মানী ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শুল্ক সংক্রান্ত আইন ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কার্পাস বস্ত্র বিষয়ক আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতে বস্ত্রশিল্পে তীব্র সংকট দেখা দেয়। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটেনের সামরিক তৎপরতা হেতু সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি পায় এবং এই অর্থ তারা ভারতবাসীর উপর কর চাপিয়ে আদায় করবার চেষ্টা করে।

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এক নিদারুণ সঙ্কট দেখা দেয়। গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীণ শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ব্রিটেনের ভারত শোষণ ও অন্যদিকে খাদ্যসঙ্কট ও অনাহারের ফলে ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে পড়ে। অন্ততঃ ৯০ লক্ষ লোক এর ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবাসীর এই জাতীয় সংকটে ইংরেজ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এর ফলে ভারতের জনগণের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। জাতীয় কংগ্রেসের একদল নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এই সব নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। তৎকালীন ভারতের তিনজন

শীর্ষস্থানীয় নেতা, যথা-দাদাভাই নওরোজি তাঁর 'Poverty and Un-British Rule in India,' রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'Economic Hisotry of India এবং রানাডে তাঁর 'Economic Essays' গ্রন্থসমূহে ভারতে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক শোষণ ও ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্কটের চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভারতীয়দের সামনে তুলে ধরেন এবং ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতিকেই দায়ী করেন। এইসব নেতৃবৃন্দের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন (Drain theory) তত্ত্ব ভারতীয়দের মনে সর্বাধিক বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ডঃ বিপানচন্দ্র তাঁর 'The Rise and Growth of Economic Nationalism in India' গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করেন যে 'Drain theory' বা অর্থ নির্গমন তত্ত্ব রাজনীতির দিক দিয়ে ছিল সবচেয়ে বৈপ্লবিক। এই লুণ্ঠনতত্ত্ব ভারতের জনগণের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শুধু ভারতীয়রাই নন, ডিগবি ও জন ম্যাকলেন স্বীকার করেছেন যে সম্পদ নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল বেশ কয়েক কোটি টাকা। ব্রিটিশ লেখক ডিগবি 'Prosperous British India' গ্রন্থে ভারতের অর্থনৈতিক অবনতি ও দারিদ্র্যের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে দায়ী করেন। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের একেবারে সূচনায় ভারতীয়দের নিদারুণ আর্থিক সংকট তাদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। দাদাভাই নওরোজী এর প্রতিকার হিসেবে স্বায়ত্বশাসনকেই বেছে নেন।.....'Self government is the only remedy for India's woes and wrongs.' 'ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতীয় জনগণের চরম দারিদ্র্য, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সমস্যা, ভারতের সবশ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষোভ চরমপন্থী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট রচনা করে।

৭.৫.৯.৪.৫ : চরমপন্থার ভাবগত কারণ

ভারতে চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের পশ্চাতে ভাবগত বা মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশেষ অবদান রেখেছিল। ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবের পশ্চাতে যেমন সাহিত্যিক, দার্শনিকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করেছিলেন ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরমপন্থার উদ্ভবের ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক দার্শনিকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী মতবাদের ভাবগত প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী এই প্রতিরোধের আন্দোলনের তিনটি ধারার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম ধারায় ধর্মীয় জীবনে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী হিন্দুধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর খ্রীষ্টধর্ম, উপযোগিতাবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাত হেনেছিল, চরমপন্থীরা আধ্যাত্মিকভাবে তাকে প্রতিহত করতে ইচ্ছুক ছিল। দ্বিতীয় ধারায় পাশ্চাত্য জগতের বস্তুবাদী, যান্ত্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতি ভারতীয় সনাতন সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে যে ধ্বংস করবার অপচেষ্টা করছিল তার প্রসার রোধ করার জন্যই চরমপন্থার অভ্যুদয়। তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক ধারায়, চরমপন্থীরা দেখেন যে ভারতের স্বতন্ত্র পরিচিতি ক্রমশঃই বৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোয় অবলুপ্ত হচ্ছে; অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতা ভারতীয়দের জাতীয় সত্ত্বার অবলুপ্তি ও বিনাশকে নিশ্চিত করেছে। এই শঙ্কার থেকেই জন্ম নেয় ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং যতই শঙ্কার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ততই চরমপন্থীরা তাদের বিরোধিতাকে তীব্রতর করে তোলে।

চরমপন্থীদের আন্দোলনে যাঁদের রচনা ও কার্যকলাপ আদর্শ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

৭.৫.৯.৪.৫.১ : বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলার চরমপন্থীরা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। Charles Himesath 'The Indian Nationalism and Hindu Social Reform' গ্রন্থে এবং আরও অনেক ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ঐতিহাসিক বঙ্কিমের লেখার মধ্যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ এবং চরমপন্থী রাজনৈতিক ধারার উৎস খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের মতে বঙ্কিমের চিন্তাধারা ও লেখা পাশ্চাত্য ধারার প্রত্যাখ্যান করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধ্যানধারণার মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎস অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছে। সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকে জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক সোপান হিসেবে ব্যবহার ও দেশমাতৃকার একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি রচনাই ছিল তাঁর মূল চিন্তাধারা। বঙ্কিমের মধ্যে যে ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গেল তা বেদ, বেদান্ত বা অর্বাচীন স্মৃতির ঐতিহ্য নয়, এর উৎস হল মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। মিল ও কোঁৎ এর তত্ত্ব প্রয়োগ করে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা হিন্দু ধর্মের শেষ কথা নয়। 'এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ।' ভক্তিশাস্ত্রই তার শেষ কথা। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ও প্রচার পত্রিকায় 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দেখালেন, বহু দেববাদ ও বিভূতি, দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম নয়। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশে ও সেই বিকশিত ব্যক্তিত্ব মানবহিতে উৎসর্গে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। তিনি এর নাম দিলেন 'অনুশীলন ধর্ম'।

অবতারবাদের এক নতুন ব্যাখ্যা দেন বঙ্কিম যা রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের অবতারবাদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর অবতার মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর নন, তাঁর অবতার, সেই অনুশীলিত পুরুষোত্তম যিনি সুকঠিন প্রয়াসে পূর্ণতা লাভ করেছেন এবং মানবহিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। বুদ্ধ বা যীশুর মত তিনি সংসার ত্যাগ করেননি, সংসারের সকল দুঃখ বীরের মত বহন করেছেন, সকল কর্ম করেছেন নিরাসক্ত চিত্তে, যে যুদ্ধের তিনি সারথি তা ধর্মযুদ্ধ, তার উদ্দেশ্য ধর্মরাজ্য স্থাপন। গীতার আদর্শ পুরুষকে ভারতীয় জনচিত্তে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে বঙ্কিম ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনদের ডাক দিলেন কর্মফল ত্যাগ করে মহাভারতের স্বপ্ন সফল করার জন্য নতুন এক কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে। তাঁর এই দুঃসাহসিক কল্পনা পরবর্তী যুগকে প্রভাবিত করেছিল। তিলক, অরবিন্দ, লাজপৎ এর মত হিন্দু চরমপন্থীরা তো বটেই, ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল ও ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধবও তার ব্যতিক্রম নন। চরমপন্থীরা ধর্মরাজ্যের তত্ত্বকে তাঁদের স্বরাজ্যের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেন এবং তাঁর রচনা থেকে সক্রিয় প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা পান।

বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠে' একদল দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের আদর্শ প্রচার করে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্থাপন করে যান। তাঁর 'আনন্দমঠ' সে যুগের যুবসম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে ও নূতন জাতীয়তাবাদের আদর্শে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অরবিন্দ ও তাঁর সমসাময়িকদের উপর আনন্দমঠের প্রভাব ছিল অপরিসীম। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত দেশবাসীর মানসে এক নব উন্মাদনার সঞ্চার করল।

তবে দেশকে দুর্গার সঙ্গে একাত্ম করে দেখার ফলে যে প্রবল আবেগ হিন্দু মানসে সঞ্চারিত হল তাই মুসলিম মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে অনেকে বঙ্কিমের চিন্তাধারার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ রয়েছে বলতে চেয়েছেন। অধ্যাপক ক্লার্ক বলেছেন যে চরমপন্থীদের কর্মপন্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার অন্যতম উৎস বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন এ ধরনের মন্তব্য খণ্ডিত মূল্যায়নের নিদর্শন। তাঁর মতে বঙ্কিমকে এই অপবাদ দেওয়া অনুচিত। এর সমর্থনে তিনি নানা যুক্তি দেখিয়েছেন। 'সীতারামে' ফকির ও সীতারামের কথোপকথন পাঠ করলে দেখা যায় বঙ্কিমের মানবপ্রীতিতে মুসলমানের স্থানও আছে, কারণ মুসলমানও জগদীশ্বরের সৃষ্টি। যেখানে শুভবুদ্ধি ও সৎকর্মের মাত্রা লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে হিন্দু-মুসলমান কেউই তাঁর কশাঘাত

থেকে রক্ষা পায়নি। 'রাজসিংহের' আলমগীর চরিত্র বা 'আনন্দমঠের' সন্তানদের কিছু মুসলিম-বিদ্বেষী শব্দ প্রয়োগ দেখে অনেকে তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে। অথচ পশুপতির উচ্চাকাঙ্খা, ভবানন্দের ব্রতচ্যুতি, সীতারামের যৌনমোহ ও গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা তিনি ক্ষমা করেননি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার যে দুর্জয় সাহস মীরকাশিম দেখিয়েছিলেন তা রাজসিংহের বীরত্বের চেয়ে কম প্রশংসা পায়নি। কতলু খাঁ জঘন্য হলেও তার কন্যা আয়েষা 'রমনীরত্ন' জেব উন্নিসার উত্তরণ যত সহানুভূতির সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, শৈবলিনীর প্রতি ততটা নয়।

৭.৫.৯.৪.৫.২ : বিবেকানন্দ

'যত মত তত পথে'র প্রবক্তা রামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃতি অনুধাবন করে তাদের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমকে দিয়েছিলেন সত্য, ত্যাগ ও প্রেমের অবতার রামকৃষ্ণের অমর বাণী ও জীবনাদর্শ; অদ্বৈত ও যোগের তত্ত্ব। আবার প্রাচ্যে আনতে চেয়েছিলেন পশ্চিমের বীর্য, কর্মোদ্যম, সুকঠিন শৃঙ্খলাবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে দুঃখমোচনের নিরলস প্রয়াস। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন যার লক্ষ্য বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির জয় এবং আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত করা। পূর্ণ মানবগঠনের এই স্বপ্ন শুধু ভারতের জন্যই তিনি দেখেননি, বিশ্বের জন্য দেখেছিলেন। এখানে গোঁড়ামি, শ্রেয়োবোধ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। ইউরোপকে সত্ত্বের ও ভারতকে রজের সাধনায় প্রবুদ্ধ করতে পারস্পরিক বোঝাপড়া, লেনদেন প্রয়োজন এ কথা বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন। অথচ চরমপন্থীরা তার ভুল ব্যাখ্যা করলেন। পশ্চিমের যে সব দোষ তিনি বন্ধুর মত দেখিয়েছিলেন, সেগুলির উপর জোর দেওয়া হল, অথচ প্রাচ্যের যে সব দোষত্রুটি তিনি তীব্র কশাঘাতে জর্জর করেছিলেন তা চেপে যাওয়া হল। সন্দেহ নেই তিনি আমাদের জাতীয়তাকে দিয়েছেন প্রবল পৌরুষ, অদ্বৈতের অভীঃমন্ত্র, শিখিয়েছেন 'আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।' তার চেয়েও বড় কথা, বঙ্কিমের যে দেশ ছিল কবির কল্পনা, তাকে তিনি দিয়েছিলেন রক্ত, মাংস, মজ্জা। যে দেশ তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী ও মূর্খ অন্ত্যজ, দরিদ্রের দেশ-তাকে অন্নদান, আরোগ্য দান, জ্ঞান দান করতে হবে। তবেই আসবে আত্মজ্ঞান। তখন যে শক্তির সৃষ্টি হবে তার সামনে জাতপাত, শ্রেণী, সাম্রাজ্য, কোন বাধা, বিভেদই টিকবে না।

বিবেকানন্দ সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার করে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন। তাঁর কাছে দুর্বলতা ছিল দাসত্বের নামান্তর, দুর্বলতা হল মৃত্যু। তিনি ভারতের যুবসমাজকে দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি গীতার আদর্শ প্রচার করে স্বদেশবাসীকে ক্লীবতা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমের আদর্শ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সহায়ক হয়েছিল।

বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে চাননি, নিবেদিতাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। অথচ জনসমর্থন সংগ্রহ করতে অরবিন্দ ও তিলক হিন্দুধর্মকে কাজে লাগালেন এবং অন্য ধর্মের সমর্থন হারালেন। যে কুলি মজুর মেথরকে ঝোপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সমাজ গড়তে আহ্বান করেছিলেন বিবেকানন্দ, তারা ভদ্রলোক ও উচ্চজাতির (বিশেষত ব্রাহ্মণের) বহু পেছনে আসন নিল।

৭.৫.৯.৪.৫.৩ : স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

ইংরেজ জাত্যভিমানের প্রত্যুত্তরে চরমপন্থীরা আর্য শ্রেয়োমন্যতা জাহির করতে চেয়েছিলেন। আর এর জন্য তাঁরা গুরু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতীকে। বঙ্কিম বেদকে হিন্দুধর্মের মূল বলে স্বীকার করলেও সর্বোচ্চে স্থান

দেননি। অথচ দয়ানন্দের কাছে বেদ ঈশ্বরের বাণী। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ও শেষ কথা নেই, আছে জড়বিজ্ঞানের সব তথ্য। বৈদিক সভ্যতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে দয়ানন্দ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। বেদ ব্যাখ্যায় দয়ানন্দ ম্যাক্সমূলারকে তো অবজ্ঞাই করতেন, এমন কি সায়নভাষ্যও সব জায়গায় মানেননি। তাঁর মতে ঋকবেদ আদৌ প্রকৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে ছন্দোবন্ধে নিবেদিত প্রার্থনা নয়, তা একেশ্বরবাদের প্রথম ও পূর্ণ রূপ, এবং তার পরে হিন্দুধর্মের যা কিছু, বিবর্তন হয়েছে — বেদান্ত থেকে শুরু করে পৌরানিক হিন্দু ধর্ম—সবই ভ্রান্ত ও বর্জনীয়। অরবিন্দ এর মধ্যে আর্য পৌরুষের অনমনীয় দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছেন, যা সব চিন্তা ঝটিকার মধ্যে অচল, অটল, কিন্তু 'সত্যার্থপ্রকাশ'—এ আপন মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভুল ইতিহাস ও মনগড়া মিথের যে সংমিশ্রণ দয়ানন্দ করেছিলেন তাও কি বৈজ্ঞানিক বলে মানতে হবে? দেবদেবীর মূর্তিপূজা বর্জন করে গোমাতার পূজা ব্যবস্থা করা কতখানি যুক্তিযুক্ত? কতখানি সম্ভব ছিল আধুনিক ভারতে শত শত তপোবন বানিয়ে অহোরাত্র বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান? বা ইংরেজী সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ করে গুরুকুল- সম্মিত সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠ? হাজার হাজার বছর ধরে যে ইসলাম ভারতের মাটিতে বাসা বেঁধেছে, হিন্দুদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান করেছে, তাদের বাদ দেওয়া বা তাদের সবাইকে ধর্মান্তরিত করাই কি ধর্ম হত? ইহুদীসুলভ অসহিষ্ণুতার চিহ্ন চরমপন্থীদের চিন্তায় রয়ে গেছে। তবে স্বামী দয়ানন্দের আদর্শ উত্তর ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

৭.৫.৯.৪.৬ : লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

চিন্তার দিক থেকে চরমপন্থার যতই প্রস্তুতি থাকুক, কার্জনের নীতি তাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছিল। লর্ড কার্জন জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করে ভারতবাসীর স্বার্থ-বিরোধী কতকগুলি আইন প্রবর্তন করেন। স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতীক কলকাতা পুরসভার গঠনতন্ত্রের উপর আঘাত হেনে কার্জন তাঁর অভিযান শুরু করলেন। পুরোনো বিল সংশোধন করে কার্জন যে নতুন বিল খাড়া করলেন তাতে পুরসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো একশোর জায়গায় পঞ্চাশ। তার মধ্যে নির্বাচিত ভারতীয় ও মনোনীত ও নির্বাচিত সবরকমের ইংরেজদের সংখ্যা হবে সমান সমান-পঁচিশ করে। কিন্তু সভাপতি হবেন একজন ইংরেজ। ইনিই আবার পুরসভায় গৃহীত নীতি কার্যে পরিণত করবেন। কাউন্সিল ও সভাপতির মধ্যে থাকবে বারোজনের এক জেনারেল কমিটি, সেখানে নির্বাচিত ভারতীয়দের সংখ্যা মাত্র চার। বলা বাহুল্য, এর মুখ্য উদ্দেশ্য, কলকাতার বহুব্যাপ্ত ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ। এর আরেকটা দিক ছিল। ১৮৯৩-৯৯ সালের মধ্যে যাঁরা বাংলার আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ঘাঁটি ছিল পুরসভা ও মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটি।

দ্বিতীয় আঘাত পড়ে শিক্ষার উপর। যে ব্যবস্থা চালু ছিল কেউ তাকে আদর্শ বলবে না। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য কার্জন যা নীতি নিলেন তা অত্যন্ত মারাত্মক। সিমলায় তিনি যে শিক্ষা সম্মেলন ডাকলেন তাতে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। যে শিক্ষাকমিশন গঠিত হল তাতে প্রথমে কোন হিন্দু প্রতিনিধিও ছিল না। র‍্যালে কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কার অনেকের উদ্বেগ সঞ্চার করল। কমিশন সব দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করল। বেসরকারী কলেজে আইন পড়ার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব হল। কলেজে পড়ার ন্যুনতম বেতনহার নির্ধারিত করে দেওয়ার ফলে গরীব ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথের আইন কলেজ টিকে গেল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যা শাসনতন্ত্র ঠিক হল তাতে ইউরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হল। সেনেটের ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৮০ জনের মনোনয়নের ভার পড়ল বড়লাটের উপর। ইউরোপীয় সদস্যের সংখ্যা হল ৫৪। সিন্ডিকেটকে দেওয়া হল কলেজের স্বীকৃতি দান ও হরণের ক্ষমতা। সর্বোপরি রইলেন সাহেব

অধিকর্তা। বিলের বিরোধিতা করে গোখ্‌লে বললেন, 'এতে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী বিভাগে পরিণত হবে।' ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সমর্থন করেছিলেন।

নরমপন্থীদের সহযোগিতা নীতি আবার লাঞ্ছিত হল Official Secrets Amendments Act-এ। এই আইনের বলে অসামরিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশনার জন্য সংবাদপত্রকে দণ্ডনীয় করা হয়। এ নীতি সংবাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে তুমুল আপত্তি উঠল। চরমপন্থীরা বিনামূল্যে এক বিরাট প্রচারমাধ্যম হাতে পেয়ে গেলেন।

নানাকারণে যে সব অসন্তোষ ঘনীভূত হচ্ছিল তা ফেটে পড়ল বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করে। নরমপন্থীদের অবরোধ বিপুল আবেগের বন্যায় ভেসে গেল। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' আন্দোলন শুরু হল। কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দলের উদ্ভব হল।

৭.৫.৯.৪.৭ : বৈদেশিক ঘটনাসমূহের প্রভাব

তদানীন্তনকালে বৈদেশিক নানা ঘটনাও ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারে সহায়ক হয়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভারতে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সহায়ক হয়েছিল। এছাড়া সে সময়কার আন্তর্জাতিক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতের চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবে ও প্রসারে সাহায্য করেছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ জাপানের কাছে ইউরোপের শক্তিশালী দেশ রাশিয়ার পরাজয় ভারতের জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ইউরোপীয়রা যে অপরাজেয় এই ধারণার এখন থেকে অবসান ঘটে। ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের সাফল্যও অনুরূপভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশজনগণের এই বিজয়কে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের জয় বলে মনে করা হয়েছিল এবং এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের সংগ্রাম অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই সময় চীন, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে জাতীয় আন্দোলন চলছিল এবং তাও ভারতীয় রাজনীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

অতএব বলা যায়, উনিশ শতকের শেষদিকে উপরি উক্ত একাধিক কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে চরমপন্থার উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের ফলে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটল। এই গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধিতা ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বরাজ অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গেল।

৭.৫.৯.৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) অমলেশ ত্রিপাঠী—ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব-(অনুবাদ-নির্মল দত্ত)

(২) অমলেশ ত্রিপাঠী— The Extremist Challenge.

(৩) সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত।

(৪) অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(৫) বিমান বিহারী মজুমদার—Militant Nationalism in India.

(৬) বিপান চন্দ্র— The Rise and growth of Economic Nationalism in India.

(৭) Stanley Wolpert–Tilak and Gokhale: Revolution and Reform in the Making of Modern Life.

৭.৫.৯.৪.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় জাতীয়তাবাদে চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট বিচার কর।

(২) ভারতীয় জাতীয়তাবাদে চরমপন্থা উদ্ভবের পশ্চাতে ভাবগত কারণ বিশ্লেষণ কর।

(৩) চরমপন্থী নেতৃবর্গ বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে কি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন?

(৪) চরমপন্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

(৫) চরমপন্থা উদ্ভবের পশ্চাতে লর্ড কার্জন কতখানি দায়ী ছিলেন?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

Emergence of Organised Nationalism Trend till 1919

একক - ১০

বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ – লর্ড কার্জনের দায়িত্ব

গঠন (Structure) :

৭.৫.১০.১.০ : উদ্দেশ্য

৭.৫.১০.১.১ : সূচনা

৭.৫.১০.১.২ : বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক পরিকল্পনা

৭.৫.১০.১.৩ : বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার পেছনে কার্জনের ভূমিকা

৭.৫.১০.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৫.১০.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৫.১০.১.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট

(২) বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে প্রশাসনিক পরিকল্পনা

(৩) বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার পেছনে কার্জনের দায়িত্ব

৭.৫.১০.১.১ : সূচনা

উনিশ শতকের শেষ থেকে কংগ্রেসের মধ্যে উদারপন্থী নেতৃত্বের ব্যর্থতা চরমপন্থী আদর্শের জন্ম দিয়েছিল। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, চিন্তার দিক থেকে চরমপন্থীদের প্রস্তুতি থাকলেও, তাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছিল লর্ড কার্জনের নীতি।

৭.৫.১০.১.২ : বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক পরিকল্পনা

কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনিক নীতির বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ তৈরী হয়েছিল, তা চরমে ওঠে বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, লর্ড কার্জন পূর্বে প্রস্তাবিত বাংলাভাগের পরিকল্পনাকে কার্যকর করার নির্দেশ দেন। ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল তা নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছিল। বৃটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার কথা বললেও, এর পিছনে বৃটিশ আমলাদের বাঙালী বিরোধী মনোভাবই ছিল প্রধান কারণ।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে বৃটিশ আমলারা ভারতে এসেছিলেন তারা মনে করতেন যে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীরা বৃটিশ শাসক এবং তাদের প্রজাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করবে। বর্ণে ভারতীয় হলেও, চিন্তা এবং আদর্শে এরা হবে ইংরেজ এবং শাসকশ্রেণীর অনুগত। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বৃটিশ আমলাদের এই মনোভাবে পরিবর্তন আসতে থাকে। উনিশ শতকের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, বিশেষ করে নীলচাষীদের পক্ষে হিন্দু পেট্রিয়টের সমর্থন, ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলন, বৃটিশ আমলাদের মধ্যে বাঙালীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। এর সঙ্গে ছিল নীলকর সাহেব এবং বৃটিশ বণিকদের উস্কানি। ভাইসরয় হিসাবে ভারতে আসার আগে থেকেই কার্জন বৃটিশ সরকারের কংগ্রেস বিরোধী এবং বাঙালী বিরোধী মনোভাবের ভাগীদার ছিলেন।

বাংলাভাগের পিছনে প্রশাসনিক কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল বাংলা প্রেসিডেন্সির বৃহৎ আয়তন। বিশাল এই প্রেসিডেন্সির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নানা প্রশাসনিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সির সঙ্গে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ যুক্ত হয়। ১৮৬৭ সালে উড়িষ্যায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় প্রথম প্রশাসনিক সমস্যা অনুভূত হয়। সেই সময় বম্বে এবং মাদ্রাজের মতন বাংলা প্রেসিডেন্সিকেও একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দায়িত্বাধীন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু জন লরেন্স এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বাংলার জেলাগুলির আয়তন সংকোচনের প্রস্তাব দেন। এরই সঙ্গে তাঁর বিকল্প প্রস্তাব ছিল বাংলা থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করে চিফ কমিশনারের অধীনে তিনটি কমিশনে ভাগ করা। তিনি মনে করতেন যে আর্থিক ব্যয়

সংকোচনের সঙ্গে আসামের উন্নতি সাধন হবে এই পরিকল্পনার ফলে। পরে তিনি আসামের সঙ্গে তৎসন্নিহিত জেলাগুলিকে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বিহার এবং উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো কারণ তিনি দেখেননি।

১৮৭২ সালের প্রথম আদমসুমারিতে দেখা যায় যে বাংলার জনসংখ্যা প্রায় সাতষট্টি কোটি, এবং এই বিশাল প্রেসিডেন্সিতে সুষ্ঠু প্রশাসন চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সরকার যে নতুন কর আরোপ করেছিল, তার বিরুদ্ধে জমিদারদের অসন্তোষ বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে রায়তদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, এবং রাজস্বসংগ্রহ আরও সহজ করার জন্যে জেলাগুলির আয়তন কমানো প্রয়োজন ছিল।

১৮৭৪ সালে আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বাংলাভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা নিয়ে আসামে Chief Commissioner এর অধীনে স্বতন্ত্র একটি প্রদেশ গঠিত হয়। কিন্তু সিভিলিয়ান এই ক্ষুদ্র প্রদেশে কর্মোপলক্ষ্যে যেতে রাজি না হওয়াতে, চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু জনমতের চাপে বিশেষ করে চট্টগ্রামের মানুষের বিরোধিতার জন্যে এই প্রস্তাব কাউন্সিলে অনুমোদন করানো যায়নি।

১৯০০ সালে কার্জনের আসাম সফরের সময় সেখানকার চা-বাগানের মালিকরা রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নতুন বন্দর গঠনের দাবি জানান। ১৯০২ সালে সীমান্ত বিন্যাসের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্যে যখন কার্জনের সামনে আসে, তখন নিজামের থেকে লব্ধ বেরারকে সেন্ট্রাল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবা হয়। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে এই সময় অবধি বৈজ্ঞানিকভাবে সীমা বিন্যাসের প্রশ্নটাই বড়ো ছিল, রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি যুক্ত হয়নি।

ইতিমধ্যে বাংলার জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এই অবস্থায় বাংলার গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ওড়িশা এবং সম্বলপুরকে সেন্ট্রাল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন।

বাংলা, আসাম, সেন্ট্রাল প্রদেশ এবং মাদ্রাজের সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রেজারকে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। ফ্রেজারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯০৩ এর পয়লা জুন, সীমানা নির্ধারণের মিনিট তৈরি হয়। স্বরাষ্ট্র সচিব রিজ্‌লির অনুমোদন পাওয়ার পর ১৯০৩ এর তেসরা ডিসেম্বর রিজ্‌লি পেপার প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম ডিভিসন, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ছোটনাগপুরকে সেন্ট্রাল প্রদেশের সঙ্গে এবং সম্বলপুরকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলাকেও বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। নতুনভাবে সীমান্ত বিন্যাসের ফলে মনে করা হয় বাংলার জনসংখ্যা খানিকটা হ্রাস পাবে এবং জেলা শাসকের পক্ষে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হবে। চট্টগ্রামের মধ্যে দিয়ে আসামের চা রপ্তানি করা গেলে, রপ্তানির ব্যয় কমবে। ওড়িয়াভাষী মানুষেরা এক শাসনের অধীনে আসবে। পূর্বের জেলাগুলি কলকাতার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলে, এই অঞ্চলের মুসলিম জনগণ সুবিচার পাবেন।

১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক সুবিধা সীমান্ত বিন্যাসের প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু ১৯০৫এর বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল, তার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯০৩ সালে প্রকাশিত রিজ্‌লি পেপারের মধ্য দিয়ে। ফ্রেজার এবং রিজ্‌লির পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গের প্রথম পরিকল্পনা যে চরমপন্থীদের দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে যায় ফ্রেজারের মন্তব্য থেকে—তার মতে বাংলা প্রদেশের বেশ কয়েকটি জেলা বাঙালীদের নিজস্ব আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। রিজ্‌লি মনে করতেন প্রাদেশিক রাজনীতিতে বাঙালী

হিন্দুদের আধিপত্য হ্রাসের প্রয়োজন আছে এবং তা একমাত্র বাংলাকে ভাগ করলেই সম্ভব হবে। ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু বাংলাকে ভাগ করলে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে বাংলাভাগের পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া।

অবশ্যই রিজ্‌লি পেপারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। আপত্তি এসেছিল প্রধানতঃ বাঙালীদের থেকেই। কংগ্রেস রিজ্‌লি পেপারের কড়া সমালোচনা করে এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হবে বলে মনে করে।

কার্জন এই উত্তেজনার সময়কে বেছে নিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গ সফরের জন্যে। মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গে সমর্থন লাভ না করলে বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়িত করা যাবে না। ময়মনসিংহ সফরের সময় হঠাৎ রিজ্‌লি পত্রের পরিকল্পনার আরও ব্যাপক রূপ দেন। মালদাসহ রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে) ও ঢাকার বাকি জেলাকে রিজ্‌লি পত্রে বর্ণিত জেলাগুলির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। ঢাকার একটি সমাবেশে কার্জন মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আলাদা প্রদেশ গঠন করাই রিস্‌লে পত্রের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন।

১৯০৪ সালে কংগ্রেস রিজ্‌লি পত্রের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ পুনরায় জানিয়েছিল। এর উত্তরে কার্জন বলে যে বাঙালীভাষীদের বিভক্ত করার যে কোন পরিকল্পনাই কংগ্রেস বিরোধিতা করবে কারণ কলকাতা কংগ্রেসের সকল ষড়যন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র এবং কলকাতা গুরুত্ব হারালে কংগ্রেসের মধ্যে আধিপত্যস্থাপনকারী উকিলশ্রেণী তাদের ক্ষমতা হারাবে। কার্জনের এই বক্তব্য থেকে, বঙ্গভঙ্গের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রাধান্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বঙ্গভঙ্গের শেষ প্রস্তাবে বাংলা হারিয়েছিল ১৫টি জেলা। ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছিল, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫এ এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা বাংলা। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পালন করা হয় রাখী উৎসব।

৭.৫.১০.১.৩ : বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার পিছনে কার্জনের ভূমিকা

১৮৯৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কার্জন বড়লাটের দায়িত্বভার নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে তার দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বৃটিশ সরকারকে প্রায়শই সমস্যায় ফেলত। প্রথম থেকেই কার্জন বৃটিশ আমলাদের হিন্দু এবং কংগ্রেস বিরোধিতার মানসিকতার ভাগীদার ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের উচ্চপদগুলি একমাত্র ইউরোপীয়দের জন্যই সংরক্ষিত হওয়া উচিত। সঞ্জীবনী পত্রিকা থেকে জানা যায়, কার্জনের আমলে সরকারী উচ্চপদগুলিতে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বেড়েছিল। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে কার্জনের অসহিষ্ণুতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ সালের ১৮ই নভেম্বর ভারত সচিব হ্যামিলটনকে তিনি জানান যে কংগ্রেস ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং আমার অন্যতম উচ্চাকাঙ্খা হল এর শান্তিপূর্ণ বিলুপ্তিতে সহায়তা করা। কংগ্রেসকে অপ্রয়োজনীয়, রাজদ্রোহী প্রমাণ করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। একটি সংখ্যালঘুদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রতীক হিসাবে মানতে তিনি রাজি ছিলেন না। স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব বা গণতন্ত্রের আর্দশ ভারতীয়দের জন্যে নয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। কার্জনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। কার্জন ছিলেন যথার্থভাবেই একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি যার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনকে শক্তিশালী, নির্দিষ্টমুখী এবং স্থায়ী করা। বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে বৃটিশ শাসনকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনার মধ্যেও তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক

শাসকদের মনে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক সমস্যা প্রাধান্য পেলেও, পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক কারণই প্রধান হয়ে দাড়িয়েছিল। কার্জন পূর্বেকার বৃটিশ আমলাদের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে যে ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ১৯০৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লর্ড মিন্টোর একটি স্মারকলিপি থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাঙালী ভদ্রলোক, জমিদার, মহাজন এবং পেশাদারী শ্রেণী যাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য, তাদের আধিপত্য বিনষ্ট হবে বাংলা ভাগের ফলে। শিক্ষা এবং প্রশাসনের সমস্ত পদগুলি তাদের দখলে ছিল যা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল। সুতরাং ভদ্রলোকদের বিপরীতে অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করতে হবে।

৭.৫.১০.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

Shekhar Bandyopadhyay – From Plassey to Partition-A History of Modern India.

Sumit Sarkar – The Swadeshi Movement in Bengal.

Amales Tripathi – The Extremist Challege.

অমলেশ ত্রিপাঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

Rajat Kanta Ray – Social Conflict and Political Unrest in Bengal.

John Mc Lane – Indian Nationalism and Early Congress.

৭.৫.১০.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Why was Bengal Partitioned in 1905.
2. How far was Curzon responsible for the Partition of Bengal.
3. Would you agree that administrative considerations were the sole reason for partitioning Bengal in 1905.

পর্যায় গ্রন্থ - ৫
NATIONAL MOVEMENT

স্বদেশী আন্দোলন এবং বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা

গঠন (Structure) :

৭.৫.১০.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.৫.১০.২.১ : সূচনা

৭.৫.১০.২.২ : নরমপন্থী চিন্তাধারা

৭.৫.১০.২.৩ : গঠনমূলক স্বদেশী

৭.৫.১০.২.৪ : চরমপন্থী ধারা—বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

৭.৫.১০.২.৫ : সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

৭.৫.১০.২.৬ : স্বদেশীর অর্থনৈতিক তাৎপর্য

৭.৫.১০.২.৭ : বাংলায় স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ

৭.৫.১০.২.৮ : বয়কট

৭.৫.১০.২.৯ : জাতীয় শিক্ষা

৭.৫.১০.২.১০ : স্বদেশী সংগঠন

৭.৫.১০.২.১১ : আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

৭.৫.১০.২.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৫.১০.২.১৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৫.১০.২.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা

(২) এই আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা

(৩) এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

৭.৫.১০.২.১ : সূচনা

বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাংলায় প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল সভা, সমাবেশের মধ্য দিয়ে। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট টাউন হলে একটি সভায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু করার কথা প্রথমবার ঘোষণা করা হয়। ঊনিশ শতক থেকেই আত্মশক্তি অর্জনের জন্য গঠনমূলক স্বদেশীর আর্দশ নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আলোচনা হলেও, সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায় বলে মনে করেন সুমিত সরকার–(১) উদার পন্থী চিন্তাধারা বিশ্বাস করতেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে না গিয়ে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া, (২) গঠনমূলক স্বদেশী, (৩) বয়কট এবং Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, (৪) সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা।

৭.৫.১০.২.২ : নরমপন্থী চিন্তাধারা

প্রথম পর্বে ডিসেম্বর ১৯০৩ থেকে জুলাই ১৯০৫ পর্যন্ত নরমপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। মার্চ ১৯০৪ এবং জানুয়ারী ১৯০৫ এ টাউন হলে দুটি সভা হয়েছিল এবং বাংলাভাগের বিরোধিতা করে কিছু আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যেও আন্দোলনের প্রকৃতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ১৯০৫ সালের বেনারস অধিবেশনে গোখলে সরকারি নীতির সমালোচনা করেন। বারাণসী কংগ্রেস থেকেই মহারাষ্ট্র এবং বাংলার চরমপন্থীদের মধ্যে বোঝাপড়া শুরু হয় এবং কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। স্বদেশীর কর্মসূচীও গৃহিত হয়। ১৯০৬ সালের কলকাতা অধিবেশনে চরমপন্থীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বয়কটের প্রস্তাব রাখেন। নরমপন্থীরা চেয়েছিলেন সীমিত কয়েকটি বৃটিশ পণ্যের বয়কট। কলকাতার পূর্ণ অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী শেষপর্যন্ত উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে স্বরাজ লাভই ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেন। আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধিতা থাকলেও বাংলায় নরমপন্থী নেতৃত্ব তাদের আবেদন নিবেদনের রাজনীতিকে পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়। সুরেন্দ্রনাথ বাংলার বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমন করেন এবং ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র এবং লিভারপুলের নুন বয়কটের ডাক দেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও তারা যুক্ত ছিলেন।

৭.৫.১০.২.৩ : গঠনমূলক স্বদেশী

স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল আত্মশক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং বাংলায় উদারপন্থী পদ্ধতির সমালোচনা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। বৃটিশ শক্তির কাছে ভিক্ষার বদলে, গঠনমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন নতুন যুগের মন্ত্র ছিল। দেশীয় প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক ভাষা, দেশীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রথম প্রয়াস শুরু হয় এই সময় থেকে। স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী ভান্ডার, জাতীয় শিক্ষা এবং গ্রাম উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠাই ছিল মূল লক্ষ্য। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের বহু আগে থেকেই স্বদেশী মেলা, দেশীয় রীতি, ভাষা এবং স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বদেশীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে স্বদেশী এবং জাতীয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। গঠনমূলক স্বদেশীর মূল চিন্তা ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শও প্রকাশ পেয়েছিল। পুরোনো রাজনৈতিক পদ্ধতি বর্জন করে গ্রামভিত্তিক গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির কথা তিনি বলেছিলেন।

স্বদেশীর আদর্শকে কাজে পরিণত করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল ঊনিশ শতকের নব্বই এর দশক থেকে। বিভিন্ন প্রদর্শনী ও স্বদেশী বিপনী খোলা হয়েছিল যেমন ১৮৯৭ এ খোলা হয় স্বদেশী ভান্ডার, ১৯০১ যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ইন্ডিয়ান স্টোরস্ এবং ১৯০৩ সরলাদেবীর লক্ষ্মী ভান্ডার। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল খোলা হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। সতীশচন্দ্র মুখার্জীর ডন পত্রিকায় স্বদেশী শিল্প এবং জাতীয় শিক্ষা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়। ভাগবত চতুষ্পাঠী (১৮৯৫), ডন সোসাইটির সাপ্তাহিক আলোচনা সভা, সারস্বত আশ্রম (১৯০২) এবং বোলপুরের আশ্রমের মতো জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯০৪ সালের বর্ধমান প্রাদেশিক সভাতে আশুতোষ চৌধুরী গঠনমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের আহ্বান দেন। সুতরাং ১৯০৫ এ যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হচ্ছে তখন আত্মশক্তি এবং স্বদেশীর আদর্শ বাংলার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

৭.৫.১০.২.৪ : চরমপন্থী ধারা—বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে চরমপন্থীরা ক্রমশঃ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি এবং আত্মশক্তির আদর্শের থেকে সরে গিয়ে এরা দাবী তোলে স্বরাজের। স্বরাজ লাভের পদ্ধতি হিসাবে চরমপন্থীরা বেছে নিয়েছিলেন বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

১৯০৫ সাল থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় স্বাধীনতার দাবী জানানো হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট পত্রিকায় স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলেন। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে বিপিনচন্দ্র পাল বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ভারতের দাবী তোলেন। বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ এবং সরকারী প্রশাসন বয়কট এবং সঙ্গে স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে বৃটিশদের বিরোধিতার কথা বলেন অরবিন্দ। বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে সংগঠনের প্রয়োজন, কলকাতার চরমপন্থী নেতারা সেদিকে ততটা দৃষ্টি দেননি। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলির রাজনীতিতেই তারা মগ্ন ছিলেন। সুমিত সরকারের মতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে জেলাগুলিতে যে নতুন সমিতিগুলি গড়ে

উঠেছিল তাদের মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। বরিশাল এবং ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিশনে সমিতিগুলি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং পল্লীউন্নয়ন, স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে স্বদেশীর আদর্শ প্রচারে সফল হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত কলকাতা এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে বিশেষ করে জামালপুর, আসানসোল এবং খড়গপুরে যে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী, প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বোসের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা। যদিও শ্রমিক আন্দোলনের মূল দাবী ছিল অর্থনৈতিক, তথাপি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের যথেষ্ট যোগ ছিল, বিশেষ করে বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত শিল্পে শ্রমিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমর্থন ছিল সুস্পষ্ট যেমন ১৯০৫-০৬ এর খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রেলের শ্রমিক আন্দোলন।

৭.৫.১০.২.৫ : সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

স্বদেশী আন্দোলনকে সামনে রেখে গোপন সমিতিগুলির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের উত্থান ছিল স্বদেশী আন্দোলনের ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯০২ সালের মধ্যে বাংলায় চারটি বিপ্লবী গোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল অনুশীলন সমিতি। ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী সংগঠনগুলি পুনরায় কার্যকরী হয়ে ওঠে । অনুশীলন সমিতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাদের শাখা বিস্তার করে। ১৯০৬ ডিসেম্বরে প্রথম বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী যুগের বহু বিপ্লবী সংগঠনের শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে।

৭.৫.১০.২.৬ : স্বদেশীর অর্থনৈতিক তাৎপর্য

স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক এবং গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্পে এবং উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশে তৈরি সামগ্রী ব্যবহার করা এবং এর জন্যে নতুন শিল্প গড়ে তোলা। দেশপ্রেমের এই আদর্শ বাংলার মানুষকে প্রভাবিত করেছিল ১৮৭০ এর দশক থেকে এবং বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় তা আরও শক্তি সঞ্চয় করেছিল। স্বদেশী যুগের এই অর্থনৈতিক চিন্তা যদিও নতুন ছিল না কিন্তু ১৯০৫ এর পরে এই চিন্তাভাবনায় কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। নরমপন্থীরা শিল্পায়নকে সামগ্রিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে দেখেছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালের থেকে চরমপন্থী নেতৃত্ব বয়কট এবং স্বদেশীকে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে মনে করতেন। বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কট করলে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা হবে এবং স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ হবে বলে তারা মনে করতেন। এর ফলে অর্থনীতিতে স্বয়ংভরতার বিকাশ ঘটবে যা ভারতবর্ষকে স্বনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করবে। সুমিত সরকারের মতে ১৯০৫ এর পরে গঠনমূলক স্বদেশীর বদলে চরমপন্থী নেতৃত্ব Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনীতিকে গ্রহণ করেন যার মধ্যে বয়কট এবং স্বদেশী শিল্প গঠন একটি অংশমাত্র ছিল। স্বদেশী অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার সবচেয়ে নতুন দিক ছিল পশ্চিমী ধাঁচে বৃহদাকার শিল্প গঠনের পরিকল্পনা বর্জন। এই সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মতো স্বদেশী কাপড়ের মিল, চিনেমাটি, চামড়া, দেশলাই বা সাবানের কারখানা গড়ে উঠে। স্বদেশী শিল্প গঠনে তরুণদের উৎসাহ দেওয়া হয়। ১৯০৭ সালে দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ সম্ভাব্য উদ্যোগপতিদের জন্য Industrial Guide প্রকাশ করেন। হস্তশিল্প, চরকা ও হাতে বোনা তাঁতের দ্বারা উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাখী বন্ধনের দিনে স্বদেশীর ব্রত হিসাবে চরকা ব্যবহারের প্রস্তাবও রাখা হয়। তবে স্বদেশী শিল্পায়নের প্রকৃতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। একদিকে যেমন ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং

বৃহৎ শিল্পের সামাজিক কুপ্রভাব নিয়ে আপত্তি ছিল, অন্যদিকে স্বদেশী বলতে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নীলরতন সরকার বৃহদাকার আধুনিক শিল্পের কথা ভেবেছিলেন। সতীশচন্দ্র মুখার্জী ডন পত্রিকায় ''Indian Economic Problem'' প্রবন্ধে দ্বৈত অর্থনীতির কথা বলেন অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিল্পায়ন যেমন রেল, খনি, রসায়ন। অন্যত্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন।

৭.৫.১০.২.৭ : বাংলায় স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ

ঊনিশ শতক থেকে বাঙালী উদ্যোগপতিদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এই প্রচেষ্টার পিছনে কোন জাতীয়তাবাদী চেতনা কাজ করেনি। ১৮৮৭ সালে ভাগ্যকূলের রায় পরিবারের (যারা চাল এবং পাটের ব্যবসা করতেন) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স। চা এবং কয়লার ব্যবসাতে যে ভারতীয় পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছিল সেখানেও জাতীয়তাবাদী আদর্শ কোন ভূমিকা নেয়নি।

জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং দেশপ্রেম থেকে যে দেশীয় শিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল সেখানে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল কলকাতার কয়েকটি অভিজাত পরিবার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার যেমন ১৮৪৭ সালের পর থেকে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রকে হিন্দু মেলা শুরু করতে সাহায্য করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Inland River Steam Navigation Service।

সুমিত সরকারের মতে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে অর্থনৈতিক স্বদেশী ক্রমশঃ একটি সংগঠিত আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত বিদ্যা এবং গবেষণা শুরু হয়েছিল, অন্যদিকে দেশীয় কারিগরি শিল্প এবং আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়াও স্বদেশী ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি ইত্যাদি ব্যবসার শুরু হতে দেখা যায় এই পর্বে।

হিন্দু মেলার অনুকরণে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির জন্য Industrial Association মেলা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করত। মহিলা শিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিরন্ময়ী দেবীর উদ্যোগে। এছাড়াও স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির জন্য স্বদেশী দোকান খোলা হয়েছিল। নীলাম্বর মুখার্জী এবং বঙ্গবাসীর কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বদেশী এম্পোরিয়াম। ইন্ডিয়ান স্টোরস্ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০২ সালে। ১৯০৫ সালের পর স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা বাড়ার ফলে নতুন বিপণী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্বদেশী বাজার। চিৎপুর রোডে স্বদেশী বস্ত্রালয় বাংলার ঐতিহ্য তাঁত শিল্পের পুনরুত্থান ঘটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে। ফ্লাই শাটল তাঁতের ব্যবহার জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাঁতের কাপড়ের চাহিদা বেড়েছিল। কিন্তু দেশী কাপড়ের দাম ছিল দ্বিগুণ। ফলে তাঁতীদের লাভ কম হত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুর্শিদাবাদ এবং মালদায় রেশম শিল্পের উৎপাদন বেড়েছিল।

আধুনিক শিল্পের মধ্যে অন্যতম ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের Bengal Chemical and Pharmaceutical Works। রাসায়নিক শিল্পের বিকাশের যে ধারা এই সময় শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত ছিল পরবর্তী পর্বেও। ১৯০৬ সালে বৃটিশ এবং জার্মান মেশিন ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুরু হয় Calcutta Pottery Works এর আধুনিক কারখানা। এছাড়াও সত্যচরণ বোসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Bengal Pottery Works। স্বদেশী উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম ছিল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার ছিলেন জমিদার এবং ব্যবসায়ীরা। মোহিনী মোহন চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোহিনী মিলস্ নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়াতে।

এছাড়াও সাবান এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের শিল্পও গড়ে উঠেছিল এই সময়। নীলরতন সরকারের প্রতিষ্ঠিত National Soap Factory, Bengal Soap Factory, রাসবিহারী ঘোষের Bande Mataram Match Factory, স্বদেশী সিগারেট, মনোরমা মোমবাতির কারখানা ইত্যাদি। স্বদেশী প্রসাধনী শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এইচ. বোস।

সুমিত সরকারের মতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে স্বদেশী যুগে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৮৬৭ সালে Shibpur Iron Works প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কাঁচা মালের লোহা এবং স্টীল আমদানী করতে হত। একমাত্র ব্যাতিক্রম ছিল টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি।

১৯০৭-০৮ থেকে ব্যাঙ্কিং এবং বীমার ব্যবসা, ইত্যাদিতে পুঁজি বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালে। ১৯০৬ এ শুরু হয় The National Insurance Company। কিন্তু বাংলার অর্থনীতি এবং শিল্পের উপর ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে বাংলার স্বদেশী যুগের উদ্যোগ বিশেষ প্রসার লাভ করেনি।

৭.৫.১০.২.৮ : বয়কট

বিদেশী দ্রব্য বর্জন স্বদেশী কর্মসূচীর প্রধান বিষয় হলেও বাস্তবে কিন্তু বয়কট প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। প্রধানত মাঞ্চেস্টারে উৎপাদিত বস্ত্র, লিভারপুলের নুন এবং চিনি, সিগারেট ইত্যাদি দ্রব্য বয়কটের কথা বলা হয়েছিল। কলকাতা বন্দরে আমদানীর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে বিলাতী বস্ত্রের ক্ষেত্রে আমদানী কমেছিল। নুনের ব্যবহার ১৯০৫-০৬ এ ছিল ৫৯ শতাংশ, ১৯০৮-০৯ তা কমে গিয়ে দাড়ায় ২৮ শতাংশ এবং ১৯১১-১২ তে ৩৭ শতাংশ। সরকারী মতে ১৯০৭-০৮ সালের বিশ্বমন্দা এই কমতির জন্যে দায়ী ছিল। এছাড়াও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ও বিদেশী মিলমালিকদের মনোমালিন্যও আমদানী ব্যবসার উপর প্রভাব ফেলেছিল। তবে পূর্ব বাংলার বাখরগঞ্জ, ঢাকা জেলায় সমিতির সদস্যরা পিকেটিং, সামাজিক বহিষ্কার ইত্যাদি পদ্ধতির প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বয়কটকে সফল করে তুলেছিল। এর ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশালে বিদেশী বস্ত্র এবং নুনের আমদানী কমে যায়।

৭.৫.১০.২.৯ : জাতীয় শিক্ষা

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় স্বাভাবিক ভাবে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে নেতাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল। সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমালোচনা করা হয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা তৈরি করছে। এই সময় সব নেতারাই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে সরব হয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ঊনিশ শতকের থেকেই জাতীয়তাবাদী সচেতনতার প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে গ্রহণ করার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে বিদেশী সভ্যতা আমাদের বোধবুদ্ধিকে অভিভূত করেছে যার ফলে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা অতি সহজেই লুপ্ত হয়েছে। আত্মশক্তি জাগ্রত করে সামাজিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের বাঁচবার একমাত্র উপায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা প্রভাবিত হয়েছিল তার স্বদেশচিন্তার দ্বারা। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার

প্রচার হলে শিক্ষা সর্বব্যাপী হবে। দেশীয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনে সাহায্য করবে। শিক্ষা ও স্বদেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার জোরালো বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে পটলডাঙার মল্লিকবাড়ীতে ছাত্রদের সভায় রবীন্দ্রনাথ বললেন ''আমাদের সমাজ যদি বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করে, তবে একদিন ঠকিতে হইবে।.....গভর্নমেন্ট এদেশে অনুকূল শিক্ষা কখনো দিতে পারে না''। ডন সোসাইটির একটি সভায় কার্লাইল সার্কুলার এর কথা উত্থাপন করে তিনি বলেনঃ ''আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে''.....

জাতীয় শিক্ষার আরেক অন্যতম প্রবক্তা সতীশচন্দ্র মুখার্জীর শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছিল ডন পত্রিকার মাধ্যমে। ''An Examination into the Present System of University Education in India and a Scheme for Reform (এপ্রিল-জুন ১৯০২) প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের সমালোচনা করেন। তবে সতীশচন্দ্রের শিক্ষাভাবনার মধ্যে তৎকালীন হিন্দু সংস্কারবাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায়। ডন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখা হয় যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। কিন্তু দেশীয় বিশেষ করে হিন্দু জীবন এবং বিশ্বাসের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সতীশচন্দ্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপরেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং সতীশচন্দ্রের মতো মানুষের কাছে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জাতি গঠন।

জাতীয় শিক্ষা নিয়ে বিশিষ্ট মনীষীদের চিন্তাভাবনা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল কার্জনের দমনমূলক নীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। ১৯০৪ এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা উচ্চশিক্ষার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় সরকারী স্কুল কলেজ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বিকল্প হিসাবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা ভাবা হয়। ১৯০৫ এর ৫ই আগস্ট একটি সভায় ছাত্রদের সাহায্যের জন্যে একটি তহবিল খোলা হয়। সরকারী দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন আরও সংগঠিত হয়। এই পর্বে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯০৫ এর ১০ই ডিসেম্বর Landholders Association এর একটি সভায় National Council of Education বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তিন বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, সাত বছরের সেকেন্ডারি শিক্ষা এবং চার বছরে কলেজের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৬ এর ১৫ই আগস্ট Bengal National College এবং স্কুল গঠন করা হয় এবং অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন প্রথম অধ্যক্ষ। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলাতেও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯০৮ এর মধ্যে প্রায় চল্লিশটা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তারকনাথ পালিত এবং নীলরতন সরকার প্রমুখ শিক্ষাবিদদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় Society for the Promotion of Technical Education. সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় Bengal Technical Institute ১৯০৬ সালের ২৫শে জুলাই। তারকনাথ পালিত ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। প্রমথনাথ বোস Institute এর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অর্থনৈতিক স্বদেশীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে বিষয়গুলি পড়ানো হত, তার মধ্যে ছিল সেরামিক প্রযুক্তি, মোমবাতি, সাবান তৈরীর প্রক্রিয়া। ১৯০৭ সালে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ইন্টারমিডিয়েটে ৬৮ এবং সেকেন্ডারীতে ১১৪ জন। কারিগরি এবং প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

৭.৫.১০.২.১০ : স্বদেশী সংগঠন

স্বদেশী আন্দোলনকে সংগঠিত করতে এবং আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরী করতে বাংলার বিভিন্ন জেলায় সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী দল এবং সমিতির মাধ্যমে গঠনমূলক স্বদেশীর কাজ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ গঠনের আদর্শ এবং অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনৈতিক মতাদর্শ বাস্তবে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব নেয় এই সমিতি ও সংগঠনগুলি।

১৯০৫ পর্যন্ত উদারপন্থীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সভা সমাবেশ করলেও, নিজেদের স্বেচ্ছাসেবি দল গঠন করেনি। মফস্বলে রিজ্‌লির পরিকল্পনার প্রতিবাদে আন্দোলন গঠন করেছিল ঢাকা পিপলস্ এসোসিয়েশন। কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহী জেলার পিপল্‌স এসোসিয়েশন নিজেদের জেলায় প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিল ১৯০৪-০৫ ধরে।

তবে জেলার মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত আন্দোলন হয়েছিল বরিশালে। ১৮৮০ র দশক থেকে বরিশালে পিপল্‌স এসোসিয়েশন (People's Association) সংগঠিত হয়েছিল আঞ্চলিক মানুষদের উৎসাহে। পরে অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রচেষ্টায় এই সংগঠন আরও প্রসার লাভ করে। বরিশালে যখন বয়কট আন্দোলন শুরু হয় তখন দুটি সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল যার মধ্যে একটি ছিল কর্মী সংঘ। পরবর্তীকালে অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কর্মী সংঘের অন্যান্য সদস্যদের প্রচেষ্টা কর্মী সংঘকে নতুনভাবে সংগঠিত করা হয় এবং জন্ম নেয় স্বদেশ বান্ধব সমিতি। সমিতির সদস্যরা বেশিরভাগই ছিলেন ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশানের ছাত্র এবং শিক্ষক। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যে সংগঠন তৈরির কর্মসূচী গ্রহণ করে। জেলা সংগঠন তৈরি হয় ঢাকা, কলকাতা, ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিশন টাঙ্গাইল, রামপুরহাট এবং বাগেরহাটে।

১৯০৬ সালের একটি পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় কলকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় বয়কট আন্দোলনের সময় থেকে। বন্দে মাতরম সম্প্রদায়, ব্রতী, ভারত অনুশীলন সমিতি, শক্তি সমিতি ইত্যাদি অসংখ্য ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান এবং সমিতি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রতী সমিতি। Anti Circular Society প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০৫ সালে কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে। এটি ছিল ছাত্রদের একটি সংগঠন। উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, হিন্দু মুসমান ঐক্য এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার উপর জোর দিত এই সংগঠনের সদস্যরা।

পূর্ব বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ এবং এই প্রত্যেকটি জেলায় সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলার পাঁচটি প্রধান সমিতি ছিল স্বদেশ বান্ধব, ব্রতী, ঢাকা অনুশীলন, সুহৃদ এবং সাধনা। বরিশাল শহরে ১৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল স্বদেশ বান্ধব সমিতি। বিভিন্ন সভার মধ্যে দিয়ে সমিতি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করত। এছাড়া সমিতির নিজস্ব স্বদেশী ভান্ডার এবং তাঁত বোনার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। স্বদেশ বান্ধব সমিতির শাখা ছিল গ্রামস্তরে এবং প্রত্যেকটি সংগঠন নিজেদের স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করেছিল। বিভিন্ন গঠনমূলক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের শারীর শিক্ষা দেওয়া হত। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশী দ্রব্য জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সমিতির দ্বারা

পরিচালিত আন্দোলনের ফলে বরিশালে বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানী কমে গিয়েছিল। দেশীয় উৎপাদনের চাহিদা বেড়েছিল।

ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদারের নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। অন্যদিকে মাদারীপুর সাবডিভিশনে বিপ্লবী ভাবধারায় গড়ে উঠেছিল ব্রতী সমিতি। লাঠি চালনা, ছোরা খেলার অনুশীলন এবং সঙ্গে সঙ্গে বয়কট ও স্বদেশীর আদর্শ প্রচার করা হত।

ঢাকায় বিপিনচন্দ্র পালের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতি। এই সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন পুলিনবিহারী দাশ। বিপ্লবের আদর্শে সংগঠিত এই সমিতি কঠোর অনুশীলন এবং নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিত। ঢাকার চরমপন্থী নেতা এবং উকিল আনন্দ চন্দ্র চক্রবর্তী এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৮ সালের মধ্যে ঢাকা জেলায় অনুশীলন সমিতির ১১৯টি শাখা স্থাপিত হয়েছিল। সমিতিরা ম্যাজিক লণ্ঠন শো, গ্রাম উন্নয়ন, আদালত স্থাপন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রচার করত।

স্বদেশী আন্দোলনকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। গান, নাটক, যাত্রাপালা, স্বদেশী মেলা, নাটক এবং বিভিন্ন উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে মানুষকে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে স্বদেশী যুগের নেতারা জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা শিক্ষিত জনগণের মধ্যে প্রচার করতেন। ইংরাজি সংবাদপত্রের মধ্যে বেঙ্গলি, অমৃতবাজার পত্রিকা জনপ্রিয় ছিল। বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে হিতবাদী, সন্ধ্যা, বসুমতী, হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। এছাড়াও মফস্বল থেকে বহুসংখ্যক বাংলা কাগজ প্রকাশ করা হত, যেমন বরিশালে দুর্গামোহন সেনের সম্পাদনায় হিতৈষী, ময়মনসিংহ থেকে বৈকুণ্ঠনাথ সোমের মিহির ইত্যাদি। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ভান্ডার পত্রিকা হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক, কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ, জাতীয় ভান্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপে। স্বদেশীর বার্তা প্রচারের আরও একটি মাধ্যম ছিল পুস্তিকা বা Pamphlet।

জনসভায় স্বদেশীর কর্মসূচী এবং আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা সাধারণ মানুষের মনকে নাড়া দিত। স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা জেলাগুলিতে পরিভ্রমন করে সভা সমাবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার করত।

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের এই পদ্ধতি ছাড়াও স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল। গ্রামউন্নয়ন এবং গঠনমূলক কাজকর্ম ছিল তার মধ্যে একটি।

ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতার মাধ্যমে স্বদেশীর আদর্শ প্রচার করত। স্বদেশ বান্ধব সমিতি ১৯০৬ সালে দুর্ভিক্ষে ত্রাণের কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। ১৯০৭ সালে ত্রাণের জন্য অন্নরক্ষিনী সভা গঠন করা হয় বঙ্গবাসীর উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গ্রামউন্নয়নের এবং সমাজ গঠনের উপদেশ দিয়েছিলেন।

জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রাখী বন্ধন দিবস পালন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জনপ্রিয় প্রাচীন এই ভারতীয় ঐতিহ্যকে একদিকে প্রতিবাদ এবং অন্যদিকে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক হিসাবে পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবে মেয়েরা অরন্ধন পালন করত এবং গৃহের আগুন জ্বালাতো না। ১৯০৫ সালের ২৪ আগস্ট মেয়েদের একটি সমাবেশ হয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় মেয়েরা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের অঙ্গীকার নেয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলা কবিতা, গান এবং নাটকের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের শুরু হয়। উনিশ শতক থেকেই জাতীয়তাবাদী গান এবং কবিতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় যা পূর্ণতা পায় স্বদেশী যুগের দেশাত্মবোধক সংগীত এবং কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগের গান ছাড়াও, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, মুকুন্দ দাস, সৈয়দ আবু মহম্মদের গান যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনা করা হয়েছিল গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বদেশীর বার্তা পৌঁছানোর জন্যে। ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি স্বদেশী পল্লী সঙ্গীতের একটি সংকলন প্রকাশ করেছিল। বাঁকুড়ায় ভাদু সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বদেশী প্রচার করা হতো বরিশালে জারি গানের শৈলীতে স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন মোফিজউদ্দিন রায়তি।

১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের রচিত; বাংলার মাটি, বাংলার জল বাংলার মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক এবং যাত্রার চল হয়েছিল। ১৯০৬ সালে স্টার এবং মিনার্ভায় স্বদেশী নাটক দেখানো হত। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা, মির কাশিম এবং ছত্রপতি শিবাজী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস এবং মেবার পতন। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করা হত। গ্রামাঞ্চলে যাত্রা এবং কথকতার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রচার করা হত। মুকুন্দ দাসের মাতৃপূজা এইসময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

৭.৫.১০.২.১১ : আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

স্বদেশী আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল। সরকারী অত্যাচার এবং দমননীতির ফলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলেও, সম্পূর্ণভাবে গতিহীন হয়ে পড়ার পিছনে প্রধান কারণ ছিল না বলে মনে করেন সুমিত সরকার। তাঁর মতে স্বদেশী আন্দোলন ভদ্রলোক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কৃষকদের জন্যে নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী না থাকার ফলে, গ্রামাঞ্চলের অগণিত কৃষক এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মবোধ করেনি। আন্দোলনে বয়কট প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করলেও পরে স্তিমিত হয়ে আসে। গ্রামের মানুষের পক্ষে নিম্নমানের স্বদেশী তাঁতের কাপড় বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অতিরিক্ত মূল্যে কেনা সম্ভব ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বয়কট তার তাৎপর্য হারিয়েছিল।

তাছাড়াও স্বদেশী উদ্যোগ, চা, পাটশিল্প, কয়লা ইত্যাদি শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ করতে পারেনি। সরকারি সাহায্য না পাওয়ার ফলে স্বদেশী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পুঁজির অভাবও স্বদেশী শিল্পোদ্যোগে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রেও নানা দুর্বলতা দেখা যায়। গঠনমূলক স্বদেশীর ফলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে যায়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরিয়ে উপযুক্ত চাকরি পাওয়া কঠিন ছিল বলে ছাত্ররা এই প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসত না। বয়কট ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে গিয়েছিল। গণশিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দেয়নি জাতীয় শিক্ষা নীতি।

স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকে মুসলমানদের প্রতি বৃটিশদের নীতিতে পরিবর্তন এসেছিল। বাংলাভাগের অন্যতম কারণ ছিল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা। ফলে মুসলিমদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতারা সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ছিল প্রকট, যা মুসলমানদের

খানিকটা পরিমাণে আন্দোলনের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ১৯০৩ এ যখন প্রথম বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় তখন উভয় সম্প্রদায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু এই ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বৃটিশ নীতি উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলন বিরোধী করে তুলেছিল। অভিজাত মুসলিম নেতৃত্ব শহর ও গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের সংগঠিত করেছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্র মুসলমানদের ক্ষোভ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আকার ধারণ করেছিল।

বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা কৃষক এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট কৃষিভিত্তিক কর্মসূচীর অভাবের জন্যই কৃষকেরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্নবর্গীয় জাতি সম্প্রদায়ের মানুষও এই আন্দোলনে সামিল হয়নি।

৫.২.২.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

Sumit Sarkar – The Swadeshi Movement in Bengal

Shekhar Bandyopadhyay – From Plassey to Partition–A History of Modern India

Rajat Kanta Ray – Social Conflict and Political Unrest in Bengal.

Amit Bhattacharjee – Swadeshi Enterprise in Bengal 1900-1920

Haridas and Uma Mukherjee – Origins of National Education movement.
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ

J.R. Mc Lane – The 1905 Partition and The New Communalism Bengal East and West Alenander Lipski (ed.)

গণশক্তি (প্রকাশনা) -- **বজ্রশিখায় বাংলা** (কলকাতা বইমেলা, ২০০৫)
(বঙ্গবিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষে সংকলন)
'বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসকি সংগ্রাম' (প্রবন্ধ) অমল দাশ

৫.২.২.১৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Give a brief account of the Swadeshi Movement in Bengal.
2. Analyse the nature and programme of constructive Swadeshi as followed in the wake of the Swadeshi Movement.
3. How far was economic Swadeshi successful in Bengal in this period.
4. Discuss the various trends in the Swadeshi Movement in Bengal.
5. What were the limitations in the Swadeshi Movement in Bengal?

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

NATIONAL MOVEMENT

সশস্ত্র বিপ্লববাদ

গঠন (Structure) :

৭.৫.১০.৩.০ : উদ্দেশ্য

৭.৫.১০.৩.১ : পটভূমিকা

৭.৫.১০.৩.২ : বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

৭.৫.১০.৩.৩ : গদর আন্দোলন

৭.৫.১০.৩.৪ : সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা

৭.৫.১০.৩.৫ : সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতা

৭.৫.১০.৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৫.১০.৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৫.১০.৩.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ

(২) এই আন্দোলনে নারীজাতির ভূমিকা

(৩) এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

৭.৫.১০.৩.১ : পটভূমিকা

ঊনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আরও একটি নতুন রাজনৈতিক ধারার সংযোজন হয়েছিল। ভারতের যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির মধ্য দিয়ে সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

১৯০৭ সালের মধ্যে নরমপন্থীদের রাজনৈতিক ভূমিকা ক্রমশ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নরমপন্থীদের রাজনৈতিক কাজকর্ম নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে চরমপন্থীরা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত চরমপন্থী নেতৃত্বও সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে তারা আন্দোলনের অংশীদার করতে পারেনি। কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থী নেতাদের ব্যর্থতা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেছিল, যা সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল।

ভারতবর্ষে সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচেষ্টা ১৮৫৭র খ্রীষ্টাব্দ থেকে বহুবার হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে ১৮৭৬-৭৭ সালে বসুদেব বলবন্ত ফাড়কের নেতৃত্বে নিম্নবর্গীয়রা সংগঠিত হয়েছিল বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে। মহারাষ্ট্রে উনিশ শতক ধরেই ইয়ুথ ক্লাব এবং শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী রাজনৈতিক ধারা বেঁচেছিল। ভারতে কৃষক আন্দোলনের ধারা এই তরুণদের উৎসাহিত করেছিল। বাংলার নীল বিদ্রোহ যেমন এই তরুণদের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। সেইসময়ের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও সন্ত্রাসবাদ উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৮৯৪ সালে ইতালির পরাজয় এবং ১৯০৫ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ইউরোপীয় রাষ্ট্রের দুর্বলতা প্রকাশ করে দিয়েছিল। এবং এশিয়া বা আফ্রিকার দেশগুলির শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। সন্ত্রাসবাদীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনগুলির দ্বারা। মাৎসিনীর আন্দোলন, আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের কার্যকলাপ ভারতীয় যুবসমাজকে উৎসাহিত করেছিল এবং তারা গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের কাজের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস, হত্যা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির থেকে শুরু সন্ত্রাসবাদ উত্তীর্ণ হয়েছিল দলবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধের পর্যায়ে। ভারতের মধ্যে থেকে নিয়ে বিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাদের কার্যকলাপের জাল। সুমিত সরকারের মতে গঠনমূলক স্বদেশী এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ থেকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের দিকে মোড় নিয়েছিল এই পর্বের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা। দ্বিতীয়ত গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন উচ্চবর্গীয় নেতৃত্ব এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল মূলতঃ উচ্চবর্গীয়দের আন্দোলন।

সাধারণভাবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ বলেই বর্ণনা করেছেন এই বিপ্লবী রাজনৈতিক ধারাকে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী সন্ত্রাসবাদ অভিধার বদলে বৈপ্লবিক কর্মধারা কথাটি অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। সুমিত সরকারের মতে স্বদেশী আন্দোলনের থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির। এক প্রজন্মের তরুণদের উপর এই আদর্শ অদ্ভুত এক প্রভাব ফেলেছিল এবং অত্যাচারী বৃটিশ প্রশাসনিক অথবা বিশ্বাসঘাতক ভারতীয়দের হত্যা। স্বদেশী ডাকাতি এবং বৃটিশদের শত্রুদের সাহায্যে সামরিক সাহায্যে সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানা ছিল তাদের পরিকল্পনা। শহরে গণ অভ্যুত্থান এবং গ্রামাঞ্চলে গেরিলা আন্দোলনের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি সেহেতু এই বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ বলা বোধহয় অযৌক্তিক নয় বলে মনে করেন সুমিত সরকার।

সন্ত্রাসবাদীদের যে গোষ্ঠীগত সংগঠন ছিল তার কেন্দ্রে ছিল ''দল'' যার একজন নেতা থাকতেন। ঐতিহাসিকদের মতে দলের মধ্যে প্রধানের সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক ছিল প্রায় গুরু এবং শিষ্যের। ভাগবত গীতা এবং অরবিন্দের ''ভবানী মন্দির'' এই বিপ্লবীদের শক্তির আরাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিভিন্ন দলের মধ্যে বিপ্লবী কাজকর্ম এবং অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে সহযোগিতা থাকলেও দলগত দ্বন্দ্বও ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ব্যাপ্তি লাভ করলেও এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছিল বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবে।

৭.৫.১০.৩.২ : বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল আঠারোশ ষাট, সত্তরের দশকে। ব্যায়াম এবং শরীরচর্চার আখড়াগুলি বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য যুব সম্প্রদায়কে প্রস্তুত করত। এর প্রথম শুরু হয় নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলায়। শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে নবগোপাল মিত্র শঙ্কর ঘোষ লেনে একটি আখড়া খুলেছিলেন। বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দের আদর্শের উপর ভিত্তি করে, শরীর এবং মনকে বিপ্লবী কাজের জন্য তৈরি করাই ছিল বাঙালী যুবসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। বাংলায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের শুরু হয়েছিল ১৯০২ থেকে। মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুর সোসাইটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছরে সরলা ঘোষাল বালিগঞ্জে একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে লাঠি এবং তলোয়ার খেলা শেখানো হত। মধ্য কলকাতার যুবসম্প্রদায় আত্মোন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ১৯০২ সালে গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সতীশচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং অরবিন্দ ঘোষ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমদিকে কলকাতা অনুশীলন সমিতি বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ১৯০৫ অবধি গুপ্ত সমিতিগুলির কাজকর্মের মধ্যে প্রাধান্য পেত শরীরচর্চা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে সমিতিগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ১৯০৫ সালে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চল যেমন দর্জিপাড়া, পটলডাঙা, খিদিরপুর, হাওড়ার শিবপুর, বালি, উত্তরপাড়া, সালকিয়া, হুগলীর তারকেশ্বর, শ্রীরামপুরে, অনুশীলন সমিতির শাখা খোলা হয়। পূর্ব বাংলায় পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৬ সালে। ঢাকা সমিতির প্রায় ৫৪০টি শাখা ছিল। ১৯০৬ সালে নিখিলবঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সারা বাংলায় বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। একই বছরে যুগান্তর পত্রিকা বের করা হয় বিপ্লবী কাজকর্মের প্রচারের জন্যে। হেমচন্দ্র কানুনগো, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং প্রফুল্ল চাকীর নেতৃত্বে বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু হয়। ১৯০৬ সালে রংপুরে প্রথম স্বদেশী ডাকাতি হয় বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে।

বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। একটি গোষ্ঠী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীরা গোপন সমিতির মাধ্যমে, গুপ্ত হত্যার পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিল। গুপ্তহত্যার প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯০৭ সালে। পূর্ববঙ্গের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। বারীন ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখেরা মানিকতলার কাছে মুরারীপুকুর অঞ্চলে বোমা প্রস্তুত করার কারখানা শুরু করে। প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরামের উপর প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল এবং বিপ্লবীরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। আলিপুর বোমা মামলায় বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত ও অন্যান্য বিপ্লবীদের দ্বিপান্তর হয়। অরবিন্দ অধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী হন। আলিপুর বোমা মামলার পর সরকারের দমন নীতি শুরু হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শেষ না হলেও, এর পরে আন্দোলন গোপনে পরিচালিত হতে থাকে। মডারেটদের নরমপন্থার বিকল্প রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে সন্ত্রাসবাদ জনমানসে তার স্থান করে নিয়েছিল। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। এই পর্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ১৯১২ সালে সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র ঢাকা থেকে কলকাতায় সরে যায়।

৭.৫.১০.৩.৩ : গদর আন্দোলন

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে। এই সময় থেকে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসের থেকে সংগঠিত এবং সম্মিলিত প্রয়াসের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। সশস্ত্র আন্দোলনের দ্বারা বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয় এবং বাংলা ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যেও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিদেশী শক্তির সহায়তায় অস্ত্র সংগ্রহ, গেরিলাবাহিনী গঠন এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীর মধ্যে গুপ্ত প্রচার চালানো এই পর্বের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসবিহারী বসু এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে।

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যুগান্তর দলের। অন্যদিকে রাসবিহারী বোস এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যাল পাঞ্জাব, দিল্লী এবং উত্তরপ্রদেশে সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি সংগঠন করেছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা আক্রমণ করা হয় ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। কিন্তু ক্রমশ সন্ত্রাসবাদীরা বাধ্য হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের কার্যকলাপকে ছড়িয়ে দিতে, প্রধানতঃ অস্ত্র সংগ্রহের আশায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে সন্ত্রাসবাদীরা চার শর্তে তাদের আন্দোলনের প্রসার ঘটানোর সুযোগ পেয়েছিল (১) ভারত ও ব্রহ্ম সীমান্তে মোতায়েন সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভ (২) গদর দলভুক্ত সদস্যদের সাহায্য নেওয়া (৩) বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা (৪) বিভিন্ন দলের মধ্যে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা। এছাড়াও তুরস্কের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধের ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী এবং মুসলিম প্যান ইসলামিস্ট গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়। মুসলিম বিপ্লবীদের মধ্যে বরকতুল্লা এবং দেওবন্দ গোষ্ঠীর মহম্মদ হাসান, ওবেইদুল্লা সিন্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হয়।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পাঞ্জাবী অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিলেন লালা হরদয়াল, সোহন সিং ভাখনা। এদের প্রচেষ্টায় সানফ্রান্সিসকোতে ১৯১৩ সালে যুগান্তর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা "দ্য গদ্দর" প্রকাশ করা হয় উর্দু এবং গুরুমুখীতে। গদর আন্দোলন উত্তর আমেরিকার পাঞ্জাবী অভিবাসীদের সংগঠিত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১৫ সালে রডা কোম্পানির থেকে প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করা হয় কোম্পানির একজন কর্মচারীর সহায়তায়। রাজনৈতিক ডাকাতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ, রেল সংযোগ উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায় এবং বাঘা যতীন ও সহযোগীরা উড়িষ্যার বালেশ্বরে পালিয়ে যান। সেখানে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে বাঘা যতীন বীরের মৃত্যু বরণ করে নেন।

গদর আন্দোলনের নেতাদের সহযোগিতায় বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা তাদের আন্দোলন চালানোর পরিকল্পনা করে। উত্তর আমেরিকা থেকে বহু সংখ্যক পাঞ্জাবী (গদর পার্টির সদস্য) ভারতে ফিরে আসে। ১৯১৪তে কোমাগাতা মারু নামক জাহাজের যাত্রী শিখ এবং পাঞ্জাবী মুসলিম অভিবাসীদের সঙ্গে কলকাতার কাছে বজবজে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে লাহোর, ফিরোজপুর এবং রাওয়ালপিন্ডিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। রাসবিহারী বসু জাপানে পালিয়ে যান। শচীন সান্যাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১৫ থেকে সরকারী দমননীতির ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। যদিও সর্বভারতীয় স্তরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সংগঠন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু এই আন্দোলনের নেতারা বিশেষ করে গদর পার্টি সেনাবাহিনী এবং কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯১৫ সালে বার্লিন থেকে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টা করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি। ১৯১৫ সালে ইন্দো ইরান সীমান্তের উপজাতিদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী প্রচার চালানো হয় এবং ১৯১৫ ডিসেম্বরে মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লা এবং ওবেইদুল্লা সিন্ধি কাবুলে Provisional Government of Free India প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

১৯২২ সালের পর উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পুনরায় সূত্রপাত হয়। আত্মশক্তি, বিজলী, সারথি ইত্যাদি পত্রিকাগুলির মাধ্যমে নতুন করে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করা হয়। ১৯২৬ সালে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনকে গৌরবান্বিত করা হয়েছিল। ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহার টেগার্ট হত্যার প্রচেষ্টা, ১৯২৫ সালে কাকোরী ট্রেন ডাকাতি ছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রচেষ্টা। ১৯২৮ সালে ভগৎ সিং এবং পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুস্তান সোশালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। বাংলাতেও বেশ কয়েকটি নতুন দলের উদ্ভব ঘটে যার মধ্যে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম গোষ্ঠী ছিল অন্যতম। ব্যাপক এবং সশস্ত্র আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি এরা গ্রহণ করেছিলেন এবং অনেকেই সমাজ তান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। ১৯৩০ সালে একদিকে চলছিল গান্ধীজির মত ও পথে পরিচালিত অহিংস পদ্ধতিতে আইন অমান্য আন্দোলন। অন্যদিকে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিতে বৃটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। এই ঘটনা বাংলার তরুণদের এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে এক বছরের মধ্যে প্রায় ৫৬টি বৈপ্লবিক কাজকর্মের ঘটনা ঘটেছিল।

বিপ্লবীদের মধ্যে মানবেন্দ্র রায়ের প্রভাবে অনুশীলন এবং যুগান্তর গোষ্ঠীর কিছু বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন বাঘা যতীনের অন্যতম সহকারী। পরবর্তী জীবনে তিনি

মানবেন্দ্র নাথ রায় নাম গ্রহণ করেন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। তিরিশের দশক থেকে সাম্যবাদী আদর্শ বিপ্লবীদের মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট সংহতি নামে একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭.৫.১০.৩.৪ : সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ১৯২০-৩০ এর দশক থেকে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতেও তাদের দেখা যায়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যে মহিলারা যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ছাত্রী। বিপ্লবী ভাবধারায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এরা অনেকেই প্রথমে কংগ্রেস অথবা বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরে সন্ত্রাসবাদী আদর্শে দীক্ষিত হন। কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, সুরমা মিত্র এবং কল্যাণী দাস প্রতিষ্ঠা করেন ছাত্রী সংঘ। প্রধান উদ্দেশ্য শরীর চর্চা এবং শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের সংগঠিত করা। ছাত্রী সংঘের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগ ছিল প্রথম থেকেই। কল্যানী দাস এই সময়ে মেয়েদের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী দলগুলির নতুন নেতৃত্ব এই মেয়েদের তাদের সংগঠনে নিয়ে আসে। আগেও মেয়েরা সন্ত্রাসবাদী দলগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু তাদের কাজ ছিল গৃহের অভ্যন্তরে পুরুষদের সাহায্য করা। প্রধানতঃ বিপ্লবী রাজনীতি প্রচার, অস্ত্র সংগ্রহ এবং পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকতেন। কিন্তু তিরিশের দশক থেকে মহিলা সন্ত্রাসবাদীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেয়। ১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার দুজন স্কুলছাত্রী শান্তি এবং সুনীতি ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্‌সকে হত্যা করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বীণা দাস গভর্নরকে হত্যার চেষ্টা করেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে বীণা দাস প্রথমে লতিকা ঘোষের সঙ্গে যোগ দেন, পরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হন। সূর্য সেনের দলে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদেদার, কল্পনা দত্ত এবং সুহাসিনী গাঙ্গুলী। প্রীতিলতা ওয়াদেদারের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করা হয়। কিন্তু প্রীতিলতা মৃত্যু বরণ করেন। প্রীতিলতা তার মৃত্যুকালীন সাক্ষ্যবিবৃতিতে লিখে যান যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যদি মেয়েরা অংশ নিতে পারে, তবে বৈপ্লবিক আন্দোলনেও তারা ছেলেদের সঙ্গে সমান ভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ১৯৩৩ সালের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় চল্লিশজন মহিলাকে কারাবন্দী করা হয়।

৭.৫.১০.৩.৫ : সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতা

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল সরকারী দমননীতি। ভারত রক্ষা আইন এবং রাওলাট আইনের দ্বারা বিপ্লবী কার্যকলাপ দমনের জন্য বৃটিশ সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু তাছাড়াও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। স্বদেশপ্রেমের আদর্শ এবং আত্মত্যাগের মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও সন্ত্রাসবাদীদের বাস্তববোধের অভাব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা তাদের আন্দোলনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেনি। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব ছিল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সীমিত ছিল শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। শ্রমিক এবং কৃষকদের সংগঠিত করার কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক এবং কর্মপন্থা মুসলমানদের এই আন্দোলনের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সর্বোপরি গান্ধীজির অহিংস সত্যাগ্রহের কর্মপন্থা সন্ত্রাসবাদীদের সহিংস আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। কর্মী সংঘের মাধ্যমে বিপ্লবীদের কয়েকজন কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্ব মেনে

নিয়েছেন। ফলে ১৯২০র পর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান ধারা প্রবাহিত হয় অহিংসা এবং সত্যের পথ ধরে।

৭.৫.১০.৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

Uma Mukherji	–	Two Great Indian Revolutionaries
হেমচন্দ্র কানুনগো	–	বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা অপ্রকাশিত রাজনৈতিক
David M. Laushey	–	Bengal Terrorism and the Marxist Left.
কমলা দাশগুপ্ত	–	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী
Manmatha Nath Guha	–	Bhagat Singh and His Times.
যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়	–	বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি
অনন্ত সিংহ	–	অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম
P. Heehs	–	The Bomb in Bengal : The Rise of Revolutionary Terrorism in India 1900-1910
Bipan Chandra et al,	–	India's Struggle for Independence.

৭.৫.১০.৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Write a short essay on revolutionary movement in the period before the First World War.
2. How far were the Revolutionaries successful in building up a worldwide network of conspiracy to free India during and after the First World War.
3. Why did the Revolutionary Movement fail to achive its goal.
4. Briefly discuss the role of women in the Revolutionary Terrorist Movement.

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

GANDHIAN MOVEMENT AND LEFT MOVEMENT

একক - ১১

গান্ধীবাদী আন্দোলন
Gandhian Movements

গঠন (Structure) ঃ

৭.৬.১১.০ : উদ্দেশ্য

৭.৬.১১.১ : সূচনা

৭.৬.১১.২ : গান্ধীজির উত্থান

৭.৬.১১.৩ : আঞ্চলিক বা স্থানীয় আন্দোলন

৭.৬.১১.৪ : রাওলাট সত্যাগ্রহ

৭.৬.১১.৫ : অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলন

৭.৬.১১.৬ : সরকারী দমননীতি

৭.৬.১১.৭ : আন্দোলন প্রত্যাহার

৭.৬.১১.৮ : স্বরাজ্য দল (১৯২৩-২৭)

৭.৬.১১.৯ : স্বরাজ্য দলের নীতি ও কর্মসূচী

৭.৬.১১.১০ : কার্যাবলী

৭.৬.১১.১১ : অবদান

৭.৬.১১.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৬.১১.১৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৬.১১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে উত্থান

(২) গান্ধীর আঞ্চলিক আন্দোলনে অবদান

(৩) অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলন

(৪) আন্দোলনের ফলাফল

(৫) স্বরাজ্য দলের আবির্ভাব এবং কার্যাবলী

(৬) কার্যাবলীর মূল্যায়ন

৭.৬.১১.১ : সূচনা

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির অবদান নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয়। তাঁর আগমনের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন দিকে মোড় নেয়। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে গণআন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনিই ছিলেন এক নতুন মতাদর্শ ও পথের দিশারী। তাঁর মত ও পথ অনুসরণ করেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক সর্বভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং ইংরেজ সরকার আন্দোলনের ভয়াবহতায় শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

৭.৬.১১.২ : গান্ধীজির উত্থান

১৮৬৯ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত পোরবন্দর নামক স্থানে এক বনেদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কাবা গান্ধী ও মা পুতলিবাঈ। গান্ধীজির মন ও চরিত্র গঠনে তার মায়ের অপরিসীম প্রভাব ছিল। 'The Story of My experiments with Truth' নামক আত্মচরিতে গান্ধীজি একথা লিখেছেন। পোরবন্দরে গান্ধীজির শৈশব ও কিশোরকাল কাটে। ১৮৭৮ খ্রীঃ তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ তিনি লন্ডন যান এবং ১৮৯১ খ্রীঃ ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু বোম্বাই-হাইকোর্ট ও রাজকোটে তিনি বিশেষ পশার জমাতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতে দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানী নামক এক মুসলিম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তাদের মামলা করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার আমন্ত্রণ পেলে তখন তিনি তা গ্রহণ করেন।

১৮৯৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত তা প্রত্যক্ষ করে গান্ধীজি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। আইন প্রশাসনের মাধ্যমে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে ভারতীয়দের ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ইউরোপীয়রা কুলি বলে সম্বোধন করতেন। গান্ধীজি ভারতীয় বলে তাকে কুলি ব্যারিস্টার বলে সম্বোধন করা হ'ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালে বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধে গান্ধীজির তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা ব্যবসা ছাড়াও অন্যান্য কাজেও ব্যাপৃত ছিলেন। গান্ধীজি প্রত্যেকের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হন। এবং বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকেও কিভাবে

ভারতীয়দের জন্য ন্যূনতম মানবিক অধিকার অর্জন করা যায় সেজন্য তিনি প্রয়াসী হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী সকল স্তরের ভারতীয়রা তাকে সাহায্য করতে উদ্যোগী হন। ভারতীয়দের অধিকার অর্জনের জন্য ১৮৯৪ খ্রীঃ ২২ শে মে গান্ধীজি নাটালে ইন্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োর (Boer) এবং বৃটিশদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে এবং ১৯০৬ খ্রীঃ জুলু বিদ্রোহের সময় গান্ধীজি বৃটিশদের সাহায্য করেন। তিনি ঘোষণা করেন 'The British Empire existed for the welfare of the world'— বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পৃথিবীর কল্যাণের জন্যই রয়েছে।

১৯০৬ খ্রীঃ ট্রান্সভ্যাল (Transval) শহরে একটি আইন পাশ করে তার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয় এবং প্রত্যেক ভারতীয়কে এই সরকারী অনুমোদনপত্র সঙ্গে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। গান্ধীজি এই ধরনের অপমানজনক আইনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ সংগঠিত করেন। পরবর্তীকালে এই অহিংস প্রতিরোধই সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত হয়। গান্ধীজি পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গী করে সত্যাগ্রহ শুরু করলে শেতাঙ্গ সরকার ১৮৯৪ খ্রীঃ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট পাশ করে ভারতীয়দের দুর্দশা কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করেন।

১৮৯৩-১৯১৪ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার অর্জনের দাবীতে গান্ধীজির কার্যাবলী তাকে একজন আদর্শবাদী—জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময় তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে হিন্দুধর্ম ছাড়াও প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। টলস্টয়ের লেখা 'The Kingdom of God is Within you' গ্রন্থটি গান্ধীজিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। টলস্টয় ফার্ম নামে একটি আশ্রমিক আবাস তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১০ খ্রীঃ টলস্টয়ের মৃত্যু পর্যন্ত গান্ধীজির তার সঙ্গে পত্রালাপ ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কারাগারে কাটানোর সময়ে মার্কিন চিন্তাবিদ হেনরি ডেভিড থোরা (Henry David Thoreau (1817-1862) রচিত আইন অমান্য আন্দোলন বিষয়ক (Civil Disobedience,1849) প্রবন্ধ পাঠ করেন। গুজরাটে থাকাকালীনই তিনি প্রচলিত বৈষ্ণব ও জৈনধর্মের মাধ্যমে অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করেন। আফ্রিকাতেই গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। সেখানকার হিন্দুদের বিশেষত নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে তিনি প্রথম অস্পৃশ্যতাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেন। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শেতাঙ্গদের অসম আচরণ দেখে পশ্চিমী ভাবধারা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে তার মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। তবে তখনও তিনি বৃটিশরাজের প্রতি সরাসরি যুদ্ধে যাননি। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পরও তিনি বিনাশর্তে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন। এমনকি আনুগত্যও প্রকাশ করেন। কুড়ি বছর ধরে একটানা সংগ্রামের ফলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গীকে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপদান করতে সক্ষম হন।

১৯১৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এলেও তখনই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু গোপালকৃষ্ণ গোখলের নির্দেশে ১৯১৩-১৪ গান্ধীজি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করে নিজের দেশবাসীর সঙ্গে পরিচিত হন ও ভারতের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ মে মাসে আমেদাবাদে সবরমতি আশ্রম গঠন করে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৭ খ্রীঃ প্রথম পর্যন্ত গান্ধীজি একজন সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু চম্পারণ ও খেদার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

৭.৬.১১.৩ : আঞ্চলিক বা স্থানীয় আন্দোলন

চম্পারণ—উত্তর বিহারের তিরহুত ডিভিশনের অন্তর্গত চম্পারণ জেলা। জেলার জনসংখ্যা কম এবং উর্বর কৃষিজমি হওয়ায় গ্রামগুলি ছিল সমৃদ্ধ। চম্পারণে প্রধানত হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই বাস করত। ১৭৯৩ খ্রীঃ চম্পারণ জেলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। তখন এইসব ছোট রাজারা যাদের পূর্বপুরুষরা অতীতে বংশপরম্পরায় প্রায় স্বাধীন শাসকের মত নিজ নিজ অঞ্চলে ক্ষমতা ভোগ করতেন তারা বড় জমিদারীর মালিক হয়ে গেলেন। ১৯১৬—১৯১৭ খ্রীঃ বেত্তিয়া, রামনগর ও মধুবন ছিল বড় জমিদারী। তাদের মধ্যে বেত্তিয়ার জমিদারী ছিল সবচেয়ে বড়। দেড় হাজারের বেশী গ্রাম নিয়ে বেতিয়া জমিদারী গঠিত ছিল। বেশিরভাগ গ্রামই ইজারাদাররা ঠিকা নিয়ে পরিচালনা করত। এই ইজারাদারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিলেন ইউরোপীয় নীলকররা। ১৮১৩ খ্রীঃ চম্পারণ জেলায় প্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ পর থেকেই নীলশিল্পের ক্রমশ উন্নতি ঘটে। ১৯১৭ খ্রীঃ গান্ধীজি যখন চম্পারণ জেলায় পৌঁছান তখন চম্পারণ জেলার অর্ধেক ইউরোপীয় নীলকরদের কাছে ইজারা দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় ঠিকাদাররা জোর করে নীলচাষে বাধ্য করত। কিন্তু তারা খাটনির উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেত না। ফলে কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ গান্ধীজি যখন চম্পারণে যান তিনি বিভিন্ন স্থান ঘুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। গান্ধীজিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন। তাদের দুঃখ দুর্দশা রোধ করতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় কৃষকদের সংগঠিত করে গান্ধীজি নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি এখানেই সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। গান্ধীজির আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল তিনকাটিয়া ও অন্যান্য অবৈধ কর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা বন্ধ করতে হবে। একটি অনুসন্ধান কমিশন গঠন করে কৃষকদের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য জেনে তাদের ক্ষোভ দূর করার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তার কারণে তিরহুত ডিভিশন থেকে গান্ধীজিকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিহার সরকার তা অনুমোদন না করায় এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হয়নি। গান্ধীজিকে বহিষ্কারের খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও বাংলার সমস্ত কাগজে সরকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এই সময়েই সাধারণ মানুষ তাকে বাপু ও মহাত্মা নামে অভিহিত করেন।

চম্পারণে গান্ধীজি পরিচালিত সত্যাগ্রহ ব্যাপকতর হতে পারে এই আশঙ্কায় গান্ধীজির দাবি মেনে নিয়ে ভারত সরকারের নির্দেশে বিহার সরকার ১৯১৭ খ্রীঃ ১০ই জুন একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। ৩ রা অক্টোবর অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট তৈরী হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ চম্পারণ কৃষি আইনে অনুসন্ধান কমিটির প্রধান মুশকিলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গান্ধীজির জন্যই নিপীড়নমূলক তিনকাঠিয়া প্রথার অবসান ঘটে। উচ্চহারে খাজনা আদায় রদ করা হয়। কৃষকদের আরও কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে কৃষকদের সঙ্গে নীলকরদের আপস রক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু নীলকরদের সঙ্গে কৃষকদের ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। গান্ধীজির বক্তব্য ছিল চম্পারণের সমস্যাসমূহের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করতে হলে কৃষকদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন এবং উভয়ের বিরোধ মেটাতে নিরন্তর প্রয়াস দরকার। চম্পারণ সত্যাগ্রহের ফলে কৃষকরাও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়। জুডিথ ব্রাউন (Judith Brown) তার ''Gandhi's Rise to Power'' নামক গ্রন্থে লেখেন-১৯১৭ আগে ভারতবর্ষের সমস্যা গান্ধীজির কাছে ছিল ভাসাভাসা বা তত্ত্বগত। বিহারের কৃষকরাই তাকে ভাবতে শেখায়, সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে। তাই গান্ধীজির জীবনে চম্পারণের গুরুত্ব সর্বাধিক।

গান্ধীজি এরপর আমেদাবাদের সূতাকল শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। জুডিথ ব্রাউন বলেছেন এ পর্যন্ত গুজরাটের রাজনীতিতে তিনি পরিচিত ছিলেন মূলত একজন সমাজসেবী এবং প্রচারক হিসেবে। আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘটে গান্ধীজি নিজস্ব আন্দোলন পদ্ধতির মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেন। শ্রমিকরা তার নির্দেশে অহিংস ধর্মঘট করে (মার্চ ১৯৩৮)। গান্ধীজি অনশন শুরু করেন। এই ঘটনায় আমেদাবাদ শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ছিলেন গুজরাটের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনায় মিল মালিকরা বিচলিত হন। শেষপর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরী ৩৫% বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি মিল মালিকরা দেবার পর গান্ধীজি অনশন প্রত্যাহার করনে।

চম্পারণ এবং খেদা আন্দোলন ছিল কৃষিজীবি মানুষের সমস্যা নিয়ে। আমেদাবাদে শিল্পবিরোধের ক্ষেত্রে গান্ধীজি প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। আমেদাবাদের আন্দোলনের অপর এক গুরুত্ব হল এখানেই গান্ধীজি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনশন ধর্মঘটকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। পরে তিনি এই অস্ত্র বহুবার প্রয়োগ করেছেন এবং সফল হয়েছেন। কেবল শ্রমিক শ্রেণী নয়, এ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজি দেশের শিল্পমালিকদেরও আস্থা অর্জন করেন।

৭.৬.১১.৪ : রাওলাট সত্যাগ্রহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার একদিকে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইনের দ্বারা ভারতীয় জনগণকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট হয়, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও গণ-অসন্তোষ দমনের জন্য প্রবর্তন করে রাওলাট আইন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বড়লাটের আইন সচিব সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি কতগুলি সুপারিশ করে—

(১) সন্দেহভাজন যে কোন ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার, (২) আটক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বন্দী রাখা, (৩) বিশেষ আদালতে তার বিচার, (৪) ঐ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে না, (৫) সরকার বিরোধী যে কোন প্রচার দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা।

এই প্রস্তাবগুলি দুটি বিল আকারে সরকার কেন্দ্রীয় আইনসভায় উপস্থিত করে। 'রাওলাট বিল' নামে পরিচিত এই বিলের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সমস্ত বেসরকারী সদস্য তীব্র প্রতিবাদ জানান। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার এবং বোম্বাই-এর বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলি বিশেষত, দি ইন্ডিয়ান সোসাল রিফর্মার (The Indian Social Reformer), পাঞ্জাবের দি ট্রিবিউন (The Tribune), বাংলার অমৃতবাজার পত্রিকা (Amrita Bazar Patrika) এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে। কেন্দ্রীয় আইনসভা থেকে মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না, মাজাহার উল হক এবং মধ্যপ্রদেশের আইনসভা থেকে বি.ডি. মুকুল পদত্যাগ করেন। তেজবাহাদুর সাপ্রু সরকারের এহেন পদক্ষেপকে নীতিহীনভাবে ভ্রান্ত, অপ্রযোজ্য এবং সামান্যীকরণের দোষে দুষ্ট (''Wrong in Principle, unsound in operation and too sweeping'') বলে অভিহিত করেন। এমনকি, ভারতসচিব মন্টেগু তার আপত্তি জানিয়ে ভাইসরয়কে লিখেছিলেন "পৃথিবীর পেন্টল্যান্ডদের (মাদ্রাজের ছোটলাট পেন্টল্যান্ড অ্যানি বেশান্তকে আটক করার নির্দেশ দেন) বা ও'ডায়ারদের কোন লোককে বিনাবিচারে বন্দীকরার সুবিধা করে দিতে আমি ঘৃণা করি"।

'জাতিরজনক' গান্ধী ব্রিটিশ শাসনকে শয়তানের রাজ্য (Satanic) বলে চিহ্নিত করে রাওলাট বিলকে নির্যাতনের প্রমাণ (evidence of a determined policy of repression) রূপে সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি 'বিল' সম্পর্কিত বিতর্ক প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করেন। আইনসভায় এ সময়ে ভারতীয় সদস্যদের, বিশেষত

শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় সরকার কর্ণপাত করেনি। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন—"নিদ্রিত মানুষকে জাগানো যায় কিন্তু যে ঘুমেরভাব করছে, কোন কিছুতেই তার ওপর প্রভাব পড়ে না (You can wake a man only he is really asleep; if he is merely pritending effort will produce no effect upon him")। ১৯১৯ সালের ৯ই-ফেব্রুয়ারী লেখা এক চিঠিতে গান্ধী শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে বলেন, "When petitions.....resolution of gigantic mass meeting fail, there are but two courses open.....armed rebellion....(or) civil disobedience". এর দিন পনেরো পর, গান্ধী যখন আমেদাবাদে, তার সঙ্গে দেখা করে বি.জি. হোরনিম্যান, শঙ্করলাল বাঙ্কার, উমর শোভানি, সরোজিনী নাইডু, যমুনাদাস দ্বারকাদাস, বল্লভভাই প্যাটেল এবং ইন্দুলাল ইয়াগনিক প্রমুখ রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে তাকে অনুরোধ করেন। ২৩'শে ফেব্রুয়ারী সবরমতি আশ্রমে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপস্থিত ২০ জন নেতা ও নেতৃবর্গের সঙ্গে গান্ধীজি আলোচনায় বসেন এবং তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনায় রাজি হন। অহিংস পথে অবিচল থাকার জন্য "সত্যাগ্রহ শপথ" নামে এক অঙ্গীকার পত্রে সকলের প্রথমে সই করেন। আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গান্ধীজির নেতৃত্বে একটি সত্যাগ্রহ সভা গঠন করা হয়। বোম্বাই-এ এর সদর কার্যালয় ছিল। প্রচার পত্রিকা প্রকাশ, জনসভা সংগঠন এবং সত্যাগ্রহ শপথনামায় স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। গান্ধী ভাইসরয়কে পত্র দ্বারা সতর্কবাণী পর্যন্ত দেন। কিন্তু কিভাবে আন্দোলন সূচনা করবেন সে সম্পর্কে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। এই সময়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজে গোপালাচারি-র গৃহে অবস্থানকালে এক রাতে অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় ("The twilight condition between sleep and consciousness----Gandhi") হরতাল পালনের মাধ্যমে আন্দোলন শুরুর কথা তার মানসলোকে উদয় হয়। ইতিমধ্যে ২১শে মার্চ, ১৯১৯ সালে 'ক্রিমিনাল ল এমারজেন্সি পাওয়ারস বিল' পাশ হয়ে যায়। শঙ্কর নায়ার ছাড়া কোন ভারতীয় প্রতিনিধি এতে সম্মতি দেয়নি। এমতাবস্থায় ৩০শে মার্চ শান্তিপূর্ণ হরতাল ও অনশনের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ পালনের ডাক দেওয়া হয়। পরে তা পরিবর্তিত করে ৬ই এপ্রিল করা হয়। গান্ধী বলেন "Let the people of India suspend their business on that day (30th April) and observe the day as one of fasting and prayer".

এটি-ই ছিল সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট। স্বদেশী আন্দোলনের তুলনায় এর ব্যাপকতা ছিল অনেক বেশি। ধর্মঘটের উল্লেখযোগ্য সাড়া মেলে অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা, কসুর, আমেদাবাদ, বিরমগাঁও এবং বোম্বাই শহরে। দিল্লী, মুলতান, অমৃতসর এবং লাহোরে পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে মার্চ হরতাল হয়েছিল। দিল্লীতে জনগণের ওপর পুলিশের গুলিতে বহু লোক হতাহত হয়। পাঞ্জাবে যুদ্ধের সময় দমনপীড়ন, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান এবং রোগ-ব্যাধি কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিল। সেখানে পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। অমৃতসর, লাহোর, দিল্লীর পরিস্থিতি বিস্ফোরক আকার ধারণ করায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গান্ধীজিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আহ্বান জানান। তাদের আশা ছিল যে গান্ধীজি জনরোষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। গান্ধীজি সেই মতো ৯ই এপ্রিল রাতে দিল্লী ও অমৃতসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু সরকারের আশঙ্কা ছিল যে তার উপস্থিতি অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করবে। তাই দিল্লী থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে সরকার গান্ধীকে পাঞ্জাবে প্রবেশ না করার নির্দেশ দেয়। তিনি তা অগ্রাহ্য করলে তাকে পালওয়াল স্টেশনে গ্রেপ্তার (১০-ই এপ্রিল) এবং বোম্বাইতে এনে মুক্তি দেওয়া হয়। তার গ্রেপ্তারের সংবাদে বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং গুজরাটের অন্যান্য স্থানে আগুন জ্বলে ওঠে। গান্ধী সেখানে জনগণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও পাঞ্জাবের পরিস্থিতি মর্মান্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। হিংসায় মদত দেওয়ার অপরাধে পাঞ্জাবের জননেতা ডঃ সত্যপাল ও সৈফুদ্দিন কিচলুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১০-ই এপ্রিল। প্রতিবাদে জনগণ মিছিল করলে পুলিশ শোভাযাত্রার

ওপর গুলি চালায় ও কিছু ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। অমৃতসরে ক্ষিপ্ত জনতা টাউনহল, পোস্ট অফিসের ওপর আক্রমণ চালায়। টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়। আক্রমণ চালানো হয় ইউরোপীয়দের ওপরও।

এহেন অবস্থায় শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল ডায়ার (১২ই এপ্রিল)। তিনি জনসভা, সমাবেশ, নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, যদিও তা প্রচারিত হয়নি। ১৯১৯ সালের ১৩-ই এপ্রিল বৈশাখীর দিনে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে প্রায় দশ হাজার মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় যোগ দিতে আসে। এদের অনেকেই পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল বৈশাখী উৎসবে যোগ দিতে। নিরস্ত্র জনতাকে কোন রকম সতর্ক না করেই ব্রিগেডিয়ার ডায়ার তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। শিশু ও নারী সহ অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়। সরকারীভাবে নিহতের সংখ্যা ৩৭৯ এবং আহতের সংখ্যা ১২০০ জন হলেও প্রকৃতপক্ষে সহস্রাধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। সান্ধ্য কারফিউ জারি করার ফলে স্থানীয় জনগণ আহত ও নিহতদের কাছে পৌঁছতে পারেনি।

সমগ্র দেশ এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। গান্ধীজি সরকারকে কাইজার-ই-হিন্দ খেতাব, বুত্তর যুদ্ধ মেডেল ফিরিয়ে দেন। সরকারের নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। অমৃতসর ও পাঞ্জাবের অন্যত্র সামারিক আইন বলবৎ হয়। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত, পায়ে শেকল বেঁধে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার মতো শাস্তি ছাড়াও ইউরোপীয়দের সামনে হামাগুড়ি দেবার মতো মর্যাদা হানিকর কাজ করতে বাধ্য করা হয়। মার্শাল ল কমিশন গঠন করে ৫১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, ৪৬ জনকে দ্বিপান্তরিত করা হয়, ২'জনকে ১০ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়, ৮৯ জনকে সাত বছরের জন্য, ১০ জনকে পাঁচ বছরের জন্য ও ১৩ জনকে তিন বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এইরূপ অবস্থায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে গান্ধী ১৮ই এপ্রিল, ১৯১৯ সালে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

জুডিথ ব্রাউনের মতে রাওলাট সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছিল। (''The Rowlatt Satyagraha .....was a manifest failure''.) আন্দোলন তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। রাওলাট আইন প্রত্যাহৃত হয়নি। গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীজির আদর্শ অনুযায়ী আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অহিংস পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়নি। পরে গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছিলেন তার ভুল হয়েছিল (''Himalayan miscalculation'')। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের চাপে সরকার রাওলাট আইন প্রত্যাহার করেনি। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্দোলনের পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ও স্থানীয় সমস্যা কাজ করেছিল, রাজনৈতিক চেতনা বা গান্ধীর আদর্শ নয়। তৎসত্বেও এই আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। রাওলাট সত্যাগ্রহ গান্ধীকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটেছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে। তৃতীয়ত, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশের নৃশংস মানসিকতাকে প্রমাণ করলো। ফলত নরমপন্থীদের বহু ঘোষিত ব্রিটিশের উদারতা, মহানুভবতা ও ন্যায়পরায়ণতাঃ স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষকে গান্ধীজি যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আকর্ষণ করতে পারে, রবীন্দ্র কুমারের মতে, তা প্রমাণ হল — (''The Rowlatt Satyagraha vividly illustrates Gandhiji's ability to drag individuals belonging to different castes, communities and religions into a movement to protest against the British Government''— Ravinder Kumar).

৭.৬.১১.৫ : অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত এদেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ না করেই বৃটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল। তৎসত্ত্বেও ভারতীয়রা সরকারকে সমর্থন করে এই আশায় যে যুদ্ধের পর তারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রায় ১২$^{১}/_{২}$ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে দশ হাজার যুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছিল। ভারতীয়রা ৬ কোটি ২১ লক্ষ পাউন্ড সরকারের তহবিলে দান করে। যুদ্ধের পরিণামে ভারতে ঋণের বোঝা ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধের পর মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার ঘোষণা দেশবাসীর আশা পূরণ করেনি। ১৯২০ সালের অমৃতসর কংগ্রেস এই সংস্কারকে প্রয়োজনের তুলনায় কম, অসন্তোষজনক এবং হতাশাজনক (“Unadequate, insatisfactory and disappointing”) বলে মন্তব্য করে।

যুদ্ধের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মূল্যসূচককে ১০০ ধরলে ১৯১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫২। যুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পের প্রসার ঘটলেও যুদ্ধের পর মন্দার প্রাদুর্ভাব হয়। ১৯১৪ সালে ভারতে ৫১০২ মিলিয়ন গজ সূতো বিক্রি হত। ১৯২০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৮৯৯ মিলিয়ন গজ। যুদ্ধের বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশি ব্রিটিশপণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশ করে। জাপানী পণ্য সুলভে বিক্রি হতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় শিল্পপতিরা সরকারের কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছিল যুদ্ধের পর তা আর দেখা যায়নি। মহীশূরের দেওয়ান বিশ্বেশ্বরাইয়া ভদ্রাবতী লৌহ প্রকল্প ও কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সরকারের চাপে তাকে পদচ্যুত করা হয়। ভারত-সচিব মর্লির হস্তক্ষেপে এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ হয়। পাউন্ডের তুলনায় টাকার দাম যুদ্ধের বছরগুলি থেকেই হ্রাস পাচ্ছিল। বৃটেন থেকে বিলিতি পণ্য আমদানি তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। গান্ধীজির আন্দোলনে ভারতীয় শিল্পপতিদের একাংশ তাই সাহায্য করে।

শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা ছিল আরও সঙ্গীন। শিল্পে মন্দার ফলে বহু শ্রমিক ছাঁটাই হয়। তাছাড়া যুদ্ধের সময় শিল্পপতিরা লাভবান হলেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তারা আরও বিপাকে পড়ে। ১৯১১ সালে এক জোড়া ধুতির দাম ছিল ১ টাকা ৭৫ পয়সা। ১৯১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ টাকা। আমেদাবাদে ১৯১৪ সালে গমের মূল্যসূচক ছিল ১৬৬। ১৯১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৯। শিল্পপণ্যের দাম যে হারে বেড়েছিল কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সে হারে ঘটেনি। ফলে কৃষকদের অবস্থা ছিল আরও দুর্বিষহ। খাদ্যসংকটের কারণে গ্রামাঞ্চলে দিনমজুররা খাদ্য ও হাটের গোলা লুঠ করে। ১৯১৮-১৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকার ধারণ করে। সাধারণের মধ্যে এই অসন্তোষ গান্ধী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর অধ্যায়ে ভারতীয় রাজনীতি রাওলাট আইনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের জন্য প্রবর্তিত হয় ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (Defence of India Act)। যুদ্ধোত্তরকালে এই ব্যবস্থা রাখার জন্য রাওলাট আইন পাশ হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যপী প্রতিবাদের যে ঝড় ওঠে তা অসহযোগ আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রাউলাট আইনকে অসহযোগ আন্দোলনের জনক রূপে চিহ্নিত করেছেন। রাওলাট সত্যাগ্রহ চলাকালে অমৃতসরে ‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’ হত্যাকান্ডে (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯) সমস্ত দেশ স্তম্ভিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। গান্ধীজিও ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সমস্ত পদক ফিরিয়ে দেন। পাঞ্জাবে সরকারের দমনপীড়নের তীব্রতায় দেশবাসী অস্থির হয়ে ওঠে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তুরস্কের প্রতি বৃটেনের বিরোধিতা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বৃটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়াকে নিয়ে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে শক্তিজোট গড়ে উঠেছিল, জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সঙ্গে তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল তার বিরোধী। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব পড়ে। বল্কান যুদ্ধের সময় (১৯১২-১৩) ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করেন। জাফর আলি খাঁ সম্পাদিত 'জমিদার' পত্রিকায় মুসলমানদের মনোভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। মুসলমান সমাজে এই পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। লাহোর থেকে তা প্রকাশ পেত। শিবলী, ইকবাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব উচ্চারিত হয়। মহম্মদ আলি সম্পাদিত ইংরাজী ভাষায় কমরেড এবং উর্দু ভাষায় 'হামদর্দ' পত্রিকা মুসলমানদের এই পরিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় বহন করে। কলকাতা থেকে আবুল কালাম আজাদ সম্পাদিত 'আল হিলাল' পত্রিকার নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মুসলিম লীগের রাজভক্ত প্রবীণ নেতৃত্বকে সরিয়ে নতুন এক প্রজন্ম সামনে আসছিল। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তারা মিলিতভাবে আন্দোলনের কথা চিন্তা করে। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মহম্মদ আলি, সৌকত আলি এবং আবুল কালাম আজাদকে সরকার নজরবন্দী করে রাখে। ১৯১৮ সালে সেভরের চুক্তি দ্বারা অটোমান সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ মুসলমানদের মর্মবেদনার কারণ হয়। খলিফার সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি ঘটনাও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উদ্বুদ্ধ করে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, আয়ারল্যান্ডের সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলন, মিশরের জগলুল পাশা এবং তুরস্কে কামাল পাশার আন্দোলন ভারতীয়দের নিজ অধিকার রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রামে ব্রতী হতে উৎসাহিত করেছিল।

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অধ্যায়ে বিভিন্ন ঘটনাবলী ভারতে যে রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, তা গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তার অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি প্রয়োগে উৎসাহিত করেছিল। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থাশীল গান্ধীর এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ও ইংরেজদের সদিচ্ছা ও মহানুভবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ ঘটে। তিনি বলেছিলেন, ''The present representatives of the empire have become dishonest and unscrupulous. They have no real regard for the wishes of the people of India and they count Indian honour as of little consequence. I can no longer retain affection for a Government so evil".

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। চিত্তরঞ্জন দাস, মহম্মদ আলি জিন্না, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত গান্ধীরই জয় হয়। তার পক্ষে পড়ে ১৮৫৫টি ভোট, বিপক্ষে ৮৭৩ টি। কলকাতার মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী ও মুসলমান সম্প্রদায় তাকে সমর্থন জানায়। গান্ধী স্বরাজের দাবী স্বীকার করে নেন। ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে, অ্যানি বেশান্ত, মালব্য প্রমুখের বিরোধিতা সত্ত্বেও অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর সত্যাগ্রহের লক্ষ্য হিসাবে স্থির হয়— (১) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার (২) খিলাফৎ অন্যায়ের প্রতিবিধান, (৩) স্বরাজ অর্জন, (৪) সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণ। গান্ধী সকলকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, তাঁর নির্দেশিত কর্মসূচী অনুসরণ করলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ সম্ভব।

গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল দ্বিবিধ-ইতিবাচক বা গঠনমূলক এবং নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক। গঠনমূলক কর্মসূচীগুলি হল—

(ক) স্বদেশী সূতোর বস্ত্রবয়ন অর্থাৎ চরকা ও তাঁতের ব্যবহার

(খ) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য।

(গ) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ।

(ঘ) জাতীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(ঙ) মাদকদ্রব্য বর্জন।

আর নেতিবাচক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল—

(ক) সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করা।

(খ) সরকারি চাকরি ও আইন আদালত বর্জন।

(গ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন বয়কট।

(ঘ) সরকারী পদক, খেতাব প্রত্যাখ্যান ও সমস্ত সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন।

(ঙ) বিদেশী পণ্য বর্জন।

(চ) সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন।

অসহযোগ কর্মসূচী গৃহীত হবার পর এই আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে ও তৎপরতায় তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলিকে নিয়ে গান্ধী ভারতের নানা স্থানে সভাসমিতি করে জনমত গঠনে তৎপর হন। আন্দোলনের শুরুতেই ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ও আইনজীবিরা আদালত পরিত্যাগ করে। সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯১৯-১৯২০ সালে কলেজগুলিতে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫২৪৮৬ জন। ১৯২১-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তা কমে দাঁড়ায় ৪৫,৯৩৩ জনে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা ১,২৮১,৮১০ (১৯১৯-১৯২০ খ্রীঃ) থেকে হ্রাস পেয়ে হয় ১,২৩৯,৫২৪। ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে। প্রতিষ্ঠিত আইনজীবিরা আইনব্যবসা ত্যাগ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, জয়াকর, সৈফুদ্দিন কিচলু, বল্লভভাই প্যাটেল, জহরলাল নেহেরু, সি. গোপালাচারী প্রমুখ। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১৮০ জন আইনজীবি পদত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে ছিল বাংলা। তারপর যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও পাঞ্জাব। সরকারী আদালত বয়কট করে পঞ্চায়েত ও সালিশী আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলায় এরকম ৮৬৬টি সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ভোটদাতাদের অংশ মাত্র নির্বাচনে অংশ নেয়। তবে সরকারী খেতাব ও চাকরী বর্জনের কর্মসূচী বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। ১৯২১ এর জানুয়ারীর মধ্যে ৫,১৮৬ জন খেতাবধারীর মধ্যে মাত্র ২৪ জন তাদের সরকারী খেতাব পরিত্যাগ করেন। এরমধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত ব্যবসাদার "রায়বাহাদুর" শেঠ যমুনালাল বাজাজ। ১৯২১-সালের মধ্যে ৮৭ জন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের পদ ত্যাগ করেন। তাছাড়া বেশ কিছু মুসলিম পুলিশও পদত্যাগ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন।

বয়কট কর্মসূচীর মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছিল বিদেশী কাপড় বর্জন। ১৯২০-২১ সালে ১০২ কোটি টাকার বিলিতি বস্ত্র আমদানি করা হতো। ১৯২১-২২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৫৭ কোটি টাকা। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন, পাউন্ডের তুলনায় টাকার দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা বিলাতী দ্রব্য বয়কটে উৎসাহ লাভ করেছিল।

বয়কটের ফলে দেশী মিলমালিকেরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। স্বেচ্ছাসেবকরা বিলাতী দ্রব্য ও বস্ত্রের দোকানের সামনে পিকেটিং করে। ফলে বিলাতীদ্রব্যের বিক্রয় কম হয়। বিদেশী বস্ত্র বয়কটের এই আন্দোলন সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করে বাংলা মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে। তবে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ব্যবসার স্বার্থে বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন নি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, যমুনাদাস ঠাকুরদাস প্রমুখ।

মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন এই সময়ে প্রবল হয়েছিল। ফলে সরকারী আবগারী শুল্ক বাবদ আয় হ্রাস পায়। সরকার বাধ্য হয় মদ্যপান স্বাস্থ্যকর বলে প্রচার করতে। বিহার ও উড়িষ্যা সরকার মদ্যপানের প্রচারের জন্য ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তি মোজেস, আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন, শেক্সপীয়র যারা মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন তাদের তালিকা তৈরী করে প্রচার করেছিলেন। ১৯২১-২২ সালে আবগারি থেকে পঞ্চায়েতের আদায় ৩০ লক্ষ টাকা কমে যায়।

কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য জাতীয় স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচার, খাদি ও চরকার ব্যাপক প্রচার চালায়। কংগ্রেসের বিজয়ওয়াড়া অধিবেশনের (মার্চ, ১৯২১) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিলক স্বরাজ তহবিল গঠন করে ১ কোটি টাকা সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। ১ কোটি সদস্য সংগ্রহ ও ২০ লক্ষ চরকা বিলির কর্মসূচি গৃহীত হয়। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৮০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ এবং দিল্লীর জমিয়ামিলিয়া ইসলামিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহার ও উড়িষ্যায় শুরু করা হয়েছিল ৪৪২টি প্রতিষ্ঠান, বাংলায় ১৯০টি, বোম্বাই-এ ১৮৯টি ও যুক্তপ্রদেশে ১৩৭টি। আচার্য নরেন্দ্রদেব, জাকির হোসেন, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবিরা এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষা বয়কটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাফল্য অর্জিত হয়েছিল বাংলা ও পাঞ্জাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বয়কটের এই কর্মসূচীর প্রথমে বিরোধিতা করলেও লাজপৎ রায় পাঞ্জাবে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও বোম্বাইতে এ ব্যপারে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়, যদিও মাদ্রাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট আন্দোলনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কেবল উত্তর প্রদেশেই ১৩৭টি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ওয়াড়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ কোটি সভ্যসংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা না গেলেও কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষে পৌঁছেছিল। তিলক স্বরাজ তহবিলে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এক কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং খাদি জাতীয় আন্দোলনের পোশাকে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাদুরাইতে এক ছাত্রসভায় ভাষণরত অবস্থায় খাদির দাম বেশি বলে অভিযোগ করা হলে গান্ধী স্বল্পবাস পরিধানের উপদেশ দেন। তিনি নিজেও স্বল্পবাস পরিধান করতেন। ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভারতে এলে গান্ধীর পরামর্শে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। হরতালকে কেন্দ্র করে বোম্বাইতে বয়কট হলে গান্ধী তিনদিন অনশন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

১৯২১ সালের ২৮শে জুলাই বোম্বাইতে সংগঠিত নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন কংগ্রেসের শাখা সমিতিগুলিকে পরবর্তী ৩০শে সেপ্টম্বরের মধ্যে বিদেশী দ্রব্যের সম্পূর্ণ বয়কট সফল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সাথে খদ্দর উৎপাদনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু বিদেশীবস্ত্র বয়কটের কর্মসূচী তীব্রভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমালোচিত হয়। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই কর্মসূচীর তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রকৃতপক্ষে বিদেশীদ্রব্য বয়কটের কর্মসূচীর সফল রূপায়ন অসম্ভব ছিল। কারণ গান্ধীর প্রস্তাব সমূহ যে কাগজে ছাপা হয়েছিল, তা ছিল বিদেশী, যে মেশিনে ছাপা হয় তাও ছিল বিদেশী, এছাড়া সমস্ত পাক্ষিক বা দৈনিক পত্রিকা সমূহ, এমনকি গান্ধীজির 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকাও বিদেশী মুদ্রণ যন্ত্রে ছাপা হতো। এমনকি পত্রপত্রিকাগুলি পাঠকের কাছে পৌঁছে

দেবার জন্য যে ডাকটিকিট ব্যবহৃত হতো, তাও বিদেশী যন্ত্রাংশে ছাপা হতো। তাছাড়া সমস্ত দেশ ভারতের শত্রুও ছিলনা। অধিকন্তু বিশ্বভাতৃত্বের প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একান্ত অপরিহার্য। তাই বিদেশী দ্রব্যের বয়কট কর্মসূচী ছিল এক সভ্যজাতি গোষ্ঠীর কাছে ছিল অসম্ভব ও অনাকাঙ্খিত (''It was impossible and undesirable for a civilised community to boycott all foreign goods''-Ramananda Chattopadhyay) 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ বিদেশী বস্ত্র পোড়াবার বা স্মার্না-র মত দেশে পাঠিয়ে দেবার কংগ্রেসী কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বিকল্প হিসাবে প্রস্তাব দেন, বিদেশীবস্ত্র বিদেশে না পাঠিয়ে বা পুড়িয়ে না ফেলে দেশেরই দরিদ্র দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হোক। এই ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন সাধারণ মানুষের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেবে বলে তার ধারণা ছিল। কারণ দেশীয় বস্ত্রের দাম বিদেশী মেশিনজাত বস্ত্রের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া দেশীয় বস্ত্রের সরবরাহও প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। ফলে এই ধরনের কর্মসূচী এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্যের ওপর কশাঘাত স্বরূপ প্রতিভাত হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একইরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এবং তিনিও বয়কট কর্মসূচীর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

তৎসত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলন সমগ্রভারতে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কোলকাতায় সুভাষচন্দ্র বসু, চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রংপুর ও চট্টগ্রামে মুসলিম চাষীরা খাজনা বন্ধ করে। বাংলায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তীদেবী প্রমূখ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ডের খাজনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। অসমে কনকচন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন প্রসার লাভ করে। পাঞ্জাবে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে মোহান্তদের হাত থেকে গুরুদ্বার দখলের আন্দোলন যুক্ত হয়। প্রচণ্ড দমনপীড়নের সম্মুখীন হয়েও আকালিরা অহিংসার নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। উত্তরপ্রদেশে জওহরলাল নেহেরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ নতুন এক প্রজন্মের নেতাদের অবির্ভাব ঘটে।

অসহযোগ আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন চটকলে ১৯২০ সালের জুলাই থেকে পরবর্তী ৯ মাসে ১৩৭টি, ১৯২১ এ ১৫০টি এবং ১৯২২ সালে ৯১ টি ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট হয় বার্ণ, জেসপ প্রভৃতি কোম্পানী এবং রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও বরাকরের কয়লা খনিতে। অসমের 'চা' বাগানেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। 'বিনা অনুমতিতে 'চা' বাগান ত্যাগী শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে আসাম-বেঙ্গল রেলপথে ও স্টীমারে ধর্মঘট হয়।

৭.৬.১১.৬ : সরকারী দমননীতি

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, অসহযোগ আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পাশব চরিত্র উদ্ঘাটন করে দেয়। (The non-co-operation movement brought into prominent relief the brute force of the British rule in India.) শুরুতে সরকার আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল। নির্যাতনের ফলে জাতীয়তাবাদের সঙ্কল্প আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠবে বুঝে তারা খিলাফৎপন্থী ও অসহযোগীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। ১৯২১ সালের মে মাসে বড়লাট রীডিং গান্ধীকে বলেন, আলী ভাতৃদ্বয়কে বক্তৃতায় হিংসার পথ ত্যাগ করতে। এটা ছিল উভয়ের মধ্যে বিরোধ

সৃষ্টির এক প্রয়াস। কিন্তু গান্ধীর অনিচ্ছায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি সরকার কঠোর দমননীতি অনুসরণ করেছিল। কংগ্রেস সেবাদলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। এর সদস্যদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশ (২৩শে ডিসেম্বর) ও তার স্ত্রী বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হন। এদের অনুসরণ করে সহস্রাধিক যুবক-যুবতী গ্রেপ্তার বরণ করেন। লাজপৎ রায়কে Seditious Meeting Act-এ গ্রেপ্তার করা হয়। জওহরলাল নেহেরুকে বিদেশী দোকানে পিকেটিং করার ঘোষণা করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় ও ১৮ মাসের জেল দেওয়া হয়। গান্ধী ব্যতীত অধিকাংশ নেতাই প্রেপ্তার হন। পত্রপত্রিকা এবং জনসভা ও সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কংগ্রেস ও খিলাফৎ দপ্তরে মধ্যরাতে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় অসংখ্য ব্যক্তিকে। উত্তরপ্রদেশে সরকার অসহযোগ আন্দোলনকে বৈপ্লবিক (revolutionary) ও নৈরাজ্যবাদী (anarchical) বলে অভিহিত করে সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের প্রতিআক্রমণে যেতে বলে। সরকারী অফিসারদের ইতিপূর্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে যে বিধিনিষেধ ছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য এ 'Reform League ও 'Liberal League' -এ অংশ নিয়ে আন্দোলন বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়। সত্যাগ্রহী ও পিকেটিংকারীদের ওপর লাঠিপ্রয়োগ ও গুলিবর্ষণ স্বভাবিক ঘটনা হয়ে দাড়ায়। বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়।

৭.৬.১১.৭ : আন্দোলন প্রত্যাহার

১৯২১ সাল শেষ হবার আগেই গান্ধীজি ছাড়া বাকি সব প্রধান নেতাকেই কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি প্রদেশকে কতগুলি শর্তসাপেক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার অনুমতি দিয়েছিল। তবে মোপলা বিদ্রোহ ও বোম্বাই দাঙ্গা শুরু হবার পর গান্ধীজি কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগলেন। তিনি চাইলেন 'মন্থরতার মধ্যদিয়ে গতিবেগ আনতে'। তাই তিনি ঠিক করলেন শহর থেকে আন্দোলনের কেন্দ্র গ্রামে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে ব্যক্তিগত ও গণঅসহযোগ অন্দোলনের সম্মতি দেওয়া হয়। ১৯২২-এর ১লা ফেব্রুয়ারী ভাইসরয়ের কাছে গান্ধীজি পাঠালেন তার বিখ্যাত চরমপত্র ঃ বাক্-স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, প্রেসের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রাথমিক দাবীগুলিকে আদায় করার জন্য কোন অহিংসা উপায় অবলম্বন ছাড়া এ দেশের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই'। গুজরাটের বরদৌলি তালুকে গান্ধীজি অহিংস পথের পরীক্ষায় ব্রতী হবেন বলে ঠিক করেন। গান্ধীজি এই চিঠিতে ঘোষণা করেছিলেন সরকার যদি নাগরিক অধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করে এবং বন্দীদের মুক্তি না দেয় তাহলে তিনি গণ আইন অমান্য করতে বাধ্য হবেন। ভাইসরয়ের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। সুরাট জেলার বরদৌলি তালুকে গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর ডাক দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে দেশের সব অংশের সহযোগিতা চাওয়া হয়।

এই সময়ে চৌরীচৌরা-র ঘটনা গান্ধীকে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে এক বিশাল জনতা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ভগবান আহীরের ওপর পুলিশের বেত্রাঘাত ও অকথ্য নির্যাতনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পুলিশের এই বর্বর আচরণের প্রতিবাদে জনতা অহিংসভাবে থানার সামনে জমায়েত হয়। ১৯২২-এর ৫-ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ও খিলাফতীদের মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ক্ষিপ্ত জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ কর্মীরা পালাবার চেষ্টা করলে তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে আগুণে ফেলে দেওয়া হয়। বাইশজন পুলিশকর্মী নিহত হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা ডেকে গান্ধী তার মনোবেদনা ব্যক্ত করেন এবং অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ১৯২২-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী বরদৌলী প্রস্তাব অনুয়ায়ী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গণসত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নেয়। এই ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

৭.৬.১১.৮ : স্বরাজ্য-দল (১৯২৩-২৭)

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গান্ধীজি কারারুদ্ধ হওয়ায় যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা থেকে স্বাভাবিক পথে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় স্বরাজ্য দল।

চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯২৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ, জহরলাল নেহেরু, আজমল খাঁ, সত্যমূর্ত্তি প্রমুখরা কংগ্রেস কর্মপন্থার দাবী পরিবর্তন করেন। অপরদিকে মিঃ রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল, কে. আর. আয়েঙ্গার প্রমুখরা এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন। প্রথম গোষ্ঠীটি পরিবর্তনপন্থী এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি পরিবর্তন বিরোধী নামে পরিচিত হয়। জহরলাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখরা প্রস্তাব করেন যে, — (১) অসহযোগ আন্দোলনের নীতির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। (২) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় আরও বেশী ভারতীয় প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। (৩) একমাত্র আইনসভার মাধ্যমেই সরকারের কাজ ও নীতির বিরোধিতা করা সম্ভব। তাছাড়া তাঁরা গান্ধীজি অনুসৃত বিদেশী বস্ত্র, আইন আদালত, স্কুল-কলেজ, উপাধি ও আইনসভা বর্জন এই পাঁচটি নীতিকেই সমর্থন করেননি। কিন্তু রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বে পরিবর্তনবিরোধীরা পুরনো কর্মসূচী অনুসরণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে গয়া অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলালের প্রস্তাব গুলো গোঁড়া নেতাদের ভোটে বাতিল হয়ে যায়। ফলে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল তখন কংগ্রেসের মধ্য থেকেই স্বরাজ্য দল গঠন করেন। অবশ্য ১৯২৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে দুই গোষ্ঠীর মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা হয়। মৌলানা আজাদ বিশেষ আপোষ প্রস্তাব পেশ করলে তা পরিবর্তন বিরোধীদের সহযোগিতায় গৃহীত হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ গান্ধীজি অসুস্থতার জন্য কারাগার থেকে মুক্তি পান। এরপর আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয় যে স্বরাজ্য দল আইন সভার কার্যকলাপ পরিচালনা করবে আর কংগ্রেসকর্মীরা গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকবে। ১৯২৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বেলগাঁও-এ যে কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সমঝোতাসূত্র গৃহীত হয় ও জাতীয় কংগ্রেস স্বরাজ্য দলকে নিজস্ব কর্মসূচী রূপায়ণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়।

পরিবর্তনপন্থীরা স্বরাজ্য দল গঠনের জন্য কতগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেন। (১) আইনসভাই একমাত্র বক্তব্য প্রকাশের জায়গা হিসেবে গৃহীত হবে। (২) সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক নীতিগুলি বিরোধিতার জন্য আইন সভাতে বিভিন্ন প্রস্তাব আনা যাবে। (৩) আইনসভায় সরকারের সমালোচনার ফলে জনগণ রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে। (৪) সংবিধান পরিবর্তনের জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া যাবে ও দ্বৈতশাসনকে অকার্যকর করা সম্ভব হবে।

৭.৬.১১.৯ : স্বরাজ্য দলের নীতি ও কর্মসূচী

১৯২৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে এলাহাবাদের স্বরাজ্যদলের যে প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতেই দলের গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য, নীতি ও আন্দোলনের রূপরেখা রচিত হয়। স্বরাজ্য দলটির প্রধান প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে ছিল (ক) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন অর্জন (খ) আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ও নির্বাচনে জয়ী হয়ে আইনসভার ভিতর থেকেই সরকারের কাজে বাধাদান করা। (গ) সরকারী বাজেট প্রত্যাখ্যান করা, (ঙ) নানরকম ভাবে জাতীয়তাবাদীদের অগ্রগতিতে সাহায্য করা, (চ) সুনির্দিষ্ট আর্থিক নীতিগ্রহণ করা, (ছ) সংবিধান রাখার অধিকার। এই কার্যাবলীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ খ্রীঃ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাকে অকার্যকর করাই ছিল এই দলের উদ্দেশ্য। স্বরাজ্যদলের নেতা মূলত কংগ্রেসী হলেও তারা গান্ধীজির সঙ্গে মতৈক্যয় আসতে পারেননি বেশ কিছু বিষয়ে।

৭.৬.১১.১০ : কার্যাবলী

১৯২২ খ্রীঃ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নির্বাচনে স্বরাজ্য দল অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণিত হয়। মতিলাল নেহেরু বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পান। এছাড়াও স্বরাজ্যদল মধ্যপ্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, বাংলাদেশে গরিষ্ঠতা এবং উত্তরপ্রদেশ ও আসামে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্যদল সংখ্যাগরিষ্ঠা অর্জন করে ও দলনেতা চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়রপদে নির্বাচিত হন।

স্বরাজ্য দলের আন্দোলনের ফলেই ভারতকে ডোমিনিয়ান স্টেটাস দেওয়ার জন্য সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেন বৃটিশ সরকার। রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারেও স্বরাজ্য দলের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। স্বরাজ্যদলের বাধার ফলেই বাংলায় নতুন আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতশাসন ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯২৬ খ্রীঃ ১৩ই জুন থেকে ১৯২৭খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলায় দ্বৈতশাসন স্থগিত হয়ে যায়। স্বরাজ্য দলের জনপ্রিয়তা রোখার জন্যই বৃটিশ সরকার গান্ধীজিকে ১৯২৪ খ্রীঃ মুক্তি দেন। ১৯২৫ খ্রীঃ দার্জিলিঙের বাড়িতে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলে স্বরাজ্যদলের পতন ঘটে। **ব্যর্থতার কারণ**— চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্যাটেল সকলেই কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও স্বরাজ্যদলের উত্থান ও পতন খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ঘটে। প্রধানত চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতেই এই দলের পতন হয়। কারণ চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ গণসংগঠনের ক্ষমতা, তার ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমই স্বরাজ্য দলকে জাতীয় রাজনীতিতে তুলে আনতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া দলের অন্যান্য নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন শাসমল ও তুলসী গোস্বামী এই অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এছাড়াও স্বরাজ্য দল বিত্তবান ভারতীয়দের প্রতিনিধি ছিল। বৃটিশদের সঙ্গে তারা অনেক সময় আপোষও করতেন। ফলে গণসংযোগ ও গণসমর্থন হারান।

৭.৬.১১.১১ : অবদান

বহু ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের রাজনীতি ও জাতীয় দলের আন্দোলনে স্বরাজ্য দলের অবদান অনস্বীকার্য, কারণ গান্ধীজি যে সময় আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন সেই সময় স্বরাজ্য দলের প্রাণবন্ত কর্মসূচী সাধারণের সামনে আশার আলো জাগিয়েছিল। তারাই প্রথম জনগণের মনে পরিষদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করে। সরকারী কাজে স্বরাজ্য দলের বিরোধিতার জন্যই বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেন। স্বরাজ্য দলের কার্যকলাপই বুঝিয়ে দেয় ভারতে দ্বৈতশাসন অচল।

৭.৬.১১.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশী থেকে পার্টিশান

(২) অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭

(৩) Judith Brown –Gandhi's Rise to power

(৪) G. Tendulkar– Mahatma Vol, I, II

(৫) Sumit Sarkar–Modern India

(৬) Bipan Chandra–India's Struggle for Independence

(৭) P.C. Bamford–History of the Non-cooperation and khilafat Movement

৭.৬.১১.১৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির উত্থানের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

(২) আঞ্চলিক বা স্থানীয় আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকা আলোচনা কর।

(৩) রাওলাট আইন কিভাবে গান্ধীবাদী আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিল?

(৪) অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ও সাফল্য-ব্যর্থতা আলোচনা কর।

(৫) গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে কেন খিলাফৎ আন্দোলনকে সংযুক্ত করেছিলেন?

(৬) স্বরাজ্য দলের উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর।

ভারতীয় রাজনীতিতে এই দলের অবদান কি ?

———

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

GANDHIAN MOVEMENT AND LEFT MOVEMENT

একক - ১২

Revolutionary and Left Movements; Civil Disobedience and Quit India Movement

---

গঠন (Structure) ঃ

৭.৬.১২.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

৭.৬.১২.১ : ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব

৭.৬.১২.২ : শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের বামপন্থীরা

৭.৬.১২.৩ : বামপন্থীদের দুর্বলতা

৭.৬.১২.৪ : নীতির পরিবর্তন, পরিস্থিতির পরিবর্তন

৭.৬.১২.৫ : কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (C.S.P.)

৭.৬.১২.৬ : আরও অন্য বামপন্থী দল/গোষ্ঠী

৭.৬.১২.৭ : স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার একটি মূল্যায়ন

৭.৬.১২.৮ : স্বাধীনতার পর বামপন্থী আন্দোলন

৭.৬.১২.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৬.১২.১০ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৬.১২.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ

(২) শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার পিছনে বামপন্থীদের অবদান

(৩) বামপন্থী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

(৪) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ভূমিকা

(৫) স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার মূল্যায়ন

(৬) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বামপন্থী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি

৭.৬.১২.১ : ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ দেশের জাতীয় আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এর আগে জাতীয় আন্দোলন ছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই। বামপন্থী চিন্তাধারা বিকাশের ফলে সামাজিক স্বাধীনতার বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শুধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই নয়, সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বামপন্থীরাই প্রথম বলেন। গান্ধী অবশ্য এক ধরনের সমাজবাদের কথা ভেবেছিলেন তবে তা গ্রামভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা ভারতবর্ষে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। গান্ধী সেই পরিমণ্ডলে অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০) মধ্যে দিয়ে, প্রথম জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা ভারতবর্ষের যুবসমাজকে হতাশ করে তুলেছিল। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরাতে ১৯২২ সালের ৫ফেব্রুয়ারি পুলিশকর্মীদের, আন্দোলনকারীরা হত্যা করলে গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে গান্ধী রুদ্ধ করায় গান্ধীর প্রতি একধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। গান্ধীর প্রতি এই ধরনের নেতিবাচক মনোভাব বামপন্থা প্রসারের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

দেশের এই অবস্থার পাশাপাশি বিদেশের ঘটনাও বামপন্থীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বামপন্থী বলশেভিক বিপ্লবের বিরাট সাফল্য এদেশে বামপন্থার বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বামপন্থীদের এই সাফল্য ছিল সাম্যবাদের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রেরও সাফল্য। রুশ বিপ্লব শিক্ষা দিয়েছিলঃ সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবল পরাক্রান্ত জার সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটিয়ে এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে যেখানে একদল মানুষ আর একদল মানুষকে শোষণ করবে না, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় জনগণও তা করতে পারে। বিখ্যাত চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ১৯১৯এ লিখেছিলেনঃ 'আজ জার্মান সমরবাদের পরাজয়ের পর, জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর সারা পৃথিবীতে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে, জনগণের শক্তি। এই শক্তি নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার-সম্পত্তিবানদের ও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীগুলোর দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত না হয়ে স্বাধীনভাবে সুখে বাস করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ', এক কথায় বলা যায়, গান্ধীর আন্দোলনের নেতিবাচক দিক, রুশ-বিপ্লবের সদর্থক দিক এবং ভারতবর্ষের আন্দোলনের উপযুক্ত পরিস্থিতিই বিকল্প চিন্তা হিসেবে বামপন্থীদের উত্থানের পটভূমি তৈরি করেছিল।

১৯২০-র গোড়া থেকেই ভারতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা প্রকাশিত হতে থাকে। বোম্বাইতে এস.এ. ডাঙ্গে 'Gandhi and Lenin' (গান্ধী অ্যান্ড লেনিন) নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। তিনি *The Socialist* (দ্য সোশালিস্ট) নামে এদেশে প্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। বাংলায় মুজফ্‌ফর আহমেদ প্রকাশ করেন 'নবযুগ' পত্রিকা এবং পরে কবি নজরুল ইসলামের সহযোগিতায় প্রকাশ করেন 'লাঙল'। পাঞ্জাবে গুলাম হোসেন ও অন্যান্যরা প্রকাশ করেন 'ইনকিলাব'। আর মাদ্রাজে এম. সিঙ্গারভেলু প্রতিষ্ঠা করেন 'লেবার-কিষান গেজেট'-এর।

দেশের বাইরেও বামপন্থী ভাবধারার আন্দোলনের সঙ্গে এ দেশের মানুষ যুক্ত হচ্ছিলেন। তাঁরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেখানকার রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। উপনিবেশগুলো সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন)-এর নীতি কি হবে, তা ঠিক করার ক্ষেত্রে তিনি লেনিনকে সহযোগিতা করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ওখানে কার্যরত সাতজন ভারতীয় (মহম্মদ আলি, মহম্মদ সফিক প্রমুখ) ১৯২০-র অক্টোবরে তাসখন্দে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রয়াস থেকে আলাদা ভাবে, ১৯২০-র পর থেকে ভারতে বেশ কয়েকটি বামপন্থী ও কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীগুলো মূলতঃ কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সংগঠিত হতে থাকে।

কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হয় ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে। এই মামলার বিচারে এস.এ. ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, শওকৎ উসমানি, নলিনী গুপ্ত প্রমুখের চার বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে তাদের আপিল নাকচ হয়ে যায়। পরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ২ বছর ৯ মাস আগে ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি পান। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হওয়ার আগে সত্য ভক্‌ত নামে এক ব্যক্তি কানপুরে একটি কমিউনিস্ট সম্মেলনের পরিকল্পনা করেন। তিনি ছিলেন একজন গান্ধীপন্থী কংগ্রেস কর্মী। তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জানকী প্রসাদ বাগেরহোট্টা নামে আর একজন যুব কংগ্রেস নেতা।

১৯২৫ সালের ১২ অক্টোবর সত্য ভক্‌ত এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। নিজেকে তিনি 'ভরতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র (ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি) সম্পাদক বলে পরিচয় দেন। ঐ প্রচারপত্রে লেখা হয়, আগামী ডিসেম্বর মাসে কানপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশাপাশি একটি কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। মৌলানা হজরৎ মোহানি এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ইংলন্ডের পার্লামেন্টের সদস্য সাকলাতওয়ালা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

এই সত্য ভক্‌তের প্রকৃত নাম ছিল চকনলাল। তিনি ভরতপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯১৮ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমে ছিলেন। ১৯২৩ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন কানপুরে আসেন এবং কলকাতার এক যুবক অবনী চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হন। এই অবনী চৌধুরী কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। তিনি সত্য ভক্‌তকে কানপুর মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অর্থাদি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। এই মামলার সংস্পর্শে এসে, মামলার সওয়াল-জবাব শুনে ও পড়ে সত্য ভক্‌ত উপলব্ধি করেন যে কমিউনিস্ট পার্টি আইনত সংগঠিত ও পরিচালিত হতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ১৯২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় এর

প্রচার হয় এবং তিনি দাবি করেন ১৯২৫ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রায় ২৫০ জন সদস্যকে তিনি তালিকাভুক্ত করে ফেলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খোলাখুলিভাবে ভারতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করা।

১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, এস.বি. (সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু) ঘাটে, নিম্বকার, কে.এন. যোগলেকর প্রমুখ যোগদান করেন এবং নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে পার্টির কোনও গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়নি। পার্টি সংগঠনও ছিল অস্থায়ী। সম্মেলন থেকে চারজন প্রাদেশিক সংগঠক নির্বাচিত হন যাঁরা নিজেদের প্রদেশে পার্টি গড়ে তোলার কাজের দায়িত্ব পান। দিল্লীতে পার্টির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপিত হয়। প্রথমে বাগেরহোট্টা এবং পরে ঘাটে অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

এই সময় সি.পি. আই-এর বক্তব্য ছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পার্টি তার সব সদস্যকে কংগ্রেসের সদস্য হতে, এর সমস্ত সংগঠনে একটি শক্তিশালী বামপন্থী শাখা গড়ে তুলতে, অন্যান্য র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং কংগ্রেসকে আরও বেশি করে র‍্যাডিকাল গণসংগঠনে রূপান্তরিত করতে আহ্বান জানায়।

১৯২০-র দশকে মানবেন্দ্রনাথ রায় লেনিনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক জগতে কমিউনিস্টদের রণকৌশল সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত ও তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্কে অবতীর্ন হন। লেনিন জোর দেন উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশে প্রধানত বুর্জোয়া--পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনকে বিস্তৃতভাবে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার ওপরে। অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথ যুক্তি দেন যে, গান্ধীর মতো বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের সম্পর্কে ভারতীয় জনগণ ইতিমধ্যেই মোহমুক্ত হয়ে গেছেন আর 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন'-নিরপেক্ষভাবে ভারতীয় জনগণ এগিয়ে চলেছেন বিপ্লবের দিকে। ১৯২২-এ বার্লিনে মানবেন্দ্রনাথ 'ভ্যানগার্ড অব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্টস্' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। একই সময়ে অবনী মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় প্রকাশ করেন India in Transition যা ছিল ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের অগ্রণী প্রয়াস। এই সময়ে বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় গোষ্ঠীগুলোও মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বরকাতুল্লার নেতৃত্বে পুরোন বার্লিন গোষ্ঠী।

মানবেন্দ্রনাথ রায় দুটি ভাগে বামপন্থী আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন- (১) মার্কসবাদী পন্থায় বিশ্বাসী গুপ্ত সংগঠন স্থাপন এবং (২) কৃষক, শ্রমিক, পাতি বুর্জোয়াদের সঙ্গে একসাথে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলোতে প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করার জন্য মানবেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে কমিউনিস্ট কর্মসূচী ভিত্তিক বিবৃত্তি তৈরি করতেন, 'ভ্যানগার্ড'-এর গোড়ার দিকের সংখ্যাগুলোতে (মে--জুন ১৯২২) গান্ধী সম্পর্কে তীব্র সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হলেও ১৯২৮ পরবর্তী পর্যায়ে গান্ধীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুর অনেকটা নরম করা হয়েছিল। এতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল 'নিপীড়িত স্বদেশবাসীর জন্য গান্ধীর গভীর ভালবাসাকে, কৌশলগত বড় বড় ভুল করলেও সে ভালবাসা মহান'।

৭.৬.১২.২ : শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনে বামপন্থীরা

ভারতে আদি কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রধান ধরন ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের পার্টি গঠন করে সেগুলোর মাধ্যমে কাজ করা। এই ধরনের প্রথম সংগঠন ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'শ্রমিক স্বরাজ পার্টি'

(১৯২৫) যা মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ, কাজী নজরুল ইসলাম, কুতুবুদ্দিন আহ্‌মেদ, হেমন্ত কুমার সরকার প্রমুখ গড়ে তোলেন বাংলাতে। এদের পত্রিকা ছিল লাঙ্গল, গণবাণী। ১৯২৬-এর শেষ দিকে বোম্বেতে যোগলেকর, ঘাটের নেতৃত্বে 'কংগ্রেস শ্রমিক পার্টি' (পত্রিকা ঃ ক্রান্তি) এবং পাঞ্জাবে সোহন সিং জোশের নেতৃত্বে 'কীর্তি কিষাণ পার্টি' (পত্রিকা ঃ কীর্তি) গড়ে ওঠে। ১৯২৩ সাল থেকেই মাদ্রাজে কাজ করছিল 'হিন্দুস্থান শ্রমিক কৃষক পার্টি' (Labour Kisan Party of Hindustan)। ১৯২৭-এ এই প্রাদেশিক সংগঠন Workers and Peasants Party নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলে। এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীতে। W.P.P চেয়েছিল কংগ্রেসকে 'জনগণের পার্টি' করে তুলতে, স্বাধীনভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন গড়ে তুলতে এবং প্রথমে স্বাধীনতা ও শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র অর্জন করতে। W.P.P-র সংগঠন দ্রুত বাড়তে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের ভেতরেও বামপন্থী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য র‍্যাডিকাল কংগ্রেসীরা কংগ্রেসকে বামপন্থী আদর্শে প্রভাবিত করার জন্য W.P.P-র প্রয়াসকে স্বাগত জানান। এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ছিলেন নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বসু। যুব লীগ- এর কর্মীরাও বামপন্থা বিকাশের কাজে সক্রিয় ছিলেন। W.P.P শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে; ১৯২৭-২৯ পর্বে শ্রমিক সংগ্রাম পুণরুজ্জীবনে W.P.P-র বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জাতীয় আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকায় সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বামপন্থীদের ওপর দমন-পীড়ন চলতে থাকে। (আগে উল্লেখিত কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা দ্রষ্টব্য) ১৯২৯-এ বাণিজ্য বিরোধ বিল (Trade Disputes Bill) এবং জন নিরাপত্তা বিল (Public Safety Bill) নামে দুটি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন জারি হয়; মার্চ মাসে আচমকা হানা দিয়ে ৩২ জন র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন Communist Party of Great Britain-এর তিনজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন ব্রাডলি ও লেস্টার হাচিনসন সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করে দেওয়া এবং জাতীয় আন্দোলন থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করা। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় এই ৩২ জনের বিচার শুরু হয়। এই বিচার জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার ঘটায় বন্দীদের হয়ে সওয়াল করেন জহরলাল নেহরু, এম.এ. আনসারি, এম.সি. চাগলার মতো জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। মীরাট বন্দীদের প্রতি সংহতি জানানোর জন্য এবং আসন্ন আন্দোলনে তাদের সহযোগিতা চাওয়ার জন্য গান্ধী জেলে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বন্দীরা যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলো সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়; এর ফলে ভারতের বহু মানুষ কমিউনিস্ট চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার সুযোগ পান। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বামপন্থীদের বিযুক্ত করার সরকারি ষড়যন্ত্র সফল হয়নি, বরং তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে শ্রমিক আন্দোলন এই দমন নীতির ফলে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। শ্রমিক আন্দোলনের এই গড়ে ওঠার কালে নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠা সহজ ছিল না।

৭.৬.১২.৩ : বামপন্থীদের দুর্বলতা

সাংগঠনিক নীতির কারণে বামপন্থী গোষ্ঠী এই সময়ে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়ে এদেশের কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরা কংগ্রেসকে 'বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্টি' বলে চিহ্নিত করেন। জহরলাল নেহরু এবং

সুভাষ বসুর মত কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের বর্ণনা করা হয় 'জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়াদের দালাল' হিসেবে। অভিযোগ করা হয় তাঁরা শ্রমিকদের ব্যাপকতম অংশকে ধোঁকা দিচ্ছেন এবং জনসাধারণকে বুর্জোয়া প্রভাবে রাখার চেষ্টা করছেন। ১৯৩১-এ স্বাক্ষরিত গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে জাতীয়তাবাদের প্রতি কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ বলে চিহ্নিত করা হয়। আবার শ্রমিক ও কৃষকের পার্টি পেটি বুর্জোয়াদের খপ্পরে পড়তে পারে এই যুক্তিতে W.P.P. ভেঙে দেওয়া হয়।

বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেন, রাজনৈতিক মনোভাবের হঠাৎ এই পরিবর্তনের ফলে তারা জাতীয় আন্দোলন থেকে এমন এক সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন যখন এই আন্দোলন বৃহত্তর গণসংগ্রামের জন্য নিজেকে তৈরি করছিল এবং এর উপর বামপন্থীদের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তার ওপর কমিউনিস্টরা এই সময় অনেকগুলো ছোট ছোট দল ছুট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। তার উপর সরকার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৩৪-এ C.P.I. কে বেআইনি ঘোষণা করে।

কংগ্রেসের সংস্কারবাদী আপসমুখী নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টরা গণ-আন্দোলন থেকে নিজেদের পুরোপুরি সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর ফলে ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে, ১৯৩৪-এর মার্চে কমিউনিস্ট পার্টি তার 'Draft of Political Thesis' বা রাজনৈতিক তত্ত্বের খসড়ায় স্বীকার করে, আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১) থেকে বিরত থাকার ফল ভাল হয়নি। এই প্রতিবেদনে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তার আপসমুখী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর আহ্বান জানোনো হয়।

৭.৬.১২.৪ : নীতির পরিবর্তন, পরিস্থিতির পরিবর্তন

১৯৩৫-এ পি.সি. যোশীর (পূরণ চাঁদ যোশী) নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠিত হয়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের বিপদের মুখে, ১৯৩৫-এর আগস্টে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস। কমিন্টার্ন এই অধিবেশনে তাদের আগের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। কমিন্টার্ন পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির সঙ্গে এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানায়। এই সময় রজনী পাম দত্ত এবং বেন ব্র্যাডলি লিখিত একটি দলিল কংগ্রেসের কাজকর্মে বামপন্থীদের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত প্রদান করে।

'দত্ত-ব্র্যাডলি থিসিস' নামে পরিচিত এই দলিলের মূল্য বক্তব্য ছিল—

(১) জাতীয় মুক্তিপ্রয়াসী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস বিশাল কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণমোর্চা গঠনের কাজে কংগ্রেস বড় ভূমিকা নিতে পারে।

(২) কংগ্রেস নেতৃত্ব বুর্জোয়া ধরনের এবং তার সঙ্গে জনসাধারণ-এর সংঘাত অবশ্যম্ভাবী।

(৩) কংগ্রেসের বাইরে যে সব শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন আছে সেগুলিকে কংগ্রেসের মধ্যে আনতে হবে যৌথ সংযুক্তির মাধ্যমে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণমোর্চা শক্তিশালী হবে।

(৪) বামপন্থীরা একটি গণ পরিষদ গঠনের দাবি তুলবেন যে দাবিকে কেন্দ্র করে সকল শক্তিকে সমবেত করা সম্ভব হবে।

(৫) সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভেতরের সমস্ত বামপন্থী শক্তির সঙ্গে 'ঐক্য প্রতিষ্ঠা' করা প্রয়োজন। এভাবেই গড়ে উঠবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির যুক্ত মোর্চা।

১৯৩৮-এ কংগ্রেসকে 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় জনগণের কেন্দ্রীয় গণ রাজনৈতিক সংগঠন' বলে স্বীকার করা হয়। ১৯৩৯এ পি.সি. যোশী, পার্টির মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট '-এ লেখেন—'আমাদের জাতীয় সংগ্রামই আজকের দিনে সবচেয়ে বড় শ্রেণী সংগ্রাম আর কংগ্রেস তার প্রধান হাতিয়ার'।

তবে একই সঙ্গে পার্টি জাতীয় আন্দোলনকে শ্রমিকশ্রেণীর এবং বামপন্থীদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার লক্ষ্যেও অবিচল থাকে। কংগ্রেসের মধ্যেই বামপন্থীরা কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। ১৯৩৬ থেকে '৪২-এর মধ্যে কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বাংলা ও পাঞ্জাবে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌতে এন.জি. রঙ্গার নেতৃত্বে সারা ভারত কিষাণ কংগ্রেস গঠিত হয়। সংগঠনের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৩৮ সালে এই সংগঠনের নতুন নামকরণ হয় সারা ভারত কিষাণ সভা; পতাকার রং হয় লাল।

শ্রমিক সংগঠনেও বামপন্থী প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ২৭১ থেকে বেড়ে হয় ৫৬২। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' আখ্যা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন/প্রভাবাধীন বম্বের শ্রমিকরা ৩ নভেম্বর যুদ্ধ বিরোধী ধর্মঘট পালন করেন। রজনী পাম দত্ত তাঁর 'India Today' বইতে মন্তব্য করেছেন, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম যুদ্ধ বিরোধী ধর্মঘট। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বামপন্থীরা ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

এই সময়কার আন্তর্জাতিক রাজনীতি বামপন্থীদের অবস্থান বদলাতে বাধ্য করে। ১৯৪১ সালের জুনে নাৎসী জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মহাজোট গঠিত হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ', 'জনযুদ্ধ'-এ রূপান্তরিত হয়।

১৯৪২-এর আগস্টে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব নিলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (A.I.C.C.) কমিউনিস্ট সদস্যরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সি. পি. আই তার গৃহীত একটি প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির নিন্দা করে এবং মুক্তিসংগ্রামীদের 'উন্মাদ দেশপ্রেমিক' রূপে আখ্যায়িত করে। পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরা অবশ্য স্বীকার করেন যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে তাঁদের অবস্থান সঠিক ছিল না।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতে গণ-আন্দোলনের বিকাশ ঘটে আর সেই গণ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বামপন্থীরা। এই গণবিস্ফোরণের সূচনা ঘটেছিল কলকাতায়, ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর। লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারের প্রহসন বন্ধ করা ও সকলের মুক্তির দাবিতে ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে সমর্থন জানানো হয়েছিল ছাত্রদের এই সাধারণ ধর্মঘটকে। ঐদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণবিদ্রোহের তিনিই ছিলেন প্রথম শহীদ।

১৯৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'পিপলস্ এজ' (Peoples Age) -এ সম্পাদকীয় লেখা হয়; 'দেশবাসীর অন্তরে দেশপ্রেমের যে অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠেছে, সে আগুনকে জাগ্রত রাখতে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলিকে বিচারে দণ্ডিত করা হলে কলকাতা প্রতিবাদী হয়। ১১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী কমিউনিস্ট পার্টি 'রশিদ আলি দিবস' পালন করে, কমিউনিস্ট পার্টির দুই শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল ও সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই গণবিক্ষোভের ওপর সেনাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালানো হয়।

১৯৪৬-এর ১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতে নৌসেনাদের বিদ্রোহ হয়। এই নৌবিদ্রোহের সমর্থনে গণবিস্ফোরণ দেখা দেয়। বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন বামপন্থীরা।

আরও উল্লেখ্য যে শিল্প সাহিত্যের নানান ক্ষেত্রে চল্লিশের দশকে লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল যাকে বলা হয় বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনে মার্কসীয় চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। যেসব সংগঠনের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল সেগুলো হল সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ (প্রতিষ্ঠা চল্লিশের দশকের আগেই, ১৯৩৬ সালে), ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (১৯৪২), সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (১৯৪২) এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩)। এগুলো ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্ট। এর পাশাপাশি চরিত্রগতভাবে রাজনৈতিক কিষাণ সভা, ট্রেড ইউনিয়ন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, কিশোর বাহিনীর মত সংগঠনও অল্পবিস্তর সংস্কৃতিচর্চায় যুক্ত ছিল। কাজেই বলা যায়, চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

৭.৬.১২.৫ : কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (C.S.P)

ভারতে বামপন্থী আন্দোলন শুধু যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস তা নয়। বামপন্থী আন্দোলনের আর একটি ধারার বিকাশ ঘটে তিরিশের দশকে। ১৯৩৪-এর অক্টোবরে বোম্বেতে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, মিনু মাসানি প্রমুখর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি, C.S.P) এই দলের বক্তব্য ছিলঃ স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় সংগ্রামই ভারতে প্রাথমিক সংগ্রাম এবং জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রের পথে একটা প্রয়োজনীয় পর্যায়, সমাজতন্ত্রীদের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে কেননা এটাই জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী প্রাথমিক সংগঠন, এরই প্রমাণ মেলে এই দলের নেতাদের বক্তব্যে।

১৯৩৪এ আচার্য নরেন্দ্র দেব বলেন—'কংগ্রেস নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধি। এই আন্দোলন থেকে আমরা যদি নিজেদের বিচ্ছিন্ন করি, তবে তা হবে আত্মহত্যার নীতি। আমাদের চেষ্টা করতেই হবে কংগ্রেসকে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা দেওয়ার জন্যে; আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে শ্রমিক ও কৃষকদের নিজ নিজ শ্রেণী সংগঠনে সংগঠিত করতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে এবং তাদেরকে জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত করতে হবে।

ঐ বছরই জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন—'আমরা কংগ্রেসের সামনে একটা কর্মসূচী (বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে শ্রমিকদের ও কৃষকদের স্বার্থে আরও বেশি সংস্কারকামী নীতি এবং স্বাধীন ভারত সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করার কথা) উপস্থিত করছি। আমরা চাই কংগ্রেস তা গ্রহণ করুক। কংগ্রেস যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে (আমরা) বলব না যে আমরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমরা যদি আজ ব্যর্থ হই কাল চেষ্টা করব, কাল ব্যর্থ হলে পরের দিন'।

১৯৩৫এ সি.এস.পি (C.S.P)-র মীরাট থিসিসে বলা হয়েছিল কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে বর্তমান বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে নিয়ে আসাই সি.এস.পি-র কর্তব্য।

তবে ১৯৩৯-এ জয়প্রকাশ বসেছিলেন-'আমরা, সোশালিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যে একটা উপদল সৃষ্টি করতে কিংবা কংগ্রেসের পুরোনো নেতৃত্বকে সরিয়ে একটা বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। আমরা শুধু কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে ভাবিত।.....পুরোনো নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যত মতপার্থক্যই থাকুক না কেন, আমরা তা নিয়ে বিবাদ করতে চাই না। আমরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চাই। আমরা সবাই চাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে'।

যখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কথা বলেছিল তখন জয়প্রকাশ সমস্ত বামপন্থী দলের ঐক্যর কথা ভেবেছিলেন। তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

সি.এস.পি আদর্শগতভাবে কংগ্রেসকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পাশাপাশি চেয়েছিল সাংগঠনিক দিক থেকে কংগ্রেসে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে। তবে ১৯৩৯-এ ত্রিপুরী অধিবেশনে গান্ধীর প্রার্থী সীতারামাইয়াকে হারিয়ে (ব্যবধান ১৫৮০-১৩৭৭=২০৩) সুভাষচন্দ্রের জয়ের পরে ১৯৪০-এ রামগড় অধিবেশনে যখন কংগ্রেসে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী বিভাজনের সম্ভাবনা দেখা দিল তখন সি.এস.পি বামপন্থীদের পাশে দাঁড়াল না। এই দলের নেতারা মনে করেছিলেন, এই প্রয়াস জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবে এবং বামপন্থীদের আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এই দলে নানান মতাবলম্বীর অবস্থান দলকে এবং সামগ্রিকভাবে বামপন্থী আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।

৭.৬.১২.৬ : আরও অন্য বামপন্থী দল/গোষ্ঠী

সি.পি.আই এবং সি.এস.পি ছাড়াও নানান বামপন্থী সংগঠন/দল/গোষ্ঠী ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানবেন্দ্রনাথ রায়ের Royist, সুভাষচন্দ্র বসুর ফরোয়ার্ড ব্লক (১৯৩৯), বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (Revolutionary Socialist Party, R.S.P), ট্রটস্কির মতাবলম্বী গোষ্ঠী। এছাড়া স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এন.জি. রঙ্গ ও ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের মত বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা কোন সংগঠিত বামপন্থী পার্টির কাঠামোর বাইরে থেকে কাজ করতেন।

৭.৬.১২.৭ : স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার একটি মূল্যায়ন

বামপন্থী কর্মীরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী, লড়াকু ও আত্মত্যাগী হওয়া সত্ত্বেও তারা জাতীয় আন্দোলনের উপর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হননি। এর একটা বড় কারণ ভারতের মূলধারার

জাতীয় আন্দোলনের প্রধান শক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের সম্পর্ক। বামপন্থীরা অনেক সময়ই ভুল বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন। যখন তা চরম সীমায় পৌঁছেছে তখন হয় তারা এই মূলস্রোতের নেতৃত্বের পেছনে যেতে বাধ্য হয়েছেন আর নয়তো জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

ভারতীয় বাস্তবতাকে উপলব্ধি না করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে গিয়ে ভারতের বামপন্থীদের 'ভারতীয়ত্ব' কিছুটা ক্ষুন্ন হয়। ভারতের সামাজিক শ্রেণীগুলোর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা সরলীকৃত একটা মডেল গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই অমলেশ ত্রিপাঠী এদের 'যান্ত্রিক মার্কসবাদী' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

বামপন্থীদের পারস্পরিক অসদ্ভাব আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। বিভিন্ন বামপন্থী দল, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি এজন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারেননি। তাত্ত্বিক বিরোধ, মতপার্থক্য, অহং এবং মেজাজের পার্থক্য ঐক্যকে বিঘ্নিত করেছিল। ১৯৩৯-এ সুভাষ ও সোশালিস্টদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ অবধি কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোশালিস্ট পার্টি একসঙ্গে কাজ করলেও পরে একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়।

১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান দেশের মানুষ ভাল চোখে দেখেনি। ১৯৪৮-এ সি.পি.আই -এর সাধারণ সম্পাদক বি.টি. রণদিভে স্বীকার করেন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি ভ্রান্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

সুনীতি কুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণসংগ্রামের ঢেউ সমগ্র ভারতে আছড়ে পড়েছিল তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছিল বিহ্বল এবং তারা উল্টোপাল্টা বুঝেছিল। গৌতম চট্টোপাধ্যায় পার্টি নেতৃত্বের কিছুটা বিহ্বলতার কথা মেনে নিলেও স্পষ্ট বলেছেন, পার্টি কোন সময়েই গণসংগ্রামের বিরোধিতা করেনি।

সত্যি কথা বলতে কি এদেশে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে গণসংগ্রাম সংগঠিত করতে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল বিরাট। বহু বিভাজন ও দুর্বলতা সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। ১৯২০-এর দশকের কৃষক আন্দোলন, তিরিশের দশকে বামপন্থার প্রভাবে নতুন চরিত্র লাভ করে।

জাতীয় কংগ্রেসেও বামপন্থীদের প্রভাব বাড়ছিল। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে বামপন্থী সুভাষচন্দ্রের বিজয়। এর আগে বামপন্থীদের প্রভাবেই ১৯৩১-এ করাচী অধিবেশনে মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। বামপন্থীদের প্রভাবেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন, ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা শুধু ঔপনিবেশিক শাসনেরই ফল নয়, ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ ও সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোরও পরিণাম। সুতরাং জনগণের দুর্দশা দূর করতে গেলে এই কাঠামোও আমূল বদলাতে হবে।

৭.৬.১২.৮ : স্বাধীনতার পর বামপন্থী আন্দোলন

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়, এর প্রতিক্রিয়ায় দেশের প্রধান বামপন্থী রাজনৈতিক দল 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে, প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদপন্থী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকল প্রগতিশীল শক্তিকে নেহেরুর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। পরে অবশ্য পার্টি তার মত বদলে বলে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'।

কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে দেশে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ বহাল, তাই পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার ডাক দেয়। ১৯৪৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে বলা হয়, অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য জনগণ কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে চায়। পার্টি ১৯৪৯-এর ৯মার্চ রেল ধর্মঘট ডাকে। তা সফল হয়নি। পার্টির সরকার বিরোধী লড়াইয়ের ফলে বেশ কয়েকটি রাজ্যে সি.পি.আই-কে নিষিদ্ধ করা হয়। পার্টির শক্তিও কমতে থাকে; নব্বই হাজার থেকে সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়ায় আঠারো হাজারে।

১৯৫১ সালের শেষ দিকে অজয় ঘোষের নেতৃত্বে স্তালিনের নির্দেশনায় নতুন এক কর্মসূচী ও কৌশলগত অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে পার্টি সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। বলা হয়, ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলগতভাবে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী। অতএব বামপন্থীদের কর্তব্য হল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের পতন ঘাটানো।

এই মনোভাব মুলতুবি রেখে সি.পি.আই ১৯৫২তে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ৬১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মোট প্রদত্ত ভোটের ৪.৬% পেয়ে ২৩টি আসন জিতে তারা লোকসভায় বৃহত্তম বিরোধী দলের তকমা পায়।

সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রবেশ করার পর সি.পি.আই তার নীতিগত অবস্থানও পুনর্বিবেচনা করতে থাকে। যেমন ১৯৫৩ সালের মাদুরাই কংগ্রেস পার্টি স্বীকার করে যে ভারত সরকার স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে চলেছে যদিও অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে তা এখনও স্বাধীন নয়। এরপরে ১৯৫৬ সালে পার্টির পালঘাট কংগ্রেসে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব স্বীকার করেন যে ভারত ১৯৪৭ সালে সত্যিই স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং আলোচ্য সময়ে তা প্রকৃতই এক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের রূপ পেয়েছে। এই পর্যায়ে পার্টির বক্তব্য ছিল, সরকারের নীতিগুলো পুঁজিবাদের পক্ষে, তা জনবিরোধী, কাজেই মূলগত বিচারে এই সরকার প্রতিক্রিয়াশীল। তাই পার্টির লক্ষ্য হল কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে এক গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলা। ১৯৫৭র নির্বাচনে পার্টি আরও ভাল ফল করল, ৮.৯২% ভোট পেয়ে ২৭টি আসন জিতল। কেরালায় ক্ষমতায় এল।

১৯৫৮ সালের অমৃতসর কংগ্রেসে পার্টি ঘোষণা করে শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছোনো সম্ভব। পার্টি বলে, তারা ক্ষমতায় এলে পূর্ণ পৌর অধিকার বহাল করবে। সংসদীয় পথে সমাজতান্ত্রিক সরকার আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতার অধিকারও বিরোধীপক্ষের থাকবে। ১৯৬১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিজওয়াড়া কংগ্রেসে কংগ্রেসের সঙ্গে যুগপৎ সংগ্রাম এবং ঐক্যের নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হয়, পার্টি কংগ্রেসের প্রগতিশীল নীতিগুলিকে সমর্থন করবে। আশা ছিল, এর ফলে কংগ্রেস প্রগতি-প্রতিক্রিয়া দুই শিবিরে ভেঙে যাবে, তখন পার্টি প্রগতি শিবিরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে। ১৯৬২তে পার্টি নির্বাচনে তার সাফল্য আরও বাড়িয়েছিল, এবার ৯.৯৪% ভোট পেয়ে সি.পি.আই লোকসভায় ২৯টি আসন পেল। ইতিমধ্যে কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে পার্টি যথেষ্ট সমর্থন লাভ করেছিল।

তবে পার্টির মধ্যে মতানৈক্য বাড়ছিল। বিরোধের বিষয়ের মধ্যে ছিল স্তালিন সম্পর্কে সোভিয়েত মূল্যায়ন, রুশ-চীন বিরোধ এবং ১৯৬২র ভারত-চীন যুদ্ধ। ১৯৬২র এই ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 'মডারেট' বনাম 'র‍্যাডিকাল'-দের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে সি.পি.আই

দু'টুকরো হয়ে যায়। আগেকার 'দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী' প্রবণতা-যুক্ত অংশটি সি.পি.আই নামে পরিচিত হয়। আর আগেকার 'বামপন্থী' প্রবণতা যুক্ত অংশটি অল্পকাল পরে পরিচিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি.পি.আই (এম) নামে।

বামপন্থী আন্দোলনের একটা ধারা যদি হয় কমিউনিস্ট পার্টি-কেন্দ্রিক, তবে অন্য ধারা ছিল সোশালিস্ট পার্টি-কেন্দ্রিক। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালের মার্চে সোশালিস্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঘোষণা করে তাদের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আসলে কংগ্রেস ১৯৪৮-এর গোড়ায় নিয়ম চালু করে যে নিজস্ব সংবিধান ও নিয়মকানুন-যুক্ত অন্য কোনও পার্টির সদস্য, কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবে না। স্বভাবতই সোশালিস্টরা তাদের নিজেদের পার্টি তুলে দিতে রাজি হয়নি। তারা মনে করছিল, কংগ্রেস একটি দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হয়েছে।

সোশালিস্টদের কংগ্রেস ত্যাগ কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের রীতিমতো দুর্বল করে দেয়। এর ফলে নেহরু তাঁর নিজের পার্টির মধ্যেই রক্ষণশীল শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যান। অন্যদিকে সোশালিস্টরা যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারল-এমনও নয়। ১৯৫২র নির্বাচনে সোশালিস্টরা বিশেষ সাফল্য পায়নি। তারা বহু আসনে দাঁড়িয়ে মাত্র ১২টি আসন লাভ করে যদিও প্রাপ্ত ভোট ছিল প্রদত্ত ভোটের ১০.৬%।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে সোশালিস্ট পার্টি এবং জে. বি. কৃপালনির নেতৃত্বাধীন মজদুর প্রজা পার্টি এক হয়ে গিয়ে তৈরী হয় প্রজা সোশালিস্ট পার্টি। এর সভাপতি হন কৃপালনি, সম্পাদক অশোক মেহ্‌তা। প্রথম থেকেই মতাদর্শগত বিরোধ আর গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার হয়ে পড়ে এই পার্টি।

একদিকে অশোক মেহ্‌তা গোষ্ঠী ছিলেন শাসক দলের সঙ্গে সহযোগিতামূলক নীতি গ্রহণের পক্ষে আর অন্যদিকে রামমনোহর লোহিয়া গোষ্ঠী ছিলেন কংগ্রেস বিরোধিতায় দৃঢ়সংকল্প। লোহিয়া পন্থীরা কংগ্রেস কমিউনিস্ট উভয়ের থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। ১৯৫৩য় পার্টি তার বেতাল অধিবেশনে লোহিয়াপন্থী নীতি গ্রহণ করে। তবে অন্তর্বিরোধ কমেনি। ১৯৫৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে ভূদান প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে জীবন উৎসর্গ করার কথা বলেন। ১৯৫৫র শেষাশেষি লোহিয়া ও তাঁর অনুগামীরা পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে নতুন সোশালিস্ট পার্টি গঠন করেন। এই পার্টি ছিল রাজনৈতিকভাবে জঙ্গি ধরনের। বিক্ষোভ, আইন অমান্য আন্দোলন, রাজ্য বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে এসে তার কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা--এইসব নিয়মিত চালিয়ে যেতেন তাঁরা। এরা ছিলেন কংগ্রেস এবং নেহরু বিরোধী। এদের দাবি ছিলঃ যোগাযোগ-ভাষা হিসেবে হিন্দী চালু করা এবং পিছিয়ে-থাকা জাতি, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য ৬০% চাকরি সংরক্ষণ করা।

১৯৫৬ সালে আচার্য নরেন্দ্র দেব মারা যান। ১৯৫৭র নির্বাচনে প্রজা সোশালিস্ট পার্টি প্রদত্ত ভোটের ১০.৪% পেয়ে লোকসভায় ১৯টি আসন পায়। ১৯৫৭ সালের এই সাধারণ নির্বাচনের পর জয়প্রকাশ নারায়ণ রাজনীতি ছেড়ে দেন। বলেন, দলীয় রাজনীতি ভারতের পক্ষে উপযোগী নয়। তার বদলে 'দলবিহীন গণতন্ত্র'-র পথে চলাই ভাল। ১৯৬০ সালে কৃপালনি পার্টি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ১৯৬২র নির্বাচনে প্রজা সোশালিস্ট পার্টি ৬.৮% ভোট পেয়ে ১২টি আসন পায়। ১৯৬৩ সালে অশোক মেহ্‌তা পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হতে রাজি হয়ে যান। পার্টি যখন তাঁকে বহিষ্কার করে তখন ১৯৬৪তে তিনি কংগ্রেসে ফিরে যান। বহু সোশালিস্ট কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেন।

আসলে কংগ্রেসের সঙ্গে সোশালিস্টদের মতাদর্শগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না। উভয়েই ছিল জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদীয় গণতন্ত্র, পৌর অধিকার ভিত্তিক রাষ্ট্রসমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। কংগ্রেস আবাদি প্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের দায়বদ্ধতা ঘোষণা করার পর থেকে সোশালিস্টদের সঙ্গে তাদের আর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কংগ্রেসের এই ঘোষণার ফলে সোশালিস্টরা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস যখন তার ক্ষমতা সংহত করছিল তখন বামপন্থীদের অন্তর্বিরোধ সামগ্রিকভাবে দেশের বামপন্থী আন্দোলনকে দুর্বল করছিল। 'নেহরু যুগ'-এ (১৯৪৭-১৯৬৪) বামপন্থী আন্দোলন মূলত নানান ভাঙনের সাক্ষী। তবে এটাও সত্যি, আদর্শ হিসেবে বামপন্থা, ভারতীয় জনসাধারণের একাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে এই সময়ে।

৭.৬.১২.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) সুমিত সরকার, Modern India

(বঙ্গানুবাদ ঃ আধুনিক ভারত, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী)

(২) বিপান চন্দ্র এবং অন্যান্য, India's Struggle for Independence

(বঙ্গানুবাদ ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী)

(৩) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, From Plassey to Partition

(বঙ্গানুবাদ ঃ পলাশি থেকে পার্টিশান, ওরিয়েন্ট লংম্যান)

(৪) বিপান চন্দ্র এবং অন্যান্য, India After Independece

(বঙ্গানুবাদ ঃ ভারতবর্ষ-স্বাধীনতার পরে, আনন্দ)

(৫) K.N. Panikkar, National and Left Movements in India

(৬) Gautam Chattopadhyay, Communism and Bengal's Freedom Movement.

(৭) রজনী পাম দত্ত, India Today

(বঙ্গানুবাদ ঃ আজিকার ভারত)

(৮) Sudhi Pradhan, Marxist Cultural Movement in India

(৯) Girija Shankar, Socialist Trends in Indian National Movement

(১০) Suniti Kumar Ghosh, India and the Raj

৭.৬.১২.১০ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতে বামপন্থী আন্দোলন বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান কর।

(২) ভারতের বামপন্থী আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

(৩) ভারতের বামপন্থী রাজনীতিতে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির ভূমিকাকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

(৪) শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা কি ছিল?

(৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের অবদানের মূল্যায়ন কর।

(৬) আন্তর্জাতিক বামপন্থী রাজনীতির প্রেক্ষিতে ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের নীতি নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা কর।

(৭) স্বাধীনতা-পরবর্তী বামপন্থী আন্দোলনের মূল ধারাগুলো ব্যাখ্যা কর।

আইন অমান্য আন্দোলন
ও
ভারত ছাড়ো আন্দোলন

গঠন (Structure) :

৭.৬.১২.৩.০ : উদ্দেশ্য

৭.৬.১২.৩.১ : আইন অমান্য আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট

৭.৬.১২.৩.২ : গান্ধী-আরউইন চুক্তি

৭.৬.১২.৩.৩ : আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

৭.৬.১২.৩.৪ : ভারত ছাড়ো আন্দোলন

৭.৬.১২..৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৬.১২.৩.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৬.১২.৩.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

(২) গান্ধী-আরউইন চুক্তি

(৩) আইন অমান্য আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

(৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

(৫) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপ্তি

(৬) এই আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা

৭.৬.১২.৩.১ : আইন অমান্য আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট

আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমিকা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। ১৯২০-র দশক থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ১৯৩০ এর মধ্যেই তা মর্মান্তিক অবস্থা গ্রহণ করে। বৃটিশ সরকারের আমদানি নীতি, শুল্কনীতি কোন কিছুই ভারতীয় শিল্পপতিদের পছন্দ ছিল না। এমনকি পাউন্ডের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করার জন্যেও তারা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিও ভারতবাসীর দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে নতুনভাবে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত দেওয়ার সময়েই রাজস্বের হারও যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এজন্য পশ্চিমভারতে কৃষকদের অবস্থার অবনতি হয়। তাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ে। অন্ধ্রের গোদাবরী জেলায় আল্লুবি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে রম্পা উপজাতি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও ভূমিবন্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিদ্রোহ করেন। পুলিশ বিদ্রোহীদের নির্বিচারে হত্যা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পমালিকেরা মাল বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা বাড়ালেও শ্রমিকদের কোন মজুরি বাড়েনি। তাদের কোনও আর্থিক নিরাপত্তাও ছিল না। ১৯২৪ খ্রীঃ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে বোনাসের দাবীতে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করলে সরকার বস্ত্রশিল্পের ওপর $৩\frac{১}{২}\%$ শুল্ক হ্রাস করলে মালিকরা সেই অর্থ শ্রমিকদের বোনাস হিসেবে দেয়। ১৯২৮ খ্রীঃ গিরণী কামগার ইউনিয়নের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে টানা ছয় মাস ধর্মঘট চলে। ধর্মঘট চলাকালীন ১৮৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সরকার এই ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করার জন্য কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতাদের দমনের উদ্দেশ্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২৯ খ্রীঃ বহু নেতাকে দণ্ডিত করেন। সরকার যাতে বাড়তি শুল্ক রদ করেন তার জন্য বারদৌলীতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বারদৌলী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রীঃ পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দাতে ভারতীয়রা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভারতের মধ্যবিত্ত কৃষক ও শ্রমিকের দুর্দশার সীমা ছিল না। ১৯২৯-৩০ খ্রীঃ আর্থিক মন্দায় ধানের দাম শতকরা ১০০ ভাগ থেকে শতকরা ৪৬.৯ ভাগে নেমে যায়। পাটের দামও শতকরা ১০০ ভাগ থেকে শতকরা ৪৩.৫ ভাগে নেমে আসে। এর ফলে কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা বেড়েই চলে। মন্দার দরুন কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়। ভূমিহীন মজুররা বেকার হয়ে পড়ে। সরকার ভারতীয়দের এই দুর্দশার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে হোমচার্জ, ভারতে মূলধন লগ্নীর মুনাফা, ব্যাঙ্কের মুনাফা, রয়্যালটি প্রভৃতি খাতে পাওয়া প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ ভারত থেকে নিজদেশে নিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি বাজেটে ঘাটতি দেখা গেলে তাও আদায় করা হত ভারতবাসীর

ওপর দিয়েই। বৃটিশ সরকারের এই শোষণ নীতি ও ভারতবাসীর আর্থিক দুর্দশার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়।

এই পরিস্থিতিতে ভারতবাসী স্বায়ত্ব শাসন পেতে পারে কিন্তু সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন নিযুক্ত করেন। সাইমন কমিশনই ভারতীয়দের স্বদেশীবোধকে জাগ্রত করে। প্রথমত কোন ভারতীয় এই কমিশনের সদস্য ছিল না। তাই কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলগুলি আশঙ্কা করে যে কমিশনের রায় কখনো পুরোপুরি ভারতীয়দের অনুকূলে যাবে না। দ্বিতীয়ত কোন ভারতীয় এই কমিশনের সদস্য না হওয়ায় শিক্ষিত ভারতীয়দের অপমান করা হয়। তৃতীয়ত ভারতবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবী জানিয়ে আসছিল। ইংলন্ডের রক্ষণশীল সরকার এই দাবী পূরণের পূর্বে সাইমন কমিশন দিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করে যে ভারতীয়রা স্বায়ত্ত্বশাসন লাভের যোগ্য কিনা। ফলে ভারতীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সকল দলই সাইমন কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের সর্বত্র সাইমন কমিশনকে 'go back' ধ্বনি দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন প্রধানত ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়। এই উপলক্ষ্যে ভারতের বামপন্থী ছাত্র স্টুডেন্টস ফেডারেশনের জন্ম হয়। গান্ধীজি বুঝতে পারেন অবিলম্বে কোন বৃহত্তর আন্দোলন শুরু না করলে আপোষ বিরোধী যুবক নেতারা (জহরলাল, সুভাষ প্রভৃতি) ও কিষাণ ও শ্রমিক নেতারা হয়ত কংগ্রেস ছেড়ে স্বাধীনভাবে আন্দোলন শুরু করবেন। যদি এই নেতারা আন্দোলন শুরু করে তাহলে তা অহিংসপন্থী নাও হতে পারে। এবং এই যুবকনেতারা আন্দোলনে না থাকলে আন্দোলন বিশেষত কংগ্রেসীদের আন্দোলন একেবারেই অক্ষম প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হবে।

ভারতীয়রা এই সময় সংবিধান রচনার উদ্যোগ নিলে ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল দলের ভারতসচিব লর্ড বাকেনহেড ভারতবাসীদের এই উদ্যোগ নস্যাৎ করে দেন। কিন্তু ভারতীয়রা তার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অপমানজনক আখ্যা দেন। মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর উদ্যোগে ও মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে গঠিত একটি সর্বদলীয় কমিটি একটি খসড়া সংবিধান রচনার ভার নেন। ১৯২৮ খ্রীঃ নেহেরু রিপোর্ট বা সংবিধান তৈরী হয়। ডোমিনিয়ান স্টেটাস অর্থাৎ বৃটিশ ডোমিনিয়ান বা সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে ভারতবাসীর নিজস্ব সাংবিধানিক স্বায়ত্ব শাসন লাভকেই সংবিধানের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়। মুসলিমরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করে। শুধু যে প্রদেশে তারা সংখ্যালঘু আইনসভায় তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সিন্ধুপ্রদেশকে পাঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাব রাখা হয়।

১৯২৮ খ্রীঃ কলকাতায় যে সর্বদলীয় সম্মেলন শুরু হয় তাতে নেহেরু রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণের জন্য আলোচনা আরম্ভ হলে মহম্মদ আলি জিন্নাহ সেই সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১/৩ আসন সংরক্ষণ বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিমদের সংখ্যার ভিত্তিতে আসনবন্টন, সিন্ধুপ্রদেশ গঠনের জন্য দাবী উত্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি কেন্দ্রের ক্ষমতা কমিয়ে প্রদেশের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্যও নতুন দাবী পেশ করেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভাপন্থী এম.আর. জয়াকর জিন্নাহর এই দাবী বিরোধিতা করেন। ফলে নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হয়নি। জিন্নাহ এবার কট্টর লীগপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেন।

১৯২৮ খ্রীঃ সর্বদলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হয়। এরপর জাতীয় কংগ্রেস ডোমিনিয়ান স্টেটাস দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। কংগ্রেসের মডারেট নেতারা অবশ্য তখনও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেননি। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যুব বাম শক্তির উদ্ভব হয়েছিল। তাই কংগ্রেসের ভেতরও অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কেও মতভেদ দেখা দেয়। সুভাষ ও নেহেরু পূর্ণ স্বরাজকেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। মুসলিম নেতারাও অবশ্য পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবেননি। কিন্তু ১৯২৮ খ্রীঃ কানপুরে সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে মুসলিম নারীরা পর্দার ভেতর থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানালে মুসলিম পুরুষরাও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান। ১৯২৮ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে ১০ হাজার শ্রমিক শোভাযাত্রা করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান। মহাত্মা গান্ধীও এই ধরনের পরিস্থিতিতে হতচকিত হয়ে যান। তার মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে যদি একবছরের মধ্যে বৃটিশ সরকার নেহেরু রিপোর্ট অনুযায়ী ডোমিনিয়ান স্টেটাস ভারতবাসীকে দেন তবে কংগ্রেস তা গ্রহণ করবে নচেৎ কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গ্রহণ করবে। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীঃ বিপ্লবী ভগৎ সিং ও অন্যান্য রাজবন্দীরা জেলে রাজবন্দীদের প্রতি কদর্য ব্যবহারের প্রতিবাদে আন্দোলন আরম্ভ করলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা জনসমাজে আলোড়ন তোলে। শেষ পর্যন্ত ভগৎ সিং অনশন ত্যাগ করলেও বিপ্লবী যতীন দাশ ৬৩ দিন অনশনে থেকে লাহোর জেলে প্রাণত্যাগ করলে সারা ভারতের যুবসমাজ উদ্বেল হয়ে ওঠে।

বড়লাট লর্ড আরউইন অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ১৯২৯ খ্রীঃ ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণার দ্বারা ভারতকে ডোমিনিয়ান স্টেটাস দানের প্রতিশ্রুতি দিলে সাধারণ মানুষ গভীর আশায় বুক বাধেন। কিন্তু বিলাতের পার্লামেন্টে রক্ষণশীল দল এজন্য বড়লাটের তীব্র সমালোচনা করায় লর্ড আরউইন তার প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গেন। ডোমিনিয়ান স্টেটাস দানের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষিত একবছরের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে এবং সরকার কোন সংস্কার দান না করায় কংগ্রেসের পক্ষে ১৯২৯ খ্রীঃ সক্রিয় আন্দোলনে নেমে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। এদিকে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে লালা লাজপৎ রায় লাঠির আঘাতে আহত হন। সারা দেশে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য কংগ্রেসের রক্ষণশীলরাও পূর্ণস্বরাজের পক্ষে সওয়াল শুরু করেন। ১৯২৯ খ্রীঃ লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ দাবীকেই কংগ্রেস আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। জওহরলাল লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি রূপে নির্বাচিত হন। আন্দোলন পরিচালনার কর্মসূচী রচনার দায়িত্ব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই কমিটিতে অবশ্য সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গৃহীত হলে কংগ্রেস গণ আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯২৯ খ্রীঃ ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কংগ্রেস সভাপতি ইরাবতী তীরে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে আন্দোলনের সূচনা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার প্রাথমিক বাধাবিপত্তি পার হয়ে পূর্ণস্বরাজের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজির নির্দেশেই ২৬শে জানুয়ারী দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ থেকে যতদিন না স্বাধীনতা লাভ হয় ২৬শে জানুয়ারী জাতি তা উচ্চারণ করে শপথ নেয়।

মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য সরকারী আইনগুলিকে অহিংসভাবে ভেঙে ফেলার জন্য জনগণকে ডাক দেন। তবে আইন অমান্য সম্পর্কে কোন নেতারই কোন ধারণা ছিল না। গান্ধীজি সাধারণকে সম্যক ধারণা দেবার জন্যই লবণ তৈরী করে আইন অমান্য করেন। লবণ আইন ভঙ্গ ছিল একটি প্রতীকি আন্দোলন মাত্র। কারণ লবণের জন্য বৃটিশ সরকারকে কর দিতে হত। অথচ শতকরা ৭০ ভাগ কৃষকই এত দরিদ্র যে, তারা শুধুমাত্র লবণ দিয়েই ভাত খায়। লবণ আইন ভেঙ্গে দেশের মাটি ও জল থেকে লবণ ছেঁকে লবণ তৈরী করলে সাধারণ দেশবাসীর সাড়া পাওয়া যাবে বলে গান্ধীজি বুঝেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে দুই শত মাইল পদযাত্রা করে গুজরাটের ডান্ডি নামক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য যাত্রা করেন। এই ঘটনাকে 'ডান্ডি অভিযান' বলা হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ ৬ ই এপ্রিল ডান্ডিতে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন।

মহাত্মা শীর্ণ শরীরে সন্ত-সুলভ আচরণে ভারতীয় কৃষকদের প্রতিনিধি হিসেবে অর্ধনগ্ন গাত্রে লাঠির ওপর ভর করে ডান্ডি পর্যন্ত যে যাত্রা করেন তা ভারতের আপামর জনসাধারণকে আলোড়িত করে। গান্ধীজি চরকায় সূতা কাটা ও বিলিতী মালের দোকানে পিকেটিংয়ে যোগ দিতে বলেন। মহিলারা দলে দলে এগিয়ে আসেন ও কারাবরণ করেন। গান্ধীজি গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রায়তওয়ারি এলাকায় সরকারী খাজনা বন্ধ ও জমিদারী এলাকায় খাজনা ও চৌকিদারী কর প্রদান রদ ঘোষণা করে। মধ্যপ্রদেশে অরণ্য আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

গান্ধীজির গ্রেপ্তারের পর আইন অমান্য আন্দোলন আসমুদ্র হিমাচল ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় বিলাতী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং চলে। গান্ধীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় লবণ আইন আন্দোলন। তামিলনাড়ুতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। মালাবারে লবণ আইন পরিচালনা করতে এগিয়ে আসেন কে. কোলাপ্পান। আসামের শ্রীহট্ট থেকে সত্যাগ্রহীরা পায়ে হেঁটে বাংলার নোয়াখালির সমুদ্রোপকূলের কাছে লবণ আইন অমান্য করেন। অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে লবণ সত্যাগ্রহ করা হয়। লবণ আইন অমান্য করার জন্য ১৪ই এপ্রিল জহরলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবাদে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নিষিদ্ধ পুস্তক প্রকাশ্যে পাঠ করে আইনভঙ্গ করেন। মহিষবাথানে লবণ আইন অমান্য করা হয়।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারে সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আবদুল গফফর খান ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে যোগদানের পর গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ও প্রতিষ্ঠা করেন খোদাই খিদমদগার বা লালকুর্তা। এই সংগঠনটি অহিংস আন্দোলনে যোগ দেয়। এদের কার্যকলাপে পেশোয়ার এক সপ্তাহের বেশি সময়কাল পর্যন্ত জনতার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। শঙ্কিত বৃটিশ সরকার সীমান্তগান্ধীকে গ্রেপ্তার করলে পেশোয়ারে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। রয়্যাল গাড়োয়াল রাইফেলের দুদল পদাতিক সৈন্যদের যখন হুকুম দেওয়া হয় খোদাই খিদমদগারদের ওপর গুলি চালাতে তখন তারা গুলি না করে সীমান্ত গান্ধীর অনুচরদের সঙ্গে মিশে যান। পরে এই কাজের জন্য অধিকাংশ সেনাকে গুলি করা হয়। নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়।

দিল্লীতে প্রায় দেড় হাজার নরনারী কারাবরণ করেন। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা, পূর্ববাংলার কিশোরগঞ্জ, বেরারে কৃষকরা খাজনা প্রদানে বিরত থাকেন।

মহাত্মা গান্ধী এরপর মনস্থ করেন যে ২৮শে এপ্রিল সরকারি লবণগোলা দখলের জন্য ধারসানায় অহিংস অভিযান করবেন। এই সত্যাগ্রহ বন্ধ করার জন্য লর্ড আরউইন গান্ধীকে ৫ই মে গ্রেপ্তার করেন। এরপর ধারসানায় নেতৃত্ব দেন শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু। গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হলে মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে ক্রুদ্ধ জনতা, থানা, আদালত, সরকারী ভবনে অগ্নিসংযোগ ঘটায়। কয়েকদিনের জন্য শোলাপুর কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের অধীনে চলে যায়।

কলকাতা, মেদিনীপুর, হুগলী, বালুরঘাট, বিক্রমপুরে ব্যাপক পিকেটিং চলে। চৌকিদার, দফাদার ও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করলে তাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। সুতাহাটার কুমারচন্দ্র দাস, বর্ধমানে যাদবেন্দ্র পাঁজা, আরামবাগে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন অহিংস উপায়ে আন্দোলন পরিচালনা করেন। প্রফুল্ল সেন আরামবাগের গান্ধী নামে সুখ্যাত হন। উত্তরপ্রদেশে খাজনা পীড়িত কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাজনা বন্ধ ও আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। আগ্রা ও রায়বেরিলীতে খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলে। বিহারের চম্পারণ, সারণ, মুঙ্গেরে বিলাতী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং চলে। উড়িষ্যায় গোপবন্ধু চৌধুরীর পরিচালনায় বালাসোর, কটক ও পুরী জেলায় লবণ সত্যাগ্রহ খুবই কার্যকর হয়।

৭.৬.১২.৩.২ : গান্ধী-আরউইন চুক্তি

১৯৩০ খ্রীঃ মধ্যভাগে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পাবার পর ইংরেজ সরকার ভারতের শাসনসংস্কার আলোচনার জন্য প্রথম গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে অংশ নিলেও কংগ্রেস তা বয়কট করে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া ভারতবর্ষ সম্পর্কিত কোন আলোচনা সফল হবে না বুঝে পরবর্তী বৈঠকে যাতে কংগ্রেস যোগদান করে সেজন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভাইসরয় লর্ড আরউইন গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী হন। এমতাবস্থায় প্রথম গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে তেজবাহাদুর সাপ্রু, জয়াকর প্রমুখ নেতারা গান্ধীজিকে বোঝান যে গোলটেবিল বৈঠকেই অংশ নিলে সুফল মিলবে। দিল্লীতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ পর্যন্ত গান্ধীজির সঙ্গে ভাইসরয়ের আলোচনা চলে। ৫ই মার্চ স্বাক্ষরিত হয় গান্ধী-আরউইন চুক্তি। এতে বলা হয় (১) কংগ্রেস আপাততঃ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবে। (২) এছাড়াও কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকেও যোগদান করবে। (৩) সরকার আইন অমান্যকারী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে সম্মত হয়। (৪) লবণ সত্যাগ্রহকে আইনসঙ্গত বলে সরকার মেনে নেয়। (৫) যে সব জরিমানা তখনও আদায় হয়নি সেগুলি মুকুব করতে হবে। (৬) বাজেয়াপ্ত করা জমি যা তখনও বিক্রি হয়নি সেগুলি ফেরত দিতে হবে। (৭) পদচ্যুত সরকারী কর্মীদের প্রতি ক্ষমাশীল মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। (৮) শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করার অধিকারও সরকার অনুমোদন করে।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি দেশে বিজাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব কার্যকর না হওয়া এবং বিপ্লবী ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেওর মৃত্যুর আদেশ ও কংগ্রেসের এই পশ্চাদপসারণে জনসাধারণ, বিশেষত; যুবসম্প্রদায়, গান্ধীজির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। এই চুক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতা, ভারতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতার নিদর্শন এবং গান্ধীর নতিস্বীকারের প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষোভ এতই তীব্র ছিল যে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে যাওয়ার পথে গান্ধীজিকে কালো পতাকা দেখানো হয়।

গান্ধীজির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন— এই আন্দোলনের তিনটি দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ ১৯৩০ এর শরৎকালের পর শহরাঞ্চলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। যদিও তা গ্রামাঞ্চলে প্রবল হয়। দ্বিতীয়তঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বাইরে মুসলিমরা কখনই আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তৃতীয়তঃ ১৯২৭ ও ১৯২৮-এ শ্রমিক আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করলেও ঠিক আন্দোলনের সময় ১৯৩০-৩১ তা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। অধ্যাপক বিপানচন্দ্র মনে করেন গান্ধী- আরউইন চুক্তির আগেই আন্দোলনে ভাঁটার টান দেখা যাচ্ছিল। সরকারের দমননীতি এর জন্য কিছুটা দায়ী। বণিক এবং শিল্পপতিরাও আন্দোলনের বিপক্ষে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল বৃটিশ সরকার তা উপেক্ষা করতে পারেনি। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যে ভারতের শাসনসংস্কার সম্পর্কে কোন রকম আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না, গান্ধী-আরউইন চুক্তির মাধ্যমে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এতে কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। জেল ফেরৎ রাজবন্দীরা বীরের স্বীকৃতি লাভ করে। উত্তর প্রদেশের কৃষকদের বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করে খাজনা দানের নির্দেশ পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পশ্চাদপসারণ বলা যেতে পারে। কিন্তু অমলেশ

ত্রিপাঠীর মতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে গান্ধীজি এ বিষয়ে কোনও জেদ করেননি। আইন অমান্য অন্দোলন চলাকালে গুজরাটে সত্যাগ্রহীদের যেসব জমি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল কংগ্রেস সরকার ১৯৩৭ সালে সে রাজ্যে সরকার গঠনের পর সেগুলি প্রত্যর্পণের নির্দেশ দেয়। সবমিলিয়ে অধ্যাপক ত্রিপাঠীর মতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দিলে কংগ্রেস জাতীয় ভূমিকা পালন করত না। বৈঠক প্রত্যাখ্যান করলে ভারত বৈদেশিক সহানুভূতি হারাত।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি। সরোজিনী নাইডু ভারতীয় নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। গোলটেবিল বৈঠকে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন বৃহৎ ভূস্বামী, রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি ও সরকারের অনুগত সম্প্রদায়। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ বৈঠকে গান্ধী দাবী করেন যে কেন্দ্র ও প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে দায়িত্বশীল সরকার। এক্ষেত্রে ইংরেজ সরকার কোন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কিন্তু বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তীব্র আকার নেয়। 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো' ও 'সংখ্যালঘু' সমস্যা বিষয় দুটিকে কেন্দ্র করে প্রতিনিধিদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা যায়। মুসলিমরা হিন্দু প্রাধান্যের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা ডোমিনিয়ান স্টেটাসের দাবীও অস্বীকার করে। গান্ধীজি চেষ্টা করেও সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। এহেন অবস্থায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের যে প্রস্তাব দেন সদস্যরা তা মানতে অস্বীকার করেন। গোলটেবিল বৈঠক কার্যত ব্যর্থ হয়। গান্ধীজি শূন্য হাতে দেশে ফেরেন।

ইতিমধ্যে লর্ড উইলিংডন ভারতের পরবর্ত্তী ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন (১৯৩১-৩৬)। বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দমনমূলক অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে নিতে ১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর গান্ধীজি ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করেন। কিন্তু সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন হয় না । কংগ্রেস নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। গান্ধীজি ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে, সরকার দমন নীতি পরিহার করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর জন্য কংগ্রেসকে যদি আলোচনার সুযোগ দেয় এবং স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে তবেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। অন্যথা কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য এবং খাজনা বন্ধ আন্দোলনও শুরু করবে। এইভাবে ১৯৩১ এর ২৯ শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৩২ এর ৩ রা জানুয়ারী পর্যন্ত গান্ধীজি ও ভাইসরয় পত্রালাপ চলে। ৪ঠা জানুয়ারী সরকার চারটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারী করে। গান্ধীজিসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি ও গুলি চালনা করা হয়। জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনাও কম ঘটেনি। ১৯৩২ থেকেই ভারতে ভয়ংকর সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য অন্দোলন শুরু হওয়ার চার মাসের মধ্যেই ৮০,০০০ ব্যক্তির কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ এর মার্চ মাসের শেষে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,২০,০০০। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সাহায্য গ্রহণ করে সরকার আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা করেন। ১৯৩২ সালে 'সাম্প্রদায়িক পুণা চুক্তি বাঁটোয়ারার প্রস্তাব' ঘোষণার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের মধ্যে ভেদ টানার চেষ্টা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, মুসলিম, শিখ এবং ইউরোপীয় নির্বাচকরা আইনসভার নির্বাচনে সম্প্রদায়গতভাবে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করবে এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ভোট দেবে। অনুন্নত সংরক্ষিত আসনে কেবল মুসলিম নির্বাচকরাই নির্বাচিত হবে। শিখদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুরা সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী হতে এবং অন্যান্য ভোটারদের মত ভোট দিতে পারবে। যে সব অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে। এই সমস্ত সংরক্ষিত কেন্দ্রে অনুন্নত শ্রেণীর প্রার্থীরা কেবল তাদের সম্প্রদায় নির্বাচকদের ভোটে নির্বাচিত হবে। এই নির্বাচকরা সংরক্ষিত কেন্দ্রে ভোটদানের যেমন অধিকারী সেরকম সাধারণ কেন্দ্রের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ কিনা তারা দুবার ভোট দিতে পারবে।

গান্ধীজি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ স্বরূপ ইয়ারওয়াদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত দলিত নেতা বি.আর. আম্বেদকর জেলে তার সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনার ফলে উভয় নেতার মধ্যে পুণা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন। হিন্দুদের একত্রে বেঁধে ফেলার নীতি গৃহীত হলেও তপশীলি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধাগুলি এই চুক্তিতে দ্বিগুনিত হয়।

১৯৩৩ সালের মে মাসে গান্ধীজি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর আগে তিনি জেলের ভেতর হরিজনদের মঙ্গলের জন্য অনশনও করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে তিনি গণ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। গান্ধীজি স্বয়ং ঐ বছরের ১লা আগস্ট অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ১৬ই আগস্ট সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। ১৬ ই আগস্ট গান্ধীজি অনশন শুরু করেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২৩শে আগস্ট তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৩৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী কারাবরণ করেন। সক্রিয় রাজনীতি থেকে এই সময় অবসর নিয়ে গান্ধীজি হরিজন উন্নয়ন ও সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিহারে ব্যাপক ভূমিকম্পের (জানুয়ারী ১৯৩৪) পরিপ্রেক্ষিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ মে মাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। গান্ধীজি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি দলের বাইরে থাকলেও তার উপদেশ থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি কংগ্রেস দল।

৭.৬.১২.৩.৩ : আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

আইন অমান্য আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয়েছিল এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বি. আর টমলিনসন মনে করেন যে কংগ্রেস নৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়েই আন্দোলন পরিচালনার উপযুক্ত ছিল না। জুডিথ ব্রাউনের মতে কংগ্রেস কোন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী ছাড়াই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিল। গান্ধীজি নিজেই কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের আগে গান্ধীজি বলেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন সত্যাগ্রহী জীবিত থাকবেন ততদিন আইন অমান্য চলবে। অমলেশ ত্রিপাঠী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—কিন্তু দেখা গেল সৈনিকরা সংগ্রাম চালাতে প্রস্তুত অথচ সেনানায়ক যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। সুমিত সরকার লিখেছেন গান্ধীর মনোভাবে কেন যে পরিবর্তন হল তা এক ঐতিহাসিক প্রহেলিকা।

অসহযোগ আন্দোলন জাতীয়তাবাদে অভিষিক্ত থাকলেও আইন অমান্য আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা পায়নি। মুসলিম সম্প্রদায় ও কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। মালব্য সর্বদলীয় সভার পক্ষপাতী ছিলেন। অ্যানি বেশান্ত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

অবশ্য সরকারের দমননীতি এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়। বহু সংখ্যক মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। কংগ্রেস বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। এমন কি খবরের কাগজে কোন রকম কংগ্রেসী প্রচার নিষিদ্ধ হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় টাকাকড়ির প্রচণ্ড টানাটানি শুরু হয়। আমেদাবাদের শিল্পপতি দেশপাণ্ডে, জোগলেকার, রণদিভে প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং গিরনি কামগার ইউনিয়নের নেতৃত্ব এই আন্দোলন থেকে দূরে সরেছিলেন। এছাড়াও সংহতির অভাব ছিল যথেষ্ট, — হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলিম ও নমঃশূদ্রদের বিরোধ এবং মালাবারে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এই আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। **গুরুত্ব** — এই আন্দোলনই সর্বপ্রথম ভারতীয়দের সমস্যার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আর সহানুভূতি আকর্ষণ করে। ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়।

এই আন্দোলন বৃটিশ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন ১৯২৯ খ্রীঃ ২৬০ লক্ষ পাউন্ডে মূল্যের কাপড় ইংল্যান্ড থেকে ভারতে রপ্তানী হত কিন্তু ১৯৩০ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ১৩৭ লক্ষ পাউন্ডে। ইংল্যান্ডে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এই অসন্তোষ থেকেই জন্ম নেয় অখিল ভারতীয় কিষাণ সভা। কৃষকরাও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে, সত্যাগ্রহীদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও গান্ধীজির প্রতি জনগণের আস্থায় ফাটল ধরেনি। কংগ্রেসও শক্তি না হারিয়ে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ফলেই ভারতীয়দের বিপ্লবী মন সুদৃঢ় হয়।

৭.৬.১২.৩.৪ : ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা বৃটিশ সরকারের ভিতকেও নড়িয়ে দিয়েছিল। স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপস্‌ের মিশন ব্যর্থ হলে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে সব রকমের সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যা ভারতবাসীর মনে প্রবল হতাশা ও নিরাশার জন্ম দেয়। অন্যদিকে ১৯৪২ খ্রীঃ প্রথম থেকেই জাপান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অগ্রসর হতে থাকে এবং তারা মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ দখল করে নেয়। এই উভয়সংকট পরিস্থিতিতে গান্ধীজির মনে হয় ভারতের হয়ে শেষ কথা বলার অধিকারী হবে ভারতীয়রাই। কিন্তু তা নিয়েও কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। জাপানী আক্রমণের মোকাবিলার জন্য ভারতবাসীর শক্তিকে কাজে লাগাতে বিশেষভাবে আহ্বান করেন জহওরলাল নেহেরু ও মৌলানা আজাদ। অন্যদিকে গান্ধীজি, সর্দার প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদ জাপানীদের স্বপক্ষে ছিলেন। এই অবস্থায় ২৯শে এপ্রিল ১৯৪২ গান্ধীজি **হরিজন** পত্রিকায় বৃটিশ সরকারকে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার উপদেশ দিয়ে হরিজন পত্রিকায় একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতিতে গান্ধীজির এই প্রস্তাবে ভারতীয় নেতাদের অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হন। তা লক্ষ্য করে গান্ধীজি প্রস্তাব দেন যে ভারতের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে বৃটিশ সেনানিবাস ও সেনাবাহিনী থাকতে পারে কিন্তু ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা চাই। আর যদি এই প্রস্তাব অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা মেনে না নেন তবে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে আরও ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

১৯৪২ খ্রীঃ ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ঐতিহাসিক **'ভারতছাড়'** প্রস্তাব অনুমোদন করল। এই প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদের অবসানের জন্য ভারতের বৃটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। এবং বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতীয় প্রতিনিধিরা সামরিক সরকার গঠন করবেন ও সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা হবে। প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার পরেই গান্ধীজি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজির আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪২ খ্রীঃ ৯ই আগস্ট আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৯৪৪ সালের ৫ই মে গান্ধীজিকে কারামুক্ত করা হলে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই আন্দোলনের শুরুতেই গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে (৯ই আগস্ট, ১৯৪২) পুণায় আটক রাখা হয়। এরপর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, নেহেরু, আজাদ, কৃপালনী ও অন্যান্য নেতারাও কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে হরতাল পালন করা হয়।

ভারত ছাড় আন্দোলন অনতিকালের মধ্যেই ব্যাপক আকার লাভ করে। প্রথমদিকে ছাত্র ও যুবসম্প্রদায় এই আন্দোলনে অংশ নিলেও পরবর্তী সময়ে বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর, দিল্লী ও জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের মানুষরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বিহারে আন্দোলনের ব্যাপকতা ও প্রকৃতি ছিল মারাত্মক। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেল লাইন উপড়ে ফেলে, ডাকঘর পুড়িয়ে সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। সরকারী কার্যালয় ও আদালতে ইউনিয়ন জ্যাক সরিয়ে ফেলে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করে। বোম্বাই, নাগপুর, কলকাতা, পাটনা প্রভৃতি শহরে কিছু স্বেচ্ছাসেবী পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। ক্রমেই গণবিক্ষোভ কংগ্রেসের অহিংস আদর্শ লঙঘন করে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় আন্দোলন এক মারাত্মক গণবিক্ষোভের রূপ নেয়। তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় গণবিক্ষোভের গভীরতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই গণবিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরা। তমলুক মহকুমায় সমস্ত সরকারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সেখানে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠার কথাও ঘোষণা করা হয়। এই সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের পরিচালিত সামরিক বাহিনী বিদ্যুৎ বাহিনী নামে পরিচিত ছিল। প্রশাসন, বিচার, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সরকারের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখ্য। বাংলার বীরভূম, ঢাকা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় আন্দোলন গণমুখী চরিত্রের রূপ নেয়। বীরভূম জেলার কয়েক হাজার সাঁওতাল আদিবাসী ও মুসলিম কৃষিজীবি রেলষ্টেশন ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলে। ১৯৪২ ও '৪৩ আগস্ট আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষের সময়ে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য।

আগস্ট আন্দোলন যে পরিমাণ ব্যাপকতা অর্জন করেছিল সেই তুলনায় তা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বহীন ও অস্ত্রবিহীন জনগণের পক্ষে বেশিদিন বৃটিশের মত এক প্রবল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে

যাওয়া সম্ভব ছিল না। সরকারী দমননীতি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হলেও আন্দোলনের চরিত্রের মধ্যেও এই ব্যর্থতা নিহিত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল ও সেগুলির মধ্যে কোন সংহতিও গড়ে ওঠেনি।

৭.৬.১২.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—পলাশী থেকে পার্টিশান

(২) অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭

(৩) সুমিত সরকার—আধুনিক ভারত

(৪) Bipan Chandra-India's Struggle For Independence

(৫) প্রবণ কুমার চট্টোপাধ্যায়—আধুনিক ভারত (দ্বিতীয় খন্ড)

৭.৬.১২.৩.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) আইন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

(২) গান্ধী আরউইন চুক্তির প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

(৩) আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কি কি?

(৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ব্যাপ্তি আলোচনা কর।

(৫) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

WORKING OF CONGRESS COMMUNAL POLITICS AND SUBHAS CHANDRA BOSE

একক - ১৩

কংগ্রেস ও অকংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলির কার্যকলাপ
Working of Congress and Non-Congress Provincial Ministries

গঠন (Structure) :

৭.৭.১৩.১.০ : উদ্দেশ্য

৭.৭.১৩.১.১ : আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা ও ভারতীয় রাজনীতিতে দিক পরিবর্তন

৭.৭.১৩.১.২ : ১৯৩৫-৩৭ ভারত শাসন আইন ও ভারতীয় রাজনীতি

৭.৭.১৩.১.৩ : ১৯৩৭'এর প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনী ফলাফল ও জাতীয় রাজনীতি

৭.৭.১৩.১.৪ : কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কার্যকলাপ

৭.৭.১৩.১.৫ : কংগ্রেসী সরকারগুলির মূল্যায়ন

৭.৭.১৩.১.৬ : অ-কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি

৭.৭.১৩.১.৭ : কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলির পদত্যাগ

৭.৭.১৩.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৭.১৩.১.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৭.১৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতির দিক পরিবর্তন।

২। ১৯৩৫-৩৭ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন ও ভারতীয় রাজনীতি।

৩। ১৯৩৭ এর প্রাদেশিক নির্বাচন এবং জাতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি।

৪। কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির কার্যকলাপ ও মূল্যায়ণ।

৫। অ-কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির কার্যকলাপ।

৭.৭.১৩.১.১ ঃ আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা ও ভারতীয় রাজনীতিতে দিক পরিবর্তন

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ থেকেই আইন অমান্য আন্দোলনের অবসানের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে যারা যথেষ্ট জঙ্গীপনা দেখিয়েছিল সেই ধনী কৃষকেরা আর গান্ধীজীর ওপর ভরসা রাখতে পারছিল না। উচ্চবর্ণের প্রতিভূ হিসাবে গান্ধীজীর সামাজিক সংস্কার আন্দোলনেও তাদের আগ্রহ ছিল না। আম্বেদকর 'এর দলিত ঘাঁটিগুলোর বাইরেও হরিজন আন্দোলন হরিজনদেরও বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। বণিক - শিল্পপতি মহলও ছিল দোদুল্যমান। বম্বে মিল মালিকেরা খোলাখুলিভাবে আন্দোলন বিরোধী, গুজরাটী ও মাড়োয়াড়ী বণিকদের মতো কট্টর গান্ধী সমর্থকরাও অর্থনৈতিক মন্দা ও ক্রমবর্ধমান হিংসার প্রাবল্যে আন্দোলনে নিরুৎসাহ। শহুরে বুদ্ধিজীবীরাও গান্ধীবাদী আদর্শে আটকে থাকতে অনীহা শ্রমিকশ্রেণী নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিল। মুসলমানেরা আন্দোলনের বৃত্তের বাইরে, বিরোধী। হাজার হাজার মানুষ কারান্তরালে। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে গান্ধীজীও ১৯৩২'এর শেষার্ধ থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এই ব্যর্থ দ্বৈরথ থেকে সম্মানজনক অপসারণের চিন্তা করছিলেন। ১৯৩৩'এর মার্চ 'এ আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করা হল। জুন মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজী হরিজন উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৩৪'এর এপ্রিলে আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহৃত হল।

বিড়লার মতো কেউ কেউ গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় বণিক-শিল্পপতি মহল পরিষদীয় রাজনীতি ও শেষে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের দিকে কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে অনেক বেশী আগ্রহী ছিল। তারা চাইছিল আইনসভার ভিতরে কংগ্রেসকে একটা কার্যকরী pressure group হিসাবে দেখতে। অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাও আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা মেনে নিয়ে অন্য পথে চলতে চাইছিল। প্রদেশগুলোতে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ছবি স্পষ্ট হচ্ছিল। ১৯৩৩'এর অক্টোবরে সত্যমূর্তি স্বরাজ্য দলের পুনঃস্থাপনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে ফিরে আসার প্রস্তাব দিলে ভুলাভাই দেশাই, আনসারি, বি. সি. রায়ের মতো নেতারা তা সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। গান্ধীজী ১৯৩৪'এর এপ্রিলে বিড়লাকে লেখা চিঠিতে স্বীকার করলেন ''that there will always be a party within the Congress wedded to the idea of Counciletry. The reins of the Congress should be in the hands of that group''. এই পর্যায়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাজা

গোপালাচারীর মতো কট্টর গান্ধীবাদী এবং ১৯২০'র দশকের 'no changer' দের সাথে কাউন্সিল প্রবেশ ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণে ইচ্ছুকদের মিলন। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে এটা ছিল 'a common front against a growing challenge from the Left' এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর আবির্ভাবের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উপদেশ ও চাপের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

প্রত্যাশাপূরণে আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের উত্থান, পরিকল্পিত অর্থনীতির সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ার বিস্ময়কর অগ্রগতি কংগ্রেসের মধ্যেই একটি বাম-গোষ্ঠী তৈরী করেছিল। কংগ্রেসের মধ্যেই জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পট্টবর্ধন, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ সমাজতন্ত্রী এবং অনান্য বাম মতাবলম্বীদের নিয়ে ১৯৩৪'এর মে মাসে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের জন্ম হল যার মূল লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের মধ্যে থেকে দক্ষিণপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ও বামপন্থী কর্মসূচী গ্রহণে একটি pressure group হিসাবে কাজ করা। জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে এই দলে যোগ না দিলেও এদের কর্মসূচীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ থেকেই জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন এবং একই সাথে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলো মিলনের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। জুলাই মাসে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল ও কংগ্রেসের মধ্যেকার বাম-জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলস্রোতে থাকা কিছু হতাশ গান্ধীবাদী ও বহু প্রাক্তন বিপ্লবী নেতৃবন্দের যোগদানের ফলে কম্যুনিস্ট দল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এভাবেই জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে বাম-দক্ষিণ দ্বন্দ্বের মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল এবং ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনের সাংবিধানিক কাঠামোর সুযোগ ও অংশীদারিত্ব গ্রহণ এই দ্বন্দ্বে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

৭.৭.১৩.১.২ : ১৯৩৫-৩৭ ভারত শাসন আইন ও ভারতীয় রাজনীতি

ব্রিটিশ শাসনগোষ্ঠী যখন একদিকে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করতে ব্যস্ত, অন্যদিকে ব্রিটেনে তারাই ভারতে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পূনর্বিন্যাসের ব্যাপারে অগ্রসর হলেন। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩খ্রীঃ মার্চ 'এ একটি শ্বেতপত্র দাখিল করেন এবং এর ভিত্তিতে নতুন সংস্কার রূপায়ণের দায়িত্ব একটি যৌথ সংসদীয় কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৩৫ 'এর ২'রা আগস্ট ভারত শাসন বিলটি ব্রিটিশ সংসদের উভয় সভায় অনুমোদিত হয়।

১৯৩৫'এর ভারত শাসন আইনের প্রধান দুটি দিক হল (ক) ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন (খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রস্তাবিত সংস্কারকে নৈরাশ্যজনক বলে অভিহিত করে। আপত্তির মূল বিষয় ছিল প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র বা Federation। তবে নতুন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিধানগুলি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমর্থন করে। গভর্নরশাসিত এগারটি প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন প্রযোজ্য হবে বলে স্থির হয়। প্রদেশগুলো হল— মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা ও সিন্ধু। প্রদেশগুলোতে গভর্নর এবং আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীসভার ওপর শাসনভার অর্পিত হয়। গভর্নরদের হাতে 'বিশেষ ক্ষমতা', জরুরী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, এমনকি কুখ্যাত ৯৩ ধারা অনুযায়ী প্রদেশে সংসদীয় শাসন অসম্ভব হয়ে পড়লে অনির্দিষ্টকাল স্বহস্তে শাসন পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষ নির্বাচনকে গুরুত্ব দেবার ফলে নির্বাচকমন্ডলীর আয়তনের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটে।

১৯৩৫-৩৬ 'এ ভারতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আশাব্যাঞ্জক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্টদের 'Red Trade Union Congress' AITUC'-র সঙ্গে আবার যুক্ত হয়। বাম-জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট ঐক্যের অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল 'সারা ভারত কিষাণ সভা'র প্রতিষ্ঠা। কিষাণ সভা তাদের দাবীপত্রে জমিদারী প্রথা বিলোপ, ঋণ বিলোপ, খাজনা হ্রাস, জমিতে কৃষক প্রজার পূর্ণ দখলী-স্বত্ব প্রতিষ্ঠার মতো বৈপ্লবিক দাবী উত্থাপন করে। দেশীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে 'সাবধানী' গান্ধীবাদী পদক্ষেপ'কে দূরে সরিয়ে ভূমি-রাজস্ব হ্রাস, দেশীয় রাজ্যগুলোতে কৃষক অসন্তোষের তদন্তের দাবী জানানো হয়। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে নেহেরুর লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুর ভাষণে (এপ্রিল ও ডিসেম্বর ১৯৩৬) এবং কংগ্রেস এর নির্বাচনী ইস্তাহারে বামপন্থীদের প্রগতিশীল ভাবধারা ও কর্মসূচীর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থার এই আপাত অগ্রগতির ভিত আদৌ মজবুত ছিল না। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে ১৯৩৫-৩৭ সময়কালে রাজনৈতিক কৌশল, বণিক-শিল্পপতিদের চাপ ও পৃষ্ঠ-পোষকতা ব্যবহার করে, দক্ষিণপন্থীরাই কংগ্রেসকে পরিচালিত করেছিল। কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী এবং নেহেরু সংসদীয় কর্মসূচী গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৬'এর কংগ্রেস অধিবেশনে নেহেরু ঘোষণা করেন ১৯৩৫'এর আইনের আপোষহীন বিরোধিতাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এর অনেক আগে ১৯৩৪ 'এই ভুলাভাই দেশাই, সত্যমূর্তির মতো একশ জন কংগ্রেস নেতা ডাঃ আনসারির নেতৃত্বে কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ড গঠন করেছিলেন। ঐ বছরের অক্টোবরে সংসদীয় কাজকর্মে কংগ্রেসের অংশগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। বামপন্থী সক্রিয়তাকে খর্ব করার জন্য গান্ধীজীর অনুমোদন ক্রমেই গণ আন্দোলনের পথ পরিহার করে সংসদীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৩৬'এর জুলাইয়ে কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ড গঠিত হল । শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য সত্ত্বেও সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেস প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৭.৭.১৩.১.৩ : ১৯৩৭'এর প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনী ফলাফল ও জাতীয় রাজনীতি

১৯৩৭'এ অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ — এই পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বোম্বাইতে ১৭৫টির মধ্যে ৮৬টি আসন পেয়ে হয় বৃহত্তম দল। আসামে ১০৮টি আসনের মধ্যে ৩৩টি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৫০টি'র মধ্যে ১৯টি আসন লাভ করে। মোট ১৫৮৫টি প্রাদেশিক আসনের মধ্যে ১১৬১টি আসনে লড়াই করে কংগ্রেস লাভ করে ৭১৬টি আসন। "গান্ধীর জন্য হলুদ বাক্সে ভোট দাও" এই জিগির সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ আইন অমান্য আন্দোলন তার ব্যর্থতা সত্ত্বেও ১৯৩৭'এর নির্বাচনে কংগ্রেসকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে আন্দোলন বহু স্থানে তৃণমূল স্পর্শ করেছিল বলে কংগ্রেস বৃহত্তম সর্বভারতীয় দলে পরিণত হয়েছিল এবং ভোটদাতাদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। হরিজন আন্দোলন বা গ্রামীণ পুণর্গঠন কর্মসূচীরও প্রভাব পড়েছিল। তাছাড়া প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক স্বার্থকে কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে সুসংহত করার সাফল্য ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'নেহেরুর Charisma এবং বামপন্থীদের জনসংযোগ'। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি না পেলেও বামপন্থীরা সরে গেলে কংগ্রেস কতটা সাফল্য পেত তা বলা যায় না।

মুসলিম লীগ কিন্তু মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলোতে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ৪৮২টি মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ১০৩টি আসন। পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমান আসনগুলিতে মুসলিম লীগ বিরোধী দলগুলোর সাফল্য ছিল অভাবনীয়। বাংলায় স্বতন্ত্র মুসলমান দল ৮২টি ও কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় ৩৯টি আসন। পাঞ্জাবে ইউনিয়ানিষ্ট পার্টি'র দাপটে ৮৬টি মুসলমান আসনের মধ্যে লীগ মাত্র একটি আসন পায়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলমান আসনগুলোতে কংগ্রেসের ফল খারাপ হলেও (৫৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৬টি আসনে জয়লাভ) বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ ছাড়া অন্যত্র তপশিলী জাতি'দের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে ভাল ফল করে।

নির্বাচনে জয়লাভের পর বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেসে মতবিরোধ দেখা দেয়। বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রীরা মন্ত্রীসভা গঠনের বিপক্ষে ছিলেন। নেহেরু ঘোষণা করেন "ভারত শাসন আইনকে প্রতিরোধ করার জন্য ও তার বিলুপ্তি ঘটাতে আমরা আইনসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি... মন্ত্রীসভা পরিচালনার জন্য নয়...।" রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, কৃপালনীর মতো দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিকাংশই ছিলেন সরকার গঠনের পক্ষে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে গান্ধীজী নিঃশর্ত মন্ত্রীত্বগ্রহণ চাননি। 'কিন্তু কোনদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বুঝতে পেরে তিনি পেছিয়ে যান।' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' 'অদ্ভুত এক আপোষ' করে। একদিকে শাসনতন্ত্রের সাথে লড়াই'এর কথা বলা হয়, অন্যদিকে বলা হয় যদি প্রাদেশিক আইনসভার নেতারা যদি বোঝেন যে গভর্নরেরা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা মন্ত্রীসভার কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবেন না তবে মন্ত্রীসভা গড়তে পারেন। মন্ত্রীসভা সম্পূর্ণ বর্জনের উদ্দেশ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের আনা বামপন্থী প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। নানা টালবাহানার পর অবশেষে ২১ জুন বড়লাট প্রতিশ্রুতি দিলেন যে বিশেষ জরুরী প্রয়োজন দেখা না দিলে গভর্নরেরা মন্ত্রীসভার দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। ৫ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রীসভার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। ৭ই জুলাই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ করে।

নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে তা হল পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম এই চারটি প্রদেশে কংগ্রেসের ভূমিকা কি হবে? বাংলায় কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। কৃষক প্রজাদলের নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবে মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব দেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে থাকলেও কংগ্রেস ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে কোন দল বা ব্যক্তি কংগ্রেসী আদর্শে পূর্ণ আস্থা জানিয়ে কংগ্রেসে যুক্ত হতে পারে। এছাড়া অন্য কোন দলের সঙ্গে কংগ্রেস কোন সুবিধাবাদী কোয়ালিশনে যাবে না। ফলে হকের যৌথ সরকার গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং তিনি লীগের সমর্থনে সরকার গঠন করেন। পরে অবশ্য গান্ধীজীর নির্দেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস দল কোয়ালিশনে প্রবেশের অনুমতি পায়। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল, যার খেসারৎ দিতে হয়েছিল বাঙালী হিন্দুদের। পাঞ্জাবে ইউনিয়ানিষ্ট দলের নেতা স্যার সিকন্দর হায়াত খাঁ জিন্নার সাথে 'কাজ-চলা গোছের' বোঝাপড়া'য় এলেও পাঞ্জাবে লীগের কোন আলাদা সংগঠন গড়তে দেন নি। তার মৃত্যুর পরই পাঞ্জাবে লীগের প্রভাব বাড়ে। সিন্ধুতে ব্রিটিশ সমর্থক গুলাম হোসেন মন্ত্রীসভার পতনের পর (মার্চ, ১৯৩৮) ১৯৪২'এ বরখাস্ত হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের সমর্থনে আল্লা বক্স মন্ত্রীসভা কাজ চালিয়েছিল। এরপর থেকে সিন্ধু লীগ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আসামে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। তবে কোয়ালিশন বিতর্কের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয় যুক্তপ্রদেশের ক্ষেত্রে। ইউ.পি.'তে সাধারণ শত্রু অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট দলের বিরুদ্ধে

কংগ্রেস ও লীগের এক "informal, unspoken understanding" হলেও নির্বাচনী সাফল্যের বিচারে কংগ্রেস অভাবনীয় সাফল্য পায়। লীগের সাথে মোর্চার কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষেত্রে আজাদে'র মতো কেউ কেউ নেহেরুর অনমনীয়তা ও অপরিণামদর্শিতাকে দায়ী করলেও অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে গণভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসের সাথে সামন্ততান্ত্রিক এবং ক্রমশ মৌলবাদী লীগের এক সাথে চলা সম্ভব ছিল না।

৭.৭.১৩.১.৪ : কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কার্যকলাপ

মন্ত্রীত্বকে গান্ধীজী "কাঁটার মুকুট" বলে অভিহিত করেছিলেন। কংগ্রেসের ক্ষমতাগ্রহণের মধ্যে কিছু অবশ্যম্ভাবী স্ব-বিরোধিতা ছিল। ১৯৩৫'এর ভারত শাসন আইনের বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোকে এই আইনের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছিল, যেখানে গভর্নরদের 'বিশেষ ক্ষমতা', সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থ এবং কংগ্রেসের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র ও পুলিশের ওপর নির্ভরশীলতা অবধারিত ভাবে স্ব-শাসনের প্রতিবন্ধক ছিল। ভারতের রাজস্ব সম্পদের অধিকাংশই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনকল্যাণকর কর্মসূচী রূপায়ণ এই সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতায় প্রাদেশিক সরকারগুলোর সাধ্যের বাইরে ছিল। কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের নিয়ন্ত্রণও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলোর স্বাধীন কার্যকলাপে বাধাস্বরূপ ছিল। এছাড়াও কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলো যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো হল — রাজবন্দীদের মুক্তি, ভূমি-রাজস্ব সমস্যা, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত।

দমনমূলক আইন প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তিদান কংগ্রেসী সরকারগুলোর অন্যতম। কিছু ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকলেও বোম্বাই সরকার Special Emergency Power Act, বিহার সরকার Public Safety Act, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে Public Transquility Act 'এর মতো দমনমূলক আইনগুলো প্রত্যাহৃত হয়। প্রায় সকল কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে রাজবন্দীরা মুক্তি পেলেও উত্তর প্রদেশ ও বিহারে বন্দীমুক্তি বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়। ঐ দুই রাজ্যের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে এক সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিহার ও ঐ দুই প্রদেশে রাজবন্দীরা সকলেই মুক্তি পায় এবং সংকট নিরসন হয়।

প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি নানা জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছিল। গ্রামোন্নয়ন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পানীয় জলসরবরাহ, রাস্তাঘাট তৈরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যবস্থা প্রদেশগুলোতে গৃহীত হয়েছিল। গান্ধীজী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে 'ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর' মনে করতেন। ১৯৩৭'এর অক্টোবরে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে ওয়ার্ধায় একটি নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শিক্ষাকে স্বনির্ভর ও উৎপাদনমুখী করে তোলার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হল। বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ডাঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নঈ তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষার এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ করা হল। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে বিশেষতঃ বিহার, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। মধ্য প্রদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য বিদ্যামন্দির নামক প্রকল্প গৃহীত হল। বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে বোম্বাইয়ে বয়স্ক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। বিহারে গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্রসমাজকে বয়স্ক শিক্ষার কাজে লাগান হয়। মধ্যপ্রদেশেও বয়স্ক শিক্ষার প্রসার হয়। বিহারের সব মিউনিসিপ্যালিটি, স্থানীয় ও জেলা বোর্ড স্ত্রী-শিক্ষা ও হরিজন শিক্ষায় অর্থবরাদ্দ করেছিল।

সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল মাদক দ্রব্য বর্জন। ১৯৩৭'এর আগস্ট মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক সরকারগুলোকে তিন বছরের মধ্যে এই পাপ দূর করার নির্দেশ দেয়। প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলো মাদকদ্রব্য আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। বোম্বাইয়ে তিন বছরের জন্য মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ'এ মাদকদ্রব্য বর্জন সাফল্য লাভ করে। উড়িষ্যায় আফিম ও দিশি মদের বিরুদ্ধে আলাদা আইন করা হয়।

'গান্ধীজীর প্রেরণায় অস্পৃশ্যতা মোচন ও হরিজন উন্নয়ন কংগ্রেস সরকারদের অন্যতম ব্রত হয়েছিল'। হরিজনদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টা হয়। হরিজনদের মন্দির প্রবেশের অধিকার কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারগুলো আইন পাশ করে। বোম্বাই সরকার এ ধরনের আইন প্রথম পাশ করে। মাদ্রাজে Removal of Civil disabilities Bill (1938) চাকরির ক্ষেত্রে, সরকারী সম্পত্তির ব্যবহারে হরিজনদের ওপর বাধানিষেধ লোপ করে। এই আইনের বলেই মালাবারে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ সম্ভব হয়।

শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থাভাব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তথাপি গান্ধীজীর পরিকল্পনামতো খাদি ও কুটির শিল্পের প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় খাদি বোর্ডের সভাপতি কুমারাপ্পার অবদান উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজে খাদি ও কুটির শিল্প প্রসারে তিনটি আইন পাশ হয়। মধ্যপ্রদেশে শিল্প প্রশিক্ষণের দুটি পলিটেকনিক স্থাপিত হয়। বিহারে কাগজ, রেশম, চর্মশিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে এ ধরনের সীমিত প্রচেষ্টায় আর্থিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। এই চেতনার ফলশ্রুতি ভারতীয় পরিকল্পনা কমিটি (জুলাই, ১৯৩৮) নেহেরুর সভাপতিত্বে ১২ জন সদস্যের এক পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। কৃষি, পরিবহন, শিল্প, জনসংখ্যা, বাণিজ্য ও লগ্নি, জনকল্যাণ ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কতগুলো সাবকমিটি তৈরী করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাক্রমে পরিকল্পনা কমিটির কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেলেও স্বাধীন ভারতে পরিকল্পনা কমিশন পূর্ববর্তী ঘটনারই ফলশ্রুতি।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলোর কাছে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক অসন্তোষ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত'কে নিয়ন্ত্রণে রাখা। প্রদেশগুলোতে জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা শ্রমিক সংগঠনের প্রসার ও জঙ্গী আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ১৯৩৮'এ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সদস্যসংখ্যা ১৯৩৭'এর তুলনায় ৫০% বৃদ্ধি পায়। AITUC ও মধ্যপন্থী NFTU কাছাকাছি আসায় শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়। নেহেরু, সুভাষচন্দ্রের মতো বামপন্থী কংগ্রেস নেতারা, অথবা প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনীদের মতো দক্ষিণপন্থীদের প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান মজদুর সভা' শ্রমিক আন্দোলনে লিবারাল এবং কমিউনিস্ট প্রভাবকে খর্ব করতে পারেনি। এ সময়কালে অগণিত শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলায় পাটকল ধর্মঘট, আমেদাবাদ ও মাদ্রাজে সূতাকল ধর্মঘট, কুলটি ও হীরাপুর লৌহ ইস্পাত কারখানায় ধর্মঘট, ডিগবয় তৈলক্ষেত্রে ধর্মঘট ইত্যাদি কানপুর ও বোম্বাই শিল্পাঞ্চলেও ধর্মঘট হয়েছিল। নেহেরুর পরামর্শে কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণীর মঙ্গলবিধানে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে (অক্টোবর, ১৯৩৭)। Textile Enquiry Committee গঠন করে সূতাকল শ্রমিকদের বেতন হার ও উন্নততর বাসস্থানের দাবী খানিকটা মেনে নেওয়া হয়। বাংলায় পাটকল শ্রমিক ও পাঞ্জাবে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর সরকারী দমননীতির নিন্দা করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার গুলোর এই আপাত 'pro-labour' নীতি ভারতীয় বণিক-শিল্পপতিদের বিরক্তির ও আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। বিড়লা কংগ্রেসী রাজ্যগুলোতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা'র অভিযোগ

আনেন। বম্বে এবং যুক্তপ্রদেশ থেকে বিনিয়োগ দেশীয় রাজ্যগুলোতে সরিয়ে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। আতঙ্কিত বণিক-শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করতে বোম্বাই সরকার Bombay Traders Dispute Act (Nov, 1938) পাশ করে। এই আইনে শ্রমিক সংগঠন ও বে-আইনী ধর্মঘটের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা রাখলেও কারখানা 'Lock-out' এর ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা রাখেনি। সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলো এই শ্রমবিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে ও ৭ই নভেম্বর সমগ্র প্রদেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ডিগবয়ে ব্রিটিশ মালিকানাধীন আসাম অয়েল কোম্পানী'তে কংগ্রেস সরকার ধর্মঘটীদের জব্দ করতে ভারত রক্ষা আইনের আশ্রয় নেয়। স্বভাবতই কংগ্রেসী সরকারগুলোর শ্রমিকনীতি কম্যুনিস্টদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যদিও নেহেরু'র কাছে Bombay Act 'এর মতো শ্রমবিরোধী আইনও ছিল। 'On the whole...a good one'। সুভাষচন্দ্রও এ নিয়ে শোরগোল চান নি।

১৯৩০'এর দশকে সহজানন্দ, নরেন্দ্র দেব, মোহনলাল গৌতম, এন.জি. রঙ্গ, ই.এম.এস নাম্বুদ্রিপাদ প্রভৃতি নেতার উদ্দ্যোগে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ইত্যাদি প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যগুলোতে কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠছিল এবং সারা ভারত কিষাণ সভা'র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী নেতারা পছন্দ না করলেও কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী নেতাদের চাপ এবং নির্বাচনী বাধ্যবাধকতায় জমিদারী উচ্ছেদের মতো দাবীকেও নির্বাচনী ইস্তাহারে রাখতে হয়েছিল। স্বভাবতঃ আট রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা নিপীড়িত কৃষকশ্রেণীর কাছে মুক্তির বার্তা বয়ে এনেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তরে ও প্রদেশগুলোতে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতা সংহত করার ফলে কৃষকদের সাথে প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলোর সংঘাত শুরু হয়। বিহারে 'বকস্ত' জমি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে কিষাণ সভার আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব জমিদারদের পক্ষ নেয়। প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ব আইনে অসন্তুষ্ট কৃষকেরা ১৯৩৮-৩৯'এ কিষাণ সভার নেতৃত্বে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করে যা অধ্যাপক শেখর বন্দোপাধ্যায়ের মতে জাতপাত ও শ্রেণী বিভেদকে সরিয়ে দলিত এবং দরিদ্রতর ভূমিহীন কৃষকের সাথে ধনী ভূমিহার ও রাজপুত কৃষককে সামিল করেছিল। আতঙ্কিত ভূস্বামী সম্প্রদায় কংগ্রেস সরকারকে বলপ্রয়োগের জন্য চাপ দেয়। ভূস্বামীদের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশী নির্যাতনে আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে।

যুক্তপ্রদেশে ১৯৩৯'এর একটি আইনের মধ্যে নানা সংস্কার করা হয়েছিল। নতুন আইনে কৃষকের দখলীস্বত্ব ও উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগের অধিকার দেওয়া হল, কৃষকের জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হল, বাকী খাজনার দায়ে গ্রেফতারী বা জেল বন্ধ হল, খাজনার রসিদ বাধ্যতামূলক করা হল। 'উড়িষ্যাতেও ১৯৩৮'এর আইনে দখলী স্বত্বাধীন জমি বিনা ফি-তে হস্তান্তরের অনুমতি দেওয়া হল ও বকেয়া খাজনার ওপর সুদের হার ৬% নামিয়ে আনা হল।

এসব ব্যবস্থাগুলো স্বভাবতঃই কৃষকদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। দখলী স্বত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল কৃষিঋণ'এর সমস্যা। বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, সীমান্তপ্রদেশে মহাজনী আইন সংশোধন করা হয়। কোথাও কোথাও ঋণের সুদের উর্দ্ধতম হার স্থির করে দেওয়া হয়। তবে মাদ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যায় ঋণের দায়ে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

'বস্তুতঃ কংগ্রেস কোথাও জমিদারী উচ্ছেদের চেষ্টা করে নি' এবং কৃষকস্বার্থে কংগ্রেস সরকারগুলোর সংস্কারগুলো কৃষকদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একান্তই হতাশাব্যঞ্জক। আসলে এসময় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ প্রায় পুরোপুরিভাবে চলে যায় দক্ষিণপন্থীদের হাতে এবং কৃষকসভা পরিচালিত আন্দোলনে তাদের বিরাগ ক্রমশ বাড়তে

থাকে। ১৯৩৮'এই কৃষকসভা গান্ধীবাদী শ্রেণী সহযোগিতা তত্ত্ব অস্বীকার করে কৃষি বিপ্লবকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। কংগ্রেসও ১৯৩৮'এর ফেব্রুয়ারীতে হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেসীদের কৃষক সভার সদস্যপদ গ্রহণে বিধিনিষেধ আরোপ করে, যদিও এর প্রয়োগ প্রাদেশিক কংগ্রেসের হাতে রাখা হয়।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলোর সামনে সবচেয়ে জটিল ও দুরূহ সমস্যা ছিল ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক সংঘাত। পৃথক নির্বাচকমন্ডলী, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুকে পূর্ণ প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করা, বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য ইত্যাদি লীগের দাবীগুলো ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস উভয়েই মেনে নিয়েছিল। এ সত্ত্বেও নির্বাচনে লীগের শোচনীয় ফল, যুক্তপ্রদেশে লীগের সঙ্গে মোর্চা গঠনে কংগ্রেসী অনীহা, মুসলমানদের মধ্যে 'গণসংযোগ' স্থাপনে নেহেরুর আগ্রাতিশয্য লীগ ও কংগ্রেসের সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন হিসাবে লীগের অযৌক্তিক দাবী কংগ্রেসের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলনা। জিন্নাও মৌলবাদীদের সম্পর্কে অনীহা ত্যাগ করে ও বাংলা ও পাঞ্জাবের ফজলুল হক ও সিকান্দার হায়াত খানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসে লীগের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করলেন। 'ইসলাম বিপন্ন' জিগির তোলা হল। পীরপুর রিপোর্ট (1938), শরীফ রিপোর্ট (1939) ফজলুল হকের Muslim Sufferings under Congress Rule 'এ (Dec, 1939) কংগ্রেস সরকার হিন্দুদের নেকনজরে দেখছেন, মুসলমানদের লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে বাধা দিচ্ছেন, উর্দুর পরিবর্তে দেবনাগরী লিপি ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছেন, বকরী ঈদে গো-হত্যায় নিষেধাজ্ঞা জারী করছেন এ জাতীয় অভিযোগের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মদত দেওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগ আনছেন। বিদ্যামন্দির, নঈ তালিম- সবই মুসলিম সংস্কৃতি দলনের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত হতে লাগল। লীগের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস প্রধান বিচারপতি Mauric Gwyer এর নেতৃত্বে তদন্তের প্রস্তাব দিলে লীগ তা অগ্রাহ্য করল, সাম্প্রায়িক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ফাঁপিয়ে তোলা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে ১৯৩৭'এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৯'এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫৭টি দাঙ্গাই প্রমাণ করে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ কলুষিত হয়ে উঠছে। কংগ্রেসের উপরের স্তরের নেতাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উত্তর ও মধ্যভারতে নীচের স্তরে, এমনকি কিছু মন্ত্রীরও, হিন্দু মহাসভার মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করা যায় নি। কিনা ১৯৩৮'এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস সদস্যদের হিন্দু মহাসভার সদস্যপদ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৯৩০'এর দশকের শেষে লীগ এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রসারকে কংগ্রেসীমহল বেশী গুরুত্ব না দিলেও হিন্দু মহাসভার ছত্রছায়ায় 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' বা পাঞ্জাবে মাশরিকি'র 'খকসর' এর মতো জঙ্গী সাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রভাব বিস্তারের মধ্যে ভবিষ্যতের অশনি সংকেত ছিল।

৭.৭.১৩.১.৫ : কংগ্রেসী সরকারগুলির মূল্যায়ন

১৯৩৫'এর ভারত শাসন আইনের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আইনের কাঠামোর মধ্যেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী স্ব-বিরোধিতা ছিল। গভর্নরদের 'বিশেষ ক্ষমতা', সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থ, প্রতিক্রিয়াশীল এবং শত্রুভাবপন্ন আমলাতন্ত্র এবং পুলিশের ওপর নির্ভরশীলতা প্রকৃত স্ব-শাসনের প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভিন্নমুখী স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য আনা। অধ্যাপক সুমিত সরকারের ভাষায় "Despite its national and Multi-class ideals, the Congress as a ruling party found it almost impossible to go on pleasing Hindus and Muslims, landlords and peasants, or businessmen and workers at the

same time''. কংগ্রেসের ক্ষমতাগ্রহণের বিরোধিতা করে নেহেরু আগেই বলেছিলেন এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোকে টিকিয়ে রাখা হবে এবং কংগ্রেসী আন্দোলন জনগণের মধ্যে যে 'high spirits' জাগিয়ে তুলেছিল তার অবনমন ঘটবে। কেন্দ্রে ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলোতে দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্য ও ক্ষমতার আস্বাদ কংগ্রেসের আন্দোলনমুখী প্রবণতা হ্রাস করে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেয়। মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রীসভায় মারাঠীভাষী ও হিন্দিভাষী মন্ত্রীদের বিরোধে 'খাড়ে মন্ত্রীসভা' পদত্যাগ করে। দলাদলি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেন 'In no way would a deposed premier have behaved with such supreme lack of dignity and responsibility as the ex-premier of C.P.'' মাদ্রাজে রাজা গোপালাচারী 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের গ্রেফতার করাচ্ছিলেন, স্বাধীনতা শপথের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাননি। অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের বিষয়ে ছোটলাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতেও তাঁর বাধেনি। ছোটলাট এরস্কাইন লিখেছেন ''In fact, he is even too much of a Tory for me''. বস্তুতঃ 'সুযোগ থাকলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও ব্রিটিশ আমলাশাহীর সঙ্গে পাল্লা দিতেন'। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলো শ্রমিক, কৃষক এবং বামপন্থী কংগ্রেসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। ভূস্বামী বা বণিক-শিল্পপতিরাও পুরোপুরি খুশি হতে পারেনি। মন্ত্রীসভার শেষের দিকে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা কমতে থাকে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দলের ভাবমূর্তির নিরিখে মন্ত্রীসভাগুলোর ভূমিকা নেতিবাচক হয়ে পড়ে। ১৯৩৯'এর জুলাই থেকে আয়কর থেকে আরও বেশী টাকা প্রদেশগুলোকে বরাদ্দ না করলে প্যাটেল মন্ত্রীসভাগুলোর পদত্যাগের দাবী তুলে রেখেছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে পদত্যাগ না করলে মন্ত্রীসভাগুলোকে নিয়ে কংগ্রেসের উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি পেত। তাই অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে 'The resignation of Congress ministries on 29-30 October 1939 was thus logical and inevitable'.

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলো তাদের ২৭ মাসের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে জনগণকে মোটামুটি সৎ, পরিচ্ছন্ন ও জনহিতকর প্রশাসনের আস্বাদ দিয়েছিল। গোবিন্দবল্লভ পন্থ, আর.এ.কিদোয়াই, রবিশঙ্কর শুক্ল'র মতো অনেকে দক্ষ প্রশাসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রচন্ড প্রতিকূল অবস্থায় সরকারগুলোকে কাজ করতে হয়েছিল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে 'কাজের পরিমাণ এত ব্যাপক ও সমস্যা এত জটিল ছিল যে কংগ্রেসী সরকারের চেষ্টা বা অর্থব্যয় আশানুরূপ হয়নি'। কিন্তু 'সততার অভাব ছিল না'। ভাইসরয়, ভারতসচিব এবং প্রাদেশিক গভর্নরেরা এমনকি কুপল্যান্ডের মতো সাম্রাজ্যবাদী লেখকও কংগ্রেসী সরকারগুলোর নিষ্ঠা, সদিচ্ছা ও দক্ষতার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৭.৭.১৩.১.৬ : অ-কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি

অ-কংগ্রেসী সরকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী ছিল পাঞ্জাবে ইউনিয়ানিষ্ট দলের নেতা স্যার সিকান্দার হায়াত খানের নেতৃত্বাধীন সরকার। ১৭৫ জন সদস্যের আইন-সভায় এই দলের সদস্যসংখ্যা ছিল ৯৬, লীগ মাত্র একটি আসন পেয়েছিল। জিন্না সিকন্দরের সাহায্য কেন্দ্রে তাকে মুসলমানদের অবিসংবাদী নেতা হতে সাহায্য করবে এই বিবেচনায় সিকান্দার'এর সাথে বোঝাপড়ায় আসে। সিকান্দার-জিন্না লখনউ চুক্তিকে 'handing over the League to Sir Sikandar and his friends' বলে সমালোচনা করলেও লীগের সুবিধাও হয়েছিল। পাঞ্জাবে লীগের কোন আলাদা সংগঠন গড়তে না দিয়ে সিকান্দার ইউনিয়ানিষ্ট দল ও নিজের কর্তৃত্ব অক্ষত রাখেন। অন্যদিকে কংগ্রেসী প্রদেশগুলোতে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস হিন্দু রাজ কায়েম করছে এই অভিযোগ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করতে থাকেন। পাঞ্জাবের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান-শিখ এই জটিল সমীকরণ সামলে সিকান্দার হায়াত খাঁ কৃষি ও অন্যান্য

ক্ষেত্রে সীমিত সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর খিজির হায়াত খাঁর সময় থেকে মুসলিম লীগ পাঞ্জাবের রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

১৯৩৭'এর নির্বাচনে বাংলায় দলগত অবস্থা ছিল এরকম—কংগ্রেস-৫৪, স্বতন্ত্র মুসলিম-৪২, হিন্দু ন্যাশনালিষ্ট-৩, হিন্দু সভা-২, স্বতন্ত্র হিন্দু-৩৭, মুসলিম লীগ-৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি-৪০, ইউরোপীয়ান-২৫, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান-২৫, ইন্ডিয়ান খ্রীষ্টান-২, মোট- ২৪৮ (দুটি আসন বাদ)। কৃষক-প্রজাদলের নেতা এ.কে. ফজলুল হক কংগ্রেসের সাথে মিলিতভাবে সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবের পক্ষে থাকলেও, কংগ্রেস হাই-কম্যান্ড 'এর সায় ছিল না। কংগ্রেস বাইরে থেকেও হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করতে পারত। কিন্তু বাধল বন্দীমুক্তি নিয়ে। বন্দীমুক্তির ওপর জোর দিলে সরকার বরখাস্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় প্রজাদল কৃষক প্রজাস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে চাই। এ ধরনের পদক্ষেপ পূর্ব-বাংলার হিন্দু ভূস্বামীদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে এই আশঙ্কায় কংগ্রেস বন্দীমুক্তিকেই অগ্রাধিকার দিল। হুমায়ুন কবীর এ ব্যাপারে কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ততাকে দায়ী করলেও অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী'র মতে বিরোধের মূল কারণ কংগ্রেস ছেড়ে আসা নলিনী সরকার ও মশারফ হোসেনের মতো লীগপন্থীকে সরকারে ঢোকানো নিয়ে। "বাঙালী হিন্দু যদি আপন সর্বনাশ ডেকে এনে থাকে, হকও খাল কেটে কুমীরকে ডেকে এনেছিলেন"। যাই হোক, এরপর হক মুসলিম লীগ সমর্থনে মন্ত্রীসভা তৈরী করে। হক সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ফলতঃ লীগ নেতাদের সঙ্গে তার মতবিরোধ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের সমর্থনে প্রগতিশীল কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। কিন্তু প্রথমে থেকেই ব্রিটিশ সরকারের অসহযোগিতার ফলে ১৯৪৩'এর মার্চ'এ হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে লীগ একটি যৌথ মন্ত্রীসভা তৈরী করে। মুসলিম লীগ ব্রিটিশ পক্ষপাতিত্বের আশ্রয়ে বাংলার রাজনীতিতে প্রধানতম শক্তিতে পরিণত হয়।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে কলুষিত হলেও হকের শাসনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—দু'হাজার রাজবন্দীর মুক্তি, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংস্কার) আইন। এছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কার্যকারিতা বিচারের জন্য ফ্লাউড্ কমিশন গঠিত হয়। বস্তুত: প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন গভর্নরদের হস্তক্ষেপ, প্রশাসনকে দলীয় গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহারে কলুষিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৩'এর মন্বন্তরে ও পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ বিধ্বস্ত হয়।

সিন্ধু প্রদেশে ১৯৩৮'এর মার্চে গুলাম হোসেন মন্ত্রীসভার পতনের পর কংগ্রেস সমর্থিত আলা বক্স মন্ত্রীসভার সাথে নিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে গভর্নরের সংঘাত বাধে। ১৯৪২'এ আলা বক্স বরখাস্ত হন। এর পর সিন্ধু'র রাজনীতি লীগের কুক্ষিগত হয়।

৭.৭.১৩.১.৭ : কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলির পদত্যাগ

১৯৩৯'এর ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনমতকে অগ্রাহ্য করে একতরফাভাবে ভারতকে যুদ্ধে জড়িত করায় কংগ্রেস বিক্ষুব্ধ হয় এবং ১৫ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চায়। অবশ্য একই সঙ্গে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের কঠোর নিন্দাও করা হয়। ১৪ই অক্টোবর লিনলিথগো'র বিবৃতি কংগ্রেসের মূল দু'টি দাবী—যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীনতা, (পূর্ণ স্বাধীনতা না হলেও স্বাধীন জাতি হিসাবে স্বীকৃতি) এবং কেন্দ্রে অবিলম্বে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা'র আশ্বাসকে এড়িয়ে গেল। ২২'শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভাইসরয়ের বিবৃতি দুর্ভাগ্যজনক

আখ্যা দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। ২৯'শে ও ৩০'শে অক্টোবর সমস্ত মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে। উল্লসিত মুসলিম লীগ জিন্না'র আহ্বানে ভারতের সর্বত্র 'মুক্তি দিবস' পালন করে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলার অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলো অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখিয়েছিল।

৭.৭.১৩.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

(২) সুমিত সরকার — আধুনিক ভারত

(৩) শেখর বন্দোপাধ্যায় — পলাশী থেকে পার্টিশন

(৪) B.R. Tomlinson — The Indian National Congress and the Raj

(৫) B.B. Mishra — The Indian Political Parties.

(৬) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আধুনিক ভারত (২য় খণ্ড) ১৯২০-৪৭।

৭.৭.১৩.১.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এনেছিল?

(২) আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসী রাজনীতিতে 'বামপন্থা'র উত্থান আলোচনা কর।

(৩) ১৯৩৫'এর ভারত শাসন আইন' কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কী বিতর্ক তৈরী করেছিল?

(৪) ১৯৩৭'এর নির্বাচনে কংগ্রেসের নির্বাচনী সাফল্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 'দক্ষিনপন্থী' ও 'বামপন্থী'দের মধ্যে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে দ্বন্দ্ব তৈরী করেছিল?

(৫) প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারগুলোর গঠনমূলক কার্যকলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৬) ক্রমবর্ধমান কৃষক অসন্তোষ কিভাবে কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলোর পতন ঘটিয়েছিল?

(৭) ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারের পতনে কী ভূমিকা নিয়েছিল?

(৮) বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রীসভার ব্যর্থতার কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

(৯) প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারগুলোর ২৭ মাস ব্যাপী শাসনের সদর্থক ও নঞর্থক দিকগুলো আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

ক্রিপস দৌত্য
Cripps Mission

গঠন (Structure) :

৭.৭.১৩.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.৭.১৩.২.১ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত সংকট ও ক্রিপস 'এর আগমন

৭.৭.১৩.২.২ : ক্রিপস প্রস্তাবগুচ্ছ ও ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া

৭.৭.১৩.২.৩ : ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ও ভারতীয় রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া

৭.৭.১৩.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৭.১৩.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৭.১৩.২.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ক্রিপসের আগমনের কারণ।

(২) ক্রিপসের প্রস্তাবসমূহ এবং ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া।

(৩) ক্রিপস দৌত্যের ব্যর্থতা।

(৪) ভারতীয় রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া।

৭.৭.১৩.২.১ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত সংকট ও ক্রিপস'এর আগমন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিস্থিতি ভারতীয় রাজনীতিতে এক গভীর সংকট সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় জনমানসের তোয়াক্কা না করে একতরফাভাবে ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলায় কংগ্রেস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং ব্রিটেনকে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে জানাতে বলে। ১৯৩৯'এর ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় 'স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই যদি এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক অধিকার, কায়েমী স্বার্থ ও সুবিধা যদি এই যুদ্ধের মাধ্যমে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে এই যুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোন সম্পর্ক নেই'। একমাস পর বড়লাট লিনলিথগো জানালেন ব্রিটেনের যুদ্ধ, উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার কিছু বলার নেই। তিনি বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৩৫'এর ভারত শাসন আইনে কী-কী পরিবর্ত্তন দরকার যুদ্ধশেষে সেই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করতে পারেন। কংগ্রেস বড়লাটের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ও প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলো পদত্যাগ করে।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকার ভারতে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে প্রশ্রয় দিতে থাকে। ১৯৪০'এর রামগড় অধিবেশনে ডোমিনিয়ন স্টেটাস'এর বদলে পূর্ণ স্বাধীনতাকে অবিচল লক্ষ্য হিসাবে কংগ্রেস ঘোষণা করে ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সংবিধান সভা গঠনের দাবী জানায়। অন্যদিকে, মুসলিম লীগ নির্বাচিত সংবিধান সভায় কংগ্রেসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার আশঙ্কায় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। ১৯৪০'এর লাহোর অধিবেশনে লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৪০'এর মাঝামাঝি ইউরোপে মিত্রশক্তির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ব্রিটেনে চার্চিল প্রধানমন্ত্রীত্বে এলেন। যুদ্ধের আচরণবিধি সম্পর্কে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও যুদ্ধ শেষে ব্রিটেন ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতার অঙ্গীকার করলে এবং অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার গঠনে রাজী থাকলে কংগ্রেস ব্রিটেনকে সাহায্য করতে রাজী বলে ১৯৪০'এর জুলাইয়ে জাতীয় কংগ্রেস কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু বড়লাট লিনলিথগোর ৮ই আগস্টের ঘোষণায় ভবিষ্যতে ডোমিনিয়ন স্টেটাস'এর প্রতিশ্রুতির বেশি কিছু ছিল না। উপরন্তু এই ঘোষণায় সংখ্যালঘু স্বার্থের দিকে অহেতুক মনোযোগ পাকিস্তান দাবীর সম্ভাবনাকে পরিপুষ্ট করে। হতাশ কংগ্রেস ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

১৯৪১'এর শেষদিক থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ আরও জটিল হয়ে ওঠে। ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণের পর আমেরিকা যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় জাপানী অধিকারে আসে।

১৯৪২'এর মার্চ মাসে রেঙ্গুন ও আন্দামানের পতনে যুদ্ধ ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই পরিস্থিতিতে জাপানী আগ্রাসন প্রতিরোধ ও ভারতীয় সাম্রাজ্যরক্ষায় ভারতবাসীর সমর্থন লাভের জন্য কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছিল।

কেবল সামরিক প্রয়োজন নয়, ভারতীয় সংকট নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য ব্রিটেনের ওপর আন্তর্জাতিক চাপও বাড়ছিল। আমেরিকা আটলান্টিক চার্টারে ঘোষিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পৃথিবীর সমস্ত দেশে কার্যকরী করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। রুজভেল্ট ১৯৪১'এর ডিসেম্বরে চার্চিলের সঙ্গে তার বৈঠকে ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নটি তোলেন। ১৯৪২'এর মার্চে রুজভেল্ট ভারতে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি সাময়িক ডোমিনিয়ন সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। চীনের রাষ্ট্রপতি চিয়াং-কাই-শেক'ও ভারতে ব্রিটিশ নীতি পরিবর্তনে আমেরিকা ও ব্রিটেন'কে উদ্যোগী হতে বলেন। ব্রিটেনে উপপ্রধানমন্ত্রী এটলী, ক্রিপস'এর মতো শ্রমিকদলের নেতারাও ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা মেটানোর জন্য উদ্যোগী হওয়ার দাবী তোলেন। অবশেষে ১৯৪২'এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একটি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে বলা হয় — যুদ্ধ শেষে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সমেত ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হবে। প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'Constitution-making body' তৈরী হবে। অবশ্য কোন প্রদেশ ইচ্ছে করলে এতে যোগ নাও দিতে পারে। প্রস্তাবের (e) অনুচ্ছেদে বলা হয় যুদ্ধকালীন সময়ে 'the control and direction of the defence of India' ব্রিটিশদের হাতেই থাকবে। এই খসড়ার ভিত্তিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ক্রিপসকে (স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস) ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

বড়লাট লিনলিথগো প্রথম থেকেই 'Provincial Option'এর বিরোধী ছিলেন। ভারতে রাজনৈতিক সমস্যার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি। তার ওপর ক্রিপস'কে ভারতে পাঠানোর ব্যাপারেও তার মতামত নেওয়া হয়নি। ক্রুদ্ধ বড়লাট পদত্যাগের হুমকি দিলে চার্চিল তাকে জানালেন যে এই মূহুর্তে গুজব, প্রচার এবং আমেরিকান চাপে "the Cripps Mission is indispensable to prove our honesty of purpose... If it is rejected by Indian parties... our sincereity will be proved to the World"। ঘটনাপ্রবাহ চার্চিলেরও মনপুতঃ ছিল না। ক্রিপসকে বলা হল বড়লাট ও প্রধান সেনাপতির সাথে পরামর্শ করে চলতে। তাকে আরও বলা হল ভারতীয়দের Executive Council'এ স্থান দেওয়া হবে 'Provided this does not embarrass the defence and good government of the country during the present critical time'.

৭.৭.১৩.২.২ : ক্রিপস প্রস্তাবগুচ্ছ ও ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া

একজন সফল আইনজীবী, সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল এবং ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষ হিসাবে ক্রিপসকে ভারতীয় রাজনীতির জটিল গ্রন্থি মোচনের উপযুক্ত ভাবা হয়েছিল। ১৯৪২'এর ২৩'শে মার্চ ভারতে পৌঁছে তিনি কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ব্রিটিশ সরকারের খসড়া প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। ২৯শে মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রিপস যে প্রস্তাব ঘোষণা করলেন তাতে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়ে দুধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হল। বলা হল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দেওয়া হবে এবং এরজন্য যুদ্ধের শেষে একটি সংবিধান সভা গঠিত হবে। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্য উভয়ের থেকেই সদস্য নেওয়া হবে। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভার নিম্নতর কক্ষের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

দেশীয় রাজ্যগুলোর সদস্যরা হবেন দেশীয় রাজাদের মনোনীত। যদি কিছু প্রদেশ শাসনতন্ত্র না মেনে নেয় তবে তারা বর্তমান অবস্থায় থাকবে। পরে ইচ্ছে হলে তারা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারে, না হলে তাদের ভারতীয় ইউনিয়নের সমমর্যাদাসম্পন্ন শাসনতন্ত্র দেওয়া হবে। ভারত কমনওয়েলথ'এ থাকতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু ব্রিটেনের স্বার্থ, দায়িত্ব ইত্যাদির জন্য তাকে ব্রিটিশ সরকারের সাথে এক চুক্তি করতে হবে। ক্রিপস প্রস্তাবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। তবে আশ্বাস দেওয়া হয় যে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল পদে ভারতীয়রা নিযুক্ত হবেন। কেবল প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত সামরিক দায়িত্ব ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে থাকবে, যদিও এক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সদস্য হিসাবে একজন ভারতীয় থাকবে।

ক্রিপস'এর প্রস্তাবগুলি ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে হতাশার সৃষ্টি করে। যুদ্ধের শেষে ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রতিষ্ঠার আশ্বাস কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। 'দেশীয় রাজাদের 'প্যারামাউন্ট পাওয়ার' হিসাবে ব্রিটিশরা রক্ষা করবে' বা তারা গণপরিষদে মনোনীত প্রতিনিধি পাঠাবে এ বিষয়টিও কংগ্রেসেও মনপুত ছিল না। তাছাড়া কোন প্রদেশ ভারতীয় ডোমিনিয়নে থাকতে না চাইলে আলাদা সংবিধান সভা ও শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার পাবে এই প্রস্তাবে পাকিস্তান দাবীর পরোক্ষ স্বীকৃতি থাকায় কংগ্রেসের কাছে তা গ্রহণীয় হয়নি। বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদকে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদের মর্যাদা দেবার কংগ্রেসী দাবী গ্রাহ্য হয়নি। একজন ভারতীয়র হাতে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার তুলে দেওয়ার যে দাবী কংগ্রেস করেছিল তাও গ্রাহ্য হয়নি। যুদ্ধকালীন সময়ে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকায় কংগ্রেস ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ ক্রিপস'কে জানান যে পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন মন্ত্রীসভা সমেত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে অবস্থার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। 'আমরা দায়িত্ব নিতে পারি না যদি না আমাদের তা পালন করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা না দেওয়া হয়।'

ক্রিপস প্রস্তাবে পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি মুসলিম লীগকে খুশি করেছিল এবং জিন্না জানিয়েছিলেন যে লীগ 'নীতিগতভাবে ক্রিপস'এর ঘোষণা মেনে নিচ্ছে। তবে জিন্নাও চেয়েছিলেন বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদকে 'ক্যাবিনেটের মর্যাদা দেওয়া হোক। তবে সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় লীগ অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ক্রিপস প্রস্তাবে ভারত বিভাগের ইঙ্গিত থাকায় শিখ সম্প্রদায় ও হিন্দু মহাসভা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা আম্বেদকরও সংবিধান সভায় বর্ণহিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় আশঙ্কিত ছিলেন। বস্তুতঃ যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয়দের হাতে কোন কার্যকরী ক্ষমতা দেওয়ার ইঙ্গিত ক্রিপস প্রস্তাবে না থাকায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই কমবেশী অসন্তুষ্ট ছিল।

৭.৭.১৩.২.৩ : ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ও ভারতীয় রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার জন্য ক্রিপস নিজে জাতীয় কংগ্রেসের, বিশেষ করে গান্ধীজীর অনমনীয় মনোভাবকে প্রধানতঃ দায়ী করেছেন। একথা সত্যি যে গান্ধীজী 'deliberately kept very much in the background throughout Cripps' stay in India' এবং ক্রিপস প্রস্তাবে পাকিস্তানের ইঙ্গিত, গণপরিষদে দেশীয় রাজাদের মনোনীত সদস্য প্রেরণ এবং প্রতিরক্ষায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যও গান্ধীজীর মনোভাবের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আজাদ, নেহেরু, রাজাগোপালাচারীর মতো নেতারা কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা দপ্তর ভারতবাসীর হাতে থাকলেই ক্রিপস প্রস্তাব মানতে সম্মত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ উদ্ধত, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার

ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত ক্ষমতাদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং ভারত সচিব আমেরী, বড়লাট লর্ড লিনলিথগো, প্রধান সেনাপতি ওয়াভেল প্রতিপদক্ষেপে ক্রিপসের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। ক্রিপস নিজেও ব্যক্তিগতভাবে প্রগতিশীল ও উদারমনা হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় রাজনীতির জটিলতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। নেহেরুর মতে, ক্রিপস নিজেকে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার 'বাহ্যিক প্রতিনিধি' রূপে জাহির করতেই বেশি সচেষ্ট ছিলেন এবং পূর্বনির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

যাইহোক, ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা একদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে নৈরাশ্য ও জটিলতার সৃষ্টি করেছিল তেমনি অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক ও বিভেদপন্থী দলগুলির তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব প্রকট হয়েছিল। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে শক্তি সুসংহত করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই তৎপরতার মূলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা থাকলেও, জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্বও কম ছিল না। কংগ্রেসের ক্রিপস প্রস্তাব বর্জন মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা শুধু ভারতীয় রাজনীতি নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতায় গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করেন ও ক্রিপসকে ফিরে না আসার অনুরোধ জানান। রুজভেল্ট হপকিন্স্‌কে লেখেন "American public opinion cannot understand why, if the British Government is willing to permit the component parts of India to secede from the British Empire after the war, it is not willing to permit them to enjoy self-government during the war.' নেহেরু একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে রুজভেল্টকে জানান যে ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার ফলে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবাসী প্রকৃত অর্থে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। কারণ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রকৃত প্রতিরোধ সংগঠিত করা কষ্টসাধ্য।

ভারতীয় রাজনীতির এই অচলাবস্থা, সাম্প্রদায়িক জটিলতা ও জাতীয়তাবাদী মহলে নৈরাশ্যের মধ্যেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অগ্রগতি ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগজনক হয়ে উঠল। জাপানের প্রতি সহানুভূতিশীল না হলেও অনেকের মনে হয়েছিল যে জাপ আক্রমণ ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনকই হবে কারণ এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসিত হবে। ভারতের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্রিটিশ সরকারের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিল। হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে গান্ধীজী এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হলে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা লোপ পাবে। স্বাধীন ভারতই বৈদেশিক আক্রমনের মোকাবিলা করতে পারবে। ব্রিটিশ ক্ষমতার অবসানই ভারতীয় জনগণের পারস্পরিক বিভেদ দূর করবে। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধকালীন সময়ে কোন গণআন্দোলন বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। মুসলিম লীগ কংগ্রেসী আন্দোলনে সংখ্যালঘু স্বার্থ বিপন্ন হবে বলে প্রচার করতে শুরু করল। হিন্দু মহাসভা ও উদারপন্থীরাও আন্দোলনের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস দ্রুত ও ব্যাপক এক গণআন্দোলনকেই আসন্ন বিপদ ও অচলাবস্থার একমাত্র সমাধান গণ্য করে 'ভারত ছাড়' কর্মসূচী গ্রহণ করল।

৭.৭.১৩.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) সুমিত সরকার — আধুনিক ভারত।

(২) শেখর চট্টোপাধ্যায় — পলাশী থেকে পার্টিশন।

(৩) অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

(৪) B.R. Tomlinson – Indian National Congress and the Raj.

৭.৭.১৩.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) কোন পরিস্থিতিতে ভারতে ক্রিপস মিশন প্রেরিত হয়েছিল? এই মিশন ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

(২) ক্রিপস'এর প্রস্তাবগুলি ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল? ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ভারতীয় রাজনীতিতে কী প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

WORKING OF CONGRESS COMMUNAL POLITICS AND SUBHAS CHANDRA BOSE

একক - ১৪

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দেশভাগ (১৮৫৮-১৯৪৭)

Communal Politics and Partition (1858-1947)

গঠন (Structure) :

৭.৭.১৪.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.৭.১৪.২.১ : ভূমিকা

৭.৭.১৪.২.২ : সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ

৭.৭.১৪.২.৩ : স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন

৭.৭.১৪.২.৪ : মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

৭.৭.১৪.২.৫ : মর্লে-মিন্টো সংস্কার

৭.৭.১৪.২.৬ : লক্ষ্ণৌ চুক্তি

৭.৭.১৪.২.৭ : পাকিস্তান আন্দোলন

৭.৭.১৪.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৭.১৪.২.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৭.১৪.২.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ।

২। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন।

৩। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট।

৪। মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রতিক্রিয়া।

৫। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব।

৬। পাকিস্তান আন্দোলন এবং তার ফলাফল

৭.৭.১৪.২.১ : ভূমিকা

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা নিছক সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য মুসলিম উচ্চাশা ও আকাঙ্খার ফসল ছিল না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রভাবের প্রতি একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভীতির মধ্যেই মুসলিম লীগের উদ্ভবের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিহিত আছে। এই ভীতিবোধ লালন করেছিল সাম্প্রদায়িকতাকে, যাকে সমর্থন জুগিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারী ভেদনীতি, এবং নেতিবাচক প্রভাবে পুষ্ট করেছিল হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ। বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ ও ঢাকায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ছিল উপরোক্ত তিন উপাদানের মিলিত ফসল। এই স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির অন্তিম ও অবধারিত ফল ছিল ১৯৪৭ সালের ১৪-ই অগাষ্ট একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের জন্ম।

৭.৭.১৪.২.২ : সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ

ভারতীয় মুসলমানদের অর্ধাশ বসবাস করত বাংলায়, এবং বাংলায় মুসলমানদের সিংহভাগই পূর্ব বাংলায় বাস করত। পূর্ব, মধ্য এবং উত্তর বাংলা ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। এই তিন অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৬০% এবং সমগ্র বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৮% ছিল মুসলমান। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ অবিভক্ত বাংলায় ভাগীরথী নদী যেন সাংস্কৃতিক জলবিভাজিকা রূপে প্রবাহিত ছিল। এর পূর্ব তীর মুসলিম এবং পশ্চিম তীর ছিল হিন্দু অধ্যুষিত।

বাংলার মুসলমান জনসাধারণ ছিল মূলতঃ গ্রামীণ। ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী, বাংলার শহুরে জনসাধারণের ৬৭.০১% ছিল হিন্দু, এবং মাত্র ৩.০৮% মুসলমান। এই গ্রামীণ মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবি, এবং কৃষিজীবিদের সিংহভাগই ছিল ভাগচাষী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাখরগঞ্জ জেলায় মোট জনসাধারণের ৬৪.০৮% মুসলমান হলেও জেলার মাত্র ১০% জমি তাদের মালিকানায় ছিল, যা থেকে জেলার মোট ভূমিরাজস্বের মাত্র ৯% আদায় হতো। পূর্ব বাংলায় ভূমি মালিকানা ছিল হিন্দুকবলিত, বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দু জেন্ট্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কার্যতঃ শ্রেণীগত পার্থক্যে পরিণত হয়েছিল। রফিউদ্দিন আহমেদের মতে বাংলায় মুসলমানদের পরিচিতির স্তর ছিল দ্বিবিধ, — (১) ভাষাভিত্তিক বাঙালী পরিচিতি, এবং (২) ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক মুসলমান পরিচিতি। দ্বিতীয় পরিচিতিটি আরো

দৃঢ় হয়েছিল ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের ফলে। আহমেদ দেখিয়েছেন, বাংলার মুসলমান সমাজ আনুভূমিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। বৈদেশিক সংস্কৃতির ধারক, অবাঙালী উর্দুভাষী শহুরে আশরফ এলিট মুসলমানরা কলকাতা ও ঢাকায় বাস করতেন। অন্যদিকে সিংহভাগ মুসলমান ছিল আত্রপ বা আজলফ গোষ্ঠীভুক্ত, গ্রামের বাসিন্দা, যারা বাংলার মূল হিন্দু জনগোষ্ঠীরই ধর্মান্তরিত অংশ ছিল। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলত মোল্লা ও উলেমা সম্প্রদায়। বাংলা মুসলিম সংহতিবোধ গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় ভিত্তিতে সংগঠিত অঞ্জুমন্দ্‌গুলিকে আশ্রয় করে। জওহরলাল নেহরু তাঁর Discovery of India গ্রন্থে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একধরণের ভীতি মনস্তত্ত্বের কথা তুলেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সূচিত হবার পরে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের শতাব্দী লালিত পদমর্যাদা ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার দরুণ তাদের মধ্যে যে বঞ্চনাবোধের জন্ম হয়েছিল, হান্টার তার সবিস্তার আলোচনা করেছেন। অনিল শীল দেখিয়েছেন যে কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল থেকে নূতন আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রচলনের ফলে মুসলমানরা সরকারী পেশা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সরকারী কাজকর্মে ফার্সীর জায়গায় ইংরেজীর ব্যবহার শুরু হলে মুসলমানদের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেওয়া আর সম্ভব হয় নি। ১৮৬৭ সালেও বাংলায় সরকারী চাকুরীরত ভারতীয়দের ১১.০৭% ছিলেন মুসলমান, যা ১৮৮৭ সালে হ্রাস পেয়ে ৭% -এ এসে দাঁড়ায়। ১৮৭১ সালে গেজেটেড ভারতীয় কর্মচারীদের ১২% ছিলেন মুসলমান, যা মাত্র ১০ বৎসর পরে ৮ শতাংশে নেমে আসে। ইতিপূর্বেই সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগে মুসলমান আধিপত্যের অবসান ঘটেছিল। পেশাগত ক্ষেত্রে এই ক্রমিক ব্যর্থতা মুসলমানদের মধ্যে ভীতিবোধ ও নিরাপত্তাহীনতার সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

উত্তর ভারতে মুসলমানদের অবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্ন। উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের দুই প্রধান শক্তিকেন্দ্র ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং অযোধ্যা। উত্তর ভারতে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩% ছিল। কিন্তু সংখ্যালঘুত্ব তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি, প্রভাব বা শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসনকালেও ভূস্বামী, শাসনকর্তা ও পেশাদার শ্রেণী হিসাবে সমাজে নিজেদের স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক একাধিক নূতন রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রচলন সত্ত্বেও উত্তর ভারতে মুসলমানদের ভূম্যধিকারে বিশেষ তারতম্য ঘটে নি। ক্রেতাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান, এবং অযোধ্যার ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুনর্বাসিত তালুকদারদেরও অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। উত্তর ভারতে সরকারী চাকুরীতে ও বিচার বিভাগে মুসলমানরা যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োজিত ছিলেন।

কিন্তু ক্রমেই উত্তর ভারতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৮৮০-র দশক থেকে উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা শিক্ষিত হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে উত্তর ভারতে অধস্তন শাসন ও বিচার বিভাগীয় পদগুলির ৬৩.০৯% ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। এই শতকরা হার ১৮৮৬-'৮৭ সালে ৪৫.০১% এবং ১৯১৩ সালে ৩৪.০৭ -এ নেমে আসে। অন্যদিকে একই ক্ষেত্রে হিন্দু অংশগ্রহণের মাত্রা ১৮৫৭ সালে ২৪.০১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮৬-'৮৭ সালে ৫০.০৩% এবং ১৯১৩ সালে ৬০% -এ গিয়ে পৌঁছয়। এই নির্দিষ্ট ঘটনা উত্তর ভারতের মুসলমানদের রাজনীতিতে টেনে আনে। উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পেশাদার গোষ্ঠীটিই রাজনৈতিকভাবে সব থেকে বেশী সচেতন ছিল, এবং ভূস্বামী মুসলমানরা এই গোষ্ঠীটির নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই পেশাদার গোষ্ঠীটিই ব্রিটিশ শক্তির প্রতি আনুগত্যমূলক রাজনীতির এক নূতন নীতি অনুকরণ করেছিল। এক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতীয় পরিস্থিতির এক মৌলিক পার্থক্য ছিল। বাংলায় কোনও মুসলমান পেশাদার শ্রেণী ছিল না। অন্যদিকে, উত্তর ভারতে উলেমাদের সঙ্গে পেশাদার মুসলিম গোষ্ঠীটির সম্পর্ক ভালো ছিল না। কারণ উত্তর ভারতীয় উলেমারা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী।

৭.৭.১৪.২.৩ : স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে যে নূতন 'কসমোপলিটান' জনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার বাস্তব অভিজ্ঞতার এক প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠা আলিগড় আন্দোলন উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একটি 'কসমোপলিটান' সাম্রাজ্য হিসাবে গণ্য না ক'রে গণ্য করতেন বরং মুঘল সাম্রাজ্যেরই একটি প্রলম্বিত ও ধারাবাহিক রূপ হিসাবে। তিনি যুক্তি দেখান যে প্রাক্তন শাসক শ্রেণী হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। লেলিভেল্ড লিখেছেন, উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই পরিচিতি - সচেতনতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল স্বাজাত্যবোধ ('কায়ুম' -এর অঙ্গীভূত, এই বোধ)। এই নূতন পরিচিতির উদ্ভব ও বিস্তারে কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বাধীন আলিগড় আন্দোলন।

ফ্রান্সিস রবিনসন মন্তব্য করেছেন, সৈয়দ আহমদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত পেশাদার হিন্দুদের প্রতি মুসলিম আশরফদের ক্ষোভ মূর্তল রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিশেষতঃ কাশ্মিরী পণ্ডিত, উত্তর প্রদেশের কায়স্থ এবং উচ্চবর্ণীয় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত হিন্দুদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের সরকারের পাশে এসে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানান। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর মধ্যে যে তিক্ততা ও বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করার উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হলে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সংহতিবোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৫ সালে আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে ইসলামীয় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় শিক্ষার মেল বন্ধন ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে আলিগড় কলেজ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সৈয়দ আহমদ প্রচার করেন যে কংগ্রেস একটি হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এবং কংগ্রেসের উত্থানের ফলে একটি স্থায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। মুসলিম জনমত সংহত করার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ ১৮৮৬ সালে এ্যানুয়াল মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স স্থাপন করেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ স্যার সৈয়দের মীরাট ভাষণে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যাতে তিনি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত সংখ্যালঘু মুসলিম ভীতির প্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে এক নূতন মোড় এনেছিল আর্য সমাজের নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ এবং গো-হত্যা বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জ্ঞান পাণ্ডে দেখিয়েছেন যে, উত্তর প্রদেশের ভোজপুরী ভাষাভাষি অঞ্চলে গোহত্যাকে কেন্দ্র ক'রে কীভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গড়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল মহারাষ্ট্রে শিবাজী ও গণপতি উৎসব এবং বাংলায় অরবিন্দ কর্তৃক ভবানীর মাতৃরূপ চিত্রায়নের ফলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নাগরী প্রচারিণী সভার উর্দু বিরোধী অভিযান। এছাড়া চরমপন্থীদের প্রাচীন আর্য তথা হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী মনস্তত্ত্বকে আরোই দৃঢ় করে তুলেছিল।

লেলিভেল্ড লিখেছেন, ঊনবিংশ শতকের শেষাশেষি উত্তর ভারতের মুসলমানদের একাংশের মধ্যে আলিগড় কলেজের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল, যার প্রমাণ মিলেছিল কলেজের ছাত্র সংখ্যার অবনতির মধ্যে। লেলিভেল্ড

লিখেছেন, এই পরিস্থিতিতে কলেজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ এক নূতন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই আলিগড় কলেজের ইওরোপীয় অধ্যক্ষ থিওডর বেকের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৯৩ সালে গড়ে ওঠে মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা রোধ করা এবং মুসলমানদের স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী সংগঠিত করা।

কিন্তু ১৮৯৮ সালে সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর পরে তরুণ মুসলিম প্রজন্ম ক্রমেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে অনাস্থা পোষণ করতে থাকে। এই অনাস্থার কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, সৈয়দ আহমদ উলেমাদের নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান ক'রে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে তুলে এনেছিলেন। এই 'এলিট' নেতৃত্ব নূতন প্রজন্মের পছন্দ ছিল না, তারা বরং ইসলামকে প্রধান সাংগঠনিক শক্তিতে পরিণত করার পক্ষপাতি ছিল, এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব তারা দিতে চেয়েছিল উলেমাদের হাতে। এর ফলে উত্তর ভারতে মুসলিম রাজনীতির ইসলামীকরণ শুরু হয়। এই প্রবণতার প্রধান মুখপাত্র ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং লক্ষ্ণৌ-এর উলেমা আবদুল বারি। দ্বিতীয়তঃ, নূতন প্রজন্মের সরকারের প্রতি আনুগত্যমূলক রাজনীতিতে কোনও আস্থা ছিল না। এই আনুগত্যমূলক রাজনীতির প্রতি তাদের অনাস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল লেফটেন্যান্ট গভর্নর ম্যাকডোনাল্ডের মুসলমান বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি হিন্দুপন্থী নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনই হিন্দী-উর্দু বিতর্ক কালে প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে ১৯০০ সালে ১৪ই এপ্রিল 'নাগরী প্রস্তাব' বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট পদক্ষেপ মুসলমানদের নিকট তাদের সংস্কৃতিবোধের উপর একটি আক্রমণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় তারা 'উর্দু ডিফেন্স্ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করে। ম্যাকডোনাল্ড আলিগড়মূলক নীতির দেউলিয়ানা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে ওঠে যখন বাংলার কিছু প্রভাবশালী মুসলমান নেতা জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করার হুমকি দেন। এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত প্রবীণ ও নবীন মুসলিম নেতৃবর্গ ভারতীয় মুসলমানদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেন।

৭.৭.১৪.২.৪ : মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১৮৯৯ সালেই লক্ষ্ণৌয়ে একটি কংগ্রেসবিরোধী কমিটি গঠিত হয়েছিল, এবং তার দুই বৎসর পরে ১৯০১ সালে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯০৩ সালে আলিগড় কলেজের এক প্রভাবশালী সদস্য ডিকার উল্-মুল্কের নেতৃত্বে একটি সরকারপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে, যদিও সংগঠনটি বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। এ'কথা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে বাংলার মুসলমানদের সহায়তা ব্যতীত কেবলমাত্র আলিগড় গোষ্ঠীর পক্ষে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না।

আলিগড় ও বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৯ সালে কলকাতায় মহম্যাডান এডুকেশন কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনে। কিন্তু এই সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মূলতঃ দুটি কারণে নেতৃত্বের সংকট দেখা গিয়েছিল, — ১৮৯৩ সালে আব্দুল লতিফের মৃত্যুর দরুণ, এবং আমীর আলি বিলাতে গিয়ে বসবাস করতে থাকার কারণে। বঙ্গভঙ্গের আগে বাংলার মুসলমানদের কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। বঙ্গভঙ্গের পরে ঢাকা নূতন শক্তিকেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার মুসলমানদের নূতন নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন ঢাকার নবাব সালিমুল্লাহ। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে মহমেডান পলিটিকাল ইউনিয়ান।

১৯০৬ সালে নির্দিষ্ট তিনটি ঘটনা মুসলিম লীগের (১৯০৬) প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল, — ফুলারের পদত্যাগ, মর্লের বাজেট বক্তৃতা এবং সিমলা দৌত্য। বঙ্গভঙ্গের ফলে গড়ে ওঠা নূতন প্রদেশটির প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রতি ফুলারের যথেষ্ট সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের চাপে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। ফুলারের পদত্যাগ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের যৎপরোনাস্তি আতঙ্কিত করে তোলে। মুসলমানরা এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে অতঃপর সরকার হয়ত' স্বদেশী চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে, বঙ্গভঙ্গ রদ হবে এবং বাংলায় মুসলিম রাজনীতির পথ রুদ্ধ হবে। ফুলারের পদত্যাগ বাংলার মুসলমান সমাজকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৎক্ষণাৎ গড়ে তুলতে প্ররোচিত করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি, অর্থাৎ মর্লের বাজেট বক্তৃতায় মর্লে ইঙ্গিত দেন যে প্রদেশগুলিতে এবং কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার নির্বাচন আহ্বান করার কথা বিবেচনা করছে। বস্তুতঃ মর্লের এই বাজেট ভাষণ ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ ছিল। মর্লের এই বক্তৃতা উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। তারা এই কথা ভেবে ভীত হয়ে পড়ে যে ১৮৯২ সাল থেকে ভোগ করে আসা বিশেষ সাম্প্রদায়িক সুযোগ-সুবিধা থেকে এর ফলে তারা বঞ্চিত হবে। এই পরিস্থিতিতে আলিগড় কলেজের সচিব মহসিন-উল্-মুলক্ কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ডকে এই মর্মে পত্র দেন যে বিক্ষুব্ধ তরুণতর নেতৃবর্গের আক্রমণে প্রবীণতর নেতারা বিব্রত বোধ করছেন, এবং সেই কারণেই প্রস্তাবিত আইন সভাগুলিকে সম্ভাব্য হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভাইসরয়ের নিকট থেকে মুসলমানদের উপযুক্ত আশ্বাস অর্জন করা আশু প্রয়োজন। এরই ফল ছিল ১৯০৬ সালে ১লা অক্টোবরে সিমলা দৌত্য।

মুসলিম স্বতন্ত্রীকরণে ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বও কিছু কম ছিল না। বহুপূর্বে ১৮৬১ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্স্ বিল সংক্রান্ত বিতর্কে চার্লস্ উড ভারতীয় জনসাধারণের ভাষাভিত্তিক, ধর্মীয় ও প্রথাগত বিবিধতার কথা তুলে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কলভিন এবং হান্টারের মতো ব্রিটিশ বেসামরিক সরকারী কর্মচারীরাও মুসলিমপন্থী সরকারীনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাদেশিক কাউন্সিল সংক্রান্ত লর্ড ডাফরিনের কমিটি ১৮৮৮ সালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাম্য দূর করার জন্য সরকারকে মনোনয়ন পদ্ধতির উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিল। ডাফরিন কংগ্রেসকে একটি 'আনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু' প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, ডাফরিনের এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত 'ইণ্ডিয়া অফিস' অথবা ভারতীয় মুসলমানরা উপলব্ধি করতে ভুল করে নি, ১৮৯২ সালে বিধিবদ্ধ লর্ড ক্রসের আইনে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রারম্ভিক চিহ্ন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সন্তুষ্ট ল্যান্সডাউন মন্তব্য করেছিলেন, এই নূতন আইনের ফলে কাউন্সিলাররা /অঞ্চল অথবা সংখ্যা অপেক্ষা সামাজিক শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করবেন বেশী। কার্জনও এই সরকারী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ত্রিপাঠী লিখেছেন, বঙ্গ ভঙ্গ পরিকল্পনা ছিল একটি দ্বিমুখী অস্ত্র, যার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি ক'রে ভাষাগত ও ধর্মীয় দিক থেকে বাঙালী হিন্দুদের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত ক'রে কার্জন কংগ্রেসী আন্দোলনকে দুর্বল ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশ, মুসলমানদের পৃথক সরকার, বিচার ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সুযোগ দিয়ে কার্জন হিন্দু মধ্যবিত্তদের আর্থিক ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদের অংশ গ্রহণের মাত্রা কিছু কম ছিল না। আব্দুল রসুল এবং লিয়াকৎ হোসেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং বিপিন চন্দ্র পালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গজনভির 'বেঙ্গল হোসিয়ারী' মুসলিম স্বদেশী উদ্যোগের এক মহৎ দৃষ্টান্ত

ছিল। এমনকী রাখীবন্ধন দিবসেও মুসলমানরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আলিগড় কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ থিওডর মরিসন এবং রাষ্ট্রসচিব মর্লে স্বদেশী আন্দোলনে এই মুসলিম অংশগ্রহণে তাঁদের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মিন্টো আন্দোলনকারীদের জাতীয়তাবাদী পরিচিতি খর্ব করার উদ্দেশ্যে তাদের হিন্দু পরিচিতি তুলে ধরতে থাকেন। অতঃপর ব্যামফিল্ড ফুলার পদত্যাগ পত্র পেশ করলে ও মর্লে বাজেট ভাষণ প্রদান করলে সিমলা দৌত্যের পথ সুগম হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় ভাইসরয়ের আশ্বাস মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ফুলারের উত্তরসূরী, পূর্ব বাংলা ও আসামের নূতন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হেয়ার, ভাইসরয়কে সিমলা দৌত্যের মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন। দুই ব্রিটিশ আমলার সহায়তায়, আলিগড় কলেজের সচিব মহসিন-উল্-মুল্কের আগ্রহে এবং কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ডের উদ্যোগে ভাইসরয় মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তারিখ স্থির হয় ১লা অক্টোবর, ১৯০৬। স্থির হয় যে আইনসভার পরিকাঠামো সম্পর্কে সরকার কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বেই মুসলমানরা ভাইসরয়ের নিকট তাদের 'ন্যায্য দাবী' উত্থাপন করবে। সিমলা দৌত্যের দুই প্রধান নেতা আগা খান এবং মহসিন-উল্-মুল্ক ভাইসরয়ের নিকট থেকে ভারতীয় মুসলমান সমাজ সম্পর্কে 'nation within the nation' এই পরিচিতি ও স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছিলেন, যে পরিচিতিকে ভিত্তি করে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সিমলায় মিন্টো সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ও বঙ্গভঙ্গ এবং ফুলার প্রসঙ্গ তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান। সিমলায় মিন্টো মাথাপিছু ভোটের অধিকার প্রদান না করলেও মুসলমানদের সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বার্থের সংরক্ষণের পূর্ণ আশ্বাস দেন। শুধু তাই নয়, ভাইসরয় মহসিন-উল-মুল্ককে ব্যক্তিগতভাবে জানান যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা অর্জন করার জন্য মুসলমানদের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন যে সিমলা দৌত্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের হাত মজবুত করে তুলেছিল এবং অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমান্তরাল একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তাৎক্ষণিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্ত কিছুর ফলে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ খানের উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মুসলিম অল ইণ্ডিয়া কনফেডারেসি' স্থাপিত হয়, যার নাম অচিরেই পরিবর্তিত করে রাখা হয় 'মুসলিম লীগ'।

জয়ন্তী মৈত্র মুসলিম পৃথকীকরণের রাজনীতি গড়ে ওঠার পিছনে বাংলার মুসলমান সমাজের ভূমিকাকে বড় করে দেখেছেন। সিমলা দৌত্যকালে যে স্মারক লিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তাতে বাংলার মুসলমানদের দুই কেন্দ্রীয় দাবি অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ এবং ফুলারের পদত্যাগ সংক্রান্ত দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আগা খান বিশ্বাস করতেন যে এই দুই দাবি যথেষ্ট স্পর্শকাতর হবার কারণে দাবিপত্রে এ'দুটির অন্তর্ভুক্তি অনুচিত হবে। এর ফলে বাংলার মুসলমানদের একাংশের ধারণা হয় যে আগা খান বঙ্গভঙ্গ বিরোধী, যে কারণে স্বাস্থ্য হানির অজুহাতে নবাব সলিমুল্লাহ সিমলা দৌত্যে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। সিমলা দৌত্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি। দৌত্যে পূর্ব বাংলার এই অকিঞ্চিৎকর প্রতিনিধিত্বের কারণে ফ্রান্সিস রবিনসন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে দৌত্যের প্রকৃত উদ্যোগ এসেছিল বরং আলিগড় নেতৃবর্গের তরফ থেকে। অন্যদিকে জয়ন্তী মৈত্র দেখিয়েছেন যে ভাইসরয় সমবেত প্রতিনিধিদের জানান যে পরবর্তী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকালে তাদের বিশেষ দাবি বিবেচনা করা হবে। ভাইসরয়ের এই আশ্বাসে উদ্দীপ্ত বাংলার মুসলমান নেতৃবর্গ ১৯০৬ সালে মহম্যাডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনকালে মুসলিম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে মৈত্র মন্তব্য করেছেন যে বাংলার মুসলমানদেরই উদ্যোগের ফলে ঢাকা সম্মেলনে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তাঁর মতে, সিমলায় এবং ঢাকা অধিবেশনে বাংলার

মুসলমানরা উত্তরভারতীয় মুসলমানদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে লীগ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্যোগ আলিগড়ের পক্ষ থেকে এসেছিল।

যাই হোক, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে, — ১) বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করা; ২) ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধি করা ও সেই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে তাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করা; এবং (৩) মুসলমানদের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাবের উদ্ভব প্রতিরোধ করা। ত্রিপাঠীর মতে, তৃতীয় লক্ষ্যটি ছিল সর্বতোভাবে অসার, কারণ লীগের উৎপত্তিই ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে গড়ে ওঠা মুসলমান উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে।

৭.৭.১৪.২.৫ : মর্লে-মিন্টো সংস্কার

ইতিমধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সচিব লর্ড মর্লে ও বড়লাট মিন্টো কিছু সংবিধানিক সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন। তদনুযায়ী, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টে সংস্কার যখন প্রবর্তিত হয় তা কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে ছাড়া আর কাউকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

মর্লে-মিন্টো সংস্কারে স্থির হয় যে গর্ভনর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক কাউন্সিলে একজন করে ভারতীয় সদস্যকে নিয়োগ করা হবে। এই দুই কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলেও সে দুটির মূলগত চরিত্রে কিন্তু কোনও পরিবর্তন করা হয় নি। কেন্দ্রীয় কউন্সিলে সরকারী সদস্যরা আগেরই মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ রইলেন। স্থির হয়, ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৭ জন নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হবেন। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এই গরিষ্ঠতা ছিল ময়ামাত্র, কারণ তার মধ্যে কিছু মনোনীত সদস্য থাকতেন।

আলোচ্য সংস্কার আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভার জন্য নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে (১) সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলী, যার অন্তভুক্ত ছিলেন প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যবর্গ, (২) শ্রেণী ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলী যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মুসলমান ও ভূস্বামী সম্প্রদায়, এবং (৩) বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী যা গড়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয় চেম্বার অফ কর্মাস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের অধিকাংশই নির্বাচিত হয়ে আসবেন নানা সমিতি, ভূস্বামী ব্যবসায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারা। এই ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে থেকেও প্রদেশিক গর্ভনর বা ভাইসরয় নিজের ইচ্ছামতো যে কোনও সদস্যকে রাজনৈতিক ভাবে অবাঞ্ছিত বলে বাদ দিতে পারতেন বলে স্থির হয়।

আইন সভাগুলির ক্ষমতাকে সীমায়িত রাখা হয়। প্রশ্নের উত্থাপক সদস্যেরই কেবল অধিকার ছিল সম্পূরক প্রশ্ন তোলার। উল্লেখযোগ্য, সেনাবাহিনী বা দেশীয় রাজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কের কিংবা প্রস্তাব গ্রহণের কোনও অধিকার আইনসভাগুলিকে দেওয়া হয় নি। সামগ্রিক বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করার বা ভোট গ্রহণের কোনও অধিকারও আইনসভাগুলিকে দেওয়া হয় নি। কেবল বাজেটের আংশিক আলোচনার মধ্যে এই অধিকারকে সীমিত রাখা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হবার আগেও কংগ্রেসের নেতৃবর্গ সরকারের সঙ্গে আপস-মীমাংসায় রাজী ছিলেন। কিন্তু আইন প্রবর্তিত হলে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটে। বস্তুতঃ সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সদিচ্ছাই সরকারের ছিল না, যে কারণে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছিল মুষ্টিমেয় মানুষকে। বস্তুতঃ মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার ভারতের জাতীয়

সংহতির পথে বিপুল অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিল। এই সংস্কার আইনে মুসলমানদের আইনসভায় পৃথকভাবে সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করে সরকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। ভোটদানের যোগ্যতার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে। তবে মুসলিম লীগ এই সিদ্ধান্তে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে।

মর্লে-মিন্টো সংস্কার ভারতীয়দের মধ্যে যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, তাকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। নূতন বন্দোবস্ত অনুযায়ী বিহার ও উড়িষ্যাকে আর বাংলাদেশের অংশ রাখা হল না, এবং আসামকে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হল। তার সঙ্গে ভারতের রাজধানীকেও কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল।

৭.৭.১৪.২.৬ : লক্ষ্ণৌ চুক্তি

বঙ্গভঙ্গ রদ হবার সিদ্ধান্ত বাংলার মুসলিম সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই ক্ষোভ ক্রমে সর্বভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নবিউল্লাহ মুসলমানদের আত্মশক্তির আদর্শ অনুসরণের পরামর্শ দেন। এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় মুসলিম সমাজে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তুরস্ককে কেন্দ্র করে। বল্কান যুদ্ধ ও তুরস্কের প্রতি অনুসৃত ব্রিটিশ নীতি ভারতীয় মুসলমানদের ক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। ইসলাম জগতের ধর্মগুরু তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে তুরস্কের বিদ্রোহী অমুসলমান প্রজাদের ইংল্যাণ্ড সাহায্য করায় ভারতের মুসলমানরা ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই নূতন পরিস্থিতিতে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বিবেচনা করতে থাকে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগ নাগাদ লীগের নেতৃত্বে ও সংগঠনে কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি প্রসারিত হয়। 'এলিট' নেতৃত্বের অবসান ঘটে, এবং লীগ একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। মৌলানা আজাদ, হাকিম আজমল এবং ডঃ আনসারির মতো মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অগ্রসর হন। মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান এবং মজহর-উল-হক এই সময়ে যে আহরার আন্দোলন শুরু করেন, তা' কংগ্রেসের চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে একই ক্ষুরে বাঁধা ছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বেছে নিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথ। এই সময়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও মহম্মদ আলির মতো নেতৃবর্গ লীগের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মুশিরুল হাসান দেখিয়েছেন যে এই সময়ে হালি, শিবলি, নোমানি এবং মহম্মদ ইকবালের রচিত কবিতার অন্তর্নিহিত ব্রিটিশ বিরোধিতা কীভাবে মুসলিম নবীন প্রজন্মকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

১৯১২ সালে মুসলিম লীগ কাউন্সিল লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯১৩ সালে লীগের নূতন সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯১৩ সালেই লীগ স্বায়ত্ত শাসনের লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং হিন্দু-মুসলিম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব রাখে। কংগ্রেস ও লীগের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে একই স্থানে দুই দলেরই অধিবেশন আহুত হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ব্রিটেনের

তুরস্ক বিরোধী নীতি ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরূপতা আরো বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক, এলিট নেতৃত্বও আলিগড়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ফলে লীগের দৃষ্টিভঙ্গীও চরমপন্থী হয়ে ওঠে। এই সময়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করার আগ্রহ দেখা দেয়। এই আগ্রহেরই ফল ছিল লক্ষ্ণৌ চুক্তি।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদনে বাল গঙ্গাধর তিলকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য একান্ত আবশ্যক। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যেতার আগ্রহ এতোই আন্তরিক ছিল যে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ও রয়তি সুবিধার দাবি মেনে নিতেও তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূল শর্তগুলি নিম্নরূপ। প্রথমতঃ, প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভার মুসলিম সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। দ্বিতীয়তঃ স্থির হয়, কেন্দ্রীয় আইন সভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান। আরো স্থির হয়, কংগ্রেস এবং লীগ যৌথভাবে সরকারের কাছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের বিলুপ্তি ও সাংবিধানিক সংস্কারের দাবি জানাবে। সর্বোপরি, লীগ কংগ্রেসের স্বরাজ সংক্রান্ত আদর্শে সম্মতি জানায়।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ চুক্তি এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত। কারণ এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরোধিতায় অগ্রসর হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যবর্তী ব্যবধান অলঙ্ঘনীয় নয়। কিন্তু গান্ধী এই চুক্তি সম্পর্কে বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর মতে, লক্ষ্ণৌ চুক্তি ছিল ধনী শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে ধনী শিক্ষিত মুসলমানের সমঝোতা বিশেষ। সাধারণ হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে এই চুক্তির কোনও সম্পর্ক ছিল না। শুধু তাই নয়, এই চুক্তিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র স্বার্থের উপর। রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে কংগ্রেস নেতৃবর্গ লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক গাঁটছড়া বাঁধার আশায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বকে পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর ফলে বরং ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ আরো প্রশস্ত হয়েছিল। জুডিথ ব্রাউন লিখেছেন, মুসলিম লীগ সকল স্তরের ভারতীয় মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে নি। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে লীগকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিহার ও উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত ব্যারিস্টার ও বুদ্ধিজীবি মহল। ফলে মুসলিম অভিজাত সমাজ লক্ষ্ণৌ চুক্তিকে মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু তা হলেও এই ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে গান্ধীর হাতে নূতন হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল। বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকেই আশ্রয় করে গান্ধী অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

৭.৭.১৪.২.৭ : পাকিস্তান আন্দোলন

কিন্তু অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলনের হিন্দু-মুসলিম সংহতি স্থায়ী হয় নি। কামাল পাশা খিলাফৎ পদ লোপ করলে খিলাফৎ আন্দোলনও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে আবার নূতন করে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

খিলাফৎ আন্দোলনের অবসানের পরে অভিজাত ও বিত্তবান মুসলিম নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নূতন করে মুসলমানদের সংহত করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। আগা খান, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, আবদুর রহিম প্রমুখ নেতৃবর্গ এখন মুসলমান রাজনীতির শীর্ষনেতারূপে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৪ সালে মুসলিম লীগকে পুণরুজ্জীবিত করা হয়, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভাও শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে

ভারতে সর্বমোট ৬২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আত্মপ্রকাশ করে। এই পর্বে মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বিখ্যাত উর্দু লেখক ও দার্শনিক স্যার মহম্মদ ইকবাল। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে আয়োজিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে তিনি ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলির সমন্বয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের প্রস্তাবও দেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৮ সালে জিন্নাহ কলকাতায় নিখিল ভারত সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের যে সমস্ত দাবি উত্থাপন করেছিলেন সেগুলি প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি আগা খানের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলান। নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনে যোগ দিয়ে অতঃপর জিন্নাহ ১৯২৯ সালে মার্চ মাসে তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করেন। জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবি নেহরু রিপোর্টের গণতান্ত্রিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাঁর চৌদ্দ দফা দাবির মধ্যে সাংবিধানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল।

মহম্মদ আলি ১৯৩০ সালে ঘোষণা করেন যে গান্ধীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দু মহাসভার উপর নির্ভরশীল করে তোলা। কংগ্রেসের পরিচালিত আন্দোলনকে তিনি 'হিন্দু আন্দোলন' অ্যাখ্যা দেন। গোল টেবিল বৈঠকের সময়ে মহম্মদ আলি স্পষ্টতঃ বলেন যে ভারতীয় মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী হতে পারেন না, কারণ তাঁরা কেবলমাত্র ভারতীয় আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নন। ভারতীয় মুসলমানরা অখণ্ড ঐস্লামিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এর মধ্যে ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামধাজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেবার প্রস্তাব দেন।

'পাকিস্তান' শব্দটির প্রস্তাবক ছিলেন কেম্ব্রিজে পাঠরত জনৈক পাঞ্জাবী মুসলিম ছাত্র চৌধুরী রহমৎ আলি। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত 'এখন, অথবা কখনও নয়' শীর্ষক এক ইস্তাহারে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে 'পাকিস্তান' নামে এক নূতন রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান।

১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে লীগ রাজনীতির কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। ১৯৩৪ সালে তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। অথচ প্রথম জীবনে জিন্নাহ একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে তিনি কংগ্রেস বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৯২৯ সালে চৌদ্দদফা দাবি পেশ করার পরে তাঁর রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটে এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক নেতারূপে ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভূত হন।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনগুলিতেও লীগ আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ১১টি প্রদেশে মোট ৪৮৫টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে লীগ সামান্য আসল দখল করতে পেরেছিল। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশের মতো মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলেও লীগ একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারে নি, পাঞ্জাবে ৪৮টি সংরক্ষিত আসনের মাত্র একটি এবং বাংলায় ১১৭টি সংরক্ষিত আসনের মাত্র একটি এবং বাংলায় ১১৭টি সংরক্ষিত আসনের মাত্র ৪৯টি লীগ জয়লাভ করেছিল। ফলে উপরোক্ত চারটি প্রদেশের কোনটিতেই লীগ সরকার গঠন করতে পারে নি, ১৯৩৭ সালে নির্বাচন কংগ্রেসের প্রতি লীগের বিদ্বেষ আরোই বৃদ্ধি করেছিল।

কংগ্রেস এই সময়ে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশে জনসংযোগের আন্দোলন শুরু করলে জিন্নার উদ্যোগে লীগও জাতীয় স্তরে মুসলমান সংহতি বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। এর ফলে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার

হায়াৎ খান, বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ও আসামের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শায়াদুল্লাহ্ লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌতে লীগের বার্ষিক অধিবেশনে জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমানদের সমস্ত বিভেদ ভুলে লীগের অন্তর্ভুক্ত হবার আবেদন জানান। তিনি ঘোষণা করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনে ভারতীয় মুসলমানদের কোনরূপ আশ্চর্যজনক অগ্রগতি ঘটা সম্ভব নয়। জিন্নাহ্-র এই উগ্র মনোভাব প্রশমিত করতে ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু এবং ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালান। এর প্রত্যুত্তরে জিন্নাহ্ কংগ্রেসের কাছে দুটি দাবি রাখেন, — ১) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসকে এ'কথা মেনে নিতে হবে, এবং ২) কংগ্রেসকে এ'কথাও স্বীকার করতে হবে যে কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান, কাজেই ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার কংগ্রেসের নেই। সহজবোধ্য কারণেই কংগ্রেসের পক্ষে জিন্নাহ্-র এই দুই প্রস্তাবের কোনটিই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

অতঃপর জিন্নাহ্ কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলিতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচারের কথা প্রচার করতে শুরু করেন। এই অত্যাচারের তদন্ত করার জন্য লীগ পীরপুরের রাজার সভাপতিত্বে যে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করে তার রির্পোট প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯৩৯ সালে বিহার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, শরিফ রিপোর্টে মুসলিমদের উপর হিন্দু অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে। ঐ বছরেই শেষ দিকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুর্দশা' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লীগ এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে ভারতের মতো বহুজাতিক দেশে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা অন্যায় ও অযৌক্তিক।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সরকার কংগ্রেস-বিরোধী নীতি অনুসরণ করে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। অতঃপর কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করলে জিন্নাহ্ 'কংগ্রেসী অত্যাচার' থেকে মুক্তিলাভ করায় মুসলমানদের 'মুক্তিদিবস' পালন করতে আহ্বান জানান।

১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ লাহোরে আহুত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ফজলুল হকের উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে প্রস্তাবটিতে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানানো হলেও 'পাকিস্তান' শব্দটি কিন্তু ব্যবহৃত হয় নি। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে মুসলিম লীগের উদ্যোগে পাকিস্তান প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ঘটে। এই সময়ে 'পাকিস্তান' গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই লীগের যাবতীয় কর্মসূচী পরিকল্পিত হয়েছিল। আলোচ্য সাত বৎসরে জিন্নাহ তথা লীগের ভূমিকাকে দুইটি কালানুক্রমিক পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে (১৯৪০-'৪৫) জিন্নাহ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৪৫-'৪৭) তিনি সাংবিধানিক পথ পরিহার ক'রে পাকিস্তানের দাবিতে অনমনীয় সংঘর্ষের পথ অবলম্বন করেন।

প্রথম পর্যায়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সরকারী দমননীতির ফলে কংগ্রেসের সক্রিয়তা স্তিমিত হয়ে পড়লে লীগ প্রদেশে-প্রদেশে ক্ষমতা দখল করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সরকারও লীগকে বাড়তি মর্যাদা দিতে শুরু করে। এ'ক্ষেত্রে দুই বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ও লর্ড ওয়াভেলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থায় রাজাগোপালাচারী কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে সমঝোতাসূত্র উত্থাপন করেন তা জিন্নাহ-র বিরোধিতায় বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৪৪ সালে গান্ধী-জিন্নাহ্ বৈঠকেও জিন্নাহ্ পাকিস্তানের ও দেশভাগের দাবিতে অটল রইলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটনার দ্রুত পালা বদল ঘটেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে ব্রিটেনের নবনির্বাচিত শ্রমিক দলের সরকারের উদ্যোগে লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু জিন্নাহ্ লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসাবে গণ্য করার দাবি জানালে ১৯৪৫ সালের জুন মাসের সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হয়। অতঃপর মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবও লীগ প্রত্যাখান করে। ১৯৪৬ সালের ২৯-শে জুলাই লীগ কাউন্সিল ঘোষণা করে যে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের কম কিছু তারা মানতে রাজী নয়। এর পরে ৩১শে জুলাই ১৯৪৬ লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা সাংবিধানিক রাজনীতি থেকে স্পষ্টতই একটি বিচ্যুতি ছিল। জিন্নাহ্ সম্ভবতঃ লীগের উগ্র গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে ১৬-ই আগষ্ট কলকাতায় রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। শীঘ্রই পাঞ্জাবও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং কংগ্রেস ভারত বিভাগকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। স্থির হয় যে পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পূর্ব বাংলা এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্ট স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করে।

খলিদ বিন সৈয়দের মতে, জিন্নাহ তাঁর প্রতিপক্ষের ভুলভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। বি. আর. নন্দের মতে, ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সংঘর্ষের পরিণতি পাকিস্তান। তিনি লিখেছেন, অন্যেরা জিন্নাহ্-র জন্য দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন, এবং জিন্নাহ্ সহজেই তাঁর অভীষ্টে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু আয়েষা জালালের মতে জিন্নাহ্ আদৌ ভারত বিভাগ চান নি, কংগ্রেস নেতৃত্বই বরং ভারত বিভাগের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। জালালের বক্তব্য হল হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে জিন্নাহ্ একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের পরে কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব তাঁকে হতাশ করে তোলে ও স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু অমলেন্দু দে আয়েষা জালালের বিরোধিতা করে দেখিয়েছেন যে ১৯৩৭ সাল থেকেই জিন্নাহ্ কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবের শরিক হয়ে ওঠেন এবং তখন থেকেই তিনি লীগকে সাম্প্রদায়িক 'ক্ষমতার নীতি' অনুসরণ করতে পরামর্শ দেন।

৭.৭.১৪.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Peter Hardy, The Muslims of British India.
2. Mushirul Hasan, Nationalism and Communal Politics in India, 1916-'28
3. D. Page, Prelude to Partition : All India Muslims Politics, 1921-'32
4. Francis Robinson, Separatism among Indian Muslims.
5. Aysha Jalal, The sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan.
6. Bipan Chandra, Amales Tripathi, Barun De, Freedom Struggle.
7. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত, খণ্ড ১,২

৭.৭.১৪.২.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. How Would you explain the emergence of separatist politics in India?
2. What part did syed Ahmed khan play in the growth of a separate political identity among the Indian Muslims?
3. Assess the role of the Aligarh Movement in the history of Muslim separatism in India.
4. Trace the circumstances leading to the formation of the Muslim League.
5. How did the Morley-Minto Reforms foster separatist tendencies in Indian Politics?
6. Did the Lucknow Pact (1916) bring new grounds in Hindu-Muslim relations in India?
7. Trace the course of the Pakistan Movement.

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

WORKING OF CONGRESS COMMUNAL POLITICS AND SUBHAS CHANDRA BOSE

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

Subhas Chandra Bose and INA and Telengana

গঠন (Structure) :

৭.৭.১৪.৩.০ : উদ্দেশ্য

৭.৭.১৪.৩.১ : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

৭.৭.১৪.৩.২ : আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের গুরুত্ব

৭.৭.১৪.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৭.১৪.৩.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৭.১৪.৩.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অবদান।

২। আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান এবং এর গুরুত্ব।

৭.৭.১৪.৩.১ : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্ব থেকেই সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের আপোষনীতির সমালোচনা করতে থাকেন। যুদ্ধকে সুভাষচন্দ্র এক বিরাট সুযোগ বলে ধরে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যুদ্ধ ভারতীয়দের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা ও সাফল্যের সুযোগ এনে দিয়েছে। বস্তুতঃ ১৯৩৫ থেকেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর সুভাষচন্দ্র তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন এবং ১৯৩৮'এ হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের কথা বলেন এবং প্রয়োজনে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু গান্ধীজী এবং তার ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা ব্রিটিশ যুদ্ধনীতিকে সমর্থন না করলেও অবিলম্বে জাতীয় সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলোকে সুস্থিরভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত বলে মনে করতেন। আসলে গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিলেও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সকল পদক্ষেপ সুভাষচন্দ্র সমর্থন করতেন না। সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী যোগাযোগ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী, ফেডারেশন সম্পর্কে কঠোর মনোভাব, প্রজা আন্দোলনকে সমর্থন, বৃহত্তর আইন অমান্য আন্দোলনের হুমকি, সর্বোপরি গান্ধীর অনিচ্ছাসত্ত্বে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জয়লাভ তাকে কংগ্রেসের দক্ষিনপন্থীদের এমনকি গান্ধীজীরও, প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন করে। ক্ষুব্ধ সুভাষ ১৯৩৯'এর এপ্রিলের শেষদিকে কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দেন ও ফরোয়ার্ড ব্লক নামে আলাদা সংগঠন তৈরী করে জাতীয় সংগ্রামের জন্য ভারতবাসীকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে প্রাচ্য ও ইউরোপীয় রণাঙ্গনে ব্রিটিশ শক্তি দারুণ সংকটের মধ্যে পড়ে। সুভাষচন্দ্রের সক্রিয় যুদ্ধবিরোধী মনোভাবে উৎকণ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০'এর ২রা জুলাই Defence of India আইনে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে। জেলে অনশনে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাকে তার এলগিন রোডের বাড়ীতে নজরবন্দী রাখা হয়।

বন্দী অবস্থাতেই সুভাষচন্দ্র নিশ্চিত হন যে ব্রিটিশ সরকার কোন অবস্থাতেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এরজন্য ভারতবাসীকে গণআন্দোলনে নামতে হবে। তিনি আরও নিশ্চিত হন যে যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় অনিবার্য। জাতীয় কংগ্রেস যেহেতু সেই মুহূর্তে গণআন্দোলনের পক্ষে ছিল না, সেহেতু ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিগুলির সহায়তায় ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনাই একমাত্র বিকল্প। এই পটভূমিতেই তিনি দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯৪১'এর ১৭ই জানুয়ারী গভীর রাত্রে তিনি ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করে কাবুল এবং রাশিয়া হয়ে বার্লিনে উপস্থিত হন

(মার্চ ২৮, ১৯৪১)। তার দেশত্যাগের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কীর্তি দলের সদস্যরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। জার্মানীতে তিনি জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করে ইউরোপে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা পেশ করেন। ২৯ মে, ১৯৪১ সুভাষচন্দ্র হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু জার্মান সরকার ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারে রাজী ছিল না এবং মধ্য এশিয়া দিয়ে ভারত অভিযান বিষয়েও আদৌ আগ্রহী ছিল না। জুন মাসে জার্মানী অতর্কিতে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করায় সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন ইউরোপ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা অসম্ভব। ইতিমধ্যে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় (৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১) এবং বিদ্যুৎগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। ১৯৪২'এর ফেব্রুয়ারীতে সিঙ্গাপুর ও মার্চে রেঙ্গুন জাপানী অধিকারে আসে। সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন ইউরোপ নয়, দূর প্রাচ্যই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ বিষয়ে তিনি বার্লিনে জাপানী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন।

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপানের অভাবনীয় সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে। দীর্ঘকাল জাপান প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করায় উদ্যোগী হন। সৃষ্টি হয় 'ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স লীগ।' ১৯৪২'এর মার্চে টোকিও'তে এক সম্মেলনে ভারতের জন্য এক জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জুন মাসে ব্যাঙ্কক'এ রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে এক সমাবেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় এবং যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪২'এর ১লা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগঠিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পান ক্যাপ্টেন মোহন সিং। কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ আশানুরূপ হচ্ছিল না। জাপানী কর্তৃপক্ষ এই বাহিনীর অগ্রসরে উৎসাহী ছিল না। অন্যদিকে মোহন সিং'এর সঙ্গে জাপানী কর্তৃপক্ষ এবং রাসবিহারী বসুর মনোমালিন্য শুরু হল। মোহন সিং পদচ্যুত হন।

ইতিমধ্যে ১৯৪২'এর জুন মাসের ব্যাঙ্কক সম্মেলনেই সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসার আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সুভাষচন্দ্র সাগ্রহে তা গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জার্মানী থেকে জাপানে উপস্থিত হওয়া প্রায় দুরূহ ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এক দুঃসাহসিক সাবমেরিন অভিযানে ১৯৪৩'এর ১৬ই মে টোকিও পৌঁছান। ২রা জুলাই, ১৯৪৩ তিনি সিঙ্গাপুর পৌঁছান এবং রাসবিহারী বসু তার হাতে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' নামে অভিনন্দিত হন।

এরপর সুভাষচন্দ্র একটি অস্থায়ী সরকার গঠনে অগ্রসর হন। সিঙ্গাপুরে ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩'এ তিনি আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। শীঘ্রই জাপান, জার্মানী, ইটালী, বার্মা, থাইল্যান্ড সহ বেশ কয়েকটি দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। আজাদ হিন্দ সরকার ১৯৪৩'এর ২৬'এ অক্টোবর ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৩'এর নভেম্বরে সুভাষচন্দ্র Greater East Asia Conference'এ যোগদান করেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতের মুক্তিসংগ্রামে জাপানের সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করেন এবং জাপানী সহযোগিতার নিদর্শন

হিসাবে আন্দামান ও নিকোবর আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে প্রত্যার্পণ করেন। আজাদ হিন্দ সরকার এভাবে প্রথম বিদেশী শাসনমুক্ত ভারতীয় অঞ্চল লাভ করে।

এরপর নেতাজী ভারতের মুক্তি সাধনে চুড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ১৯৪৩'এর ২৫শে আগষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সৈন্যবাহিনীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট নেতাজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় শীঘ্রই সৈন্যসংখ্যা ১৩,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছল — ২০,০০০ সৈন্য এবং ২৩,০০০ স্বেচ্ছাসেবক। নারী সৈনিকদের জন্য 'ঝাঁসীর রাণী' নামে একটি ব্রিগেড গঠিত হল। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আয়ের একটি অংশ অনুদান দিতে আহ্বান জানালেন।

১৯৪৪'এর জানুয়ারীতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হল। কারণ ব্রহ্মদেশকে ভিত্তি করেই ভারত অভিযান অধিকতর সফল হবার সম্ভাবনা ছিল। সুভাষচন্দ্র সম্মিলিত (জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর) বাহিনীর চট্টগ্রাম আক্রমণের পক্ষপাতী হলেও জাপান সম্মিলিত মার্কিন-ব্রিটিশ নৌ ও বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় চট্টগ্রাম আক্রমণের পক্ষপাতী ছিল না। সুভাষচন্দ্র জাপানী বাহিনীর সহায়ক হিসাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র ও জাপানী সেনাধ্যক্ষ কাওয়ারের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয় যে — আজাদ হিন্দ বাহিনী জাপানী বাহিনীর সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে ; আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের নিজস্ব সামরিক আইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ভারতের যে সব অঞ্চল মুক্ত হবে তার দায়িত্ব আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

১৯৪৪'এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে অভিযান শুরু হল এবং মার্চের শেষে ইম্ফল অধিকৃত হল। এপ্রিলের ৮ তারিখে কোহিমা অবরুদ্ধ হল। ১৯৪৪'এর মে মাস নাগাদ আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন কোহিমায় উপস্থিত হল তখন জাপানের সামরিক অবস্থা শোচনীয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন চাপ বাড়ায় জাপান ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে বিমানবাহিনী সরিয়ে ফেলেছিল। এই পরিস্থিতিতে ইম্ফল রণাঙ্গনে ব্রিটিশরা ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল। বর্ষা শুরু হওয়ায় খাদ্য ও রসদ সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এরকম প্রতিকূল পরিবেশেও আজাদ হিন্দ বাহিনী বীর বিক্রমে কোহিমা দখলে রাখতে প্রয়াসী হয়। শেষ পর্যন্ত জুন মাসে আজাদ হিন্দ বাহিনী রণাঙ্গন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ৫ই জুলাই ভারত অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ও জাপানী বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য সামরিক সাহায্য ও রসদের অপ্রতুলতা, নিম্নমানের সামরিক কৌশল এবং সর্বোপরি যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিবর্তন যা ক্রমশ অক্ষবাহিনীর প্রতিকূল হয়ে পড়ছিল তা দায়ী ছিল। এই পরাজয় ও ব্যর্থতা নেতাজীকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি। ১৯৪৪'এর ১৪ই আগষ্ট একটি ঘোষণায় তিনি জানান যে 'যুদ্ধ স্থগিত হয়েছে, উপযুক্ত সময়ে পুনরায় আক্রমণ শুরু হবে'। এদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ জাপানের আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছিল। মে মাসে ব্রিটিশরা রেঙ্গুন পুনর্দখল করেছিল। বাধ্য হয়ে আজাদ হিন্দ সদর দফতর ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হল। ১০ই আগস্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৫ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পন করে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থাকা নিরাপদ হবে না মনে করে সুভাষচন্দ্র একটি জাপানী সামরিক

বিমানে সায়গন থেকে টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮ই আগস্ট তাই-হো-কু বিমানবন্দরে বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে এবং কথিত আছে যে এই দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সামরিক কারণে অবধারিত ছিল। ১৯৪৪'এ ব্রহ্মদেশ থেকে ভারত অভিযান সময়োপযোগী ছিল না। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রণাঙ্গনে ব্রিটিশ-মার্কিন সেনাবাহিনী প্রত্যাঘাত শুরু করেছিল। মিত্রশক্তির অপর্যাপ্ত সামরিক ও আর্থিক শক্তির তুলনায় ব্রহ্ম রণাঙ্গনে জাপানের শক্তি ও সামর্থ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আরও দু'বছর আগে ১৯৪২'এ ব্রিটিশ বাহিনী যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপর্যস্ত, ভারতের অভ্যন্তরেও যখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন'এ মথিত, সে সময় ভারত অভিযানের কর্মসূচী গৃহীত হলে ব্রিটিশদের পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রবল হত। আসলে নেতাজী ১৯৪৩'এ যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করলেন তখন থেকেই যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে শুরু হয়েছে। তাই ভারত অভিযানের ক্ষেত্রে নেতাজীর কর্মসূচী ও রণকৌশল ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

৭.৭.১৪.৩.২ : আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের গুরুত্ব

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যার্থতা সত্ত্বেও জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও তার বাহিনীর গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তিসংগ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের প্রতি মোহে নয়, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থে তিনি অক্ষ-শক্তিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তার কর্মপ্রয়াসে তিনি কখনই স্বাধীনতার আদর্শকে বিসর্জন দেননি। আজাদ হিন্দ বাহিনী ছিল অসাম্প্রদায়িকতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। ঝাঁসী রানী বাহিনী নারী ক্ষমতার উপর অটুট অবস্থার উদাহরণ।

আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভাঙনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ধৃত সৈনিকদের মুক্তির দাবীতে সারা ভারতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা ব্রিটিশ শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। তীব্র জনমতের চাপে ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত আজাদ হিন্দ সৈনিকদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল, যার পরিণতি ১৯৪৬'এর নৌ-বিদ্রোহ। ডঃ সুমিত সরকারের মতে "...the wave of disaffection in the British Indian Army during the winter of 1945-46 which culminated in the great Bombay Naval Strike of February 1946 and was quite possibly the single most decisive reason behind the British decision to make a quick withdrawal." নেতাজী এবং তার আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি আন্তর্জাতিক পটভূমিতে উপস্থাপিত করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর বিদায় ও পরাধীন জাতিগুলির মুক্তি লাভই প্রমাণ করে যুদ্ধকালীন সংকটকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের স্বপক্ষে ব্যবহার করার যে নীতি নেতাজী গ্রহণ করেছিলেন তা যথার্থই ছিল।

৭.৭.১৪.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) Netaji Research Bureau — Netaji and India's Freedom.

(২) সুমিত সরকার — আধুনিক ভারত।

(৩) তারাচাঁদ — History of the Freedom Movement in India – Vol-IV.

(৪) প্রণব চট্টোপাধ্যায় — আধুনিক ভারত ।

(৫) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় — পলাশী থেকে পার্টিশান

৭.৭.১৪.৩.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবদানের মূল্যায়ন কর।

(২) কোন পরিস্থিতিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল? আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

(৩) আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৮

স্বাধীন ভারতবর্ষ

(Independent India)

একক - ১৫

Foreign Policy – Non-Alignment

গঠন (Structure) :

৭.৮.১৫.১.০ : উদ্দেশ্য

৭.৮.১৫.১.১ : ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির সূচনা

৭.৮.১৫.১.২ : ভারতের বৈদেশিকনীতি ঃ জোট নিরপেক্ষতা

৭.৮.১৫.১.৩ : স্বাধীনতা উত্তর নতুন ভারতের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী

৭.৮.১৫.১.৪ : স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি

৭.৮.১৫.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৮.১৫.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৮.১৫.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা কিভবে হয়েছিল।

২। ভারত কেন জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল?

৩। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারতের ভূমিকা কি ছিল।

৪। স্বাধীনতার পর নতুন ভারত গড়ার জন্য কি কি লক্ষ্য ছিল?

৫। কিভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল?

৭.৮.১৫.১.১ : ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির সূচনা

১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির সূচনা হয়। এই পরিকল্পনা কমিশন গঠন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যের ফলশ্রুতি। ১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত হতে থাকে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোন পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেন। এই বিভিন্ন মতগুলির সার্বিক ফলশ্রুতিই হল ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা কমিশন গঠন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগে যে সমস্ত মতগুলি উপস্থাপিত হয়েছিল সেগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারী প্রয়াস।

১৯৩০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী কৃষিমন্দার পর থেকে বিভিন্ন দেশের মত ভারতেও অর্থনীতিবিদ কেইন্স নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। কেইন্স অবাধ অর্থনীতির পথ পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রকে বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। অর্থনীতিকে সঠিক পথে ও সঠিক লক্ষ্যে পরিচালনা করার জন্য তার উপর অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর বহু দেশ কেইন্সের বক্তব্য মেনে নিয়ে তাদের অর্থনীতিকে পরিবর্তিত করলেও ভারতে ব্রিটিশ সরকার সে সম্পর্কে কিছুই করেনি। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। এই অবস্থায় আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর জোর দিতে থাকেন।

১৯৩৪ সালে মহীশূর রাজ্যে একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও প্রশাসক স্যার মোক্ষ গুন্ডম বিশ্বেশ্বরাইয়া একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইতে তিনি ভারতে পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার বইটির নাম হল "ভারতের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতি।" বইটিতে কিন্তু কোন সামগ্রিক পরিকল্পনার ছক পাওয়া যায় না। তবে তার বই থেকে দুটি বক্তব্য উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমত তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে অর্থনৈতিক মন্দার বিরুদ্ধে সেই সব দেশের সরকারের উদ্যোগের কথা বলেছেন এবং ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কথা তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য শিল্প উন্নয়নের গুরুত্ব ও তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বিশ্বেশ্বরাইয়া ভারতের মত সম্পদশালী দেশের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছিলেন। রাশিয়ার উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন দেশে অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব নয়। তার বক্তব্য হল দেশকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সরকারকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে পরিকল্পিত পথে এগোতে হবে। বিশ্বেশ্বরাইয়া তার বইতে ভারতীয় অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন কৃষির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ। তার মতে, একমাত্র শিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়েই দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব। ভারী শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারকে মূল উদ্যোগ নেবার কথা তিনি বলেছিলেন। মাঝারি শিল্পের বিকাশের জন্য তিনি সংরক্ষণ নীতির উপর জোর দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন পঞ্চায়েতের ভূমিকার উপর।

স্যার বিশ্বেশ্বরাইয়া ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ভাবনার ক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। বিশ্বেশ্বরইয়ার মত সুভাষ চন্দ্রও শিল্প বিকাশকে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির পথ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিশ্বেশ্বরইয়ার চেয়ে সুভাষ চন্দ্র বসু একধাপ এগিয়ে ছিলেন এই কারণে যে, তিনি কেবল তার ভাবনা চিন্তা ও বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকেননি, তিনি সরাসরি কাজে নেমে পড়েছিলেন। এক্ষেত্রে তার একটু সুবিধা ছিল কারণ কংগ্রেসের মত একটি বৃহৎ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সুবিধার সদব্যবহার তিনি করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষ চন্দ্র একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে তিনি বরণ করেন জওহরলাল নেহেরুকে।

সুভাষ চন্দ্র বসু রাশিয়ার পরিকল্পনাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি ভারতে ভারী শিল্পভিত্তিক শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের কাজের সুবিধার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের উপর তথ্য সংগ্রহ করার কথা বলেন। তিনি জাতীয় স্তরে একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিটির অধীনে বেশ কিছু উপকমিটি তৈরী করা হয়। এইসব কমিটিতে কাজ করার জন্য দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত মানুষদের আহ্বান করা হয়।

১৯৪৪ সালে সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি রূপরেখা উপস্থাপিত করে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের ৮ জন শিল্পপতি। এই জন্য এই খসড়াটি বোম্বাই পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এই খসড়াতেও শিল্পায়নের বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই পরিকল্পনা রচয়িতাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ১৫ বছরের মধ্যে দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় ৩ গুণ বাড়ানো। এবং মাথা পিছু আয় দ্বিগুন বাড়ানো। বোম্বাই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকে আপত্তি ওঠে। এর প্রধান কারণ ছিল তারা বেসরকারী পুঁজির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বোম্বাই পরিকল্পনার প্রতিবাদে ১৯৪৪ সালে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের নেতৃত্বে Indian Federation of Labour জনগণের পরিকল্পনা নামে আর একটি বিকল্প রূপরেখা উপস্থাপিত করেন। এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেশের শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা এবং জমি ও খনিজ সম্পদকে জাতীয়করণ করা।

এইভাবে স্বাধীনতার আগে ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করার উদ্যোগ দেখা দেয়। সাধারণভাবে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল শিল্পনির্ভর অর্থনীতির বিকাশ। অর্থনীতির বিকাশ প্রক্রিয়াকে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা। কিন্তু ভারতের পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রয়োগ নিয়ে যেসব চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলশ্রুতি।

১৯৪০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাধারণভাবে সমগ্র পৃথিবী জুড়েই যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনঃগঠন নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে। ফলে রাজকোষ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। এই জন্য যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই সঞ্চিত অর্থকে কাজে লাগানোর জন্য চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এর ফলশ্রুতি হিসাবে সরকার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরিকাঠামো তৈরী করার কাজে হাত দেন।

১৯৪৪ সালে সরকার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর গঠন করেন। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে পুনঃগঠন সংক্রান্ত কতগুলি পরিকল্পনা পেশ করা হয় কিন্তু এই বিভাগের কাজকর্ম খুব বেশী ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৪৬ সালে গঠিত হয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা পর্ষদ। এই পর্ষদের দুটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশের একটি হল পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা এবং অপরটি হল কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা গঠন করা। এই পর্ষদের কাজকর্ম থেকেও পরিকল্পনার সামগ্রিক ছবি বেরিয়ে আসেনি।

১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। এই শিল্পনীতিগুলি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এই শিল্পনীতির মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে শিল্পায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের এই শিল্পনীতি ভবিষ্যতের 'মিশ্র অর্থনীতি'র সূচনা করে যায়। এই শিল্পনীতিতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, কেবলমাত্র সম্পদের পুনঃবন্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না, এর জন্য এই নীতিতে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই শিল্পনীতি গুলিকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) প্রথমটিকে চিহ্নিত করা হয় সম্পূর্ণ একচেটিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হিসাবে। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় লৌহইস্পাত, কয়লা, খনিজ তেল, জাহাজ ও উড়োজাহাজ নির্মাণের মত শিল্পসমূহকে। (গ) তৃতীয় শ্রেণীটিকে চিহ্নিত করা হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হিসাবে। (ঘ) চতুর্থ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় অন্যান্য সমস্ত শিল্পকে। পরবর্তীকালে সরকারের পরিকল্পনার লক্ষ্য কি হবে অথবা ভারতের অর্থনীতি কোন পথে এগোবে তার একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা এই শিল্পনীতি থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ভারতের পরিকল্পনার যুগ শুরু হয়েছিল ১৯৫১ সালে। কিন্তু পরবর্তী ৪ দশক ধরে ভারত সরকারের শিল্প সংক্রান্ত নীতিগুলির প্রধান ভিত্তি ছিল ১৯৪৮ সালের এই শিল্পনীতি।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। স্থির হয় যে, পরিকল্পনা কমিশন প্রত্যেকটি পরিকল্পনা শুরু করার আগে সেই পরিকল্পনার একটি খসড়া তৈরী করবে। এই খসড়া জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ সেটি অনুমোদন করলে পরিকল্পনা কমিশন এর চূড়ান্ত রূপদান করবে। সবশেষে সংসদ পরিকল্পনার দলিলটি অনুমোদন করলে তবেই পরিকল্পনার রূপায়ন শুরু হবে।

সুতরাং স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পটভূমি অনেক বিস্তৃত। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি থেকে রাজনীতিবিদ ও সরকারী উদ্যোক্তাদের সমবেত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতি। এই অর্থনীতির রূপায়নে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইন্স-এর প্রভাব যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি সুভাষ চন্দ্র বসুর মত রাজনীতিবিদ, মোক্ষগুন্ডমের মত প্রযুক্তিবিদ এবং পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের মত শিল্পপতির চিন্তাধারাও এই পরিকল্পিত অর্থনীতির সূচনা করেছিল। বিভিন্ন ধরনের মানুষের চিন্তাধারার সুফল হল ভারতের পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ন।

পরিকল্পিত অর্থনীতির অনেকগুলি সুবিধা আছে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে অবাঞ্ছিত উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না। দেশে আয়ের বন্টনের অনেকটা সমতা রক্ষা করা যায়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবারীদের ক্ষমতা এবং মূল্যব্যবস্থার বিকৃতি খর্ব করা সম্ভব। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মহীনতার সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। ভারতের মতো দরিদ্র, উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বিরাট কোন লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়নি। এই পরিকল্পনার প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিল ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত অস্থির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা। সামাজিক ন্যায় ও আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের অর্থনীতির যথাসম্ভব দ্রুত সুষম বিকাশ। এই দুটি লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম যোজনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি পূরণ, উদ্বাস্তুদের পুনঃবাসন, দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা এবং অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো নির্মাণ, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দ্রুততর করে জীবনধারণের মান উন্নত করা, ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে দেশের আর্থিক বৈষম্য কমানো।

১৯৫০-৫১ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয় ছিল প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় স্থির করা হয় যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়কে ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে। এর ফলে রাষ্ট্রের বেসরকারী বিনিয়োগকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং ব্যক্তিগত সংশয়কে কোন মতেই উপেক্ষা করা চলবে না। সঞ্চয়কে মূলধন গঠনের দিকে সঞ্চারিত করতে হবে এবং ব্যাঙ্ক ঋণের নিয়ন্ত্রণ, শস্য সংগ্রহ প্রথার মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় সঙ্কোচন করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

প্রথম পরিকল্পনায় যেগুলির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয় সেগুলি হল কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যুৎ প্রকল্প। কৃষিকে সর্বোচ্চ অধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে সমবায় ভিত্তির প্রয়াস এবং রাসায়নিক সার ইত্যাদি উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উপরেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের প্রাথমিক পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৬৯ কোটি টাকা। পরে এই বিনিয়োগের পরিমাণকে বাড়িয়ে ২ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা করা হয়। কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের বিভাজন ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) কৃষি	—	১৮৪ কোটি টাকা
(২) সমষ্টি উন্নয়ন	—	১০০ কোটি টাকা
(৩) পশুপালন	—	২২ কোটি টাকা
(৪) বনভূমি সংরক্ষণ	—	১২ কোটি টাকা
(৫) রেলপথ ও সড়ক উন্নয়ন	—	১০০ কোটি টাকা
(৬) বৃহৎ শিল্প	—	৪০ কোটি টাকা

৭.৮.১৫.১.২ : ভারতের বৈদেশিক নীতি : জোট নিরপেক্ষতা

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেহেরু সরকারের প্রধান অবদান জোট নিরপেক্ষতা। এই নীতি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিশ্বরাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই ভারত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষনীতি গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিম রাষ্ট্রবর্গের আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ ভীতি এবং পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া ও তার মিত্র রাষ্ট্রবর্গের ধনতন্ত্রবাদ ভীতি থেকে আন্তজাতিক দুনিয়া যে দুটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতার পর ভারত তার থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার যে পথ গ্রহণ করেছে তাই জোট নিরপেক্ষনীতি নামে পরিচিত।

জোট নিরপেক্ষ নীতির ব্যাখ্যা

ভারতের অন্তঃবর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৬ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতির রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন। এই সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ''We propose as far as possible, to keep away from the power politics of groups, aligned one another, which have led in the past two world wars and which may again lead to disaster of even vaster scale'' কংগ্রেসের ৫৭তম অধিবেশনে ১৯৫১ সালের ১৮ই অক্টোবর নেহেরু আবার ঘোষণা করেছিলেন 'We are convinced that any control imposed by one country over another is bad and is a danger to peace'' নেহেরুর এই দুটি ভাষণ থেকে বোঝা যায় যে তার জোট নিরপেক্ষনীতি ছিল মূলত শান্তিবাদী, যুদ্ধ বিরোধী এবং বিভিন্ন দেশের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। জোট নিরপেক্ষতা কোন নেতিবাচক নীতি নয়, এটি ইতিবাচক। ভৌগোলিক অবস্থান ও বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার নেতৃত্বে দুই শিবিরের অস্তিত্ব ভারতকে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিল।

জোট নিরপেক্ষ রাজনীতির ইতিহাস স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই নীতির মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি জটিল ও সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র দুই বিবাদমান শক্তির পাশে নিজেদের স্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ এই ঠান্ডা লড়াইয়ের রাজনীতির পরিস্থিতিতে একটি বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং ভারতের ঐতিহ্য ও স্বার্থের কথা মনে রেখে একটি স্বাধীন প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে তৎপর হয়।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে মহা-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উদীয়মান কমিউনিস্ট চীনের প্রতিও ভারতবর্ষ স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। স্বাধীন

পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ একটি শান্তিপূর্ণ জোট নিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেহেরু যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকেই ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের আভাস পাওয়া যায়। এই বেতার ভাষণে নেহেরু বলেছিলেন, "আমরা প্রস্তাব রাখছি ভারত যতদূর সম্ভব পৃথিবীর দুই শক্তিশিবির থেকে দূরে থাকুক।"

ভারতের জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ উপাদানের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ অতীতকাল থেকে শান্তিপূর্ণ ঐতিহ্যের অনুসরণকারী ছিল। ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যের মধ্যে শান্তি ও অহিংসার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৌতমবুদ্ধ, অশোক থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অনেকের আদর্শেই শান্তি ও অহিংসার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। স্বাধীন ভারতও স্বাভাবিকভাবেই শান্তির ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারত উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতিষ্ঠান ছিল এবং নেহেরু ও গান্ধীজী এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নেহেরুর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার স্বভাবতই উপনিবেশবাদ বিরোধী ধারার ঐতিহ্য অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ স্বাধীন ভারত এক তীব্র ও বেদনাদায়ক আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। সাম্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভারতই আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ বিরোধী নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। একইসঙ্গে ভারতের দ্রুত আর্থিক উন্নতিও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে বৈদেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে ভারত আর্থিক সম্পর্কের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে চেয়েছিল।

জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের সবকটি প্রস্তাবই ছিল নেহেরুর মস্তিষ্ক প্রসূত। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ অথবা মিউনিখ সঙ্কটকালে তিনি ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেন। প্রথম থেকেই তিনি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ১৯৫০-এর জুন মাসে কোরিয়ার যুদ্ধের সময় ভারতের জোট নিরপেক্ষতা নীতির একটি সুস্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে। এই যুদ্ধের পশ্চিমী জগৎ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ও বিশ্বশান্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ন হয় এবং সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের এই নিরপেক্ষ ভূমিকা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের প্রশংসা লাভ করে। স্তালিনের মৃত্যুর আগেই ভারতের জোট নিরপেক্ষতা নীতি একটি বাস্তবসম্মত বিকল্প কর্মপদ্ধতি রূপে বিবেচিত হয়।

১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ যে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন হয়েছিল তা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছিল। এই সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে ঠিক হয় যে (i) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল কোন তৃতীয় শিবির তৈরী করা নয়। এর উদ্দেশ্য হল নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। এই বান্দুং সম্মেলনে নেহেরু বিখ্যাত পঞ্চশীল নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। (ii) পারস্পরিক সহায়তা, সহাবস্থান ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দান করা পঞ্চশীলেরই একটি অঙ্গ (iii) জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি দুই প্রধান শিবির থেকে

দূরে থাকবে। (iv) পঞ্চশীল নীতিতে বিশ্বাসী শক্তিবৃন্দ পরস্পরের সীমানা অতিক্রম করে আক্রমণ করবে না ও কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে চুক্তিবদ্ধ হয়। জোট নিরপেক্ষ নীতির চরিত্র সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ধারণা প্রচলিত আছে। মার্কিন সমালোচকগণ বিশেষত Hartman এই নীতিকে সুবিধাবাদী নীতি বলে সমালোচনা করেছেন। আবার অনেকে এই নীতিকে অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলে চিহ্নিত করেছেন।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত করার চেষ্টা, কিন্তু এটা করা সবসময় সম্ভব ছিল না। জন্মলগ্ন থেকেই এই আন্দোলনের ঝোঁক ছিল অত্যন্ত সাধারণীকরনের দিকে, অস্বস্তিকর যেকোন বিষয়কে তারা এড়িয়ে যেতে অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। তীব্র মতপার্থক্যকে ধামাচাপা দেবার জন্য তারা যেকোন ভাবেই হোক একটি মতৈক্য স্থাপনে প্রয়াসী হতেন।

জাতীয় স্বার্থের সংঘাতের ফলে বৃহৎ শক্তিবর্গের বৈদেশিক নীতি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কে নির্জোট দেশগুলির মধ্যে জাতীয় স্বার্থের সংঘাত এতই প্রবল যে তৃতীয় বিশ্ব বলে আদৌ কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নির্জোট আন্দোলনের শরিক হলেও তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান।

ঐতিহাসিক কারণ

বিভিন্ন কারণে নেহেরু জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত ভারতের চিরাচরিত শান্তিবাদী আদর্শ তাঁর এই বিদেশনীতি রচনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। গৌতমবুদ্ধ, রাজশ্রী, অশোক থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকলেই সমগ্র বিশ্বে অহিংসা এবং শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। সুতরাং প্রাচীন কাল থেকে অনুসৃত শান্তিবাদী নীতির আদর্শ থেকে নেহেরু তার বিদেশ নীতিকে কখনোই বিচ্যুত করতে চাননি। এছাড়া নেহেরু বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের জনগণও একধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির পক্ষপাতি। সুতরাং তিনি তার বৈদেশিক নীতির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জনগনের সাধারণ ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন।

রাজনীতিক কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয় তা থেকে নেহেরু ভারতকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। এইজন্য তিনি ভারতকে কোন বৃহৎ গোষ্ঠীতে যুক্ত না করে নিরাপদ ও নিরপেক্ষ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন জোট নিরপেক্ষনীতি গ্রহণের ফলে স্বাধীন দেশ হিসাবে ভারতের সম্মান ও মর্যাদা বজায় থাকবে। নেহেরুর যুক্তি ছিল ভারত যদি কোন জোটের মধ্যে যোগ দেয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই জোটভুক্ত অন্যান্য দেশের মতানুযায়ী ভারতকে চলতে হবে। অর্থাৎ আন্তজাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে বা ভারতের নিজস্ব স্বার্থে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার কোন অধিকার থাকবে না। এর ফলে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশের সম্পর্ক যেমন ক্ষুন্ন হবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা বিনষ্ট হবে। এছাড়া নেহেরু মনে করতেন কোন দেশের বৈদেশিক নীতি সেই দেশের আভ্যন্তরীণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হওয়া উচিত। নেহেরু মনে করেছিলেন, সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের অবশ্যই উচিত স্বাধীনতা, সার্বভৌমিকতা এবং অখন্ডতা বজায় রাখা এবং একটি মর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় নেহেরু বুঝেছিলেন বিশ্বযুদ্ধের পর ঠান্ডা লড়াইয়ের জটিল আবর্তে ভারত না জড়িয়ে জোট নিরপেক্ষতার মাধ্যমে ভারতের মর্যাদা ও প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

নেহেরু মনে করেছিলেন, জোট নিরপেক্ষতার মাধ্যমে ভারতের সমস্ত জনগণকে রাজনৈতিক ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে। অধ্যাপক বিমল প্রসাদ তাই মন্তব্য করেছেন ''He found in Non-alignment a strong element of National Consensus'' ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতি সচেতন মানুষেরা বাম ও দক্ষিণপন্থী এই দুই মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কোন একটি জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে ভারতের সমগ্র মানুষের সমর্থন পাওয়া নেহেরুর পক্ষে সম্ভব হতনা। এই জন্য নেহেরু মনে করেছিলেন একমাত্র জোট নিরপেক্ষতার মাধ্যমে দেশের জনমতকে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে এবং সদ্য স্বাধীনতা লাভের পর এই জাতীয় ঐক্যমত ভারতের স্বাধীনতা অটুট রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

অর্থনৈতিক কারণ

জোট নিরপেক্ষ নীতি ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করবে বলে নেহেরু অভিমত পোষণ করেছিলেন। এই নীতির মাধ্যমে নেহেরু পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক অধীনতা থেকে ভারতকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। নেহেরু মনে করেছিলেন জোট নিরপেক্ষনীতি গ্রহণ করলে দুটি জোটের কাছ থেকেই অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। বস্তুত পক্ষে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্য বিদেশী পুঁজির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নেহেরু ভারতের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন ''A straight forward honest and independent policy is the best'' তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ''Even in accepting economic help or in getting political help, it is not a wise policy to put all our eggs in one busket. Nor should we seek help at the cost of our self-respect''

নিরাপত্তাজনিত কারণ

নেহেরুর মতে, ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্যে জোট নিরপেক্ষতা প্রয়োজন ছিল। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে কোন দেশের নিরাপত্তা তার সামরিক শক্তির মাধ্যমেই রক্ষিত হয়। নেহেরু মনে করেছিলেন যেহেতু ভারত সামরিক শক্তির দিক থেকে দুর্বল সেইজন্য ভারতের নিরাপত্তা ''can be protected policies'' অর্থাৎ নেহেরু কূটনীতির মাধ্যমেই ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। নেহেরুর কাছে এই কূটনীতির অর্থই ছিল জোট নিরপেক্ষতা। এই ক্ষেত্রে নেহেরুর কূটনীতি বা বৈদেশিক নীতি ছিল খুবই স্বচ্ছল এবং স্পষ্ট। ১৯৩১ সালে ভারতের নিরাপত্তা সমস্যার সম্পর্কে নেহেরু একটি প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধে নেহেরু তার এই নীতি গ্রহণের আভাস দেন। ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণকারী দেশ হিসাবে নেহেরু সোভিয়েত রাশিয়াকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই ধারনাও পোষণ করতেন যে, তার এই আশংঙ্কা হয়ত অমূলক বলে প্রমাণিত হতে পারে। কারণ সোভিয়েত রাশিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে এমনই ব্যস্ত ছিল যে তার পক্ষে ভারতকে আক্রমণ করা সম্ভব হবে না। এই ধারণার বশবর্তী জোটবদ্ধ হওয়ার অর্থ হল সোভিয়েত আক্রমণের সম্মুখীন হওয়া। এই জন্যই তিনি ভারতকে জোট- নিরপেক্ষ রেখে ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন। নেহেরু বলেছিলেন-''India's security could be better safe-guarded by keeping it free from being involved in U.S. world strategy directed against the Soviet Union, hereby saving it from the latter's hostility''.

নেহেরু এই নীতিকে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং এই নীতিকে ভারত ও বিশ্বশান্তির মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী রূপে বর্ণনা করেছেন। নেহেরুর অভিমত হল যে, জোট নিরপেক্ষ নীতি একটি অবিমিশ্র নিরপেক্ষ নীতি নয়, তিনি এই নীতিকে একটি ইতিবাচক নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে তার কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। ১৯৫০ সালের জুলাইয়ে নেহেরু মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ পরিস্থিতি অনুযায়ী তার নীতি নির্ধারন করবে এবং এক স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করার অধিকার সে কখনো হারায়নি। পরবর্তীকালে নেহেরু একই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বারংবার একথা জানিয়েছিলেন যে, শান্তি ও মানবতার আদর্শ বিপন্ন হলে ভারতবর্ষ একেবারে নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষতা গ্রহণ করবে না। জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও বিশ্ব শান্তির মধ্যে একটা সংমিশ্রন ঘটে। এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক তার নিজস্ব মর্যাদা ও স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছিল।

জোট নিরপেক্ষ নীতির মাধ্যমে নেহেরু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা পদ্ধতি ও তৃতীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এই তৃতীয় অঞ্চলের মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতিতে ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রকোপ হ্রাস পাবে এবং বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ১৯৫০ সালে মূলত নেহেরু তার পররাষ্ট্র নীতি রূপায়নের ক্ষেত্রে অনেকটা নম্র ও সংযত আচরণ করেন। এই সময় আমেরিকা ও রাশিয়া ভারতকে নিজেদের দলে টানতে চেয়েছিল। কিন্তু নেহেরুর নির্দেশে ভারতবর্ষ এই দুই রাষ্ট্র জোটের কোনটিকেই সমর্থন জানায়নি এবং সচেতনভাবে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। একথা সত্য যে, দুটি দেশই ভারতবর্ষকে সাহায্য দান করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ তার নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। ভারতের এই ধরনের অবস্থানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সহযোগী রাষ্ট্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল এবং পাকিস্তান ও মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত SEATO-র সদস্যপদ গ্রহণ করে।

প্রশ্ন হল জোটনিরপেক্ষ নীতিকে কি Rigid বা কঠোর বলা যায়? পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস প্রমাণ করে যে নেহেরুর জোটনিরপেক্ষ নীতি কঠোরভাবে পরিচালিত হয়নি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা নেহেরুর নীতির মধ্যে 'A blend of firmness and flexibility' লক্ষ্য করেছিলেন। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নেহেরু তার জোটনিরপেক্ষ নীতিকে অনেক ক্ষেত্রেই নমনীয় করেছিলেন। এর প্রথম উদাহরণ হল স্বাধীনতার পর ভারতের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এ যোগদান। প্রাথমিকভাবে নেহেরু ব্রিটেন পরিচালিত ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য হতে রাজি হননি। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তার মত পরিবর্তন করেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন এর ফলে ভারতের স্বাধীনতা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেহেরু অবস্থা অনুযায়ী তার জোটনিরপেক্ষ নীতির কঠোরভাবে প্রয়োগ করেননি। কাশ্মীর প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে জওহরলাল নেহেরু তার জোটনিরপেক্ষ গন্ডী থেকে বেরিয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হবার পর নেহেরু তার জোটনিরপেক্ষ নীতির কঠোরতা কিছুটা পরিত্যাগ করেন। এই সময় থেকেই ভারত তার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বিভাগকে শক্তিশালী করার দিকে মন দেয়। নেহেরুর প্রকাশ্যে বিদেশী শক্তির কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি হয়। আমেরিকা ও ভারতের যৌথ বিমান মহড়া শুরু হয়। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হল যে, আমেরিকা নেহেরুকে জোটনিরপেক্ষনীতি পরিত্যাগ করার অনুরোধ করলেও নেহেরু তাতে রাজি হননি। সবশেষে বিমল প্রসাদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলা যায়—"Although firm in fundamentals, it was quite flexible and pragmatic in details and constantly adjusted to the changing international situation".

৭.৮.১৫.১.৩ : স্বাধীনতা উত্তর নতুন ভারতের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতে দীর্ঘ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত স্বাধীন হয়। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের চিহ্ন ভারতের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে সর্বত্র ছড়িয়েছিল। একদিকে যেমন ছিল চরম দারিদ্র্য, প্রায় সামগ্রিক নিরক্ষরতা, অন্যদিকে ছিল বিভিন্ন রোগ অস্বাস্থ্য এবং সামাজিক অসাম্য ও অবিচার। নতুন স্বাধীন ভারতের রূপকাররা ভারতকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাদের চোখে ছিল নতুন ভারতের স্বপ্ন। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে তারা গড়তে চেয়েছিলেন নতুন ভারত, যে ভারতে ঘটবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ও আমূল সামাজিক পরিবর্তন।

নতুন ভারত গড়ার জন্য স্বাধীন ভারতের রূপকারদের প্রথম লক্ষ্য ছিল ভারতের জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা, শক্তিশালী করা এবং দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। ভারতের ধর্মীয়, জাতিগত এবং আঞ্চলিক বিভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা চেয়েছিলেন 'Indianness' বা 'ভারতীয়ত্ব' বোধের প্রসার।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতের আরেকটি প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে শক্তিশালী করা। জাতীয় নেতারা ভারত বিভাগ এবং জাতিগত দাঙ্গা হওয়া সত্ত্বেও চেয়েছিলেন ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে। একইসঙ্গে তারা চেয়েছিলেন সামাজিক সচেতনার বিকাশ ঘটাতে। তারা সমাজে অর্থনৈতিক, জাতিগত এবং লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য দূর করে আমুল সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্য স্থির করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ জাতীয় নেতাদের আরেকটি প্রধান লক্ষ্য ছিল সকলের জন্য শুধু একমুঠো খাবারের ব্যবস্থা করা নয়, ভারতীয় জনগণের মনে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটানো। এছাড়াও তাদের আরো লক্ষ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। তারা ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন ধাপে ধাপে এবং অহিংস নীতির মাধ্যমে।

চতুর্থতঃ জাতীয় নেতাদের আরেকটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি ঘটানো। তারা এই লক্ষ্য পূরণ করতে চেয়েছিলেন রক্তপাত এড়িয়ে এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বিভিন্ন কৃষি সংস্কার, রাষ্ট্র পরিকল্পনা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক অসাম্য দূর করে তারা এই লক্ষ্য পূর্ণ করতে চেয়েছিল। তারা সমাজের পুরুষদের প্রাধান্য দূর করে নারীদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। নারীরা যাতে পরিবারে সামাজিক পীড়নের শিকার না হয় সেইজন্য তারা সচেষ্ট ছিলেন। তারা মহিলাদের নিরক্ষরতা দূর করা এবং শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। তারা সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। নারীদের সম্পত্তির অধিকার দেবার কথা তারা চিন্তা করেছিলেন।

৭.৮.১৫.১.৪ : স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি

স্বাধীন ভারতের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যা ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ক্যাবিনেট মিশনে সুপারিশের ভিত্তিতে দেশীয় রাজারা ভারতে ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতা তাদের হাতেই দেবার দাবী করেছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনেও বলা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চুক্তির

অবসান ঘটবে এবং স্বাধীন রাজ্য হিসাবে তারা ভারত বা পাকিস্তান যেকোন রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৯ কোটি মানুষ এই রাজ্যগুলিতে বসবাস করত।

ভারতের স্বাধীনতা আইনে দেশীয় রাজ্যগুলির সামনে যে অবাধ সুযোগের সৃষ্টি করা হয়েছিল তার ফলে নতুন ভারত রাষ্ট্রের কাছে সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করেছিল। এর উপর ছিল বড়লাটের উস্কানি। এর ফলে ভূপাল, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণার পরিকল্পনা করেছিলেন। অন্যদিকে অনেক ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ইন্দোরের রাজার নেতৃত্বে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ দেশীয় রাজাদের মধ্যে ভারত ভুক্তির ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়ে। জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করে যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু দুজনেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে সতর্ক করে দেন। নেহেরু বলেন যদি কোন বিদেশী রাষ্ট্র কোন দেশীয় রাজার স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তা হবে ভারতের শত্রুতার সামিল।

দেশীয় রাজ্যের সমস্যার সমাধান করার জন্য নেহেরু একটি পৃথক দপ্তর গঠন করেন। তিনি ভি.পি মেননকে এই দপ্তরের সচিব নিযুক্ত করেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে তিনি এই কাজে যুক্ত করেন। কারণ মাউন্টব্যাটেন দেশীয় রাজ্যগুলির ভুক্তির স্বপক্ষে ছিলেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে যিনি সবচেয়ে বেশী সাহসিকতার ও কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি হলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। এই কৃতিত্বের জন্য তিনি 'লৌহমানব' নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যেসব দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতে যোগদান করেছিল তাদের নিয়ে এক একটি অঞ্চল গঠন করা হয়। যেমন পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হয় পাতিয়ালার ৮টি রাজ্য। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যকে নিয়ে কেরল প্রদেশ গঠিত হয়। বরোদা, কাথিয়াবাড় ও রাজপুতানা রাজ্যগুলিকে নিয়ে সৌরাষ্ট্র বা রাজস্থান প্রদেশ গঠিত হয়। মহীশূর ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে কর্ণাটক প্রদেশ গঠিত হয়। তবে অনেকগুলি রাজ্য নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করার চেষ্টা করে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর।

জুনাগড়ের নবাব মুসলমান হলেও তার অধিকাংশ প্রজা ছিল হিন্দু। নবাব পাকিস্তানে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন তা বুঝতে পেরে বল্লভ ভাই প্যাটেল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে জুনাগড় দখল করে নেন, সেখানে গণভোট নেওয়া হয় এবং অধিকাংশ মানুষ ভারতভুক্তির পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। এরপর জুনাগড় ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

হায়দ্রাবাদের নিজামও ছিলেন অস্থিরচিত্ত মানুষ। তিনি মুসলমান হলেও তার প্রজাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। হিন্দু প্রজারা ভারতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু নিজাম ছিলেন স্বাধীনভাবে থাকার পক্ষে। তিনি মনে করেছিলেন ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অন্যান্য দেশের রাজাদের সম্পর্কের চেয়ে আলাদা। হায়দ্রাবাদ ব্রিটিশদের অধীনস্থ হলেও তা ছিল তাদের অনুগত মিত্র রাজ্য। এই হিসাবে হায়দ্রাবাদ দাবী কয়েছিল যে তারা স্বাধীন থাকতে পারে। অন্যদিকে ভারতের যুক্তি ছিল যে, যেহেতু হায়দ্রাবাদ ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত সেইজন্য হায়দ্রাবাদের স্বাধীন রাজ্যের দাবী মেনে নেওয়া যায় না। নিজাম আরো বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি ভারতের আবেদনে সাড়া দেননি। তিনি হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংল্যান্ডের সাহায্য চেয়েছিলেন। তাছাড়া পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আমদানি

করেছিলেন। তাছাড়া নিজাম তার ইংরেজ পরামর্শদাতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হায়দ্রাবাদের ঘটনাকে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এইসব জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বল্লভ ভাই প্যাটেল হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে জেনারেল জে. এন. চৌধুরির নেতৃত্বে পুলিশি অভিযান পাঠান। ভারতীয় পুলিশ হায়দ্রাবাদ দখল করে। সেখানে গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। জনগণ ভারত ভুক্তির পক্ষে রায় দেয়। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী হায়দ্রাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতে অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সবচেয়ে সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কাশ্মীর রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে। ইঙ্গো-শিখ যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব ইংরেজদের অধিকারে আসার পর ব্রিটিশ সরকার গুলাব সিং নামে একজন ডোগরা রাজপুত যোদ্ধাকে কতগুলি শর্তের বিনিময়ে জম্মু-কাশ্মীর বিক্রি করে দেন। গুলাব সিংহের বংশধররা কাশ্মীরের মহারাজা হিসাবে জম্মু ও কাশ্মীর শাসন করতে থাকেন। কিন্তু রাজ্যটি ব্রিটিশদের অধীনস্থ থাকে। এইভাবে কাশ্মীরের দেশীয় রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভারতের স্বাধীনতার সময় কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং। তিনিও ভারতের স্বাধীনতা আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন। ভারতের মন্ত্রীসভাতে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়ে দ্বিমত ছিল। ভারত সরকার হরি সিংকে ভারত ভুক্তির প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির পক্ষে জনমত গঠন করেন। হরি সিং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই জটিল পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের মদতে বিদেশী উপজাতীয়রা কাশ্মীরে প্রবেশ করে। তারা সেখানে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে থাকে। উপজাতিদের পেছনে পাক বাহিনীও কাশ্মীরে প্রবেশ করে। সংকটে পড়ে হরি সিং ভারতের সাহায্য চায়। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে হরি সিং ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর সর্দার প্যাটেল কাশ্মীরে সৈন্যবাহিনী পাঠান। পাক বাহিনীকে বিতাড়িত করে কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ ভারত উদ্ধার করে। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরে জরুরি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পাকিস্তান তার দখল করা এলাকায় একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে। সেই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয় 'আজাদ কাশ্মীর'। এই পরিস্থিতিতে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

নেহেরু মাউন্ট ব্যাটেনের পরামর্শে কাশ্মীর সমস্যাকে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিয়ে যান। বিতর্ক শুরু হলে পাকিস্তান জানায় যে উপজাতি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ব্যাপারে পাকিস্তানের কোন দায়িত্ব নেই। অন্যদিকে ভারত অভিযোগ করে যে হানাদারদের সংযত করা পাকিস্তানের দায়িত্ব। তাছাড়া ভারত যুক্তি দেখায় যে, কাশ্মীর আইনসঙ্গত ভাবে ভারতে যোগদান করেছে। সুতরাং সেখানে ভারত সৈন্য পাঠাতেই পারে। ১৯৪৯ সালে নিরাপত্তা পরিষদের কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী উভয়পক্ষ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে কিন্তু সন্ধি স্বাক্ষর করেনি। ইতিমধ্যে ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর প্রশ্ন আঞ্চলিকতার গন্ডী অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। ভারত রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে গণভোটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের যোগদানের বিষয়ে নেহেরু ও শেখ আবদুল্লার মধ্যে দিল্লি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তার ভারত ভুক্তির প্রমাণ রেখেছে।

৭.৮.১৫.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Bipan Chandra : India After Independence.

(2) Harish Kapur : India's Foreign Policy.

(3) Surjit Man Singh : India's Search for Power.

(4) Ranabir Samaddar (ed) : Space, Territory and the State.

(5) A. Vaidyanathan : The Indian Economy since Independence (1947-70).

(6) Dharma Kumar (ed) : The Cambridge Economic History of India.

(7) S. Gopal : Jawaharlal Nehru – A Biography.

৭.৮.১৫.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) To what extent did the First Five Year Plan fulfil the people's expectations ?

(2) Trace the history of Economic Planning in India?

(3) How did the Government of newly Independent India solve the problem of Native States ?

(4) Why did Nehru adopt the Policy of Non-alignment? How far was he successful?

(5) What dod you mean by Non-alignment?

পর্যায় গ্রন্থ - ৮

স্বাধীন ভারতবর্ষ

(Independent India)

একক - ১৬

Land Question and Industrial Policy

গঠন (Structure) :

৭.৮.১৬.২.০ : উদ্দেশ্য

৭.৮.১৬.২.১ : স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান নীতি

৭.৮.১৬.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৮.১৬.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.৮.১৬.২.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। স্বাধীনতা লাভের পর জওহরলাল নেহরু কিভাবে ভারতের বিজ্ঞান নীতি নির্দিষ্ট করে দিলেন।

৭.৮.১৬.২.১ : স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান নীতি

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বিজ্ঞাননীতি প্রধানত জওহরলাল নেহেরুর পরিকল্পনা মত অনুসৃত হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তৈরী করে তিনি ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। নেহেরুর এই বিজ্ঞান নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা গড়ে তোলা। ডঃ এ রহমন মন্তব্য করেছেন ''Nehru repeatedly pointed out through scientist's the need for the popularisation of scientific outlook among the people and wanted to make science and technology as a part of Indian culture.''

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতি অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতীয়দের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে পশ্চিমী সভ্যতার ফসল ব্রিটিশদের শিক্ষানীতির দুটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিলঃ শিক্ষার মাধ্যমে ব্রিটিশরা তাদের শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্য কিছু কেরানী তৈরী করতে চেয়েছিল। ছাত্রদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেওয়া হত না।

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর অত্যধিক জোর দেবার ফলে ছাত্রদের মনে ভারতের পুরাতন ও প্রচলিত বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান চেতনা সম্পর্কে কোন ধারণা গড়ে উঠেনি। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। তাছাড়া ব্রিটিশ শিক্ষানীতির মাধ্যমে এই ধারণা ছাত্রদের মধ্যে তৈরী করা হয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক। কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি সরকারের এই নীতি পরিবর্তন করার জন্য প্রচন্ড আন্দোলন করতে থাকে। এর ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার তাদের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এর ফলে বাঙালি প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির চাপে ব্রিটিশ সরকার তাদের বিজ্ঞাননীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে রিপোর্টগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তা প্রধানত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিজ্ঞান নীতি সম্পর্কে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিলেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। জাতীয় কংগ্রেসের বেশীর ভাগ নেতাই কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে অনাগ্রাহী ছিলেন তাই নয়, বিজ্ঞানের প্রসারকে তারা বাধা দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। কারণ তারা মনে করতেন, -The ideas of science of anti-religion against the Indian tradition and technology, associated with British exploitation of India and as a bane of Indian technological tradition and industry.

কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত চরিত্রের মানুষও ছিলেন। তিনি হলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি নতুন ভারতের নতুন সংস্কৃতি

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভারতের যে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ভারতের নতুন জাতীয় জাগরনের স্রোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছিলেন তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে জওহরলাল নেহেরু ছিলেন অন্যতম। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতি নির্ভর করবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে।

জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস National Planning Committee গঠন করেন। এই কমিটি স্বাধীনতার পর ভারতের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার খসড়া প্রস্তুত করেন। নেহেরু ভারতের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের এই কমিটিতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানান। এইসব বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন কমিটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তিনি ভবিষ্যত ভারতের রূপরেখা তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

নেহেরু যখন স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি যে বিখ্যাত বিজ্ঞান দপ্তরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি হল Department of Scientific and Natural Resources. এই দপ্তরটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এর দায়িত্বভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। এই দপ্তরটির প্রথম ১০ বছর কাজ করার পর তিনি এর কার্যাবলী সমীক্ষা করেন এবং বোঝার চেষ্টা করেন যে এই দপ্তরটি দেশের উন্নতির জন্য কতখানি কার্যকর হয়েছে। এই সমীক্ষা করার সময় তিনি এই দপ্তরটির কর্মসূচী রূপায়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি ত্রুটি খুঁজে বার করেন।

এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য জওহরলাল নেহেরু ১৯৫৮ সালে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করান। এই প্রস্তাবটির নাম ছিল 'Science Policy Resolution'। এই প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য ছিল জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানীদের কর্মচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা। প্রস্তাবটির বিশেষত্ব হল এই যে, পার্লামেন্টে পূর্বে সাধারণত এই ধরনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহেরুর অবদান উল্লেখযোগ্য। নেহেরু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সামাজিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিজ্ঞানীদের সামনে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা উপস্থাপিত করে সেগুলির সমাধান তাদের কাছ থেকেই চেয়েছিলেন। তার এই চিন্তাধারা তিনি বিভিন্ন মিটিং এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেষণগুলিতে নিয়মিতভাবে উল্লেখ করতেন।

নেহেরু প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিগুলিতে তিনি এই প্রশাসনিক অফিসারদের যুক্ত করেছিলেন। বিজ্ঞান নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি এইসব প্রশাসনিক অফিসারদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন।

জওহরলাল নেহেরু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির জন্যে সবরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শিল্পপতি, প্রশাসনিক অফিসার এবং কংগ্রেস দলের কিছু সদস্যের আপত্তি সত্ত্বেও নেহেরু বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। নেহেরুর এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে কতগুলি রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগ গুলিকে আরো প্রসারিত করা হয়। Technological Institute গঠন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান গুলিকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়। নেহেরু এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'Temples of Learning' বলা হয়।

নেহেরুর বিজ্ঞাননীতির আরো একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল দেশের মানুষদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করা। নেহেরু ভালভাবেই জানতেন যে কতগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করলেই ভারতের জনগণের মন থেকে কুসংস্কার দূর করা যাবে না। এই. জন্য তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে বারংবার আবেদন করেন যে তারা যেন জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটানা অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন, ''Popularisation of scientific outlook among the people''। শুধু তাই নয় নেহেরু চেয়েছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গহিসাবে পরিনত করতে। এইভাবে নেহেরুর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠানিকরূপ বিকশিত হয়ে ওঠে।

নেহেরুর বিজ্ঞান নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বিজ্ঞানী ও সমাজের মধ্যে আন্তরিক সংযোগ স্থাপন। নেহেরু চেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা যেন সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে গবেষণাগারে আবদ্ধ না রেখে সমাজ ও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। অর্থাৎ নেহেরুর এই নীতিকে বলা যেতে পারে 'Principle of Science for the people'। সাধারণভাবে দেখা যায় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মানুষের কোন যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু নেহেরুর চিন্তাধারা ছিল অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা যেন মানুষের প্রতিনিয়ত সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সচেষ্ট হন। এইভাবে নেহেরু বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সমাজভিত্তিক করতে চেয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে সমাজের সঙ্গে বা মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে জনগণের মনে বিজ্ঞান চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব নয়।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিজ্ঞান নীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্বনির্ভরতা অর্জন করা। ১৯৬২ সালে এবং ১৯৬৫ সালে যথাক্রমে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে ভারত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভারত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করার জন্য প্রয়াসী হয়। ভারত উপলব্ধি করে যে এ ব্যাপারে ইউরোপীয় দেশগুলির উপর সবসময় নির্ভর করা যাবে না। সেইজন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যুদ্ধাস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরীর কাজে মন দেয়। যেহেতু ভারত জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেছিল সেইজন্য সমস্ত দেশের কাছ থেকে যুদ্ধের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের 'National Committee of Science and Technology' পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে একটি নীতি গ্রহণ করে। এর নাম দেওয়া হয় Approach to Science and Technology plan. এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে Science for the people নীতিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়। 'The Indian Institute of Science' গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রামীণ প্রযুক্তি সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ওয়ালটেয়ার অধিবেশনে গ্রামীন প্রযুক্তির সমস্যাগুলির সম্পর্কে আলোচনা করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বিজ্ঞান নীতি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ক্রমশ একটি বৃহৎ সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে মানুষ ও সমাজকে যুক্ত করা। বস্তুত পক্ষে সরকার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির গবেষণাকে সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

৭.৮.১৬.২.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Bipan Chandra : India After Independence.

(2) Harish Kapur : India's Foreign Policy.

(3) Surjit Man Singh : India's Search for Power.

(4) Ranabir Samaddar (ed) : Space, Territory and the State.

(5) A. Vaidyanathan : The Indian Economy since Independence (1947-70).

(6) Dharma Kumar (ed) : The Cambridge Economic History of India.

(7) S. Gopal : Jawaharlal Nehru – A Biography.

৭.৮.১৬.২.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) Give a brief account of the science policy of Nehruvian Government?

ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্র পাঠযুক্ত (CBCS) স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম.এ. দ্বিতীয় সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ - ৮

West Bengal 1947 Onwards

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

জুন ২০১৯
মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

SYLLABUS

SEMESTER- II

CC-8	4 CREDITS	100 MARKS	100 HOURS

CC-8: West Bengal 1947 Onwards

BLOCK 1 : Partition and post-partition scenario

Unit-1 : Partition and the creation of a new state.

BLOCK 2 : Political developments

Unit-2 : The Formative Years, 1947-1967.

Unit-3 : The Dramatic Decades, 1967- 1977.

Unit-4 : The Age of Consolidation, 1977-2011.

Unit-5 : The Age of Change, 2011-2016.

BLOCK 3 : Economy

Unit-6 : Land reforms, agriculture.

Unit-7 : Industry, Organized & unorganized trade.

BLOCK 4 : Society

Unit-8 : Social Structure and Women: Inequalities and social mobility.

Unit-9 : The women's question.

Unit-10 : The refugee factor.

BLOCK 5: Development of Education - Rural and urban

Unit-11 : Science.

Unit-12 : Technology.

Unit-13 : Management

BLOCK 6 : Culture

Unit-14 : Literature.

Unit-15 : Performing art.

Unit-16 : Sports.

Contents

Blocks	Titles	Pages
1	Partition and post-partition scenario	1-6
2	Political developments	7-15
3	Economy	16-31
4	Society	32-72
5	Development of Education - Rural and urban	73-76
6	Culture	75-110

Block / পর্যায় - ১

Partition and Creation of a New State

বাংলা বিভাজন ও নতুন রাজ্যগঠন

একক ১

বিন্যাসক্রম

৮.১.১.০ : উদ্দেশ্য

৮.১.১.১ : ভারত ভাগের পটভূমি

৮.১.১.২ : বাংলা বিভাজন ও নতুন রাজ্যগঠন

৮.১.১.৩ : বাংলা সমন্বিতকরণ পরিকল্পনা

৮.১.১.৪ : বাংলার বিভক্তি ও উদ্বাস্তু সঙ্কট

৮.১.১.৫ : উপসংহার

৮.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.১.১.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৮.১.১.০ : উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়টি পাঠ করে ছাত্রছত্রীরা ১৯৪৭ এর দেশভাগের ফলে সংযুক্ত বাংলাভাগ করে নতুন রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ আত্মপ্রকাশ করার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।

৮.১.১.১ : ভারত ভাগের পটভূমি

ভারত ভাগের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টি সামনে চলে আসে তা হল ব্রিটিশদের উত্থান, শাসনকাল ও তাদের বিদায়। ব্রিটিশরা ১৭৫৭ সালে ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের পর থেকেই এখানে তাদের শাসন ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে থাকে। অপরদিকে এ অঞ্চলের মানুষেরাও সর্বদা চাইত ব্রিটিশদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। তাই ভারতবাসী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে সর্বপ্রথম ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহে ঘটে। কিন্তু তা সফল হতে পারেনি। ব্রিটিশরা কঠিন হস্তে দমন করে। তারপর বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৮৮৫ সালে ভারতীয়রা তাদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ''ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'' গঠন করে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষেরা সংগঠিত হবার জন্য একটি প্লাটফর্ম খুঁজে পায়। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে মুসলমানরা তাদের আলাদা স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করে। ফলে ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের সূত্রপাত হয়।

ব্রিটিশদেরকে বিতাড়িত করার জন্য ১৯১৬ সালে হিন্দু-মুসলিম লক্ষ্ণৌতে একত্র হয় এবং ১৯২০ সালে গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনকে একসাথে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদী ফল পাবার পূর্বেই ১৯২৪ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। এবং ১৯২৮ সালে নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সেখানে দেখা যায় যে মুসলমানদের আলাদা নির্বাচনের দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয় যদিও পূর্বে ১৯২২ সালে কংগ্রেস মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে আলাদা নির্বাচনের দাবিকে সমর্থন করে। তাছাড়া ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সফলতা লাভ করলে মুসলিম লীগ তাদের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক গণসংযোগ চালাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে জিন্নাহ তার দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রদান করে। এর পর থেকেই মুসলমানদের মধ্যে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবিসহ হিন্দুদের প্রতি বৈরী মনোভাব গড়ে উঠে।

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার জন্য মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পরে। ফলে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসে কলকাতায় ইতিহাসের এক জঘন্যতম নারকীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এতে প্রায় ৫০,০০০ লোক হতাহত হয়। এর পরবর্তীতে নোয়াখালীর দাঙ্গা ও ত্রিপুরার দাঙ্গা ভারত বর্ষকে ভাগ করা অবশ্যম্ভাবী করে তুলে। পলে ব্রিটিশ সরকার অনেকটা বাধ্য হয়ে পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ করে। এবং ভারত বর্ষকে দুইভাগ করে ভারত ও পাকিস্তান নামের আলাদা দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ভারত বিভাজন হল ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক বিভাজন। ১৯৪৭ সালের ১৫আগষ্ট ব্রিটিশ ভারত ভেঙে হয়ে পাকিস্তান অধিরাজ্য ও ভারত অধিরাজ্য নামে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হয়। পারিস্তান অধিরাজ্য পরবর্তীকালে আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারত অধিরাজ্য পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বা ভারত গণরাজ্য নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনের ফলে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ও পাঞ্জাব প্রদেশেও দ্বিখণ্ডিত হয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (ভারত) ও পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্থান প্রদেশ (পাকিস্তান) গঠিত হয়। পাঞ্জাব প্রদেশ ভেঙে পাঞ্জাব প্রদেশ (পাকিস্তান) ও পাঞ্জাবরাজ্য (ভারত) গঠিত হয়। ভারত বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী, ইণ্ডিয়ান সিভিল ও অন্যান্য প্রশাসনিক কৃত্যক এবং রেলপথ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সম্পদ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত করে দেওয়া হয়।

ভারত বিভাজনের অব্যবহিত পূর্বে পাঞ্জাব অঞ্চলে যে ধর্মীয় দাঙ্গা বেধেছিল, তাতে উভয় ধর্মের ২০০, ০০০ থেকে ৫০০,০০০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ইউএনএইচসিআর-এর হিসেব অনুসারে, ১কোটি ৪০ লক্ষ হিন্দু, শিখও মুসলমান ভারত বিভাজনের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন এবং এর ফলে মানব ইতিহাসের বৃহত্তম দেশত্যাগের ঘটনাটি ঘটেছিল।

৮.১.১.২ : বাংলা বিভাজন ও নতুন রাজ্যগঠন

১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তির পূর্বে, ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত করা হয় যা বঙ্গ ভঙ্গ হিসেবে পরিচিত। সে সময় পশ্চিমবাংলা ছিল হিন্দু অধ্যুসিত এবং মুসমিলরা সেখানে সংখ্যালঘু, অন্যদিকে পূর্ববাংলা ছিল মুসলিম অধ্যুসিত এবং হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু। মুসলিম

অধ্যুষিত পূর্ববাংলার মানুষ এই বঙ্গ ভঙ্গের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল, কেননা তারা উপলব্ধি করেছিল যে এই বিভক্তির মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব একটি প্রদেশ পেতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা এই বিভক্তির বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়। এই বিতর্ক পরবর্তীকালে প্রতিবাদ এবং সন্ত্রাসের জন্ম দেয় এবং ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদের মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করা হয়।

১৯০৫ সালের বাংলা বিভক্তির সময়ে হিন্দু এবং মুসলিমদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া এই মতানৈক্য পরবর্তীকালে আবারো বিতর্ক তৈরি করে যা আইন তৈরী, এমনকি ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তিতে প্রভাব রেখেছে এবং সেই সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এজেণ্ডা হিসেবে বারংবার সামনে এসেছে।

■ বিভক্তিকরণ ঃ

পরিকল্পনা অনুসারে, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্যগণ বাংলা বিভক্তিকরণ প্রস্তাবের উপরে তিনটি আলাদা ভোট প্রদান করেন।

- পরিষদের সকল সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ অধিবেশনে, যৌথ অধিবেশন বিভক্তিকরণের পক্ষে ১২৬ ভোট এবং বিদ্যমান সংবিধান পরিষদের যোগ দেওয়ার পক্ষে ৯০ ভোট (অর্থাৎ, ভারত) প্রণীত হয়।
- তারপর একটি পৃথক অধিবেশনে বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় সদস্যগণ, বাংলার বিভক্তি এবং সম্পূর্ণ একটি নতুন গণপরিষদ সপক্ষে ১০৬ এবং বিপক্ষে ৩৫টি ভোট প্রণীত হয়।
- একই পদ্ধতি বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত নয়, এমন স্থানগুলোতেও অনুসরণ করা হয়েছিল। সেখানে ৫৮ভোট বিভক্তিকরণের পক্ষে এবং ২১ ভোট বিপক্ষে প্রণীত হয়।

মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী, যদি একটিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট বিভক্তিকরণের পক্ষে প্রণীত হয় তাহলে প্রদেশ বিভক্ত হবে। এই পরিকল্পনাকে তুলে ধরে, ২০ জুন পরিষদে ভোটাভুটির ফলাফলের প্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ ভারত এবং পূর্ব বাংলা প্রদেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও, মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে, ৭জুলাই অনুষ্ঠিত একটি গণভোটে, সিলেটের নির্বাচকমণ্ডলী পূর্ব বাংলা প্রদেশে যোগদানের সপক্ষে ভোট প্রদান করে।

পরবর্তীতে স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফ এর নেতৃত্বে সীমানা কমিশন দুই নব নির্মিত প্রদেশের মধ্যে আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ অনুসারে ১৪আগষ্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগষ্ট ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

৮.১.১.৩ : বাংলা সমন্বিতকরণ পরিকল্পনা

‘‘দ্বিজাতিতত্ত্ব’’ এর উপর ভিত্তি করে ভারতের বিভক্তির পরে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে ধর্মীয় বিষয়টিকে মূখ্য বিবেচনা করা হয়েছে। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী একটি ভিত্তিগত পরিকল্পনা পেশ করেন যে, পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা ভারত কিংবা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে না যুক্ত হয়ে বরং একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সোহরাওয়ার্দী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যদি বাংলা এভাবে বিভক্ত হয় তবে পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে কেননা, সব কয়লা খনি কিংবা

পাট কল পশ্চিম বাংলার অংশ হয়ে যাবে এবং একটি সিংহভাগ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যারা কিনা শিল্পায়নের সাথে যুক্ত পশ্চিম বাংলায় অভিবাসন সম্পন্ন করবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, 'কোলকাতা' যা ভারতের অন্যতম প্রধান শহর এবং শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু তা পশ্চিম বাংলার অন্তভুক্ত হয়ে যাবে। সোহরাওয়ার্দী ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে দিল্লির একটি সংবাদ সম্মেলনে তাঁর প্রস্তাব তুলে ধরেন। তবে পরিকল্পনাটি সরাসরি মুসলিম লীগ (ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল ছিলো এবং দ্বিজাতিতত্বের আলোকে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিলো) বাতিল করে দেয়। প্রাথমিকভাবে, বাংলা প্রদেশের মুসলিমলীগ নেতারা দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন। বর্ধমানের নেতা আবুল হাসিম সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং অন্যদিকে নরুল আমিন এবং মোহাম্মদ আকরাম খান এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু মোহম্মদ আলী জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবের বৈধতা বুঝতে পেরে পরিকল্পনাকে পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর সমর্থন লাভের পর সোহরাওয়ার্দী তার পরিকল্পনার সপক্ষে সমর্থন জমায়েত শুরু করেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গুটিকয়েক নেতাই এই পরিকল্পনার সাথে একমত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন বাংলা প্রদেশের প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের বড় ভাই শরৎ চন্দ্র বোস এবং কিরণ শংকর রায়। তবে, জওহরলাল নেহেরু এবং বল্লভভাই প্যাটেল সহ বেশিরভাগ বিপিসিসি নেতা এই পরিকল্পনা বাতিল করেন। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন হিন্দু জাতীয়তাবাদীর দল এর তীব্রভাবে বিরোধিতা করে। তাদের মতামত ছিলো যে, এই পরিকল্পনা আসলে বিভক্তিকরনের বিপক্ষে সোহরাওয়াদীর দ্বারা একটি চাল মাত্র যাতে কলকাতা শহর সহ শিল্পোন্নত পশ্চিম অংশের উপর লীগ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। তারা আরো মতামত পোষণ করেছিলেন যে, যদিও পরিকল্পনায় একটি সার্বভৌম বাংলার কথা উল্লেখ করা আছে, ওটা বাস্তবিক পক্ষে একটি ভার্চুয়াল পাকিস্তান ছাড়া কিছুই হবে না এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের চিরতরে মুসলিম সংখ্যগুরুদের দয়ার উপর চলতে হবে।

যদিও কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রস্তাবটি আলোর মুখ দেখা সম্ভব ছিলো না, বোস এবং সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র নিয়ে একটি মতৈক্যে পৌঁছুতে তাদের আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সোহরায়োর্দীর মত বোসও বিশ্বাস করতেন যে, বিভক্তিকরণের ফলে বাংলার অর্থনীতি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অর্ধেকের মত হিন্দু জনগোষ্ঠী অসহায় অবস্থায় পূর্ব পাকিস্থানে আটকা পরবে। চুক্তিটি ২৪ মে, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় চুক্তিটি আক্ষরিক অর্থে একটি রাজনৈতিক চুক্তি ছিলো এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কেননা ছয় বছর ধরে মুসমিল লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের ক্রমাগত প্রচার, সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রণালয়ে হিন্দু ধর্মালম্বীদের প্রান্তিকীকরণ এবং ১৯৪৬ সালের দাঙ্গরা ফলে মুসলিম লীগের প্রতি বাঙালি হিন্দুদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস তখন সামান্যই অবশিষ্ট ছিলো। এর মাঝেই নির্বাচকমণ্ডলী প্রকৃতি প্রশ্নে (পৃথক বা যৌথ) বোস এবং সোহরাওয়ার্দীর মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়।

সোহরায়োর্দী মুসলিম ও মুসলিম নন-তাদের জন্য পৃথক নির্বাচন বজায় রাখার উপর জোর দেন। কিন্তু বোস এর বিরোধিতা করেন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন কেননা কংগ্রেস এর দিক থেকে এবং অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সমর্থনের অভাব ছিল। ফলে অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। তারপরেও, এই পদক্ষেপকে বাংলার বিভক্তি এড়ানো এবং ভাহালি মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্রে বসবাস করার ইচ্ছায় শেষ চেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ ভারতবর্ষ বিভক্তির একটি অংশ হিসেবে ধর্মের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ ভারতের অন্তভুক্ত বঙ্গ প্রদেশ ভারত এবং পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বিভক্ত হয়। প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত ''পশ্চিম বাংলা'' ভারত এবং মুসলিম অধ্যুষিত ''পূর্ব বাংলা'' পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। ৩জুন পরিকল্পনা বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ এবং ১৫ অগাষ্ট যথাক্রমে পাকিস্তান এবং ভারতের নিকট এই নতুন ভাবে বিভক্ত বাংলা প্রদেশের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান যা পাকিস্তানের প্রদেশ ছিল, তা ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

- মুসলিম প্রধান জেলা, দিনাজপুর, রংপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহি, বোগুরা, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, নদিয়া, ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালি, তিপ্পেরা, চট্টগ্রাম।
- **হিন্দু প্রধান জেলা :** কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, দার্জীলিং, জলপাইগুড়ি, খুলনা।
- **বৌদ্ধ প্রধান জেলা :** পার্বত্য চট্টগ্রাম।
- **পাকিস্থান :** পূর্ব দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহি, বোগুরা, পাবনা, ময়মেনসিংহ, সিলেট (বরক ভালী ছাড়া), পূর্ব নদিয়া, ঢাকা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালি, তিপ্পেরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
- **ভারত:** কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিম নদিয়া দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বরাক ভালী (আসাম)।

৮.১.১.৪ : বাংলার বিভক্তি এবং উদ্ধাস্তু সংকট

একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিভক্তির পর অবিলম্বে স্থানান্তরন শুরু করেন। কয়েক মিলিয়ন হিন্দু ধর্মবলম্বী পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু করে। তাদের মাঝে অধিকাংশই পশ্চিম বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। অল্প কিছু জনগোষ্ঠী আসাম, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য প্রদেশে থাকতে শুরু করে। এই শরণার্থী সমস্যা সবচেয়ে বেশি মারাত্মাক আকার ধারণ করে পাঞ্জাবে, সেখানে বিভক্তিকরণের পূর্বেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এর ফলাফল স্বরূপ পূর্ব এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে খুব দ্রুতই ১ বছরের মাঝে উভয় পক্ষের লোকজন অভিবাসন প্রক্রিয়া শেষ করেন। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে কোলকাতা এবং নোয়াখালিতে দাঙ্গা এবং সন্ত্রাস সীমাবদ্ধ ছিলো। ফলে অভিবাসন প্রক্রিয়া ছিলো ধীর গতির এবং বিভক্তির পরে তিন দশক ধরে এই প্রক্রিয়া চলমান। যদিও দাঙ্গা কোলকাতা এবং নোয়খালিতে সীমাবদ্ধ ছিলো তারপরেও পশ্চিম বাংলার মুসলিম ধর্মালম্বীরা এবং পূর্ব বাংলার হিন্দু ধর্মীলম্বীরা অনিরাপদ বোধ করতে শুরু করেন এবং তাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে তারা অন্য দেশে একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ছেড়ে যাবেন কিনা বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধীনে থাকবেন কিনা। পূর্ব বাংলার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাধে যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু বর্ণের তারাই প্রথমে পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে। যারা সরকারী চাকুরে ছিলেন তাদেরকে কোথায় থাকবেন (পূর্ব বাংলা বা পশ্চিম বাংলা) সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। শহুরে শিক্ষিত উচ্চ এবং মধ্যবিত্তরা, গ্রামের উচ্চবংশীয়রা, ব্যবসায়ী এবং শিল্পীরা বিভক্তির পরপরই ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। যাদের পশ্চিম বাংলায় আত্মীয় স্বজন অথবা অন্যান্য সূত্র ছিল তারা কম সময়ের মাঝেই এবং তুলনামূলক কম ভোগান্তিতে পশ্চিম বাংলায় স্থায়ী হতে পেরেছে। পশ্চিম বাংলার মুসলিমরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল।

তবে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যারা কিনা নিম্ন বর্ণ তথা 'নমশূদ্র' তাদের জন্য অভিবাসন মোটেও সুবিধাজনক ছিল না। তাদের আয়ের পথ ছিল মূলত কৃষিকাজ এবং অন্য কোন পেশার প্রতি দক্ষতাও ছিল না। বাধ্য হয়ে তারা পূর্ব বাংলায় থেকে যায়। যাই হোক, বিভক্তির পরে পাকিস্থানের রাজনৈতিক আবহাওয়া খারাপ হতে থাকে এবং নতুন করে সাম্প্রসায়িক সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে থাকে। ১৯৫০ সালে নতুন করে বরিশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। পরিস্থিতি আরো খারাপ ধারণ করে যখন নাথ মণ্ডল (যিনি একজন নম:শূদ্র ছিলেন ও মুসলিম লীগ কে সমর্থন করেছিলেন) মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতে চলে যান। এর পরেই দুই দশকে যখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জমাট বেধেছে, পূর্ব বাংলার হিন্দুরা ততবারই ভারতে অভিবাসনের জন্য আগ্রহী হয়েছেন।

■ পরিসংখ্যান

ভারতের পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৫১ সালে ২.৫৩৩ মিলিয়ন উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। তাদের মাঝে ২.০৬১ মিলিয়ন পশ্চিম বাংলায় স্থায়ী হয়। অন্যান্যরা আসাম, ত্রিপুরা বা অন্যান্য প্রদেশে চলে যায়। ১৯৭৩ সালের মাঝে এই সংখ্যা ৬০ লক্ষের উপরে গিয়ে পৌঁছায়। নিচের সারণিতে বিভিন্ন সময়ের উদ্বাস্তুদের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

৮.১.১.৫ : উপসংহার

এই পর্যায়টি আলোচনা করে দেখা গেল যে ১৯৪৭ এর পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। অতঃপর দেশভাগ জনিত সমস্যা সমাধান করে ধিরে ধিরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

৮.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। Gyanendra pandey Remembering Partition : Violence, Nationalism, and History in India, Cambridge University Press, 2001.

২। Bashabi Fraser Bengal Partition Stories : An Unclosed Chapter. New york : Anthem Press, 2008.

৩। Hashim S. Raza Mountatten and the partion of India. New Delhi : Atlantic Publishers and Distributors, 1989.

৮.১.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির উৎপত্তির পতভূমিকা আলোচনা কর।

২. বাংলা ভাগের পক্ষে ও বিপক্ষে মতগুলি কি কি ছিল?

Block / পর্যায় - ২

Political Develipment

রাজনৈতিক ইতিহাস

একক ২, ৩, ৪, ৫

বিন্যাসক্রম

৮.২.২.০ : উদ্দেশ্য

৮.২.২.১ : পুনর্গঠনের যুগ (১৯৪৭-১৯৬৭)

৮.২.৩.২ : নাটকীয় দশক (১৯৬৭-১৯৭৭)

৮.২.৪.৩ : সংগঠিত সময়কাল (১৯৭৭-২০১১)

৮.২.৫.৪ : পরিবর্তনের যুগ (২০১১-২০১৬)

৮.২.৫.৫ : উপসংহার

৮.২.৫.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৮.১.২.০ : উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৭ থেকে রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা।

৮.১.২.১ : পুনর্গঠনের যুগ (১৯৪৭-১৯৬৭)

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সূচিত হয় ১৯৪৭ সালে। এই বছরই অবিভক্ত ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্থানভুক্ত হয়। পাকিস্তানের প্রদেশটির নাম হয় পূর্ব বাংলা ও ভারতের অংশটি পশ্চিমবঙ্গ নাম ধারণ করে। ১৯৫০ সালে কোচবিহার রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪অগস্ট ব্রিটিশ বঙ্গপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্তভুক্ত ৯০টি কেন্দ্রের বিধায়ক ও দুই জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ২১ নভেম্বর প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন বসে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়, জ্যোতি বসু প্রমুখ। ১৯৪৮ সালে বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে কোচবিহারের রাজ্য জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভারতের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলে রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতীয় সংবিধানের পশ্চিমবঙ্গের দ্বিকক্ষীয় বিধানসভা অনুমোদিত হয়। ১৯৫২ সালে ৫জুন ৫১ সদস্যবিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ গঠিত হয়। দুই জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য হয় বিধানসভার সদস্যসংখ্যা হয় ২৪০। ১৯৫২ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন উক্ত বছরে ভারতের আয়োজিত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনই । নির্বাচনে বামপন্থী রাজনীতিতে দু'টি জোটের উত্থান ঘটেছিল। এগুলি হল : ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট অর্গানাইডেজশন অফ ইণ্ডিয়া (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি, ও ফরওয়ার্ড ব্লক (মাক্সবাদী গোষ্ঠী-এর জোট) এবং পিপল'স ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট ফ্রন্ট (সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক (রুইকার) ও ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির জোট)। এই ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট অর্গানাইজেশন অফ ইণ্ডিয়া জোট মাত্র ৩৯ টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে কংগ্রেস ১৫০ টি আসন লাভ করে। প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন। ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৫২ সালের ১৮ জুন প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন বসে।

১৯৫৫ সালে চন্দননগরের ফরাসী উপনিবেশ, যেটি ১৯৫০ সালে ভারত সরকারের অধীনে আসে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। সাথে সাথে বিহারের কিছু অঞ্চলও সংযুক্তি লাভ করে। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী বিহারের পুর্ণিয়া জেলার মহানন্দা নদীর পূর্বাংশ এবং দক্ষিণের মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমা (চার থানা বাদে) পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত হয়। এর ফলে ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৮৭ (২৩৮টি আসন) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫ (২৫২টি আসন)হয়। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস পায় ১৫২টি আসন ও সরকার গঠন করে। মোট আসন ছিল ২৫২টি। বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন। এর পরবর্তী ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ১৫৭ টি আসন পেয়ে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। ওই বছর ১জুলাই তাঁর মৃত্যুর পর চলতি বিধানসভার অবশিষ্ট মেয়াদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুকালের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। বিধানচন্দ্র রায়ের প্রয়াণের পর **প্রফুল্লচন্দ্র সেন** পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়কালকে গবেষকরা পুনর্গঠনের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ এই সময় এই নবগঠিত রাজ্যটিকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ এই বাধাগুলি নিরাময়ের চেষ্টা করা হয়। সদ্যখণ্ডিত পূর্বপাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু নিঃসম্বল অবস্থায় শুধু প্রাণটুকু বাঁচাবার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়ছে সাতপুরুষের পদধূলিরঞ্জিত বাস্তুভূমি ছেড়ে। এই অক্লিষ্টকর্মা কর্মবীর তাদের দিয়েছিলেন মাথাগোঁজার ঠাঁই, একমুঠো খাবারের প্রতিশ্রুতি। উদ্বাস্তুর আগমনে রাজ্যে তখন খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা ভয়াবহ আকার নিয়েছে। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্থান থেকে কাঁচামাল পাটের যোগান বন্ধ। তিনি বহু পতিত জমি উদ্ধার করে এবং কিছু ধানের পাটচাষের ব্যবস্থা করে লক্ষাধিক চটকলকর্মীর সম্ভাব্য বেকারি রুখলেন।

তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পাঁচটি নতুন শহরের দূর্গাপুর, বিধাননগর, কল্যাণী, অশোকনগর-কল্যাণগড় ও হাবরা। তাঁর চোদ্দো বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। এই কারণে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৬১ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হন। মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানে কলকাতার উপনগরী সল্টলেকের নামকরণ করা হয় বিধাননগর। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিন (১ জুলাই) সারা ভারতে ''চিকিৎসক দিবস'' রূপে পালিত হয়। শিল্পসমৃদ্ধ বাংলা গড়তে তাঁর ত্রুটিহীন পরিকল্পনায় স্থাপিত হল দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা। বাসস্থানের জন্য তৈরি হল কল্যাণী

উপনগরী, লেক টাউন, লবণহ্রদ নগর। দুগ্ধ সরবরাহের জন্য গড়ে তুললেন হরিণঘাটা দুগ্ধপ্রকল্প। শিক্ষিত বেকারদের বিপুল পরিমাণে কর্মনিয়োগের জন্য সৃষ্টি করলেন কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই স্থান ছিল একটি আমেরিকান বিমান ঘাঁটি। যার কিছু নিদর্শন এখনও কল্যাণী স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে ও কল্যাণী ঘোষপাড়া অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ে এর নাম ছিল রুজভেল্ট নগর। ১৯৫০ এর দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে কল্যাণীকে একটি আদর্শ পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও এই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের স্মৃতিস্বরূপ কল্যানীর একটি রাস্তার নাম 'কংগ্রেস রোড' নামে চিহ্নিত।

■ বিধাননগর নির্মাণ ঃ

১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্থান থেকে দিনে রাতে কোলকাতায় ঢুকতে শুরু করল লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। এইসব শরণার্থীরা বিভিন্ন ক্যাম্প, বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাথা গোঁজার আপাত ঠাঁই পেলেও অনতিবিলম্বই রাজ্য সংকার জন-স্বার্থে, মানবিকতার দায়ে এবং বাঙালীত্বের মানসিকতায় সচেষ্ট হল তাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করতে এবং ছিন্নমূল বাঙ্গালীদের নাগরিকত্ব দিতে। তাই তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সচেষ্ট হলেন মানুষের বসবাসের উপযোগী কোলকাতার কাছাকাছি বিস্তীর্ণ জমি এলাকা খুঁজে বার করতে। আর লক্ষণীয়, সে সময়ে সল্টলেক এলাকা, যেহেতু লোনা জলে ভরা সম্পূর্ণভাবে কৃষি এবং বসবাস অযোগ্য ছিল, তাই সরকারের পক্ষে সম্ভ হয়ে ছিল ১৬মে ১৯৫৫ সালে রীতিমত নোটিস দিয়ে কিছু মাছের ভেড়িসহ ৮,৭৬০, ৫০ একর বা ৩৫.৪৫২৫ বর্গ কিলোমিটারের দখল নেওয়া এবং ল্যাণ্ড এ্যাকুইজেশন এ্যাক্ট ১৮৮৪-এর ১.(৪) ধারায় তখন থেকেই মূলতঃ শুরু হয়ে যায় সল্টলেকের ডাঙ্গা বা জলা জমি অধিগ্রহণের কাজ।

কাকতালীয় হ'লেও একটা ঘটনা খুবই লক্ষণীয় এবং মজার—সেটা হ'ল ১৭জুন, ১৭৫৬ সালে দেশের পরাধীনতার প্রাক্কালে সিরাজ-উদ্-দৌল্লা তাঁর নবাবীর স্বার্থে বর্তমান সল্টলেকের গোড়াপত্তনে কিছুটা ছোঁয়া লাগালেও সাল-তারিখ অনুযায়ী তার ঠিক দু'শ বছর পরে স্বাধীন ভারতের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জন-স্বার্থে, মানবিকতার দায়ে, কর্তব্যের খাতিরে ১৬মে ১৯৫৫ সালে জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ জারী করেছিলেন বর্তমান উন্নত সল্টলেক সিটি বা লবনহ্রদ বা বিধাননগরের গোড়াপত্তনের জন্য।

এতবড় কর্মযজ্ঞ যে খুব সহজে হয়েছিল, মোটেই তা নয়। এর জন্য সাল, তারিখ দিয়ে একটি ক্রম পর্যায়ের তালিকা দিয়ে দিলেই সহজে বোঝা যাবে।

(১) ১৯৪৭—দেশের স্বাধীনতা এবং কাতারে কাতারে শরণার্থীদের কোলকাতায় আগমন।

(২) ১৯৪৭— সল্টলেকের প্রকৃত উন্নয়ন কর্ম-যজ্ঞ শুরু হয় সেখানকার সুষ্ঠু পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থার সমস্যার (drainage problem) ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে।

(৩) ৩০শে জানুয়ারী ১৯৫৩—সল্টলেকের জমি পুনরুদ্ধার ও অধিগ্রহণের সমস্যা (problem of reclamation and acquisition) সমাধানের ব্যাপারে একটি প্রাথমিক রূপরেখা সরকারের হাতে জমা পড়ল।

(৪) ১৯৫৩—পঃবঃ সরকার সল্টলেকের লোনা জল মুক্ত ক'রে জমি পুনরুদ্ধারের কর্ম-পরিকল্পনার ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেন—(Finalized the scheme known as Reclamation od Salt Lake Area)।

(৫) ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৬—প্রস্তাবিত কর্ম-পরিকল্পনার জন্য সরকার বামনঘাটা, হাটখোলা এলাকার জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র সমালোচনায় পড়ে এবং শুরু হয় অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন।

(৬) ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭—সরকার বামনঘাটা পর্যন্ত শহরকে বিস্তৃত করতে চাইলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেখানে এক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। জন-সমাবেশে জ্যোতি বসুর মত নেতারাও বক্তৃতা দেন।

(৭) ১৯৫৯—ফলতঃ সরকার উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন এবং রিক্লামেশনের ব্যাপারে একটি 'ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি'ও গঠন করেন। ওই বছরই ওই কমিটি একটি প্রস্তাব নিয়ে কমিশনের সামনে তাঁদের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা বা জরিপ বা সমীক্ষা ইত্যাদি সব প্রশ্নেরই যথাযথ জবাব দিয়ে সবারই দুশ্চিন্তার নিরসন করেন।

(৮) ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১—সল্টলেক সিটি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও জল মুক্ত করে পুনরুদ্ধারের (reclamation) প্রাথমিক কাজ নিবিঘ্নেই শুরু হয়ে গেল।

(৯) ১৯৬১— সল্টলেকের লোনাজলের অগভীর হ্রদগুলোকে শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে জল মুক্ত করার কাজ শুরু হয়ে যায়। এরপর ওই অগভীর খাদ গুলোকে শুষ্ক করে তার মধ্যে মাটির বাঁধ বেঁধে তৈরী করা হয় ছোট ছোট খুপরী বা সেল—যেগুলোতে হুগলী নদীর তলদেশ থেকে পাইপে বয়ে এনে পূর্ণ করা হয় এবং মাটি থিতিয়ে পড়ার পর উপরের জল আবার পাম্প করে বার করে দেওয়া হয়।

(১০) ১৬ এপ্রিল, ১৯৬২—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হুগলী নদীর তলদেশ থেকে পাইপ লাইনে সল্টলেকে পলিমাটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার শুভ উদ্বোধন করেন।

ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দূর্গাপুর ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালে চালু হওয়ার সময় এই বৃহৎ ইস্পাত কারখানার অপরিশোধিত ইস্পাতের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১০ লক্ষ টন। এটি ছিল সেই সময় ভারতে ভারী শিল্পে এক বৃহৎ পদক্ষেপ। নব্বই দশকে উচ্চমানের উৎপাদন অর্জনের সঙ্গে মূল লক্ষ্য ছিল ১৮লক্ষ টন (১.৮ এম. পি.এ) ইস্পাতের উৎপাদন ও গুণমান বৃদ্ধি, শক্তি সংরক্ষণ, উৎপাদন খরচ কম করা এবং পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনা।

ডিএসপি বর্তমানে প্রধান লক্ষ্যগুলির সাথে তার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা (পর্যায়-১) প্রয়োগ করছে :

- উপলব্ধ স্যামিসেন রূপান্তর, রোলড পণ্য উৎপাদন
- প্রায় ১০০% পণ্য উৎপাদনের

- বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিদ্যমান সুবিধার রক্ষণাবেক্ষণ/বিভাজন
- উৎপাদন ক্ষমতা ২৪লক্ষ (২.৪০ এম.পি.এ) টনে বৃদ্ধি পাবে, যার মধ্যে ২২লক্ষ টন (২.২০ এম.পি.এ) ক্রুড স্টিল এবং ২২২ লক্ষ টন(২.২২ এম.পি.এ) বিক্রয় যোগ্য ইস্পাত।

* তথ্যসুত্র tothyo/dipakrachanabali.wordpress.com/2018/06/03/ বিধাননগরের-গোড়াপত্তন/

৮.২.৩.২ : নাটকীয় দশক (১৯৬৭-১৯৭৭)

১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রাজ্যে মোট চারটি জোট সরকার গঠিত হয় এবং মোট তিনবার সীমিত সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। এই সময় রাজ্যের পরিস্থিতি কিছুটা অস্থির হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে ঘোষিত হয়েছিল বিধানসভা নির্বাচন। একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় লোকসভার নির্বাচনও। সেই প্রথম পশ্চিমবঙ্গসহ আটটি রাজ্যে কংগ্রেসের ধারাবাহিক শাসনে ছেদ ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের সামগ্রিক ঐক্য না হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যায়। এই নির্বাচনী ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছিল কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব ও রাজনৈতিক চেতনা। জনগণের রায়ে সি পি আই (এম) যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সর্ববৃহৎ পার্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, আসন সংখ্যা ছিল ৪৪। নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হওয়ার পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রথম অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো। অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬৭র নভেম্বরে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে। শুরুতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে একটি সংখ্যলঘু সরকার গঠন করলেও সেই মন্ত্রীসভা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎখাত হওয়ার ঘোষণার পর রাজ্যজুড়ে ২৪-ঘণ্টার এক জোরদার হরতাল সংঘটিত হয়। ঘোষ মন্ত্রীসভার পতনের পর রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৬৯এ রাজ্যে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সিপিআই (এম) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সর্ববৃহৎ দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সিপিআই ও বাংলা কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থনে অজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে পুনঃবহাল হন। ১৯৭০এর ১৬ই মার্চ তিনি পদত্যাগ করলে রাজ্যে আবার রাষ্ট্রপতি শাসন ফিরে আসে। এই সময় থেকে রাজ্যে অতিবামপন্থী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

■ নকশাল আন্দোলন :

নকশাল শব্দটি এসেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোটগ্রাম ''নকশাল বাড়ি'' থেকে। এখানে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র একাংশ ১৯৬৭ সালে তাদের নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) একটি পৃথক উগ্র বামপন্থী দল গঠন করেন। এ বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল। এ বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২৫মে তারিখে। তখন নকশালবাড়ি গ্রামের কৃষকদের উপর স্থানীয় ভূস্বামীরা ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে অত্যাচার করছিল। এরপর এই কৃষকরা ঐ ভূস্বামীদের সেখান থেকে উৎখান করে। চারু মজুমদার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও সে তুং এর অনুসারী ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতের কৃষক এবং গরিব মানুষদের মাও সে তুং এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রেণিশত্রুদের শোষণ করে। তিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার লেখনীর মাধ্যমে। তার বিখ্যাত রচনা হল ''হিস্টরিক এইট ডকুমেন্টস'' বা আট দলিল যা নকশাল মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করে। বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সরোজ দত্ত শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতির পক্ষে একাধিক প্রবন্ধ রচনা

করেন নকশালদেব মুখপত্র 'দেশব্রতী' পত্রিকায়। নকশালপন্থীরা পরবর্তীতে সিপিআই (এম) থেকে বেরিয়ে 'অল ইণ্ডিয়া কমিটি অব কমিউনিস্ট রেভুলশনারী" (এ আই সি সি সি আর) গঠন করেন। ১৯৬৯ সালে এ আই সি সি সি আর থেকে জন্ম নেয় কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)। বাস্তবে সকল নকশালবাদী দলেরই উদ্ভব হয়েছে সিপিআই (এম এল) থেকে। তবে ''মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার" নামে একটি ভিন্ন মতাদর্শের দল ছিল। তাদের উদ্ভব হয়েছিল ''দক্ষিণদেশ গ্রুপ" নামে একটি সংগঠন থেকে। পরবর্তীতে তার ''পিপলস ওয়ার গ্রুপ" এর সাথে যুক্ত হয়ে ''কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া" (মাওবাদী) গঠন করে। এছাড়া ভিন্ন মতাদর্শের আর একটি দল হল ''অন্ধ্র রেভুলশনারী কমিউসিনস্টস্" এবং তারা ''টি.নাগি রেড্ডি"-র ''মাস লাইন" মতবাদের অনুসারী ছিল।

১৯৭০ সালের দিকে এ আন্দোলন অন্তর্দ্বন্দের কারণে কয়েকটি বিরোধী অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালে দিকে প্রায় ৩০ টি নকশালবাদী দল সক্রিয় ছিল এবং তাদের জনবল ছিল প্রায় ৩০,০০০। ২০০৪ সাল ভারতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসেবে মতে প্রায় ৯৩০০ নকশালবাদী ক্যাডার সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের কাছে প্রায় ৬৫০০ অনিবন্ধিত অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে, এছাড়া দেশী অস্ত্র তো আছেই। Judith Vidal Hall (২০০৬) এর মতে সাম্প্রতিক সময়ে নকশালদের সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০ এবং তারা ভারতের বনভূমির প্রায় এক পঞ্চামাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। তারা তাদের কর্মকাণ্ড ভারতের ৬০৪টি জেলার ভেতর ১৬০ টিতে বিস্তার করেছে।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী চরিত্রগত কারণে তেলেঙ্গানার সংগ্রামকে নেহরুর পদতলে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিপরীতে নকশালবাড়ি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুবিধাবাদী কেন্দ্র ও কাঠানোর উপর আঘাত হেনেই উপমহাদেশের বিপ্লব অকাঙ্ক্ষী বিপ্লবীদের নিজস্ব পার্টি গঠনের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। তেলেঙ্গানা পার্টি সংশোধনবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, নকশালবাড়ি তা করেনি।

বর্তমানে কিছু নকশালবাদী দল ভারতের মূলধারায় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, যেমন— সিপিআই (এম এল) লিবারেশন।

■ বাংলায় বিপ্লব

নকশাল আন্দোলন কলকাতার ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। ছাত্রদের একটি বড় অংশ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। বিশেষত নামকরা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা প্রভাবিত হয়েছিল এই আন্দোলনে। চারু মজুমদার বলেছিলেন বিপ্লবী কার্যক্রম শুধুমাত্র প্রামাঞ্চলে চালিয়ে গেলেই চলবে না, বরং একে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি নকশালদের শ্রেণীশত্রু খতম করার নির্দেশ দেন। এ শ্রেণীশত্রুদের মধ্যে যেমন ছিল ভূস্বামী তেমনি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পুলিশ অফিসার, রাজনীতিবিদ এবং আরও অনেকে।

সে সময় কলকাতার সব স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নকশালপন্থী ছাত্ররা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নিয়ে তার মেশিন শপে পুলিশদের সাথে লড়ার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজছিল তাদের সদর দফতর। তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃগোপাল সেন কে হত্যার পরিকল্পানা করেছিল।

নকশালরা অল্পসময়ের মধ্যে ভারতের শিক্ষিত সমাজের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। দিল্লীর ''সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ" তাদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

এরপর সরকার নকশালদের কে শক্ত হাতে দমনের সিদ্ধান্ত নেয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় নকশালদের উপর প্রতি-আক্রমণের নির্দেশ দেন। পুলিশদের কিছু মানবতা বিরোধী ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল নির্বিচারে হত্যা এবং অকারণে যে কাউকে বন্দী করার ক্ষমতা। লক-আপ হত্যা, জেলবন্দী হত্যা ও ভূয়োসংঘর্ষ দ্বারা পুলিশ বিভিন্ন সময় নকশালপন্থীদের হত্যা করেছে। এক মাসের ভেতরে সরকার নকশাল আন্দোলন দমন করেছিল। ''নকশালদের শক্ত হাতে দমন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই'' ভারত সরকার এবং পুলিশের মনোভাব ছিল এমনি। তারা দেশের জনগন কে এ কথাও ভাল ভাবে বুঝিয়েছিল যে ''দেশ এখন ঐ চরমপন্থীদের সাথে গৃহযুদ্ধে নেমেছে, এ যুদ্ধে গণতন্ত্রের নামে পরিহাসের কোন স্থান নেই। কেননা ঐ চরমপন্থীদের কাছে গণতন্ত্র মূল্যহীন।'' এর ফলে দেশবাসীর কাছে নকশালদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়, আর তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এছাড়া অর্ন্তকোন্দলের কারণে আন্দোলনে ছেদ পড়ে। দলের একটি বড় অংশ চারু মজুমদারের নির্দেশিত পথের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ১৯৭১ সালে সিপিআই (এম-এল) ভেঙে দু টুকরো হয়ে যায়। চারু মজুমদারের দল থেকে সত্য নারায়ন সিং বেরিয়ে যান। ১৯৭২ সালে চারু মজুমজার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আলীপুর জেলে নিহত হন। তাত্ত্বিক নেতা সরোজ দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলে তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি, সম্ভবত তাকে হত্যা করা হয়। পলিটব্যুরোর অন্যতম নেতা সুশীতল রায়চৌধুরী আত্মগোপন থাকা অবস্থায় মারা যান। প্রধান নেতৃবর্গের বড় অংশই জেল বন্দী হন। পরে নকশালপন্থী দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) বহু ধারা উপধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং বিজয়ী নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হন। এই পর্যায়ে, ১৯৭৫ সালে, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশজুড়ে জরুরী অবস্থা জারি করেন। এই সময়কাল রাজ্যে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে নকশালপন্থীদের চরম হিংসাত্মক লড়াই ও শেষ পর্যন্ত আন্দোলন দমনের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৭৪এ, বসন্তরোগের মহামারীতে হাজারো মানুষের মৃত্যু ঘটে। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে পরাজিত করলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এক বিশাল পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই যুগ কে নাটকীয় দশক বলা যুক্তিসঙ্গত।

৮.২.৪.৩ : সংগঠিত সময়কাল (১৯৭৭-২০১১)

১৯৭৭ সালের ১৪জুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আয়োজিত হয়। কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পতনের পর এই নির্বাচন আয়োজিত হয়। বামফ্রন্ট এই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। এই বিজয় বাম দলগুলির কাছেও বিস্ময়কর ছিল। এই নির্বাচনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের সূত্রপাত ঘটে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) নেতা জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি জয় লাভ করলে নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকার সেই নয়টি রাজ্যে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস (আর) লোকসভা ভোটে পরাজিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছিল এই নয়টি রাজ্যের অন্যতম। কংগ্রেস(আর) বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস(আর) সরকার সুপ্রিম কোর্টে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন জানায়। কিন্তু ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিলে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বি.ডি. জাটির আদেশক্রমে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালের মার্চে আয়োজিত নির্বাচনের পূর্বে বামফ্রন্ট (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) নেতৃত্বাধীন একটি নবগঠিত জোট) ও জনতা পার্টি আসন-ভাগাভাগির চুক্তির ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করেছিল। বিধানসভা নির্বাচনের আগেও দুই পক্ষ আসন-ভাগাভাগির ব্যাপারে ঐক্যমতে আসার চেষ্টা করে। বামফ্রন্ট জনতা পার্টিকে ৫৬% আসন এবং জনতা পার্টি নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে মুখ্যমন্ত্রীর আসন ছেড়ে দিতে রাজি ছিল। কিন্তু জনতা পার্টি ৭০% আসনে দাবি জানায়। ফলে দুই পক্ষের জোট গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বামফ্রন্ট ও জনতা পার্টি আলাদা আলাদা ভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়।

১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বামফ্রন্ট, কংগ্রেস(আর) ও জনতা পার্টির মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। বামফ্রন্ট ২৯৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। এর মধ্যে সিপিআই (এম) ২২৪টি আসনে এবং সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ৩৬টি, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ২৩টি, মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ৩টি, ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ২টি আসনে প্রার্থী দেয়। একটি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলেন বামফ্রন্ট-সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। কংগ্রেস (আর) ২৯০টি আসন এবং জনতা পার্টি ২৮৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল।

বামফ্রন্ট ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৩১টি আসন অধিকার করে এই নির্বাচনে জয় লাভ করে। এই নির্বাচনের ফলাফল বামফ্রন্টের কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল। কারণ, তারা নির্বাচনের আগে জনতা পার্টিকে ৫৬% আসন ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ১৯৭৭ সালের ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে। জ্যোতি বসু এই সরকারে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ দীর্ঘ ৩৪বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন ছিল। কোন গনতান্ত্রিক কাঠামোয় একটি সরকার এতদিন টিকে থাকা রাজনৈতিক ঐতিহাসিকদের কাছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা। স্থায়ী সরকার ও দৃঢ় দলীয় সংগঠন থাকার ফলে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। সেই কারণে এই সময়কালে কে সংগঠিত সময়কাল বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

১৯৯০ -এর দশকের মধ্যভাগে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং ২০০০ সালে সংস্কারপন্থী নতুন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্বাচনের পর রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছোটোবড়ো বেশ কয়েকটি সশস্ত্র জঙ্গিহানার ঘটনা ঘটেছে। আবার শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের একাধিক সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

২০০৬ সালে হুগলির সিঙ্গুরে টাটা ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে তীব্র গণ-অনন্তোষ দেখা যায়। জমি অধিগ্রহণ বিতর্কের প্রেক্ষিতে সিঙ্গুর থেকে টাটা গোষ্ঠী কারখানা প্রত্যাহারে করে নিলে, তা রাজ্য রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ২০০৭ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি অধিগ্রহমের কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে পুলিশের গুলিতে ১৪জন মারা গেলে রাজ্য রাজনীতি ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০১০ সালের পৌরনির্বাচনে শাসক বামফ্রন্টের আসন সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস

পেতে থাকে। অবশেষে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়ে রাজ্যের ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান হয়।

৮.২.৫.৪ : পরিবর্তনের যুগ (২০১১-২০১৬)

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ ৩৪ বৎসর ব্যাপী বাম শাসনের অবসান ঘটে। শাসনের এই পরিবর্তন কে পরিবর্তনের যুগ রূপে অভিহিত করা হয়। এই পরিবর্তনের একটি দীর্ঘ প্রাক-ইতিহাস আছে। সম্ভবত যার সূচনা হয়ে ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ে। এই নির্বাচনে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার স্থাপিত হয়, সেরকম পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ১৬টি আসন লাভ করে। তাঁর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যাদবপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের তরুণ প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বামপ্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরাজয়। এই নির্বাচনের মাধমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান হয়। যিনি পরবর্তীকালে বিভিন্ন গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে ব্যার্থ হলে, কংগ্রেস সমর্থকদের মনে হতাশা তৈরি হয়। এই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হলে অনেক কংগ্রেস সমর্থক এই নব গঠিত দলে যোগ দেয়। ১৯৯৮ সালে এই দল গঠিত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ এর সাধারণ নির্বাচনে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করলেও ২০০১ বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০০৬ বিধানসভা নির্বাচনে এই দলের পরাজয় হয়।

অতঃপর সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন কে কেন্দ্র করে পুনরায় এই দলের উত্থান ঘটে। ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কোলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি বড় অংশ তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করে পরিবর্তনের ডাকদেন। এই শব্দবন্ধটি সেই থেকে গণমাধ্যমে বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। মমতা বন্দ্যোপধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০১১ র নির্বাচনে তৃণমূল ও বাংলা কংগ্রেসের জোট সরকার জয়ী হয়। ২০১৩তে তৃণমূল জাতীয় কংগ্রেসের জোট থেকে বেরিয়ে আসে। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এককভাবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসে। এইসময় পশ্চিমবঙ্গে অনেক উন্নয়নও সংঘটিত হয়। ২০১৬ নির্বাচনে এই দল ২১১টি আসন লাভ করে।

৮.২.৫.৫ : উপসংহার

এই ভাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ১৯৪৭ থেকে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। বিভিন্ন সময় যেমন অল্পস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল তেমনি অধিকাংশ সময়ে স্থায়ী সরকার গড়ার প্রবণতা থাকে। বর্তমানে দীর্ঘদিন স্থায়ী সরকারের দিকে প্রবণতা দেখা যায়। তেমনই একবার প্রত্যাখাত দল সচরাচর ক্ষমতায় ফিরতে পারেনা এবং রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

৮.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা কর।

২। বিধানচন্দ্র রায় কে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলা কতটা যুক্তিযুক্ত?

৩। নকশাল আন্দোলনের ব্যাপকতার বিবরণ দাও।

Block / পর্যায় - ৩

Economy

অর্থনীতি

একক ৬, ৭

বিন্যাসক্রম

৮.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

৮.৩.৬.১ : ভূমি সংস্কার

৮.৩.৬.২ : কৃষি

৮.৩.৭.৪ : শিল্পক্ষেত্র

৮.৩.৭.৫ : হলদিয়া শিল্পাঞ্চল

৮.৩.৭.৬ : পশ্চিমবঙ্গের কারুশিল্প

৮.৩.৭.৭ : উপসংহার

৮.৩.৭.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৩.৭.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৮.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির অগ্রগতির ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৮.৩.৬.১ : ভূমি সংস্কার

১৭৯৩ সালের ১নং প্রবিধান অনুসারে প্রণীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন অনুসারে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা সুসংহত লক্ষ্য স্থাপিত রাজস্ব পর্ষদ গঠন, যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ পরিপূরণের জন্য জমি সর্বাধিক রাজস্ব সংগ্রহ—তার মধ্যেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যুক্তিসঙ্গত কারণে রাজস্ব প্রশাসনের দিক থেকে কল্যাণমূলক প্রশাসনের দিকেই গুরুত্ব ঘুরে যায়। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এই বিভাগটি যা স্বাধীনতার পূর্বে ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ নামে

পরিচিত ছিল, তা উপযোগিতা ও সংস্কার এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব নামে পরিচিত হওয়ার পর শেষপর্যন্ত ভূমি ও ভূমি সংস্কার নাম গ্রহণ করে যার মধযরোজযরে অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতের ইতিহাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসা বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুরা একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৬-এ এই প্রবনতার সূচনা এবং দেশবিভাগের পর তা বাড়তে বাড়তে প্লাবনের আকার নেয়। ১৯৬৪-তে আবার একবার বাস্তুহারাদের ভীড় দেখাযায় এবং ১৯৭১-এ বিপুল পরিমানে শরণার্থী আসতে থাকেন। ১৯৭১-এর ভিতর হিসাবমতো প্রায় ৫৮ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে আসেন এই ১৯৭১-এর শরণার্থীরা যারা থেকে গিয়েছিলেন তাদের বাদ দিয়ে। ১৯৭৪-এর ভারতের পরিকল্পনা কমিশনে পছিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত প্রতিবাদের অনুযায়ী রাজ্যে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। আর আর কমিটির রিপোট অনুযায়ী ১৯৮১-তে এই সংখ্যা হয় ৮০ লক্ষ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর চাপ সামলানোর উদ্দেশ্যে জেলা ও মহকুমা উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরগুলি স্থাপিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব জেলা ও মহকুমা উদ্বাস্তু ক্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরগুলিকে সুসংহতভাবে গড়ে তোলা গিয়েছে।

ভূমি সংস্কার স্বাধীন ভারতের একটি ধারণা। স্বাধীন ভারতের যোজনা প্রণেতাগণ কোনও না কোনওভাবে টিকে থাকা জমিদারদের শোষণের জাঁতাকল থেকে কৃষকদের মুক্ত করার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। স্বাধীন ভারতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলির প্রয়োজন মেটানো, খদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং কৃষি উপকরণের সরবরাহ ছিল তখনকার জ্বলন্ত সমস্যা। শিল্পে কৃষির উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে না এবং ন্যায্যতার নীতি অনুসকরণ করে ভূমিহীনদের মধ্যেতা বণ্টন করে দেওয়া হবে-এটাই সামাজিক ন্যায়ের দাবি।

ভূমি সংস্কারের অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ প্রণয়ন করা হয়, যার দ্বারা জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর জোতের ঊধ্বসীমা, খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যেবণ্টন করা, অর্থনৈতিক জোত সৃষ্টি, খাজনা হ্রাস, প্রজা ও বর্গাদারদের উচ্ছেদ বন্ধকরা, প্রজাদের মালিকানা স্বত্ব প্রদান, ছদ্ম স্বথ্বভৌগী ও অন্যান্য নিয়মবহির্ভূত ব্যবস্থা বন্ধ করার মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়। এই ধরণের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সালে ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন করে।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার ভাগচাষীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা জন্য ভূমিব্যবস্থার কিছু সংস্কার করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৫৫ সালে বর্ধিত ভূমি সংস্কার আইন ও পরবর্তী সংশোধনগুলিতে দুটি প্রধান ধারার উল্লেখ ছিল।

১। জমির মালিককে আইন নির্ধারিত উৎপাদনের অংশ দিয়ে গেলে, জমি ফেলে না রাখলে বা জমি অন্য কাউকে ইজারা না দিলে, ভাগ চাষীরা জমিতে স্থায়ী ও উত্তরাধিকার যোগ্য ভোগ দখলের অধিকার পাবে। এছাড়াও অবশ্য জমি মালিক ব্যক্তিগত চাষের জন্য ওই জমি ব্যবহার করতে চাইলে ভাগচাষী সেই অধিকার হারাবে। এই অইধকার উত্তরাধিকারযোগ্য কিন্তু হস্তান্তরযোগ্য নয়।

২। জমির মালিক কোনো নথিভুক্ত ভাগচাষীর কাছ থেকে ২৫ শতাংশের বেশি উৎপাদন দ্রব্য দাবি করতে পারবে না। এক্ষেত্রে চাষের সম্পূর্ণ শ্রম ও উৎপাদনের খরচ ভাগচাষীকে বহন করতে হবে। যদি মালিক শ্রম ছাড়া অন্যান্য উপাদানের খরচ বহন করে তাহলে তার প্রাপ্য হবে ৫০ শাতংশ।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার আগে এই আইন ছিল কেবল মাত্র কাগজে-কলমে। ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার অপারেশন বর্গা নামে একটি কর্মসূচি শুরু করে। এই কর্মসূচি অনুসারে ১৯৫৫ সালের ভূমি সংস্কার আইনকে বাস্তবে প্রযোগ করা শুরু হয়। ভাগচাষীরা ভূমি রাজস্ব দপ্তরে নিজেরে নাম নথিভুক্ত করে এবং জমির মালিককে নিয়েমিত ভাবে উৎপাদনের ২৫ শতাংশ খাজনা হিসাবে দিয়ে ভাগে চাষ করা জমিতে প্রকৃতই স্থায়ী ও উত্তরাধিকারযোগ্য স্বত্ব অর্জন করে। এর ফলে যখন-তখন মালিকের মর্জি অনুযায়ী জমি থেকে উচ্ছেদ হবার ভয় থাকে না। উৎপাদন বৃদ্ধিতে তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কৃষি উৎপাদনে এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পরে। মৈত্রীশ ঘটক, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পল গার্টলার তাঁদের যৌথ গবেষণায় দেখাচ্ছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ধানচাষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্তত এক তৃতীয়াংশ অপারেশন বর্গার ফলে সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের নিরিখে অপারেশন বর্গার ভূমিকা কি? প্রথমত অপারেশন বর্গার ফলে নথিভুক্ত প্রায় সাড়ে চোদ্দ লক্ষ ভাগচাষী এই রাজ্যের সমগ্র কৃষিজমির মাত্র ৮ শতাংশ জমিতে চাষ করেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে অপারেশান বর্গার ফলে অনথিভুক্ত ভাগ চাষীদেরও দরকষাকষির ক্ষমতা এবং জমিতে স্থায়িত্ব বেড়েছে এবং এই অনথিভুক্তদের সংখ্যা নথিভুক্তদের প্রায় সমান, তাহলেও এই কর্মসূচীর (প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ) মোট প্রভাব ১৬শতাংশের বেশি জমিতে পড়েনি। বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা পত্র থেকেও জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ মোট জমির ২০% -এর বেশি নয়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ৮০% জমির ওপর অপারেশন বর্গার কোন প্রভাব পড়েনি। ওই জমি কর্ষিত হয় মূলত ক্ষেতমজুর ও বা ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক পরিবারগুলির পারিবারিক শ্রমে।

অপারেশন বর্গার ফলে পুরাতম ভূমি সম্পর্কের কোনো গুণগত পরিবর্তন হয় না। এই আইনে জমির মালিকের অধিকার পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। কোন শ্রম না করে, উৎপাদনের কোন খরচ বা ঝুঁকি বহন না করে জমি মালিক শুধু মালিক হবার সুবাদে উৎপাদনের ২৫ শতাংশ ভোগ করে। এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার থেকে পশ্চাৎপদ একটি ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জমি মালিককে সমগ্র উৎপাদনের তদারকি, উৎপাদন ব্যয় এবং ঝুঁকি বহন করতে হয়। কিন্তু বর্গাদারি ব্যবস্থায় জমি মালিককে প্রায় সামন্তবাদী কায়দায় উদ্বৃত্ত আত্মসাতের অধিকার দেওয়া হয়। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন পুনর্বিনিয়োগের কোন ইচ্ছা বা উৎপাদনের মানের উন্নয়ন ঘটাবার কোন দায় তার থাকে না। চিরকাল মালিক বর্গাদারের ঘাড়ের ওপর পরজীবীর মত চেপে থাকে। ইদানিং আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় বাজার চাষে ঝুঁকি ক্রমশই বাড়ছে। জমির মালিক যে ব্যবস্থায় ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায় তা ভাগচাষীর পক্ষে কখনোই মঙ্গলজনক নয়।

পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু জমি খাস হয়েছে এবং চাষীদের মধ্যে বিতরণ ও হয়েছে। এই খাসজমি দখলের অধিকাংশটাই হয়েছে ১৯৬৭ থেকে ৭২ সালের মধ্যে। সেই সময় সি পি আই (এম এল) সহ বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপ এবং সিপি আই (এম) এর আপেক্ষাকৃত বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে গ্রাম বাংলায় উত্তাল কৃষক আন্দোলনের ফলেই এটা সম্ভ হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের পর থেকেই ভূমি সংস্কার আইনে সীমাবহিভূত জমি খাস ঘোষণা করার হার করতে থাকে। আজ পর্যন্ত খাস জমির পরিমাণ সমগ্র কৃষিজমির ১০শতাংশ অতিক্রম করেনি এবং বণ্টিত খাস জমির পরিমাণ সমগ্র জমির ৬৫ শতাংশেরও কম (Sengupta and Gazdar 1997)। ১৯৭৭ সালের পর থেকে খাস জমি দখলের হার কমার কারণ হিসাবে অনেকে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে দখল করার মত দমির পরিমাণ খুবই কমে গেছে। এই প্রসঙ্গে দীপঙ্কর বসু তার EPW April 21-27, 2001 সংখ্যায় প্রকাশিত Political Economy

of Middleness Behind Violence in rural West Bengal প্রবন্ধে একটি চমৎকার হিসাব দেখিয়েছেন। তার বক্তব্য এখানে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হল ঃ

"NSSO থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে মোট পরিবারের সংখ্যা ছিল ৭,৩৭,৫০০। এর মধ্যে ১৩৬ শতাংশ ছিল ধনী কৃষক (অর্থাৎ যারা ১০ একর বা তার বেশি জমির মালিক) অর্থাৎ ধনী কৃষক পরিবারে সংখ্যা হল প্রায় ১০,০৩০। যদি এই ধরনের প্রত্যেক পরিবারের ১০ একর করে জমি থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে ধনীচাষীদের অধিকারে ছিল ১০,০৩,০০০ একর জমি।

প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে ১৯৮১ সালে রাজ্যের মোট জমির (যা প্রায় ১,০৩,০০,০০০ একর) ১৩৬৬ শতাংশই এই শ্রেণীর হাতে ছিল। অর্থাৎ এই শ্রেণীর অধীনে প্রায় ১৪,০৬, ৯৮০ একর জমি ছিল। যদি ১৯৮১ সালে পরিবার পিছু সর্বাধিক জমির সীমা কমিয়ে ১০ একর করা হত (যা বর্তমানো সেচ এলাকায় ১৭২৯ একর ও অসেচ এলাকায় ২৪১২ একর) তাহলে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ দাঁড়াত ৪,০৩,৯৮০ একর।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে সীমা বহির্ভূত জমির মালিক খুব বেশি নেই। কিন্তু গোটা ভারত জুড়েই ব্যক্তি বা পরিবারভিত্তিক জমির কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা বর্তমানে দেখা যাচ্ছেনা। কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদী অনপ্রবেশের ফলে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে কৃষিতে পুনবিনিয়োগ আর লাভজনক হচ্ছে না। জমির ব্যক্তি বা পরিবারভিত্তিক কেন্দ্রীভবন না হবার সেটা একটা বড় কারণ। কিন্তু মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিশেষত অন্তদেশীয় মাছ চাষে) সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ কৃষির তুলনায় খুবই কম। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে মাছ চাষে স্থানীয় জ্ঞানের সাথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এমন অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে যে অন্তত প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ হওয়াও মুশকিল। তাই মাছ চাষের ক্ষেত্রে একটা পুঁজিবাদী বিকাশ চোখে পড়ে। অনেক ধনী মাছ চাষীরই উদ্বৃত্ত উৎপাদন পুনর্বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের মানের অবিরাম উন্নতি ঘটাবার প্রবণতা লক্ষণীয়। মাছ চাষের ক্ষেত্রে এক ধরনের পুঁজি নির্ভর কেন্দ্রীভবন লক্ষ করা যায়। আইনি সীমা বহির্ভূত জলকরের মালিকের সংখ্যা খুব করে নয়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার মেছো ভেড়িগুলোই তার প্রমাণ। পঞ্চায়েত বা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির অধীন্সথ বিশাল বিশাল জলকরগুলি অধিকারশ ক্ষেত্রে ধনী মৎস্য চাষীরাই বেনামে ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করে। ভূমি সংস্করা আইন কিন্তু জমি ও জলকরের মধ্যে পার্থক্য করে না। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে, আইনি সীমা বহিভূর্ত মালিক যথেষ্টই আছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে পুঁজির জমি বা জলকর কেন্দ্রীভবনের ক্ষমতা থাকলে ভূমি সংস্কার আইন তাকে প্রতিহত করতে পারছেনা, এমনকী ভূমি বণ্টন আন্দোলনের পীঠস্থান বলে পরিচিত এই পশ্চিমবঙ্গেও না। বর্তমানে অনেকেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রভাবে জমির কেন্দ্রীভবনের আশঙ্কা করছেন। সেই আশঙ্কা বাস্তবায়িত হতে শুরু হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি সংস্কার আইনের সাহায্যে তা প্রতিহত করতে পারবে বা চাইবে বলে মনে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ভূমি কাঠামো সম্পর্কে অনিন্দ্য সেন 'অন্যস্বর' পত্রিকার এপ্রিল-মে, ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রামঞ্চলে ভূমি কাঠামো ও রাজনৈতিক বিন্যাস : একটি আন্তঃসম্পর্ক রচনার চেষ্টা শীর্ষক প্রবন্ধে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে যাচ্ছে যে, ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ০-০.৫ একর, ০.৫-১একর এবং ১-২ একর এই তিনটি স্তরের জোতের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। এর মধ্যেও ০-০.৫ একর পর্যন্ত অংশটির বৃদ্ধির হার সবেচেয়ে বেশি, প্রায় ১০.৮৮ শতাংশ। ০.৫-১ একর জোতের মালিক পরিবাবের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ২.৬৫ শতাংশ এবং ১-২ একর জোতের মালিক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ০.৯২ শতাংশ। অনিন্দ্য সেন তার প্রবন্ধে

এক জায়গায় বলেছেন এই ক্যাটেগরির কৃষকদের সাথে মধ্য কৃষকদের (মাও-এর সংজ্ঞা অনুসারে ঃ 'স্বনির্ভর কৃষক যারা মজুরি বিক্রি করনে না, নিয়োগও করেন না) কোন গুণগত পার্থক্য নেই। তাঁর লেখায় সে সমীক্ষার উল্লেখ আছে তার পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় হয়েছে তা বলা নেই (শুধুমাত্র একটি গ্রানের মাম উল্লেখ আছে নদীয়ার ধুবী নাগাদী, অন্যান্য গ্রামগুলি একই জেলায় না অন্য জেলায় তা জানা যাচ্ছে না), ওই অঞ্চলগুলিতে সেচ আছে না নেই, তারও উল্লেখ নেই। যদি সেচ থাকে তাহলে বছরে দুবার ফসল হবে ধরা যায়। তাহলে ০৫ একর জমিতে সর্বাধিক ৬০ মন বা ২৪০০ কেজি ধান হতে পারে। ওই ধান ফলাতে তার উৎপাদন খরচ হবে ৩০০০ টাকা। যদি তিনি ঋণ না করেও চাষ করেন তবে আগামী বছর চাষের খরচ তোলার জন্যে তাকে প্রায় ১৬ মন ধান করতে হবে (১৮০ টাকা মণ হিসাবে)। অর্থাৎ তার নিট লাভ হবে ৬০-১৬= ৪৪ মণ বা ১৭৬০ কেজি ধান, যা থেকে চাল হবে ১০৫৬ কেজি। যদি তার পরিবারের ৫জন সদস্য হয়, তবে দৈনির মাথাপিছু চালের পরিমাণ হবে ৫৭০ গ্রাম, যার ক্যালরি মূল্য ২২৮০।

একজন কর্মক্ষম মানুষের নূন্যতম শক্তি চাহিদা ২৪০০ ক্যালরি হলে বলা যায় যে, ০.৫ একর জোতের মালিক শুধু জমির আয় থেকে তার পরিবারের ন্যূনতম পুষ্টিটুকুও জোগাড় করতে পারবেন না, জীবনধারণের অন্য উপকরণ তো দূরের কথা। আর অসেচ এলকায় ০.৫ একর জোতের মালিকের অবস্তা সহজেই অনুমেয়। তাই এই জোতের মালিকেরা অন্যের জমিতে মজুরি খাটতে বা অন্য কোন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুধু অসেচ এলাকা নয়, সেচ এলাকাতেও বর্তমানে ২০ মন ধান হওয়া বিরল দৃষ্টান্ত, বিঘা প্রতি ১৫-১৭ মনের বেশি ধান এখন আর হয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে, কৃষক পরিবার ধান চাষ না করে অন্য ফসল চাষ করলে কী হবে? বিভিন্ন প্রকার চাষের লাভক্ষতির হিসাব দিয়ে প্রবন্ধকে ভারক্রান্ত না করেও বলা যায়যে, আলু চাষে চূড়ান্ত ফাটকাবাজি থাকার জন্যে ক্ষুদ্র কৃষকের লাভ এর থেকে বেশি হবে না, ডাল বা গম চাষ করলে লাভ কমবে। তাই ০-০.৫ একর জোতের মালিকদের সাথে মধ্য কৃষক নয় বরং ক্ষেত মজুরদেরই গুণগত কোন পার্থক্য নেই। এরাও মাও বর্ণিত আধা-সর্বহারা শ্রেণী।

অনিন্দ্য সেন তাঁর প্রবেন্ধর শেষের দিকে ক্ষুদ্র কৃষকদের আধা-সর্বহারা বলে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধে প্রথমে যখন ক্ষুদ্র কৃষকদের মূলত মধ্য কৃষক বলে বর্ণনা করে পশ্চিমবঙ্গে মধ্য কৃষকদের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল তখন ক্ষুদ্র কৃষক বলতে ০-২ একর জোতের মালিকদের বোঝানো হয়েছিল। যে অংশটির সত্যই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে (০-০.৫ একর) তারা যে অন্তত মধ্য কৃষক নয় তা ওপরের আলোচনা থেকে প্রমাণ করা যায়। তিনি কী ছোট চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক শব্দ দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে প্রবন্ধেও কোথাও তার ইঙ্গিত নেই। যদি না করে থাকেন, তাহলে একবার ০-২ একর জোতের মালিকদের ক্ষুদ্র কৃষক বলে, তাদের সাথে মধ্য কৃষকদের কোন গুণগত পার্থক্য নেই বলে, আবার অন্য জায়গায় ১-৩ একর জোতের মালিকদের ক্ষুদ্র কৃষক হিসাবে দেখিয়ে তাদেরপ ধ্রূপদী অর্থে আধা সর্বহারা বলা হল কেন তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যাই হোক, এক একর এবং তিন একরের মালিকেরা বোধ হয় একই শ্রেণীভুক্ত নয়। বলা যায় যে, ভাল ফলন পেলে ৩ একর জমির মালিক জমির আয় থেকে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়েও আরও কিছু জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের অবস্থায় থাকেন। এই ৩একর যদি সেচযুক্ত জমি হয় এবং জমি মালিকের যদি অন্য কোন আয়ে উৎস থাকে, তাহলে তার পক্ষে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করা ও অসম্ভব নয়।

দুই বা তিন একরের একটা জোত কেবলমাত্র পারিবারিক শ্রমেই চাষ করা যায়, মজুর নিয়োগের দরকার হয় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি ভাষায় প্রান্তিক (জমির পরিমাণ ২.৫ একরের কম) বা ছোট চাষীদের (২.৫-৫ একর জমির মালিক) একটা ভাল অংশ, চাষের জন্য জমিতে মজুর নিয়োগ করেন। এ থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় যে ওই প্রান্তিক ও ছোট চাষীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্য কৃষক নন, বরং ওদের প্রবণতা ধনী কৃষকের দিকে। নিশ্চিতভাবেই এদের জমি ছাড়াও চাকরি, ব্যবসা বা অন্য কোন সূত্র আয় আছে, না হলে মজুর লাগিয়ে ছোট জোত চাষ করা পোষাবে না। এরকম সিদ্ধান্ত করাও ভুল হবে না যে, এই বর্গের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের হাতে ভাল রকম উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হচ্ছে।

অর্থাৎ অনিন্দ্য সেন প্রদত্ত সমীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'স্টাডি অন ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট' ও 'কস্ট অফ প্রোডাকশন' পশ্চিমবাংলা, কৃষি বিভাগ, ১৯৯৬-৯৭ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শস্য চাষে নিয়োজিত মোট জন-দিনের ৭৩%-ই আসে মজুরের শ্রম থেকে। আর মাত্র ২৭% সে কৃষক পরিবারগুলির পারিবারিত শ্রম থেকে। এই তথ্যও সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধিকেই সমর্থন করে।

৮.৩.৬.২ : কৃষি

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। রাজ্যের প্রধান খাদ্যফসল হল ধান। অন্যান্য খাদ্যফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাল, তৈলবীজ, গম, তামাক, আখ ও আলু। এই অঞ্চলের প্রধান পণ্যফসল হল পাট। চা উৎপাদনও বাণিজ্যিকভাবে করা হয়ে থাকে, উত্তরবঙ্গ দার্জিলিং ও অন্যান্য উচ্চ মানের চায়ের জন্য বিখ্যাত। যদিও রাজ্যের মোট আভন্তরিণ উৎপাদনে প্রধান অবদানকারী হল চাকুরিক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র থেকে রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনের ৫১ শতাংশ আসে, অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে ২৭ শতাংশ ও শিল্পক্ষেত্র থেকে আসে ২২ শতাংশ। নিট কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ৫২.০৫ লক্ষ হেক্টর। এই পরিমাণটি মোট ভৌগলিক এলাকার ৬৮% এবং কর্ষণযোদ্য জমির ৯২%। এছাড়া কৃষি নিবিড়তার পরিমাণ ৯৮.৪%। অবশম যেহেতু এই রাজ্য আদ্র-ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী তাই মাঝে মাঝেই বন্য, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। যদিও এই রাজ্য চাল, সব্জী ও আলুর উৎপাদন উদ্বৃত্ত হয়, ডাল, তৈলবীজ ওভুট্টার উৎপাদনের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানে বিপুল পার্থক্য আছে। কৃষির উন্নয়নে প্রধান বাধাগুলি হল রাসায়নিক সার ব্যবহারে ভারসাম্যের অভাবের দরুন ভূমিস্বাস্থ্যের অবনমন, প্রয়োজনীয় উন্নত মানের বীজ পাবার অসুবিধা, জোত যন্ত্রায়ণের অপ্রতুলতা, অসংগঠিত বাজার ইত্যাদি। স্বাধীনতার বেশ কয়ে বছর পরেও খাদ্যের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ (ভারতীয় বঙ্গ) কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী ছিল। ভারতের সবুজ বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পারায় এই রাজ্যের খাদ্য উৎপাদন অপর্য্যাপ্তই রয়ে যায়। তবে ১৯৮০ এর দশক থেকে রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতের সামগ্রিক শিল্প উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল ৯.৮ শতাংশ, ১৯৯৭-৯৮ সালে এই অংশ কমে দাঁড়ায় ৫ শতাংশ। তবে চাকুরিক্ষেত্র জাতীয় হারের তুলনায় অধিক হারে প্রসারিত হয়েছে এই রাজ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষি ফসলগুলি হল ধান (চাল), আলু, পাট, গম, চা, আখ প্রভৃতি। ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ চাল উৎপাদনে ভারত এর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মোট চাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫ মিলিয়ন টন। ভারতে আলু উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, ২০১৪ সালে ৮.৯মিলিয়ন টন আলু উৎপাদন করে রাজ্যটি। এছাড়া, পাট উৎপাদনে প্রথম ও চা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজ্যটি। দেশের মোট পাট উৎপাদনের ৬৭ শতাংশ হয় এই রাজ্যে। রাজ্যটির গম, তৈলবীজ, আখ প্রভৃতি ফসল উৎপাদন দেশের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই রাজ্যে উৎপাদিত দার্জিলিং চা জগৎ বিখ্যাত।

■ কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী :

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাগুলিকে মেনে নিয়েও বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের ক্ষেত্রে কৃষি এখনো এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা এবং জীবনযাপনের মাধ্যম। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, ''২০২০ সালের মধ্যেদক্ষতা, কৃৎকৌশল, বাজার ও অর্থনৈতিক অন্তভুক্তি নিশ্চিত করে কৃষকদের আয়ের দ্বিগুণ বৃদ্ধি এই সামগ্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্য XII এফ ওয়াই পি-রাজ্য কৃষি পরিকল্পনায় নিচের লক্ষ্যগুলিকে অন্তভুক্ত করা হয়েছে।

১। উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতায় পরিমাপযোগ্য উন্নয়নকে নিশ্চিত করা।

২। সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ্রে মাধ্যমে উৎপাদনের পার্থক্য হ্রাস করা।

৩। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কৃষিজীবীদের আয় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে নিয়ে যাওয়া।

৪। বিপণনে হস্তক্ষেপ ও রপ্তানি বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলির বর্ধিতকরণ।

৫। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের বৃদ্ধি এবং

৬। আবহাওয়া পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলির মোকাবিলা করা এবং খরা ও বন্যা ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

■ সম্মুখগতি :

উপরের লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণের জন্য কৃষি বিভাগ কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে যেমন, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য, কৃষি বিপন্ন, উদ্যনপালন, সমবায়, জলসম্পদ অনুসন্ধান, সেচ ও জলপথ, বন, রেশমশিল্প, খদ্য ও সরবরাহ এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীন ডব্লিউ বি সি এ ডি সি-র সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে। সাম্প্রতিক কালে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তাঁরা আরও বেশি প্রক্তিফল পান সেই উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যেমন উন্নততর অনুশীলন, উন্নতমানের কাঁচামাল, বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন, কৃষি যন্ত্রায়ণে প্রথম পর্যায়ে ভরতুকি প্রদান, জল সংরক্ষণ ও জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিপন্নজ্ঞানের প্রয়োগ, এছাড়া তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির কৃষকদের উন্নতি, কৃষিক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন, এফ পি ও এবং এড় জিও-গুলির সাহায্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আনয়ণ ইত্যাদি। এই বিভাগ আই সি টি ভিত্তিক কৃষি সংক্রান্ত পোর্টাল নিয়ে এসেছে, এই পোটাল কৃষকদের তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি গতিশীল ভূমিকা পালন করে।

■ কৃষি বিপনন :

কৃষিখামারের উৎপন্ন দ্রব্য ও উপকরণ বিপন্ন বয্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নীতিও আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত কাঠামো এবং শক্তিশালী সরকারি সহায়তামূলক পরিষেবা। বাজার পরিকাঠামো, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং কৃষকদের বিপণণ বিষয়ে পরামর্শদানে সক্ষম কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবাকে এই ধরনের সরকারি পরিষেবার অন্তভুক্ত করা যেতে পারে। কৃষিজ উৎপন্নের সহায়কমূল্য ও উৎপাদনশীলতা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কভুক্ত। সর্বস্তরে বিপণনের প্রশিক্ষণ এখন যুগের দাবি। কৃষক গোষ্ঠী থেকে শুরু করে কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের বিপননকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নবীন শিক্ষার্থী সকলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। বিগত শতকের সাতের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে মূলতঃ ভূমি সংস্কার, কৃষি প্রকৌশলের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন, নিবিড় গবেষণা ও সরকারি সংস্থাগুলোর সদর্থক অংশগ্রহণের কারণে। কৃষি বিপণণ হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া যার শুরু বিক্রয়যোগ্য কৃষিখামারের উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। প্রযুক্তি ও অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কার্যগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় দিকেরই বাজার কাঠামোর সকল দিক এর মধ্যেযুক্ত। কৃষি বিপণণ রাজ্যের বিষয় হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বারা উৎপান্ন কৃষিজ পণ্যের বিপণণ কৌশল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দম ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেটিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৭২ প্রণয়ন করে। কৃষিজ উৎপন্নের বিপনন বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষি বিপণণ বিভাগ তৈরি করে যা এই সমস্ত সকল বিষয় নিয়ে বিশেষ ভাবে কাজ করে। কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় বাজার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে উক্ত আইন রূপায়নের জন্য মুখ্যত দায়ী হচ্ছে এই আইনের অধীনে গঠিত বিধিবদ্ধ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপণণ পর্ষদ এবং কৃষি বিপণণ অধিকার।

৮.৩.৬.৪ : শিল্পক্ষেত্র

কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং পূর্ব ভারতের অর্থনীতির কেন্দ্রস্থল। এখানে পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। রাজ্যের শিল্পকেন্দ্রগুলি কলকাতা ও পশ্চিমের খনিজসমৃদ্ধ উচ্চভূমি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। দুর্গাপুর-আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ইস্পাতকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, ইলেকট্রিনিকস, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কেবল, ইস্পাত, চামড়া, বস্ত্র, অলংকার, যুদ্ধজাহাজ, অটোমোবাইল, রেলওয়ে কোচ ও ওয়াগন প্রভৃতি নির্মাণশিল্প রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বন্দর শহর হলদিয়া ও পশ্চিমের খনিজ দ্রব্য পরিপূর্ণ অঞ্চলে আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গে চা শিল্প ও পর্যটন শিল্প খুবই উন্নত। শিলিগুড়ি এই অঞ্চলের প্রধান শঙর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। একটি অগ্রণী প্রবণতা স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গের তথ্যপ্রযুক্তি (আই.টি) ক্ষেত্র এক নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে এবং এটি রাজ্যের অর্থনীতির প্রসারে বেশ ভালো কাজ করছে। সুসজ্জিত ভাল প্রশিক্ষিত জনশক্তি, সহ, তথ্যপ্রযুক্তি বা আই.টি শিল্প ভারতের বাণিজ্যিক রেখান্যাসের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দাবী করে। তথ্যপ্রযুক্তি বা আই.টি-র কেন্দ্রস্থল গঠনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স রাজ্যে জনপ্রিয়ভাবে পরিচিত। এটি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থার অবিশ্বাস্য অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি (আই.টি) ব্র্যাণ্ডের কিছু বৃহত্তম

নামের মধ্যে রয়েছে, উইপ্রো, টি.সি.এস, আই.বি.এম এবং এন.আই.আই.টি, কলকাতায় অবস্থিত এই তথ্য প্রযুক্তি (আই.টি)—ভবনগুলি রাজ্যের জন্য এক গৌরবময় স্থান। পশ্চিমবঙ্গের এই তথ্য প্রযুক্তি (আই.টি) শিল্পগুলিতে অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ শুধুমাত্র ভারতীয় সংস্থাগুলিকেই নয় বরঞ্চ বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও উচ্চ-মাত্রায় কর্মী সরবরাহের শ্রেষ্ঠ সমাধান দেয়। তথ্য প্রযুক্তির সক্রিয় সেবা বা আই.টি-র ক্ষেত্র আই.টি-র একটি সম্প্রসারণ এবং যথাযোগ্যভাবে তার মৌলিক নিয়ামকের সুযোগ বর্ধন করে।

৮.৩.৬.৫ : হলদিয়া শিল্পাঞ্চল

হলদিয়া শিল্পাঞ্চল হল ভারতের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় গড়ে ওঠা একটি শিল্পাঞ্চল। এই শিল্পাঞ্চলটি হলদিয়া বন্দর কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই শিল্পাঞ্চলটির প্রধান শিল্প হল পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প। হলদিয়া মহকুমার ৩৫০ বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকা নিয়ে শিল্পাঞ্চলটি গড়ে উঠেছে। এই শিল্পাঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধুনীক শিল্পাঞ্চল।

অবস্থান

হলদিয়া শিল্পাঞ্চল তিন দিক দিয়ে নদী বেষ্ঠিত। উত্তর দিকে রূপনারায়ণ নদ ও হুগলি নদী, পূর্ব দিকে হুগলি নদী এবং দক্ষিণ দিকে হলদি নদী। শিল্পাঞ্চলটি থেকে বঙ্গোপসাগর ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে শিল্পাঞ্চলটি ১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত।

পরিকাঠামো

হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে রয়েছে উন্নত শিল্প পরিকাঠামো। এখানে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনিয় বিদ্যুৎ-এর যোগান পাওয়া যায়। এখাড়ার হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে বাসুদেবপুরে একটি ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। হলদিয়ার ঝিকুরখালি গ্রামে ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার হলদিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সিইএসই এর অধিনস্থ সংস্থা হলদিয়া এনার্জি লিমিটেড-এর দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২০১৪ সালে চালু হয়েছে।

শিল্পাঞ্চলটি ৪১নং জাতীয় সড়ক (বর্তমানে জাতীয় সড়ক ১১৬) দ্বারা ৬নং জাতীয় সড়ক (বর্তমানে জাতীয় সড়ক ১৬) বা কলকাতা-মুম্বাই রোডের সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব রেল-এর পাশকুড়া-হলদিয়া রেলপথ দ্বারা শিল্পাঞ্চলটি সমগ্র ভারতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। জাতীয় জলপথ ১ (হুগলি নদী ও গঙ্গা নদী) দ্বারা শিল্পাঞ্চলটি কলকাতার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এখানে একটি বড় সমুদ্র বন্দর রয়েছে যা হলদিয়া বন্দর নামে পরিচিত। প্রায় ৯মিটার গভীরতার (৮মিটার থেকে ৮.৫ মিটার) বন্দরটি এই শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যোগাযোগের মাধ্যমে।

বিভিন্ন সংস্থা

১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রয়ত্ত ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন-এর অধীনে প্রায় ৪৫৬ একর জমির ওপর হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে একটি খনিজ তেলশোধনাগার স্থাপিত হয়। এই শোধনাগারের শোধিত তেল ছাড়াও রান্নার গ্যাস, মোটর স্পিরিট, ন্যাপথা, কেরোসিন, লুব্রিকিটিং তেল, বিটুমেন বা আলকাতরা প্রভৃতি উপজাত দ্রব্যও উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শোধনাগারের পাশেই ৮০ একর জমিতে ৩৩০০ কোটি টাকা লগ্নি করে আরও একটি কারখান গড়ছে আইওসি। সেখানে শোধনাগারের বর্জ্য ফার্নেস অয়েল এবং বিটুমিন থেকে তৈরি হবে কোক, ডিজেল ও কেরোসিন তেল।

.....

আমদানিকৃত ফসফেট ও হলদিয়া তেলশোধনাগার থেকে প্রাপ্ত ন্যাপথার ওপর নির্ভর করে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে রাষ্ট্রয়ত্ত হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন -এর অধীনে একটি রাসায়নিক সার উৎপাদন কারখানা গড়ে উঠেছে। এই কার খানা থেকে উন্নতমানের রাসায়নিক সার উৎপাদন করা হয়।

.....

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চ্যাটার্জি শিল্প গোষ্ঠী এবং ইণ্ডিয়াল ওয়েল কর্পোরেশনের প্রচেষ্টা ও আর্থিক আনুকূল্যে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে একটি আধুনিক পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প গড়ে উঠেছে। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হয় ৫,১৭০ কোটি (USS ৭১৯.৩৮ মিলিয়ন) টাকা। ২০০০ সালের ২ এপ্রিল পেট্রোকেমিক্যাল কেন্দ্রটি উৎপাদন শুরু করে। এখানে ন্যালথা থেকে ইথিলিন, প্রোপিলিন, পলিইথিলিন, পলিপ্রোপিলিন, বেঞ্জিন, বিউটানিন প্রভৃতি রাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদিত হয়।

মিৎসুবিশি কেমিক্যাল কর্পোরেশনের অধীনে এখানে পলিয়েস্টার তন্তু, টেরেফথালিন অ্যাসিড উৎপাদিত হয়। দ্যা সাউৎ এশিয়ান পেট্রোকেম লিমিটেডের অধীনে বটল গ্রেড পেট রেসিন প্লানট গড়ে উঠেছে।

.....

শওয়ালেস সংস্থার অধীনে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে একটি কীটনাশক তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এখানে চার ধরনের কীটনাশক তৈরি হয়।

.....

হিন্দুস্থান লিঠার নামে একটি সংস্থার অধীনে এখানে একটি সবান উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

.....

১৯৭৯ সালে হিন্দুস্থান লিভার-এর উদ্যোগে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে ২০০ একর জমির উপর ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিটার্জেণ্ট উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল ইণ্ড্রাস্টিয়াল ফসফেট তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানা থকে বর্তমানে পূর্ব ভারতের ফসফেটের যোগানের বেশির ভাগ অংশ উৎপাদিত হয়।

.....

ক্লোরাইড (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের একটি ব্যাটারি তৈরির কারখানা হলদিয়া শিল্পঞ্চলে রয়েছে।

.....

পেট্রো-কার্বন সংস্থার অধীনে এখানে একটি কার্বন-ব্ল্যাক তৈরির কারখানা রয়েছে।

.....

হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাস্টিক, বেকারি প্রভৃতি শিল্প কেন্দ্র ও কারখানা গড়ে উঠেছে। wikipedia.

৮.১.৭.২ : পশ্চিমবঙ্গের কারুশিল্প

পশ্চিমবাংলাই সবসময় দেশের সংস্কৃতির বাহিনীকে চালনা করছে। তা সে সঙ্গীত, শিল্পকলা বা কারুশিল্প যাই হোক—হস্ত নির্মিতবস্তু এবং হস্তশিল্পেও এই রাজ্যের এক দৃষ্টান্তমূলক দক্ষতা আছে। বাংলার বিভিন্ন শিল্পী ও কারিগরেরা বহুদিন ধরেই তাদের অত্যাশ্চর্য ও বর্ণময় হস্তশিল্প দেশ ও বিদেশে সরবরাহ করে। বাংলার কারুশিল্পকে অনেক ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, তাদের মধ্যে কয়েকটি হল—

● *চর্ম শিল্প, বাঁশ ও বেত, কাঁসা এবং পিতল, মাটির পুতুল, চীনামটি, পাটজাত পণ্য, চন্দন কাঠ খোদাই, তাঁত, মৃৎশিল্প, শাঁখের ভাস্কর্য, অস্থি খোদিত ভাস্কর্য, পাথর খোদিত ভাস্কর্য, কাঠের কাজ, ডোকরা ধাতু শিল্প, শিল্প পর্দা প্রভৃতি।

প্রতিটি সুক্ষ কাজের নিজস্ব একটি স্বতন্ত্রতা আছে। বাংলার তাঁতিরা বিভিন্ন ধরনের শিল্প কাজে দক্ষ। জামদানি, কাঁথা এবং বিভিন্ন ধরনের তাঁত পণ্য বাংলার সমৃদ্ধ বয়ন শিল্পকে অনেকটাই ধরে রেখেছে। এই রাজ্য কিছু অসামান্য ধাতু ও পাথরের কারুশিল্পের সঙ্গেও আর্শীবাদ প্রাপ্ত। ধাতু ও পাথরের ভাস্কর্য, প্রদর্শনী দ্রব্য, গহনা ইত্যাদি এরই অন্তভুক্ত। ডোকরা ধাতু কাজ হল হস্তশিল্পের এক অতি দুর্লভ রূপ, যা বাংলা ও পূর্ব ভারতের কিছু অন্যান্য জায়গায় পাওয়া যায়। বাংলার কারিগররা বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য কর্মে দক্ষ যেমন পাথর, অস্থি, কাট জাত পণ্য এবং শাঁখের ভাস্কর্য।

■ মৃৎশিল্প :

ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য পশ্চিম বঙ্গ হস্তশিল্পের জন্য সুপরিচিত, এরই মধ্যে মৃৎ শিল্প হল অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গে, মৃৎশিল্পের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে। সাধারণত গ্রামের নারী সম্প্রদায় এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। কখনো কখনো পুরুষরাও মৃৎশিল্প তৈরীতে নিজেদের যুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গে মৃৎশিল্পের বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখা যায়। সেগুলি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি এবং বিভিন্ন মাপ ও আকারে পাওয়া যায়। মৃৎশিল্প এক অন্যতম স্থানীয় হস্তশিল্প যা আদ্যিকাল থেকে রাজ্যে প্রচলিত আছে। এছাড়াও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মৃন্ময় পাত্রাদি ব্যবহার করা হয়।

মঙ্গল ঘট হল মাটির ঘট যা সাধারণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের কুম্ভকারদের দ্বারা আঁকা ও রং করা হয়। যেগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু গৃহের একটি অপরিহার্য বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই মৃণ্ময় পাত্রাদি বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালির শুভকর্মে ব্যবহৃত হয় যেমন-বিবাহ অনুষ্ঠান, জন্মানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন মঙ্গলজনক ধর্মানুষ্ঠান।

লক্ষী ঘট বা ফুলদানি সাধারণত মঙ্গলজনক কর্মে জোড়ায় আনা হয়। এই জোড়া ঘটের একটি লক্ষী বা ধনের দেবী এবং অন্য একটি প্রভু গণেশের জন্য বলে মানা হয়। লক্ষী ঘট এছাড়াও লক্ষী হিসাবে পরিচিত সম্পদ দেবীর পূজায় ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের ঘটকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অন্যান্য মৃন্ময় পাত্রাদির মধ্যে সবথেকে মঙ্গলজনক হিসেবে গণ্য করা হয়।

মনসা ঘট বিভিন্ন আকারের পাওয়া যায়। এই মাটির পাত্রাদি সর্প দেবীকে সম্মান দেওয়ার জন্যে আঁতা হয়। এই অঙ্কন প্রধানত ঊর্ধ্বেখিত মৃন্ময় ঘটের উপর করা হয়। দেবীর মুখচিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি, সর্প ফণার চিত্রও এই ঘটের উপর আঁকা হয়।

তুলসী মঞ্চ মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় এবং কোথাও কোথাও ইট দ্বারা নির্মাণ করা হয়। এই মৃণ্ময় মঞ্চে বিভিন্ন দেব দেবীদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে হয় বিশেষত রাধাকৃষ্ণ। তুলসী মঞ্চ ভূমি থেকে প্রায় তিন চার ফুট উত্থাপিত করে একটি স্তম্ভ আকারে নির্মাণ করা হয়। সাধারণত এই স্তম্ভের ব্যাস প্রায় দেড় থেকে দুই ফুট হয়। এই চৌহদ্দির সব পক্ষ বাঁকা হয়। তুলসী মঞ্চের আকৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে, আয়তক্ষেত্রাকার, অষ্টকোণী বা ষড়ভূজাকার। তুলসী মঞ্চের প্রতিটি দিকে বিভিন্ন দেব দেবীদের প্রতিকৃতি অঙ্কণ করা হয় বিশেষত রাধাকৃষ্ণ।

তুলী মঞ্চ মাটিতে স্থাপন করা হয় এবং ধীরে ধীরে এর ভিতটি প্রশস্ত করা হয়। ইট দিয়ে সজ্জিত করার পর মাটি দিয়ে এর কাঠামোটি তৈরি করা হয়। তারপর একটি তুলসী বা বেসিল চারা রোপণ করা হয়। হিন্দুদের কাছে তুলসী গাছ খুবই পবিত্র এবং বিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়। পরিবারের কল্যাণ কামনা করে তুলসী গাছ প্রতিটি হিন্দু গৃহে মহিলাদের দ্বারা পূজিত হয়।

■ শিল্পকলা :

শিল্পকলা পশ্চিমবঙ্গের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ও প্রত্যেক গৃহের একটি অভিন্ন অংশ। রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা নাচ, গান, হস্তশিল্প এবং চিত্রকলা মিশে আছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সমৃদ্ধকরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এর অবদান অতুলনীয়। তিনি শতাব্দী জুড়ে নতুন উচ্চাকাঙ্খী সঙ্গীতজ্ঞ এবং নর্তক-নর্তকীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আশছেন।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক নতুন ধারার কণ্ঠসংগীত সৃষ্টি করেন, যা তাঁর নামনুসারে 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' নামে পরিচিত। এগুলি তাঁরই লিখিত এবং রচিত। প্রকৃতপক্ষে, এই গানগুলি বাংলা ভাষায় লেখা, যেগুলির পরে বহু অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তৈরি এক বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ধরণের শিল্পকলা শেখানো হয়, যা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি অর্জন করেছে এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নামে তা পরিচিত। ব্যালে নৃত্য শৈলী, উদয় শঙ্কর ও তার স্ত্রী অমলা শঙ্কর দ্বারা ভারতে প্রচলিত হয়েছে। রাজধানী শহর কলকাতায় তারা বহু নৃত্য শিল্পীদের এই শৈলীর প্রশিক্ষণ দেন এবং তাদের দল নিয়ে বিশ্ব জুড়ে নৃত্য শৈলী প্রদর্শন করেন।

চারুকলা ক্ষেত্রে, বাংলার শিল্পীরা তাদের অসাধারণ কাজের জন্য বিখ্যাত। এই বিখ্যাত শিল্পীরা ভারতীয় চারু ও কারু কলাকে একটি নতুন পথ প্রদর্শন করেছেন, উদাহরণ স্বরূপ— গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বোস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনি রায়, রামকিঙ্কর বেজ। বাংলা লোকগীতিতে বাউল ঐতিহ্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। বহুসংখ্যক অন্যান্য ধরনের লোকসঙ্গীত যেমন গম্ভীরা এবং ভাওয়াইয়ও প্রচলিত। শিল্প কলার অন্য এক রূপ নৃত্য, বাংলা সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শাস্ত্রীয় নৃত্য যেমন— ভারতনট্যম, মণিপুরী, কত্থক এবং লোক শৈলী যেমন—ছৌ নাচ শিল্পীদের দ্বারা শেখান হয়। ছৌ-লোকনৃত্য পুরুষ নর্তক দ্বারা মুখোশ পরে প্রদর্শন করা হয়।

■ তাঁত :

হস্তচালিত পণ্যের মধ্যে তাঁত হল এক অন্যতম রূপ, যা পশ্চিমবঙ্গ আমাদের উপহার দিয়েছে। বাংলার শিল্প ও নৈপুণ্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে সুসংগত রেখে, বাংলার তাঁত এবং তাঁতের শাড়ি ফ্যাশন ডিজাইনার, শৈলী প্রেমী, এবং ব্যবহারকারীদের কাছে অতি প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলায় তাঁর শাড়ি ভূষিত জননীসুলভ চিত্র প্রত্যেক গৃহেই এক খুবই সাধাররণ এবং প্রীতিজনক দৃশ্য। একটি ঐতিহ্যগত বাঙ্গালী মহিলার সবচেয়ে সম্ভাব্য চিত্রের বৈশিষ্ট্যটি হল লাল সাদা তাঁতের শাড়ির সঙ্গে লাল আঁচল। এই চমৎকার শাড়িটি বাঙ্গালীদের পূজায় এবং অন্যান্য উৎসবে অতি আবশ্যক। এটি খুব সহজেই উপলব্ধ করা যায় যে, তাঁর বাংলা ও সংলগ্ন এলাকায় অতি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

মসলিনের মত কড়কড়ে ও পালকের ন্যায় ওজনের জন্য তাঁর খুবই জনপ্রিয়। তাঁত শাড়ি সত্যিই আরামদায়ক ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আদর্শ। শাড়ির পুরো গা জুড়ে থাকে চওড়া এবং রেশমী সুতোর কাজ, সর্বোত্তম বাঙ্গালী নকশার এক চমৎকার উদাহরণ। এছাড়াও রঙিম তাঁত বস্ত্র সালোয়ার কামিজ, পাঞ্জবি এবং জামা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তাঁতের শাড়ির আঁচল অথবা পল্লুটি সম্পূরক সুতোর কাজ দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়, যা এই পরিধানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। আধুনিক মহিলাদের কাছেও তাঁত পোশাক খুব জনপ্রিয়, বিশেষ চাকুরীরতা মহিলা, যারা এটিকে দৈনন্দিন ব্যবহার ও অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারেন, একই প্রাণবন্ততার সঙ্গে।

■ অস্থি খোদিত ভাস্কর্য :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অদ্ভুত কারুশিল্পগুলির মধ্যে অস্থি খোদাই ভাস্কর্য বহু বছর ধরে প্রচলিত। ভারতের এই পূর্ব রাষ্ট্র সর্বদা ভারতের সাংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে রয়েছে এবং হস্তনির্মিত সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী পণ্য এরই একটি অংশ।

পশ্চিমবঙ্গ গজদন্ত খোদাই ভাস্কর্যে বিশেষজ্ঞ এবং কারুশিল্পী গজদন্ত খোদাই করে সূক্ষ শিল্পপণ্য তৈরি করে। গজদন্তের সাদা প্রতিভালিপ্ত হস্তনির্মিত পণ্যশিল্পের নিজস্ব একটি আভিজাত্য রয়েছে, যা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। গজদন্তের প্যানেল নির্মিত বিছানা, আলমারি, সাজসজ্জা করার টেবিল , কেদারা, সিংহাসন, পালকি ও অন্যান্য অনুরূপ পণ্য রাজা ও রানীদের কাছে খুবই ইপ্সিত ছিল। বাংলার কারিগর দ্বারা তৈরি গজদন্ত্রে টেবিল বা পাত্র এই পরিবার গুলিতে খুবই প্রচলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা এই বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের খাগড়া এবং জয়গঞ্জ সুরুচিপূর্ণ অস্থি খোদাই ভাস্কর্যের জন্যে এই জেলার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

পশ্চিমবঙ্গে গজদন্ত খোদাই ভাস্কর্যে হিন্দু ও ইসলামী উভয় নকশাই করা থাকে, যা সব ধর্ম নির্বিশেষে সমাজ ভাবে পছন্দের। হিন্দু দেবদেবীর নকশা শিল্পকলায় খুবই সাধারম। গজদন্ত নির্মিত মূর্তিগুলি তার সহজাত

বহুমুখিতার জন্য আশ্চর্যকর। গজ ও অশ্বের নকশা টানা গজদন্ত নির্মিত পণ্য ও গহনা বাক্স খুবই জনপ্রিয় পণ্য। এই অলংকার বাক্স, বিশেষত রাজকীয় মহিলাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

এছাড়াও পশু শৃঙ্গ দ্বারা নির্মিত চিরুনির জন্য সুপরিচিত। এটি গ্রামের লোকেরা খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এই পশু শৃঙ্গ নির্মিত চিরুনি মাথা ও চুলের জন্য উপকারী। কালো ও ধূসর রঙের চকচকে এই চিরুণিগুলির এক নিজস্বতা আছে।

■ পাথর খোদিত ভাস্কর্য :

পাথর খোদিত ভাস্কর্য পশ্চিমবঙ্গে একসময় খুবই প্রচলিত ছিল। ক্রমাগত বাজারে অন্যান্য শিল্প আসার সাথে সাথে এই ভাস্কর্য অনেকটাই বিলুপ্তির পথে এসে গেছে। কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভাবান কারিগররা এই সুন্দর নৈপুণ্য পণ্য নির্মাণে অব্যাহত আছে, এবং তার এক নিজস্ব সৌন্দর্যশীলতা প্রদর্শন করে। এই ভাস্কর্য শিল্পীদের কোন প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেই। তারা পূর্বপুরুষদের থেকে এই বুনিয়াদি শিক্ষা অর্জন করেছে এবং তাদের নিজস্ব জ্ঞান মিশ্রিত করেছে। শেষ পর্যন্ত, এটি সৌন্দর্যায়িত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পাথর খোদাই ভাস্কর্য শিল্পীরা বিশেষত পাথরের পাত্র নির্মাণের সাথে নিযুক্ত। হস্তচলিত খোদাই বিভিন্ন আকার ও আকৃতির পাত্র নির্মাণ করতে ব্যবহৃত হয়। খোদাই করার উদ্দেশ্য ফাইলাইট পাথর ব্যবহৃত হয়, একটি অর্ধ-নরম ধূসর রঙের পাথর যা দিয়ে সহজেই খোদই করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় শিমূলপুর এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাথরের বাসনপত্র যতন্ন সহকারে ব্যবহার করা প্রয়োজন, এই জন্যই বহু অন্যান্য উপকরণ সাধারণ মানুষদের কাছে বেশি প্রচলিত।

বর্ধমান, পাটুন ও দাঁইহাট-এর ভাস্কর অথবা সুত্রধররা তাদের সুক্ষ পাথর খোদাই কাজের জন্য বিখ্যাত। তাদের খোদাই করার বিষয় হল মূর্তি এবং মন্দির ও গৃহের দেয়ালে খোদাই করা ক্ষুদ্র মানব মূর্তি। দণ্ডায়মান ভাস্কর্য তাদের কর্মক্ষেত্রের এক অবিশ্বাস্য উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরগুলিতে লাল ইট পাথরের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। এই মন্দিরগুলিকে আরও অলঙ্কৃত করার জন্য পাথর কেটে নকশা করা হয়। বিভিন্ন নকশা যেমন—হাতি, অশ্ব এবং দেবদেবী বঙ্গের মন্দিরগুলির এক প্রচলিত পাথর খোদিত ভাস্কর্য।

■ কাঁথা :

বাংলার মহিলাদের দ্বারা বাহিত কাঁথা শিল্প বাংলার এক অসাধারণ সূচিকর্ম শিল্প। এই ধরনের গ্রামীণ সূচিকর্ম ব্যাপক ভাবে রাজ্যে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালী পরিবারের মা ও বোনেরা কাঁথা শিল্পকে বিভিন্ন রূপে গ্রহণ করেছেন, হয় গৃহস্থালী বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য। কাঁথা শিল্প সমাজের আয়না রূপে কাজ করে, যায় মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। তারা এই অপূর্ব রূপের হস্তচালিত শিল্পের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন এবং ইচ্ছাতে চিত্রাঙ্কন করে।

কাঁথা একটি সহজে চলমান সেলাই উপর ভিত্তি করে করা হয় কিন্তু এটি সেরা শিল্প কর্মের কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঁথার সরলতা এর অপরিমেয় জনপ্রিয়তার কারণ। কাঁথার উৎপত্তি কোঁথা-র সাথে সম্পর্কিত, সংস্কৃতে যার অর্থ ছিন্ন বস্ত্র। এটি বলা হয় যে বুদ্ধ দেবের শিষ্যরা ঠাণ্ডা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে একসাথে দুটি বস্ত্র সেলাই করতেন যাতে এটি মোটা ও উষ্ণ হয়। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাঁথা একটি নারীর আত্ম অভিব্যক্তি তুল্য।

শেষ পণ্যের উপর ভিত্তি করে কাঁথার বিভিন্ন নমুনাগুলি হল—

- অচিলতা কাঁথা— ছোট, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়নার পর্দা রূপে ব্যবহৃত হয়।
- দুরজানি বা থালিয়া—বেশিরভাগই মানিব্যাগ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
- বাঁইতো কাঁথা—বইয়ের এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার হয়।
- সুজানি কাঁথা—এক আলংকারিক কাঁথা, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর থেকে কম্বল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- ওয়ার কাঁথা—যা আলংকারিক বালিশের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- রুমাল কাঁথা—যা রুমাল ও পাত্রের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কাঁথা যে ভাবেই ব্যবহার হোক না কেন, এটি বাংলার মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

■ দেওয়ালে ঝুলন্ত সামগ্রী (ওয়াল হ্যাঙ্গিং) :

পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ওয়াল হ্যালিং, রাজ্যের কারিগরদের সমৃদ্ধ শৈল্পিক দক্ষতা এবং সৃজনশীল কল্পনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। পশ্চিমবঙ্গের এক অন্যতম উদীয়মান শিল্প, হস্তজাত শিল্প বহু আলংকারিক পণ্য উৎপাদন করে।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এক অন্যতম পাট উৎপাদনকারী রাজ্য। রাজ্যের হস্তজাত শিল্প থেকে পাটের বহু পণ্য উৎপাদিত হয় যেমন— সুন্দর ডিজাইনের গালিচা, আকর্ষণীয় পাটের থলি, পাটের রঙিন দুয়ারে পাতার মাদুর এবং অনেক অন্যান্য অলঙ্কারিক গৃহস্থালি পণ্য। ওয়াল হ্যাঙ্গিং, পশ্চিমবঙ্গের এই ধরণের এর ক্ষুদ্র কুটির ও গ্রামীম শিল্পের রূপ।

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শিল্পীরা পাটের সূক্ষ সুতো দিয়ে বুনে বিভিন্ন সুন্দর ওয়াল হ্যাঙ্গিং তৈরি করে। পাট তন্তুর প্রাকৃতির সোনালী রঙ ওয়াল হ্যাঙ্গিংগুলিকে এক হলুদ এবং সোনালী বর্ণ প্রদান করে। আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে কারিগররা রঙিন রেশম সুতো এবং পুঁতি দিয়ে এই ওয়াল হ্যাঙ্গিংগুলিকে সুসজ্জিত করে।

এই ওয়াল হ্যাঙ্গিং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা প্রাপ্ত, রাজ্য পরিদর্সন করতে আসা যে কোন পর্যটক এটি ক্রয় করবে বলে ঠিক করেই রাখে। ওয়াল হ্যাঙ্গিং, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা হয়। একদিকে ওয়াল হ্যাঙ্গিং, একটি অলঙ্কারিক উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় যা গৃহের শোভা বাড়ায়, অন্যদিকে এটি স্মারক হিসাবে ব্যবহার করা হয় যা আপনজন এবং প্রিয়জনদের উপহার দেওয়া হয়।

হস্তকলা শিল্প পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই ক্ষুদ্রায়তন হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প থেকে রাজ্য, রাজস্বের এক বৃহৎ অংশ আয় করেন। হস্তজাত শিল্পের ওয়াল হ্যাঙ্গিং, অতীতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতির ঐতিহ্যকে প্রতিফলতি করে, যা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

■ বালুচরি :

বালুচরির রেশম ঐতিহ্য, যা শাড়ির পার্শ্বে ও আঁচলে জরি দ্বারা ভূষিত ব্যক্তিত্বমণ্ডলীর নকশার জন্যে সুপরিচিত। শাড়ি ভারতীয় নারীদের প্রথাগত পরিধান। বিভিন্ন প্রকারের শাড়ি ভারতে জনপ্রিয়, যেগুলিকে তাদের বুনন, নকশা, অলঙ্কার ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ বৈচিত্রের শাড়ি হল কাঞ্জিভরম,

ইক্কত, বেনারসি, তাঁত, পোচামপল্লী, কোটকি সিল্ক, চান্দেরী, বালুচরী, গাড়োয়াল সিল্ক ইত্যাদি। বালুচরি সিল্ক এক প্রকার রেশমের বয়ন, যার মধ্যে কারিগররা ভারতীয় পুরানের কাহিনী বয়নের মাধ্যমে লিখেছেন। এই শিল্প সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু ফরাসি ধরনের তাঁতের সাহায্যে পুনর্জাগরিত করা হয়েছে। বালুচরি, ব্যাঙ্গালোর ও পশ্চিমবঙ্গের দুই ধরনের রেশমের সুতো দ্বারা বোনা হয়। এক বিশেষ তাঁত যন্ত্রে রেশম বুননটি উল্লম্বভাবে নির্ধারণ করা হয় এবং অন্যটি অনুভূমিকভাবে নির্ধারণ হয়। একটি শাড়ি তৈরি করতে কারুশিল্পীদের অনেক প্রচেষ্টা লাগে। এই রেশমের সুতোগুলিকে বোনার আগে ফুটন্ত জলে ধুয়ে নেওয়া হয়। পরের দিন, গরম রঙের মধ্যে ডুবিয়ে এগুলিকে রঙ্গীন করা হয়। তারপর এই সুতো গুলিকে ঘূর্ণমান চাকায় ঘোরনা হয়। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাসের কঠোর পরিশ্রমের পর আমরা এই সুন্দর বালুচরি শাড়ি পাই।

ঢাকাই জামদানি ঃ বিভিন্ন ধরনের হাতে বোনা বস্ত্রের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিল্প ঐশ্বর্য ও নৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়। এই নিদারুণ হস্তচালিত -তাঁত পণ্যের মধ্যে ঢাকাই বা ঢাকাই জামদানি একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র শৈলী বজায় রাখে। সুতির শাড়ির উপর বোনা ঢাকাই-এর নকশা বহু বছর ধরে খ্যাতি অর্জন করে আসছে। এই শব্দটির উৎপত্তি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে হয়েছে। নামানুসারে এই হস্তচালিত তাঁত শৈলী মূলত ঢাকাতে এবং অবিভক্ত বাংলার কিছু অন্যান্য অংশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গের পর এটি পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত হয়। ঢাকাই শৈলী সুতি বস্ত্রের উপর বোনা হয়। এই ঢাকাই সাধারণ ভাবে সুতি বস্ত্রের উপর বোনা হয়, কিন্তু যখন এটি রেশম বস্ত্রের উপর বোনা হয় তখন একটি চাকচিক্যময় ঢাকাই -এর সৃষ্টি হয়।

বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অংশের মহিলাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঢাকাই শাড়ি পরিধান বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশী ঢাকাই শাড়িগুলি বেশিরভাগই ধূসর রঙের হয়, কিন্তু ভারতীয় সংস্করণগুলির বিভিন্ন রঙের হয়। সোনালি ও রুপালি জরির কাজ করা ধূসর কালো ঢাকাই যে কোন মহিলার দখলে থাকে বেশ ঈর্ষনীয় এবং এটি দেশের এক অন্যতম রুচিশীল শাড়ি। ঢাকাই জামদানি শাড়ির সুক্ষ জমিন, প্রায় নিখুঁত শোভাময় মসলিনের অনুরূপ। বাংলার ওপারে থেকে আগত এই বিস্ময়কর ঢাকাই শাড়ি বর্তমানে ভারতের গর্ব। এটি দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিকারক উপাদান।

৮.৩.৭.৪ : উপসংহার

এই ভাবে দেখাযায় যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় লক্ষ্য করা গেছে। মূলত কৃষিপ্রধান রাজ্য হলেও এখানে বিভিন্ন সময়ে শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের অগ্রগতি হয়েছে। যার ভিত্তিতে এই রজ্যের অর্থনীতি ১৯৪৭ থেকে বর্তমান কাল অবধি গড়ে উঠেছে।

৮.৩.৭.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। Ray choudhury, R (২৭ অক্টোবর ২০০৬)। "A new dawn beckons West Bengal

২। The State Economy (PDF). Indian States Economy and Business : West Bengal. India Brand Equity Foundation, Confederation of India Industry.

৩। David Christiana (২০০৭-০৯-০১)। "Arsenic Mitigation in West Bengal, India : New Hope for Millions"(PDF)।

Source: Compilation of Different Internet Sources.

Block / পর্যায় - ৪

একক - ৮

পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষের সমাজকাঠামো ও গ্রামীণ নারী

ভারতীয় সমাজ বিন্যাসে নারীর ভালো থাকা বা সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে তাঁদের কারক (agent) ভূমিকা প্রসারের উপরে। কিন্তু নানান সামাজিক কারণ নারী উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে বা তাঁদের বিভিন্ন ধরণের বঞ্চনার শিকার হতে বাধ্য করে। যেমন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অধিকাংশ বিষয় বা পরিষেবা প্রাপ্তির পরিসংখ্যান মূলক তথ্যে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় এই পিছিয়ে থাকার পরিমাণ গ্রামীণ পুরুষ অপেক্ষা গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে বা শহরের নারীর তুলনায় গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে আরো প্রকট। স্বাধীনতা পরবর্তী সংবিধান রচনা, নানাবিধ আইন প্রণয়ন এবং নানা উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক হীনস্থানের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। তাই আমার মতে, পুরুষের তুলনায় নারী সমাজের (বিশেষ করে গ্রামীণ নারীর) হীন অবহস্থন, উন্নয়নশীল ভারতবর্ষের অন্যতম সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর অন্যন্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক অসম, বৈষম্যমূলক এবং বিপরীত। এই বৈষম্য বা বৈপরীত্যের রয়েছে অনেক ধরণ, যেমন—শ্রেণিগত, বর্ণগত, জাতিগত, ধর্মগত, অবস্থানগত, লিঙ্গগত প্রভৃতি। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজ গ্রামীণ নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে তৈরি করেছে। ভারতবর্ষের সংবিধানের ১৬(৪) ধারা অনুযায়ী অনুন্নত শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য ১৯৫৩ সালে গঠিত কাকা কালেলকার কমিশন (First Backward Classes Commission)-এর ১৯৫৫ সালের রিপোর্টেও নারী সমাজকে 'অনুন্নত শ্রেণি' রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী যে সংবিধান কার্যকর হয়েছিল তাতে জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ হয়। যাঁরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত হয়েছেন,সামাজিক কারণে পিছিয়ে পড়েছেন, তাঁদের সমান স্তরে উন্নত করতে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা নিলেও তাকে বৈষম্যমূলক বলে গণ্য করা হবে না— সংবিধানে তাও বলা হয়। নারী আন্দোলনের চাপে ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থনে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণে, নারীর বিরুদ্ধে হিংসায়, বিবাহে প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে একের পর এক নতুন আইন, প্রকল্প ও পরিকল্পনা গৃহীত হলেও আজও ভারতের অধিকাংশ গ্রামীণ নারীরা রয়ে গিয়েছেন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে। কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত মহিলারা তাদের পেশায়, সমাজে, রাজনীতিতে অনেক দূর এগোতে পারলেও সংখ্যায় তারা নামমাত্র। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর 'উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া' নারী উন্নয়নের পদক্ষেপ গৃহীত হতে থাকে। কিন্তু প্রকল্প রূপায়ণে অর্থনৈতিক ব্যয়বরাদ্দের স্বল্পতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, পরিকল্পনা রচনাকালে মহিলাদের অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতিতে দীর্ঘমেয়দী সুস্থায়ী লক্ষ্যের পরিবর্তে সম্ভাব্যতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ নারীর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভই বর্তমান অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামোতে নারীর স্থান বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণাপত্র এবং সর্বভারতীয় বা পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক নানাবিধ সমীক্ষালব্ধ তথ্যের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচিত হয়েছে-পুরুষতন্ত্র ও গ্রামীণ নারী, পরিবার ব্যবস্থা ও গ্রামীণ নারী, গ্রামীণ নারী ও শিক্ষা, গ্রামীণ নারী ও স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ নারী, নারী নির্যাতন ও পারিবারিক হিংসা প্রভৃতি বিষয়ের। পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতায়নের ধরণ অনুসন্ধানের পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ নারীর প্রকৃত সামাজিক অবস্থার উল্লেখ পরবর্তী অধ্যায়গুলি অনুধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

■ পুরুষতন্ত্র ও গ্রামীণ নারী :

পৃথিবীর যে কেন দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক জুড়ে রয়েছেন নারী। শুধু সংখ্যাগত দিক থেকেই নয়; সামজিক কাজকর্ম, অর্থনীতিতে, শিক্ষাব্যবস্থায়, সংস্কৃতিক্ষেত্রে রাজনৈতিক জগতে-প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নারীর অবদান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে (যেমন—পরিবার গঠনে, মনব সভ্যতার বিকাশে) নারীর এই অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। নারীর সামগ্রিক কাজকর্ম যেন হয়ে ওঠে 'ছায়াকর্ম' (Shadow work) ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতরাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭৪ সালে ভারত সরকার প্রকাশ করল একটি রিপোর্ট, নাম— 'Towards Equality; Report of the Commitee on the Status of Women in India'। এই রিপোর্টে ভারতীয় সমাজে, ভারতীয় রাষ্ট্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের তথ্যসম্বলিত বিশ্লেষণ করা হল। দেখা গেল ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতবর্ষেও নারীর সামজিক অবস্থা ভালো তো হয়ই নি বরং ক্ষেত্রবিশেষে তার অবনতি হয়েছে। ভারতরাষ্ট্র ও সমজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেমে এসেছে নারীর প্রতি অস্বীকৃতি, অবদমন ও বঞ্চনা। ১৯৮৮ সালের 'শ্রমশক্তি রিপোর্টে'-ও এই প্রান্তিকতার বয়ান আবারও প্রকাশিত হল।

তই প্রশ্ন উঠল, স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের প্রগতি, উন্নয়ন, কল্যাণকামিতার ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও নারীর অবস্থার উন্নতি হল না কেন? সমস্যা কোথায়? প্রয়োগে? নাকি ভাবনার ধরণ-ধারণে, ভাবনার পদ্ধতিতে? ভাবনার লিঙ্গকেন্দ্রিকতাই কি নারীর এই অবমূল্যায়িত অবস্থার জন্য দায়ী?

উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নারী সংক্রান্ত সনাতন প্রশ্নগুলির সম্পূরক (Supplement) হিসাবে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা লিঙ্গ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সমাজে নারীর সার্বিক অবস্থা ও অবস্থানের অনুধাবনে আমাদের তাকাতেই হবে একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা সংস্কৃতির দিকে যা 'পিতৃতন্ত্র' নামে পরিচিত। পিতৃতন্ত্র শুধু পিতা বা পুরুষের অনুশাসন নয়, পিতৃতন্ত্র হল নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার সামাজিক উপায়। সেজন্য Sylvia Walby তাঁর *Theorizing Patriarchy* (১৯৯০) গ্রন্থে পিতৃতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "A system of social structures and pratices in whic men dominate, opprss and exploit women." এই বিশেষ ব্যবস্থার অধীনেই নারীর সামগ্রিক জীবন যাপন এবং তাঁর সামাজিক

অস্তিত্বসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়। পুরুষতন্ত্র কেবল নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক শারীরিক পার্থক্যের ওপর ভিত্তিশীল নয়; এটি একটি সামাজিক নির্মাণ। পুরুষতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের এমন একটি ব্যবস্থাপন, যার বস্তুগত ভিত্তি আছে এবং এটি পুরুষদের মধ্যেকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা বা সৃষ্টি করে, যা তাদের নারী সমাজের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম করে তোলে। পুরুষতন্ত্রের এই আধিপত্য টিকে থাকে পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, যৌন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের একরৈখিক পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে।

সকল সমাজ তথা রাষ্ট্রে পুরুষতন্ত্রের ব্যপকতা ও গভীরতার মাত্রা একই রকম নয়। বিভিন্নতার পিছনে জনসংখ্যা বিষয়ক উপাদান, পরিবার ও সমাজের ক্ষমতা কাঠামো, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক উদারতা ও রক্ষণশীলতার মাত্রা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ. সম্পত্তির মালিকানার ধরণ, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, সামাজিক সচলতা ও সামজিকীকরণের ধরণ, বিয়ের শর্তাবলীর প্রকৃতি প্রভৃতির প্রভাব সরাসরি বিদ্যমান। এইসব প্রভাবকের বিবেচনায় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন সময়ে পুরুষতন্ত্রও বহুরূপে প্রকাশিত হয়। পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রের নানাবিধ রূপ ফুটে ওঠে। তবে সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের সার্বিক অবস্থা এমন যেখানে গ্রামীণ নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের, অবদমনের, শোষণের ব্যাপকতা ও গভীরতাই নির্দেশিত হয়। বাস্তবে গ্রামীণ নারী সমাজ, বিশেষ করে নিরক্ষর ও দরিদ্র গ্রামীণ নারী পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে সবচেয়ে বেশি নিস্পেষিত।

নীরা দেশাই (Neera Desai) এবং মৈত্রেয়ী কৃষ্ণরাজ (Maithreyi Krishnaraj) তাঁদের *Women and Society in India* (১৯৯০) গ্রন্থে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় নারীর অবস্থানের ৬টি দিক নির্দেশ করেছেন। সেগুলি হল-(১) ভারতীয় সমাজে নারীর পরিচয় সমাজ নির্ভর, (২) নারীর অস্তিত্ব, দক্ষত প্রকাশ পায় পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার উপর, (৩) বর্তমনে সাংবিধানিক আইন থাকলেও সংস্কৃতিগত দিক থেকে নারীর সম্পত্তির অধিকারকে তেমন ভাবে স্বীকার করা হয় না, (৪) নারী তাঁর পিতার পরিবার থেকে যবে বিবাহের মধ্য দিয়ে স্বামীর পরিবারে এবং সেখানে তার অস্তিত্ব নির্ভর করবে তাঁরা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও সবার প্রতি সেবা মূলক সঠিক (যেটা অন্যরা মনে করছে) আচরণের মধ্য দিয়ে, (৫) পুরুষতান্ত্রিক পরিবারে নারী ধর্মীয় ধারার ধারক হিসাবে কাজ করেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি পূর্ণ মাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন, স্থানীয় রীতিনীতি ঐতিহ্য মেনে চলে তঁরা স্বামী-পুত্রের কল্যাণের জন্য এবং (৬) 'পরিবার' নারীর সামগ্রিক জীবনের উপর প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ জারী করে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গবৈষম্য কেবলমাত্র নারী-পুরুষের মৃত্যুহারের চিরাচরিত অসমতার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় না, এর একটি নতুন রূপ হল লিঙ্গ-নির্দিষ্ট গর্ভপাত-যার লক্ষ্যবস্তু হল কন্যা-ভ্রূণ। এই জন্মসংক্রান্ত বৈষম্যটি পুরুষ শাসিত সমাজের অনেক বাবা- মায়ের ইচ্ছর প্রতিফলন-এঁরা চান যে তঁদের নবাগত সন্তানটি যেন মেয়ে ন হয়ে ছেলেই হয়। বর্তমানে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতা লিঙ্গভিত্তিক গর্ভপাতকে সহজসাধ করে তুলেছে, যা একেবারে জন্মের সময়েই নারী-পুরুষের অনুপাতকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে।

নীচে সারণির মাধ্যমে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের ১৫-৪৯ বছরের নারী-পুরুষের মধ্যে অধিক পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষার ধরণ পরিবেশিত হল ঃ

সারণি নং ৩.১

ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের ১৫-৪৯ বছরের নারী-পুরুষের মধ্যে পুত্র বা কন্যা সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছার ধরণ (২০০০-২০০৬)

নারীর মনোভাব ঃ												
রাষ্ট্র/রাজ্য	কন্যার চেয়ে অধিক পুত্র সন্তান চাওয়ার শতকরা হার			পুত্রের চেয়ে অধিক কন্যা সন্তান চাওয়ার শতকরা হার			কমপক্ষে একটি পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষার শতকরা হার			কমপক্ষে একটি কন্যা সন্তানের আকাঙ্ক্ষার শতকরা হার		
	শহর	গ্রাম	মোট	শহর	গ্রাম	মোট	শহর	গ্রাম	মোট	শহর	গ্রাম	মোট
ভারতবর্ষ	১৪.০	২৬.৬	২২.৪	৩.৩	২.২	২.৬	৬৮.৫	৮১.৭	৭৭.৪	৬৬.৪	৭৭.৭	৭৪.০
পশ্চিমবঙ্গ	১২.৭	১৮.২	১৬.৫	৪.৪	৩.১	৩.৫	৬১.৩	৮২.৯	৭৬.২	৫৭.১	৭৭.৭	৭১.৪
পুরুষের মনোভাব ঃ												
ভারতবর্ষ	১৩.৬	২৩.৭	২০.০	২.১	১.৮	২.০	৬১.৮	৭৪.৬	৬৯.৯	৫৮.২	৬৯.৩	৬৫.২
পশ্চিমবঙ্গ	১১.৭	১৯.১	১৬.৬	২.৪	১.৯	২.১	৬২.২	৭৩.৫	৬৯.৬	৫৫.৮	৬৭.১	৬৩.৩

উৎস ঃ *National Family Health Survey (NFHS-3) 2005006, (2007),* Volume-1 International Institute for Population Sciences, Mumbai, India, September, pp-104-105 & *National Family Halth Survey (NFHS-3) 2005-06, (2008).* West Bengal, International Institute for Population Sciences (IIPS) and Macro International, Mumbai, India, October, p. 51.

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রাম ও শহর উভয় স্থানে বসবাসকারী নারী-পুরুষের মধ্যে কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক (এই প্রবণতার একটি অন্যতম কারণ হল পণপথা)। তবে তুলনামূলকভাবে শহর অপেক্ষা গ্রামীণ নর-নারীদের মধ্যে পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা বেশি। আবার পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। নারী-পুরুষের এই মনোভাব পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় নিশ্চিতভাবেই নারীবিরোধী পক্ষপাতের প্রতিফলন ঘটায়, যা বিশেষ ভাবে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট গর্ভপাত ও শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যাধিক্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

সাধারণভাবে প্রায় সব সমাজেই নারীর কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত (private) ক্ষেত্রে এবং পুরুষের কর্মকাণ্ড সার্বজনিক (public) ক্ষেত্রে সীমিত করা হয়। পুরুষতন্ত্রে গ্রামীণ নারীকে গৃহবন্দী করে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তাঁর ভূমিকা বিস্তারের ক্ষেত্রক সুকৌশলে সীমিত করা হয়। ফলে পরিবার, সমাজ ও জাতীয় পরিসরে গ্রামীণ নারীসমাজ প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। যা ভারতীয় সমাজের সার্বিক অগ্রগতি ও জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে নেতিবাচকভাবে প্রতিহত করে। কার্যক্ষেত্রে নারীজাতির ভূমিকার সংকীর্ণতা সবারই জীবনের উপর মন্দ প্রভাব আনে—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিশু, বয়স্ক সবার উপরে। সেজন্য, ভারবর্ষের সার্বিক বিকাশ ও প্রগতির লক্ষ্যে পুরুষতন্ত্রের নাগপাশ থেকে নারীর মুক্তি ও ক্ষমতায়ন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

■ পরিবার ব্যবস্থা ও গ্রামীণ নারী :

ভারতবর্ষে বিদ্যমান পারিবারিক ব্যবস্থা ও রীতিনীতি অধিখাংশ সময়ে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর শাসন, শোষণের পথকে প্রশস্ত এ বিধিবদ্ধ করে। পরিবার এমন এক সামাজিক গোষ্ঠী যেটি অর্থনীতি, পুরুষতান্ত্রিক ভাবদর্শ ও সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থনীতি, পরিবার ও নারী এই ত্রিবিধ সম্পর্ককে সামনে রেখে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (Friedrich Engels) রচনা করেন *The Origin of the Family, Private Property and the State (1985)* নামক কালজয়ী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, কী পুরুষের অধীন হয়েছিল। সেজন্য এঙ্গেলস বলেছেন, 'মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়'।

পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের তুলনামূলক প্রয়োজনের উপলব্ধি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পারে। যেমন—গৃহস্বামীর প্রয়োজনকে বড় ও নারীর প্রয়োজনকে তুচ্ছ বলে ভাবা হতে পারে। অমর্ত্য সেন তাঁর "Gender and Cooperative Conflict" (১৯৯০) প্রবন্ধে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবে পরিবারের মধ্যে যে বিভাজন দেখা যায় তা নিয়ে আলাচনা করতে গিয়ে বলেছেন, নারী ও পুরুষের পারিবারিক সম্পর্ক একইসঙ্গে সংঘাত ও বিরোধমূলক। পরিবারের মধ্যে সহযোগিতামূলক সংঘর্ষের প্রভাবে সংঘাতকারী বিষয়সমূহের সর্বসমমত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও সহযোগী সংঘর্ষের সাপেক্ষে গৃহীত পারিবারিক সমস্যার সমাধান সবার পক্ষে সমান ন্যায়সঙ্গত নাও হতে পারে। অনেক সময় পারিবারিক জীবনের ধারায় বঞ্চিত নারী তাঁর আপেক্ষিক বঞ্চনার ব্যাপকতাও স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে কে কতখানি উৎপাদনশীল কা করছেন বা পরিবারের সমৃদ্ধিতে কার অবদান কতখানি এ সম্পর্কে ধারণাগুলি খুবই প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য, অমর্ত্য সেন নারীর ক্রিয়াকরণ (agency) ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা, ক্রিয়াকরণ ভূমিকার দ্বারা নারী তাঁর নিজস্ব পছন্দ বা মনোনয়ন ক্ষমতা (সিদ্ধান্ত তৈরি করা) যেমন অর্জন করে তেমনি সমাজের তা প্রকাশ ও প্রয়োগের ব্যাপারেও সচেষ্ট হয়। একজন নারীর কারক (agent) হিসাবে কাজ করার সক্ষমতাই হল তাঁর স্বাতন্ত্র। অমর্ত্য সেনের মতে, সম্ভবত এই ক্রিয়াকরণ ভূমিকার যত উন্নতি হবে হয়ত নারীর দুর্গতির তত অপসারণ ঘটবে। এছাড়া, পরিবারের অন্তর্গত লিঙ্গ বিভাজনকে অনেক সময় 'দরকষাকষির সমস্যা' (bargaining problems) হিসাবেও গণ্য করা হয়ে থাকে। গণিতজ্ঞ জন ন্যাশ (J. Nash)-এর ধ্রুপদী কাঠামোগত

দরকষাকষির সমস্যা বিষয়ক সূত্র নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পারিবারিক বিভাজনের ন্যায্যতা বুঝতে সাহায্য করে। দরকষাকষির সমস্যা ও তার প্রভাবকে ভালোভাবে বুঝতে পারলে পারিবারিক বিভাজনে নারীরা যে 'ব্যবহার' পেয়ে থাকেন সেগুলি কিসের দ্বারা প্রভাবিত সেটি যেমন খুঁজে বের করা যেতে পারে তেমনি পারিবারিক সহযোগিতামূলক সমাধানগুলি কেন সর্বদা পুরুষের অনুকূলে যায় সেটিও অনুধাবন করা যেতে পারে।

পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত অবদান ও স্বত্বাধিকার নারী-পুরুষের মধ্যে যৌথ সুবিধা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে। এর ফলে, যে পরিস্থিতিগুলি ব্যক্তিগত অবদান ও যথাযথ স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয় ধারণাগুলিকে প্রভাবিত করে যেমন—নারীর স্বাধীনভাবে উপার্জন, বাড়ির বাইরে কর্মসংস্থান, সাক্ষরতা এবং শিক্ষালাভ, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি এইসব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। গৃহ-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে নারীর স্বাধীন উপার্জনের ফলে পরিবারের সমৃদ্ধিতে তাঁর অবদান আরও প্রকাশ্য হয় এবং অন্যদের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাওয়ায় তাঁর মতামত অধিকমাত্রায় গ্রহণযোগ্য হয়। নারীশিক্ষা নারীকে আরও কর্মদক্ষ ও কৌশলী করে। সম্পত্তির অধিকারিণীরূপ পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী আরও শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। আর্থ-সামাজিক নানা রকম বৈষম্য নারী পুরুষ উভয়েরই জীবনযাত্রা ও ভালো থাকার অনিষ্টসাধন করে থাকে। নারীদের আরও বেশী ক্ষমতা অর্জন ও স্বাধীন কারক ভূমিকার প্রভাব এইসব বৈষম্যের অবসান ঘটাতে সাহায্য করে।

পরিবার বা সংসারের মধ্যে নারী-পুরষ সম্পর্কের মধ্যেকার মূল বৈষম্যগুলি প্রায়শই নানাভাবে ফুটে ওঠে। যেমন—প্রাণে বেঁচে থাকার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি লাভ, বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ, গৃহকর্ম ভাগ করে নেওয়া বা সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রভৃতি। সাধারণত পরিবার প্রধানের ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রামীণ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কর্ম বন্টিত হয়ে থাকে। পুরুষ প্রধান সমাজের প্রচলিত ধারা অনুসারে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাইরের পরিসরে (public sphere) এবং নারী সদস্যরা পারিবারিক পরিসরে (private sphere) কাজ করে থাকেন। নারীরা বাড়ির বাইরে কেবলমাত্র তখনই কাজ করার অধিকার পাবেন, যখন তাঁরা তঁদের অপরিহার্য বাড়ির কাজগুলি সম্পূর্ণ করে উঠবেন। কার্যত যা এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। এটিকে নারীর উপর শ্রমের বোঝা চাপিয়ে চলা হিসাবে দেখা যেতে পারে।

ভারতী রায় এবং অপর্ণা বসু সম্পাদিত *From Independence Towards Freedom: Indian Women since 1947* (১৯৯৯) নামক গ্রন্থে মুকুল মুখার্জী তাঁর "Women and Work in India: A Collage from Five Decades of Independence" প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক পরিবারের মহিলাদের কাজের পরিধির একটি বিস্তারিত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ—

রেখাচিত্র নং ৩.১

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক পরিবারের মহিলাদের কাজের পরিধি

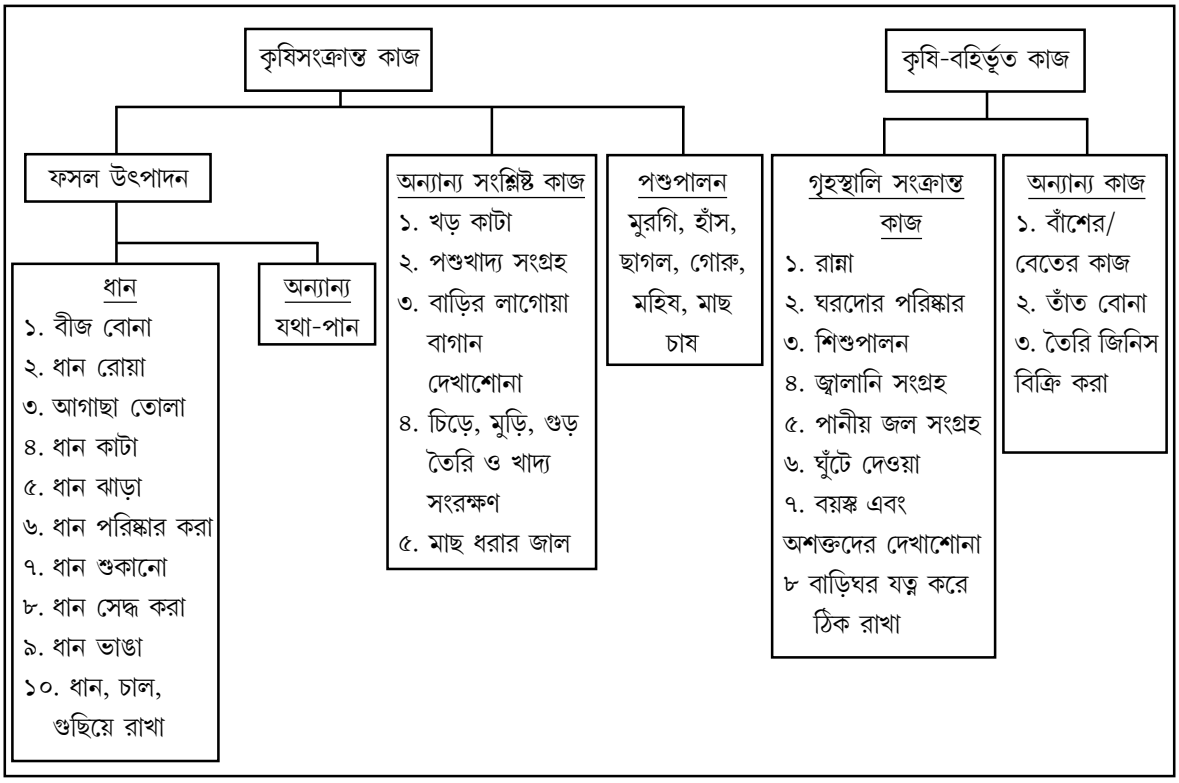

উপরের রেখাচিত্রটি গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষক পরিবারের মহিলাদের কাজের চাপ কত ব্যাপক। কিন্তু, মূলধারার অনীতিতে নারীর গৃহকর্মকে 'অনুৎপাদক কর্ম' হিসাবে দেখা হয়। সেজন্য, আয়-উপার্জনহীন ঘরোয়া কাজের এই দায়িত্ব বা 'শ্রম বিভাজন' নারীর ক্ষমতাহীনতার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

পারিবারিক পরিসরে মহিলাদের কাজের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে না। সারা দিন-রত্রান্তে যে কোন সময়ে বিশেষ করে পরিবারের প্রয়োজনে নারী কাজ করে চলেন। বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরিসংখ্যানেও অধিক সময় ধরে 'অনুৎপাদক কর্মে' নারীর নিযুক্ত থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে। যেমন — Time Use Survey, India 2000 নামে কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত রাজ্যভিত্তি সমীক্ষাতে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলীতে {যথা—System of National Accounts (SNA), Extended SNA Non-SNA কার্যাবলী ঃ The SNA activities consist of primary productin activities, like crp farming, animal husbandry, fishing, forestry, processing and storage, mining and quarrying; secondary activities like SNA acticities include household maintenance, care for children, sick and elderly. The activities related

t learning, social and cultural sctivities, mass media and personal care and self-maintenance are categorised as Non-SNA activities.} নারী-পুরুষের সাপ্তাহিক কর্মব্যস্ততার গড় হিসেবের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। SNA কার্যাবলীর মধ্যে মূলত উৎপাদনশীল কর্মগুলিকে এবং Extended SNA কার্যাবলীর মধ্যে মূলত অনুৎপাদক কর্মগুলিকে সামিল করা হয়েছে। সমীক্ষায় প্রকাশিত নারী-পুরুষের সাপ্তাহিক কর্মব্যস্ততার চিত্রটি হল ঃ

সারণি নং–৩.২

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলীতে নারী-পুরুষের সাপ্তাহিক গড় সময় (ঘন্টা হিসাবে) ব্যয়ের ধরণ

কার্যাবলীর ধরণ	গ্রাম*			শহর*		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
SNA কার্যাবলী	৪২.৩১ (২৫.১৮)	২২.৫৩ (১৩.৪১)	৩২.৭২ (১৯.৪৮)	৪১.০৬ (২৪.৪৪)	৯.১৬ (৫.৪৫)	২৫.৭৭ (১৫.৩৪)
Extended SNA কার্যাবলী	৩.৭৪ (২.২৩)	৩৩.৯৫ (২০.২১)	১৮.৪০ (১০.৯৫)	৩.৪৪ (২.০৫)	৩৬.৪৪ (২১.৬৯)	১৯.২৬ (১১.৪৬)
Non-SNA কার্যাবলী	১২১.৯৮ (৭২.৬১)	১১১.৫০ (৬৬.৩৭)	১১৬.৮৯ (৬৯.৫৮)	১২৩.৪৭ (৭৩.৪৯)	১২২.৪৪ (৭২.৮৮)	১২৩.০৩ (৭৩.২৩)
মোট	১৬৮.০৩ (১০০)	১৬৭.৯৮ (১০০)	১৬৮.০১ (১০০)	১৬৭.৯৭ (১০০)	১৬৮.০৪ (১০০)	১৬৮.০৬ (১০০)

উৎস : 'Gender issues in the measurement of paid and unpaid work', (2000). Country Report : India, *Conducting the Time Use Survey-Indian Experience,* United Nations Secretariat, Statistics Division, New York, pp.6-7.* বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যাগুলি শতাংশ নির্দেশক।

উপরের সারণিটিতে দেখা যাচ্ছে, SNA কার্যাবলীতে গ্রামীণ নারীর সাপ্তাহিক কর্মব্যস্ততা মোট বয়িত সময়ের ২২.৫৩ ঘন্টা এবং পুরুষের কর্মব্যস্ততা ৪২.৩১ ঘন্টা। কিন্তু Extended SNA কার্যাবলীতে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে গ্রামীণ পুরুষের ব্যয়িত সময় মাত্র ২.২৩ শতাংশ, আর নারীর ব্যয়িত সময় অনেক বেশি ২০.২১ শতাংশ। এটি পুরুষের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি। শহরের নারী-পুরুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে, Non-SNA কার্যাবলীতে গ্রামীণ পুরুষ গ্রামীণ নারীর তুলনায় ৮ শতাংশ পয়েন্টস (percentage points) অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে থাকেন। সব মিলিয়ে গ্রাম ও শহরের নারী-পুরুষের কাজের জন্য ব্যয়িত সময়ের পার্থক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও, শহর অঞ্চলে (৫ শতাংশ) SNA কার্যাবলীতে নারীর

অংশগ্রহণের হার গ্রামের (১৩ শতাংশ) তুলনায় কম পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ফলাফলের একটি কারণ হল, গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের অধিক হারে SNA কার্যাবলীভুক্ত কৃষিকাজে অংশগ্রহণ।

নীচের সারণিতে নারীর জীবনে প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুৎপাদক কার্যাবলীতে নারী-পুরুষের ব্যয়িত সময়ের ধরণ উল্লেখ করা হল :

সারণি নং–৩.৩

ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলির সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলীত নারী-পুরুষের সাপ্তাহিক কর্মব্যস্ততার গড় হিসাব (ঘন্টায়)

কার্যাবলী	পুরুষের ব্যয়িত সময়	নারীর ব্যয়িত সময়
রান্না করা	০.৫২	১৪.৯৩
ঘর-বাড়ি পরিষ্কার রাখা	০.২১	৪.৫৫
বাসনপত্র পরিষ্কার করা	০.১০	৩.৩৯
জামা-কাপড় পরিষ্কার ও ঠিক রাখা	০.১৮	২.৭১
পোষা প্রাণীর যত্ন নেওয়া	০.০৩	০.০৪
শিশুদের যত্ন নেওয়া	০.৩২	৩.১৬
নিজের সন্তানদের লেখাপড়া শেখানো	০.১৬	০.১৯
অসুস্থ ও বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়া	০.০৪	০.১৯
শিশুদের তত্ত্বাবধান করা	০.২৮	০.৭৮
অতিথি অভ্যাগতদের যত্ন নেওয়া	০.০৩	০.০৪
মোট	২.৫৪	৩০.৭১

উৎস : 'Gender issues in the measurement of paid and unpaid work', (2000), Country Report : India, *Conducting the Time Use Survey-Indian Experience,* United Nations Secretariat, Statistics Division, New York, p. 8

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, নারীরা যেখানে রান্না করার জন্য দৈনিক ২.১ ঘন্টা এবং ঘর-বাড়ি ও বাসনপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ১.১ ঘন্টা ব্যয় করেন সেখানে এই সমস্ত কাজে পুরুষদের অংশগ্রহণ খুবই সামান্য পরিমাণে লক্ষিত হয়েছে। শিশুদের যত্ন নেওয়াও মূলত মহিলাদের দায়িত্ব, কেননা এই কাজে মহিলাদের সাপ্তাহিক গড় ব্যয়িত সময় যেখানে ৩.১৬ ঘন্টা সেখান পুরুষদের তা মাত্র ০.৩২ ঘন্টা। সার্বিক ভাবে উল্লেখিত

কাজগুলিতে নারীর দৈনিক কর্মব্যস্ততার গড় যেখানে ৪.৩৯ ঘন্টা, সেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে তা মাত্র ০.৩৬ ঘন্টা। Time Use Survey, India 2000 এর সাহায্য নিয়ে ইন্দু গ্রোভার ব্যবহৃত '২৪ ঘন্টার চিত্র'-তেও গ্রামীণ নারীর দৈনিক কর্মব্যস্ততার গড় ১৭.৫ ঘন্টা প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে পুরুষের তা মাত্র ১০ ঘন্টার কাছাকাছি। পারিবারিক পরিসরে নারী-পুরুষের পেশাগত বৃত্তে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্বন্ধ জানা ও অনুধাবন এবং সেই সঙ্গে শ্রমবিভাজনের উপর আলোকপাত লিঙ্গ বৈষম্যের স্বরূপ উৎঘাটনের সহায়ক হতে পারে।

লিঙ্গ সম্পর্ককে অনেক সময় অন্যান্য সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের নির্ধারক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতীয় সমাজের প্রাথমিক একক হিসাবে চিহ্নিত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পরিবারে নারীর অবস্থান, মর্যাদা ও সুযোগ প্রাপ্তির ধরণ অনেক সময় লিঙ্গ সম্পর্কের নিরিখেই নির্ধারিত হয়। পরিবারের মধ্যে শ্রম বিভাজনের বিষয়টিও লিঙ্গ বৈষম্যকেই নির্দেশ করে। বর্তমানে নগরায়ন, পশ্চিমায়ন, শিল্পায়ন প্রভৃতির হাত ধরে ভারতীয় সমাজ কাঠামো যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে তেমনি, নারীদের অধিক হারে শিক্ষা গ্রহণ বা স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামিল হওয়ার ফলে পারিবারিক ক্ষমতা কাঠামোরও পরিবর্তন হচ্ছে। যে কারণে, ভারতীয় সমাজে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে অনু পরিবার, পুরুষ প্রধান পরিবারের পাশাপাশি নারী প্রধান পরিবার, পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপার্জনের পাশাপাশি নারীদের উপার্জন ও তার প্রভাব অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে।

লিঙ্গ বৈষম্য আমাদের সমাজ ব্যবস্থার নেক গভীর প্রবেশ করলেও, পুরুষতন্ত্র যে একটি সুস্থায়ী ব্যবস্থা সেরকম ভাবারও কোন কারণ নেই। তাছাড়া লিঙ্গ সাম্যের লক্ষ্যে মানব আচরণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক একক হিসাবে চিহ্নিত 'পরিবার'-কে 'যৌথ লক্ষ্য' পূরণের মাধ্যম হিসাবেও ভাবা যেতে পারে। সেদিক থেকে ভাবলে পরিবার 'যৌথতার নতুন সংজ্ঞা' (collective connotation)[১১] নির্মাণের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/bitstream/..../11–chapter%203.pdf

আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. Discuss the structure of social condition and role of women in post independent West Bengal?

একক - ৯

The Women Question

নারীর মর্যাদা বলতে কোনো সমাজের সামাজিক ভূমিকা কাঠামো জালিকাতে নারীর অবস্থান, তার অধিকার, কর্তব্য এবং সুবিধাকে বোঝায়। বস্তুত নারীর মর্যাদা কোনো সমাজের পুরুষদের মর্যাদা ও সম্মান পরিমাপের তুলনায় হিসাবে আলোচনা করা হয়। ভারত ও অন্যান্য দেশে এই তুলনীয় মর্যাদায় অবস্থান থেকে দেখা যায় যে, মহিলাদের ভূমিকা পুরুষদের প্রকাশ্য অধীনতা মেনে চলার উপর নির্ভরশীল। ভারতের কিছু কিছু সামাজিক ক্ষেত্রে বস্তুত মহিলারা সমাজের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এগুলি মহিলাদের স্বাধীনতার বাধা হিসাবে দেখা যায় এবং সমাজের পক্ষে তাদের সক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ঘাটতি হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এই ঘাটতি মেটানোর জন্য অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষদের মতো সমান সুযোগের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতাকে উপভোগ করার জন্য ভারতের তথা বাংলার মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রামে ব্রতী হয়ে আছেন। এই সংগ্রাম কখনও ব্যক্তিগতভাবে, কখনও সমষ্টিগতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সমষ্টিগতভাবে যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন তার পিছনে কোনও না কোনও সংগঠন অনেকক্ষেত্রে বিরাট শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই গবেষণার লক্ষ পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের পক্ষে আন্দোলনরত সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

মহিলাদের মুক্তির জন্য বাংলার কিছু মণীষীও সচেষ্ট হন। রক্ষণশীলরা এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করার চেষ্টাও করে। তথাপি নবজাগরণের ছোঁয়ায় বাংলার অল্প সংখ্যক মহিলারা শিক্ষিত হলে তাঁদের প্রচেষ্টায় মহিলাদেরকে সংগঠিত করে তাদের অধিকার ও মর্যাদা অর্জনের লক্ষে আন্দোলনে সামিল করা হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে নারী আন্দোলনের একটা ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাস অধ্যয়ন করে দেখা গেছে বাংলার মহিলারা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদের সেই অংশগ্রহণ অব্যহত। মহিলাদের এই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজ্যনৈতিক অংশগ্রহণের পাশাপাশি এক সময় মহিলাদের ক্ষমতায়নেরও দাবি বিভিন্ন অংশ থেকে উঠতে থাকে।

সাধারণভাবে কোন লক্ষ্যপূরণের জন্য সমষ্টিগতভাবে কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সামনে বিভিন্নভাবে দাবী পেশ বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তখন সেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলা যেতে পারে এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের এই ধারণাকেই গ্রহণ করে গবেষণার অভিমুখ স্থির করা হয়েছে অর্থাৎ এই গবেষণায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে এক ধরণের রাজনৈতিক ক্রিয়া হিসাবে ভাবা হয়েছে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগদান করা, নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হওয়া, দেশমুক্তি ও সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা হল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, মহিলাদের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সকল আন্দোলনে মহিলারা অংশগ্রহণ করেছেন (Forbes, G. 2007 : 93-152, বন্দ্যোপাধ্যায়, কে., ২০০২ : ২৮-৬২)। এটাও পরিলক্ষিত যে উল্লেখিত আন্দোলনে বর্ধমান জেলার মহিলারাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন (মুখার্জি, বি., ২০১৫ : ৭৩-৭৫, চৌধুরী, এন., ১৯৯৬ : ৯৫, ১৮৭, সৈয়দ, এস., ১৯৯১ : ১১৮, ১১৯, ২০০, ৩২২-৩২৯)।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পাশাপাশি মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি এক সময় চর্চার এবং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে সাধারণত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে কার্যকরী অংশগ্রহণকে বোঝায়। সুতরাং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। ভোটাধিকার প্রয়োগ হল রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রথম ধাপ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সহ বিভিন্ন বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান যেমন ওয়রলী, তেভাগা, তেলেঙ্গনা, নকশালবাড়ি ইত্যাদিতে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটে (বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, ২০০২ : ৪৭-৫৮)। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের অধিকার রক্ষায় মহিলারা রাষ্ট্রীয় কিছু আইনি ও সংবিধানিক অধিকার লাভ করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নের সাপেক্ষে কিছু কার্যশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় মহিলাদের অবস্থান জানতে স্ট্যাটাস কমিটি গঠিত হয় (১৯৭৪)। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ (১৯৭৫) ও নারী দশক (১৯৭৬-৮৫) পালন করা হয়। মহিলাদের জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা গঠন (১৯৮৮), মহিলা কমিশন গঠন (১৯৯২), স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থায় মহিলা সংরক্ষণ বিষয়ক বিল (১৯৯২) পাশ হয়। তথাপি মহিলারা আজও অবহেলিত। মহিলাদের উপর ধর্ষণ, নির্যাতন, পণপ্রথা বেড়েই চলেছে। ভোটের লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ভোট প্রদান, পুরুষের ন্যায় প্রায় সমহারে ভোটদান মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ইতিবাচক দিক। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মহিলাদের ভোটের হার পুরুষদের থেকে বেশি ছিল, পুরুষ ৮৪.২২ শতাংশ, মহিলা ৮৪.৪৫ শতাংশ, ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট: তাং ২১.০৯.২০১২। মহিলা সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে পঞ্চায়েত পুরসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্বের বৃদ্ধি ঘটলেও আজও সংসদ, বিধানসভায় মহিলা সংরক্ষণ অধরাই রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী নির্বাচনে যথাসংখ্যক মহিলা প্রার্থী মনোনীত করে না (বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, ২০০২ : ১৯৫)। অংসরক্ষিত আসনে মহিলাদের ঠাঁই নেই। মন্ত্রিসভাতেও উপযুক্ত সংখ্যায় মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ হয় না। কিছু সংখ্যক হলেও অনেককে কম গুরুত্ব মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আবার পঞ্চায়েত পুরসভায় মহিলা প্রতিনিধিকে নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয় বাড়ির বা নিজ রাজনৈতিক দলের কোন পুরুষের উপর (তপতী দত্ত, সাক্ষাৎকার, ২০১৪)। অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও, পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়া জাল থেকে মহিলারা এখনও বের হতে পারে নি।

স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে তথা বাংলায় মহিলাদের উপর নিপীড়ন অত্যাচার থেকে মুক্তি, মহিলাদের অধিকার অর্জন, নারীশিক্ষার প্রসার এবং মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে অনেক মহিলা সংগঠন গঠিত হয়েছিল (Forbes, G, 2007 : 64-82) । সংগঠনের ছত্রছায়ায় থেকে মহিলারা সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ মহিলাদের রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহিলা সংগঠনগুলির ইতিবাচক ভূমিকা থাকে। পশ্চিমবাংলার এই রকম মহিলা সংগঠনগুলির অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি।

পশ্চিমবঙ্গে তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন ছিল। বামফ্রন্টের অন্যতম বড় শরিক হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। এই দলের গণ সংগঠন হল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গে পেয়েছিল। ওই সময়ে সাধারণ মহিলাদের ভোটদানে অংশগ্রহণ, মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ, টেলিভিশনে খবর দেখা বা খবরের কাগজ পড়া ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে (সমীক্ষা, ২০১৪)। এইরূপ পটভূমিকায় এই গবেষণায় একটি ক্ষেত্রভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্ধমান জেলায় ১৯৯৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ক্ষমতায়নে ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ভূমিকার একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সংগঠনগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের হাত থেকে দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ১৯৪২ সালে 'মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি' গঠিত হয় এই কমিটির আহ্বানে ১৯৪৩ সালে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণির মহিলারাই এই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। উক্ত উদ্দেশ্য ছাড়াও দুর্ভিক্ষপীড়িত ও সুস্থ মানুষের জন্য রিলিফ ও তাদের সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে এই সমিতি কাজ করে। ১৯৪৭ সালের পর এই সমিতির নাম হল 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। ১৯৫৯ সালে ওই সমিতির নাম 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি'। ১৯৭০ সালে ওই সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং একটি অংশের নাম হন 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'। ১৯৮১ সালে 'সারা ভারত গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, দাবিসমূহ, সংগঠনের গঠন ও কাঠামো, সভ্যপদ ও সভ্য পদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থান পায় (গঠনতন্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ২০০০ : ১-৬)। এই সমিতি মনে করে নারীর সমঅধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজন সমতাভিত্তিক, বৈষম্যমুক্ত, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সমিতি কমিউনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রকৃত নারীমুক্তি সম্ভব বলে বিশ্বাসী। এই সমিতি তাদের আন্দোলনে পুরুষদেরও সদর্থক ভূমিকার কথা স্বীকার করে। সমিতির নেতৃত্বরা নিজেদের নারীবাদী বলে মনে করেন না (অঞ্জু কর, সাক্ষাৎকার, ২০১৪)।

John Baylis, Steve Smith ও Patrica Owens সম্পাদিত 'The Globalization of World Politics-An introducation to international relations' (2014) পুস্তকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নারীবাদীরা 'জেন্ডার' কে ক্ষমতার অসম গঠনগত সম্পর্ক হিসাবে জেন্ডারের এই সংজ্ঞাকে ব্যবহার করে বোঝার চেষ্টা করা হয় সব সমাজের মহিলারা পুরুষের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকে কেন? জাতীয় নিরাপত্তা নীতিতেও পৌরুষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই আন্তর্জাতিক নীতিতে ও সেনা বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতাযুক্ত অবস্থানে মহিলাদের কম প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ব লিঙ্গায়িত শ্রমবিভাজনের সঙ্গে অসাম্যের লিঙ্গায়িত অর্থনৈতিক গঠনের সংযুক্তি ব্যাখ্যা করে যে কেন বিশ্বের অধিকাংশ গরীব মানুষ হল মহিলা। আশির দশকের শেষের দিক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চাতে 'জেন্ডার' বিষয়টি ভালভাবে প্রবেশ করে। পুস্তকটিতে ব্যাখ্যা হয়েছে নারীবাদী তত্ত্ব ও জেন্ডার সম্পর্কিত নারীবাদী তত্ত্বের আলোচনার দ্বারা বুঝতে হবে বিশ্বমাত্রিক ইস্যুর ক্ষেত্রে 'জেন্ডার' কিভাবে কার্যশীল। মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ দশকে নারীবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'নারীবাদী' একটি বিশেষ বিদ্যা চর্চা হিসাবে গড়ে ওঠে। নারীবাদী তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হল নারীর অধীনতা যা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন মাত্রায় অস্তিত্বশীল তা ব্যাখ্যা করা এবং তা নিঃশেষ করার উপায় নির্ধারণ করা। নারীদের অধীনতার কারণ বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে। ই অধীনতা নানা সমাজ ও স্থানে জাত, ধর্ম ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন হয়। এখানে বলা হয়েছে জেন্ডার হল সামাজিক এবং সংস্কৃতগত গঠিত বৈশিষ্ট্য যা সময় ও স্থানভেদে নির্ভরশীল। যখন এই বৈশিষ্ট্যকে শক্তি, স্বক্ষমতা, জড়গণ নিরিখে ভাবা হয় তখন তাদেরকে আমরা পৌরুষতার (masculinity) সঙ্গে যুক্ত করি। আবার যখন বিপরীত বৈশিষ্ট্য যথা দুর্বলতা, নির্ভরশীলতা, আবেগ, ব্যক্তিগত হিসাবে ভাবা হয় তখন তাদেরকে নারীত্বের

(faminity) দ্বারা সংযোজিত করা হয়। কখনও কখনও জেন্ডারকে মহিলার সমার্থক ভাবা হয়। কিন্তু নারীবাদীরা বিশ্বাস করে জেন্ডার যতখানি পুরুষ সম্বন্ধে, ঠিক ততখানি মহিলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পুস্তকটিতে মহিলা সংগঠনের মাইলস্টোন হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিভিন্ন অধিবেশন ও চুক্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শুভঙ্কর সরকার সম্পাদিত 'Gender Sensitization Empowerment and Distance Education : History, Society and Culture' (2014) নামক পুস্তকতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলা ইস্যুগুলি আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের উপর তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব এখানে আলোচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের অবস্থানের উন্নতিতে উপনিবেশিক প্রশাসনের আইন পরিবর্তনের সাহায্যে সেই সময়ের সমাজ সংস্কারগণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় নারীদের পারিবারিক অধীনতা এবং আর্থিক নির্ভরতার ক্ষেত্রে পারিবারিক মতাদর্শগত আধিপত্যের হেজিমনি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সবসময়ই বিতর্কের। ভারতীয় আইন মহিলাদের অবস্থান বিকাশে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। তৎসত্ত্বেও মহিলাদের অবস্থানের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সরকারের সদর্থক ভূমিকাই মহিলাদের রক্ষাকর্তা হতে পারে। মহিলাদের ক্ষমতায়নে দূরশিক্ষা মাধ্যম বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাদের কোর্সের ধরণ, সিলেবাস, ক্যারিকুলামে মানবী বিদ্যার বিশেষ স্থান আছে। প্রান্তিক মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দূরশিক্ষার শিখন ব্যবস্থা তাদের অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। উত্তর উপনিবেশিক ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলা বিষয়গুলির সমালোচনামূলক আলোচনা এখানে রয়েছে। সংরক্ষণ, রাজনৈতিক দলগুলির মহিলা সদস্যের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতীয় মহিলাদের অবস্থান উন্নতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অধিবেশন, চুক্তির প্রভাব, স্ট্যাটাস কমিটির রিপোর্ট, রাজনীতিতে মহিলা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিকতার বাধা, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা মহিলা ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলি বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পুস্তকটি পরিশেষে কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হয়েছে যা সাম্প্রতিক মহিলা ইস্যুগুলি অনুধাবন করতে বিশেষ সুবিধা হয়।

রাজশ্রী বসুর 'নারীবাদ' (২০১২) গ্রন্থে নারীবাদের উদ্ভব ও প্রেক্ষাপট এবং তার দার্শনিক ভিত্তি, বিভিন্ন তরঙ্গ ও ধারা এবং ভারতে নারীবাদের প্রসার প্রভৃতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে থেকে বোঝা যায় নারীবাদ কেবলমাত্র নারী-বৈষম্যকে কেন্দ্র করে একটি আন্দোলন ও বৈদিক চর্চা নয়। পরিবর্তে এটি একটি সুসংহত চিন্তা দর্শন বা মতাদর্শ বা বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের লেখার মধ্যে দিয়ে এবং বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। গ্রন্থটিতে নারীবাদের বিভিন্ন ধারা যেমন উদারপন্থী, মার্কসীয়, সমাজতান্ত্রিক, বৈপ্লবিক, পরিবেশবাদী, উত্তর-উপনিবেশিক, উত্তর-আধুনিক প্রভৃতির এবং নারীবাদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থ তরঙ্গের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

'The Second Sex' (2011, Transl.) হল দুইখণ্ডে বিভক্ত Simon De Beauvour রচিত কালজয়ী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় মহিলাদের অবস্থান। মহিলাদের এই অবস্থানকে তিনি ধ্রুপদী দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। মানবসভ্যতায় মহিলাদের অবস্থানকে তিনি অস্তিত্ববাদী দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মহিলারা অবহেলিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত। সেই সভ্যতায় মহিলারা যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। যদিও জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। পুরুষ পক্ষপাতিত্বের ব্যাখ্যা তিনি তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য উক্তি—'কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং নারী হয়ে ওঠে'। উল্লেখিত গ্রন্থের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রেম ও শরীর। তিনি

ব্যাখ্যা করেছেন জ্ঞান কিংবা প্রজ্ঞার সঙ্ঘে প্রেম কামের কোন বৈরী সম্পর্ক নেই। গ্রন্থের পরিশেষে বোভোয়ার পুরুষ ও মহিলার ভ্রাতৃত্ববোধে আকৃষ্ট হয়ে আশা ব্যক্ত করেছেন।

মন্দাকিনি দাস ও প্রীতিরেখা দেশপান্ডের 'Empowering women, issues, challenges and strategics' (2009-10) গ্রন্থটি নির্বাচিত গবেষণা ভিত্তিক ২৭টি পত্রের একটি অতুলনীয় সমাহার। বিশ্ব এবং ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়নের পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। পুস্তকটিতে ত্রৈলোক্যা জেলা তাঁর 'Status of Women in Indian Society : Towards a Gender Respective Governance' প্রবন্ধে মহিলাদের অতীত এবং বর্তমান অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা ক্ষমতায়নের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অসীমা সাহু তাঁর 'Em-powering Women in India : Issues and Challenges' পত্রে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন যে ভারত সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণভাবে মহিলারা নিরক্ষর, কম নিযুক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নগন্ন উপস্থিতি, অপুষ্টি ও চিকিৎসা যত্নে কম প্রকোপ, কম বেতন, নিরাপত্তাহীন চাকুরি প্রভৃতি লক্ষিত। স্বরূপ কুমার ব্যানার্জী তাঁর 'From Emancipation of Women to Empowerment : An Instrospection on Feminist Perspectives in India' প্রবন্ধে প্রস্তাব করেছেন নারী ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তাকে দেখতে হবে লিঙ্গ বিষয়ে পক্ষপাতমূলক মনের গঠনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটি সামাজিক কৌশল হিসাবে। ক্ষমতায়নের পদ্ধতিটি যথেষ্ট পরিমাণে গভীরে এখনও যায়নি যাতে করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি ব্যাপক পরিবর্তন হয়। রাজলক্ষী দাস তাঁর 'Some Strategic Efforts towards the Empowerment of Women in India' পত্রে সাংবিধানিক ব্যবস্থা সমূহ, নীতি, পরিকল্পনা, স্কিম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল মহিলাদের প্রতিরক্ষা, প্রোমোশন এবং ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বি.কে.মহাকুল 'Politics of Political Empowerment of Women : The Indian Paradox' পত্রে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই মহিলাদের ক্ষমতায়নের দাবি উত্থাপিত হতে থাকলেও আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় মহিলা সংরক্ষণ বিলটি রাজনৈতিক কারণে আটকে থাকছে। টি.এন.পাতি তাঁর 'Empowerment of Women : A Long Journey Ahead' পত্রে মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সাথে মহিলাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বিজয়িনী মহান্তী তাঁর 'Invisible Barrier against Women Empowerment' নামক পত্রে বিশ্লেষণ করেছেন তৃণমূলস্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়টির উন্নতি ঘটলেও মহিলা নেতৃত্ব এবং প্রোমশনের ক্ষেত্রে অবস্থাটি করুণ। নিরঞ্জন বারিক তাঁর 'Women and the Problem of Paticipation' পত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণ কম মাত্রার কারণ হিসাবে সমাজে তাদের নিচু অবস্থানকে দাবি করেছেন। এবং মহিলা আসন সংরক্ষণের দ্বারা মহিলা প্রতিনিধিত্ব বাড়বে বলে আশা করেন। জোহানি জাক্সা তাঁর 'Women and Politics : Problems and Prospects of Political Empowernment of Women in India' পত্রে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেন রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমেই তাদের অবস্থান বাড়বে। সুমিত্রা মিশ্র তাঁর 'Women Empowerment through Education : Commission and Omissions' নামক পত্রে বিশ্লেষণ করেছেন যে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিশনের দ্বারা নীতি নির্ধারন স্বাধীন ভারতে রয়েছে যার ফলশ্রুতি মহিলাদের ক্ষমতায়নের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার সুবিধা এবং নিযুক্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সাংবিধানিক লক্ষ্য এবং মহিলাদের প্রকৃত অবস্থানের মধ্যে বিস্তর ফাঁক থাকছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সংকরামন

দাস এবং মানম্বানি শ্রীচন্দন তাঁদের যৌথ পত্র 'Empowering Women through Natural and Common Resource Management'-এ মন্তব্য করেন যে প্রাকৃতিক এবং সাধারণ সম্পদের পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ঘটলে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে এবং উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্রে তাদের নিয়ে আসা যাবে। বিজয়কুমার মিশ্র তাঁর 'Status of Tribal Women in Orissa' পত্রে উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন এবং সার্বিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে উপজাতি মহিলাদের উন্নয়নের মূলস্রোতে যুক্ত করতে হবে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পার্বতি সাহু তাঁর পত্র 'Empowering Tribal Women in Orissa'-এ উপজাতি মহিলাদের নিচু অবস্থানের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের পদ্ধতিকে তরান্বিত করতে পারে এমন কারণ খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। নবনীতা রথ 'The Paradox of Women Empowerment: Expectations and Experiences of the Tribal Women in an Urban Slum' পত্রে 'ক্ষমতায়ন'- এর ধারনাকে চারটি মাত্রা যথা প্রবেশাধিকার, চেতনাকরণ, অংশগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে উপজাতি মহিলাদের উপর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার কোন কার্যশীল প্রভাব নেই। কারণ হিসাবে তিনি তাঁদের চেতনার অভাব, ঐতিহ্যবাহী মনের গঠন, বৃহৎ পারিবারিক আকার, পারিবারিক বন্ধ্যা, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব ইত্যাদিকে দাবি করেছেন। করুণাকর পট্টনায়ক 'Women and Panchavat' পত্রে দেখিয়েছেন ৭৩ তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইনের ফলে মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু মহিলা প্রতিনিধিদের স্থানীয় বিষয়ে তাঁদের নিজেদের দ্বারা সমস্যা সমাধানে তারা কতটা সমর্থ সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শোভান কুমার পট্টনায়ক 'Empowernment of Women and the System of Panchyat Raj in India' পত্রে দেখিয়েছেন লিঙ্গ সমতার প্রতি অঙ্গীকার এবং স্থানীয় শাসনে মহিলা সংরক্ষণ কার্যশীল হলেও বেশিরভাগ মহিলা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হচ্ছেন এবং অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানে পদ গ্রহণ করছেন।

মিনু আগরওয়াল সম্পাদিত 'Women Empowerment and Globalisation; A Modern Perspective' (209) পুস্তকটিতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করার পাশাপাশি ৩০টি বিশেষ প্রবন্ধের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন কি এবং তার বাস্তবতা, মহিলাদের উপর ক্ষমতায়নের প্রভাব, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক বিকাশে মহিলাদের ভূমিকা, রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা, মহিলাদের ক্ষমতায়নে মিডিয়ার ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর্থসামাজিক পরিবর্তনে মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা, দারিদ্র দূরীকরণে লিঙ্গ সমতার মতো বিষয়গুলিকে সামনে রেখে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে সুচিন্তিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণ করা এবং বাস্তবে ক্ষমতায়নের বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে পুস্তকটি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। বইটিতে বিহারের মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাত্রা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগের থেকে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়লেও বেশির ভাগ মহিলারা আজও অত্যাচারিত, নিপীড়িত এবং স্কুলহীন আছে।

'নারী বিশ্ব' পুলক চন্দ-র সম্পাদনায় একটি সুন্দর সংকলন যেখানে ৪২ জন লেখক-লেখিকা, ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদরা বাংলার নারী সমাজের একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। বাংলার নারী সমাজের একটি বহুমাত্রিক ইতিহাস এই সংকলনটি থেকে জানা যাবে। প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার মহিলাদের জাগরণ, তাদের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ, নিজেদের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া, বিভিন্ন সমাজে নারীর অবস্থান ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। পুরুষতন্ত্র, মেয়েদের রাজনীতি, লিঙ্গ অনপেক্ষা চর্চা নারীত্বের নির্মাণ, কবিতা-উপন্যাস-যাত্রা-থিয়েটার ও নারী, লিঙ্গ সমতা, নারীর উন্নয়ন, বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে নারীবাদ, লিঙ্গ-সমতার প্রশ্নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্তের বাঙালি মেয়েদের রাজনীতি ভাবনা ও সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর বাংলার নারী : অতীত বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত : আন্দোলনের রূপরেখা নামক প্রবন্ধে বাংলার নারী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সুধা নায়ারের 'Women's Empowerment in South Asia' (2008) পুস্তকে মহিলাদের ক্ষমতায়নের সংজ্ঞাকে বিশেষ আঙ্গিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দক্ষতা বর্ধক, প্রশক্ষিণ, সম্পদ, ক্ষমতা এই বিষয়গুলি মহিলাদের ক্ষমতায়নের সাপেক্ষে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বে মহিলাদের দুঃখজনক অবস্থানের পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে লিঙ্গ সমতা বা লিঙ্গ নায্যতার প্রশ্নে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কলাকৌশলের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০০৫ সালে মহিলা ক্ষমতায়নের অনুসন্ধানে CARE-র উদ্যোগ এবং তাদের এ ব্যাপারে কার্যকারিতা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মহিলা ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সম্পত্তির অধিকার, জাতীয় নীতি ও তার লক্ষ্য উদেশ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, দারিদ্র দূরীকরণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প, বিশ্বায়ন, কৃষি ও শিল্পে মহিলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানীয় জল ও শৌচাগার, আশ্রয়, পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়গুলি যথাযথ আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের উপর অপরাধ, বিদ্যমান আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, ৭৩তম এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়গুলির সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। নারীবাদ এবং লিঙ্গ সত্তার সমস্যা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

'Women's Studies And Women's movement in India' (2007) গবেষণামূলক গ্রন্থের লেখিকা কুসুম দত্ত দশটি অধ্যায়ে ভারত মানবীবিদ্যা চর্চার ইতিহাস ও অবস্থা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কীত নারী আন্দোলনের একটি চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছন। তার এই কাজটি ইতহাস ও সমাজ বিদ্যার মিশ্র প্রচেষ্টা। মানবীবিদ্যা চর্চার প্রাতিরষ্ঠানিকতার অভ্যন্তরীণ ইতিহাস ব্যাখ্যা করার একটা প্রচেষ্টা এই পুস্তকে নেওয়া হয়েছে। মানবীবিদ্যা চর্চা ও নারী আন্দোলনকে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সম্পর্কের মাত্রা নির্ধারিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। মানবীবিদ্যা চর্চার সাহিত্যিক ঘাটতি মেটানোর ক্ষেত্রে পুস্তকটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ভারতে বিভিন্ন মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের কার্যধারা বর্ণনা করে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ভারতে মানবীবিদ্যা চর্চার বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমসাময়িক নারী আন্দোলনের বর্ণনা করেছেন। মানবীবিদ্যা চর্চার বিকাশে CSWI, ICSSR-এর ভূমিকা কি ছিল, মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রগুলি কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। মানবীবিদ্যা চর্চা বিষয়ক জাতীয় অধিবেশনসমূহের বিষয়গুলি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে মানবীবিদ্যা চর্চার বিকাশৈ RCWS এবং CWDS-এর ভূমিকা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়, IAWS-এর গঠন ও পশ্চিমবঙ্গে মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রগুলির কার্যাবলী, বাধা ও চ্যালেঞ্জগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা' (২০০৭) গ্রন্থে শ্যামলী গুপ্ত আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি, ইরাক যুদ্ধ, ভিয়েতনামের বিজয় যাত্রা মানবাধিকার সনদের প্রভাব বর্ণনা করা হয়। নারী আন্দোলনের প্রতি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের ভূমিকা, জাতীয় প্রেক্ষাপটে

ভারতের নারী আন্দোলন বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া, বিজেপি ও সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক দর্শন ও ভারতীয় নারী সমাজ এবং উন্নয়ন ও মহিলাদের সম্পর্ক, নারী জাগরণে তারাবাঈ ও রোকেয়ার অবদান, সুফিয়া কামালের অবদান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে নারী আন্দোলনকে গতিশীল করেছে তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'Women in Modern India' (2007) গ্রন্থটিতে লেখিকা Geraldine Forbes ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় নারীদের অবস্থানের একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি শুরু করেছেন সংস্কার আন্দোলন দিয়ে যেখানে পুরুষ সংস্কারকরা মহিলাদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শিক্ষিত মহিলারা তাদের জীবনকে কীভাবে পরিবর্তন করে গণ-জীবনে অংশগ্রহণ করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা কীভাবে সংগঠন গড়ে তুললেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদেরকে যুক্ত করেছেন তার বর্ণনা গ্রন্থটি থেকে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নারী আন্দোলনের বিকাশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। লেখিকা উল্লেখ করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারকগণ আধুনিকীকরণের সাপেক্ষে নারীর অবস্থাকে উন্নত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে ভারতের মহিলা সংগঠনগুলি কেন্দ্রিক চরিত্র সম্পন্ন হওয়ার অনেক মহিলার মোহভঙ্গ হয়। এই সংগঠনগুলির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য গুণাবলী থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। বিভিন্ন দল ও সংগঠনে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য থাকলেও লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে তাদের ঘাটতি ছিল। পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ তাদের নিজস্ব অধিকার অর্জনের আন্দোলনকে আকার দিতে সমর্থ হয়েছিল, তবে এরূপ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের কিছু ঘাটতি ছিল।

'Indian Political thought and movement' (2007) হরিহর ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ ঘোষ সম্পাদিত এই গ্রন্থে রাজনৈতিক ধারনার দেশীয় ঐতিহ্য তথা ভারতীয় উপনিষদীয় ভাবনা ও তার সমসাময়িক প্রসঙ্গ এবং প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাক্ এবং উত্তর স্বাধীনতার সময়ে বিভিন্ন সাময়িক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক ভাবনাকে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবনা ও আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে দেবযানী সেনগুপ্তের প্রবন্ধে পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। সংরক্ষণের সাপেক্ষে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থেকে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে অতনু চ্যাটার্জী ও অপূর্ব কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে SIPRD -তে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যাদের আলোচনার ভিত্তিতে কতকগুলি সমস্যাকে সনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সংরক্ষণ বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।

বৃন্দা কারাটের 'Survival and Emancipation' (2005) পুস্তকটি হল AIDWA-এর সম্পাদক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং সে সময়ের খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, সেমিনার, সাংগঠনিক প্রতিবেদন ভিত্তিক মহিলা আন্দোলনের একটি দলিল। অর্থনৈতিক উদারনীতির দশায় নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। মহিলা আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী যে অবাঞ্ছিত প্রতিস্পর্ধার সম্মুখীন হতে হয় তাকে রাজনৈতিক ভাবে গ্রহণ করার কথা তিনি বলেছেন। আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় বিভিন্ন সংগ্রামে মহিলারা যুক্ত হয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক দেশবিভাজনের বিরুদ্ধে, কৃষিক্ষেত্রে, ৫০-এর দশকে সামাজিক আন্দোলন, জমি মজুরীর আন্দোলনে, গৃহে ও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের আত্মনিরাপত্তা প্রচারের মহিলা অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা তিনি

তুলে ধরেছেন। উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশের নারীবাদী আন্দোলনের ধরণ ব্যাখ্যা করেছেন। ৯০-এর দশকে উদারনৈতিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন ধারণের অবস্থান কিভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা উল্লেখ করেন। মহিলাদের অংশগ্রহণ, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে মহিলা, মহিলাদের উপর হিংসা ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বইটিতে করা হয়েছে। ৯০-এর দশকে নারী আন্দোলনের বিশেষ ইস্যু হল পার্লামেন্টে মহিলা আসন সংরক্ষণের বিল পাশ। এক্ষেত্রে মহিলা সংগঠনগুলির যৌথ ক্রিয়ার কথা বলেছেন। শ্রীমতী কারাত নির্বাচিত সংস্থায় সংরক্ষণ এবং তার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলে সংরক্ষণের বিষয়টিও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ইউনিফর্ম সিভিল কোডের প্রশ্নে তিনি 'সম আইন, সম অধিকার'-এর স্লোগান উত্থাপন করেছেন। পণপ্রথা সম্পর্কিত গার্হস্থ্য হিংসা, কর্মক্ষেত্রে মহিলা নির্যাতন, জাতগত হিংসা প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে AIDWA-এর আন্দোলন উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত 'Political Sociology' (2005) বইটিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দেওয়া রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিভিন্ন ধরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচনী পদ্ধতির সাপেক্ষেও ইহা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং কেন করে তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিক্ষা, পেশা, আয়, সামাজিক লিঙ্গ, বাসস্থান, ধর্মের সাপেক্ষে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি কিছু মানুষ কেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে না তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট বা হতাশা, ব্যক্তির ভবিষ্যৎ না থাকা, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত, অন্য মানবিক ক্রিয়াকর্মের সাপেক্ষে কম শ্রদ্ধা পাওয়া যায় ইত্যাদির কারণকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকে 'জেন্ডার' ও রাজনীতি নিয়ে গভীর আলোচনা সীমন্তী সেন করেছেন। এখানে জেন্ডারের ধারণার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'জেন্ডার'-এর ধারণা ইতিহাস, সমাজভেদে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ জেন্ডারের স্থানিক মাত্রার কথা পুস্তকটি বলা হয়েছে। এই শব্দটি কোনভাবেই মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়। এটি নারীত্ব ও পৌরুষের বিভাজনই নয়, 'জেন্ডার' শব্দটি নারী পুরুষের অসম ক্ষমতা সম্পর্ক ও মহিলাদের সামাজিক অধীনতারও নির্দেশক। জেন্ডার শব্দটির ধারণা সষ্ট করতে পিতৃতন্ত্র বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। পরিবার সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হবে। সামাজিক মৌলিক একক হিসাবে পরিবার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। পরিবারের দ্বারাই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ চালিত হয়। বিশ্বের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ, আলোচনা করেছেন। নারী আন্দোলনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন মহিলাদের রাজনীতির আলোচনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত পরিসর ও গণ পরিসরের বিভাজনে উপর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

'The Changing Status of Women in West Bengal, 1970–2000' (2004) যশোধরা বাগচি সম্পাদিত এই গ্রন্থে পশ্চিমবাংলার বিগত ৩০ বছরের (১৯৭০–২০০০) মহিলাদের অবস্থান কেমন তা পরিসংখ্যানগতভাবে দেখানো হয়েছে। Towards Equality-র প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবাংলার মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবস্থানের চিত্রটি তুল ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, বিভিন্ন বয়সের সাপেক্ষে ভারতের সাপেক্ষে নারী-পুরুষ জনসংখ্যা তুলনামূলক চিত্র, জেলাগতভাবে নারী-পুরুষ অনুপাত, জন্মহার, শিশু মৃত্যুর হার, বৈবাহিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে। মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, কৃষ্টি, মহিলাদের আইন

ও তার উপর হিংসা এবং উপজাতি মহিলদের বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার মহিলাদের কি অবস্থান তা পরিসংখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। একটি গ্রন্থের মধ্যে এভাবে মহিলাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে বাস্তব পরিসংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা মহিলাদের অবস্থান উন্নয়নের সাপেক্ষে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বিশেষ সাহায্য করবে। গ্রন্থটির পরিশেষে বিষয়ভিত্তিক কতকগুলি নীতি নির্ধারক সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

'রাজনীতি ও নারী শক্তি, ক্ষমতায়নের নবদিগন্ত' (২০০২)-এর লেখিকা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মে নারীর স্থান, বিবাহিত জীবনে নারী, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী, বিভিন্ন গণ অভুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকার বর্ণনা করেন। মহিলা ক্ষমতায়নের প্রশ্নে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ক্ষমতায়নের প্রশ্নে অতীত আন্দোলন, বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব এবং আইনসভায় মহিলা সংরক্ষণের বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষে মহিলাদের রাজনীতি ও নারীমুক্তির বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা রেখেছেন। তিনি আর্থসামাজিক বঞ্চনাকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতরা মূল কারণ বলে মনে করেন। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন পঞ্চায়েত এবং পৌরসভায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেও আইনসভায় তা না হওয়ার কারণ কী? তিনি বলতে চেয়েছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে নারীশক্তিকে ব্যবহার করলেও স্বাধীন দেশে নারীর সেই অবদান অস্বীকৃত হয়েছে। এই কারণেই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নও ব্যহত হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতি, শ্রেণি, বর্ণের নারীর সীমিত অবস্থানের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও রাজনীতির বিভিন্ন পর্বে নারীর অবদান ও অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষমতায়নের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটিতে পঞ্চায়েতে মহিলাদের অবস্থান ও ক্ষমতায়ন নিয়ে সমীক্ষা ও তথ্য নির্ভর ব্যাখ্যা রয়েছে।

অমর্ত্য সেনের 'উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা' (২০০২) পুস্তকে আজকের নারী আন্দোলনের লক্ষ্যগুলির বিবর্তন আলোচিত হয়েছে। মহিলাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের বিষয়ের পাশাপাশি মহিলা সংগঠনগুলির কাজকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। মহিলাদের অবস্থানের পরিবর্তনে মহিলা পুরুষ উভয়কেই ভূমিকা পালন করতে হবে। গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয় মহিলাদের প্রতি বঞ্চনা বর্তমানেও রয়েছে। লিঙ্গের পক্ষপাতিত্বের জন্য মহিলারা তাঁদের প্রয়োজনীয়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। মহিলা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, স্বত্ত্ব লাভের অধিকার, শিক্ষা প্রভৃতির অবদান আছে। শিশু মৃত্যুর হ্রাস মহিলাদের স্বক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। নারী শিক্ষা এবং মহিলা কর্মসংস্থান প্রজননের হারের উপর প্রভাব ফেলে। মহিলাদের উপর পক্ষপাতমূলক আচরণ তাদেরকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে হীন করে তুলেছে। লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে মহিলাদের দুর্দশার সম্পর্ক থাকে। মহিলাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের ক্রিয়াকর্মের ভূমিকা আছে।

রাখহরি চ্যাটার্জি সম্পাদিত 'Politics India, the State Society Interface' (2001) পুস্তকটিতে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৫০-এর পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন ধারা গণতন্ত্র, প্রতিষ্ঠান, আধুনিকতা, দল ব্যবস্থা, লিঙ্গ রাজনীতি, জাতি গঠন ইত্যাদির সাপেক্ষে পর্যালোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। পুস্তকটিতে 'কেন্দ্র' এর বহুমুখী অর্থের কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেসের অধীনে কেন্দ্র গঠন, ভারতীয় রাজনীতিতে বিরোধীদের ভূমিকা, নির্বাচন বিধি ও সংস্কার, নগর সরকারের ইস্যু ও সমস্যা, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনব্যবস্থা, বিশেষ করে কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজ গঠন, ফলাফল, মূল্যায়ন, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকের সম্পর্কের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠন, তার সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা, জাতি, উপজাতি দ্বারা কিভাবে সম্পর্কিত তা আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতি, সংস্কৃতি বিবর্তনের ব্যাখ্যা এবং মহিলা ও রাজনীতির বিষয়কে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নারীবাদ ও নারী আন্দোলন, পুরুষতন্ত্র, স্বাধীনতার আগে ও পরে মহিলাদের রাজনীতিকরণ , রাজনীতিতে মহিলাদের সক্রিয়তা, নির্বাচনে তাদের প্রতিনিধিত্ব বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজনীতি থেকে সাধারণত মহিলারা দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। মহিলারা মনে করেন রাজনীতি হল পুরুষ সম্বন্ধীয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় মহিলাকে পুরুষের ব্যক্তিগত অধিকার বলে ভাবা হত। নারীবাদ আন্দোলনের ফলে ব্যক্তিগত পরিসর ও গণপরিসরের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করার চেষ্টা করা হয়। নারীবাদ এবং নারী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে মহিলাদের পৃথক সত্তা ও লিঙ্গ সমতার বিষয়ে পুস্তকটিতে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়। রাজনীতিতে মহিলা অনুপ্রবেশের সুযোগ বাড়ানো হয়। পুস্তকটিতে পুরুষতান্ত্রিকতা এবং লিঙ্গ বৈষম্যই মহিলাদের অধীনতরা কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নারীবাদের তরঙ্গগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরুষ আধিপত্য, মহিলা নিপীড়ন ও শোষণকে পুরুষতান্ত্রিকভাবে সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। WIA, AIWC, NFIW, AIDWA, AICCWA, MDS, দুর্গাবাহিনী, SMS, MMM, SMA, SEWA মহিলা সংগঠনের কার্যকারিতার আলোচনা হয়েছে। সংসদে ও বিধানসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব তথ্যসহ বিশ্লষণ করা হয়।

'Gender And Politics in India' (1999) Nivedita Menon-এর এই গ্রন্থে ভারতের মহিলা আন্দোলন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইস্যুগুলি বিভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের নারীবাদী আন্দোলন, তত্ত্ব ও রাজনীতির বিভিন্ন রূপগুলি নিয়ে একটি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। লিঙ্গ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ইস্যুগুলি এবং তাদের গুরুত্বগুলি গ্রন্থের সূচনাপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সমন্বয় সংযুক্তি রাজনীতিতে (Structural adjustment politics),নারীদের আইনের অন্তর্ভূক্তি, লিঙ্গ ও পরিবেশের মধ্যে বিতর্ক, মহিলাদের অধিকার, সংবিধান ও মহিলা সমতা, মহিলা শ্রমিকদের উপর প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাব, যৌনতা, মহিলা সংগঠনের বিষয়কে সামনে রেখে গবেষণামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে ভারতে একধরণের নারী আন্দোলন ছিল না। পরিবর্তে পৃথক পৃথক ধরণের নারী আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং সাধারণভাবে নারী আন্দোলনকেই মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে তত্ত্ব ও রাজনীতির মতবাদগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের নারী আন্দোলনের উপর বিভিন্ন ইস্যুকে তুলে ধরা হয়েছে। বৈদিক যুগে নারীদের আলোচনা, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা, জাতীয় প্রয়োজনে মহিলাদের প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী, নারীবাদী রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব, রাজনৈতিক অর্থনীতিতে নারীবাদের মূল্যায়ণ, ভারত রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভারতে নারী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়। সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় যেমন নারী উন্নয়ন, যৌন অত্যাচার তথা মহিলাদের প্রতি হিংসা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সংরক্ষণ বিষয়গুলি গ্রন্থটিতে আলোচনা হয়েছে। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের যৌন নিপীড়নের উপরে কিছু মামলা আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে উল্লেখ আছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একই ধরনের সমাজ সংস্কারক আন্দোলন ছিল না, বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ইস্যুগুলিকে নিয়ে পৃথকভাবে প্রচার করা হত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মহিলারা পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকে এবং পুরুষতান্ত্রিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মহিলা নিপীড়নের যোগসূত্র খুঁজে পায়। এর থেকে নারী আন্দোলনে নতুন মাত্রা পায়। ফলে বিভিন্ন নারী সংগঠন গড়ে ওঠে।

রাম আহুজার 'Violence Against Women'(1998) পুস্তকটিতে মহিলাদের উপর পুরুষের হিংস্রতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, পুলিশ তদন্ত ও বিচার, বিচারকে প্রভাবিত করে এমন কারক সমূহ, বিচারের প্রতি অসন্তোষ, নির্যাতিতার প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মহিলাদের উপর পুরুশের হিংস্রতায় সমস্যাটি নতুন নয়। তিনি মহিলাদের উপর হিংস্রতাকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন-যৌন হিংসা, অপহরণ, পণজনিত মৃত্যু, হত্যা, স্ত্রী-মারধর এবং কিছু বিশেষ হিংস্রতা যেমন নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি। হিংস্রতাকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে তিন ধরনের তত্ত্বের অবতারণা করেছেন-মানসিক বিশ্লেষণ (psychiaytric analysis), সমাজ মনবিদ্যাগত বিশ্লেষণ (socio-psycological analysis) এবং সমাজ সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ (social-cultural analysis) তিনি এক্ষেত্রে অপরাধকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন-ভারতীয় পেনাল কোডের দ্বারা চিহ্নিত অপরাধ (crimes identified under PC) এবং বিশেষ আইন দ্বারা চিহ্নিত অপরাধ (crimes identified under the special laws) । পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের ধারণা, পুলিশের কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পীড়িত মহিলাদের আত্ম ভাবমূর্তি (self image) এবং আত্ম শ্রদ্ধা (self esteem) আচরণগুলি সমীক্ষা ভিত্তিক প্রতিবেদনের সাপেক্ষে আলোচনা করা হয়েছে। মহিলা নির্যাতিতাদের নির্যাতিত হওয়ার পরে জীবনের ক্ষেত্রে চার ধরনের সমন্বয় দশাকে চিহ্নিত করেছেন -মানসিক আঘাত এবং যন্ত্রণা (shok and pain), যন্ত্রণার মুক্তি (removing pain), পরিহার ও অপমান (avoidance and humiliation) এবং গ্রহণ (adaptation)।

বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, কে এন পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন প্রণীত ‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম’ (১৯৯৪) গ্রন্থে সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকে ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যবোধ, চিন্তাধারা, নেতৃত্বের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা পুস্তকটিতে ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। জানা যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের জন্ম এবং নারীরা নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে মিছিল ও পিকেটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের কৃষক ও শ্রমিমক আন্দোলনের বিশ্লেষণ যেমন এই গ্রন্থে করা হয়েছে, পাশাপাশি উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক সমালোচনা, বামপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব, সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাতীয় নেতৃত্বের কার্যকারিতা, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকাণ্ড, জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিরা দেশাই ও মৈত্রী কৃষ্ণরাজ প্রণীত 'Women and Society in India' (1990) পুস্তকটিতে ভারতের মহিলাদের অবস্থানগত দিক তুলে ধরা হয়েছে। ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্যগত গঠনের ব্যাখ্যাসহ প্রাক উপনিবেশিক পর্যায়ে মহিলাদের অবস্থান আলোচনা হয়েছে। এছাড়া প্রাক স্বাধীনতা পর্যায়ে ভারতীয় মহিলাদের অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হওয়া নারীমুক্তি আন্দোলন থেকে জাতীয় মুক্তি ান্দোলনে মহলিাদের অংশগ্রহণ, সে সময়ে মহিলাদের উপর সামাজিক অন্যায় বন্ধে কিছু আইন প্রণয়ন সহ নারী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়। সমতার লক্ষ্যে সাংবিধানিক প্রতিবিধান, অর্থনৈতিক নীতি ও সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন।

রেণু চক্রবর্তী প্রণীত 'ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা' ১৯৪০-১৯৫০ (১৯৮০) পুস্তকটি বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন লড়াই আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েদের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। ওই দশকে নানা রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েরা, কমিউনিস্ট এবং কমিউনিসচ মনোভাবাপন্ন মেয়েরা কলকাতায় 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গড়ে তুলে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে সমবেত হয়েছিলেন। সংগ্রামী মহিলারা 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'কে নারী সংগঠন হিসাবে তেমন মূল্য দিতেন না। প্রায় সর্বত্রই মহিলা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রীরাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক মহিলা ফ্রন্ট গড়ে উঠে ছিল। ফ্যাসিবাদের কবল থেকে ভারতকে বাঁচাবার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন, তবে তার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির জন্য এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি জন্মলগ্ন থেকেই আওয়াজ তোলে। মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা কমিটিও গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলনে শরিক হন। পুস্তকটিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সেই সময়ে কর্মসূচী ও সম্মেলন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের সাহায্যার্থে এবং মহিলাদের স্বনির্ভরতার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা তুলে ধরা হয়। তেভাগা আন্দোলন, তেলেঙ্গনার আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা, কেরালায় পুন্নাপ্রা-ভায়ালার ও পাঞ্জাবের নারী জাগরণ এবং ওয়রলিদের মুক্তি আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্যাখ্যা করা হয়। ওই সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শান্তি সেনা গঠনের মাধ্যমে মহিলাদের ভূমিকার পর্যালোচনা করা হয়। শান্তি সেনা গঠনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগ আলোচিত হয়। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক ও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন, রেলওয়ে ধর্মঘট, বোম্বের বস্ত্র কারখানার আন্দোলন, বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বে-আইনী ঘোষণা, আসানসোলের শ্রমিক আন্দোলন, জমি বন্টন ও তেভাগা আন্দোলন, নার্স, শিক্ষিকা, উদ্বাস্তু মহিলাদের আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এবং ঐ সবক্ষেত্রে কমিউনিস্ট মহিলা ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা আলোচিত হয়। ওই সময়ে WIDF (Women International Development Federatin) এবং AIWC (All India Wmen Cnference) -এর কার্যকারিতা বর্ণনা করা হয়। পুস্তকটিতে উল্লেখ করা হয় নারীমুক্তি আন্দোলন এবং দেশের মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্রটি মহাত্মা গান্ধীই প্রথম দেখিয়েছিলেন এবং কমিউনিস্ট মেয়েরা কিশান, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক, বস্তিবাসি, খেটে খাওয়া মহিলাদেরকে নারী আন্দোলনের মধ্যেনিয়ে আসে অর্থৎ তারা সর্বস্তরের মেয়েরে নারী আন্দোলনে শামিল করতে চেষ্টা করেছিলেন। তারা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের কঙ্কালসার মেয়েদের মিছিল করে নিয়ে গিয়েছিলেন বিধানসভার গেটে। লেখিকার বক্তব্য, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজে নারী পাবে সাম্য এবং মর্যাদার জীবন।

Competition Success Review (2012) পর্যালোচনা করে জানা যায় স্বাধীনতার এত বছর পরও মহিলারা পরিবার এবং গণপরিসরে দ্বিতীয় ভূমিকা নেয়। তবু আজকের দিনে মহিলারা বাড়ি বাইরে এসে সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় বিকাশে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিগত বছরগুলিতে সরকারিভাবে ক্ষমতায়নের উপর জোর দিলেও গ্রামীণ মহিলা সহ একটা ব্যাপক অংশের মহিলারা এই ক্ষমতায়নের বাইরেই রয়ে গেছে। যদিও রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবসা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মিউজিক, তথ্যপ্রযুক্তি, খেলাধূলা, ব্যাঙ্ক, বিচারব্যবস্থায় মহিলাদের যোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সকল মহিলারা যদি সব সুযোগ পায় তবেই মহিলাদের সার্বিক ক্ষমতায়ন ঘটবে, লিঙ্গ নায্যতা মহিলাদের মনোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১১ সাল হল মহিলাদের ক্ষমতায়নের বর্ষ এবং তাদের মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে

সাক্ষরতার হার ৫৪.১৬% (২০০১) থেকে বেড়ে ৬৫.৪৬% (২০১১) হয়েছে। বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের দ্বারা একটি দেশে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত হতে পারে।

চিন্তার বিভিন্ন মতাদর্শে (schools of thought) দাবি করে যে নাগরিকরা কর্মক্ষেত্রে মাধ্যমে তাদের গণতান্ত্রিক দক্ষতাকে উন্নতি করে। Carle Pateman, Sydney Verba এবং তাদের সহকর্মীদের প্রকল্প অনুসারে বলা যায় যে নাগরিকগণ তারে নাগরিক দক্ষতা (Civil skill) এবং কর্মক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার দ্বারা রাজনীতিতে আরও বেশি সক্রিয় হয়। সাংগঠনিক ভাবে সক্রিয় নাগরিকগণ রাজনৈতিক ভাবে বেশি সক্রিয় হয়। নাগরিক দক্ষতার প্রশ্নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহ-ই যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির একমাত্র উপায় তা নয় (Adman,P.D.PB : 2008) ।

নাগরিকদের নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রসারণের দ্বারা ক্ষমতায়ন ঘটে। ক্ষমতায়নের প্রশ্নে একটি কারক হল আয় এবং সম্পদের অসাম্য। ভারতীয় সমাজের গঠনের মধ্যেই অসাম্যতা বিরাজমান যা জাত এবং লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পরবর্তী সময়ে আইন বদলেছে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে, তৎসত্ত্বেও নিচু জাতের মহিলারা এবং পুরুষরা অনেক অসুবিধা ভোগ করে। ভারতের সংবিধানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের নির্বিশেষে জনগণের অনেক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে কিন্তু তা অনেকটাই কাগুজে। অধিকার তৈরি করা এক জিনিস আর উপভোক্তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হল অন্য জিনিস। ক্ষমতায়ন হল একটি বিকল্প পথ যার দ্বারা পুরান সামাজিক গঠনকে বদলে নতুন একটি সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ক্ষমতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের চাহিদাই ক্ষমতায়ন (Beteille, A., 1999) । আর্থ-সামাজিক বিকাশ এবং সামাজিক কিছু ব্যাধি যেমন শিশু শ্রমিক দূর করতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন খুবই জরুরী। শিক্ষা ও প্রশাসনে মহিলারে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেলেও সংসদে মহিলা প্রতিনিধি বাড়ছে না। আইনসভায় মহিলা সংরক্ষণের প্রশ্নে অনগ্রসর মহিলাদের আলাদাভাবে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে সি পি এম এবং সি পি আই ছাড়া অন্য দলগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়। মহিলা সংরক্ষণের ইস্যুটি এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিষয়টি লিঙ্গ নায্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক (Raman V., 1999). UNESCO-এর সিদ্ধান্ত করেছিল ১৯৯৫ -এর মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের সকল স্তরে মহিলাদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষণ করতে হবে। তা সত্ত্বেও সারা বিশ্বে আইনসভায় মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম। বেজিং সম্মেলনে বলা হয় যে ক্ষমতা সম্পর্ক হল মহিলারে এই অবস্থানের জন্য দায়ি (Kannabiran, V and Kannabiran, K., 1997) ।

বুর্জোয়া মহিলা সংগঠনগুলি মহিলাদের নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবিগুলি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই উত্থাপিত করে। কিন্তু সমাজবাদীরা বিশ্বাস করে মহিলা এবং নিপীড়িত জনগণের যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজবাদী সমাজে আর্থ-সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা হবে। বুর্জোয়া মহিলা সংগঠনগুলি সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ছাড়াই সীমাবদ্ধ অধিকারের সাপেক্ষে সংগ্রাম করে। সোভিয়েত রাশিয়াতে ১৯০৬-এ আলেকজান্দের কোলান্তাই শ্রমিক মহিলাদের একটি ব্যুরো তৈরিতে সচেষ্ট হলেও পার্টির মধ্যে বিরোধিতায় তা তিনি করতে ব্যর্থ হন। তিনি শ্রমে মার্কশীয় ধারণাকে প্রয়োগ করেছেন। শ্রমের অধিকারে মহিলাদের বঞ্চিত করে যে ভূমিকা তাই হল মহিলাদের উপর নিপীড়ন। স্ত্রীর বিনাবেতনের শ্রমের উপর পরিবারের ভিত্তি এবং এটি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে। এটাই হল পুরুষতান্ত্রিক শোষণের ভিত্তি যেখানে পুরুষ হল শোষক। নারী নিপীড়নের বিভিন্ন দিক কোলান্তাই বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯০৭-এ পার্টির মহিলারা প্রথম মহিলাদের একটি সংঘ করতে সমর্থ হন (Lokaneeta, J., 2001)।

আম্বেদকর মহিলাদের অধিকারের বিষয়টি বিশেষ করে দলিত মহিলাদের অধিকার এবং পুরুষতন্ত্র ও জাতিতন্ত্রের দ্বারা তাদের উপর নির্যাতনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ইতিবাচক প্রচেষ্টা নেন। বর্তমান সময়ে লিঙ্গ রাজনীতিতে দুটি ইস্যু যথা-সংসদ ও বিধানসভায় মহিলা সংরক্ষণ ও ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিষয়ে বিতর্ক চলমান। এ দুটি ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ইস্যুগুলির উপর বর্তমানে মহিলা আন্দোলন বিতর্ক সংগঠিত করে। লোকসভায় বিধানসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণের প্রশ্নে অনগ্রসর মহিলা এবং মুসলিম মহিলাদের সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি চর্চিত হচ্ছে (Sonalkar W.,1999) ।

ছয়ের দশকের শেষের দিকে এবং সাতের দশকের প্রথম দিকে মহিলা আন্দোলন বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই সময় নারী আন্দোলনের প্রয়োজনের সাপেক্ষে এবং মহিলাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে সামাজিক ক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে মানবী বিদ্যা (Wmen study)-এর উদ্ভব হয়। মহিলা আন্দোলন এবং মানবী বিদ্যা বা মহিলা চর্চার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রয়োজনীয়তা উভয়কে শক্তিশালী করে। মানবী বিদ্যা নারী আন্দোলনকে বেশী মাত্রায় আকার দেয়, নারী আন্দোলনকে দিক নির্দেশ করে। যেমন সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'মহিলা এবং উন্নয়নের সংহতিকরণে'-এর জরুরী দাবী ওঠার পেছনে মানবী বিদ্যার 'মহিলা এবং উন্নয়ন' সম্পর্কিত গবেষণা বেশীমাত্রায় দায়ী (Pandhe S EPW. 1997) । ১৯৯০ এর পরে মহিলা উন্নয়নের প্রশ্নে নীতিনির্ধারক, বুদ্ধিজীবী ও উন্নয়নের প্রবক্তারা অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং মহিলা উন্নয়নের প্রশ্নে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে থেকে মহিলাদের স্বাধীনতার সঙ্গে মহিলা উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে (Kalegaonkar, A., 1997) ।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগ সময়ে Uniform Civil Code বিষয়ে দেশে বিতর্ক শুরু হয়। বি জে পি UCC-এর প্রতি জোরাল দাবি তুললেও লিঙ্গ নায্যতার প্রশ্নে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিকাশের আলোকে UCC কে নিয়ে বিতর্কের দানা বাঁধে। বিভিন্ন সংগঠন এই বিতর্কে অংশ নেয়। প্রাথমিকভাবে AIDWA-এর পক্ষে থাকলেও ১৯৯৫ সালে সরলা মুগাল মামলার পরে তা থেকে বিচ্যুতি হয়। তারা লিঙ্গ নায্যতার প্রশ্নে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে যা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে শক্তিশালী করবে। এর জন্য মৌলবাদীদের দাবির বিরোধিতা করে। মহিলাদের জন্য একক এবং সার্বজনীন সম আইন প্রয়োজন। কায়োরো, ভিয়েনা এবং বেজিং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মানবাধিকার এবং মহিলাদের অধিকারের ইস্যুগুলি প্রাধান্য পায় (Snalkar W., 1997) ।

আশির দশকে মহারাষ্ট্রের মাঞ্জেরাই পঞ্চায়েত হল দেশের মধ্যে প্রথম মহিলা পরিচালিত পঞ্চায়েত। পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার কুলটিকরি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পঞ্চায়েত (১৯৯৩) যার সকল সদস্যই হল মহিলা। মোট ১৩ জন সদস্যের ৯ জনের বয়স হল ২৮ বছরের নিচে। ৭ জন অবিবাহিতা। যার সকল সদস্যই হল চাষি পরিবারের সদস্য। এক জন গ্রাজুয়েট, ২ জন উচ্চমাধ্যমিক, ৩জন মাধ্যমিক, ৬ জনের পড়াশুনা ষষ্ঠ থেকে দশম এবং বাকিরা সাক্ষর। পেশাগত দিক থেকে ৮ জন কৃষি মজুর, ১ জন পোষাক প্রস্তুতকারক, ১ জন করে রাধুনি, গৃহিনী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রী। ওই সময় সাক্ষরতা অভিযানে কুলটিকুরি অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে (Mukhopadhyay, A., 1995) ।

বিশ্বের বেশির ভাগ মহিলা কি স্বাধীন? তারা কি নিজেরা নিজেদের সত্তার অধিকারী? 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' হওয়া শুরুর ইতিহাস কি? ইতিহাসে কি ঘটেছিল যে মহিলারা তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল? কেমন করে সে মুক্ত হয়ে

'মহিলা' না হয়ে মানুষ হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। অগোষ্ট বেবেল বলেন মহিলাদের উপর ঘৃণ্য ব্যবস্থা খ্রিষ্ট যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন মহিলারা হল— " The first humsn being to come into bondage. She was a slave before the male slave existed". সিম্যান দ্য বভেয়া বলেন—"Man is defined as a human being and woman is defined as female. Whenver she tries t behave as a human being she is accused of trying to emulate the man." মহিলারা হল ক্রেতা এবং পুরুষ হল উৎপাদক। এঙ্গেলসের মতানুযায়ী শ্রেণি নিপীড়নের অঙ্গ (organ) হল রাষ্ট্র এবং যৌন নিপীড়নের অঙ্গ হল পরিবার যেখানে পুরুষ হল বুর্জোয়া এবং মহিলা হল সর্বহারা। মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী দাবি হল কাজের দাবী, এর সঙ্গে যোগ করতে হবে সম মজুরীর দাবী এবং পুরুষের ন্যায় একই ধরনের কাজের দাবী। মহিলাদের গার্হস্থ্য কর্মকে সামাজিক কর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। ধনতন্ত্র একই সঙ্গে সর্বহারা এবং গৃহিণী তৈরী করেছে (Shivaraman,M,SS, 1975) ।

১৯৭০ সালের পর দেখা গেছে ভারতে উগ্র এবং জনভিত্তিক মহিলা সংগঠনের আত্মপ্রকাশ বেশ তাৎপর্যবাহী। এক্ষেত্রে শ্রমজীবী মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠা বাম মহিলা সংগঠনের আন্দোলন আরও তাৎপর্যবাহী। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নাম উল্লেখযোগ্য (Omvedt G. SS, 1975) ।

চল্লিশের দশকের শেষের দিকে গৃহরারা উদ্বাস্তু মহিলাদের সেবাকার্যে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপালের পৃষ্ঠপোষকতায় 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা জরুরী সেবা সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির পরিচালনায় অনেকগুলি চরকাকেন্দ্র ছিল, বয়ন ও সূচি কেন্দ্র ছিল, শিক্ষার্থীনীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উদবাস্তুদের পোশাক বিতরণ করা, উদ্বাস্তু রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা তারা করত (প্রবাসী, ১৩৫৮ ব.)। মহিলাদের শিল্পকার্যে শিক্ষা দেওয়া, পড়াশোনায় সাহায্য করা, সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক চর্চা কাজে এই সমিতি লিপ্ত থাকতো (প্রবাসী, ১৩৫৯ ব.)। নারীরা ভোটাধিকার অর্জনের ইতিহাসটি চর্চা করলে দেখা যায় ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যেই দেশগুলি ভোটাধিকার পায়। যদিও ১৯৪৭-১৯৪৮ সাল থেকে আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, চিন, ভেনিজুইলা, ইসরাইল প্রভৃতি দেশে নারীরা পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করে (দত্ত, পি. প্রবাসী, ১৩৫৯ ব.)।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ৮ মার্চ গণশক্তি পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বের যে লেখাপত্র প্রকাশিত হয় তা থেকে নারী দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য জানা যায়। নারী দিবসের মূল তিনটি দাবী হল-মহিলাদের কাজের অধিকার, নারীর ভোটাধিকার এবং শান্তি। নারীর সমানাধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করতে ক্ষমতাভিত্তিক, বৈষম্যমুক্ত, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি বছরে বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি লেখাগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, মৌলবাদ, বিশ্বায়ন, পুরুষতন্ত্র, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদির কুপ্রভাবে মহিলাদের সম অধিকার ও মর্যাদা অর্জন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বলা হয়েছে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত করে বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। তবেই গণতন্ত্র সার্থক হবে। লেখাগুলিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে সমাজতন্ত্রই নারী মুক্তির একমাত্র পথ। দীর্ঘকাল থেকেই মহিলারা লড়াই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। আন্দোলনের ফলেই তারা ভোটাধিকার অর্জন করেছে। দেশের বিদেশ নীতি, কৃষি, শিল্প, মুদ্রাস্ফিতি, শিশু মৃত্যু বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রাসঙ্গিক শ্লোগান সহ কিছু দাবী উত্থাপিত হয়। সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার

পাশাপাশি মহিলাদের দারিদ্র, পণপ্রথা, ভ্রূণ হত্যার মত সামাজিক ব্যাধিগুলির যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনি সরকারী কিছু নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, যুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে, জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতা সহ বিচ্ছিন্নবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা লেখাগুলিতে স্থান পেয়েছে (গণশক্তি, ৮ মার্চ, ১৯৯৬-২০০৯)।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মুখপাত্র 'একসাথে'-এর ২০টিরও বেশি সংখ্যা অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং আলোচিত বিষয়গুলির সারাংশ হল-সংস্কার আন্দোলনের সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতার আগে ও পরে বিভিন্ন আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর ৬০ ও ৭০-এর দশকে বাম আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ১৯৭৭-এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে নারীদের সমমর্যাদা, সমানাধিকার, বৈষম্যহীন ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবু মহিলাদের প্রতি যৌন পীড়ন, পণের জন্য মৃত্যু ইত্যাদির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মহিলা সংগঠন ছাড়াও অন্যান্য প্রগতিশীল জনগণের ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিক, কৃষক-ছাত্র আন্দোলনের বর্ণনা, নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ভূমিকা উল্লেখ আছে। কর্মস্থান, ভূমিসংস্কার, মিশা বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সমিতির আন্দোলনের কথা উল্লেখ আছে। নারীমুক্তি আন্দোলনে বামফ্রন্ট সরকারের অবদান স্বীকার করা হয়েছে। সংখ্যাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মূল কাজ হল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে মহিলাদের আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত করা, লেখাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে খাদ্যের সমস্যা, জলের সমস্যা, জমির সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই না করলে সমিতির আন্দোলন সার্বিক নারী আন্দোলন হবে না। উল্লেখ করা হয়েছে মহিলাদের বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে ওই সমিতিকে এগিয়ে যেতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের যে সকল কাজের সঙ্গে মহিলাদের স্বার্থ যুক্ত সেগুলিকে কার্যকরী করতে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ভূমিকা নিয়ে ছিল। বিগত শতরে ৯০ দশকের সময় থেকে মহিলা আসন সংরক্ষণের জন্যও ওই সমিতি আন্দোলন করে তা সংখ্যাগুলির লেখা থেকে বোঝা যায়। সংখ্যাগুলি অধ্যয়ন করে বোঝা যায় যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি আন্দোলন চালিয়েছে। শিশু ও নারী পাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্মীয় মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে, মহিলাদের কর্মহীনতার বিরুদ্ধে, যৌন নির্যাতন, নারী সমস্যা, আইনসভার সংরক্ষণ, পণপ্রথা, গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধনী, মুসলিম মহিলাদের উন্নয়নের জন্য, কন্যাভ্রূণ নিষিদ্ধ-র বিষয়ে ওই সমিতি আন্দোলন করেছে। একসাথে যেহেতু ওই সমিতির মুখপত্র, সুতরাং ওই সমিতির কর্মকাণ্ড বিষয়েই আলোচনা বেশি করা হয়। তবে এর পাশাপাশি সাহিত্য বিষয়েও লেখাপত্র সংখ্যাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় (একসাথে ১৩৮০-১৪২১ ব.)।

গবেষণাধর্মী পর্যালোচনা

সঞ্জয়কান্তি দাসের গবেষণাধর্মী পত্র 'Best Practies of Self Help Grups and Wmen Empowernment : A Case of Barak Valley of Assam' (2012)-তে আসামের কছর, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্ডি জেলার গড়ে ওঠা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর গুণগত এবং কার্যগত দিকগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের উপর গোষ্ঠীর প্রভাব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। ঐ রাজ্যে SHG এবং

ব্যাঙ্কের বন্ধনের কর্মসূচী দ্রুততার সঙেগ গড়ে ওঠোয় SHG -এর গুণগত মান ধাক্কা খায়। SHG -এর গুণগত মাত্রার কিছু বিশেষ কারক আছে। যার অন্যতম হল সরকারী লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্যে গ্রুপগুলি তৈরির দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রুপগুলির সাপেক্ষে অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি। গবেষণার দ্বারা দেখা যায় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, আস্থা তৈরি এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের গোষ্ঠীগুলির কাজকর্মের প্রভাব আছে।

সুপর্ণা গাঙ্গুলী ও সোনালী চক্রবর্তী (ব্যানার্জী)-র গবেষণামূলক পত্র 'Women in Gram Panchayat'(2010) অধ্যয়নে দেখা যায় তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত মহিলাদের, বিশেষ করে সব সদস্যই মহিলা এমন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সামাজিক প্রেক্ষাপট যাচাই করতে চেয়েছেন। মহিলাদের ক্ষমতায়নের ইস্যুটি পরীক্ষা করতে, তাঁরে সঙ্গে রাজনৈতিক সাহায্য কতটা, নির্বাচিত মহিলাদের দায়িত্বশীলতার প্রতি প্রত্যক্ষণ এবং সংরক্ষণের সাপেক্ষে মানুষের প্রত্যক্ষণ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। ৮টি জেলার ৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে তাঁদের সমীক্ষাটি করেছেন। নির্বাচিত মহিলাদের প্রেক্ষাপটে তাঁরা দেখিয়েছেন রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কমবয়সী মহিলাদের অপেক্ষা বয়স্করা বেশি সংরক্ষণশীল। ২২% এর বেশি প্রতিনিধি মুসলিম মহিলা, মহিলা প্রতিনিধিত্বের ৪০% তপশিলীজাতি, কয়েকটি পঞ্চায়েতে উচ্চবর্গের হিন্দু কম থাকায় সেখানে তপশিলী মহিলা প্রতিনিধি আরও বেশি, বেশির ভাগ নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি কম শিক্ষিত হলেও ৪.৪১% প্রতিনিধ স্নাতক। বেশির ভাগ নির্বাচিত মহিলা হল গৃহবধূ। ৬০.২২% মহিলা প্রতিনিধির কোন পেশাগত নিযুক্তি নেই। বেশিরভাগ মহিলা প্রতিনিধিই গরীব। ৮০% উত্তরদায়ক মহিলা প্রতিনিধির মাসিক আয় ২০০০ টাকার মধ্যে, পরিবারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ৪৬% মহিলা প্রতিনিধি রাজনীতিতে এসেছেন। ১৭% স্থানীয় কারক এবং ১৫% নেতাদের দ্বারা উৎসাহ পেয়ে রাজনীতিতে এসেছেন। ২১.৫৩% মহিলা নিজের পছন্দে রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন। বেশির ভাগ নির্বাচিত মহিলাই তার স্থানীয় সহযোগিতা পায়। তবে ২৫% উত্তরায়ক মহিলা প্রতিনিধ পরিবারের পূর্ণ সহযোগিতা পায় না।

শ্রীমতি নিরোজ সিংহের 'Empowerment of Wmen thrugh Political Participation' (2007) নামক গবেষণামূলক পুস্তকে নির্দিষ্ট সমাজ-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিহার রাজ্যকে তিনি গবেষণার পরিধি হিসাবে বেছেছেন। উত্তরদায়কের সাড়ার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সচেতনার অভাব থাকার জন্য ভোটার হিসাবে বিহারের মহিলারা তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারে না। ভোটের সময় আইন শৃঙ্খলার অবস্থা মহিলাদের ভীত করে। পুরুষতন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ মহিলাদের সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে তুলেছে। বিগত ৫০ বছর বিহারের সমাজের কোন পরিবর্তন হয় নি। ব্যাপক পুনর্গঠনের দ্বারা বিহারের মহিলাদের অবস্থা বদলাবে, যার দ্বারা মহিলারে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঘটবে। মহিলাদের জন্য সাক্ষরতা প্রসরণ, মহিলাদের আয়ের জন্য নিয়োগ কর্মসূচী, মহিলা এবং বালিকদের নিরাপত্তা, মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কর্মসূচী (এক্ষেত্রে এন জী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে) ও মহিলাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। এছাড়াও লিঙ্গ সমতার মূল্যবোধের পাঠ ছোটবেলা থেকে নিতে হবে, এক্ষেত্রে শিক্ষিত বাবা-মা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও ভূমিকা আছে। সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দরকার।

'Women's Participation in Panchayati Raj: Nature and Effectiveness' (2007). Pamala Singla-র গবেষণামূলক এই বইটিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের ভূমিকা, বিদ্যমান গঠন কাঠামোয় মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ঐতিহাসিক দিকগুলি আলোচিত হয়। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের সাপেক্ষে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিষয়টি যথাযথভাবে আলোচনা করা হয়। সংসদ ও বিধানসভায় মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে যে বিতর্ক সে দিকটিও আলোচনা করা হয়। হরিয়ানা প্রদেশ পঞ্চায়েতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন প্রশ্নে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রতিবেদন তুলে ধরা হয় এবং সুপারিশসহ ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়।

পল্লব মুখোপাধ্যায়ের 'Problem of Gender Inequality and Expansion of Education of Women in West Bengal' (2006) নামক গবেষণাপত্রে তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য হিসাবে সমাজ, বাজার এবং গৃহে কি মাত্রায় লিঙ্গ অসমতা সৃষ্টি হয় তা যাচাই করা, বাড়ির বাইরে কি সুবিধা বা বাধার সম্মুখীন হয় তা পরীক্ষা করা এবং শিক্ষা ঐ সমস্যা সমাধানে কতটা কার্যকর তা উল্লেখ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ অসমতা এবং বৈষম্য, স্থানীয় সরকার এবং শিক্ষার প্রসার, মহিলাদের উপর হিংসা এবং আইনি অধিকার, লিঙ্গ বাজেট, লিঙ্গ বৈষম্য, প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা, গার্হস্থ্য হিংসা সুরক্ষা আইন ২০০৫ বিষয়গুলির পর্যালোচনার পাশাপাশি গ্রামীণ বাংলার মহিলাদের প্রকৃত অবস্থা বিচার, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার স্থানে শহুরে, আধা শহুরে ও গ্রামীণ মহিলাদের হিসাবে দেখা যায় ৭০% উত্তরদায়ক লিঙ্গ বৈষম্যের মাঝারি মাত্রার মতামত দেন, ২০% মহিলা এ বিষয়ে সামান্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন। গ্রামীণ এলাকায় ৮০% মহিলা লিঙ্গ বৈষম্যের উপস্থিতির সমর্থক। শহুরে এলাকায় মহিলাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো। লিঙ্গ বৈষম্য অবসানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত সচেতনতা জরুরী। প্রচার মাধ্যমেরও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে বলে অনেক মহিলা মনে করেন। ৬০% মহিলা রাজ্যে শিক্ষা প্রসারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে মহিলাদের সচেতনার প্রশ্নে শিক্ষার মাত্রা আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে ৬০% মহিলা মত প্রকাশ করেন।

উল্লিখিত পুস্তক-পুস্তিকা, জার্নাল ও গবেষণা পত্রের সাপেক্ষে বলা যায় যে আমাদের দেশের মহিলারা স্বাধীনতা পূর্বে ও তাঁর পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। মহিলাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুরুষতান্ত্রিকতা, স্থায়ত্বশাসনে মহিলাদের যোগদান, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং ঐ ক্ষমতায়নে বিশ্বায়নের প্রভাব, মহিলাদের উপর হিংসা, মহিলা সংরক্ষণের বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে। নারীবাদ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'জেন্ডার'-এর ভূমিকা, উদার অর্থনীতির আঙ্গিকে নারী আন্দোলনের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লিঙ্গ রাজনীতি, মহিলা প্রতিনিধিত্ব, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য, মহিলা সংগঠন, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের বিষয়গুলি যথাযথভাবে আলোচিত হয়। কিন্তু লেখা পত্রগুলি থেকে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন, পুরুষতন্ত্র অবসানে আন্দোলন কর্মসূচি, মহিলাদের স্বনিযুক্তিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলা সংগঠন হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না, যদিও ঐ সমিতির মুখপাত্রে তারে আন্দোলনের কর্মসূচি সহ নারী আন্দোলনের তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

৮.৩.৪ ঃ বাংলার নারীবাদ (BENGAl FEMINISM

নারীবাদের তিন ধারা— উদারনৈতিক, সমাজবাদী আর র‍্যাডিক্যাল। ১৯২৩ সালে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্যে'র আগে এ বিষয়ে খুব বেশি তাত্ত্বিক আলোচনা বাংলায় হয়নি। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তথা বেগম রোকেয়ার 'অবরোধ বাসিনী' (১৯১৩)-তে মুসলিম নারী মুক্তির ধারণা স্পষ্ট হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। বাঙালী নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষা—শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সতীদাহ নিবারণের রাজা রামমোহনের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা আর বহুবিবাহ রহিত করার আয়াসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিকা বাংলার নারীবাদের উৎসে স্মরণীয়।

নারীবারে বীজ অঙ্কুরিত করেছেন বাংলার উদারনৈতিক পুরুষ নেতৃত্ব। এতে তাদের পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হয়ত কাজ করেছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'-তে একটি বিচিত্র কবিতা আছে। কবিতাটির শীর্ষক 'নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ'। রচনাকাল ১৮৮৮-র ২৩ আষাঢ়। বর যতই না কেন রোমাঞ্চকর পরিবেশের কথা সাজিয়ে কল্পনার ভুবন গড়ে তুলুক, কনে-র উক্তিতে সেই রোমান্টিকতার ফানুস ফেঁসে যাচ্ছে। বর বলছে—

'তোমার আমার প্রেম পারাবার
জুড়াইতে আমি এনু তাই।'

কিংবা

'খসে-পড়া তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে।'

আর সদ্যবিবাহিতা কনে বলছে—'আইমার কাছে শুতে যাই।' অথবা 'পুষি মোনিটরে/ফেলিয়া এসেছি ঘরে।'

বস্তুত পুরুষ তার সঙ্গী হিসাবে যে নারীটিকে চায়, সে কল্পনায় এরকম—বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষ সমাজের চাহিদাই নারীকে গৃহের বাহির করেছে—এ কেবল আন্তর্জাতিক ইতিহাস, বাংলার ক্ষেত্রেও ত বাস্তব। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসটিতে বিষয়টি বেশ স্পষ্ট।

ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন— অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবকে নারী শিক্ষার উদ্যোগ আয়োজনকে সার্থক করার জন্য ভূমিদান করেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ইনিই বাংলার প্রথম রেজিস্ট্রি -বিবাব করেছিলেন— বর্ধমান রাজার বিধবা পত্নী রাণী বসন্ত কুমারীকে নিয়ে পলায়ন ও বিবাহ —সে সময়কার তীব্র সমাজ আন্দোলনের উৎস হয়েছিল।

উনিশ শতকে একটু একটু করে শিক্ষা পাচ্ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত নারীরা। তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭০), সরলা দেবী চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৫), প্রিয়ম্ব দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), লেডি অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১), কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯২৩), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। জীবনের নানা ক্ষেত্রে এঁরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। তবে অধিকাংশই স্বামী বা পরিবারের অন্য কারো সাহায্য পেয়েছেন/কংগ্রেস সভানেত্রী সরোজিনী

নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) কিংবা উত্তরপ্রদেশ তথা ভারতের কোনো প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালিনী (১৯০৮-১০৭৪), বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লীলা রায় (১৯০০-১৯৭০)-এর ক্ষেত্রে এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অল্পবয়সে বিধবা হয়েছেন অথচ জীবনকে নিরাশার চোখে দেখেননি, এমন কয়েকজন নাম বাংলার সংস্কৃতিতে স্মরণীয়। স্বামী-পুত্র হারিয়ে কৃষ্ণকামিনী দাস (১৮৬৪-১৯১৯) যে ভাবে শিক্ষা ও সাহিত্যসেবা করেছেন তা অতুলনীয়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪)-র সাহিত্যসেবা মূলত স্বামীর মৃত্যুর পর। মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩)-র সাহিত্য সাধনাও বিধবা হবার পর। মাত্র ১৯ বছয় বয়সে তিনি বিধবা হন।

নারীবাদী চেতনার উদ্দাম সম্ভবত মোক্ষদায়িনী দেবীর লেখায়। ১৮৭০ সালে তিনি মহিলাদের জন্য একটি পাক্ষিক পত্রিকা শুরু করেন। 'বাংল মহিলা'। 'বন প্রসূন' নামক কাব্য-অন্তর্গত কবিতা 'বাঙ্গালী বাবু'-তে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের ইঙ্গিত ধরা পড়েছে। কবিতাটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালীর মেয়ে'র জবাব।

বাংলার নারী সমাজের কোনো কোনো মহিয়সী চরিত্র পতিতা বা বাঈজী শ্রেণির। তাদের কেউ বাংলার নাট্যমঞ্চে অভিনেত্রী হিসাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। 'স্টার' রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এই শ্রেণীর নারী বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩-১৯৪২) অগ্রবর্তী। পুরুষ-মহাপুরুষ সান্নিধ্য তিনি পেয়েছেন— তাকে ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। নারীবাদী চেতনার ধারায় এই শ্রেণীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতা স্বকীয়তা আত্মচেতনার ফল। রাজনীতির সংগ্রামে মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২) বা নারী সমাজের আত্মচেতনার দিগদর্শন সঙ্গিনী কৈলাসবাসিনী দেবী এই দিক থেকে আলোচ্য। শহীদ মাতঙ্গিনীর অনুপ্রেরণা স্বাধীনতা সংগ্রামে। কৈলাসবাসিনীর চেষ্টা 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'-র সন্ধানে (১৮৬৩)। আর একজনের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মৃণালিনী সেন (১৮৭৯-১৯৭২)। অল্প বয়সে বিধবা এই নারী কবিখ্যাতি পেয়েছিলেন। তারপর ২৬ বছর বয়সে দ্বিতীয় বিবাহ হয়— কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্মল চন্দ্র সেনের সঙ্গে। ইংলণ্ড ও ভারতে মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে ছিলেন অগ্রণী মহিল। নারীবাদী চেতনার এই অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলার আর কোন নারীর আছে? গান্ধীজীকে বাংলা শিখিয়েছিলেন মৃণালিনী। প্রথম মনোপ্লেনে চড়েছিলেন। মুক্তির তুঙ্গ সিদ্ধি বলে এসব তথ্য নিশ্চয় ধরা সম্ভব।

বাঙালী মহিলার অস্মিতা ও অঙ্গীকার বিষয়ে উপন্যাস লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)। তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতি, 'সুবর্ণলতা' আর 'বকুলকথা' বাঙালী নারীর আত্মউন্মোচনের দলিল।

স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্য সাধনায়, বিদ্যাবত্তায় যারা নারীবাদকে স্পষ্ট করেছেন তাদের মধ্যে কেতকী কুমারী ডাইসন, গায়ত্রী স্পিভ্যাক চক্রবর্তী, কবিতা সিংহ, বাণী বসু, সুকুমারী ভট্টাচার্য,সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সুমিতা চক্রবর্তী, মালিনী ভট্টাচার্য, ইলা মিত্র প্রমুখের কথা বিশেষভাবে মনে পড়েছে। এই পর্যায়ে যার কথা না বললে লেখা অসম্পূর্ণ থাকে তার নাম মহাশ্বেতা দেবী।

এই লেখিকার কৃতিত্ব শুধুমাত্র আত্মসচেতনার উদাহরণ প্রতিষ্ঠায় নয়—বাংলার সমাজ সচেতন ভাবাদর্শের প্রকাশেও।

বাংলা দেশের কয়েকজনের কথাও এই সূত্রে লিখি। ফয়জুন্নেসা চৌধুরী (১৮৪৮-১৯০৫) অবশ্য স্বাধীনতার আগেই দানশীলতার জন্য 'নওয়াব' উপাধি পেয়েছিলেন। সাহিত্যে বেগম সুফিয়া কামাল, সেলিন হোসেন কিংবা

তসলিমা নাসরিনের কথা উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত মহিলা নারীবাদ প্রচারের জন্য নানাভাবে ধর্মাধবজী ও রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন।

বাংলার নারীবাদী চেতনা বিকাশে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে'র ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই কেন্দ্রটি বেশ কিছুদিন ধরে বাংলার নারীবাদী চিন্তনের বিকাশ নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণা করে চলেছে।

আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নারীবাদের কটি ধারা প্রচলিত আছে? কি কি?

২। নারীবাদের উপর প্রথম তাত্ত্বিক বই —বাংলা ভাষায় কি?

৩। বাংলার নারীবাদী চেতনার উন্মেষে উদারমতি পুরুষদের ভূমিকা কতটা বলে আপনি মনে করেন?

৪। পুরুষ সমাজের চাহিদাই নারীকে গৃহের বাহিরে করেছে— উদাহরণসহ মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার করুন।

৫। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীশিক্ষার উদ্যোগ ও ফলাফল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করুন— ফলাফল লিখুন।

৬। অল্পবয়সে বিধবাদের মধ্যে নারীবাদের বীজ কিভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে—দেখান।

৭। প্রথম নারীবাদী চেতনা বাংলায় কার কার্যকলাপে লক্ষিত হয়?

৮। সমাজের পতিতা বা বাঈজী শ্রেণীর মধ্যে নারীবাদের ধারণা।

৯। নারীবাদের ভিত্তি স্বকীয়তা ও আত্মচেতনা। বাংলার কয়েকজন নারীর মধ্যে তা কিভাবে ধরা পড়েছে দেখান।

১০। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ নারীবাদী চেতনার বিকাশে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করুন। এদের কোনো একজনকে কি আলাদা করে নেওয়া সম্ভব? কেন তিনি অতটা স্বতন্ত্র?

একক - ১০

শরণার্থী সমস্যা ও তার প্রকৃতি

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর যে সমস্যাটি স্বাধীন ভারতের সামনে সবথেকে ভয়ঙ্কর ও জটিল ছিল তা হল উদ্বাস্তু তথা শরণার্থী সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উল্লেখ্য দিল্লির নিকটবর্তী কুরুক্ষেত্র অঞ্চলটি মহাভারতের কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে যেমন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক সেইসময় স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু সমস্যার ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র অঞ্চলটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু এবং শিখদের অনেককেই সরকার এই কুরুক্ষেত্রের একটি উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠিয়ে দেয়। এই খেথালা ময়দানে গড়ে উঠেছিল উদ্বাস্তুদের বিশাল এক শহর যেখানে স্রোতের মত আছড়ে পড়েছিল উদ্বাস্তুদের তরঙ্গ। কখনো দিনে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ২ লক্ষ্য পর্যন্ত হত। জনৈক আমেরিকান পর্যবেক্ষক লিখেছিলেন, সেনাবাহিনী যেভাবে একটা শরণার্থীর স্রোত শেষ হতে না হতে অন্যের জন্য তাবু খাটিয়ে ছিলো সে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কুরুক্ষেত্রের এই নবাগত বাসিন্দাদের জন্য একসঙ্গে পরিমাণমতো চাল, ডাল, চিনি আর রান্নার তেল-এর সমস্তটাই সরকার থেকে বিনা পয়সায় দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে ভারতীয় বিদেশি সমাজকর্মীদের সংস্থা যা 'সংযুক্ত কল্যাণ পরিষদ' নামে পরিচিত ছিল উদ্বাস্তুদের কিছু স্থান করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল। বস্তুতপক্ষে এই সময় উদ্বাস্তুদের স্থায়ী বাসস্থান আর উৎপাদন মূলক কাজের বন্দোবস্ত একান্তই প্রয়োজন ছিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে কুরুক্ষেত্র দেখে একজন সাংবাদিক তাকে পুরোদস্তুর এক শহর বলে বর্ণনা করেন যেখানে তিন লক্ষ লোকের বাস ছিল। উদ্বাস্তুদের মাথায় একটা চিন্তা ছিল সেটা হল তাদের নিজস্ব কিছু জমি যেখানে তারা চাষবাস করবে।

অন্যদিকে উল্টো দিকে অর্থাৎ ভারত থেকে পাকিস্তানে গৃহত্যাগী জনতার একইরকম অবস্থা দেখা গিয়েছিল। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রথম জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল পাঞ্জাবের পূর্ব অংশে মুসলিমদের ফেলে যাওয়া সেই সব জায়গা জমিতে। এই সময়েই বিশ্বের সর্ববৃহৎ জমি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা প্রায় ২ লক্ষ্য হেক্টর জমি পেয়েছিল, কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিমরা কয়েক লক্ষ হেক্টর জমি পেয়েছিল। এই দুইয়ের মধ্যে ফারাকটা এই কারণে যে, পাঞ্জাব প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের জমির উর্বরতা এবং সেখানে সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 1917 সালে করা হয়েছিল। সেখানেই মরুভূমিকে তারা সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের পর তাদের ফেলে যেতে বাধ্য করা হয়। কাজেই মাত্র দুটো প্রজন্ম যেতে না যেতেই জমিহারারা তাদের আদি বাসস্থান ফেলে চলে গেল।

পশ্চিম পাঞ্জাবের সুজলা জমি জায়গার পরিবর্তে এই উদ্বাস্তুরা পেলেন পূর্ব পাঞ্জাবের হতদরিদ্র কিছু অঞ্চল। তার ওপর আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেওয়া হয়। তারা অনেক কম পরিমাণে জমি পেলেন, কিন্তু যে উদ্যম আর উদ্ভাবন ছিল তার জন্য তারা প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তার পরিচয় দিয়ে তারা উঠে পড়ে লাগলেন। নতুন নতুন এলাকা তৈরী করেন, বানালেন নতুন নতুন বাড়ি। ১৯৫০ সালে লক্ষ্য করা গিয়েছিল এইসব এলাকা ক্রমশ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু হারানোর বেদনা তবু রয়ে গিয়েছিল। অর্থনীতিকে হয়তো নতুন করে গড়ে দেওয়া গেল কিন্তু দেশভাগের যে সংস্কৃতিক আঘাত তার ক্ষতি পূরণ হলো না। এ প্রসঙ্গে Urvashi Butalia 'The Other Side of Silence' গ্রন্থে দেশভাগ এবং উদ্বাস্তুদের মর্মান্তিক কাহিনী তয়ুলে ধরেছেন। উদ্বাস্তুরা অনেক নতুন অঞ্চল ফিরে পেয়েছিলেন কিন্তু তাদের অনেক ভালোবাসার উপাসনালয়গুলি কোনোদিন ফিরে পাননি।

যেমন লাহোরে 'Gurudwara Dera Sahib' (যেখানে শায়িত আছেন শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন এবং মহান যোদ্ধা নেতা রঞ্জিত সিংহ), 'নানকানা সাহিব' (গুরু নানকের জন্মস্থান) ইত্যাদি।

ভারতের বিভিন্ন শহরে উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৫০ সালে একজন সমাজতত্ত্ববিদ লক্ষ্য করেন যে, উদ্বাস্তুরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছেন। প্রায় সবার মুখেই এক অভিযোগ যে জিনিপত্র প্রয়োজনের তুলনায় কম। আর সর্বোপরি সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্যের অভাব। আমেদাবাদের উদ্বাস্তুরা বলেন যে, এখানে যেসব জিনিস দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানে সেগুলি তারা পাখিদের খাওয়াতো। এছাড়া তারা দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন এবং বিশেষ করে মুসলিমদের প্রত বিদ্বেষ পোষণ করেন। তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন তারা বলেন যে, আমাদের এই সরকারের অপদার্থগুলি এক জায়গায় জুটেছে। একমাত্র পণ্ডিত নেহেরু ভালো লোক। তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং যা বলেন তা করেন।

উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ভারতের তৃতীয় মহানগর কলকাতার চালচিত্র বদলে গিয়েছিল। দেশভাগের আগেই পূর্ব বাংলার সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলো তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে শুরু করেছিলেন। দেশভাগের পর মূলতঃ শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের লোকজন আস্তে লাগলেন। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার তফাৎ এই যে পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু স্রোত এসেছিল একটাই বিপুল তরঙ্গে, কিন্তু বাংলায় তা এল পরিব্যপ্ত হয়ে। ১৯৪৯-৫০-এর শীতকালে পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ফলে আরো অনেক হিন্দু সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসতে বাধ্য হন। পূর্বের বছরগুলিতে প্রায় চার লাখের মতো উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছিলেন। আর ১৯৫০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ১৭ লক্ষ্যে। যদিও অনেকেরই কিছু সুবিধা ছিল। তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে উঠেছেন, শহরের রেল স্টেশনগুলোতে আশ্রয় নিলেন। তাদের বাক্স-পেটরা বিছানাপত্র সম্বলিত ছবি প্রায়শই লক্ষ্য করা যেত। উদরাময়কে সঙ্গী করে পরিবারগুলি থাকত। নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করত। এছাড়া অনেকে থাক রাস্তায়-ফুটপাতের ধারে।

উক্ত কথাগুলি লিখেছিলেন 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার ভারত সংক্রান্ত সংবাদ দাতা। কিন্তু এই বর্ণনা পড়ে মনে হয় উদ্বাস্তুরা ততটা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। কারণ ১৯৪৮ এর গোড়াতে 'এক বিশাল সংখ্যক উদ্বাস্তু শিয়ালদহ স্টেশনে নিজেদের দুর্বিষহ অস্তিত্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে লেকের সামরিক ব্যারাক, মহীশূর ভবন এবং অন্যান্য অনেক বড় বড় ফাঁকা বাড়ি দখল করে নেয়। শাপুর, দুর্গাপুর, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড আর ধর্মতলার সামরিক ব্যারাকও দখল করে নেয় তারা। এইসব জনমানবহীন বাড়ীগুলি রাতারাতি উদ্বাস্তু পুরুষ, নারী ও শিশুতে ভরতি হয়ে যায়।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেক যেমন ফাঁকা বাড়ি দখল করে নিলেন ঠিক, তেমনি অন্যেরা আবার রাস্তার ধারে আর রেল লাইনের পাশের ফাঁকা জমিতে বসতি স্থাপন করলেন। শুধু তাই নয়, অনেকে আবার জঙ্গল আর জলা জমিতেও বসতি স্থাপন করলেন। এইসব জবর দখলকারীরা রাত্রিবেলা চুপি চুপি এইসব জমিতে ঢুকে পড়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চটপট ছাউনি খাটিয়ে ফেলত। তারপর আর সেই জায়গা ছাড়তে চাইতো না।

বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই উদ্বাস্তুদের বাধ্য করেছিল এইভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে পাঞ্জাবে যেমন ভারত থেকে পাকিস্তান অভিমুখে এক বিপুল সংখ্যক মানুষের নিষ্ক্রমণ ঘটেছিল, এখানে তেমনটা হয়নি। ফলে উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য এখানে ফাঁকা খেত খামার পড়ে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সরকার বিশ্বাস করতে ভালোবাসতো যে, এই উদ্বাস্তু স্রোত খুবই সাময়িক। অবস্থা শান্ত হলেই

এইসব হিন্দুরা পূর্ববাংলায় তাদের দেশের বাড়িতে আবার ফিরে যাবে। এই বিশ্বাসকে মদত জোগাত একটা ধারণা—যে কারণেই হোক বাঙ্গালীরা নাকি স্বভাবত পাঞ্জাবিদের তুলনায় কম সাম্প্রদায়িক। এখানে মুসলিমরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে একই ভাষায় কথা বলে, একই খাবার খায়, কাজেই তারা নাকি আগের মতই প্রতিবেশীর পরম আনন্দে দিন কাটিয়ে চলে যেতে সহজে রাজি হবে।

এই দ্বিতীয় যুক্তিটা তো উদ্বাস্তুরা নিজেরাই সবলে খারিজ করেন। যে জিনিসটাকে তারা ইসলামী রাষ্ট্র বলে উপলব্ধি করেছিলেন, সেখানে ফিরে যাওয়ার কোন বাসনা ছিল না তাদের। তারা তাদের এই ইচ্ছার সমর্থন পেয়ে গিয়েছিলেন ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকারের অভিমত-এর মধ্যে, যাকে অনেকেই এই প্রজন্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী বলে মনে করেন। ১৯৪৮ সালের ১৬ই আগস্ট উদ্বাস্তুদের এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন পূর্ব বাংলার হিন্দুদের এই অভিগমন চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে Huguenots দের পলায়ন-এর সঙ্গে তুলনীয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের কাছে সনির্বন্ধ আহ্বান রাখলেন যাতে তারা দেশ ছেড়ে চলে আসা এই উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করে একাত্ম করে নেন। এটা করলে তাদের সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পুষ্ট হয়ে উঠবে। এই ইতিহাসবিদ বলেন, 'ইহুদি শাসনাধীনে প্যালেস্টাইন যা হবে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যেন তাই হয়, যেন তা হয়ে ওঠে আঁধারে আলো, যেন তা মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার আর বাতিল ধর্মতাত্ত্বিক অন্ধতার মরুভূমিতে সভ্যতার এক মরুদ্যান হয়ে ওঠে'।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত হলো 'সারাবাংলা উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিষদ'। উদ্বাস্তুদের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নাগরিকতার অধিকার দাবি করে মিছিল আর বিক্ষোভ সংগঠিত হলো। আন্দোলনের নেতাদের লক্ষ্য ছিল দলে দলে উদ্বাস্তু নামিয়ে কলকাতার রাস্তা ছেয়ে ফেলা আর সরকারেদ্দর ওপর নিরন্তর চাপ বজায় রাখা। মিটিং, বিক্ষোভ, যানজট, স্রোতের মতো ধেয়ে আসা ইট পাটকেল, কাঁদানে গ্যাসের শেল আর লাঠি, ট্রাম পোড়ানো আর মাঝে মাঝে গুলি চালানা — এইসবই হয়ে উঠল এই শহরের বিশেষ চিহ্ন।

সর্বত্রই উদ্বাস্তুরা এমন সব শক্তির ঠেলায় গৃহহারা হয় যার উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে সর্বত্রই তাদের চরমপন্থী আন্দোলনের খোরাক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। দিল্লি আর পাঞ্জাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো চরমপন্থী হিন্দু সংগঠন খুব দ্রুত এই গৃহহারাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলাতেও আরএসএস-এর সঙ্গী সংস্থা হিন্দু মহাসভা উঠে পড়ে লাগল যাতে এই সমস্যাটাকে একটা ধর্মীয় রঙে রাঙিয়ে দেওয়া যায়।

তারা বলল, 'ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে বাঙালি হিন্দুদের বলির পাঁঠা করা হয়েছে।' যে সরকার এই উদ্বাস্তুদের পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে বলে তারা তোষণপন্থার দোষে দোষী। তারা গণহত্যাকে মদত দিচ্ছে। সরকার চাইছিল উদ্বাস্তুরা নত হোক, আর উদ্বাস্তুরা চাইছিলেন 'পুরুষোচিত শক্তির কড়া দাওয়াই। ১৯৫০ সালে একজন হিন্দু ক্রুদ্ধ ভাষায় লিখেছিলেন, 'একান্তভাবে কামনা করি, এদের মধ্য থেকে একজন শিবাজী বা একজন রানা প্রতাপের উদয় হোক'।

মধ্যযুগে যেসব হিন্দু যোদ্ধা মুসলমান রাজাদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তাদের নাম নিয় এইভাবে ..... ব্যাপারটা দিল্লিতে আর পাঞ্জাবে বেশ কাজে দিয়েছিল। বাংলায় কিন্তু কমিউনিস্টরাই উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করার কাজে সবচেয়ে সফল হয়। তারাই সরকারি কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে মিছিল সংগঠিত করত। কলকাতার পতিত জমি

জবরদখল করার কাজটাকে তারাই সমন্বিত করেছিল। ওইসব জমির ওপর 'সংগঠিত শক্তি আর চরম প্রয়োজন ছাড়া আর কোন অধিকার ছিল না উদ্বাস্তুদের। এইভাবে শহরের বিভিন্ন অংশে গড়ে উঠল অসংখ্য বসতি। পূর্ব বাংলার ধাঁচে ঘর, টালি কিংবা করগেটেড শিট দিয়ে ছাওয়া, চট আর বাঁশে ঘেরা, মাটির মেঝেওয়ালা ঘরে ছেয়ে গেল বসতিগুলো।

১৯৫০ এর গোড়ায় এইসব জবরদখল কলোনিতে প্রায় 2 লক্ষ উদ্বাস্তু বাস করতেন। কোনরকম রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকেই এরা নিজেদের উদ্যোগে কমিটি তৈরি করে নিলেন, কলোনিগুলো চালানোর নিয়ম কানুন রচনা করলেন এবং এক বিশাল ঐক্যবদ্ধ সংস্থার অঙ্গ হিসেবে নিজেদের সংগঠিত করলেন। 'দক্ষিণ কলিকাতা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি' নামক একটি সংস্থা জানায় যে তারা কয়েক হাজার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। নিজ নিজ কলোনিতে এইসব পরিবার সব মিলিয়ে পাঁচশো মাইল রাস্তা বানিয়েছে, ৭০০ নলকূপ বসিয়েছে, উচ্চ বিদ্যালয় আর ১০০টা প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছে। সন্তটাই করেছে নিজেদের খরচে এবং সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে। কমিটির দাবি সরকার এইসব কলোনিগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা পৌরসভার অধীনে এনে আইন সম্মত স্বীকৃতি দিক, ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিখণ্ড আর স্কুলবাড়ীগুলিকে অনুরূপ নিয়মানুগ স্বীকৃতি দিক, বাজার গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করুক আর ঋণ দিক।

এই উদ্বাস্তুদের হয়ে যারা কথা বলতেন, তারা কেবলই এই অভিযোগ করতেন যে পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বাঙালি সমাজকর্মীদের একটি দল উত্তর ভারত ঘুরে এসে জানান যে সেখানকার শিবিরগুলোর মান অনেক উঁচু, বাড়িগুলো পাকা, কলের জল আছে, উপযুক্ত শৌচব্যবস্থা আছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুদের পচা বাঁশের কুঁড়েতে কোনও মতে থাকতে হচ্ছে। সকলেই জানে, সেখানে না আছে কোন আব্রু, না আছে এতোটুকু রান্নার জায়গা। আর্থিক অনুদান আর জামাকাপড়ের সাহায্যও উত্তর ভারতে অনেক উন্নত।

সব মিলিয়ে পাঞ্জাবে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটা অনেক কম কষ্টদায়ক ছিল। ১৯৫০-এর দশকের গোড়াতেই উত্তরের উদ্বাস্তুরা নতুন বাসস্থান নতুন কাজ পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বে এক অনিশ্চয়তা টিকে ছিল। একজন সাংবাদিক ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে লেখেন যে, যতদিন বাঙালী উদ্বাস্তুরা অব্যবস্থিত আর বেকার থ?াকবেন, ততদিন অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক অসন্তোষ বাড়তেই থাকবে আর কমিউনিস্টরা তারে সেই ক্ষোভকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, দেশভাগের বড় শিকার হয়েছেন হিন্দু, শিখ মুসলিম তথা অন্যান্য জাতির মহিলারা। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসি রাজনীতিবিদ রচৈতরাম গিদোয়ানি বলেন, 'কোন যুদ্ধে কখনও মেয়েরা এত দুঃখ ভোগ করেনি'। মেয়েদের খুন করে, অঙ্গহানি করে, অত্যাচার করে ফেলে চলে যাওয়া হতো। স্বাধীনতার পর দিল্লি আর বোম্বাইয়ের গণিকালয়গুলি এইসব মেয়েদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অন্যলোকে তাদের উপর যা করেছে তার পরিণামে তাদের পরিবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক Stasa Jakovitch দেশ ভাগের প্রেক্ষাপটে নারীদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গে বলেন যে, 'the women womb became occupied territory'.

১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে পাঞ্জাবের দাঙ্গা যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন ওই প্রদেশের পূর্ব প্রান্তে হিন্দু আর শিখরা মুসলিম মেয়েদের ধরে এনে রেখে দিতেন। অন্যপক্ষও এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকত না

— মুসলিম পুরুষেরা হিন্দু আর শিখ মেয়েদের অপহরণ করত। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস হয়ে গেলে ভারত পাকিস্তান উভয় দেশেরই সরকার এইসব 'অধিকৃত' মেয়েদের নিজ নিজ পরিবারে ফিরিয়ে দিতে রাজি হল।

ভারতের দিকে এই অপহৃতা মেয়েদের খুঁজে বার করার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মৃদুলা সারাভাই আর রামেশ্বরী নেহেরু। উভয়েই অভিজাত পরিবারের সন্তান, উভয়েরই জাতীয়তাবাদী পরিচয় খুব সুদৃঢ়। জওহরলাল নেহেরু এদের কাজকে উৎসাহ ও মদত দিলেন। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে একটি বেতার বক্তৃতায় নেহেরু বার্তা রাখেন বিশেষ করে সেই সব মহিলাদের প্রতি যারা এই সমস্ত দুর্বিষহ যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'তারা যেন ঘুণাক্ষরেও না ভাবেন যে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সামান্যতম কোন দ্বিধা আছে, কিংবা তাদের সতীত্ব নিয়ে আমাদের এতটুকু সংশয় আছে। আমরা তাদের সস্নেহে ফিরিয়ে আনতে চই কারণ তারা তো কোন অন্যায় করেননি, তাদের গায়ের জোরে অপহরণ করা হয়েছিল। তাই আমরা সসম্মানে ভালোবেসে তাদের আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চাই। তারা যে তাদের পরিবারের মধ্যে আবার ফিরে আসবেন, তারা যে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য পাবেন, তা নিয়ে তাদের মনে যেন এতটুকু সংশয় না থাকে।

একজন একজন করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে এইসব অপহৃতা মেয়েদের খুঁজে বার করা হয়. এই রকম একজন কারও সন্ধান পেলে সন্ধের পর যখন পুরুষেরা সবাই ক্ষেতের কাজ থেকে ফিরে এসেছে, তখন সেই গ্রামে ঢুকত পুলিশ। একজন সংবাদদাতা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত সেই অপহরণকারীর বাড়িতে। অপরাধী সাধারণত স্বীকার করতেন না যে তার কাছে যে স্ত্রীলোকটি আছেন তাকে ধরে আনা হয়েছিল। আর সেই আপত্তিকে নস্যাৎ করার পর — অনেক সময় বলপ্রয়োগ করে — মহিলাটিকে উদ্ধার করা হতো। প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হতো একটি সরকারি শিবিরে। তারপর সীমান্ত পেরিয়ে নিয়ে আসা হতো।

১৯৪৮ সালের মে মাসের মধ্যে এরকম ১২৫০০ মেয়েকে খুঁজে বার করে যার যার পরিবারর ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চরম দুঃখ আর বেদনার কথা এই যে, এদের মধ্যে অনেক মেয়েই আদৌ উদ্ধার হতে চাইতেন না। কেননা অপহৃত হবার পর তারা নতুন পরিবেশের সঙ্গে একরকম করে শান্তিতে মানিয়ে নিয়েছিলেন। উদ্ধার হয়ে ফিরে আসবার পর পুরোনো পরিবারে তাদের স্থানটা কেমন হয়ে দাঁড়াবে সে ব্যাপারে তাদের মনে ঘোর সংশয় ছিল। তার উপর ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে যে অনেকেই অবাঞ্ছিত গর্ভের শিকার হয়েছিলেন। তারা জানতেন যে তাদের যদি বা গ্রহণ করা হয় তাদের সন্তানদের সহজভাবে গ্রহণ করা হবে না। ফলে অনেক সময় পুলিশ ও তার সহকারিদের গায়ের জোরে ওই মেয়েদের ফিরিয়ে আনতে হত।

দেশ ভাগের পরের প্রথম নয় বছরেই পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে চলে এসেছিলেন ২১ লক্ষেরও বেশী মানুষ। সেই সব বাঙালি উদ্বাস্তুদের অনেকেরই দীর্ঘ জীবনসংগ্রাম শেষ হয়েছে এতগুলো দশকে। তবে ছেড়ে আসা দেশের কথা এত বছর পরেও মনে পড়ে তাঁদের। যদিও সেই সব উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর পরবর্তী প্রজন্ম এই সাত দশকে হয়ে উঠেছে পুরোপুরি ভারতীয়ই।

ভারত আর পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার ঠিক দু'দিন পরে যে র‍্যাডক্লিফ লাইন টেনে উপমহাদেশের মানচিত্র চিরতরে পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল — তাতে একদিকে যেমন কোটি কোটি মানুষ নিজের দেশ পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে কয়েক লক্ষ মানুষকে হারাতে হয়েছিল নিজের দেশ, নিজের ভিটেমাটি।

স্বাধীনতার ৭০ বছরের উৎসব পালন করছেন দেশের কোটি কোটি মানুষ, যে উৎসবে শামিল সেইসব কয়েক লক্ষ পরিবারও। যাদের কাছে এটা দেশ ছেড়ে চলে আসার, ছিন্নমূল হওয়ারও সাত দশক।

এতগুলো বছর পেরিয়ে পূর্ববঙ্গ বা তারপরে পূর্ব পাকিস্তানের নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসেছিল যেসব হিন্দু পরিবার, তারা এখন পুরোপুরি ভারতীয়ই হয়ে গেছেন।

কিন্তু প্রথম প্রজন্মের উদ্বাস্তুদের অনেকেরই এখনও ছবির মতো মনে রয়ে গেছে ছেড়ে আসা দেশের কথা, ভিটের কথা।

''অহনও রাত্রে স্বপ্ন দ্যাহি দ্যাশের বাড়ির। নদীরে তো দ্যাশে গাঙ কইত। আমরা গাঙ্গে স্নান করতে যাইতাম। কও কিসু মনে পড়ে, হায় কপাল,'' বলছিলেন এক বৃদ্ধা।

দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা, ফরিদপুর থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু শান্তিরঞ্জন গুহর কথায়, ''দেশের চার বিখা জমিতে চারটা ঘর, দুইটা পুকুর ছিল। একটা চাইর পাড় বান্ধানো। গ্রামে কারও বিয়া-শাদি হইল ওই পুকুর থিক্যা মাছ নিয়া যাইত। আর অন্য পুকুরটা নদীর সঙ্গে জোড়া ছিল—কও রকমের যে মাছ সেখানে!''

ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে যাবার জন্য যে ত্রিশটি বিশেষ ট্রেন সার্ভিস ছিল এটি তারই একটি।

৭০ বছর আগে যেসময়ে সারা ভারতে চলছে স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ-উদ্দীপনা, সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের নানা জেলায় শুরু হয়েছিল অনিশ্চয়তা আর অশান্তি।

সেই সময়ের কথা বলছিলেন ময়মনসিংহের কিশোর ছাত্র—এখন কলকাতার প্রবীণ বাসিন্দা পবিত্র চক্রবর্তী।

''তখন সবে পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে। কথাবার্তা শুনতাম নতুন দেশে বাইরে থেকে লোকজন আসবে, থাকবে। কী হবে না হবে, পড়াশোনা ঠিকমতো করা যাবে কী না, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তখনই বাবা সিদ্ধান্ত

নিলেন যে মামাদের সঙ্গে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। পরীক্ষা দিতেই এসেছিলাম প্রথমে। কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরে গিয়েছিলাম। তারপরেই দেশ থেকে চলে আসি কলকাতায়," বলছিলেন মি. চক্রবর্তী।

অশান্তির আগুন যখন ছড়িয়ে পড়ছে পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায়, তখন চরভৈরবী বন্দরে পারিবারিক ব্যবসা ছিল নিত্যানন্দ পালের বাবা-দাদাদের। একদিন রাতে হঠাৎই তাঁদের ভিটে ছাড়তে হয়।

''দাদারা ঘাসিনৌকা করে মরিচ বিক্রী করতে গিয়েছিল নোয়াখালির দিকে রামপুরে। সেখানেই তারা শুনতে পায় যে বাইরে থেকে আসা মুসলমানরা একজন স্থানীয় জমিদারের ভিটে আক্রমণ করেছে। পালিয়ে চলে এসে বাবাকে ঘটনাটা জানায়"— বলেন নিত্যানন্দ পাল।

''রাতারাতি নৌকা ঠিক করে বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম বাজাপ্তিতে এক আত্মীয়র বাড়িতে। সেখান থেকে নিজেদের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে যখন যাচ্ছিলাম নৌকায়। গ্রামে ঢোকার মুখে দেখি কুমোরপাড়ার লোকেরা গরম জল, মরিচ নিয়ে পাহারা দিচ্ছে, যাতে আক্রমণ করলে বাধা দেওয়া যায়।"

''সেটা ছিল দূর্গাপূজার ঠিক আগে। তবে আক্রমণটা হল লক্ষীপূজোর দিন। বাইরে থেকে আসা কিছু মুসলমান গ্রামের সব কলাগাছ কেটে দিয়েছিল যাতে আমরা পুজো না করতে পারি। বেতবনে সবাই লুকিয়ে পড়েছিলাম আমরা। দাদারা রামদাও হাতে পাহারা দিচ্ছিল," বলছিলেন নিত্যানন্দ পাল।

নতুন গড়ে ওঠা সীমান্ত পেরিয়ে সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতে আসার পরে বেশিরভাগেরই ঠাঁই হয়েছিল কলকাতার শিয়ালদা স্টেশনে। শিয়ালদা স্টেশন থেকে কেউ চলে যেতেন আত্মীয়-স্বজনের বাসায়, কেউ জায়গা খুঁজতে বের হতেন কলকাতার উপকণ্ঠে জমি জবরদখল করে গড়ে ওঠা রিফিউজি কলোনিগুলিতে।

এখন যেখানে দক্ষিণ কলকাতার অতি ব্যস্ত গাঙ্গুলি বাগানের বিদ্যাসাগর কলোনী এলাকা, সেখানেই মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম থেকে আসা ১৮-১৯ বছরের কিশোর তেজেন্দ্রলাল দত্ত।

তাঁর কথায়, ''লোকমুখে খবর পেয়েছিলাম এইদিকে নতুন নতুন কলোনি তৈরি হচ্ছে। খোঁজ করতে একদিন একাই চলে আসি। মা বলে দিয়েছিল বড় রাস্তার ধারে যেন জমি না নিই- বাচ্চারা খেলাধুলো করতে রাস্তায় চলে গেলে গাড়ি চাপা পড়বে—এমনটাই ধারণা ছিল মায়ের। তাই রাস্তা থেকে কিছুটা হেঁটে ভেতরে এসে একটা জায়গা দেখেছিলাম। চারদিকে ডোবা, জলা-জঙ্গল। আমার এই বাড়ির পাশে অনেকটা ধানি জমি ছিল" বলছিলেন মিঃ দত্ত।

''রাস্তার দিকে কয়েকটা ঘর তৈরি হয়েছিল। আমি আর দাদাও ঘর করলাম— গরাণের খুঁটি, হোগলা পাতার চাটাই দিয়ে বেড়া আর ছাউনি। মেঝে মাটির। নিজেরাই জঙ্গল কেটে সাফ করেছিলাম। তারপরে কলোনি কমিটি হল। কোথা দিয়ে রাস্তা হবে, কোন জমি কাকে দেওয়া হবে, সব ঠিক হতে লাগল। এখন তো চারদিকে কংক্রিটের জঙ্গল। বোঝার উপায় নেই কী ছিল এইসব জায়গা।"

যাঁদের কোথাও যাওয়ার নেই, সেরকম উদ্বাস্তুদের ট্রাকে করে পাঠানো হতো বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরগুলিতে। সপরিবারে থাকার জন্য যেমন তৈরি হয়েছিল নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্প বা ধুবলিয়ার মতো বহু শিবির, তেমনই একাকী নারী আর তাঁদের শিশু সন্তানদের জন্য ছিল আলাদা শিবির।

সরকারিভাবে এঁদের চিহ্নিত করা হয়েছিল পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি বা পিএল হিসাবে। এখনও পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন ৪৮১ জন পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি—যাঁদের ৭০ বছর ধরেই মাসোহারা, চাল-ডাল-গম র পরণের ধুতি বা শাড়ি দেয় সরকার।

মহিলাদের জন্য হুগলী জেলয় গঙ্গার ধার ঘেঁষে এরকমই একটি পিএল শিবিরে একটা সময়ে প্রায় ১৮ হাজার নারী ও শিশু বাস করতেন।

ভগ্নপ্রায় ব্যারাক ঘরে এখনও থাকেন কানুমতী বর্মন, শোভা বৈরাগীদেরহ মতো কয়েকজন অশীতিপর, একাকী উদ্বাস্তু নারী।

ভগ্নপ্রায় উদ্বাস্তু শিবির

দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষদের ওপরে গবেষণা করেন অনসূয়া বসু রায় চৌধুরী। তাঁর মতে ‘‘সরকারি নথিতে কোথাও উল্লেখ থাকত না। কিন্তু কারা উচ্চবর্ণের মানুষ, কারা তথাকথিত নিম্নবর্গের, সেটা বোঝার একটা উপায় ছিল। সীমান পেরনোর সয়ে একটা লগবুকে প্রত্যেক রিফিউজিকে নাম-ধামের সঙ্গেই পেশা লিখতে হতো।’’

‘‘যখনই কৃষিকাজকে পেশা হিসাবে লেখা হচ্ছে, তখনই বোঝা যেত যে তিনি নিম্নবর্গের মানুষ। সীমানা থেকে তারপরে যখন শিয়ালদা স্টেশনে মানুষ আসতেন, সেখানে তিন ধরনের কার্ড দেওয়া হতো-একটা সাদা, একটা নীল আরেকটা সবুজ’’ বলছিলেন মিসেস বসু রায় চৌধুরী।

‘‘সাদা কার্ড সেইসব পরিবারকে দেওয়া হতো যাঁরা উচ্চবিত্ত, পুনর্বাসনের জন্য যাঁদের সরকারি সাহায্য লাগবে না— এমন মানুষদের। আরেক দল ছিলেন, যাঁদের সরকার মনে করতো কিছুদিন পর্যন্ত সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। আর শেষ দলে ছিলেন কৃষকরা। এঁদের কোনও সহায়-সম্বল নেই-সরকারকেই পুরোপুরি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।’’

''এঁদের মধ্যে সহায়হীন একাকী নারীদের মতো অনেককে পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি বলা হলো। আর আরেক ধরনের শিবির করা হলো—ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প। সেখানে কর্মঠ পুরুষ আছেন, এমন পরিবারগুলোকে পাঠানো হতে থাকলো—যাতে তাঁদের দিয়ে কায়িক পরিশ্রমের বদলে সরকার টাকা দেবে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের নানা বাঁধ, জলাধার, কলকাতার বাগজোলা কাল এসব ওইভাবে তৈরি হয়েছে।''

রিফিউজি কলোনি বা শরণার্থী শিবিরগুলির পত্তনের পরে কেটে গেছে অনেকগুলো দশক।

একসময়ের হোগলা বন আর জলাজঙ্গলে ভরা কলোনিগুলো এখন দেখলে বোঝার উপায় নেই যে একসময়ে কী ছিল জায়গাগুলো।

বেড়ার ঘর হাতে গুনে এক আধটা, কাঁচা রাস্তার বদলে পিচ ঢালা চওড়া রাস্তা— দিনরাত সেখানে হাজারো গাড়ির হর্ণ, হ্যরিকেন আর কুপির আলোর দিন শেষ— ঝলমল করছে আলোয়।

এলাকার নাম থেকে বাদ পড়েছে কলোনি শব্দটা।

নতুন দেশে এসে কীভাবে মিশে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর, সেই প্রক্রিয়ার সাক্ষী থেকেছেন দক্ষিণ কলকাতার বিবেকনগর কলোনি এলাকার বাসিন্দা, দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙাল মোহিত রায়।

''আমরা যে ভারতেরই অংশ, সেটা প্রমাণ করার জন্য স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস-এগুলো খুব ঘটা করে পালন করা হতো আমাদের ছোটবেলায়। প্রভাতফেরী হতো, প্রতিটা কলোনিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মৃতিতে বেদী তৈরি হতো।''

''আরেকটা ফ্যাক্টর কাজ করেছে এই নতুন সমাজে মিশে যাওয়ার পেছনে— সেটা হলো পড়াশোনা। প্রতিটা কলোনিতে দেখবেন অন্তত দুটো স্কুল ছিল। আমাদের তো পড়াশোনা করা ছাড়া জীবন সংগ্রামে জেতার অন্য কোনও উপায় ছিল না!''

''তাই কলোনিগুলোর ১০০ শতাংশ মানুষই কিন্তু শিক্ষিত। সেটা দিয়ে আমরা কাজকর্ম করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, তাই এখন আমরা এলাকার নাম থেকে কলোনি শব্দটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। এখন যেন এটা কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলের মতোই একটা জায়গা'' বলছিলেন মোহিত রায়।

তথ্যসূত্র ঃ 1. https://www.bbc.com/bengali/news-40884244

2. 'India After Gandhi'---Ramchandra Guha

আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। তুমি কি মনে কর যে স্বাধীনোত্তর ভারতের সামনে শরণার্থী সমস্যা একটি গভীর সমস্যা ছিল?

২। স্বাধীনোত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রেক্ষাপটে নারীদের উপর সংঘটিত বর্বর অত্যাচারের প্রকৃতি আলোচনা কর?

Block / পর্যায় - ৫

Development of Education – Rural and Urban

একক—১১, ১২, ১৩

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অথবা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে থাকে। বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও বিদ্যালয় পরিচালনা করে। প্রধানত বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত, তবে সাঁওতালি, নেপালি, হিন্দি ও উর্দুভাষাতে পঠনপাঠন করার সুযোগ এ-রাজ্যে অপ্রতুল্য নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অথবা কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সিবিএসসি) অথবা কাউন্সিল ফর ইণ্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট একজামিনেশন (আইসিএসই) দ্বারা অনুমোদিত। ১০+২+ ৩ পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ছাত্রছাত্রীদের দুই বছরের জন্য প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় জুনিয়র কলেজে পড়াশোনা করতে হয়। এছাড়াও তারা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অথবা কোনো কেন্দ্রীয় বোর্ড অনুমোদিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েও প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করতে পারে। এই ব্যবস্থায় তাদের কলাবিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ অথবা বিজ্ঞানবিভাগের যেকোনো একটি ধারা নির্বাচন করে নিতে হয়। এই পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করার পরই তারা সাধারণ বা পেশাদার স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করতে পারে।

২০০৬ সালের হিসেব অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আঠারো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম ও অন্যতম বৃহৎ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে প্রায় ২০০টি কলেজ। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, শিবপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের দুটি প্রসিদ্ধ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। শান্তিনিকেতনে অবস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন এক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়(বর্ধমান), বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় (বাঁকুড়া), বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (মেদিনীপুর), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (রাজা রামমোহনপুর, শিলিগুড়ি), বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (কল্যাণী, নদিয়া), পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎসবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ বিশ্ববিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়—আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিসম্পন্ন রাজ্যের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হল ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়গপুর, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট, কলকাতা, রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তিক প্রতিষ্ঠান, দূর্গাপুর (পূর্বতন আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস, ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও অনুসন্ধান সংস্থান, কলকাতা IISER-K ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউশন।

- ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী সংবিধানের ২১ক অনুচ্ছেদে এ কথা বলা হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই শিক্ষার অধিকার আইন প্রয়োগ করা হবে।

- সরকারি স্কুলগুলি প্রতিটি শিশুকে বিনামূল্যে শিক্ষা দেবে এবং স্কুল পরিচালন কমিটি দ্বারা স্কুলগুলি পরিচালিত হবে। বেসরকারি স্কুলগুলি মোট পড়ুয়ার অন্তত ২৫% শিশুকে বিনামূল্যে ভর্তি করবে।
- গুণমানসহ বুনিয়াদি শিক্ষার সমস্ত দিকে নজরদারি চালাতে বুনিয়াদি শিক্ষার জাতীয় কমিশন (ন্যাশনাল কমিশন ফর ইলিমেণ্টারি এডুকেশন) তৈরি করা হবে।

শিক্ষার অধিকার আইন (আরটিই), ২০০৯ -এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের ৬-১৪ বছর বয়সি সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা। বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার আগে কোনও শিশুকে ফেল করানো, বহিষ্কার করা বা কোনও বোর্ডের পরীক্ষায় পাস করতে বাধ্য করা যাবে না।

যদি ৬ বছরের বেশি বয়সি কোনও শিশু স্কুলে ভর্তি না হয়ে থাকে বা তার বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, তা হলে তাকে তার বয়সের উপযোগী শ্রেণিতে ভির্ত করাতে হবে। যদি কোনও শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী কোনও শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়, তা হলে সে যাতে অন্যদের সঙ্গে একই মানে পৌঁছতে পারে, সে জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বুনিয়াদি শিক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে ভর্তি হওয়া প্রতিটি শিশু বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা পাবে, এমনকী তার বয়স যদি ১৪ বছর পেরিয়ে যায় তা হলেও।

ভর্তির জন্য বয়সের প্রমাণপত্র ঃ বুনিয়াদি শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে শিশুর বয়স তার জন্মের শংসাপত্র অনুযায়ী নির্ণিত হবে। এই শংসাপত্র জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৫৬ বা নির্দেশিত অন্য কোনও নথি দ্বারা প্রমাণিত হলেই হবে। শুধুমাত্র বয়সের শংসাপত্রের অভাবে কোনও শিশুর স্কুলে ভর্তি আটকানো যাবে না।

যে শিশু বুনিয়াদি শিক্ষা শেষ করবে তাকে শংসাপত্র দিতে হবে।

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নির্দিষ্ট করার বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রতিটি বেসরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে অর্থনৈতির ভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্য ২৫ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

শিক্ষার গুণমানের উন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ বছরের মধ্যে যথাযথ পেশাদার ডিগ্রি অর্জন করতে না পারলে শিক্ষকদের চাকরি যাবে।

প্রতি তিন বছরের মধ্যে স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হবে (যেখানে সমস্যা আছে)। তা না হলে স্কুলের অনুমোদন বাতিল করা হবে।

অর্থনৈতিক দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভাগাভাগি করে বহন করবে। এই আইন পশ্চিমবঙ্গেও কার্যকর করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

■ গণমাধ্যম

২০০৫ সালের হিসেব অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ (ভারতীয় বঙ্গ) থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৫০৫। এগুলির মধ্যে ৩৮৯ টি বাংলা সংবাদপত্র। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আনন্দবাজার পত্রিকা* ভারতে একক-সংস্করণে সর্বাধিক বিক্রিত বাংলা পত্রিকা। এই পত্রিকার দৈনিক গড় বিক্রির পরিমাণ ১,২৩৪,১২২টি কপি। অন্যান্য

উল্লেখযোগ্য বাংলা সংবাদগুলি হল আজকাল, বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, জাগো বাংলা, দৈনিক স্টেটসম্যানও গণশক্তি দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য স্টেটসম্যান, এশিয়ান এজ, হিন্দুস্তান টাইমস ও দ্য টাইমস অফ ইণ্ডিয়াকয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইংরেজি দৈনিকের নাম। এছাড়াও হিন্দি, গুজরাটি, এড়িয়া, উর্দু ও নেপালি ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে।

দূরদর্শন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি টেলিভিশন সম্প্রচারক। এছাড়া কেবল টেলিভিশনের মাধ্যমে মাল্টিসিস্টেম অপারেটরগণ বাংলা, নেপালি, হিন্দি, ইংরেজি সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চ্যানেল সম্প্রচার করে থাকেন। বাংলা ভাষায় সম্প্রচারিত ২৪ ঘণ্টার বাংলা টেলিভিশন সংবাদ-চ্যানেলগুলি হল স্টার আনন্দ, কলকাতা টিভি, ২৪ ঘণ্টা, এনই বাংলা, নিউজ টাইম, চ্যানেল টেন, আর-প্লাস ও তারা নিউজ, ২৪ ঘণ্টার টেলিভিশন বিনোদন-চ্যানেলগুলি হল স্টার জলসা, ইটিভি বাংলা, জি বাংলা, আকাশ বাংলা ইত্যাদি। এছাড়া চ্যানেল এইট টকিজ নামে একটি ২৪ ঘণ্টার চলচ্চিত্র-চ্যানেল এবং তারা মিউজিক ও সঙ্গীত বাংলা নামে দুটি উল্লেখনীয় ২৪ ঘণ্টার সংগীত চ্যানেলও দৃষ্ট হয়। আকাশবাণীপশ্চিমবঙ্গের সরকারি বেতার কেন্দ্র। বেসরকারি এফএম স্টেশন কেবলমাত্র কলকাতা, শিলিগুড়ি ও আসানসোল শহরেই দেখা যায়। বিএস এন এল, ইউনিনর, টাটা ডোকোমো, আইডিয়া সেলুলার, রিলায়েন্স ইনফোকম, টাটা ইণ্ডিকম, Jio 4G রিলায়েন্স জি 4জি, ভোডাফোন এসার, এয়ারসেল ও এয়ারটেল সেলুলার ফোন পরিষেবা দিয়ে থাকে। সরকারি সংস্থা বিএসএনএল ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে ব্রডব্যাণ্ড ও ডায়াল -আপ অ্যাকসেস ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া যায়।

১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিভাগ স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংসদ একটি স্বশাসিত সংস্থা যেটি সমিতি আইন দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত এবং এই বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন, যা সর্বভারতীয় আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুসারে এই বিভাগের কার্যাবলী সাবলীল ভাবে পরিচালনা করার জন্য। এই বিভাগ বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদদের সহায়তায় নিজের কার্যাবলী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত করেছে।

গত দু-দশক ধরে এই বিভাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে উৎসাহ প্রদানের জন্য বহু কঠিন পথ অতিক্রম করেছে এবং বিভিন্ন নামী বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র, কলেজ এবং নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক প্রকল্পের উন্নতিসাধনের পথে সহায়তা প্রদান করেছে।

এই বিভাগের 'রিমোট সেনসিং এণ্ড জিও-ইনফরমেশন সিস্টেমস'—এর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থার পরিকল্পনাগুলির উন্নতি সাধন এবং কলাকৌশলের নজরদারির জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং মূল তথ্যের সরবরাহ করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ক্ষেত্রের কিছু প্রকল্প ভারত সরকারের ''ন্যাশনাল রিমোট সেনসিং সেন্টার এবং ইন্ডিয়ান স্পেশ রিসার্চ অরগানাইজেশন'এর সঙ্গে অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই রাজ্যের বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার সঙ্গে অংশীদার হিসাবে এই বিভাগ বিভিন্ন জরুরী ক্ষেত্র যেমন বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও আবহাওয়া পরিবর্তন, সবুজ প্রযুক্তি, জল সংরক্ষণ, বর্জ্য পদার্থের পরিশোধন, জীব বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনী গ্রামীণ প্রযুক্তি, কৃষি উন্নয়ন, মেধাসত্ব অধিকার, প্রসঙ্গে সেমিনার, কর্মশালা এবং সচেতনতা প্রকল্পগুলির উদ্যোগে সহায়তা দেয়।

২০০৬-২০০৭ সালে জৈবপ্রযুক্তির বিভাগ খোলার ফলে পশ্চিমবঙ্গে 'স্টক অফ আর্ট' ও প্রথাগত জৈবপ্রযুক্তির উন্নয়নে নতুন জোয়ার এলো যার লক্ষ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বিভাগের লক্ষ জৈবপ্রযুক্তির উন্নতির বিপনন, পরিপোষণ এবং আরো যা গুরত্বপূর্ণ সৌন্দর্যসাধন করা। যেহেতু জৈবপ্রযুক্তি একটি জ্ঞান-নির্ভর কেন্দ্র, যেখানে উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে 'গবেষণা ও উদ্ভাবনের' ওপর নির্ভরশীল, সেই কারণে এই বিভাগ সক্রিয়ভাবে গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা করে, উন্নত মানব সম্পদে প্রেরণা যোগায় এবং জৈবপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা যোগায়। কৃষি, স্বাস্থ্যপরিষেবা, পশু বিজ্ঞান, পরিবেশ এবং শিক্ষা-শিল্প মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদিতে জৈবপ্রযুক্তির বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে এই বিভাগ উল্লেখযোগ্য কাজ করে।

অ্যাসোচাম (অ্যাসোসিটেড চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ড্রাস্টি অব ইণ্ডিয়া) পশ্চিমবঙ্গকে সম্ভবনাময় বাণিজ্য বিকাশ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে জৈবপ্রযুক্তি হচ্ছে সম্ভাবনাময় লগ্নির ক্ষেত্র। বিনিয়োগের আকর্ষণীয় ফেরত ও এবং সামাজিক বিকাশের বড় সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি ভিত্তিক কাজকর্মকে আরো ছড়িয়ে দেওয়া যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা (জেনোমিকস, প্রোটিওমিকস, ডায়গোনসটিকস, দেশীয় ঔষধটির ডি. এন. এ ফিংগারপ্রিণ্টিং ইত্যাদি) কৃষি (ফুল চাষ, রেশন চাষ ইত্যাদি), বাংলার জীববৈচিত্রের মানচিত্র তৈরি এবং পরিবেশ সুরক্ষা।

Block / পর্যায় - ৬

Culture

সংস্কৃতি

বিন্যাসক্রম

৮.৬.১৪.০ : উদ্দেশ্য

৮.৬.১৪.১ : স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চা

৮.৬.১৪.২ : বিনোদনমূলক কার্যকলাপ

৮.৬.১৫.৩ : বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

৮.৬.১৫.৪ : চলচ্চিত্র

৮.৬.১৬.৫ : ক্রীড়া

৮.৬.১৬.৬ : উপসংহার

৮.৬.১৬.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.৬.১৬.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৮.৬.১৪.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস তুলে ধরা। তার মধে যেমন পড়বে সাহিত্য, তেমনি শিল্পকর্ম এবং তার সঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের ইতিহাস উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি অঙ্গরাজ্যরূপে পশ্চিমবঙ্গের বিকাশ তুলে ধরা হচ্ছে।

৮.৬.১৪.১ : স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চা

পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘকালীন। চর্যাপদের সময় থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অনেক গুণী সাহিত্যিক বাংলাসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি, বরং তা আরও নতুন দিশা লাভ করেছিল। এই আলোচনাতে আমরা স্বাধীন পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক বিকাশ উল্লেখ করতে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করব। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা এই সময়ের সাহিত্যে ফুটে ওঠে।

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ দোঁহা-সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন ও

মধ্যযুগীর বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও বাংলার লৌকিক ধর্মবিস্বাসগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সময়কার বাংলা সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাখত পদাবলী, বৈষ্ণব সন্তজীবনী, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, রীপসাহিত্য, নাথসাহিত্য, বাউল পদাবলী এবং ইসলামি ধর্মসীহিত্য ছিল এই সাহিত্যের মূল বিষয়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের যুগে কলকাতা শহরকে কেনদ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই সময় থেকে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর বদলে মানুষ, মানবতাবাদ ও মানব-মনস্তত্ব বাংলা সাহিত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বাংলা সাহিত্যও দুটি ধারায় বিভক্ত হয় ঃ কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্থান-বাংলাদেশের সাহিত্য। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্যধারা হিসেবে পরিগমিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্র-প্রভাবের সময়েই কল্লোল নামের একটি সাময়িক পত্রের মাধ্যমে একদল তরুণ কবি-সাহিত্যিকের হাতে পাশ্চাত্য আধুনিকতার পত্তন হয়। অন্যান্য সাময়িক ও সাহিত্য পত্রেও এই আধুনিকতার অগ্নিস্পর্শ লাগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ১৯৩০ এর দশক কল্লোল যুগের সমার্থক। কবি বুদ্ধদেব বসু এই নবযুগের অন্যতম কাণ্ডারী। যে সময়ে কল্লোলের আবির্ভাব তকন বাঙলা সাহিত্যের দিগন্ত সর্বকোণে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রোজ্জ্বল। কল্লোল যুগের নাবিকদের মূল লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে সাহিত্যের একটি মৃত্তিকাসংলগ্ন জগৎ সৃষ্টি করা। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিতকল্লোল পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ। কল্লোল পত্রিকার আবহে দ্রুত অনুপ্রাণিত হয় প্রগতি, উত্তরা, কালিকলম, পূর্বাশা ইত্যাদি পত্রপত্রিকা। অন্যদিকে আধুনিকতার নামে যথেচ্ছাচারিতা ও অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এই রকম অভিযোগ এনে শনিবারের চিঠি পত্রিকাটি ভিন্ন বলয় গড়ে তোলে মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী প্রমুখের সক্রিয় ভূমিকায়।

কবিতার ক্ষেত্রে যাদের নাম কল্লোল যুগের শ্রেষ্ঠ নায়ক বিবেচনায় প্রচারিচ তাঁরা হলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে। তবে কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র ত্রি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকেরই ভূমিকা কোন অংশে খাটো করে দেখবার উপায় নেই। অচিন্ত্যকুমার সেন রচিত কল্লোল যুগ এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। একদল প্রতিভাবান তরুণ, যাদের কেন্দ্র ছিলেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের জগতে একটা ঝড় নিয়ে এলেন 'কৃত্তিবাস'এর হাত ধরে। কৃত্তিবাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা তখনও চলছে। তাই এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের একটি আন্দোলন তৈরি হয়েছিল এবং কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবি বলে একদল নতুন প্রতিভা সামনের সারিতে চলে এসেছিল। সেই সময়ে জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর মত আধুনিক ও প্রথম সারির কবিরা বর্তমানে। এক দুঃসহ স্পর্ধায় এঁদের থেকে কবিতা না নিয়ে নিতান্ত তরুণদের কবিতা নিয়ে প্রকাশ হতে থাকল কৃত্তিবাস। কবি শঙ্খ ঘোষের খাতা কৃত্তিবাসের জন্য জোর করে নিয়ে এসেছিলেন সুনীল। দেড় দশক ধরে চলা এই পত্রিকাটি নিজেই একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। পনেরো বছর পরে কৃত্তিবাসের পঁচিশতম সংখ্যা প্রকাশ পায়। ১-২৫ সংখ্যাই কৃত্তিবাসের প্রথম পর্ব বলে ধরা হয়। ষাটের দশকের শুরুতে অ্যালেন গিনসবার্গ এলেন কলকাতায়। কৃত্তিবাসের কবিরা বীটনিক কাব্যের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের কবিতা হয়ে উঠল তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ, ভয়ংকর চতুর এবং অতৃপ্ত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, তারাপদ রায় প্রমুখরা এই নতুন কবিগোষ্ঠীর অন্তভুক্ত হলেন। ১৯৬৯ সালের

পর কৃত্তিবাস দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। এরপর আবার চালু হয় মাসিক পত্রিকা হিসেবে। তখন থেকে কৃত্তিবাস আর শুধু কবিতার পত্রিকা থাকে না, গদ্যও সমান তালে ছাপা হতে থাকে। বর্তমানেও সুনীলের প্রয়াণের পরে কয়েক বছর কৃত্তিবাস পত্রিকা চলার পর একদম পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার গুজব ছড়িয়েছে। কিন্তু এতদিনে কৃত্তিবাস তার সেই দুরন্ত ছেলের তকমা হারিয়েছে। প্রথম পর্বের কৃত্তিবাস নিয়েও অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। অতি চিৎকারের অভিযোগ ওঠে। সেই বোহেমিয়ানার ঘোর কেটে গিয়ে কৃত্তিবাস তার গৌরব হারায়।

বাংলা সাহিত্যে স্থিতাবস্থা ভাঙার আওআজ তুলে, ইশতাহার প্রকাশের মাধ্যমে, শিল্প ও সাহিত্যের যে একমাত্র আন্দোলন হয়েছে, তার নাম হাংরি আন্দোলন, যাকে অনেকে বলেন হাংরিয়ালিস্ট, ক্ষুধিত, ক্ষুৎকাতর, ক্ষুধার্ত আন্দোলন। আর্তি বা কাতরতা শব্দগুলো মতাদর্শটিকে সঠিক তুলে ধরতে পারবে না বলে, আন্দোলনকারীরা শেষাবধি হাংরি শব্দটি গ্রহণ করেন। হাংরি আন্দোলন, এই শব্দবন্ধটি বাংলাভাষায় ঠিক সেভাবে প্রবেশ করেছে যে ভাবে মুসলিম লিগ, কম্যুনিস্ট পার্টি বা কংগ্রেস দল ইত্যাদি সংকরায়িত শব্দবন্ধগুলো। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ডিসকোর্সের সংকরায়ণকে স্বীকৃতি দেয়া তাঁদের কর্মকাণ্ডের অংশ ছিল। ১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা শহর থেকে একটি ইশতাহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং হারাধন ধাড়া ওরফে দেবী রায়। কবিতা সম্পর্কিত ইশতাহারটি ছিল ইংরেজিতে, কেন না পাটনায় মলয় রায়চৌধুরী বাংলা প্রেস পাননি। আন্দোলনের প্রভাবটি ব্যাপক ও গভীর হলেও, ১৯৬৫ সালে প্রকৃত অর্থে হাংরি আন্দোলন ফুলিয়ে যায়। নকশাল আন্দোলনের পর উত্তরবঙ্গ এবং ত্রিপুরার তরুণ কবিরা আন্দোলনটিকে আবার জীবনদান করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাত্ত্বিক ভিত্তিটি জানা না থাকায় তাঁরা আন্দোলনটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। হাংরি আন্দোলনকারীরা হাংরি শব্দটি আহরণ করেছিলেন ইংরেজি ভাষায় কবি জিওফ্রে চসারের ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম বাক্যটি থেকে, অর্থাৎ দেশভাগোত্তর বাঙালির কালখণ্ডটিকে তাঁরা হাংরিরূপে চিহ্নিত তরতে চাইলেন। তাত্তিক ভিত্তি সংগ্রহ করা হয়েছিল সমাজতাত্ত্বিক অসওয়াল্ড স্পেংলারের দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট গ্রন্থটির দর্শন থেকে। স্পেংলার বলেছিলেন, একটি সংস্কৃতি কেবল সরলরেখা বরাবর যায় না, তা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়। তা হল জৈবপ্রক্রিয়া, এবং সেকারণে সমাজটি নানা অংশের কার কোনদিকে বাঁকবদল ঘটবে তা আগাম বলা যায় না। যখন কেবল নিজের সৃজনক্ষমতার ওপ নির্ভর করে, তখন সংস্কৃতিটি বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়। তার সৃজনক্ষমতা ফুরিয়ে গেলে, তা বাইরে থেকে যা পায় তাই আত্মসাৎ করতে থাকে, তার ক্ষুধা তখন তৃপ্তিহীন। হাংরি আন্দোলনকারীদের মনে হয়েছিল দেশভাগের ফলে ও পরে পশ্চিমবঙ্গে এই ভয়ংকর অবসানের মুখে পড়েছে, এবং উনিশ শতকের মণীষীদের পর্যায়ের বাঙালির আবির্ভাব আর সম্ভব নয়। সেকারণে হাংরি আন্দোলনকে তাঁরা বললেন কাউন্টার কালচারাল আন্দোলন, এবং নিজেদের সাহিত্যকৃতিকে কাইণ্টার ডিসকোর্স। তাঁরা বললেন, ''ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছিল একরৈখিক ইতিহাসের ধারণার বনেদেরে ওপর, কল্লোল বা কৃত্তিবাস গোষ্ঠী যে নবায়ন এনেছিলেন সে কাজগুলো ছিল কলোনিয়াল ইসথেটিক রিয়্যালিটি বা ঔপনিবেশিক বাস্তবতার চৌহদ্দির মধ্যে, কেন না সেগুলো ছিল যুক্তিগ্রন্থনা-নির্ভ এবং তাঁদের মনোবীজে অনুমিত ছিল যে ব্যক্তিপ্রতিস্বের চেতনা ব্যাপারটি একক, নিটোল ও সমন্বিত।'' তাঁরা বললেন, ''এই ভাবকল্পের প্রধান গলদ হল যে তার সন্দর্ভগুলো নিজেদেরকে পূর্বপুরুষদের তুলনায় উন্নত মনে করে, এবং স্থানিকতাকে ও অনুস্তরীয় আস্ফালনকে আবহেলা করে। ওই ভাবকল্পে যে বীজ লুকিয়ে থাকে, তা যৌথতাকে বিপন্ন আর বিমূর্ত করা মাধ্যমে যেমনস্তার্স তৈরি করে, তার দরুন প্রজ্ঞাকে যেহেতু

কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তিলক্ষণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়, সমাজের সুফল আত্মসাৎ করার প্রবণতায় ব্যক্তিদের মাঝে ইতিহাসগত স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যক্তিক তত্ত্বসৌধ নির্মাণ। ঠিক এই কারণেই, ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনগুলো খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে ব্যক্তিপ্রজ্ঞার আধিপত্যের দামামায় সমাজের কান ফেলে এমন রক্তাক্ত যে সমাজের পাত্তাই নেই কোনো। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে পুঁজিবলবান প্রাতিষ্ঠানিকতার দাপটে এবং প্রতিযোগী ব্যক্তিবাদের লালনে শতভিষা গোষ্ঠী যেন অস্তিত্বহীন। এমনকি কৃত্তিবাস গোষ্ঠিও সীমিত হয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন মেধাসত্তাবাধিকারীর নামে। পক্ষান্তর, ঔপনিবেশিক গণতন্ত্রের আগেকার প্রাকঔপনিবেশিক সময়কালের কথা ভাবা হয়, তাহলে দেখা যায় যে পদাবলী সাহিত্য নামক ম্যাক্রো পরিসরে সংকুলান ঘটেছে বৈষ্ণব ও শাক্ত কাজ, মঙ্গলকাব্য নামক পরিসরে সংকুলান ঘটেছে মনসা, চণ্ডী, শিব, কালিকা বা ধর্মঠাকুরের মাইক্রো-পরিসর। লক্ষণীয় যে প্রাকৌপনিবেশিক কালখণ্ডে সন্দর্ভ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার রচয়িতা নয়। ১৯৬২-৬৩ সালে হাংরি আন্দোলনে যোগাযোগ করেন বিনয় মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র, ফালগুনী রায়, আলো মিত্র, অনিল করঞ্জাই, রবীন্দ্র গুহ, সুভাষ ঘোষ, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, অরুপরতন বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সতীন্দ্র ভৌমিক, শৈলেশ্বর ঘোষ, হরনাথ ঘোষ, নীহার গুহ, আজিতকুমার ভৌমিক, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমৃততনয় গুপ্ত, ভান চট্টোপাধ্যায়, শংকর সেন, যোগেশ পাণ্ডা, মনোহর দাশ, তপন দাশ, শম্ভু রক্ষিত, মিহির পাল, রবীন্দ্র গুহ, সুকুমার মিত্র, দেবাশিষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনিল কবঞ্জাই এবং করুণানিধান মুখোপাধ্যায় ছিলেন চিত্রকর। হাংরি আন্দালনেকারিরা প্রধানত একপৃষ্টার বুলেটিন প্রকাশ করতেন। সেগুলো পাটনা থেকে প্রকাশিত, সেগুলো ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। কখনও বা পোস্তকার্ড, পোস্টার এবং এক ফর্মার পুস্তিকা প্রকাশ করতেন। এক পাতার বুলেটিনে তাঁর কবিতা, রাজনীতি, ধর্ম, অশ্লীলতা, জীবন, ছোটগল্প, নাটক, উদ্দেশ্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইশতাহার লেখা ছাড়াও, কবিতা, গদ্য, অনুগল্প, স্কেচ ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন। বুলেটিনগুলো হ্যাণ্ডবিলের মতন কলকাতর কলেজ স্টিট কফি হাউস, পত্রিকা দপ্তর, কলেজগুলোর বাংলা বিভাগ ও লাইব্রেরি ইত্যাদিতে তাঁরা বিতরন করতেন। হাংরি আন্দোলনের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার এইটি-ই প্রধান কারণ বলে মনে করেন গবেষকরা। কিন্তু হ্যাণ্ডবিলের মতন প্রকাশ করায় তাঁরা ঐতিহাসিক ক্ষতি করেছেন নিজেদের, কেন না অধিকাংশ বুলেটিন সংরক্ষণ করা সংগ্রাহকদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। সুবিমল বসাক, দেবী রায় ও মলয় রায়চৌধুরীর কিছু-কিছু কার্যকলাপের কারণে ১৯৬৩ সালের শেষার্ধে হাংরি আন্দোলন বাঙালির সংস্কৃতিতে প্রথম প্রতিষ্ঠানবিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হয়। বহু আলোচক হাংরিআন্দোলনকারীদের সে সময়ের কার্যকলাপে ডাডাবাদের প্রভাব লক্ষ করেছেন। এই কারণে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করেন। শ্মশান, গোরস্তান, ভাঠিখানা ও শেয়ালদা স্টেশনে তাঁরা কবিতা পাঠের আয়োজন করতেন, মুখোশ খুলে ফেলুন লেখা জীব-জন্তু, দেবতা, দানবের মুকোশ পাঠাতেন মন্ত্রী, সমালোচক, প্রশাসকদের, কবিদের সমালোচনা করতেন বিবাহের কার্ডে, তৎকালীন মানদণ্ডে অশ্লীল স্কেচ ও পোস্টার আঁকতেন ও বিলি করতেন, একটি গ্রন্থের দাম রাখতেন লক্ষ টাকা বা কয়েকটি টি.বি. সিল। বাণিজ্যিক পত্রিকায় গ্রন্থ রিভিউ করার জন্য জুতোর বাক্স পাঠাতেন কিংবা সাদা কাগজ পাঠানেত ছোটগল্প নামে। তাঁদের রচনায় প্রশাসন ও মিডিয়াকে আক্রমণ করতেন। পেইনটিং প্রদর্শনী করে শেষ দিন প্রতিটি ছবিতে আগুন করিয়ে দিতেন। এই সমস্ত অসাহিত্যিক কার্যকলাপের মাধ্যমে তাঁরা দাবী করতেন যে অচলায়তনকে ভাঙা যাবে। অবশ্য তাঁদের অনুকরণে পরবর্তীকালে বহু প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক এসেছেন বাংলা সাহিত্যে, যদিও সাহিত্যের বাইরে তাঁরা অন্য কাজ করেননি। কিন্তু হাংরি আন্দোলনকারীদের

কার্য্যকলাপে প্রশাসন অচিরে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হল। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে ১১ জন হাংরি আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তাঁরা হলেন, সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, দেবী রায়, সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, উৎপলকুমার বসু, রামনন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবো আচার্য এবং সুবিমল বসাক। এঁদের মধ্যে প্রথম ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং কলকাতার ব্যাংলকশাল কোর্টে তোলা হয়। মলয় রায়চৌধুরীকে হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চোর-ডাকাতদের সঙ্গে। মকদ্দমার ফলে উৎপলকুমার বসু অধ্যাপনার চাকরি থেকে বরখাস্ত হন, প্রদীপ চৌধুরী রাসটিকেট হন বিশ্বভারতী থেকে, সমীর রায়চৌধুরী সরকারি চাকরি থেকে সাসপেণ্ড হন, সুবিমল বসাক ও দেবী রায়কে কলকাতার বাইরে বদলি করে দেয়া হয়, সুবো আচার্য ও রামানন্দ চট্টোপধ্যায় ফেরার হয়ে যান। মৃণাল বসু চৌধুরীর 'কবিপত্র' তখনকার ঐতিহ্যশালী পত্রিকা। পুস্পর দাসগুপ্তের নেতৃত্বে গড়ে উঠল শ্রুতি আন্দোলন। মৃণাল বসু চৌধুরী ও পরেশ মণ্ডল শ্রুতি আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু ঐতিহ্যশালী ও হাংরির বাইরে অন্য কিছু একটা করে দেখাবার, যা বামপন্থী স্লোগান সর্বস্বতার বাইরে, যা কিনা সমাজ, সংস্কার, উগ্র আধুনিকতার বাইরের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দেবে। ১৯৬৮ সালে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আর এক দল যুবক শুরু করলেন ধ্বংসকালীন আন্দোলন। 'সাম্প্রতিক' পত্রটি হল এর মুখপত্র। আর 'কবিপত্র' তার সহযোগী। মণীন্দ্র গুপ্তর তাগাদায় পবিত্র মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'ইবলিশের আত্মদর্শন'। ইসলামের বিরোধী চরিত্র ইবলিশ ছিল এর নায়ক। বিপুল সাড়া পড়ে যায় এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এক বছর চলেছিল ধ্বংসকালীন আন্দোলন। এর পরবর্তী সময়ে সেভাবে আর কোন কবিতা আন্দোলন দানা বাঁধে নি। নকশাল পিরিয়ডে কিছু রাজনৈতিক স্লোগান ধর্মী পুস্তিকা ও হ্যাণ্ডবিলের আদান প্রদান হয়েছে। অবশ্য সেই অস্থির সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই কবিতা আন্দোলন করার মত মানসিকতা ছিল না তখনকার যুবকদের। এর পরে একক ভাবে অনেক কবি উঠে এসেছেন। কিন্তু কবিতা হয়ে গেছে কলকাতা অভিমুখী। অর্থাৎ নাম, যশ বা কবিতা চর্চা হয়ে গেছে কলকাতা কেন্দ্রিক। এর ফলে সরকারী অ্যাতাডেমি যেমন তৈরি হয়েছে, কলকাতার বাইরের লেখক ও কবিরা রয়ে গেছেন অচ্ছুৎ। কাবতায় রাজনীতির রঙ লেগেছে। সাধারণ মানুষ যারা কবিতা ভালোবাসে, তাদের মধ্যে আবার অস্থিরতা বেড়েছে। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে অনেকে জেলায় জেলায় নতুন পত্রিকা চালু করেছেন তাদের মুখপত্র হিসেবে। ততদিনে ইণ্টারনেট এসে গেছে। যদিও নেট-এর হাত ধরে বৃহত্তর দুনিয়ায় পৌঁছনো মানুষের সংখ্যা তখন কম। এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'কৌরব'। একদম শুরুতে ১৯৬৮-৬৯ এ কৌরব নাট্যগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জামশেদপুরে, কমল চক্রবর্তী, বারীন ঘোষাল, সুভাষ ভট্টাচার্য্য, অরুণ আইন ও শক্তিপদ হালদারের হাত ধরে। এ ছাড়াও নিয়মিত কবিতা গদ্যের পাঠচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এভাবেই কৌরব ভেড়ে স্বদেশে সেন-এর নৌকো। ২০০৪ এর কৌরব ১০০ সংখ্যা অব্দি টানা সম্পাদনার দায়িত্বে কমল চক্রবর্তী। ১৯৯৮ এর শরতে আমেরিকা থেকে আর্যনীল মুখোপাধ্যায় আন্তর্জালে তোলেন কৌরবকে। কৌরব অনলাইনে প্রথম প্রথম ছাপা হয় প্রিন্ট পত্রিকার নির্বাচিত লেখা। ১৯৯৯ থেকে তাতে তোলা হতে থাকে ই-মেল-এ আসা পৃথিবীর নানাপ্রান্তের বাংলা কবিতাও। এছাড়াও অনলাইনে যোগ হতে থাকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কবিতা আন্দোলনের সাতপাঁচ এবং কবিতা। কৌরবের পাতায় লেখেন লরেন্স ফেলিংঘেটি, জন অ্যাশবেরি, পিটার গিজ্জি, ক্রিস স্ট্রফোলিনো, চার্লস বার্নস্টাইন, রন সিলিম্যান প্রমুখ। ২০০৪-এ আনুষ্ঠানিক ভাবে কৌরব বন্ধ হয়ে গেলে নতুন করে তাকে বাঁচিয়ে তোলা ও পরিচালনা শুরু করেন আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, সঙ্গে সুদেষ্ণা মজুমদার, অভিজিৎ মৈত্র ও সব্যসাচী সান্যাল। এই সময়েই (২০০২ সালে) বারীন ঘোষালের হাত ধরে চিরাচরিত কবিতার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মেনিফেস্টোবিহীন

'নতুন কবিতা' আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকায় স্বপন রায় আর রঞ্জন মৈত্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সক্রিয় থেকেছেন অভিজিৎ মিত্র, ইন্দ্রনীল ঘোষ, অরূপরতন ঘোষ এবং এখন রয়েছেন তপোন দাশ এবং সব্যসাচী হাজরা! কিন্তু কবি সৌমিত্র সেনগুপ্ত আর অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শুভাকাঙ্খী না থাকলে ''নতুন কবিতা'' কে চোদ্দ বছর ধরে চালানো যেত না! পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই চেষ্টা করা হয়েছিল কবিতা'র তত্ত্ব নয়, কবিতা'র ভাবনাই হবে ''নতুন কবিতা''র বিচক্ষণক্ষেত্র! প্রথম সংখ্যাটি ছিল '' সম্ভবনার কবিতা'' এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে! নতুনভাবে কবিতাকে আবিষ্কার করা প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ কবিরা সাধারণভাবে করবেন না! অথচ একটা দশক জুড়ে '' নতুন কবিতা''র চর্চা একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে ফেলেছিল! এঁদের কোন গুরুত্ব ছিল না সিনিয়র কবিদের কাছে, তাঁরা নস্যৎ করতেন এঁদের, কটু কথাও বলেছেন কেউ কেউ! আর এটাই স্বাভাবিক ছিল! আমরা যেহেতু কবিতাকে বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম অতএব ''স্থা'' র পক্ষে থাকা জীবনানন্দীয় ধারা, বামপন্থী সামাজিক বাস্তবতার ধারা, পঞ্চাশ দশকীয় ছন্দে লিখতে থাকা পদ্যধর্মী ধারা ইত্যাদিতে জড়িয়ে থাকা বাংলা কবিতা লিখিয়েদের ৯০ শতাংশ কবি, কবিতার কাগজ, খবরের কাগজ, রাজনৈতিক দলের কাগজ ইত্যাদি সকলের কাছেই এঁরা ব্রাত্য হয়ে গেলেন, এখনো তাই আছেন! কাউকে আক্রমন না করে, কারো প্রতি বিদ্বেষ বা অসূয়া প্রকাশ না করে এঁরা লেখার চেষ্টা করছিলেন বাংলা কবিতায় যা লেখা হয়নি সেরকম কবিতা, এঁদের নিজেদের ভাষায়! এই কাজটা তরুণ কবিদের একটি অংশকে আকৃষ্ট করলো! মনে হয় কবিতাকে ভেতর থেকে ভেঙে গড়ার ইচ্ছেয় কেন্দ্র থেকে বেরনো প্রসারিত চেতনার অ্যাডভেঞ্চার তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল। ''নতুন কবিতা'র একটি সংখ্যা করা হল '' শুন্য দশকের'' শুরুতে লেখালিখি করা তরুণতম কবিদের নিয়ে! ''পা রাখো জুতোর বাইরে'' এটাই ছিল ভাবনাসূত্র ওই সংখ্যার! ভাবনাকে চলিষ্ণু রাখার তাগিদেই করা হল ''কবির দরজা'', ''কবিতা ও সিনেমা'', ''টাইম মেশিন'' ইত্যাদি সংখ্যা!

২০০৯ সালে আন্তর্জালে এলো অনুপম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাক'। শুধুমাত্র ব্লগ নির্ভর বাংলার প্রথম পত্রিকা। এখানেও নতুনকে, নতুন ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ও হয়। অনুপম মুখোপাধ্যায় নিজে 'পুনরাধুনিক কবিতা' লেখেন। এই পুনরাধুনিক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, পুনরাধুনিক কোনো তত্ত্ব নয়। এটা ভাবনা। যাপন আর সমাজের মধ্যে এর ঘোরাফেরা। মূল ব্যাপারটা হল একজন কবি বা শিল্পীর হাঁফিয়ে ওঠা। সে আর নিতে পারথে না অধুনান্তিক কালপর্বের অবান্তর বেঁচে থাকাকে, একজন স্রষ্টা হিসেবে অকিঞ্চিৎকরতাকে। ১৯৩০ থেকে এই ২০১৬ অবধি, খুব কৌশলে বাংলা কবিতা থেকে একজন কবির একলা চলার ব্যাপারটাকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রতাপশালী বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মুখে বাংলা কবিতা প্রবেশ করেছে যেন সাপের মুখে ছুঁচো প্রতাপ পারছে না কবিতাকে গ্রাস করতে, পারছে না তাকে মুছে ফেলতে। বাণিজ্যিক পত্রে কবিতা ছাপা হয়, এই কারণে নয় যে পত্রিকাটির কবিতা প্রয়োজন আছে। এই কারণেই প্রতিষ্ঠান তার সুবিধাজনক কবিতাগুলোকে প্রকাশ করে যাতে কবিতার দ্রোহ এবং কবির আগুন জনসাধারণের চোখে এসে না পড়ে। একজন পুনরাধুনিক কবি কোনো প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হবেন না। তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হবেন। নিজের কবিতাকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায় তিনি নিজেই নেবেন। সেই চর্যাপদ থেকে আজ অবধি বাংলা কবিতার যাবতীয় গুণ তিনি আত্মসাৎ করবেন। কী লিখবেন না, এ নিয়ে তাঁর ভাবনা যাবে ফুরিয়ে। তিনি শুধু সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কী লিখবেন। এক পৃথিবী লেখার আছে তাঁর। কবিতার কোনো লক্ষণ ও কোনো উপাদানই তাঁর চোখে অপাংক্তেয় নয়, দিব্যাস্ত্র অথবা হাতুড়ি—তাঁর প্রয়োজনমতো হাতে তুলে নেবেন। আবহমান কবিতার ধারায় একজন পুনরাধুনিক নিজেকে সনাক্ত করবেন। তাঁর

লেখার ঘর, তাঁর কাজের ঘর, তাঁর সাধনকক্ষ। সাহিত্যচর্চা আরও অধিক পরিমাণে মানবতাবাদীরূপে ধরা দেয়। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেন ঃ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯-৮ জুলাই ২০০৩) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বাঙালি কবি ও গদ্যকার। কবিতা তাঁর প্রধান সাহিত্যক্ষেত্র হলেও ছড়া, রিপোর্টাজ, ভ্রমণসাহিত্য, অর্থনীতিমূলক রচনা, বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদ, কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা, উপন্যাস, জীবনী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য সকল প্রকার রচনাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধতস্ত। সম্পাদনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ এবং বহু দেশি-বিদেশি কবিতা বাংলায় অনুবাদও করেছেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মামাবড়িতে। তার পিতার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা যামিনী দেবী। পিতা ছিলেন সরকারি আবগারি বিভাগের কর্মচারী, তাঁর বদলির চাকরির সুবাদে কবির ছেলেবেলা কেটেছিল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। তাঁর ছেলেবেলার প্রথম দিকটা, যখন তাঁর তিন-চার, সে সময়টা কেটেছে কলকাতায়, ৫০ নম্বর নেবুতলা লেনে। একটা ভাড়াবাড়ির দোতলায় যৌথ পরিবারের ভিড়ের মধ্যে। প্রথমে নওগাঁর স্কুলে এবং পরে কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন। ভবানীপুরের মিত্র স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সক্রিয় রাজনীতি করার মানসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙ্গালী কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যজগতে চল্লিশের দশকের অন্যতম কবি হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৪০-এ প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশের মধ্য তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে নতুন সুর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষের বৈষম্যলাঞ্ছিত দুর্দশার বিরূদ্ধে দ্রোহ তাঁর কবিতার মূল সুর। 'পদাতিক' প্রারম্ভে ছিল 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি অমরা চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য কাঠফাঁটা রোদে সেঁকে চামড়া।' কথ্যরীতিতে রচিত তাঁর কবিতা সহজবোধতার কারণে ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীর আনুকূল্য লাভ করে। মানবিক বোধ ও রাজনৈতিক বাণী তার কবিতার অন্যতম প্রধান অভিমুখ। পদাতিক কাব্যগ্রন্থের মে দিনের কবিতা কেবল শ্রমিক এক বিজয়কাব্য নয়, এতে ব্যক্ত হয়েছে ঔপনিবেশবাদের উচ্ছেদসাধনের ঋজু প্রত্যয়—

" শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা,
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।
প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংশের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয়, হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন আত্মা।"

তার কাব্যভাষা নিরলংকার। নিজ উপলব্ধি ও প্রত্যয় তিনি গদ্যের সুরে ব্যক্ত করেছেন। এর স্বতন্ত্র উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর। অগ্রজ আধুনিক কবিদের মতো তিনি দুর্বোধ্য নন, দুরূহ নন। সহজেই তাঁর কবিতা পড়া যায়, বোঝা যায়

এবং অনুভব করা যায়। [২] চল্লিশের যুদ্ধ-দাঙ্গা-তেভাগা-মন্বন্তর সঙ্কুলিত রাজনৈতিক টালমাটালের যুগসন্ধিক্ষণে তনি উচ্চারণ করেছিলেন—

''আমি আসছি—
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি।
সঙীন উদ্যত করেছ কে? সরাও
বাধার দেয়াল তুলেছ কে? সরাও।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি
দূরন্ত দুর্নিবার শান্তি।''

জগৎজুড়ে যে পথে 'শান্তি' আনা সম্ভব, সেই পথেররেখা তাঁ কাছে ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় সেই পথনির্দেশিকাও আছে। কবিতাটির নাম, 'বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে'—

''বাঁয়ে চলো ভাই,
বাঁয়ে—
কালো রাত্রির বুক চিরে,
চলো
দুহাতে উপরে আনি
আমাদেরই লাল রক্তে রঙিন সকাল।''

কখনো কখনো প্রতীয়মান হয় তার কবিতা চড়া সুরে বাঁধা। চল্লিশের দশক থেকে তাঁর অ-রোম্যাণ্টিক গদ্যপ্রধান কাব্যভঙ্গী পরবর্তীকালের কবিদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে ওঠে। সমাজের তৃণমূল স্তরে নেমে গিয়ে সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করে তবেই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হতেন তিনি। আদর্শ তাঁর কবিতাকে দিয়েছিল পরিব্যপ্তি জনপ্রিয়তা। তাবে কবিতার মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে তিনি অক্ষয়বৃত্তের চালে আধুনিক কবিতার গদ্যঋদ্ধ নতুন রূপ প্রতিষ্টা করেছিলেন। স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার পর কারাবন্দী হন তিনি। এ পর্যায়ে লিখেছিলেন 'শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না/প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা।' বেশ কিছু সময় পরে আবার লিখেছিলেন 'লেনিন যেন চেঁচিয়ে বললেন, /শতীব্দী শেষ হয়ে আসছে/ একটু পা চালিয়ে, ভাই, একটু পা চালিয়ে।' তার কাব্যভাষায় প্রচলিত ছন্দ্রে কাঠামো ছিল না। তবে ছিল ছন্দ্রে প্রাণবন্ত স্পন্দন।

পদাতিক

এ গ্রন্থের বধূ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ রোম্যাণ্টিকতার বিপরীত ধ্বনি শোনা যায়, কতকটা কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো গানের অনুষঙ্গে—

''ইহার মাঝে কথন প্রিয়তম
উধাও, লোক লোচন উঁকি মারে
সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
লেকের দলে মরণ যেন ভালো।''

চিরকূট

চিরকূট কাব্যটি বাংলা ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। সুধু ফ্যাসিবিরোধিতাই নয়, এই কাব্যে উঠে এসেছে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্খা, ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের স্মৃতি। স্ফুলিঙ্গ, জবাব চাই, প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার, ফের আসবো, এই আশ্বিনে, চিরকুট প্রভৃতি কবিতায় আছে বিশ্বাস, বলিষ্ঠতা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আবার আবেগের বিধুরতাও। ঘোষণা কবিতায় দেখা যায়—

''গহগার জোয়ার এসে লাগে
ভল্গার তীরের স্পর্শ,
চোখে নব সূর্যোদয় জাগে,
মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব,
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফোরিতা আসন্ন বিপ্লব।''

অগ্নিকোণ : ১৯৪৮ সালে পার্টির দৈনিকের টাকা তোলার জন্য কবি লেখেন মাত্র পাঁচটি কবিতার সংকলন অগ্নিকোণ। কবির ভাষায়, ''রাজনীতিকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতির জন্যেই অগ্নিকোণের প্রকাশ।''[৫] এই কাব্যে কবি উদ্বেল হয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের সংবাদে—

''লক্ষ লক্ষ হাতে
অন্ধকারকে দুটুকরো ক'রে
অগ্নিকোণের মানুষ
সূর্যকে ছিঁড়ে আনে।''

অগ্নিকোণ ও ফুল ফুটুক কাব্য রচনার মধ্যবর্তী সময়ে কবি উপলব্ধি করেন এক চরম নান্দনিক সত্য

''সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছু সংঘাত সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়, পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব কটি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না। কবিতায় গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার বিভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন—যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র গভীর, একান্ত জটিল—অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা।''

এই সত্য প্রতিফলিত হয় তাঁর পরবর্তীকালের কাব্যগুলিতে। কমিউনিজমের বাঁধা বুলি ছেড়ে তিনি চিত্রকল্প নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় রত হন এই কাব্যগুলিতে। ফুল ফুটুক কাব্যের আরও একটা দিক কবিতায় অন্ধকারের একআশ্চর্য ছবি আঁকেন কবি,

''জলায় এবার ভাল ধান হবে—
বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে
সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে।

আশাপূর্ণা দেবী (৮ই জানুয়ারী, ১৯০৯-১৩ই জুলাই, ১৯৯৫) বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবন, বিশেষত সাধারণ মেয়েদের জীবনযাপন ও নস্তত্ত্বের চিত্রই ছিল তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। ব্যক্তিজীবনে নিতান্তই এক আটপৌরে মা ও গৃহবধূ আশাপূর্ণা ছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে অনভিজ্ঞা। বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল না। বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রথাগত শিক্ষালাভেও। কিন্তু গভীর অন্তদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁকে দান করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকার আসন। তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতি -সুবর্ণলতা-বকুলকথা উপন্যাসত্রয়ী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিরে অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। তাঁর একাধিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র। দেড় হাজার ছোটোগল্প ও আড়াইশো-র বেশি উপন্যাসের রচয়িতা আশাপূর্ণ সম্মানিত হয়েছিলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার সহ দেশের একাধিক সাহিত্য পুরস্কার, অসামরিক নাগরিক সম্মান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরাকার তাঁকে প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গের সব্বোচ্চ সম্মান রবীন্দ্র পুরস্কার। ভারত সরকার তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান সহিত্য অকাদেমি ফেলোশিপে ভূষিত করেন।

মহাশ্বেতা দেবী (১৪ জানুয়ারি, ১৯২৬-২৮ জুলাই, ২০১৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল হাজার চুরাশির মা, রুদালি, অরণ্যের অধিকার ইত্যাদি। মহাশ্বেতা দেবী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগঢ় রজ্যের আদিবাসী উপজাতিগুলির (বিশেষত লোধা ও শবর উপজাতি) অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (বংলায়), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ও র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার সহ একাধিক সাহিত্য পুরস্কার এবং ভারতের চতুর্থ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান যথাক্রমে পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে পশ্চিমবঙের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান বঙ্গবিভূষণে ভূষিত করেছিল।

সাহিত্যকর্ম ঃ মহাশ্বেতা দেবী ১০০টিও বেশি উপন্যাস এবং ২০টিরও বেশি ছোটগল্প সংকলন রচনা করেছেন। তিনি মূলত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে সেই সব রচনার মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ঝাঁসির রানি ঝাঁসির (লক্ষ্মীবাই) জীবনী অবলম্বনে রচিত। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। এই উপন্যাসটি রচনার আগে তিনি ঝাঁসি অঞ্চলে গিয়ে তাঁর রচনার উপাদান হিসেবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য ও লোকগীতি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

১৯৬৪ সালে মহাশ্বেতা দেবী বিজয়গড় কলেজে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজ) শিক্ষকতা শুরু করেন। সেই সময় বিজয়গড় কলেজ ছিল শ্রমিক শ্রেণির ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই সময় মহাশ্বেতা দেবী একজন সাংবাদিক ও একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে যান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও শবর উপজাতি, নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর প্রসারিত কথাসহিত্যে তিনি প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতিক ও অস্পৃশ্য সমাজরে অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> ''আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি যে, সত্যকারের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষ যে লোককথা, লোকগীতি, উপকথা ও কিংবদন্তিগুলি বিভিন্ন আকারে বহন করে চলেছে, তার পুনরাবির্ভারের সঙ্গে আমি ক্রমাগত পরিচিত হয়ে এসেছি।... আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে

না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলে তাদেরই হাতে লেখা।"

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯ অক্টোবর ১৯২৪— ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি করি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত আধুনিক বাংলা কবিদের অন্যতম। উলঙ্গ রাজা তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ লেখার জন্য তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। কবি পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমির সাথে দীর্ঘকাল যুক্ত।

সাহিত্য জীবন : ১৯৫১ সালে যোগ দিয়েছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। দীর্ঘ সময় তিনি 'আনন্দমেলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। নীরেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই 'নী নির্জন', প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। এরপর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'অন্ধকার বারান্দ', 'নিরক্ত করবী', 'নক্ষত্র জয়ের জন্য', 'আজ সকালে'সহ অসংখ্য কবিতার বই। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

এই সময়কার সাহিত্যের মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কথাও। কেবলমাত্র রোমান্টিকতার আবহে আকটে না থেকে সামাজিক বাস্তবতাকে নির্ভীকভাবে ফুটিয়ে তোলা এই সময়কালের সাহিত্যিকদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কেবল সাহিত্যচর্চাতে আটকে না থেকে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক বিভিন্ন কার্যকলাপে নিজেদের যুক্ত করেছেন। সেইভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য একটি নতুন ধরনের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ শতকের শেষভাগে সক্রিয় একজন প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিক। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূববর্তী চার দশক তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্ববৈশ্বিক বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলাভাষী এই ভারতীয় সাহিত্যিক একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, সম্পাদক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসাবে অজস্র স্মরণীয় রচনা উপহার দিয়েছেন। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি। একই সঙ্গে তিনি আধুনিক ও রোমান্টিক। তাঁর কবিতার বহু পঙ্‌ক্তি সাধারণ মানুষের মুখস্থ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ''নীললোহিত'', ''সনাতন পাঠক'', ''নীল উপাধ্যায়'' ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জনাম অধুনা বাংলাদেশের মাদারীপুরে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি কৃত্তিবাস নামে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ একা এবং কয়েকজন এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি', 'যুগলবন্দ' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে), 'হঠাৎ নীরার জন্য', 'রাত্রির রঁদেভূ', 'শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা', 'অর্ধেক জীন', 'অরণ্যেব দিনরাত্রি', 'অর্জুন', 'প্রথম আলো', 'সেই সময়', 'পূর্ব পশ্চিম', 'ভানু ও রাণু', 'মনের মানুষ' ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে তিনি ''কাকাবাবু-সন্তু'' নামে এক জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজের রচয়িতা। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি ভারতের জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সাহিত্য অকাদেমি ও পশ্চিমবঙ্গ শিশুকিশোর আকাদেমির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নীললোহিত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। নীললোহিতের মাধ্যমে সুনীল নিজের একটি পৃথক সত্বা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। নীললোহিতের সব কাহিনিতেই নীললোহিতই কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে নিজেই কাহিনিটি বলে চলে আত্মকথার ভঙ্গিতে। সব কাহিনিতেই নীললোহিতের বয়স সাতাশ। সাতাশের বেশি তাঁর বয়স বাড়ে না। বিভিন্ন কাহিনিতে দেখা যায় নীললোহিত চিরবেকার। চাকরিতে ঢুকলেও সে বেশি দিন টেঁকে না। তাঁর বাড়িতে মা এবং দাদা-বৌদি রয়েছেন। নীললোহিতের বহু কাহিনিতেই দিকশূন্যপুর বলে একটি জায়গার কথা শোনা যায়। যেখানে বহু শিক্ষিত সফল মানুষ কিন্তু জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ একাকী জীবন যাপন করেন।

তথ্যসূত্র : http://www.bombayduckmag.com/bd/article/43/তুষ্টি_ভট্টাচার্য_স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য আন্দোলন
Wikipedia and other internet sources.

৮.৬.১৫.২ : বিনোদনমূলক কার্যকলাপ

৮.৬.১৫.২.১ : বাংলা নাকটের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বাংলা নাটককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) অভিনয় (২) রচনা।

এবং বাংলা নাটকের যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

প্রথম যুগ — ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় যুগ — ১৮৭২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত।

তৃতীয় যুগ— ১৯৪২ থেকে আজ পর্যন্ত।

প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক হল জি. সি. গুপ্তের ''কির্তীবিলাস''এবং তারাচরণ সিকদারের ''ভদ্রার্জুন''—এগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলা নাটকের তৃতীয় যুগ—১৯৪২ খ্রিঃ থেকে আজ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় বাংলা নাটকের তৃতীয় যুগ। এই যুগের নাট্যকার হলেন—তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য। এই যুগের শ্রেষ্ঠ নাকট হল ''ছেঁড়া তার''—তুলসী লাহিড়ী; ''নবান্ন''—বিজন ভট্টাচার্য্য।

এই যুগের নাট্যকারদের নাটকে সাধারণ মানুষের জীবন-সমস্যাই বেশি রূপ পেয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, বস্তিবাসী, ঝুপড়িবাসী, প্রভৃতি চরিত্র নাট্যকারের সহানুভূতির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

❒ আধুনিক যুগের বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলনের যে সূত্রাপত তার প্রথম প্রকাশ বিজন ভট্টাচার্য্যের নাটকের মধ্যে। তাই এই শ্রেণির নাটক রচনার পথিকৃৎ তিনই।

❒ বিজন ভট্টাচার্য্যের এই শ্রেণির নাটকের দ্বারাই তাঁর ও তাঁ পরবর্তী নাটকের ধারা জনজীবনের সঙ্গে হার্দিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় অভিনীত থিয়েটারকেই প্রাথমিকভাবে **বাংলা থিয়েটার** বুঝায়। বাংলা থিয়েটার প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে সঞ্চালিত হয়। সম্ভবত এই শব্দটি কিছু হিন্দি থিয়েটারকেও বুঝাতে পারে যা বাঙালি জনগণের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলা থিয়েটারেরক উৎপত্তি হয়েছে। ১৯ শতকের প্রথম দিকে ব্যক্তিগত বিনোদন হিসাবে একটি শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে, বাংলা থিয়েটারগুলি ব্রিটিশ রাজের অপছন্দের বিষয়গুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন থিয়েটারকে সামাজিক সচেতনতার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। থিয়েটার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য এখনো যোগ করেছে এবং সেগুলির শক্তিশালী প্রভাব আছে। এই দলগুলো বাণিজ্যিক বাংলা থিয়েটার থেকে মতাদর্শগতভাবে নিজেদের পার্থক্য বজায় রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক থিয়েটারগুলিকে বিস্তৃতভাবে কলকাতা ভিত্তিক থিয়েটার এবং গ্রামীণ থিয়েটারে ভাগ করা যায়। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বাইরে, ''বাংলা থিয়েটার'' শব্দটি মূলত কলকাতাভিত্তিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যেহেতু পল্লী থিয়েটার কম সুবিখ্যাত। দুই ধরনের থিয়েটারের ফর্ম এবং কন্টেন্ট অনুরূপ, কিন্তু কলকাতাভিত্তিক থিয়েটারগুলিতে ভাল তহবিল এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী যুক্ত থাকে। এর প্রধান কারণ হল একটি বৃহত্তর দর্শকের কাছে অভিনয়ের জন্য কলকাতায় গ্রামাঞ্চলে থেকে দক্ষ শিল্পীদের আগমন।

এছাড়াও বাংলা লোক থিয়েটারগুলিও রয়েছে। এইসব লোক থিয়েটারগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে কথিত বাংলা ভাষার অনেক উপভাষা উচ্চারিত হয়। বৃহত্তর বাংলা থিয়েটার কলকাতায় কথিত উপভাষা ব্যবহার করে আর বাংলা লোক থিয়েটারগুলি উপভাষায় অভিনয় করা হয়ে থাকে।

বাংলার পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চালানো যাত্রা নামে আরেকটি বাঙালি বা বাংলা থিয়েটার রয়েছে। যাত্রার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথাগত বাদ্যযন্ত্রের বিস্তৃত ব্যবহার ও অতি-অভিনব। বর্তমানে গল্পগুলির সংকটের জন্য যাত্রার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। অনেক জনপ্রিয় বাঙালি চলচ্চিত্র শিল্পীরা যাত্রায় অংশ নেয়।

হিন্দী থিয়েটার যা বাঙ্গালী জনগণের দ্বারা গৃহীত হয়, ১৯৯৫ সালে শ্যামনান্দ্র জালানের অধীনে অনামিক দিয়ে শুরু করে উষা গাঙ্গুলী পরিচালিত রংগাকারমী (১৯৭৬) এবং পাদটিক (১৯৭২) পদাতিক দ্বারা প্রযোজনা করা হয়েছে।

১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০তম শতাব্দীতে থিয়েটারগুলির নিজস্ব বাংলা সঙ্গীত ছিল। এই থিয়েটার সঙ্গীত বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অগ্রণী ছিল; তার আগে বাংলা থিয়েটারের যুগে থিয়েটার সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল, এবং তার মৃত্যুর পর বাংলা থিয়েটার সঙ্গীত আরো পরীক্ষামূলক হয়ে ওঠে। গিরিশ চন্দ্রের যুগে, সমস্ত স্তর-নাটকগুলিতে কিছু প্রথাগত বাংলা সংগীত, এবং নৃত্য-গায়ক, যেগুলি শুরু হওয়ার আগে এবং নাটকের মধ্যে ব্যবহার করা হত। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে কীর্তনাঙ্গের গান থাকবে, মহাকাব্যগুলিতে খ্যামটার মতো আদিবাসী শৈলী অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং কমেডি এবং নাটকীয় নাটকগুলির মধ্যে প্রায়ই নিধুবাবু দ্বারা টপ্পা গানগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

■ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি :

বিজন ভট্টাচার্য ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। ভূস্বামী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার কর্মসূত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করার সুবাদে তিনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন।

বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যজীবনের শুরু হয় ১৯৪০-র দশকে। প্রচলিত বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধারার বাইরে স্বতন্ত্র নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেন কিছু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী গোষ্ঠী। এঁদেরই সাংস্কৃতিক শাখা ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ বা ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েসন যা আইপিটিএ নামে বেশি পরিচিত। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন এই গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম সারির নাট্যকর্মী। চিন্তা, চেতনা এবং সংগ্রামের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার দিশালী ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। বিজন ভট্টচার্যের নাটক রচনা, অভিনয় এবং নির্দেশনা সাফল্য লাভ করেছিল এই গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

গণনাট্য সঙ্ঘের (সেই সময় ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ) প্রথম নাটক আগুন বিজন ভট্টাচার্যের রচনা। এই নাটকটি ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে তাঁর লেখা নাটক জবানবন্দী এবং নবান্ন অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকগুলিতে তিনি প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে নবান্নের প্রথম অভিনয় হয়। এই নাটকটির পটভূমিকা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। গণনাট্য আন্দোলন এবং বিজন ভট্টাচার্য্যের নাটক বাংলা নাটক রচনা এবং অভিনয়ের এক যুগবদলের সূচনা করে।

১৯৪৮ সাল থেকে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের মতান্তর ঘটে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ তিনি বোম্বাইতে হিন্দি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৫০ সালে তিনি আবার বাংলায় ফিরে আসেন এবং নিজের নাটকের দল ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও তিনি নাট্যকার, প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। এই থিয়েটারে তাঁর চলিত নাটকের মধ্যে অন্যতম ছিল কলঙ্ক, গোত্রান্তর, মরাচাঁদ, দেবী গর্জন, গর্ভবতী জননী প্রভৃতি।

১৯৭০ সালে তিনি ক্যালকাটা থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে কবচ-কুণ্ডল নামে নতুন দল গঠন করেন। এখানে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজবসন্ত', 'চলো সাগরে', 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক' প্রভৃতি।

বিজন ভট্টাচার্য মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা ও বাঁচবার কথা তাঁর নাটকগুলির মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি এই ভাবনা থেকে সরে যান। গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ এবং নিজের নাটকের দল একাধিক বার ভেঙে গড়ে তিনি তৈরি করেন। ক্রম মার্কসীয় দর্শনের পরিবর্তে বা সঙ্গে তাঁর রচনায় লোকায়ত ধর্ম দর্শন, হিন্দু ধর্মের সমন্বয় প্রয়াসী মানসিকতা কাজ করেছিল। চিরকালীন মাতৃকা ভাবনা তাঁর নাটকে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

অভিনেতা হিসাবে বিজন ভট্টাচার্য অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নানারকম চরিত্রকে মূর্ত করে তুলতে তিনি দক্ষ ছিলেন। নানা উপভাষায় সংলাপ উচ্চারণেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে ছিল বেন্দা (জবানবন্দী), প্রধান সমাদ্দার (নবান্ন), পবন ও কেতকাদাস (মরাচাঁদ), হরেন মাস্টার (গোত্রান্তর), প্রভঞ্জন (দেবীগর্জন), মামা (গর্ভবতী জননী), কেদার (আজ বসন্ত), সুরে ডাক্তার (চলো সাগরে) প্রভৃতি।

নাট্যনির্দেশক হিসাবেও তিনি সমান সফল ছিলেন। গণনাট্য সঙ্ঘে তাঁর নাটক জবানবন্দী এবং নবান্ন ছিল অসাধারণ দুটি প্রযোজনা। পরে তিনি তাঁর নিজের গ্রুপ থিয়েটারেও বহু নাটকের সফল প্রযোজনা এবং নির্দেশক ছিলেন।

উৎপল দত্ত (২৯ মার্চ, ১৯২৯ — ১৯ আগস্ট, ১৯৯৩) হলেন একজন বাঙালি অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক ও লেখক। তার জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশালে (বর্তমানে বাংলাদেশের অংশ)। তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনা করেন।

উৎপল দত্ত প্রথম দিকে বাংলা মঞ্চনাটকে অভিনয় করতেন। তিনি শেক্সপিয়ার আন্তর্জাতিক থিয়েটার কোম্পানির সাথে ভ্রমণ করেছেন বেশ কয়েকবার। তাঁকে গ্রুপ থিয়েটার অঙ্গনের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হয়। কৌতুক অভিনেতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তিনি হিন্দি কৌতুক চলচ্চিত্র গুড্ডি, গোলমাল ও শৌখিনে অভিনয় করেছেন। তিনি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় হীরক রাজার দেশে, জয় বাবা ফেলুনাথ এবং আগন্তুক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। মননশীল ছবি ছাড়াও অজস্র বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত। রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে তিনি ছিলেন বামপন্থী ও মার্ক্সবাদী।

উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে 'টিনের তলোয়ার', 'মানুষের অধিকার', 'দিল্লী চলো', 'ছায়ানট' (১৯৫৮), 'অঙ্গার' (১৯৫৯), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১), 'ঘুম নেই' (১৯৬১), 'মে দিবস' (১৯৬১), 'দ্বীপ' (১৯৬১), 'স্পেশাল ট্রেন' (১৯৬১), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৬১), 'ভি.আই.পি.' (১৯৬২), 'মেঘ' (১৯৬৩), 'রাতের অতিথি' (১৯৬৩), 'সমাজতান্ত্রিক চাল' (১৯৬৫), 'কল্লোল' (১৯৬৫), 'হিম্মৎবাই' (১৯৬৬), 'রাইফেল' (১৯৬৮), 'মানুষের অধিকার' (১৯৬৮), 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' (১৯৬৯), 'মাও-সে-তুং' (১৯৭১), 'পালা-সন্ন্যাসীর তরবারি' (১৯৭২), 'বৈশাখী মেঘ' (১৯৭৩), 'দুঃস্বপ্নের নগরী' (১৯৭৪), 'সীমান্ত' প্রভৃতি।

শম্ভু মিত্র (২২ অগস্ট, ১৯১৫ — ১৯ মে, ১৯৯৭) ছিলেন বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী ও চলচ্চিত্র অভিনেতা। ১৯৩৯ সালে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে যোগ দেন। পরে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নাট্যসংস্থা বহুরূপী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র ও কন্যা শাঁওলী মিত্রও স্বনামধন্য মঞ্চাভিনেত্রী। শাঁওলী মিত্রের নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল নবান্ন, দশচক্র, রক্তকরবী, রাজা অয়দিপাউস ইত্যাদি। তাঁর চলিত নাটকের মধ্যে চাঁদ বণিকের পালা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কারার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

শম্ভু মিত্রের জন্ম কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে মাতামহ ডাঃ আদিনাথ বসুর গৃহে। তাঁর পিতার নাম শরৎকুমার বসু ও মাতার নাম শতদলবাসিনী দেবী। শম্ভু মিত্রের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলার কলাছাড়া গ্রামে। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করে ভরতি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তবে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেননি। ১৯৩৯ সালে রংমহলে যোগদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে তাঁর পদার্পণ। পরে যোগ দিয়েছিলেন মিনার্ভায়। নাট্যনিকেতনে কালিন্দী নাটকে অভিনয়ের সূত্রে সেযুগের কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় আলমগীর নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন। কিন্তু এই সময় থেকেই শিশিরকুমারের থেকে আলাদা সম্পূর্ণ নিজস্ব এক নাট্যঘরানা তৈরিতে উদ্যোগী হন শম্ভু মিত্র।

১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী সঙ্ঘের সঙ্গে পরিচিত হন শম্ভু মিত্র। ১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি.সি. যোশির অনুপ্রেরণায় যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে। ১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর গণনাট্য সঙ্ঘে কাজ করার সময়ই প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন শম্ভু মিত্র।

১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠন করেন বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। তাঁর এই পরিচালনাগুলি ভারতীয় নাটকের ইতিহাসে এক একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৭০ সালে একটি আর্ট কমপ্লেক্স নির্মাণে উদ্দেশ্য গঠন করেন। বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সমিতি। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য সমিতির প্রযোজনায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ মুদ্রারাক্ষসনাটকে অভিনয়ও করেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়া গেলে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে এক বছরের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো হয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালের ১৬ জন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দশচক্র নাটকে অভিনয় করেন। বহুরূপীর প্রযোজনায় এটিই তাঁর শেষ নাটক। এই বছরই ১৫ অগস্ট অ্যাকাডেমিতে স্বরচিত চাঁদ বনিকের পালা নাটকটি পাঠ করেন তিনি। এরপর বহুরূপীর আর কোনো প্রযোজনায় তাঁকে দেখা যায়নি।

১৯৭৯ সালে প্রায় দৃষ্টিহীন অবস্থায় প্রযোজিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ফ্রিৎস বেনেভিৎজের পরিচালনায় ক্যালকাটা রিপোর্টারির প্রযোজনায় গ্যালিলিওর জীবন নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৮৩ সালে নিজের প্রয়োজনায় কন্যা শাঁওলী মিত্র পরিচালিত নাথবতী অনাথবৎ নাটকে কন্যার সঙ্গে অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র। শাঁওলী মিত্রের পরবর্তী নাটকে কথা অমৃতসমান-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। কন্যার নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও আমৃত্যু কর্মসমিতি সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রসদনে পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনায় ও তাঁর পরিচালনায় দশচক্র নাটকটির পরপর ছয়টি অভিনয় পাঁচ দিনে মঞ্চস্থ হয়। অভিনেতা রূপে এর পর আর কোনোদিন মঞ্চে অবতীর্ণ হননি তিন।

১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত করে। যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক ডি.লিট. উপাধিতেও ভূষিত করেছিল।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কলকাতার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শম্ভু মিত্র। ইচ্ছাপত্র-এ তিনি লিখেছিলেন, ''মোট কথা আমি সামান্য মানুষ, জীবনের অনেক জিনিস এড়িয়ে চলেছি, তাই মরবার পরেও আমার দেহটা যেন তেমনই নীরবে, একটু ভদ্রতার সঙ্গে, সামান্য বেশে, বেশ একটু নির্লিপ্তির সঙ্গে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে।'' এই কারণে সৎকার সমাধা হওয়ার পূর্বে সংবাদমাধ্যমে শম্ভু মিত্রের মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা হয়নি।

বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র পরিচালিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল : 'নবান্ন', 'বিভাব', 'ছেঁড়া তার', 'পথিক', 'দশচক্র', 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'পুতুলখেলা', 'মুক্তধারা', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'বিসর্জন', 'রাজা অয়দিপাউস', 'রাজা', 'বাকি ইতিহাস', 'পাগলা ঘোড়া', 'চোপ আদালত চলছে' ইত্যাদি। চাঁদ বণিকের পালা তাঁর রচিত একটি কালজয়ী নাটক। এই নাটকের প্রযোজনা করা তার সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি এই নাটক পাঠ করেছেন এবং রেকর্ডও করেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : উলুখাগড়া, বিভাব, ঘূর্ণি, কাঞ্চনরঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী বর্তমান ও অতুলনীয় সংবাদ নামে দুটি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন। নাট্যরচনা ছাড়াও শম্ভু মিত্র পাঁচটি ছোটোগল্প ও একাধিক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কাকে বলে নাট্যকলা ও প্রসঙ্গ : নাট্য দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ। শম্ভু মিত্র ছিলেন বাংলার এক স্বনামধন্য আবৃত্তি শিল্পী। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীয় গলি কবিতাটি আবৃত্তি করে তিনি জনসমাজে বিশেষ সাড়া ফেলেছিলেন। রক্তকরবী, চার অধ্যায়, রাজা অয়দিপাউস, তাহার নাম রঞ্জনা, ডাকঘর, চাঁদ বণিকের পালা ও অয়দিপাউসের গল্প তাঁর স্বকণ্ঠে

রেকর্ড করা নাট্যপাঠ। এছাড়া শম্ভু মিত্র (কবিতা আবৃত্তি), রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ, দিনান্তের প্রণাম তা প্রসিদ্ধ বাংলা কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড। নাট্যভিনয়ের সূত্রে চলচ্চিত্র জগতেও পা রেখেছিলেন শম্ভু মিত্র। খাজা আহমেদ আব্বাসের পরিচালনায় নির্মিত হিন্দি ছবি ধরতি কে লাল-এর সহকারী পরিচালক ছিলেন তিনি। অভিনয় করেছেন মানিক, শুভবিবাহ, ৪২, কাঞ্চনরঙ্গ, পথিক, বউ-ঠাকুরাণীর হাট প্রভৃতি চলচ্চিত্রে। অমিত মিত্রের সঙ্গে একদিন রাত্রে ও তার হিন্দি জগতে রহো-র কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার কাজ করেন। রাজ কাপুর প্রযোজিত ও অভিনীত জাগতে রহো ছবিটি গ্রাঁ পিঁ সম্মানে ভূষিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বিনোদন কার্যকলাপ কেবল বিনোদনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার একটি বৃহত্তর তাৎপর্য ছিল। সাহিত্যের পাশাপাশি মঞ্চাভিনয় সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির ভূমিকা : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা নাট্যচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারি নাট্যগবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নাট্যচর্চা কেন্দ্র। নাট্য আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ১৯৮৭ সালে। এই আকাদেমির উপর বাংলার প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরে নাট্য কর্মশালা ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন, নাট্য গবেষণা এবং নাটক সংক্রান্ত পুস্তক ও নাট্য বিশ্বেকোষ প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতি বছর বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন। এর মধ্যে নাট্যমেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত নাট্য উৎসবের আয়োজনও আকাদেমি কর্তৃপক্ষ করেছেন। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় ১৯৯৯ সালে ব্রেশ্‌ট রচিত নাটকের মেলা। আকাদেমির উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকুমার সভা। এটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। উৎপল দত্ত, হাবিব তানবীর, মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নাট্য আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আছেন। যদিও সম্প্রতি নন্দীগ্রামে সরকারি গুলি চালনার প্রতিবাদে অনেক নাট্যব্যক্তিত্ব সরকারিভাবে নাট্য আকাদেমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি চত্বরের অদূরে স্থিত নাট্য ভবনে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ২০০৭ সালের ৬ মার্চ আকাদেমির বিংশতি বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে উদ্বোধিত এই ভবনে একটি সভাঘর, প্রেক্ষাগৃহ ও অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলা নাট্যচর্চার সার্বিক সমৃদ্ধি। নাটকের উন্নতিকল্পে সরকারি অর্থ সাহায্যে নাট্য আকাদেমি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন, তেমনই বাংলা নাটকের ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও গ্রন্থ-কোষগ্রন্থ প্রকাশনাও। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে আকাদেমি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে।

আবার কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের জেলাশহর, মহকুমা শহর, সাধারণ মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বও নাট্য আকাদেমি বিশেষ গুরত্বসহকারে পালন করে থাকেন। এর ফলে নাট্যচর্চাকে সমাজের তৃণমূলস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

● নাট্য প্রশিক্ষণ

সারা বছর ধরেই নাট্য আকাদেমি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে থাকেন। এই সব কর্মশালায় নাট্যকর্মীদের আধুনিক পদ্ধতিতে দৈহিক ভাষা বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ বা ভয়েস মডিউলেশন, আবৃত্তি ও স্বরভঙ্গি, অভিনয়, ছন্দ ও সংগীত, মুখাভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা, পোষাক ও সাজসজ্জা, নাট্যরচনা, থিয়েটার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রযোজনার লক্ষ্যে যে কর্মশালাগুলি আয়োজিত হয় সেগুলিতে

শিক্ষার্থীদের প্রযোজনা ও নাট্য-উপস্থাপনার প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক শেখানো হয়ে থাকে। বাংলা বিভিন্ন স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্বগণ এই সব কর্মশালায় প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত হন। এমনকি প্রয়াত বি ভি করন্থ, এইচ কানহাইলাল ও ডক্টর মোহন আগাসের মতো ভারতের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বগণও বাংলা আকাদেমির নাট্য প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আছেন।

● নাট্য উৎসব

প্রতি বছর ছোটো-বড়ো পেশাদার-অপেশাদার মিলিয়ে ৭৫-১০০টি শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি নাট্যমেলার আয়োজন করে। নন্দন-রবীন্দ্রসদন-বাংলা আকাদেমি চত্বরে আয়োজিত এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলি হল আলোচনা সভা, সেমিনার, নাট্যমঞ্চায়ণ, নাটক পাঠ ইত্যাদি। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন শহরে বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বাংলা নাট্য উৎসবের আয়োজন করে থাকে নাট্য আকাদেমি। এছাড়াও বেশ কিছু বিশেষায়িত নাট্য উৎসব যেমন ছোটোদের নাটক, মহিলা নির্দেশকদের নাটক, পথনাটক, পুতুলনাচ প্রভৃতির আয়োজন করে থাকে।

● প্রযোজনা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ধ্রুপদী বাংলা নাটকের প্রযোজনা করে থাকে। আকাদেমির কয়েকটি সুবিখ্যাত প্রযোজনা হল প্রয়াত উৎপল দত্ত নির্দেশিত চৈতালী রাতের স্বপ্ন (উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বিরচিত আ মিডসামার নাইটস ড্রিম অবলম্বনে), বিভাস চক্রবর্তী নির্দেশিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বলিদান এবং অশোক মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকুমার সভা ইত্যাদি।

● প্রকাশনা

আকাদেমি প্রকাশিত বার্ষিক নাট্য আকাদেমি পত্রিকা নিবন্ধ, শ্রদ্ধালেখ, ভাষণ, নাটকের স্ক্রিপ্ট, পুরনো লেখার পুনর্মুদ্রণ, সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশ করে। এছাড়া নাট্য আকাদেমি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কুমার রায়, খালেদ চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখের জীবনী; কলকাতার নাটক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের চিত্র-অ্যালবাম; বিভিন্ন নাট্যকারের নির্বাচিত নাটক এবং বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস ও অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থ।

● অভিলেখাগার ও গ্রন্থাগার

নাট্য আকাদেমির অভিলেখাগারে সংগৃহীত রয়েছে বিভিন্ন স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্বের ৩৬টি সাক্ষাৎকার, ১৬টি অসামান্য নাট্যপ্রযোজনার ভিডিও রেকর্ডিং, বহু পুরনো ও নতুন নাটক, নাট্যশালা ও নাট্য প্রশিক্ষণের ফটোগ্রাফ ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারটি এখনও নির্মীয়মান। যদিও এই গ্রন্থাগারের জন্য অনেক নাট্যকর্মী তাঁদের সংগ্রহ দান করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবনারায়ণ গুপ্ত, বর্ধমানের প্রশান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। গ্রন্থাগারটি নতুন ভবনে (নাট্য ভবন) চালু হবে।

● সেমিনার ও বক্তৃতা

নাট্য আকাদেমি সারা বছরই বিভিন্ন সেমিনার ও সাধারণ বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে। শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের নামাঙ্কিত দুটি স্মারক বক্তৃতা আকাদেমিতে প্রতি বছর আয়োজিত হয়। এই বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন

উৎপন দত্ত, হাবিব তানবীর, দীনা পাঠক, কে এন পানিক্কর্ জি পি দেশপাণ্ডে, সুমিত সরকার, মে কে রায়না, বি ভি করন্থ, এইচ এস শিবপ্রকাশ, রতন থিয়াম, পবিত্র সরকার, বিভাস চক্রবর্তী, সত্যদেব দুবে, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মনোজ মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দাশ, অশোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই বক্তৃতাগুলি রেকর্ড করে রাখা হয়েছে।

● সহযোগ প্রকল্প

নাট্যচর্চা প্রসার প্রকল্প নামক একটি প্রকল্পের শিরোনামে নাট্য আকাদেমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনা চক্র, সেমিনার, বক্তৃতা, কর্মশালা প্রভৃতি আয়োজন করে থাকে। যৌথ উদ্যোগে নাট্য প্রযোজনাও চলে।

● সম্মাননা ও অনুদান

পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক তিন নাট্য পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এগুলি হল

- ★ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার—প্রযোজনা, নাট্যরচনা, অভিনয়, নির্দেশনা, মঞ্চসজ্জা, নকশা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রদত্ত
- ★ দীনবন্ধু পুরস্কার—সারা জীবনের কৃতিত্বের জন্য
- ★ গিরিশ পুরস্কার—সারা জীবনের কৃতিত্বের জন্য

এই পুরস্কারগুলি ছাড়াও দুঃস্থ নাট্যকর্মীদের সাহায্যার্থে বিশেষ প্রকল্পে বা নতুন প্রযোজনার জন্য বিভিন্ন অনুদান নাট্য আকাদেমি দিয়ে থাকে।

৮.৬.১৫.২.১ : চলচ্চিত্র

কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রধান কেন্দ্রটি অবস্থিত। এই কারণে এই কেন্দ্রটি হলিউডের অনুকরণে 'টলিউড' নামে পরিচিত হয়ে থাকে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প আর্ট ফিল্ম বা শিল্পগুণান্বিত চলচ্চিত্রে সুসমৃদ্ধ। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট পরিচালকের চলচ্চিত্র বিশ্ববন্দিত। সমসাময়িককালের বিশিষ্ট পরিচালকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন ও ঋতুপর্ণ ঘোষ। বাংলা সিনেমার পাশাপাশি এই রাজ্যে অবশ্য হিন্দি সিনেমাও অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা পরিচালক ও সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন বাঙালি পরিচালকেরা। সত্যজিৎ রায় তার পথের পাঁচালি, দেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা এসব চলচ্চিত্রের জন্য বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তিনি ১৯৯২ সালে সম্মানসূচক অস্কার পান। তার প্রধান দুই অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর সমগ্র বিশ্বে নন্দিত তাদের অনবদ্য অভিনয়ের জন্য। শর্মিলা ২০০৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্র উৎসব কান-এ বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তার অভিনীত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অনু ট্রিলজি চলচ্চিত্র সিরিজটি যুক্তরাষ্ট্রের সাইট অ্যান্ড সাউন্ড ম্যাগাজিন কর্তৃক ঘোষিত পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা ১০০টি চলচ্চিত্রের তালিকায় স্থান পায়। সত্যজিৎ রায় দেবী (শর্মিলা-সৌমিত্র অভিনীত) ও কাঞ্চনজঙ্ঘা চলচ্চিত্রের জন্য বিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে জার্মানির বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে দুবার সেরা পরিচালকের পুরস্কার পান।

■ সত্যজিৎ রায়

চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যজিৎ ছিলেন বহুমুখী এবং তাঁর কাজের পরিমাণ বিপুল। তিনি ৩৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র *'পথের পাঁচালী'* (১৯৫৫) ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে, এর মধ্যে অন্যতম ১৯৫৬ কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া ''শ্রেষ্ঠ মানব দলিল'' *(Best Human Documentary)* পুরস্কার। *পথের পাঁচালী, অপরাজিত* (১৯৫৬) ও *অপুর সংসার* (১৯৫৯)—এই তিনটি একত্রে *অপুর ত্রয়ী* নামে পরিচিত, এবং এই চলচ্চিত্র-ত্রয়ী সত্যজিতের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে বহুল স্বীকৃত। চলচ্চিত্র মাধ্যমে সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনা, চরিত্রায়ন, সঙ্গীত স্বরলিপি রচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা, সম্পাদনা, শিল্পী-কুশলীদের নামের তালিকা ও প্রচারণাপত্র নকশা করাসহ নানা কাজ করেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের বাইরে তিনি ছিলেন একাধারে কল্পকাহিনী লেখক, প্রকাশক, চিত্রকর, গ্রাফিক নকশাবিদ ও চলচ্চিত্র সমালোচক। বর্ণময় কর্মজীবনে তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, যার মধ্যে বিখ্যাত হল ১৯৯২ সালে পাওয়া একাডেমি সম্মানসূচক পুরস্কার (অস্কার), যা তিনি সমগ্র কর্মজীনের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেন। তিনি এছাড়াও ৩২টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১টি গোল্ডেন লায়ন, ২টি সিলভার বিয়ার লাভ করেন।

● অপু বছরগুলো (১৯৫০-৫৯)

সত্যজিৎ ঠিক করেন যে, বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী ''বিল্ডুংসরোমান'' *পথের পাঁচালী*-ই হবে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রের প্রতিপাদ্য। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই প্রায়-আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটিতে বাংলার এক গ্রামের ছেলে অপুর বেড়ে ওঠার কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

এ ছবি বানানোর জন্য সত্যজিৎ কিছু পূর্ব-অভিজ্ঞতাবিহীন কুশলীকে একত্রিত করেন, যদিও তাঁর ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র ও শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত দুজনেরই পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন। এ ছাড়া ছবির বেশির ভাগ অভিনেতাই ছিলেন শৌখিন। ১৯৫২ সালের শেষ দিকে সত্যজিৎ তাঁর নিজের জমানো পয়সা খর করে দৃশ্যগ্রহণ শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন প্রাথমিক দৃশ্যগুলো দেখার পরে হয়ত কেউ ছবিটিতে অর্থলগ্নি করবেন। কিন্তু সে ধরনের আর্থিক সহায়তা মিলছিল না। *পথের পাঁচালী*-র দৃশ্যগ্রহণ তাই থেমে থেমে অস্বাভাবিকভাবে প্রায় দীর্ঘ তিন বছর ধরে সম্পন্ন হয়। কেবল তখনই দৃশ্যগ্রহণ করা সম্ভব হত যখন সত্যজিৎ বা নির্মাণ ব্যবস্থাপক অনিল চৌধুরী প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান করতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে ঋণ নিয়ে ১৯৫৫ সালে ছবিটি নির্মাণ সম্পন্ন হয় ও সে বছরই এটি মুক্তি পায়। মুক্তি পাওয়ার পর পরই ছবিটি দর্শন-সমালোচক সবার অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে ও বহু পুরস্কার জিতে নেয়। ছবিটি বহুদিন ধরে ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রদর্শিত হয়। ছবিটি নির্মাণের সময় অর্থের বিনিময়ে চিত্রনাট্য বদলের জন্য কোন অনুরোধই সত্যজিৎ রাখেননি। এমনকি একটি সুখী সমাপ্তির (যেখানে ছবির কাহিনীর শেষে অপুর সংসার একটি ''উন্নয়ন প্রকল্পে'' যোগ দেয়) জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধও তিনি উপেক্ষা করেন।

ভারতে ছবিটির প্রতিক্রিয়া ছিল উৎসাহসঞ্চারী। *দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া*-তে লেখা হয়, ''It is absurd to compare it with any other Indian cinema... *Pather Panchali* is pure cinema'' (''একে অন্য যেকোনও ভারতীয় চলচ্চিত্রের সাথে তুলনা করা অবাস্তব... *পথের পাঁচালী* হল বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র'')। যুক্তরাজ্যে লিন্‌জি অ্যান্ডরসন চলচ্চিত্রটির অত্যন্ত ইতিবাচক একটি সমালোচনা লেখেন। তবে ছবিটির সব সমালোচনাই এ রকম ইতিবাচক ছিল না। বলা হয় যে ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো ছবিটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন : ''কৃষকেরা হাত দিয়ে

খাচ্ছে—এরকম দৃশ্যসম্বলিত ছবি আমি দেখতে চাই না।" দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সবচেয়ে প্রভাবশালী সমালোচক বসলি ক্রাউদার ছবিটির একটি কঠোর সমালোচনা লেখেন এবং সেটি পড়ে মনে করা হয়েছিল যে ছবিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেলেও ভাল করবে না। কিন্তু এর বদলে ছবিটি সেখানে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি দিন ধরে প্রদর্শিত হয়।

সত্যজিতের পরবর্তী ছবি *অপরাজিত*-এর সাফল্য তাঁকে আন্তর্জাতিক মহলে আরও পরিচিত করে তোলে। এই ছবিটিতে তরুণ অপুর উচ্চাভিলাষ ও তাঁর মায়ের ভালবাসার মধ্যকার চিরন্তন সংঘাতকে মর্মভেদী রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়। বহু সমালোচক, যাদের মধ্যে মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটক অন্যতম, ছবিটিকে সত্যজিতের প্রথম ছবিটির চেয়েও ওপরে স্থান দেন। *অপরাজিত* ভেনিসে গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার জেতে। অপু ত্রয়ী শেষ করার আগে সত্যজিৎ আরও দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ সমাপ্ত করেন। প্রথমটি ছিল *পরশ পাথর* নামের একটি হাস্যরসাত্মক ছবি। আর পরেরটি ছিল জমিদারী প্রথার অবক্ষয়ের ওপর নির্মিত *জলসাঘর,* যেটিকে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সত্যজিৎ *অপরাজিত* নির্মাণের সময় একটি ত্রয়ী সম্পন্ন করার কথা ভাবেননি, কিন্তু ভেনিসে এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা শুনে তাঁর মাথায় এটি বাস্তবায়নের ধারণা আসে। অপু সিরিজের শেষ ছবি *অপুর সংসার* ১৯৫৯ সালে নির্মাণ করা হয়। আগের দুটি ছবির মত এটিকেও বহু সমালোচক সিরিজের সেরা ছবি হিসেবে আখ্যা দেন (রবিন উড, অপর্ণা সেন)। এ ছবির মাধ্যমেই সত্যজিতের দুই প্রিয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুরের চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ছবিটিতে অপুকে দেখানো হয় কলকাতার এক জীর্ণ বাড়িতে প্রায়-দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করতে। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অপর্ণার সাথে অপুর বিয়ে হয়। তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যে ''বিবাহিত জীবন সম্পর্কে ছবিটির ধ্রুপদী ইতিবাচকতা ফুটে ওঠে", কিন্তু শীঘ্রই এক বিয়োগান্তক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। একজন বাঙালি সমালোচক *অপুর সংসার*-র একটি কঠোর সমালোচনা লেখেন এবং সত্যজিৎ এর উত্তরে ছবিটির পক্ষে একটি সুলিখিত নিবন্ধ লেখেন—যা ছিল সত্যজিতের কর্মজীবনে একটি দুর্লভ ঘটনা (সত্যজিতের প্রত্যুত্তরের এরকম ঘটনা আরেকবার ঘটে তাঁর পছন্দের *চারুলতা* ছবিটি নিয়ে)।

সত্যজিতের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর তাঁর কর্মজীবনের সাফল্যের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। সত্যজিতের নিজস্ব কোন বাড়ি ছিল না; তিনি তাঁর মা, মামা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে এক ভাড়া বাড়িতেই সারা জীবন কাটিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলে দুজনেই তাঁর কাজের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। বেশির ভাগ চিত্রনাট্য বিজয়াই প্রথমে পড়তেন এবং ছবির সঙ্গীতের সুর তৈরীতেও তিনি স্বামীকে সাহায্য করতেন। আয়ের পরিমাণ কম হলেও সত্যজিৎ নিজেকে বিত্তশালীই মনে করতেন, কেননা পছন্দের বই বা সঙ্গীতের অ্যালবাম কিনতে কখনোই তাঁর কষ্ট হয়নি।

● দেবী থেকে চারুলতা (১৯৫৯-৬৪)

কর্মজীবনের এই পর্বে সত্যজিৎ নির্মাণ করেন রাজ পর্বের ওপর চলচ্চিত্র (যেমন *দেবী*), রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র, একটি হাস্যরসাত্মক ছবি ('মহাপুরুষ') এবং মৌলিক চিত্রনাট্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র (কাঞ্চনজঙ্ঘা)। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, সমালোচকদের মতে যেগুলোর মত করে ছবির পর্দায় ভারতীয় নারীদের এত অনুভূতি দিয়ে এর আগে কেউ ফুটিয়ে তোনেনি। পলিন কেল মন্তব্য করেন যে, তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি সত্যজিৎ নারী নন, পুরুষ।

অপুর সংসার নির্মাণের পরে সত্যজিৎ *দেবী* ছবির কাজে হাত দেন। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মজ্জাগত কুসংস্কার ছিল ছবিটির বিষয়। ছবিটিতে শর্মিলা ঠাকুর দয়াময়ী নামের এক তরুণ বধুর চরিত্রে অভিনয় করেন, যাকে তার শ্বশুর কালী বলে পূজা করতেন। শর্মিলা পরে এই ছবিতে তাঁর অভিনয় নিয়ে মন্তব্য করেন যে *দেবীতে* তিনি নিজের থেকে কিছু করেননি, বরং এক জিনিয়াস তাঁকে দিয়ে সেটা করিয়ে নিয়েছিলেন। সত্যজিৎ আশঙ্কা করেছিলেন যে ভারতীয় সেন্সর বোর্ড হয়ত ছবিটি প্রদর্শনে বাধা দেবে, বা হয়ত তাঁকে ছবিটি পুনরায় সম্পাদনা করতে বলবে, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। ১৯৬১ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর প্ররোচনায় সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিগুরুর ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভিডিও ফুটেজের অভাবে সত্যজিৎকে মূলত স্থিরচিত্র দিয়েই ছবিটি বানানোর চ্যালেঞ্জ হাতে নিতে হয় এবং তিনি পরে মন্তব্য করেন যে ছবিটি বানাতে তাঁর সাধারণের চেয়ে তিন গুণ বেশি সময় লেগেছিল। একই বছরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যের সাথে মিলে সত্যজিৎ *সন্দেশ* নামের শিশুদের পত্রিকাটি—যেটি তাঁর পিতামহ একসময় প্রকাশ করতেন—পুনরায় প্রকাশ করা শুরু করেন। সত্যজিৎ এ জন্য বহুদিন ধরে অর্থসঞ্চয় করেছিলেন। পত্রিকাটি ছিল একাধারে শিক্ষামূলক ও বিনোদনধর্মী এবং ''সন্দেশ'' নামটিতে (শব্দটির দুটি অর্থ হয় : ''খবর'' ও 'মিষ্টি'') এই দ্বিত্বতার প্রতিফলন ঘটেছে। সত্যজিৎ পত্রিকাটির ভেতরের ছবি আঁকতেন ও শিশুদের জন্য গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তী বছরগুলোতে লেখালেখি করা তাঁর আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়।

১৯৬২ সালে সত্যজিৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিটি পরিচালনা করেন। এটি ছিল তাঁর বানানো প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্যনির্ভর রঙিন চলচ্চিত্র। দার্জিলিং নামের এক পাহাড়ী রিসোর্টে একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের কাটানো এক বিকেলের কাহিনী নিয়ে এই জটিল ও সঙ্গীতনির্ভর ছবিটি বানানো হয়, যে বিকেলে পরিবারের সদস্যরা হঠাৎ করেই পরিবারের দণ্ডমুণ্ড কর্তা ইন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ছবিটি প্রথমে একটি বিরাট ম্যানশনে চিত্রায়িত করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পরে সত্যজিৎ সেই বিখ্যাত রিসোর্টেই দৃশ্যগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তিনি চিত্রনাট্যটির উত্তেজনা আলো-আঁধারের খেলা ও কুয়াশাকে ব্যবহার করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সত্যজিৎ পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন যে তাঁর চিত্রনাট্যে যেকোন ধরনের আলোকসম্পাতেই দৃশ্যগ্রহণ সম্ভব ছিল, অথচ একই সময়ে দার্জিলিং-এ অবস্থানকারী একটি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দল সূর্যালোকের অভাবে একটি শটও সম্পন্ন করতে পারেনি।[৩১] ছবিটিতে ইন্দ্রনাথ রায়ের চরিত্রে রূপদানের জন্য সত্যজিৎ ছবি বিশ্বাসকে নির্বাচন করেন। এটিই ছিল ছবি বিশ্বাসের করা শেষ ছবি; এর কিছুদিন পরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ফলে সত্যজিৎ পরবর্তীকালে কিছু চরিত্র অঙ্কনে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়, কেননা তাঁর মনে হয়েছিল একমাত্র ছবি বিশ্বাসই সেসব চরিত্র রূপদান করার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

এসময় সত্যজিৎ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন, যদিও তিনি অনুযোগ করতেন যে কলকাতার বাইরে তাঁর নিজেকে সৃষ্টিশীল মনে হত না। ১৯৬৩ সালে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন, ফেদেরিকো ফেলিনির ৪½ ছবিটি সেরা পুরস্কার জেতে। ষাটের দশকে জাপান সফরের সময় তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। দেশে অবস্থানকালে কলকাতার ব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দার্জিলিং বা পুরী-তে চলে যেতেন ও সেখানে নির্জনে চিত্রনাট্য লিখতেন।

১৯৬৪ সালে সত্যজিৎ *চারুলতা* ছবিটি নির্মাণ করেন, যেটি ছিল তাঁর কর্মজীবনের এই পর্বের শেষ ছবি এবং অনেক সমালোচকের মতে তাঁর সবচেয়ে সফল চলচ্চিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প *নষ্টনীড়* অবলম্বনে নির্মিত ছবিটিতে ১৯শ শতকের এক নিঃসঙ্গ বাঙালি বঙু চারু ও ঠাকুরপো অমলের প্রতি তার অনুভূতির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মোৎসার্টীয় এই ছবিটিকে প্রায়ই 'নিখুঁত' বলে অভিহিত করা হয়। সত্যজিৎ নিজেও বলেছেন যে এই ছবিটিতে তাঁর ভুলের সংখ্যা সবচেয়ে কম এবং এটিই তাঁর নির্মিত একমাত্র ছবি, যেটি আবার সুযোগ পেলে তিনি ঠিক একইভাবে বানাতেন। ছবিটিতে চারু চরিত্রে মাধুবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় এবং সুব্রত মিত্র ও বংশী দাশগুপ্তের কাজ উচ্চ প্রশংসা পায়। ছবিটির দুটি দৃশ্য সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হচ্ছে ছবিটির নির্বাক প্রথম সাত মিনিট, যা চারুর একঘেয়েমি জীবন ফুটিয়ে তোলে এবং দ্বিতীয়টি হল ''বাগানের দোলনার দৃশ্য'' যেখানে চারু অমলের জন্য তার ভালবাসার মুখোমুখি হয়। এ পর্বে সত্যজিতের নির্মিত অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *মহানগর, তিনকন্যা, অভিযান* এবং *কাপুরুষ ও মহাপুরুষ।*

● নতুন দিকনির্দেশনা (১৯৬৫-১৯৮২)

কাছের মানুষদের কাছে সত্যজিতের ডাক নাম ছিল ''মানিক''। তিনি তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্রকারদের চেয়ে সাধারণ জনগণের সাথে অনেক বেশি মিশেছেন। অচেনা লোকদের তিনি প্রায়ই সাক্ষাৎ দিতেন। কিন্তু সাক্ষাৎকারীদের অনেকেই সত্যজিৎ ও তাদের মাঝে একটা দূরত্ব অনুভব করতেন। বাঙালিরা এটাকে ভাবতেন তাঁর ইংরেজ মানসিকতার প্রকাশ, আর পশ্চিমীরা ভাবতেন তাঁর শীতল ও গম্ভীর আচরণ ছিল ব্রাহ্মণদের মত। অভিনেতাদের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল, কিন্তু তাদের অযোগ্যতায় বিরূপভাবও কখনো কখনো প্রকাশ করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কখনোই তেমন আলোকপাত করা হয়নি, তবে কারও কারও মতে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সাথে ষাটের দশকে তাঁর সম্পর্ক ছিল।

চারুতলা-পরবর্তী বছরগুলোতে সত্যজিৎ ছিলেন বৈচিত্র্যে সন্ধানী; এসময় কল্পকাহিনী ও গোয়েন্দা কাহিনী থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ছবিও তিনি বানান। এ পর্বে তিনি তাঁর ছবিগুলোতে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চানান এবং সমকালীন ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো তাঁর ছবিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। এ পর্বে তাঁর প্রথম প্রধান চলচ্চিত্র ছিল *নায়ক*, যার বিষয় ছিল এক চলচ্চিত্র তারকার সাথে এক সহানুভূতিশীল তরণী সাংবাদিকের রেলযাত্রায় সময়কার সাক্ষাৎ ও সংলাপ। উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত এই ছবিতে ট্রেন যাত্রার ২৪ ঘন্টার পরিসরে এক আপাতসফল চলচ্চিত্র তারকার মনের অন্তর্সংঘাতগুলো উন্মোচন করা হয়। ছবিটি বার্লিনে সমালোচকদের পুরস্কার জিতলেও এটি নিয়ে তেমন আর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। ১৯৬৭ সালে সত্যজিৎ *দি এলিয়েন* নামে একটি ছবির জন্য চিত্রনাট্য লেখেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের যৌথ প্রযোজনার এই ছবিটির প্রযোজন ছিল কলাম্বিয়া পিকচার্স এবং পিটার সেলার্স ও মার্লোন ব্রান্ডো ছবিটির প্রধান অভিনেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু চিত্রনাট্য লেখা শেষ করার পর সত্যজিৎ জানতে পারেন যে সেটির স্বত্ব তার নয় ও এর জন্য তিনি কোন সম্মানও পাবেন না। পরবর্তীকালে মার্লোন ব্রান্ডো প্রকল্পটি ত্যাগ করেন। তাঁর স্থানে জেমস কোবার্ন কে আনার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ততদিনে সত্যজিতের আশা ভঙ্গ ঘটে এবং তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। পরে ৭০ ও ৮০-র দশকে কলাম্বিয়া বহুবার প্রকল্পটি পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৯৮২ সালে যখন স্টিভেন স্পিলবার্গের *ই. টি. দ্য এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল* মুক্তি পায়, তখন অনেকেই ছবিটির সাথে সত্যজিতের লেখা চিত্রনাট্যের মিল খুঁজে পান। সত্যজিৎ ১৯৮০ সালে *সাইট অ্যান্ড সাউন্ড* ম্যাগাজিনে লেখা একটি ফিচারে প্রকল্পটির

ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলেন ও পরে সত্যজিতের জীবনী লেখক অ্যান্ড্রু রবিনসন এ ঘটনার ওপর আরও বিস্তারিত লেখেন (১৯৮৯ সালে প্রকাশিত *দি ইনার আই*-এ)। সত্যজিৎ বিশ্বাস করতেন যে তাঁর লেখা *দি এলিয়েন*-এর চিত্রনাট্যটির মাইমোগ্রাফ কপি সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে না পড়লে স্পিলবার্গের ছবিটি বানানো হয়ত সম্ভব হত না।

সত্যজিতের ছেলে সন্দীপের অনুযোগ ছিল তিনি সবসময় বড়োদের জন্য গম্ভীর মেজাজের ছবি বানান। এর উত্তরে ও নতুনত্বের সন্ধানে সত্যজিৎ ১৯৬৮ সালে নির্মাণ করেন তাঁর সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবি *গুপী গাইন বাঘা বাইন।* এটি ছিল সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোরের লেখা ছোটদের জন্য একটি গল্পের ওপর ভিত্তি করে বানানো সঙ্গীতধর্মী রূপকথা। গায়ক গুপী ও ঢোলবাদক বাঘা ভুতের রাজার তিন বর পেয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে ও দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ থামানো চেষ্টা করে। ছবিটির নির্মাণকাজ ছিল ব্যয়বহুল, এবং অর্থাভাবে ছবিটি সাদা-কালোয় ধারণ করেন। যদিও তাঁর কাছে বলিউডের এক অভিনেতাকে ছবিতে নেয়ার বিনিময়ে অর্থের প্রস্তাব এসেছিল, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরে সত্যজিৎ তরুণ কবি ও লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একটি উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে *অরণ্যের দিনরাত্রি* ছবিটি নির্মাণ করেন। বলা হয় এই ছবিটির সঙ্গীত-কাঠামো চারুলতার চেয়েও বেশি জটিল ছিল। ছবিটিতে চার শহুরে তরুণ ছুটিতে বনে ঘুরতে যায় এবং একজন বাদে সকলেই নারীদের সাথে বিভিন্ন ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে যা তাদের মধ্যবিত্ত চরিত্রের নানা দিক প্রকাশ করে। রবিন উডের মতে ''(ছবিটির) একটিমাত্র দৃশ্য থেকেই... একটি ছোট গল্প লেখার রসদ পাওয়া সম্ভব। এ ছবিতে সত্যজিৎ মুম্বাই-ভিত্তিক অভিনেত্রী সিমি গারেওয়াল-কে এক আদিবাসী মহিলা হিসেবে চরিত্রায়ণ করেন; তাঁর মত শহুরে নারীকে সত্যজিৎ চরিত্রটির জন্য নির্বাচন করেছেন শুনে সিমি অবাক হয়েছিলেন।

অরণ্যের দিনরাত্রি-তে নির্মাণকুশলতা প্রদর্শন শেষে সত্যজিৎ মনোযোগ দেন তৎকালীন বাঙালি বাস্তবতার মর্মমূলে, যখন বামপন্থী নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা সর্বত্র অনুভূত হচ্ছিল। সত্যজিৎকে প্রায়ই বলা হত তিনি সমসাময়িক ভারতীয় শহুরে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে উদাসীন। এর জবাবে ১৯৭০-এর দশকে তিনি কলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনটি ছবি বানান যেগুলো : ''কলকাতা ত্রয়ী" নামেও পরিচিত : *প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৭০), *সীমাবদ্ধ* (১৯৭১), এবং *জন অরণ্য* (১৯৭৫)। চলচ্চিত্র তিনটি আলাদাভাবে পরিকল্পনা করা হলেও বিষয়বস্তুর মিলের কারণে এগুলোকে একটি দুর্বল ত্রয়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। *প্রতিদ্বন্দ্বী*-র নায়ক এক আদর্শবাদী তরুণ স্নাতক যার মোহমুক্তি ঘটলেও ছবির শেষ পর্যন্ত সে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েনি। *জন অরণ্য*-র নায়ক আরেক তরুণ যে জীবিকা নির্বাহের জন্য দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এবং *সীমাবদ্ধ*-র অর্থনৈতিকভাবে সফল প্রধান চরিত্রটি আরও লাভ করার জন্য সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দেয়। এগুলির মধ্যে *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবিতে সত্যজিৎ ভিন্ন ধরণের (elliptical) বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেন, যেখানে নেগেটিভ, স্বপ্নদৃশ্য ও হঠাৎ ফ্ল্যাশব্যাকের সহায়তা নেয়া হয়। এ ছাড়া ৭০-এর দশকে সত্যজিৎ তাঁর নিজের লেখা জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক ফেলুদার ওপর ভিত্তি করে *সোনার কেল্লা* ও *জয় বাবা ফেলুনাথ* ছবি দুটিও নির্মাণ করেন।

সত্যজিৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একটি ছবি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু পরে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এই মন্তব্য করে যে একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি শরণার্থীদের বেদনা ও জীবন-অভিযাত্রার প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিলেন, তাদের নিয়ে রাজনীতির প্রতি নয়। ১৯৭৭ সালে সত্যজিৎ *শতরঞ্জ কি খিলাড়ি* নামের একটি উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ছবিটি মুন্সি প্রেমচাঁদ-এর একটি গল্প অবলম্বনে তৈরি করা হয়; ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিপ্লবের এক বছর আগে অযোধ্যা রাজ্যে লক্ষ্ণৌ ছিল গল্পটির পটভূমি। ছবিটিতে

ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূত্রপাতের ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এটিই ছিল বাংলা ভাষার বাইরে অন্য ভাষায় বানানো সত্যজিতের প্রথম চলচ্চিত্র। এটি আরও ছিল তাঁর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও তারকাসমৃদ্ধ ছবি, যাতে সঞ্জীব কুমার, সাইদ জাফরি, আমজাদ খান, শাবানা আজমি, ভিক্টর ব্যানার্জি ও রিচার্ড অ্যাটেনব্রো-র মতো অভিনেতারা অংশ নেন। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ প্রেমচাঁদের গল্পের ওপর ভিত্তি করে হিন্দি ভাষায় এক-ঘন্টা দীর্ঘ *সদগতি* নামের একটি ছবি বানান। ছবিটিতে ভারতে বিদ্যমান অস্পৃশ্যতার ক্রুর বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়। ১৯৮০ সালে সত্যজিৎ *গুপী গাইন বাঘা বাইন* ছবির পরবর্তী পর্ব *হীরক রাজার দেশে* নির্মাণ করেন, যেটিতে তাঁর রাজনৈতিক মতামতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছবিটির চরিত্র *হীরক রাজা* ছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণাকালীন সরকারের প্রতিফলন। বহুল প্রশংসাপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র *পিকু* নির্মাণের মধ্য দিয়ে সত্যজিতের কর্মজীবনের এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

● শেষ পর্যায় (১৯৮৩-১৯৯২)

১৯৮৩ সালে *ঘরে বাইরে* কাজ করার সময় সত্যজিতের হার্ট অ্যাটাক ঘটে এবং এ ঘটনার ফলে জীবনের অবশিষ্ট নয় বছরে তাঁর কাজের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। স্বাস্থ্যের অবনতির ফলে ছেলে সন্দীপ রায়ের সহায়তায় সত্যজিৎ ১৯৮৪ সালে *ঘরে বাইরে* নির্মাণ সমাপ্ত করেন। এরপর থেকে তাঁর ছেলেই তাঁর হয়ে ক্যামেরার কাজ করতেন। অন্ধ জাতীয়তাবাদের ওপর লেখা রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপদানের ইচ্ছা সত্যজিতের অনেকদিন ধরেই ছল এবং তিনি ৪০-এর দশকে ছবিটির একটি চিত্রনাট্যও লিখেছিলেন।[৪৪] যদিও ছবিটিতে সত্যজিতের অসুস্থতাজনিত ভুলের ছাপ দেখা যায়, তা সত্ত্বেও ছবিটি কিছু সমালোচকের প্রশংসা কুড়ায় এবং এই ছবিতেই সত্যজিৎ প্রথমবারের মত একটি চুম্বনদৃশ্য যোগ করেন। ১৯৮৭ সালে সত্যজিৎ তাঁর বাবা সুকুমার রায়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন।

শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সত্যজিৎ তাঁর শেষ তিনটি ছবি অভ্যন্তরীণ মঞ্চে নির্মাণ করেন। এগুলি তাঁর আগের ছবিগুলির চেয়ে আলাদা ও অনেক বেশি সংলাপনির্ভর। ১৯৮৯ সালে নির্মিত *গণশত্রু* ছবিটিতে তাঁর পরিচালনা তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং এটিকে দীর্ঘদিনের অসুস্থতা শেষে ফিরে আসার পর সত্যজিতের চলচ্চিত্র নির্মাণের পুনঃপ্রচেষ্টা হিসেবেই গণ্য করা হয়। ১৯৯০ সালে নির্মিত *শাখা-প্রশাখা* সে তুলনায় উন্নততর ছবি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ছবিতে এক আজীবন সততার সাথে কাটানো বৃদ্ধ ব্যক্তি জীবনের শেষে পর্যায়ে এসে তাঁর তিন ছেলের দুর্নীতির কথা জানতে পারেন; ছবি শেষ দৃশ্যে তিনি তাঁর মানসিকভাবে অসুস্থ কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত চতুর্থ সন্তানের সান্নিধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পান। সত্যজিতের শেষ ছবি *আগন্তুক* ছিল হালকা আবহের। এ ছবিতে বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া মামার পরিচয় দিয়ে একজন আগন্তুক এক পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর এই সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার (যেখানে পরিবারের ছোট ছেলেটি আগন্তুকটিকে আগ্রহভরে স্বাগত জানায়, কিন্তু পরিবারের বড়োরা তাঁকে অনীহা ও সন্দেহের চোখে দেখেন) ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ দর্শকের কাছে মানুষের পরিচয়, স্বভাব-প্রকৃতি ও সভ্যতা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জাল বোনেন। সত্যজিতের ছবি গভীর মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ।

১৯৯২ সালে হৃদযন্ত্রের জটিলতা নিয়ে অসুস্থ সত্যজিৎ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সে অবস্থা থেকে তাঁর স্বাস্থ্য আর ভালো হয়নি। মৃত্যুর কিছু সপ্তাহ আগে অত্যন্ত অসুস্থ ও শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি তাঁর জীবনের শেষ পুরস্কার একটি সম্মানসূচক অস্কার গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল সত্যজিৎ মৃত্যুবরণ করেন।

● চলচ্চিত্র কুশলতা

সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনাকে পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করতেন। এ কারণেই কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর দুই বিদেশী ভাষায় নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন, এবং তারপর সেগুলো তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুবাদকেরা হিন্দি ও উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। সত্যজিৎ ও তাঁর শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তি মনে করতেন চলচ্চিত্রের ''চলচ্চিত্রের রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্বই চিত্রনাট্যের ওপর নির্ভরশীল।'' সত্যজিৎ সবসময় প্রথমে ইংরেজিতে চিত্রনাট্য লিখতেন যেন অবাঙালি বংশী চন্দ্রগুপ্ত তা পড়তে পারেন। সত্যজিতের প্রথম দিকের চলচ্চিত্রগুলো ক্যামেরার কাজ করতেন সুব্রত মিত্র, যিনি পরবর্তীকালে তিক্ততার মধ্য দিয়ে সত্যজিতের কর্মীদল থেকে বেরিয়ে যান। কিছু সমালোচকের মতে সুব্রতের প্রস্থানের কারণে সত্যজিতের চলচ্চিত্রের চিত্রধারণের মান নেমে যায়। বাইরে সুব্রতের প্রশংসা করলেও চারুলতা-র সময় থেকেই ক্যামেরার কাজ সত্যজিৎ নিজের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে থাকেন, এবং এর পরিণতিতে ১৮৬৬ সালের পর থেকে সুব্রত আর সত্যজিতের হয়ে কাজ করেননি। সুব্রত মিত্রের পথপ্রদর্শন কাজের মধ্যে রয়েছে ''বাউন্স আলোকসজ্জা'' কৌশল, যেখানে কাপড়ে আলো প্রতিফলিত করে অভ্যন্তরীণ সেটেও বাইরের প্রাকৃতির আলোর আভাস তৈরি করা যায়। এছাড়া সত্যজিৎ তাঁর নিজের অনেক কারিগরি ও চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত উদ্ভাবনের পেছনে জঁ-লুক গদার ও ফ্রঁসোয়া ক্রফোর মত ফরাসি নবতরঙ্গের পরিচালকদের কাজের কথা স্বীকার করেছেন।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রে নিয়মিত সম্পাদনা করতেন দুলাল দত্ত, তবে বেশীর ভাগ সময় সত্যজিৎ-ই দুলালকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন। আর্থিক অসচ্ছলতা এবং সত্যজিতের অনুপুঙ্খ পরিকল্পনা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কারণে তাঁর বেশীর ভাগ চলচ্চিত্রের সম্পাদনা প্রকৃতপক্ষে ক্যামেরাকে দৃশ্যধারণের সময়েই সম্পন্ন হয়ে যেত (পথের প্যাঁচালী বাদে)। কর্মজীবনের শুরতেই রবি শংকর, বেলায়েত খান ও আলি আকবর খানের মত প্রতিভাবান ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সাথে স্যতজিতের কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এ অভিজ্ঞতা ছিল মূলত বেদনাদায়ক। তিনি বুঝতে পারেন যে সঙ্গীতজ্ঞেরা তাঁর চলচ্চিত্রের চেয়ে তাঁদের নিজেদের সাঙ্গীতিক ধারার প্রতিই বেশি অনুগত। সত্যজিৎ পাশ্চাত্য ধারার ধ্রুপদী সঙ্গীতের ব্যবহার পছন্দ করতেনষ বিশেষত তাঁর শহুরে পটভূমিতে বানানো ছবিগুলোর জন্য। এ জন্য পরবর্তীকালে তিন কন্যা ছবিটির সময় থেকে তিনি নিজেই চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত স্বরলিপি রচনা করতেন। সত্যজিতের ছবিতে অভিনেতাদের কাজ ও সমানভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর ছবিতে চলচ্চিত্র তারকারা যেমন অভিনয় করেছেন, তেমনি কখনো চলচ্চিত্র দেখেননি এরকম মানুষও অভিনয় করেছেন (যেমন অপরাজিত ছবিটিতে)। রবিন উড সহ অনেকেই সত্যজিতকে শিশু অভিনেতাদের জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে আখ্যা দেন, এবং উদাহরণ হিসেবে পথের পাঁচালী ছবিতে অপু ও দুর্গা, পোস্টামাস্টার ছবিতে রতন এবং সোনার কেল্লা ছবিতে মুকুল চরিত্রগুলোর উল্লেখ করেন। সত্যজিতের নির্দেশনার প্রকৃতি অভিনেতার প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করত। উৎপল দত্তের মত অভিনেতাদের তেমন কোন নির্দেশনাই তিনি দেননি, অন্যদিকে অপু চরিত্রে সুবীর বন্দ্যোপধ্যায়কে কিংবা অপর্ণা চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুরকে তিনি অনেকটা''পুতুলের'' মত ব্যবহার করেছেন।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু ছিল বহুমুখী। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭৫ সালে বলেন যে সমালোচকেরা প্রায়ই তাঁর বিরুদ্ধে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে এক ধরন থেকে অন্য ধরনে ঘাসফড়িঙের মতো লাফ দেয়ার

প্রবণতা প্রদর্শনের অভিযোগ করেন ও তাঁর ছবিতে চেনাজানা কোন ধরন খুঁজে পান না যাতে তাঁর গায়ে কোন একটি বিশেষ তকমা এঁটে দেয়া যায়। এ ব্যাপারে আত্ম-সমর্থন করে তিনি বলেন যে এই বহুমুখীতা তাঁর নিজের চরিত্রেই প্রতিফলন, এবং তাঁর প্রতিটি ছবির পেছনে ঠাণ্ডা মাথায় নেয়া সিদ্ধান্ত কাজ করেছে।

৮.৬.১৬.৩ : ক্রীড়া

পশ্চিমবঙ্গে খেলাধূলা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। ফুটবল ও ক্রিকেট এই রাজ্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলাগুলির অন্যতম। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়াবিদরা দেশা ও রাজ্যকে প্রভুত সম্মান এনেদিতে পেরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে খেলাধুলাকে মূলত দুই ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি, যথা-১) মূল ধারার খেলাধুলা, ২) গ্রাম্য খেলাধুলা।

১। মূলধারার খেলাধূলা

মূল ধারার খেলাধুলা বলতে বোঝায়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যে সমস্ত খেলাধুলা, এবং যেসব খেলাধুলাতে বর্তমানে পুঁজিবিনিয়োগ এবং গণমাধ্যমের দৃষ্টি থাকে সেই সমস্ত খেলাগুলি। পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, কাবাডি, অ্যাথলেটিক্স, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বিভিন্ন অলিম্পিক খেলা ইত্যাদিকে মূলধারার মধ্যে ফেলা যেতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের খেলাধুলাকে কখনই বৃহত্তর ভারতের খেলাধুলার থেকে আলাদা করে দেখা ঠিক হবে না। তাই ভারতে জনপ্রিয় এবং গুরুত্ব পাওয়া খেলাধুলাগুলি এখানেও জনপ্রিয় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে ক্রীড়ার সাথে ক্লাব ব্যাবস্থার গভীর যোগাযোগ আছে।

● ফুটবল ঃ

পশ্চিমবঙ্গে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এই আন্তর্জাতিক খেলাটি বাংলার সংস্কৃতির সাথে অতপ্রত ভাবে জরিয়ে আছে। ক্লাব ব্যাবস্থার সহায়তায় ফুটবল এখানে অনেক উন্নতি করেছে। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গন জাগরণ এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে ফুটবল ছিল সহায়ক। স্বামী বিবেকানন্দ তাই ফুটবল খেলা কে গীতাপাঠের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও করনীয় বলেছিলেন। ১৯১১ সালে কলকাতার জনপ্রিয় ক্লাব মোহনবাগান ব্রিটিশদের ইস্ট ইয়র্কশায়ার কে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে আই এফ এ শিল্ড জয়ের অসামান্য গৌরব অর্জন করেছিল। পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ভারতীয় ক্লাব সেই সময় থেকে বাংলার ফুটবলের উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যায়। স্বাধীনতার পর মোহনবাগান যেমন তার অতীত গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলে, তেমনি পাশাপাশি তার চেয়ে কনিষ্ঠ সমসাময়িক মহামেডান ক্লাব, উয়ারি ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি ক্লাব ফুটবলের আঙ্গিনায় নিজেদের গুরুত্ব বাড়াতে প্রয়াসী হয়। যদিও এই ক্লাবগুলি অন্যান্য খেলাধুলা ক্ষেত্রেও প্রয়াসী, তা সত্ত্বেও তাদের ফুটবল দলগুলি বাঙালীর আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে জড়িত।

● মোহনবাগান অ্যাথালেটিক্স ক্লাব ঃ

১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দল এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাবগুলির একটি। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই দল খেলাধূলার জগতে সাফল্য পেয়ে এসেছে। তাই এটিকে ভারতের সফলতম দলগুলির অন্যতম দল

হিসেবে গণ্য করা হয়। মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব একাধিকবার ফেডারেশন কাপ, রোভার্স কাপ, ডুরান্ড কাপ, আই এফ এ শিল্ড, জাতীয় ফুটবল লিগ, আই-লিগ ওকলকাতা ফুটবল লিগ জয় করেছে। মোহনবাগানই প্রথম ভারতীয় দল যা একটি ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করেছিল। ১৯১১ সালে আই এফ এ শিল্ডে মোহনবাগানই প্রথম ভারতীয় দল যা একটি ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করেছিল। ১৯৮৯ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা-শতবর্ষ উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯১১ সালের এই জয়ের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। স্বাধীনতার পরে এই ক্লাব ফুটবলের উন্নতিতে সচেষ্ট হয়। তারা বিভিন্ন খেতাব জয় করে। ১৯৪৭ সালে মোহনবাগান আবার আই এফএ শিল্ড জয় করে। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাদান স্বাধীনতার পর প্রথম আইএফএ শিল্ড-জয়ী ভারতীয় দলে পরিণত হয়। এই বছর মোহনবাগান তার প্রধান প্রতিপক্ষ ইসচবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত জয়ে কলকাতা ফুটবল লিগও জয় করেছিল। এরপর ১৯৫২ সালে মোহনবাগান আবার আই এফএ শিল্ড জেতে। ১৯৫৪ সালে এই দল পরপর আই এফ এ শিল্ড ও ফার্স্ট ডিভিশন কলকাতা ফুটবল লিগ জয় করে কলকাতার দ্বিমুকুট পায়। মোহনবাগানই প্রথম এই কীর্তি স্থাপন করেছিল। ১৯৬০ সালে মোহনবাগান আবার দ্বিমুকুট পায়। ১৯৭৭ সালে মোহনবাগান পরপর আইএফএ শিল্ড, ডুরান্ড কাপ ও রোভার্স কাপ জয় করে ত্রিমুকুট পায়। এই দলই প্রথম ভারতীয় ত্রিমুকুট জয়ী দল হিসেবে ইতিহাস গঠন করে।

১৯৭৭ সালে মোহনবাগান বিখ্যাত নর্থ আমেরিকান সকার লিগ দল নিউ ইয়র্ক কসমসের বিরুদ্ধে একটি মৈত্রী ফুটবল ম্যাচ খেলে। এই ম্যাচে পেলে নিউ ইয়র্ক কসমসের হয়ে খেলেছিলেন। ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই ম্যাচে ৮০,০০০ দর্শক এসেছিলেন। ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয় এবং তারকাসমন্বিত কসমসের খেলোয়াড়েরা মোহনবাগান খেলোয়াড়দের বিস্তর প্রশংসা করেন।

এরপর ১৯৭৭ সালে মোহনবাগান প্রথম ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ওঠে। কিন্তু এই ম্যাচে তারা ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজের কাজে ১-০ গোলে পরজিত হয়। ১৯৭৮ সালে মোহনবাগান আবার এ টুর্নামেণ্টের ফাইনালে ওছে। কিন্তু এবার তাদের প্রধান প্রতিপক্ষুইস্টবেঙ্গল কাপের সঙ্গে ট্রফি ভাগ করে নিতে হয়। ১৯৮০ সালে আবার মোহনবাগান ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ওঠে। এই ম্যাচও তারা ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে। পরের বছর, ১৯৮১ সালের ফেডারেশন কাপে তারা ফাইনালে মহামেডান স্পোটিং ক্লাবকে ২-০ গোলে পরাজিত করে প্রথম এই কাপ জেতে। এক বছর পর স্ফৎলাল হিলসকে ১-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান আবার ফেডারেশন কাপ জেতে। ১৯৮৬ সালে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে এবং ১৯৮৭ সালে সালগাঁওকর স্পোটিং ক্লাবকে পরাজিত করে মোহনবাগান পরপর দুই বছর ফেডারেশন কাপ জেতে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর ইস্টবেহগল মাহিন্দ্র অ্যাণ্ড মাহিন্দ্র ও সালগাঁওকর স্পোটিং ক্লাবকে যথাক্রমে ২-০, ১-০ ও ৩-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান তিনবার ফেডারেশন কাপ জেতে।

১৯৯৮ সালে মোহনবাগান প্রথম একসঙ্গে আই এফ ও শিল্ড, ফেডারেশন কাপ ও জাতীয় ফুটবল লিগ জয় করে। ২০০৭ সালে মোহনবাগান ৪-০ গোলে ডেম্পো স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে মোহনবাগান ইণ্ডিয়ান সুপার কাপ জিতেছিল। ২০০৮ সালে মোহনবাগান জার্মান আন্তজার্তিকের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পায়। এফসি বায়ার্ড় মিউনিখের অফিসিয়াল টেস্টিমোনিয়ালে ছিলেন অলিভার কান। কান ছাড়াও জে রোবার্তো ও মার্ক ফন বোমেল বায়ার্ন দলে উপস্থিত ছিলেন। ২০০৮ সালের ২৭মে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচটি আয়োজিত হয়েছিল।

এই দল সর্বাধিকবার ফেডারেশন কাপ জয় করে, ২০১৫ সালে এরা আই লীগ জয় করেছে, ২০১৬ সালে শেষবার ফেডারেশন কাপ জয় করে।

● **কলকাতা ডার্বি**, হলো মোহন বাগানের ও ইস্ট বেঙ্গলের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ। এই দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্ধিতা প্রায় ১০০ বছরের পুরানো, এবং ফিকা এর ক্লাসিক ডার্বি তালিকার বৈশিষ্ট্য যুক্ত। এই ম্যাচে মুখোমুখি দর্শকদের উপস্থিতি এবং প্রতিদ্বন্দীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা দেখা দেয়।

ক্লাব দুটি বর্তমানে আই লীগে দুবার এবং কলকাতা ফুটবল লীগে একবারে কমপক্ষে ৩ বার ডার্বিতে অংশ নেয়। ফেডারেশন কাপ, আই এফ এ শিল্ড, ডুরাণ্ড কাপইত্যাদি অন্যান্য প্রতিযোগিতায় প্রায়ই এই দুটি ক্লাবকে ডার্বিতে অংশ নিতে দেখা যায়।

উভয় দলেরই বিশ্বজুড়ে বিশাল এবং অনুরাগী ভক্ত রয়েছে। উভয় ক্লাব বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, মোহন বাগান বাংলার পশ্চিমংশ-এর বিদ্যমান লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে (যারা ঘোঁটি নামে পরিচিত), যখন ইস্ট বেঙ্গলপ্রাথমিকভাবে বাংলার পূর্বাংশের মানুষদের দ্বারা সমর্থিত (যারা বাঙালনামে পরিচিত) সংস্কৃতিকভাবে, এই ডার্বি স্কটিশ প্রিমিয়ার লিগ এর পুরাতন ফর্ম ডার্বির অনুরূপ, যেহেতু মোহন বাগানের সমর্থকরা বেশিরভাগ 'ন্যাটিভিস্ট' জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে (রেঞ্জার্স এফসি অনুরূপ) এবং বেশিরভাগ পূর্ববঙ্গের ভক্ত 'অভিবাসী' জনসংখ্যা (সেল্টিক এফসি এর অনুরূপ) প্রতিনিধিত্ব করে। যাইহোর, বাংলাদেশে মূলত অনেক মানুষই মোহন বাগানের সমর্থন করে, কারণ এটি ভারতের প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু লোক পূর্ববাংলাকে সমর্থন করে বলে এটা ফুটবল ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া। সুতরাং ক্রশ জাতিগত সমর্থন বেস একটি অস্তিত্ব আছে।

মোহন বাগানে ভারতের সবচেয়ে পুরনো বিদ্যমান ক্লাবটি ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা শহরে, তখন এটির নামকরণ করা হয় কলম্বিয়া, কলকাতা এবং আজ পর্যন্ত ভারতের সফল ক্লাব। ১৯১১ সাল পর্যন্ত দেশটির রাজধানী কলকাতা ছিল, তা উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ প্রভাব নিশ্চিত করেছে যে, এই খেলাটি উন্নত হয়েছে, অন্য অঞ্চলের খেলোয়াড়দের আকৃষ্ট করেছে এবং এটি আজকের এই প্রতিদ্বন্দিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যেখানে আজকের প্রতিদ্বন্ধিতার মূল কারণ।

১৯২০ সালে, জোড়া বাগানের ক্লাবটি মোহনবাগান এর বিরুদ্ধে মাঠে খেলেছিলেন, যারা তার তারকা খেলোয়াড় সাইলেশ বোস ছাড়াও ক্লাবের সহ-সভাপতি সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীর উৎসাহ নিয়ে খেলেন। শিল্পপতির অসন্তোষের কারণে তিনি নতুন ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইস্ট বেঙ্গল এর জন্ম হয়। চৌধুরী এবং

তার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পূর্ববঙ্গ বা ইস্ট বেঙ্গল থেকে যা বিশেষভাবে এখনকার আধুনিক যুগের বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে, এই ক্লাবটি এখন সাধারণভাবে সেই অঞ্চল থেকে আসা মানুষদের দ্বারা সমর্থিত। এর ফলস্বরূপ ক্লাবগুলি দুটি ভিন্ন আর্থ- সামজিক গোষ্ঠী দ্বার সমর্থিত ছিল, যদিও এটি বেশিরভাগ সময় সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম কলকাতা ডার্বি ১৮২৫ সালে কলকাতা লীগে অনুষ্ঠিত হয়, যা ইস্ট বেঙ্গল জয় করে ১-০ গোলে।

● প্রথমবার

১৯২৫-এ প্রথমবার দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল। মোনা দত্তের নেতৃত্বে ১-০ ম্যাচ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। একমাত্র গোলটি করে ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ছিলেন নেপাল চক্রবর্তী। ১৯৬০-এর দশকে মোহন বাগানের জন্য সুবর্ণ সময়টি প্রমাণিত হয় এবং এটি মারিনার জন্য নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে লীগ জেতার পর, মোহন বাগানের তারপর আইএফএ শিল্ড ফাইনাল তাদের নিজস্ব মাঠে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত করে ডবলে। ৩-১ গোলে উদ্দীপক কোচ অমল দত্তের নিয়োগে বিপ্লবী ৪-২-৪ গঠনের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

● ৭০এর দশক ও পি কে ব্যানার্জী

চাকা অবশেষে পরিবর্তন হয়, এবং ১৯৭০ দশক ইস্ট বেঙ্গলর দশক ছিল। ছয় বছর (১৯৭০ থেকে ১৯৭৫) মধ্যে তারা একটি ডার্বি হেরেছে মাত্র। ১৯৭৫ সালের আই এফ এ শীল্ড এ লাল হলুদ দল ৫-০ গোলের রেকর্ডে জিতেছে এবং এটির সাথে, পাঁচটি শিল্ড জয়লাভের রেকর্ড করে। কোচ ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় ফুটবলার ও প্রাক্তন ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড় প্রদীপ কুমার বন্দোপাধ্যায়। এই ধরনের হিংস্রতা ছিল বিশাল পরাজয়ের পার্শ্বে যে, বহুজন বাগানের খেলোয়াড়রা সমর্থকদের ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

● ইডেন গার্ডেন্স ডার্বি

১৯৮০-র ১৬ অগস্ট ইডেন গার্ডেন্সে ডার্বি দেখতে এসে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৬ জন সমর্থক। ভারতীয় ফুটবলে যা কালদিবস হিসেবেই গণ্য করা হয়। সেই দিন থেকে এটিকে ফুটবলপ্রেমী দিবস ও বলা হয়।

● হীরের দর্প চূর্ণ

১৯৯৭ সালে ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে অনেকগুলি রেকর্ডের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ডার্বি অনুষ্ঠিত হয়, যখন ১৩১,০০০ জন দর্শকের একটি অসাধারণ ভিড়-ভারতে যে কোনও খেলা জন্য একটি রেকর্ড উপস্থিতি-কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ভরা। ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে ৪-১ ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয় যা ভারতের সবচেয়ে স্বীকৃত ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়।

● ইস্টবেঙ্গল ৫-০ মোহনবাগান, আই এফ এ শিল্ড ফাইনাল ১৯৭৫

৯৭ বছরের ডার্বির ইতিহাসে ৭৫-এর শিল্ড ফাইনাল আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছ'বছর পর শিল্ড ফাইনালে মধুর প্রতিশোধ নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে মোহনবাগানকে পাঁচ গোলের মালাই পরিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কোনও দলের এখনও পর্যন্ত ডার্বিতে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। তাও আবার পেনাল্টি মিস করেই। সুরজিত সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপা ও রঞ্জিত

মুখোপাধ্যায় স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধেও ইস্টবেঙ্গলের আগুনে ফর্ম অব্যাহত ছিল। শ্যাম থাপা দ্বিতীয়ার্ধের ৫১ মিনিটে নিজের দু'নম্বর ও ম্যাচের চার নম্বর গোলটি করেছিলেন। ৮৪ মিনিটে সুভঙ্কর স্যান্নাল বাগানের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছিলেন।

● ইস্টবেঙ্গল ৪-১ মোহনবাগান, সেমিফাইনাল, ফেডারেশন কাপ ১৯৯৭

১৯৯৭-এর ১৩ জুলাই ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। এই ম্যাচ দেখতে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এসেছিলেন ১ লক্ষ ৩১ হাজার দর্শক। যা এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। বাইচুং ভুটিয়ার হ্যাটট্রিকে মোহনবাগানকে ৪-১ হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন চিমা ওকোরি। সেসময় নতুন ডায়মণ্ড সিস্টেম নিয়ে অমল দত্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। বিপক্ষের বক্সে আক্রমণের ঝড় তুলছিলেন বাগনের ফুটবলাররা। এমনকী অমল দত্ত ম্যাচের আগে থেকেই মাইণ্ড গেমও শুরু করে দিয়েছিলেন। বাইচুংকে 'চুং চুং' বলেও ডেকেছিলেন তিনি। যদিও লাল হলুদ কোচ পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় এসব নিয়ে কোনও মাথাই ঘামাইনি। ম্যান ম্যানেজমেণ্টের মাস্টার ছিলেন তিনি। দলের পারফরম্যান্সে আগুন জ্বালাতে জানতেন ধুরন্ধর পিকে। যুযুধান দুই কোচের মস্তিষ্কের লড়াইয়ে শেষ হাসি তিনিই হেসেছিলেন।

● মোহনবাগান ৫-৩ ইস্টবেঙ্গল, আই-লিগ ২০০৯

৭৫-এর আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পাঁচ গোলে হেরেই মাথা নীচু করে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল মোহনবাগানকে। ৩৪ বছর ধরে বাগান সমর্থকদের সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে মুখ বুজেই। ইস্টবেঙ্গল সুযোগ পেলেই হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়েই মোহনবাগানিদের ব্রিদ্রুপ করত। কিন্তু ২০০৯-এ এর উত্তর দিয়েছিল মোহনবাগান। ১৯৭৫ এর ৫-০ র বদলা ৫-৩ এ নিয়েছিল মোহনবাগান। এই ম্যাচে একাই শেষ করে দিয়েছিলেন চিডি এডে। চার গোল করেছিলেন তিনি। ২৫ অক্টোবর যুবভারতীতে আরও একটা নজির গড়েছিলেন এই নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার। একমাত্র বিদেশি ফুটবলার হিসেবে ডার্বিতে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি কোনও ডার্বিতে সর্বোচ্চ গোল করারও নজির গড়েন তিনি। এই ম্যাচের ৯ মিনিটে শিল্টন পালের ভুলেই প্রথমে বাগান গোল হজম করেছিল। নির্মল ছেত্রীর ফ্লাইট বুঝতে পারেননি শিল্টন। এরপর চিডি সমতা ফেরান। মণীশ মাথানির গোলে স্কোরলাইন ২-১ হয়েছিল। এরপর ব্যারেটোর মাপা ক্রস থেকেই চিডি নিজের দু নম্বর ও দলের হয়ে তিন নম্বর গোলটা করেছিলেন। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধের আগেই ইয়াসুফ ইয়াকুবু বাগানের দুর্বল রক্ষণের সুযোগ নিয়ে জোড়া গোল করে স্কোরলাইন ৩-৩ করেন। দ্বিতীয়ার্ধেও চিডি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ফুরিয়ে যাননি। আরও দুটি গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছিলেন।

এই ডার্বিকে ঘিরে বাংলার মানুষের মধ্যে প্রবল উন্মাদনা দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সাথে এটি ওতপ্রত ভাবে জরিয়ে গেছে। তাই বাঙ্গালির ক্রীড়া ইতিহাসে কলকাতা ডার্বির গুরুত্ব অপরিসীম। ডার্বিকে কেন্দ্র করে আলাদা খাওয়া দাওয়াস সংগীত। সর্বোপরি সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা বাংলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে।

● ক্রিকেট

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পশ্চিমবঙ্গেও ক্রিকেট অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। ভারতের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়াম কলকাতায় অবস্থিত। এই স্টেডিয়ামের এক লক্ষেরও বেশি দর্শক খেলা

দেখতে পারেন। বিশ্বে যে দু'টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এক লক্ষ আসন রয়েছে, ইডেন গার্ডেনস তার অন্যতম। ইডেন গার্ডেনস পূবাঞ্চল ও বাংলা ক্রিকেট দলের কার্যালয়। ইণ্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের কার্যালয়ও কলকাতায়। শাহরুখ খানের মালিকানাধীন এই দলটি ইডেন গার্ডেনকে নিজস্ব হোম টার্ফ হিসেবে ব্যবহার করে। ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যাণ্ড ফুটবল ক্লাব হল বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ক্রিকেট ক্লাব।

● সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ৮ই জুলাই, ১৯৭২ সালে, কলকাতার বেহালায় একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারে। তাঁর বাবার নাম চণ্ডীদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতার নাম নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ মূলত তাঁর দাদার সাহায্যে ক্রিকেট জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন।

বাঁহাতি ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অদ্যাবধি ভারতের সফলতম টেস্ট অধিনায়ক বলে বিবেচিত হন, তার অধিনায়কত্বে ভারত ৪৯টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ২১টি ম্যাচে জয়লাভ করে। ২০০৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারত ফাইনালে পৌঁছে যায়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র একজন আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন অধিনায়কই ছিলেন না, তাঁর অধীনে যে সকল তরুণ ক্রিকেটারেরা খেলতেন, তাঁদের কেরিয়ারের উন্নতিকল্পেও তিনি প্রভূত সহায়তা করতেন।

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেটার। একদিনের ক্রিকেটে তাঁর মোট রানসংখ্যা এগারো হাজারেরও বেশি। একদিনের ক্রিকেটে তাঁর সাফল্য সত্ত্বেও ক্যারিয়ারের শেষদিকে একদিনের ক্রিকেটে তাঁর স্থলে দলে তরুণ ক্রিকেটারদের নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ২০০৮ সালের ১অক্টোবর সৌরভ ঘোষণা করেন যে সেই মাসে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজটিই হবে তাঁর জীবনের সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ। ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর সৌরভ তাঁর সর্বশেষ প্রথম-সারির ক্রিকেট ম্যাচটি খেলেন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের একজন বিখ্যাত ক্রিকেটার ও প্রাক্তন অধিনায়ক।

তিনি প্রথম জীবনে স্কুল ও রাজ্যের হয়ে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন ক্রিকেট জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে থাকেন তিনি। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন ১১ই জানুয়ারী, ১৯৯২ সালে। কিন্তু তিনি সেই অভিষেক ম্যাচে মাত্র তিন(৩) রান করেন, যার ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে বাদ পড়েন। তার পরে ১৯৯৩-১৯৯৪ এবং ১৯৯৪-১৯৯৫ সালের রঞ্জি ট্রাফিতে চমৎকার সাফল্য লাভ করেন যার ফলে তিনি আবার ১৯৯৬-এর ইংল্যাণ্ড সফরের জন্য খেলার সুযোগ পান। এরপরে সেই সফরেই তিনি তার জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেন ২০ই জুন, ১৯৯৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। তিনি সেই সফরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

তিনি শুধু একজন খেলোয়াড়ই নন, একজন বিখ্যাত অধিনায়কও ছিলেন। তিনি তাঁর ক্রিকেট জীবনের সর্বমোট ৩১১টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন এবং ১১, ৩৬৩ রান সংগ্রহ করেছেন। পাশাপাশি তিনি ১১৩টি টেস্ট খেলেছেন ও ৭,২১২ রান সংগ্রহ করেছেন। ভারতকে তিনি ৪৯টি টেস্ট ম্যাচে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন যার মধ্যে ভারত জিতেছিল ২১টি ম্যাচে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতকে ১৪৬ টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যার মধ্যে ভারত জিতেছিল ৭৬ টি ম্যাচে। তিনি ভারতের একজন মিডিয়াম পেসার বোলারও

ছিলেন। তিনি একদিনের আন্তজার্তিক ক্রিকেটে ১০০টি এবং টেস্টে ৩২টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া তিনি একদিনের আন্তজার্তিকে ১০০টি ও টেস্ট ৭১টি ক্যাচ নিয়েছেন।

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার পর তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এরপরে ২০০৮, ২০০৯, ও ২০১০-এ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেন এবং ২০০৮ ও২০১০-এ এই দলকে নেতৃত্বে দেন। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত আইপিএলের চতুর্থ সিজনে নিলামে তিনি অবিক্রীত থেকে গেলেও শেষ পর্যন্ত পুনে ওয়ারিয়র্সের দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমানে তিনি দিল্লি ক্যাপিটালের মেন্টরও Cricket Association of Bengal এর সভাপতি।

এছাড়া খো খো, ড্যাং গুলি, কাবাডি প্রভৃতি গ্রাম্য খোলধুলা খুবই জনপ্রিয়। এছাড়া অ্যাফলেটিক্স পশ্চিমবঙ্গে খুবই জনপ্রিয়। বর্তমানকালে তিরন্দাজি, রাইফেল শুটিং, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতি অলিম্পিক খেলাতেও পশ্চিমবঙ্গ অনেক সুনাম অর্জন করেছে। বিশ্বের প্রাচীনতম পোলো ক্লাব ক্যালকাট পোলো ক্লাব কলকাতাতেই অবস্থিত। ক্যালকাটা পোলো ক্লাব কলকাতায় অবস্থিত একটি পোলো ক্লাব। ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পোলো ক্লাবটিকে বিশ্বের অদ্যাবধি বর্তমান পোলো ক্লাবগুলির মধ্যে প্রাচানতম বলে মনে করা হয়।

পোলো খেলার জন্ম ভারতের মণিপুরে। এই অঞ্চলে 'সাগোর কাংজেই' নামে একটি খেলা প্রচলিত ছিল। এই খেলার অপর নাম ছিল 'কাঞ্চাই-বাজী' বা 'পুলু'। ব্রিটিশরা এই খেলাটিকে নিয়মায়িত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁরা এই খেলায় কাঠের বল প্রবর্তন করেন। ইংরেজিকৃত এই খেলাটিই ধীরে ধীরে সমগ্র পাশ্চাত্য বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৬২ সালে মণিপুরের ওই খেলায় অনুপ্রেরিত হয়ে ক্যাপ্টেন রবার্ট স্টিউয়ার্ট ও মেজর জেনারেল জো শেয়ার নামে দুই ব্রিটিশ সেনা আধিকারিক ক্যালকাটা পোলো ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সমাজে তাঁরা এই খেলার প্রবর্তন করেছিলেন।

ক্যালকাট্টা পোলো ক্লাব প্রাচীনতম পোলো ট্রফি এজরা কাপ (১৮৮০) চালু করার গৌরবের অধিকারী। পাশাপাশি এই ক্লাব কারমাইকেল কাপ (১৯১০) ও স্টিউয়ার্ট কাপও চালু করেছিল। প্রথম দিকে ভারতের বিভিন্ন রাজবংশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ আয়োজিত হত।

কিছুকাল বন্ধ থাকার পর ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্যালকাটা পোলো ক্লাব বিএফ এল কর্পোরেশন পোলো সিজন নামে দুই-সপ্তাহব্যাপী পোলো টুর্নামেণ্টের পুনরায় আয়োজন শুরু করে। এই টুর্নামেন্ট জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবী, বিভিন্ন বলিউড ও টলিউড ব্যাক্তিত্ব এবং কর্পোরেট ও বিনোদন দুনিয়ার নানা ব্যক্তিত্বকে আকর্ষিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে একাধির সুবৃহৎ স্টেডিয়াম অবস্থিত। সারা বিশ্বে যে দুটি মাত্র লক্ষ-আসন বিশিষ্ট ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে কলকাতার ইডেন গার্ডেনস তার অন্যতম। অন্যদিকে বিধাননগরের বহুমুখী স্টেডিয়াম বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম। ২০১৭ সালে এই স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যাণ্ড ফুটবল ক্লাব বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব। জাতীয় ও আন্তজার্তির স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও খড়গপুর শহরেও। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যাক্তিত্বেরা হলেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক

তালিকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অলিম্পিক টেনিস ব্রোঞ্জ পদকজয়ী লিয়েণ্ডার পেজ, দাবা আন্তর্জাতিক গ্র্যাণ্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ। আবার অতীতের খ্যাতমানা ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফুটবলার চুনী গোস্বামী, পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মান্না, সাঁতারু মিহির সেন, অ্যাথলেট জ্যোতির্ময়ী শিকদারপ্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে প্রচুর সাংস্কৃতিক সংস্থা। কলকাতার জোকায় রয়েছে বাংলার ব্রতচারী সমিতি। ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়কমণ্ডলী, কবি সুকান্তের কিশোর বাহিনী, সব পেয়েছির আসর, মনিমেলা মহাকেন্দ্র ইত্যাদি শিশু কিশোর সংস্থা।

Source : Wikipedia and other relevant links.

৮.৬.১৬.৪ : উপসংহার

এইভাবে দেখা গেল যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ এর পরেও সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। যার ফলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের গৌরব অনেক উচ্চে উঠেছে।

৮.৬.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে কি জান?

২। স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চা আলোচনা কর।

৩। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর অবদান আলোচনা কর।

৪। কলকাতা ডার্বির গুরুত্ব কি?

৮.৬.১৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। সন্দীপ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রশন, কলকাতা অক্টোবর, ২০০২।

২। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২০০১।

৩। Neumann p, "Biography for Satyajit Ray"।

NOTES

NOTES